Library
SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM
Bhadaini, Varanasi-1

No....10/10.....

Books should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of -/10/- N. P. daily shall have to be paid.

5.6.78

N-13-1

LIBRARY
No. ~~83~~ 10110
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

10/10

রবীন্দ্র-রচনাবলী

রবীন্দ্র রচনাবলী

(৩)

Gayatri

LIBRARY
No.............
Shri Shri ... mayee Ashram
BANARAS.

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্র রচনাবলী

রবীন্দ্র-রচনাবলী

তৃতীয় খণ্ড

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

LIBRARY
No.............
Shri Shri ... ...mayee Ashram
BANARAS.

বিশ্বভারতী

বিশ্বভারতী
২, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা

২ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ— ২৫ বৈশাখ, ১৩৪৭
দ্বিতীয় সংস্করণ— কার্তিক, ১৩৪৭
তৃতীয় সংস্করণ— কার্তিক, ১৩৪৮
চতুর্থ সংস্করণ— জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫১

মূল্য ৫৲, ৭৲, ৮৲ ও ১০৲

মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন

=৫০৫০+৪৫০

LIBRARY
No.........
Shri Shri ... Ashram
BANARAS.

সূচী

চিত্রসূচী ।৵০

কবিতা ও গান

সোনার তরী মূল্য ৫।০ ৩

নাটক ও প্রহসন

চিত্রাঙ্গদা —— মূল্য ২, ১৫৭
গোড়ায় গলদ —— মূল্য ১, ২০১

উপন্যাস ও গল্প

চোখের বালি —— মূল্য ৪, ২৮৩

প্রবন্ধ

আত্মশক্তি ৫১৩
গ্রন্থ-পরিচয় ৬৩৭
বর্ণানুক্রমিক সূচী ৬৪৯

৮।০,

চিত্রসূচী

যৌবনে রবীন্দ্রনাথ ৭

জ্যেষ্ঠা কন্যাসহ রবীন্দ্রনাথ ৫২

সোনার তরীর পাণ্ডুলিপির এক পৃষ্ঠা ৯৬

রবীন্দ্রনাথ ১৬১

প্রিয়নাথ সেন ও রবীন্দ্রনাথ ২০৫

কবিতা ও গান

LIBRARY
No.............
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

কবি-ভ্রাতা শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন
মহাশয়ের করকমলে
তদীয় ভক্তের এই
প্রীতি-উপহার
সাদরে সমর্পিত
হইল।

LIBRARY
No.............
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

Esha 620

সূচনা

জীবনের বিশেষ পর্বে কোনো বিশেষ প্রকৃতির কাব্য কোন্ উত্তেজনায় স্বাতন্ত্র্য নিয়ে দেখা দেয়, এ প্রশ্ন কবিকে জিজ্ঞাসা করলে তাকে বিপন্ন করা হয়। কী করে সে জানবে। প্রাণের প্রবৃদ্ধিতে যে-সব পরিবর্তন ঘটতে থাকে তার ভিতরকার রহস্য সহজে ধরা পড়ে না। গাছের সব ডাল একই দিকে একই রকম করে ছড়ায় না, এদিকে ওদিকে তারা বেঁকেচুরে পাশ ফেরে, তার বৈজ্ঞানিক কারণ লুকিয়ে আছে আকাশে বাতাসে আলোকে মাটিতে। গাছ যদি বা চিন্তা করতে পারত তবু সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার এই মন্ত্রণাসভায় সে জায়গা পেত না, তার ভোট থাকত না, সে কেবল স্বীকার করে নেয়, এই তার স্বভাবসংগত কাজ। বাইরে বসে আছে যে প্রাণবিজ্ঞানী সে বরঞ্চ অনেক খবর দিতে পারে।

কিন্তু বাইরের লোক যদি তাদের পাওনার মূল্য নিয়েই সন্তুষ্ট না থাকে, যদি জিজ্ঞাসা করে মালগুলো কেমন করে কোন্ ছাঁচে তৈরি হল, তাহলে কবির মধ্যে যে আত্মসন্ধানের হেড্ আপিস আছে সেখানে একবার তাগাদা করে দেখতে হয়। বস্তুত সোনার তরী তার নানা পণ্য নিয়ে কোন্ রপ্তানির ঘাট থেকে আমদানির ঘাটে এসে পৌঁছল ইতিপূর্বে কখনো এ প্রশ্ন নিজেকে করিনি, কেননা এর উত্তর দেওয়া আমার কর্তব্যের অঙ্গ নয়। মূলধন যার হাতে সেই মহাজনকে জিজ্ঞাসা করলে সে কথা কয় না, আমি তো মাঝি, হাতের কাছে যা জোটে তাই কুড়িয়ে নিয়ে এসে পৌঁছিয়ে দিই।

মানসীর অধিকাংশ কবিতা লিখেছিলুম পশ্চিমের এক শহরের বাংলা-ঘরে। নতুনের স্পর্শ আমার মনের মধ্যে জাগিয়েছিল নতুন স্বাদের উত্তেজনা। সেখানে অপরিচিতের নির্জন অবকাশে নতুন নতুন ছন্দের যে বুনুনির কাজ করেছিলুম এর পূর্বে তা আর কখনো করিনি। নূতনত্বের মধ্যে অসীমত্ব আছে, তারি এসেছিল ডাক, মন দিয়েছিল সাড়া। যা তার মধ্যে পূর্ব হতেই কুঁড়ির মতো শাখায় শাখায় লুকিয়ে ছিল, আলোতে তাই ফুটে উঠতে লাগল। কিন্তু সোনার তরীর লেখা

আর-এক পরিপ্রেক্ষিতে। বাংলাদেশের নদীতে নদীতে গ্রামে গ্রামে তখন ঘুরে বেড়াচ্ছি, এর নূতনত্ব চলন্ত বৈচিত্র্যের নূতনত্ব। শুধু তাই নয়, পরিচয়ে-অপরিচয়ে মেলামেশা করেছিল মনের মধ্যে। বাংলাদেশকে তো বলতে পারিনে বেগানা দেশ, তার ভাষা চিনি তার সুর চিনি। ক্ষণে ক্ষণে যতটুকু গোচরে এসেছিল তার চেয়ে অনেকখানি প্রবেশ করেছিল মনের অন্দরমহলে আপন বিচিত্র রূপ নিয়ে। সেই নিরন্তর জানাশোনার অভ্যর্থনা পাচ্ছিলুম অন্তঃকরণে, যে উদ্বোধন এনেছিল তা স্পষ্ট বোঝা যাবে ছোটো গল্পের নিরন্তর ধারায়। সে-ধারা আজও থামত না যদি সেই উৎসের তীরে থেকে যেতুম। যদি না টেনে আনত বীরভূমের শুষ্ক প্রান্তরের কৃচ্ছ্রসাধনের ক্ষেত্রে।

আমি শীত গ্রীষ্ম বর্ষা মানিনি, কতবার সমস্ত বৎসর ধরে পদ্মার আতিথ্য নিয়েছি, বৈশাখের খররৌদ্রতাপে, শ্রাবণের মুষলধারা-বর্ষণে। পরপারে ছিল ছায়াঘন পল্লীর শ্যামশ্রী, এপারে ছিল বালুচরের পাণ্ডুবর্ণ জনহীনতা, মাঝখানে পদ্মার চলমান স্রোতের পটে বুলিয়ে চলেছে দ্যুলোকের শিল্পী প্রহরে প্রহরে নানাবর্ণের আলোছায়ার তুলি। এইখানে নির্জন-সজনের নিত্যসংগম চলেছিল আমার জীবনে। অহরহ সুখদুঃখের বাণী নিয়ে মানুষের জীবনধারার বিচিত্র কলরব এসে পৌঁছচ্ছিল আমার হৃদয়ে। মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে আমার মনকে জাগিয়ে রেখেছিল। তাদের জন্য চিন্তা করেছি, কাজ করেছি, কর্তব্যের নানা সংকল্প বেঁধে তুলেছি, সেই সংকল্পের সূত্র আজও বিচ্ছিন্ন হয়নি আমার চিন্তায়। সেই মানুষের সংস্পর্শেই সাহিত্যের পথ এবং কর্মের পথ পাশাপাশি প্রসারিত হতে আরম্ভ হল আমার জীবনে। আমার বুদ্ধি এবং কল্পনা এবং ইচ্ছাকে উন্মুখ করে তুলেছিল এই সময়কার প্রবর্তনা— বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবলোকের মধ্যে নিত্যসচল অভিজ্ঞতার প্রবর্তনা। এই সময়কার প্রথম কাব্যের ফসল ভরা হয়েছিল সোনার তরীতে। তখনই সংশয় প্রকাশ করেছি, এ তরী নিঃশেষে আমার ফসল তুলে নেবে কিন্তু আমাকে নেবে কি।

LIBRARY
No............
Shri Shri [illegible]mayee Ashram
BANARAS.

সোনার তরী

সোনার তরী

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।
রাশি রাশি ভারা ভারা
ধান কাটা হল সারা,
ভরা নদী ক্ষুরধারা,
খর-পরশা।
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা।

একখানি ছোটো খেত, আমি একেলা,
চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা।
পরপারে দেখি আঁকা
তরুছায়ামসীমাখা
গ্রামখানি মেঘে ঢাকা
প্রভাতবেলা,—
এপারেতে ছোটো খেত, আমি একেলা।

গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে,
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।
ভরা-পালে চলে যায়,
কোনো দিকে নাহি চায়,

ঢেউগুলি নিরুপায়
ভাঙে দু-ধারে,—
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।

ওগো তুমি কোথা যাও কোন্ বিদেশে,
বারেক ভিড়াও তরী কূলেতে এসে।
যেয়ো যেথা যেতে চাও,
যারে খুশি তারে দাও
শুধু তুমি নিয়ে যাও
ক্ষণিক হেসে
আমার সোনার ধান কূলেতে এসে।

যত চাও তত লও তরণী 'পরে।
আর আছে?—আর নাই, দিয়েছি ভরে।
এতকাল নদীকূলে
যাহা লয়ে ছিনু ভুলে
সকলি দিলাম তুলে
থরে বিথরে,
এখন আমারে লহ করুণা করে।

ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই,—ছোটো সে তরী
আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।
শ্রাবণ-গগন ঘিরে
ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে,
শূন্য নদীর তীরে
রহিনু পড়ি,
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী।

শিলাইদহ, বোট
ফাল্গুন, ১২৯৮

বিম্ববতী

রূপকথা

সযত্নে সাজিল রানী, বাঁধিল কবরী,
নবঘনস্নিগ্ধবর্ণ নব নীলাম্বরী
পরিল অনেক সাধে। তার পরে ধীরে
গুপ্ত আবরণ খুলি আনিল বাহিরে
মায়াময় কনকদর্পণ। মন্ত্র পড়ি
শুধাইল তারে— কহ মোরে সত্য করি
সর্বশ্রেষ্ঠ রূপসী কে ধরায় বিরাজে।
ফুটিয়া উঠিল ধীরে মুকুরের মাঝে
মধুমাখা হাসি-আঁকা একখানি মুখ,
দেখিয়া বিদারি গেল মহিষীর বুক—
রাজকন্যা বিম্ববতী সতিনের মেয়ে,
ধরাতলে রূপসী সে সবাকার চেয়ে।

তার পরদিন রানী প্রবালের হার
পরিল গলায়। খুলি দিল কেশভার
আজানুচুম্বিত। গোলাপি অঞ্চলখানি,
লজ্জার আভাস-সম, বক্ষে দিল টানি।
সুবর্ণমুকুর রাখি কোলের উপরে
শুধাইল মন্ত্র পড়ি— কহ সত্য করে
ধরামাঝে সব চেয়ে কে আজি রূপসী।
দর্পণে উঠিল ফুটে সেই মুখশশী।
কাঁপিয়া কহিল রানী, অগ্নিসম জ্বালা—
পরালেম তারে আমি বিষফুলমালা,
তবু মরিল না জলে সতিনের মেয়ে,
ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে!

তার পরদিনে,— আবার রুধিল দ্বার
শয়ন-মন্দিরে। পরিল মুক্তার হার,
ভালে সিন্দূরের টিপ, নয়নে কাজল,
রক্তাম্বর পট্টবাস, সোনার আঁচল।
শুধাইল দর্পণেরে— কহ সত্য করি
ধরাতলে সব চেয়ে কে আজি সুন্দরী।
উজ্জ্বল কনক-পটে ফুটিয়া উঠিল
সেই হাসিমাখা মুখ। হিংসায় লুটিল
রানী শয্যার উপরে। কহিল কাঁদিয়া—
বনে পাঠালেম তারে কঠিন বাঁধিয়া,
এখনো সে মরিল না সতিনের মেয়ে,
ধরাতলে রূপসী সে সবাকার চেয়ে!

তার পরদিনে,— আবার সাজিল সুখে
নব অলংকারে; বিরচিল হাসিমুখে
কবরী নূতন ছাঁদে বাঁকাইয়া গ্রীবা,
পরিল যতন করি নবরৌদ্রবিভা
নব পীতবাস। দর্পণ সম্মুখে ধরে
শুধাইল মন্ত্র পড়ি— সত্য কহ মোরে
ধরামাঝে সব চেয়ে কে আজি রূপসী।
সেই হাসি সেই মুখ উঠিল বিকশি
মোহন মুকুরে। রানী কহিল জ্বলিয়া—
বিষফল খাওয়ালেম তাহারে ছলিয়া,
তবুও সে মরিল না সতিনের মেয়ে,
ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে!

তার পরদিনে রানী কনক-রতনে
খচিত করিল তনু অনেক যতনে।

দর্পণেরে শুধাইল বহু দর্পভরে—
সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ কার বল্ সত্য ক'রে।
দুইটি সুন্দর মুখ দেখা দিল হাসি'
রাজপুত্র রাজকন্যা দোঁহে পাশাপাশি
বিবাহের বেশে। অঙ্গে অঙ্গে শিরা যত
রানীরে দংশিল যেন বৃশ্চিকের মতো।
চীৎকারি কহিল রানী কর হানি বুকে—
মরিতে দেখেছি তারে আপন সম্মুখে,
কার প্রেমে বাঁচিল সে সতিনের মেয়ে,
ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে!

ঘষিতে লাগিল রানী কনক-মুকুর
বালু দিয়ে— প্রতিবিম্ব না হইল দূর।
মসী লেপি দিল তবু ছবি ঢাকিল না।
অগ্নি দিল তবুও তো গলিল না সোনা।
আছাড়ি ফেলিল ভূমে প্রাণপণ বলে,
ভাঙিল না সে মায়া-দর্পণ। ভূমিতলে
চকিতে পড়িল রানী, টুটি গেল প্রাণ—
সর্বাঙ্গে হীরকমণি অগ্নির সমান
লাগিল জ্বলিতে। ভূমে পড়ি তারি পাশে
কনকদর্পণে দুটি হাসিমুখ হাসে।
বিম্ববতী, মহিষীর সতিনের মেয়ে
ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে।

ফাল্গুন, ১২৯৮

শৈশবসন্ধ্যা

ধীরে ধীরে বিস্তারিছে ঘেরি চারিধার
শ্রান্তি, আর শান্তি, আর সন্ধ্যা-অন্ধকার,
মায়ের অঞ্চলসম। দাঁড়ায়ে একাকী
মেলিয়া পশ্চিমপানে অনিমেষ আঁখি
স্তব্ধ চেয়ে আছি। আপনারে মগ্ন করি
অতলের তলে, ধীরে লইতেছি ভরি
জীবনের মাঝে— আজিকার এই ছবি,
জনশূন্য নদীতীর, অস্তমান রবি,
ম্লান মূর্ছাতুর আলো— রোদন-অরুণ,
ক্লান্ত নয়নের যেন দৃষ্টি সকরুণ
স্থির বাক্যহীন,— এই গভীর বিষাদ,
জলে স্থলে চরাচরে শ্রান্তি অবসাদ।

সহসা উঠিল গাহি কোন্‌খান হতে
বন-অন্ধকারঘন কোন্ গ্রামপথে
যেতে যেতে গৃহমুখে বালক-পথিক।
উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর নিশ্চিন্ত নির্ভীক
কাঁপিছে সপ্তম স্বরে, তীব্র উচ্চতান
সন্ধ্যারে কাটিয়া যেন করিবে দুখান।
দেখিতে না পাই তারে। ওই যে সম্মুখে
প্রান্তরের সর্বপ্রান্তে, দক্ষিণের মুখে,
আখের খেতের পারে, কদলী সুপারি
নিবিড় বাঁশের বন, মাঝখানে তারি
বিশ্রাম করিছে গ্রাম, হোথা আঁখি ধায়।
হোথা কোন্ গৃহপানে গেয়ে চলে যায়
কোন্ রাখালের ছেলে, নাহি ভাবে কিছু,
নাহি চায় শূন্যপানে, নাহি আগুপিছু।

দেখে শুনে মনে পড়ে সেই সন্ধ্যাবেলা
শৈশবের। কত গল্প, কত বাল্যখেলা,
এক বিছানায় শুয়ে মোরা সঙ্গী তিন;
সে কি আজিকার কথা, হল কত দিন।
এখনো কি বৃদ্ধ হয়ে যায়নি সংসার।
ভোলে নাই খেলাধুলা, নয়নে তাহার
আসে নাই নিদ্রাবেশ শান্ত সুশীতল,
বাল্যের খেলানাগুলি করিয়া বদল
পায়নি কঠিন জ্ঞান? দাঁড়ায়ে হেথায়
নির্জন মাঠের মাঝে, নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়,
শুনিয়া কাহার গান পড়ি গেল মনে
কত শত নদীতীরে, কত আম্রবনে,
কাংস্যঘণ্টা-মুখরিত মন্দিরের ধারে,
কত শস্যক্ষেত্রপ্রান্তে, পুকুরের পাড়ে
গৃহে গৃহে জাগিতেছে নব হাসিমুখ,
নবীন হৃদয়ভরা নব নব সুখ,
কত অসম্ভব কথা, অপূর্ব কল্পনা,
কত অমূলক আশা, অশেষ কামনা,
অনন্ত বিশ্বাস। দাঁড়াইয়া অন্ধকারে
দেখিনু নক্ষত্রালোকে, অসীম সংসারে
রয়েছে পৃথিবী ভরি বালিকা বালক,
সন্ধ্যাশয্যা, মার মুখ, দীপের আলোক।

ফাল্গুন, ১২৯৮

রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে

রূপকথা

১

প্রভাতে

রাজার ছেলে যেত পাঠশালায়,
রাজার মেয়ে যেত তথা।
দু-জনে দেখা হত পথের মাঝে,
কে জানে কবেকার কথা।
রাজার মেয়ে দূরে সরে যেত,
চুলের ফুল তার পড়ে যেত,
রাজার ছেলে এসে তুলে দিত
ফুলের সাথে বনলতা।
রাজার ছেলে যেত পাঠশালায়,
রাজার মেয়ে যেত তথা।
পথের দুই পাশে ফুটেছে ফুল,
পাখিরা গান গাহে গাছে।
রাজার মেয়ে আগে এগিয়ে চলে,
রাজার ছেলে যায় পাছে।

২

মধ্যাহ্নে

উপরে বসে পড়ে রাজার মেয়ে,
রাজার ছেলে নিচে বসে।
পুঁথি খুলিয়া শেখে কত কী ভাষা,
খড়ি পাতিয়া আঁক কষে।
রাজার মেয়ে পড়া যায় ভুলে,
পুঁথিটি হাত হতে পড়ে খুলে,

রাজার ছেলে এসে দেয় তুলে,
 আবার পড়ে যায় খসে।
উপরে বসে পড়ে রাজার মেয়ে,
 রাজার ছেলে নিচে বসে।
দুপুরে খরতাপ, বকুলশাখে
 কোকিল কুহু কুহরিছে।
রাজার ছেলে চায় উপর পানে,
 রাজার মেয়ে চায় নিচে।

৩

সায়াহ্নে

রাজার ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসে,
 রাজার মেয়ে যায় ঘরে।
খুলিয়া গলা হতে মোতির মালা
 রাজার মেয়ে খেলা করে।
পথে সে মালাখানি গেল ভুলে,
রাজার ছেলে সেটি নিল তুলে,
আপন মণিহার মনোভুলে
 দিল সে বালিকার করে।
রাজার ছেলে ঘরে ফিরিয়া এল,
 রাজার মেয়ে গেল ঘরে।
শ্রান্ত রবি ধীরে অস্ত যায়
 নদীর তীরে একশেষে।
সাঙ্গ হয়ে গেল দোঁহার পাঠ,
 যে যার গেল নিজ দেশে।

৪

নিশীথে

রাজার মেয়ে শোয় সোনার খাটে,
স্বপনে দেখে রূপরাশি।
রুপোর খাটে শুয়ে রাজার ছেলে
দেখিছে কার সুধা-হাসি।
করিছে আনাগোনা সুখ-দুখ,
কখনো দুরু দুরু করে বুক,
অধরে কভু কাঁপে হাসিটুক,
নয়ন কভু যায় ভাসি।
রাজার মেয়ে কার দেখিছে মুখ,
রাজার ছেলে কার হাসি।
বাদর ঝর ঝর, গরজে মেঘ,
পবন করে মাতামাতি।
শিথানে মাথা রাখি বিথান বেশ,
স্বপনে কেটে যায় রাতি।

চৈত্র, ১২৯৮

নিদ্রিতা

রাজার ছেলে ফিরেছি দেশে দেশে
সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার।
যেখানে যত মধুর মুখ আছে
বাকি তো কিছু রাখিনি দেখিবার
কেহ বা ডেকে কয়েছে দুটো কথা,
কেহ বা চেয়ে করেছে আঁখি নত,
কাহারো হাসি ছুরির মতো কাটে
কাহারো হাসি আঁখিজলেরি মতো।

গরবে কেহ গিয়েছে নিজ ঘর,
   কাঁদিয়া কেহ চেয়েছে ফিরে ফিরে।
কেহ বা কারে কহেনি কোনো কথা,
   কেহ বা গান গেয়েছে ধীরে ধীরে।
এমনি করে ফিরেছি দেশে দেশে।
অনেক দূরে তেপান্তর-শেষে
ঘুমের দেশে ঘুমায় রাজবালা,
তাহারি গলে এসেছি দিয়ে মালা।

একদা রাতে নবীন যৌবনে
   স্বপ্ন হতে উঠিনু চমকিয়া,
বাহিরে এসে দাঁড়ানু একবার
   ধরার পানে দেখিনু নিরখিয়া।
শীর্ণ হয়ে এসেছে শুকতারা,
   পূর্বতটে হতেছে নিশি ভোর।
আকাশ-কোণে বিকাশে জাগরণ,
   ধরণীতলে ভাঙেনি ঘুমঘোর।
সমুখে পড়ে দীর্ঘ রাজপথ,
   দু-ধারে তারি দাঁড়ায়ে তরুসার,
নয়ন মেলি সুদূরপানে চেয়ে
   আপন মনে ভাবিনু একবার,—
   আমারি মতো আজি এ নিশিশেষে
   ধরার মাঝে নূতন কোন্ দেশে,
   দুগ্ধফেনশয়ন করি আলা
   স্বপ্ন দেখে ঘুমায়ে রাজবালা।

অশ্ব চড়ি তখনি বাহিরিনু
   কত যে দেশ-বিদেশ হনু পার।

৩—৩

একদা এক ধূসর সন্ধ্যায়
ঘুমের দেশে লভিনু পুরদ্বার ।
সবাই সেথা অচল অচেতন,
কোথাও জেগে নাইকো জনপ্রাণী,
নদীর তীরে জলের কলতানে
ঘুমায়ে আছে বিপুল পুরীখানি ।
ফেলিতে পদ সাহস নাহি মানি,
নিমেষে পাছে সকল দেশ জাগে ।
প্রাসাদ মাঝে পশিনু সাবধানে
শঙ্কা মোর চলিল আগে আগে ।
ঘুমায় রাজা, ঘুমায় রানীমাতা,
কুমার সাথে ঘুমায় রাজভ্রাতা ;
একটি ঘরে রত্নদীপ জ্বালা,
ঘুমায়ে সেথা রয়েছে রাজবালা ।

কমলফুল-বিমল শেজখানি,
নিলীন তাহে কোমল তনুলতা ।
মুখের পানে চাহিনু অনিমেষে
বাজিল বুকে সুখের মতো ব্যথা ।
মেঘের মতো গুচ্ছ কেশরাশি
শিথান ঢাকি পড়েছে ভারে ভারে
একটি বাহু বক্ষ'পরে পড়ি,
একটি বাহু লুটায় এক ধারে ।
আঁচলখানি পড়েছে খসি পাশে,
কাঁচলখানি পড়িবে বুঝি টুটি
পত্রপুটে রয়েছে যেন ঢাকা
অনাঘ্রাত পূজার ফুল দুটি ।
দেখিনু তারে উপমা নাহি জানি,
ঘুমের দেশে স্বপন একখানি,—

পালঙ্কেতে মগন রাজবালা
আপন ভরা-লাবণ্যে নিরালা।

ব্যাকুল বুকে চাপিনু দুই বাহু,
না মানে বাধা হৃদয়কম্পন।
ভূতলে বসি আনত করি শির
মুদিত আঁখি করিনু চুম্বন।
পাতার ফাঁকে আঁখির তারা দুটি,
তাহারি পানে চাহিনু একমনে,
দ্বারের ফাঁকে দেখিতে চাহি যেন
কী আছে কোথা নিভৃত নিকেতনে।
ভূর্জপাতে কাজলমসী দিয়া
লিখিয়া দিনু আপন নামধাম।
লিখিনু, "অয়ি নিদ্রানিমগনা,
আমার প্রাণ তোমারে সঁপিলাম।"
যতন করি কনক-সুতে গাঁথি
রতন-হারে বাঁধিয়া দিনু পাঁতি।
ঘুমের দেশে ঘুমায় রাজবালা,
তাহারি গলে পরায়ে দিনু মালা।

শান্তিনিকেতন
১৪ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯

সুপ্তোত্থিতা

ঘুমের দেশে ভাঙিল ঘুম,
উঠিল কলস্বর।
গাছের শাখে জাগিল পাখি
কুসুমে মধুকর।

অশ্বশালে জাগিল ঘোড়া
হস্তিশালে হাতি।
মল্লশালে মল্ল জাগি
ফুলায় পুন ছাতি।
জাগিল পথে প্রহরিদল,
দুয়ারে জাগে দ্বারী,
আকাশে চেয়ে নিরখে বেলা
জাগিয়া নরনারী।
উঠিল জাগি রাজাধিরাজ,
জাগিল রানীমাতা।
কচালি আঁখি কুমার সাথে
জাগিল রাজভ্রাতা।
নিভৃত ঘরে ধূপের বাস,
রতন-দীপ জ্বালা,
জাগিয়া উঠি শয্যাতলে
শুধাল রাজবালা—
কে পরালে মালা।

খসিয়া-পড়া আঁচলখানি
বক্ষে তুলি দিল।
আপন-পানে নেহারি চেয়ে
শরমে শিহরিল।
ত্রস্ত হয়ে চকিত চোখে
চাহিল চারিদিকে,
বিজন গৃহ, রতন-দীপ
জ্বলিছে অনিমিখে।
গলার মালা খুলিয়া লয়ে
ধরিয়া দুটি করে

সোনার স্থতে যতনে গাঁথা
লিখনখানি পড়ে।
পড়িল নাম, পড়িল ধাম,
পড়িল লিপি তার,
কোলের 'পরে বিছায়ে দিয়ে
পড়িল শতবার।
শয়নশেষে রহিল বসে
ভাবিল রাজবালা—
আপন ঘরে ঘুমায়েছিনু
নিতান্ত নিরালা,—
কে পরালে মালা।

নূতন-জাগা কুঞ্জবনে
কুহরি উঠে পিক,
বসন্তের চুম্বনেতে
বিবশ দশ দিক।
বাতাস ঘরে প্রবেশ করে
ব্যাকুল উচ্ছ্বাসে,
নবীন ফুলমঞ্জরির
গন্ধ লয়ে আসে।
জাগিয়া উঠি বৈতালিক
গাহিছে জয়গান,
প্রাসাদদ্বারে ললিত স্বরে
বাঁশিতে উঠে তান।
শীতলছায়া নদীর পথে
কলসে লয়ে বারি—
কাঁকন বাজে নূপুর বাজে—
চলিছে পুরনারী।
কাননপথে মর্মরিয়া
কাঁপিছে গাছপালা,

আধেক মুদি নয়ন ছুটি
ভাবিছে রাজবালা—
কে পরালে মালা।

বারেক মালা গলায় পরে,
বারেক লহে খুলি,
দুইটি করে চাপিয়া ধরে
বুকের কাছে তুলি।
শয়ন 'পরে মেলায়ে দিয়ে
তৃষিত চেয়ে রয়,
এমনি করে পাইবে যেন
অধিক পরিচয়।
জগতে আজ কত না ধ্বনি
উঠিছে কত ছলে,
একটি আছে গোপন কথা,
সে কেহ নাহি বলে।
বাতাস শুধু কানের কাছে
বহিয়া যায় হুহু,
কোকিল শুধু অবিশ্রাম
ডাকিছে কুহু কুহু।
নিভৃত ঘরে পরান-মন
একান্ত উতালা,
শয়নশেষে নীরবে বসে
ভাবিছে রাজবালা—
কে পরালে মালা।

কেমন বীর-মুরতি তার
মাধুরী দিয়ে মিশা।
দীপ্তিভরা নয়নমাঝে
তৃপ্তিহীন তৃষা।

স্বপ্নে তারে দেখেছে যেন
এমনি মনে লয়,—
ভুলিয়া গেছে, রয়েছে শুধু
অসীম বিস্ময়।
পারশে যেন বসিয়াছিল,
ধরিয়াছিল কর,
এখনো তার পরশে যেন
সরস কলেবর।
চমকি মুখ দু-হাতে ঢাকে,
শরমে টুটে মন,
লজ্জাহীন প্রদীপ কেন
নিবেনি সেই ক্ষণ।
কণ্ঠ হতে ফেলিল হার
যেন বিজুলিজ্বালা,
শয়ন 'পরে লুটায়ে পড়ে
ভাবিলরাজবালা—
কে পরালে মালা।

এমনি ধীরে একটি করে
কাটিছে দিনরাতি।
বসন্ত সে বিদায় নিল
লইয়া যূথী-জাতি।
সঘন মেঘে বরষা আসে,
বরষে ঝরঝর।
কাননে ফুটে নবমালতী
কদম্বকেশর।
স্বচ্ছ হাসি শরৎ আসে
পূর্ণিমা-মালিকা।
সকল বন আকুল করে
শুভ্র শেফালিকা।

আসিল শীত সঙ্গে লয়ে
দীর্ঘ দুখনিশা।
শিশির-ঝরা কুন্দফুলে
হাসিয়া কাঁদে দিশা।
ফাগুন মাস আবার এল
বহিয়া ফুলডালা।
জানালা-পাশে একেলা বসে
ভাবিছে রাজবালা—
কে পরালে মালা।

শান্তিনিকেতন
১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯

তোমরা ও আমরা

তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাও
কুলুকুলুকল নদীর স্রোতের মতো।
আমরা তীরেতে দাঁড়ায়ে চাহিয়া থাকি,
মরমে গুমরি মরিছে কামনা কত।
আপনা-আপনি কানাকানি কর সুখে,
কৌতুকছটা উছলিছে চোখে মুখে,
কমল-চরণ পড়িছে ধরণীমাঝে,
কনক-নূপুর রিনিকি ঝিনিকি বাজে॥

অঙ্গে অঙ্গ বাঁধিছ রঙ্গপাশে,
বাহুতে বাহুতে জড়িত ললিত লতা,
ইঙ্গিত-রসে ধ্বনিয়া উঠিছে হাসি,
নয়নে নয়নে বহিছে গোপন কথা।

আঁখি নত করি একেলা গাঁথিছ ফুল,
মুকুর লইয়া যতনে বাঁধিছ চুল।
গোপন হৃদয়ে আপনি করিছ খেলা,
কী কথা ভাবিছ, কেমনে কাটিছে বেলা।

চকিতে পলকে অলক উড়িয়া পড়ে,
ঈষৎ হেলিয়া আঁচল মেলিয়া যাও—
নিমেষ ফেলিতে আঁখি না মেলিতে, ত্বরা
নয়নের আড়ে না জানি কাহারে চাও।
যৌবনরাশি টুটিতে লুটিতে চায়,
বসনে শাসনে বাঁধিয়া রেখেছ তায়।
তবু শতবার শতধা হইয়া ফুটে,
চলিতে ফিরিতে ঝলকি চলকি উঠে।

আমরা মূর্খ কহিতে জানিনে কথা,
কী কথা বলিতে কী কথা বলিয়া ফেলি।
অসময়ে গিয়ে লয়ে আপনার মন,
পদতলে দিয়ে চেয়ে থাকি আঁখি মেলি।
তোমরা দেখিয়া চুপি চুপি কথা কও,
সখীতে সখীতে হাসিয়া অধীর হও,
বসন-আঁচল বুকেতে টানিয়া লয়ে—
হেসে চলে যাও আশার অতীত হয়ে।

আমরা বৃহৎ অবোধ ঝড়ের মতো,
আপন আবেগে ছুটিয়া চলিয়া আসি।
বিপুল আঁধারে অসীম আকাশ ছেয়ে
টুটিবারে চাহি আপন হৃদয়রাশি।

তোমরা বিজুলি হাসিতে হাসিতে চাও,
আঁধার ছেদিয়া মরম বিঁধিয়া দাও,
গগনের গায়ে আগুনের রেখা আঁকি
চকিত চরণে চলে যাও দিয়ে ফাঁকি ।

অযতনে বিধি গড়েছে মোদের দেহ,
নয়ন অধর দেয়নি ভাষায় ভরে,
মোহন মধুর মন্ত্র জানিনে মোরা,
আপনা প্রকাশ করিব কেমন করে ?
তোমরা কোথায় আমরা কোথায় আছি,
কোনো সুলগনে হব না কি কাছাকাছি ।
তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাবে,
আমরা দাঁড়ায়ে রহিব এমনি ভাবে !

১৬ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯

সোনার বাঁধন

বন্দী হয়ে আছ তুমি সুমধুর স্নেহে
অয়ি গৃহলক্ষ্মী, এই করুণক্রন্দন
এই দুঃখদৈন্যে-ভরা মানবের গেহে ।
তাই দুটি বাহু'পরে সুন্দর-বন্ধন
সোনার কঙ্কণ দুটি বহিতেছ দেহে
শুভচিহ্ন, নিখিলের নয়ন-নন্দন ।
পুরুষের দুই বাহু কিণাঙ্ক-কঠিন
সংসার-সংগ্রামে সদা বন্ধনবিহীন ;
যুদ্ধ-দ্বন্দ্ব যত কিছু নিদারুণ কাজে
বহ্নিবাণ বজ্রসম সর্বত্র স্বাধীন ।

তুমি বদ্ধ স্নেহ-প্রেম-করুণার মাঝে,—
শুধু শুভকর্ম, শুধু সেবা নিশিদিন।
তোমার বাহুতে তাই কে দিয়াছে টানি,
দুইটি সোনার গণ্ডি, কাঁকন দুখানি।

শান্তিনিকেতন
১৭ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯

বর্ষা-যাপন

রাজধানী কলিকাতা ; তেতলার ছাতে
কাঠের কুঠরি এক ধারে ;
আলো আসে পূর্বদিকে প্রথম প্রভাতে
বায়ু আসে দক্ষিণের দ্বারে।

মেঝেতে বিছানা পাতা, দুয়ারে রাখিয়া মাথা,
বাহিরে আঁখিরে দিই ছুটি,
সৌধ-ছাদ শত শত ঢাকিয়া রহস্য কত,
আকাশেরে করিছে ভ্রূকুটি।
নিকটে জানালা-গায় এক কোণে আলিসায়
একটুকু সবুজের খেলা,
শিশু অশথের গাছ আপন ছায়ার নাচ
সারাদিন দেখিছে একেলা।
দিগন্তের চারিপাশে আষাঢ় নামিয়া আসে,
বর্ষা আসে হইয়া ঘোরালো,
সমস্ত আকাশজোড়া গরজে ইন্দ্রের ঘোড়া
চিকমিকে বিদ্যুতের আলো।
চারিদিকে অবিরল ঝরঝর বৃষ্টিজল
এই ছোটো প্রান্ত-ঘরটিরে

দেয় নির্বাসিত করি,   দশ দিক অপহরি,
সমুদয় বিশ্বের বাহিরে।
বসে বসে সঙ্গীহীন   ভালো লাগে কিছুদিন
পড়িবারে মেঘদূত-কথা ;—
বাহিরে দিবস-রাতি   বায়ু করে মাতামাতি
বহিয়া বিফল ব্যাকুলতা ;—
বহুপূর্ব আষাঢ়ের   মেঘাচ্ছন্ন ভারতের
নগ-নদী-নগরী বাহিয়া
কত শ্রুতিমধু নাম   কত দেশ কত গ্রাম
দেখে যাই চাহিয়া চাহিয়া।
ভালো করে দোঁহে চিনি,   বিরহী ও বিরহিণী
জগতের দু-পারে দু-জন,
প্রাণে প্রাণে পড়ে টান,   মাঝে মহা ব্যবধান,
মনে মনে কল্পনা সৃজন।
যক্ষবধূ গৃহকোণে   ফুল নিয়ে দিন গনে
দেখে শুনে ফিরে আসি চলি।
বর্ষা আসে ঘন রোলে,   যত্নে টেনে লই কোলে
গোবিন্দদাসের পদাবলী।
সুর করে বার বার   পড়ি বর্ষা-অভিসার—
অন্ধকার যমুনার তীর,
নিশীথে নবীনা রাধা   নাহি মানে কোনো বাধা,
খুঁজিতেছে নিকুঞ্জ-কুটির।
অনুক্ষণ দর দর   বারি ঝরে ঝর ঝর,
তাহে অতি দূরতর বন,—
ঘরে ঘরে রুদ্ধ দ্বার,   সঙ্গে কেহ নাহি আর
শুধু এক কিশোর মদন।

আষাঢ় হতেছে শেষ,   মিশায়ে মল্লার দেশ
রচি "ভরা বাদরের" সুর।
খুলিয়া প্রথম পাতা,   গীতগোবিন্দের গাথা
গাহি "মেঘে অম্বর মেদুর।"

স্তব্ধ রাত্রি দ্বিপ্রহরে   ঝুপ ঝুপ বৃষ্টি পড়ে—
শুয়ে শুয়ে সুখ-অনিদ্রায়
“রজনী শাঙন ঘন   ঘন দেয়া গরজন”
সেই গান মনে পড়ে যায়।
“পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে   বিগলিত চীর অঙ্গে”
মন-সুখে নিদ্রায় মগন,—
সেই ছবি জাগে মনে   পুরাতন বৃন্দাবনে
রাধিকার নির্জন স্বপন।
মৃদু মৃদু বহে শ্বাস,   অধরে লাগিছে হাস
কেঁপে উঠে মুদিত পলক,—
বাহুতে মাথাটি থুয়ে,   একাকিনী আছে শুয়ে,
গৃহকোণে ম্লান দীপালোক।
গিরিশিরে মেঘ ডাকে,   বৃষ্টি ঝরে তরুশাখে
দাদুরী ডাকিছে সারারাতি,—
হেনকালে কী না ঘটে,   এ সময়ে আসে বটে
একা ঘরে স্বপনের সাথি।
মরি মরি স্বপ্নশেষে   পুলকিত রসাবেশে
যখন সে জাগিল একাকী,
দেখিল বিজন ঘরে   দীপ নিবু-নিবু করে
প্রহরী প্রহর গেল হাঁকি।—
বাড়িছে বৃষ্টির বেগ,   থেকে থেকে ডাকে মেঘ,
ঝিল্লিরব পৃথিবী ব্যাপিয়া,
সেই ঘনঘোরা নিশি   স্বপ্নে জাগরণে মিশি
না জানি কেমন করে হিয়া।

লয়ে পুঁথি দু-চারিটি   নেড়ে চেড়ে ইটি সিটি
এইমতো কাটে দিনরাত।
তার পরে টানি লই   বিদেশী কাব্যের বই
উলটি পালটি দেখি পাত ;—

কোথা রে বর্ষার ছায়া, অন্ধকার মেঘমায়া,
ঝরঝর ধ্বনি অহরহ,
কোথায় সে কর্মহীন একান্তে আপনে-লীন
জীবনের নিগূঢ় বিরহ।
বর্ষার সমান সুরে অন্তর বাহির পুরে
সংগীতের মুষলধারায়,
পরানের বহুদূর কূলে কূলে ভরপুর,—
বিদেশী কাব্যে সে কোথা হায়।
তখন সে পুঁথি ফেলি, দুয়ারে আসন মেলি
বসি গিয়ে আপনার মনে,
কিছু করিবার নাই চেয়ে চেয়ে ভাবি তাই
দীর্ঘ দিন কাটিবে কেমনে।
মাথাটি করিয়া নিচু বসে বসে রচি কিছু
বহু যত্নে সারাদিন ধরে,—
ইচ্ছা করে অবিরত আপনার মনোমত
গল্প লিখি একেকটি করে।
ছোটো প্রাণ, ছোটো ব্যথা, ছোটো ছোটো দুঃখকথা
নিতান্তই সহজ সরল,
সহস্র বিস্মৃতিরাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু-চারিটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা, ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ।
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি' মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।
জগতের শত শত অসমাপ্ত কথা যত,
অকালের বিচ্ছিন্ন মুকুল,
অজ্ঞাত জীবনগুলা, অখ্যাত কীর্তির ধুলা,
কত ভাব, কত ভয় ভুল
সংসারের দশদিশি ঝরিতেছে অহর্নিশি
ঝরঝর বরষার মতো—

ক্ষণ-অশ্রু ক্ষণ-হাসি পড়িতেছে রাশি রাশি,
শব্দ তার শুনি অবিরত।
সেই সব হেলাফেলা, নিমেষের লীলাখেলা
চারিদিকে করি স্তূপাকার,
তাই দিয়ে করি সৃষ্টি একটি বিস্মৃতিবৃষ্টি
জীবনের শ্রাবণনিশার।

শেষ ১৭ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯
শান্তিনিকেতন
আরম্ভ বহুদিনের

✓ হিং টিং ছট্

স্বপ্নমঙ্গল

স্বপ্ন দেখেছেন রাত্রে হবুচন্দ্র ভূপ,—
অর্থ তার ভাবি ভাবি গবুচন্দ্র চুপ।
শিয়রে বসিয়া যেন তিনটে বাঁদরে
উকুন বাছিতেছিল পরম আদরে।
একটু নড়িতে গেলে গালে মারে চড়,
চোখে মুখে লাগে তার নখের আঁচড়।
সহসা মিলাল তারা, এল এক বেদে,
"পাখি উড়ে গেছে" ব'লে মরে কেঁদে কেঁদে;
সম্মুখে রাজারে দেখি তুলে নিল ঘাড়ে,
ঝুলায়ে বসায়ে দিল উচ্চ এক দাঁড়ে।
নিচেতে দাঁড়ায়ে এক বুড়ি থুড়থুড়ি
হাসিয়া পায়ের তলে দেয় সুড়সুড়ি।
রাজা বলে, "কী আপদ।" কেহ নাহি ছাড়ে,
পা দুটা তুলিতে চাহে, তুলিতে না পারে।
পাখির মতন রাজা করে ছটফট,—
বেদে কানে কানে বলে—"হিং টিং ছট্।"
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান।

হবুপুর রাজ্যে আজ দিন ছয়-সাত
চোখে কারো নিদ্রা নাই, পেটে নাই ভাত।
শীর্ণ গালে হাত দিয়ে নত করি শির
রাজ্যসুদ্ধ বালবৃদ্ধ ভেবেই অস্থির।
ছেলেরা ভুলেছে খেলা, পণ্ডিতেরা পাঠ,
মেয়েরা করেছে চুপ—এতই বিভ্রাট।
সারি সারি বসে গেছে কথা নাহি মুখে,
চিন্তা যত ভারি হয় মাথা পড়ে ঝুঁকে।
ভুঁইফোঁড়া তত্ত্ব যেন ভূমিতলে খোঁজে,
সবে যেন বসে গেছে নিরাকার ভোজে।
মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া উৎকট
হঠাৎ ফুকারি উঠে—“হিং টিং ছট্।”
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান।

চারিদিক হতে এল পণ্ডিতের দল,—
অযোধ্যা কনোজ কাঞ্চী মগধ কোশল।
উজ্জয়িনী হতে এল বুধ-অবতংস—
কালিদাস কবীন্দ্রের ভাগিনেয়বংশ।
মোটা মোটা পুঁথি লয়ে উলটায় পাতা,
ঘন ঘন নাড়ে বসি টিকিসুদ্ধ মাথা।
বড়ো বড়ো মস্তকের পাকা শস্যখেত
বাতাসে দুলিছে যেন শীর্ষ-সমেত।
কেহ শ্রুতি, কেহ স্মৃতি, কেহবা পুরাণ,
কেহ ব্যাকরণ দেখে, কেহ অভিধান।
কোনোখানে নাহি পায় অর্থ কোনোরূপ,
বেড়ে উঠে অনুস্বর-বিসর্গের স্তূপ।
চুপ করে বসে থাকে বিষম সংকট,
থেকে থেকে হেঁকে ওঠে—“হিং টিং ছট্।”

স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান।

কহিলেন হতাশ্বাস হবুচন্দ্ররাজ,
“ম্লেচ্ছদেশে আছে নাকি পণ্ডিত-সমাজ,
তাহাদের ডেকে আনো যে যেখানে আছে—
অর্থ যদি ধরা পড়ে তাহাদের কাছে।”
কটাচুল নীলচক্ষু কপিশ-কপোল,
যবন পণ্ডিত আসে, বাজে ঢাকঢোল।
গায়ে কালো মোটা মোটা ছাঁটাছোঁটা কুর্তি,
গ্রীষ্মতাপে উষ্মা বাড়ে, ভারি উগ্রমূর্তি।
ভূমিকা না করি কিছু ঘড়ি খুলি কয়—
“সতেরো মিনিট মাত্র রয়েছে সময়,
কথা যদি থাকে কিছু বলো চটপট।”
সভাসুদ্ধ বলি উঠে— “হিং টিং ছট্।”
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান।

স্বপ্ন শুনি ম্লেচ্ছমুখ রাঙা টকটকে,
আগুন ছুটিতে চায় মুখে আর চোখে।
হানিয়া দক্ষিণ মুষ্টি বাম করতলে
“ডেকে এনে পরিহাস” রেগেমেগে বলে।
ফরাসি পণ্ডিত ছিল, হাস্যোজ্জ্বলমুখে
কহিল নোয়ায়ে মাথা, হস্ত রাখি বুকে,
“স্বপ্ন যাহা শুনিলাম রাজযোগ্য বটে ;
হেন স্বপ্ন সকলের অদৃষ্টে না ঘটে।
কিন্তু তবু স্বপ্ন ওটা করি অনুমান
যদিও রাজার শিরে পেয়েছিল স্থান।

অর্থ চাই, রাজকোষে আছে ভূরি ভূরি,
রাজস্বপ্নে অর্থ নাই, যত মাথা খুঁড়ি।
নাই অর্থ কিন্তু তবু কহি অকপট,
শুনিতে কী মিষ্ট আহা, হিং টিং ছট্।"
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান।

শুনিয়া সভাস্থ সবে করে ধিক ধিক—
কোথাকার গণ্ডমূর্খ পাষণ্ড নাস্তিক।
স্বপ্ন শুধু স্বপ্নমাত্র মস্তিষ্ক-বিকার,
এ-কথা কেমন করে করিব স্বীকার।
জগৎ-বিখ্যাত মোরা "ধর্মপ্রাণ" জাতি
স্বপ্ন উড়াইয়া দিবে!— দুপুরে ডাকাতি!
হবুচন্দ্র রাজা কহে পাকালিয়া চোখ—
"গবুচন্দ্র, এদের উচিত শিক্ষা হোক।
হেঁটোয় কণ্টক দাও, উপরে কণ্টক,
ডালকুত্তাদের মাঝে করহ বণ্টক।"
সতেরো মিনিট কাল না হইতে শেষ,
ম্লেচ্ছ পণ্ডিতের আর না মিলে উদ্দেশ।
সভাস্থ সবাই ভাসে আনন্দাশ্রুনীরে,
ধর্মরাজ্যে পুনর্বার শান্তি এল ফিরে।
পণ্ডিতেরা মুখ চক্ষু করিয়া বিকট
পুনর্বার উচ্চারিল— "হিং টিং ছট্।"
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান।

অতঃপর গৌড় হতে এল হেন বেলা
যবন পণ্ডিতদের গুরুমারা চেলা।

নগ্নশির, সজ্জা নাই, লজ্জা নাই ধড়ে—
কাছা-কোঁচা শতবার খসে খসে পড়ে।
অস্তিত্ব আছে না আছে, ক্ষীণ খর্বদেহ,
বাক্য যবে বাহিরায় না থাকে সন্দেহ।
এতটুকু যন্ত্র হতে এত শব্দ হয়
দেখিয়া বিশ্বের লাগে বিষম বিস্ময়।
না জানে অভিবাদন, না পুছে কুশল,
পিতৃনাম শুধাইলে উদ্যত মুষল।
সগর্বে জিজ্ঞাসা করে, “কী লয়ে বিচার,
শুনিলে বলিতে পারি কথা দুই-চার,
ব্যাখ্যায় করিতে পারি উলট-পালট।”
সমস্বরে কহে সবে— “হিং টিং ছট্।”
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান।

স্বপ্নকথা শুনি মুখ গম্ভীর করিয়া
কহিল গৌড়ীয় সাধু প্রহর ধরিয়া,
“নিতান্ত সরল অর্থ, অতি পরিষ্কার,
বহু পুরাতন ভাব, নব আবিষ্কার।
ত্র্যম্বকের ত্রিনয়ন ত্রিকাল ত্রিগুণ
শক্তিভেদে ব্যক্তিভেদ দ্বিগুণ বিগুণ।
বিবর্তন আবর্তন সম্বর্তন আদি
জীবশক্তি শিবশক্তি করে বিসম্বাদী।
আকর্ষণ বিকর্ষণ পুরুষ প্রকৃতি
আণব চৌম্বকবলে আকৃতি বিকৃতি।
কুশাগ্রে প্রবহমান জীবাত্মবিদ্যুৎ
ধারণা পরমা শক্তি সেথায় উদ্ভূত।
ত্রয়ী শক্তি ত্রিস্বরূপে প্রপঞ্চে প্রকট—
সংক্ষেপে বলিতে গেলে, হিং টিং ছট্।”

স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান।

‘সাধু সাধু সাধু’ রবে কাঁপে চারিধার,
সবে বলে— পরিষ্কার, অতি পরিষ্কার।
দুর্বোধ যা-কিছু ছিল হয়ে গেল জল,
শূন্য আকাশের মতো অত্যন্ত নির্মল।
হাঁপ ছাড়ি উঠিলেন হবুচন্দ্ররাজ,
আপনার মাথা হতে খুলি লয়ে তাজ
পরাইয়া দিল ক্ষীণ বাঙালির শিরে,—
ভারে তার মাথাটুকু পড়ে বুঝি ছিঁড়ে।
বহুদিন পরে আজ চিন্তা গেল ছুটে,
হাবুডুবু হবু-রাজ্য নড়িচড়ি উঠে।
ছেলেরা ধরিল খেলা, বৃদ্ধেরা তামুক,
এক দণ্ডে খুলে গেল রমণীর মুখ।
দেশজোড়া মাথাধরা ছেড়ে গেল চট্,
সবাই বুঝিয়া গেল— হিং টিং ছট্।
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান।

যে শুনিবে এই স্বপ্নমঙ্গলের কথা,
সর্বভ্রম ঘুচে যাবে নহিবে অন্যথা।
বিশ্বে কভু বিশ্ব ভেবে হবে না ঠকিতে,
সত্যেরে সে মিথ্যা বলি’ বুঝিবে চকিতে।
যা আছে তা নাই, আর, নাই যাহা আছে,
এ-কথা জাজ্বল্যমান হবে তার কাছে।
সবাই সরলভাবে দেখিবে যা-কিছু,
সে আপন লেজুড় জুড়িবে তার পিছু।

এস ভাই, তোলো হাই, শুয়ে পড়ো চিত,
অনিশ্চিত এ সংসারে এ-কথা নিশ্চিত—
জগতে সকলি মিথ্যা সব মায়াময়,
স্বপ্ন শুধু সত্য আর সত্য কিছু নয়।
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান।
গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান।

শান্তিনিকেতন
১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯

পরশ-পাথর

খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ-পাথর।
মাথায় বৃহৎ জটা ধুলায় কাদায় কটা,
মলিন ছায়ার মতো ক্ষীণ কলেবর।
ওষ্ঠে অধরেতে চাপি অন্তরের দ্বার ঝাঁপি
রাত্রিদিন তীব্র জ্বালা জ্বেলে রাখে চোখে।
দুটো নেত্র সদা যেন নিশার খদ্যোত-হেন
উড়ে উড়ে খোঁজে কারে নিজের আলোকে।
নাহি যার চালচুলা গায়ে মাখে ছাইধুলা
কটিতে জড়ানো শুধু ধূসর কৌপীন,
ডেকে কথা কয় তারে কেহ নাই এ সংসারে,
পথের ভিখারি হতে আরো দীনহীন,
তার এত অভিমান, সোনারুপা তুচ্ছজ্ঞান,
রাজসম্পদের লাগি নহে সে কাতর,
দশা দেখে হাসি পায় আর কিছু নাহি চায়
একেবারে পেতে চায় পরশ-পাথর।

সম্মুখে গরজে সিন্ধু অগাধ অপার।
তরঙ্গে তরঙ্গ উঠি হেসে হল কুটিকুটি

সৃষ্টিছাড়া পাগলের দেখিয়া ব্যাপার।
আকাশ রয়েছে চাহি, নয়নে নিমেষ নাহি,
হুহু ক'রে সমীরণ ছুটেছে অবাধ।
সূর্য ওঠে প্রাতঃকালে পূর্ব-গগনের ভালে,
সন্ধ্যাবেলা ধীরে ধীরে উঠে আসে চাঁদ।
জলরাশি অবিরল করিতেছে কলকল,
অতল রহস্য যেন চাহে বলিবারে।
কাম্য ধন আছে কোথা জানে যেন সব কথা,
সে-ভাষা যে বোঝে সেই খুঁজে নিতে পারে।
কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নাহি, মহাগাথা গান গাহি
সমুদ্র আপনি শুনে আপনার স্বর।
কেহ যায়, কেহ আসে, কেহ কাঁদে, কেহ হাসে,
খ্যাপা তীরে খুঁজে ফিরে পরশ-পাথর।

এক দিন, বহুপূর্বে, আছে ইতিহাস—
নিকষে সোনার রেখা সবে যেন দিল দেখা—
আকাশে প্রথম সৃষ্টি পাইল প্রকাশ।
মিলি যত সুরাসুর কৌতূহলে ভরপুর
এসেছিল পা টিপিয়া এই সিন্ধুতীরে।
অতলের পানে চাহি নয়নে নিমেষ নাহি
নীরবে দাঁড়ায়ে ছিল স্থির নতশিরে।
বহুকাল স্তব্ধ থাকি শুনেছিল মুদে আঁখি
এই মহাসমুদ্রের গীতি চিরন্তন;
তার পরে কৌতূহলে ঝাঁপায়ে অগাধ জলে
করেছিল এ অনন্ত রহস্য মন্থন।
বহুকাল দুঃখ সেবি নিরখিল, লক্ষ্মীদেবী
উদিলা জগৎমাঝে অতুল সুন্দর।
সেই সমুদ্রের তীরে শীর্ণদেহে জীর্ণচীরে
খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ-পাথর।

এতদিনে বুঝি তার ঘুচে গেছে আশ ।
খুঁজে খুঁজে ফিরে তবু   বিশ্রাম না জানে কভু,
আশা গেছে, যায় নাই খোঁজার অভ্যাস ।
বিরহী বিহঙ্গ ডাকে   সারাদিন তরুশাখে,
যারে ডাকে তার দেখা পায় না অভাগা ।
তবু ডাকে সারাদিন   আশাহীন শ্রান্তিহীন,
একমাত্র কাজ তার ডেকে ডেকে জাগা ।
আর-সব কাজ ভুলি   আকাশে তরঙ্গ তুলি
সমুদ্র না জানি কারে চাহে অবিরত ।
যত করে হায় হায়   কোনোকালে নাহি পায়,
তবু শূন্যে তোলে বাহু, ওই তার ব্রত ।
কারে চাহি ব্যোমতলে   গ্রহতারা লয়ে চলে,
অনন্ত সাধনা করে বিশ্বচরাচর ।
সেইমতো সিন্ধুতটে   ধূলিমাখা দীর্ঘজটে
খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ-পাথর ।

একদা শুধাল তারে গ্রামবাসী ছেলে,
"সন্ন্যাসীঠাকুর, এ কী,   কাঁকালে ও কী ও দেখি,
সোনার শিকল তুমি কোথা হতে পেলে ।"
সন্ন্যাসী চমকি ওঠে,   শিকল সোনার বটে,
লোহা সে হয়েছে সোনা জানে না কখন ।
একি কাণ্ড চমৎকার,   তুলে দেখে বার বার
আঁখি কচালিয়া দেখে, এ নহে স্বপন ।
কপালে হানিয়া কর   বসে পড়ে ভূমি'পর,
নিজেরে করিতে চাহে নির্দয় লাঞ্ছনা,—
পাগলের মতো চায়—   কোথা গেল, হায় হায়,
ধরা দিয়ে পলাইল সফল বাঞ্ছনা ।
কেবল অভ্যাসমত   নুড়ি কুড়াইত কত,
ঠন করে ঠেকাইত শিকলের 'পর,

চেয়ে দেখিত না, নুড়ি দূরে ফেলে দিত ছুঁড়ি'
কখন ফেলেছে ছুঁড়ে পরশ-পাথর।

তখন যেতেছে অস্তে মলিন তপন।
আকাশ সোনার বর্ণ, সমুদ্র গলিত স্বর্ণ,
পশ্চিম-দিগ্বধূ দেখে সোনার স্বপন।
সন্ন্যাসী আবার ধীরে পূর্বপথে যায় ফিরে
খুঁজিতে নূতন ক'রে হারানো রতন।
সে-শকতি নাহি আর নুয়ে পড়ে দেহভার
অন্তর লুটায় ছিন্ন তরুর মতন।
পুরাতন দীর্ঘপথ পড়ে আছে মৃতবৎ
হেথা হতে কত দূর নাহি তার শেষ।
দিক হতে দিগন্তরে মরুবালি ধুধু করে,
আসন্ন রজনী-ছায়ে ম্লান সর্বদেশ।
অর্ধেক জীবন খুঁজি কোন্ ক্ষণে চক্ষু বুজি
স্পর্শ লভেছিল যার এক পলভর,
বাকি অর্ধ ভগ্ন প্রাণ আবার করিছে দান
ফিরিয়া খুঁজিতে সেই পরশ-পাথর।

শান্তিনিকেতন
১৯ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯

বৈষ্ণব-কবিতা

শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান?
পূর্বরাগ অনুরাগ, মান-অভিমান,
অভিসার, প্রেমলীলা, বিরহ-মিলন,
বৃন্দাবন-গাথা,— এই প্রণয়-স্বপন
শ্রাবণের শর্বরীতে কালিন্দীর কূলে,
চারি চক্ষে চেয়ে দেখা কদম্বের মূলে

শরমে সম্ভ্রমে— এ কি শুধু দেবতার।
এ সংগীত-রসধারা নহে মিটাবার
দীন মর্ত্যবাসী এই নরনারীদের
প্রতিরজনীর আর প্রতিদিবসের
তপ্ত প্রেমতৃষা ?
এ গীত-উৎসব মাঝে
শুধু তিনি আর ভক্ত নির্জনে বিরাজে ;
দাঁড়ায়ে বাহির-দ্বারে মোরা নরনারী
উৎসুক শ্রবণ পাতি শুনি যদি তারি
দুয়েকটি তান,—দূর হতে তাই শুনে
তরুণ বসন্তে যদি নবীন ফাল্গুনে
অন্তর পুলকি উঠে ; শুনি সেই সুর
সহসা দেখিতে পাই দ্বিগুণ মধুর
আমাদের ধরা ;—মধুময় হয়ে উঠে
আমাদের বনচ্ছায়ে যে-নদীটি ছুটে,
মোদের কুটির-প্রান্তে যে-কদম্ব ফুটে
বরষার দিনে ;—সেই প্রেমাতুর তানে
যদি ফিরে চেয়ে দেখি, মোর পার্শ্বপানে
ধরি' মোর বাম বাহু রয়েছে দাঁড়ায়ে
ধরার সঙ্গিনী মোর হৃদয় বাড়ায়ে
মোর দিকে, বহি নিজ মৌন ভালোবাসা ;
ওই গানে যদি বা সে পায় নিজ ভাষা,—
যদি তার মুখে ফুটে পূর্ণ প্রেমজ্যোতি,
তোমার কি তাঁর, বন্ধু, তাহে কার ক্ষতি।

সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
বিরহ-তাপিত। হেরি কাহার নয়ান,

রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে।
বিজন বসন্তরাতে মিলন-শয়নে
কে তোমারে বেঁধেছিল দুটি বাহুডোরে,
আপনার হৃদয়ের অগাধ সাগরে
রেখেছিল মগ্ন করি। এত প্রেমকথা,
রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি করি লইয়াছ কার মুখ, কার
আঁখি হতে। আজ তার নাহি অধিকার
সে সংগীতে? তারি নারী-হৃদয়-সঞ্চিত
তার ভাষা হতে তারে করিবে বঞ্চিত
চিরদিন?
আমাদেরি কুটির-কাননে
ফুটে পুষ্প, কেহ দেয় দেবতা-চরণে,
কেহ রাখে প্রিয়জন তরে— তাহে তাঁর
নাহি অসন্তোষ। এই প্রেমগীতি-হার
গাঁথা হয় নরনারী-মিলনমেলায়,
কেহ দেয় তাঁরে, কেহ বঁধুর গলায়।
দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে; আর পাব কোথা।
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।

বৈষ্ণব কবির গাঁথা প্রেম-উপহার
চলিয়াছে নিশিদিন কত ভারে ভার
বৈকুণ্ঠের পথে। মধ্যপথে নরনারী
অক্ষয় সে সুধারাশি করি কাড়াকাড়ি
লইতেছে আপনার প্রিয়গৃহতরে
যথাসাধ্য যে যাহার; যুগে যুগান্তরে
চিরদিন পৃথিবীতে যুবকযুবতী
নরনারী এমনি চঞ্চল-মতিগতি।

দুই পক্ষে মিলে একেবারে আত্মহারা
অবোধ অজ্ঞান। সৌন্দর্যের দস্যু তারা
লুটেপুটে নিতে চায় সব। এত গীতি,
এত ছন্দ, এতভাবে উচ্ছ্বসিত প্রীতি,
এত মধুরতা দ্বারের সম্মুখ দিয়া
বহে যায়— তাই তারা পড়েছে আসিয়া
সবে মিলি কলরবে সেই সুধাস্রোতে।
সমুদ্রবাহিনী সেই প্রেমধারা হতে
কলস ভরিয়া তারা লয়ে যায় তীরে
বিচার না করি কিছু, আপন কুটিরে
আপনার তরে। তুমি মিছে ধর দোষ,
হে সাধু পণ্ডিত, মিছে করিতেছ রোষ।
যাঁর ধন তিনি ওই অপার সন্তোষে
অসীম স্নেহের হাসি হাসিছেন বসে।

শাহাজাদপুর
১৮ আষাঢ়, ১২৯৯

✓ দুই পাখি

খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে
বনের পাখি ছিল বনে।
একদা কী করিয়া মিলন হল দোঁহে,
কী ছিল বিধাতার মনে।
বনের পাখি বলে— খাঁচার পাখি ভাই,
বনেতে যাই দোঁহে মিলে।
খাঁচার পাখি বলে— বনের পাখি, আয়
খাঁচায় থাকি নিরিবিলে।
বনের পাখি বলে— না,
আমি শিকলে ধরা নাহি দিব।

খাঁচার পাখি বলে—হায়,
আমি কেমনে বনে বাহিরিব।

বনের পাখি গাহে বাহিরে বসি বসি
বনের গান ছিল যত।
খাঁচার পাখি পড়ে শিখানো বুলি তার,
দোঁহার ভাষা দুই মতো।
বনের পাখি বলে— খাঁচার পাখি ভাই,
বনের গান গাও দিখি।
খাঁচার পাখি বলে— বনের পাখি ভাই,
খাঁচার গান লহ শিখি।
বনের পাখি বলে— না,
আমি শিখানো গান নাহি চাই,
খাঁচার পাখি বলে— হায়,
আমি কেমনে বন-গান গাই।

বনের পাখি বলে— আকাশ ঘননীল,
কোথাও বাধা নাহি তার।
খাঁচার পাখি বলে— খাঁচাটি পরিপাটি
কেমনঢাকা চারিধার।
বনের পাখি বলে— আপনা ছাড়ি দাও
মেঘের মাঝে একেবারে।
খাঁচার পাখি বলে নিরালা সুখকোণে
বাঁধিয়া রাখো আপনারে।
বনের পাখি বলে— না,
সেথা কোথায় উড়িবারে পাই।
খাঁচার পাখি বলে— হায়,
মেঘে কোথায় বসিবার ঠাঁই।

এমনি দুই পাখি দোঁহারে ভালোবাসে
তবুও কাছে নাহি পায়।
খাঁচার ফাঁকে ফাঁকে পরশে মুখে মুখে,
নীরবে চোখে চোখে চায়।
দুজনে কেহ কারে বুঝিতে নাহি পারে,
বুঝাতে নারে আপনায়।
দুজনে একা একা ঝাপটি মরে পাখা
কাতরে কহে— কাছে আয়।
বনের পাখি বলে— না,
কবে খাঁচায় রুধি দিবে দ্বার।
খাঁচার পাখি বলে— হায়,
মোর শকতি নাহি উড়িবার।

শাহাজাদপুর
১৯ আষাঢ়, ১২৯৯

আকাশের চাঁদ

হাতে তুলে দাও আকাশের চাঁদ—
এই হল তার বুলি।
দিবস রজনী যেতেছে বহিয়া,
কাঁদে সে দু-হাত তুলি।
হাসিছে আকাশ, বহিছে বাতাস,
পাখিরা গাহিছে সুখে।
সকালে রাখাল চলিয়াছে মাঠে,
বিকালে ঘরের মুখে।
বালক-বালিকা ভাইবোনে মিলে
খেলিছে আঙিনা-কোণে,
কোলের শিশুরে হেরিয়া জননী
হাসিছে আপন মনে।

কেহ হাটে যায় কেহ বাটে যায়
চলেছে যে যার কাজে,
কত জনরব কত কলরব
উঠিছে আকাশমাঝে।
পথিকেরা এসে তাহারে শুধায়,
"কে তুমি কাঁদিছ বসি।"
সে কেবল বলে নয়নের জলে,
"হাতে পাই নাই শশী।"

সকালে বিকালে ঝরি পড়ে কোলে
অযাচিত ফুলদল,
দখিন সমীর বুলায় ললাটে
দক্ষিণ করতল।
প্রভাতের আলো আশিস-পরশ
করিছে তাহার দেহে,
রজনী তাহারে বুকের আঁচলে
ঢাকিছে নীরব স্নেহে।
কাছে আসি শিশু মাগিছে আদর
কণ্ঠ জড়ায়ে ধরি,
পাশে আসি যুবা চাহিছে তাহারে
লইতে বন্ধু করি।
এই পথে গৃহে কত আনাগোনা,
কত ভালোবাসাবাসি,
সংসার-সুখ কাছে কাছে তার
কত আসে যায় ভাসি,
মুখ ফিরাইয়া সে রহে বসিয়া,
কহে সে নয়নজলে,
"তোমাদের আমি চাহি না কারেও,
শশী চাই করতলে।"

শশী যেথা ছিল সেথাই রহিল,
সেও ব'সে এক ঠাঁই।
অবশেষে যবে জীবনের দিন
আর বেশি বাকি নাই,
এমন সময়ে সহসা কী ভাবি
চাহিল সে মুখ ফিরে,
দেখিল ধরণী শ্যামল মধুর,
সুনীল সিন্ধুতীরে।
সোনার ক্ষেত্রে কৃষাণ বসিয়া
কাটিতেছে পাকা ধান,
ছোটো ছোটো তরী পাল তুলে যায়
মাঝি বসে গায় গান।
দূরে মন্দিরে বাজিছে কাঁসর,
বধূরা চলেছে ঘাটে,
মেঠো পথ দিয়ে গৃহস্থজন
আসিছে গ্রামের হাটে।
নিশ্বাস ফেলি রহে আঁখি মেলি,
কহে ম্রিয়মাণ মন,
"শশী নাহি চাই যদি ফিরে পাই
আরবার এ জীবন।"

দেখিল চাহিয়া জীবনপূর্ণ
সুন্দর লোকালয়,
প্রতিদিবসের হরষে বিষাদে
চির-কল্লোলময়।
স্নেহসুধা লয়ে গৃহের লক্ষ্মী
ফিরিছে গৃহের মাঝে,
প্রতিদিবসেরে করিছে মধুর
প্রতিদিবসের কাজে।

সকাল, বিকাল, দুটি ভাই আসে
ঘরের ছেলের মতো,—
রজনী সবারে কোলেতে লইছে
নয়ন করিয়া নত।
ছোটো ছোটো ফুল, ছোটো ছোটো হাসি,
ছোটো কথা, ছোটো সুখ,
প্রতিনিমেষের ভালোবাসাগুলি,
ছোটো ছোটো হাসিমুখ—
আপনা-আপনি উঠিছে ফুটিয়া
মানব-জীবন ঘিরি,
বিজন শিখরে বসিয়া সে তাই
দেখিতেছে ফিরি ফিরি।

দেখে বহুদূরে ছায়াপুরীসম
অতীতজীবন-রেখা,
অস্তরবির সোনার কিরণে
নূতন বরনে লেখা।
যাহাদের পানে নয়ন তুলিয়া
চাহেনি কখনো ফিরে,
নবীন আভায় দেখা দেয় তারা
স্মৃতি-সাগরের তীরে।
হতাশ হৃদয়ে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
পুরবী রাগিণী বাজে,
দু-বাহু বাড়ায়ে ফিরে যেতে চায়
ওই জীবনের মাঝে।
দিনের আলোক মিলায়ে আসিল
তবু পিছে চেয়ে রহে—
যাহা পেয়েছিল তাই পেতে চায়
তার বেশি কিছু নহে।

সোনার জীবন রহিল পড়িয়া
কোথা সে চলিল ভেসে।
শশীর লাগিয়া কাঁদিতে গেল কি
রবিশশীহীন দেশে।

বোট, যমুনায়
বিরাহিমপুরের পথে
২২ আষাঢ়, ১২৯৯

যেতে নাহি দিব

দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি; বেলা দ্বিপ্রহর;
হেমন্তের রৌদ্র ক্রমে হতেছে প্রখর।
জনশূন্য পল্লিপথে ধূলি উড়ে যায়
মধ্যাহ্ন-বাতাসে; স্নিগ্ধ অশথের ছায়
ক্লান্ত বৃদ্ধা ভিখারিনী জীর্ণ বস্ত্র পাতি
ঘুমায়ে পড়েছে; যেন রৌদ্রময়ী রাতি
ঝাঁ ঝাঁ করে চারিদিকে নিস্তব্ধ নিঝুম;—
শুধু মোর ঘরে নাহি বিশ্রামের ঘুম।

গিয়েছে আশ্বিন,— পূজার ছুটির শেষে
ফিরে যেতে হবে আজি বহুদূরদেশে
সেই কর্মস্থানে। ভৃত্যগণ ব্যস্ত হয়ে
বাঁধিছে জিনিসপত্র দড়াদড়ি লয়ে,
হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি এ-ঘরে ও-ঘরে।
ঘরের গৃহিণী, চক্ষু ছলছল করে,
ব্যথিছে বক্ষের কাছে পাষাণের ভার,
তবুও সময় তার নাহি কাঁদিবার
একদণ্ড তরে; বিদায়ের আয়োজনে
ব্যস্ত হয়ে ফিরে; যথেষ্ট না হয় মনে

যত বাড়ে বোঝা। আমি বলি, "এ কী কাণ্ড,
এত ঘট এত পট হাঁড়ি সরা ভাণ্ড
বোতল বিছানা বাক্স রাজ্যের বোঝাই
কী করিব লয়ে। কিছু এর রেখে যাই
কিছু লয়ে যাই সাথে।"
সে-কথায় কর্ণপাত
নাহি করে কোনো জন। "কী জানি দৈবাৎ
এটা ওটা আবশ্যক যদি হয় শেষে
তখন কোথায় পাবে বিভুঁই বিদেশে।—
সোনামুগ সরু চাল সুপারি ও পান;
ও-হাঁড়িতে ঢাকা আছে দুই-চারিখান
গুড়ের পাটালি; কিছু ঝুনা নারিকেল;
দুই ভাণ্ড ভালো রাই-সরিষার তেল;
আমসত্ত্ব আমচুর; সের দুই দুধ;
এই-সব শিশি কৌটা ওষুধবিষুধ।
মিষ্টান্ন রহিল কিছু হাঁড়ির ভিতরে,
মাথা খাও, ভুলিয়ো না, খেয়ো মনে করে।"
বুঝিনু যুক্তির কথা বৃথা বাক্যব্যয়।
বোঝাই হইল উঁচু পর্বতের ন্যায়।
তাকানু ঘড়ির পানে, তার পরে ফিরে
চাহিনু প্রিয়ার মুখে, কহিলাম ধীরে
"তবে আসি"। অমনি ফিরায়ে মুখখানি
নতশিরে চক্ষু'পরে বস্ত্রাঞ্চল টানি
অমঙ্গল অশ্রুজল করিল গোপন।

বাহিরে দ্বারের কাছে বসি অন্যমন
কন্যা মোর চারি বছরের। এতক্ষণ
অন্য দিনে হয়ে যত স্নান সমাপন,
দুটি অন্ন মুখে না তুলিতে আঁখিপাতা
মুদিয়া আসিত ঘুমে; আজি তার মাতা

দেখে নাই তারে ; এত বেলা হয়ে যায়
নাই স্নানাহার। এতক্ষণ ছায়াপ্রায়
ফিরিতেছিল সে মোর কাছে কাছে ঘেঁষে,
চাহিয়া দেখিতেছিল মৌন নির্নিমেষে
বিদায়ের আয়োজন। শ্রান্তদেহে এবে
বাহিরের দ্বারপ্রান্তে কী জানি কী ভেবে
চুপিচাপি বসে ছিল। কহিনু যখন
"মাগো, আসি", সে কহিল বিষণ্ণ-নয়ন
ম্লানমুখে, "যেতে আমি দিব না তোমায়"।
যেখানে আছিল বসে রহিল সেথায়,
ধরিল না বাহু মোর, রুধিল না দ্বার,
শুধু নিজ হৃদয়ের স্নেহ-অধিকার
প্রচারিল—"যেতে আমি দিব না তোমায়"।
তবুও সময় হল শেষ, তবু হায়
যেতে দিতে হল।

ওরে মোর মূঢ় মেয়ে,
কে রে তুই, কোথা হতে কী শকতি পেয়ে
কহিলি এমন কথা, এত স্পর্ধাভরে—
"যেতে আমি দিব না তোমায়"। চরাচরে
কাহারে রাখিবি ধরে দুটি ছোটো হাতে
গরবিনী, সংগ্রাম করিবি কার সাথে
বসি গৃহদ্বারপ্রান্তে শ্রান্ত-ক্ষুদ্র-দেহ
শুধু লয়ে ওইটুকু বুকভরা স্নেহ।
ব্যথিত হৃদয় হতে বহু ভয়ে লাজে
মর্মের প্রার্থনা শুধু ব্যক্ত করা সাজে
এ জগতে,—শুধু বলে রাখা "যেতে দিতে
ইচ্ছা নাহি"। হেন কথা কে পারে বলিতে
"যেতে নাহি দিব"। শুনি তোর শিশুমুখে
স্নেহের প্রবল গর্ববাণী, সকৌতুকে

হাসিয়া সংসার টেনে নিয়ে গেল মোরে,
তুই শুধু পরাভূত চোখে জল ভ'রে
দুয়ারে রহিলি বসে ছবির মতন,
আমি দেখে চলে এনু মুছিয়া নয়ন।

চলিতে চলিতে পথে হেরি দুই ধারে
শরতের শস্যক্ষেত্র নত শস্যভারে
রৌদ্র পোহাইছে। তরুশ্রেণী উদাসীন
রাজপথপাশে, চেয়ে আছে সারাদিন
আপন ছায়ার পানে। বহে খরবেগ
শরতের ভরা গঙ্গা। শুভ্রখণ্ডমেঘ
মাতৃদুগ্ধ-পরিতৃপ্ত সুখনিদ্রারত
সদ্যোজাত সুকুমার গোবৎসের মতো
নীলাম্বরে শুয়ে। দীপ্ত রৌদ্রে অনাবৃত
যুগযুগান্তরক্লান্ত দিগন্তবিস্তৃত
ধরণীর পানে চেয়ে ফেলিনু নিশ্বাস।

কী গভীর দুঃখে মগ্ন সমস্ত আকাশ,
সমস্ত পৃথিবী। চলিতেছি যতদূর
শুনিতেছি একমাত্র মর্মান্তিক সুর
"যেতে আমি দিব না তোমায়"। ধরণীর
প্রান্ত হতে নীলাভ্রের সর্বপ্রান্ততীর
ধ্বনিতেছে চিরকাল অনাদ্যন্ত রবে,
"যেতে নাহি দিব। যেতে নাহি দিব"। সবে
কহে, "যেতে নাহি দিব"। তৃণ ক্ষুদ্র অতি
তারেও বাঁধিয়া বক্ষে মাতা বসুমতী
কহিছেন প্রাণপণে, "যেতে নাহি দিব"।
আয়ুক্ষীণ দীপমুখে শিখা নিব-নিব,
আঁধারের গ্রাস হতে কে টানিছে তারে
কহিতেছে শতবার, "যেতে দিব না রে"।

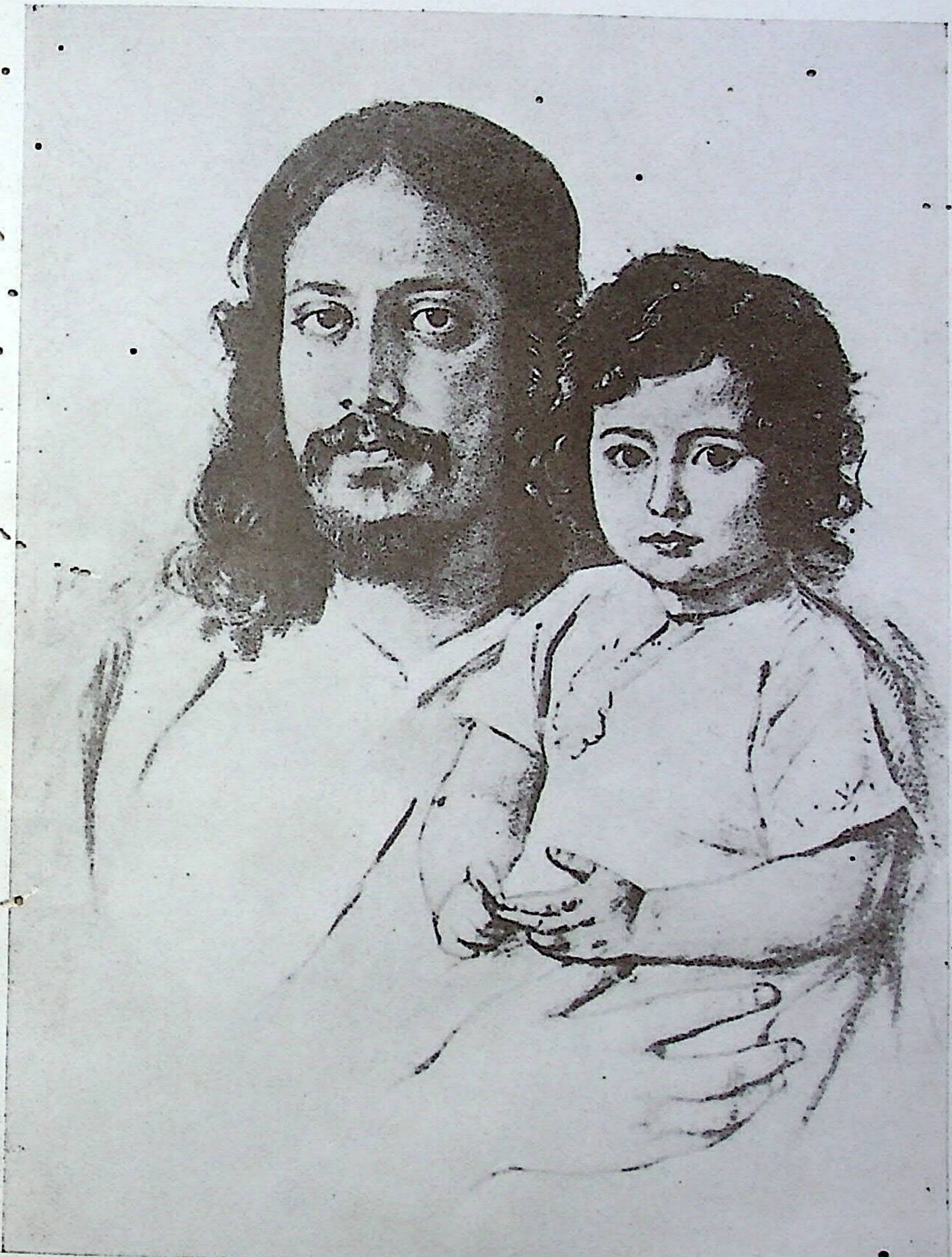

জ্যেষ্ঠা কন্যাসহ রবীন্দ্রনাথ
১৮৮৭ সালে শিল্পী আর্চার অঙ্কিত প্যাস্টেল চিত্র

এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত্য ছেয়ে
সব চেয়ে পুরাতন কথা, সব চেয়ে
গভীর ক্রন্দন "যেতে নাহি দিব"। হায়,
তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।
চলিতেছে এমনি অনাদি কাল হতে।
প্রলয়সমুদ্রবাহী সৃজনের স্রোতে
প্রসারিত-ব্যগ্র-বাহু জলন্ত আঁখিতে
"দিব না দিব না যেতে" ডাকিতে ডাকিতে
হুহু করে তীব্রবেগে চলে যায় সবে
পূর্ণ করি বিশ্বতট আর্ত কলরবে।
সম্মুখ-উর্মিরে ডাকে পশ্চাতের ঢেউ
"দিব না দিব না যেতে"—নাহি শুনে কেউ
নাহি কোনো সাড়া।

চারি দিক হতে আজি
অবিশ্রাম কর্ণে মোর উঠিতেছে বাজি
সেই বিশ্ব-মর্মভেদী করুণ ক্রন্দন
মোর কন্যাকণ্ঠস্বরে; শিশুর মতন
বিশ্বের অবোধ বাণী। চিরকাল ধরে
যাহা পায় তাই সে হারায়, তবু তো রে
শিথিল হল না মুষ্টি, তবু অবিরত
সেই চারি বৎসরের কন্যাটির মতো
অক্ষুণ্ণ প্রেমের গর্বে কহিছে সে ডাকি,
"যেতে নাহি দিব"। ম্লানমুখ, অশ্রু-আঁখি,
দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে টুটিছে গরব
তবু প্রেম কিছুতে না মানে পরাভব,
তবু বিদ্রোহের ভাবে রুদ্ধ কণ্ঠে কয়,
"যেতে নাহি দিব"। যত বার পরাজয়

তত বার কহে, "আমি ভালোবাসি যারে
সে কি কভু আমা হতে দূরে যেতে পারে।
আমার আকাঙ্ক্ষাসম এমন আকুল,
এমন সকল-বাড়া, এমন অকূল,
এমন প্রবল, বিশ্বে কিছু আছে আর ?"
এত বলি দর্পভরে করে সে প্রচার,
"যেতে নাহি দিব"।— তখনি দেখিতে পায়,
শুষ্ক তুচ্ছ ধূলিসম উড়ে চলে যায়
একটি নিশ্বাসে তার আদরের ধন,—
অশ্রুজলে ভেসে যায় দুইটি নয়ন,
ছিন্নমূল তরুসম পড়ে পৃথ্বীতলে
হতগর্ব নতশির।—তবু প্রেম বলে,
"সত্যভঙ্গ হবে না বিধির। আমি তাঁর
পেয়েছি স্বাক্ষর-দেওয়া মহা অঙ্গীকার
চির-অধিকার-লিপি"। তাই স্ফীত বুকে
সর্বশক্তি মরণের মুখের সম্মুখে
দাঁড়াইয়া সুকুমার ক্ষীণ তনুলতা
বলে, "মৃত্যু তুমি নাই"।— হেন গর্বকথা !
মৃত্যু হাসে বসি। মরণ-পীড়িত সেই
চিরজীবী প্রেম আচ্ছন্ন করেছে এই
অনন্ত সংসার, বিষণ্ণ নয়ন'পরে
অশ্রুবাষ্পসম, ব্যাকুল আশঙ্কাভরে
চির-কম্পমান। আশাহীন শ্রান্ত আশা
টানিয়া রেখেছে এক বিষাদ-কুয়াশা
বিশ্বময়। আজি যেন পড়িছে নয়নে,
দুখানি অবোধ বাহু বিফল বাঁধনে
জড়ায়ে পড়িয়া আছে নিখিলেরে ঘিরে,
স্তব্ধ সকাতর। চঞ্চল স্রোতের নীরে
পড়ে আছে একখানি অচঞ্চল ছায়া,—
অশ্রুবৃষ্টিভরা কোন্ মেঘের সে মায়া।

তাই আজি শুনিতেছি তরুর মর্মরে
এত ব্যাকুলতা ; অলস ঔদাস্যভরে
মধ্যাহ্নের তপ্ত বায়ু মিছে খেলা করে
শুষ্ক পত্র লয়ে ; বেলা ধীরে যায় চলে
ছায়া দীর্ঘতর করি অশথের তলে ।
মেঠো সুরে কাঁদে যেন অনন্তের বাঁশি
বিশ্বের প্রান্তরমাঝে ; শুনিয়া উদাসী
বসুন্ধরা বসিয়া আছেন এলোচুলে
দূরব্যাপী শস্যক্ষেত্রে জাহ্নবীর কূলে
একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য-অঞ্চল
বক্ষে টানি দিয়া ; স্থির নয়নযুগল
দূর নীলাম্বরে মগ্ন ; মুখে নাহি বাণী ।
দেখিলাম তাঁর সেই ম্লান মুখখানি
সেই দ্বারপ্রান্তে-লীন স্তব্ধ মর্মাহত
মোর চারি বৎসরের কন্যাটির মতো ।

১৪ কার্তিক, ১২৯৯

সমুদ্রের প্রতি

পুরীতে সমুদ্র দেখিয়া

হে আদিজননী সিন্ধু, বসুন্ধরা সন্তান তোমার,
একমাত্র কন্যা তব কোলে । তাই তন্দ্রা নাহি আর
চক্ষে তব, তাই বক্ষ জুড়ি সদা শঙ্কা, সদা আশা,
সদা আন্দোলন ; তাই উঠে বেদমন্ত্রসম ভাষা
নিরন্তর প্রশান্ত অম্বরে, মহেন্দ্রমন্দির পানে
অন্তরের অনন্ত প্রার্থনা, নিয়ত মঙ্গলগানে
ধ্বনিত করিয়া দিশি দিশি ; তাই ঘুমন্ত পৃথ্বীরে
অসংখ্য চুম্বন কর আলিঙ্গনে সর্ব অঙ্গ ঘিরে

তরঙ্গবন্ধনে বাঁধি, নীলাম্বর অঞ্চলে তোমার
সযত্নে বেষ্টিয়া ধরি সন্তর্পণে দেহখানি তার
সুকোমল সুকৌশলে। এ কী সুগম্ভীর স্নেহখেলা
অম্বুনিধি, ছল করি দেখাইয়া মিথ্যা অবহেলা
ধীরি ধীরি পা টিপিয়া পিছু হটি চলি যাও দূরে,
যেন ছেড়ে যেতে চাও,—আবার আনন্দপূর্ণ সুরে
উল্লসি ফিরিয়া আসি কল্লোলে ঝাঁপায়ে প'ড়ে বুকে—
রাশি রাশি শুভ্রহাস্যে, অশ্রুজলে, স্নেহগর্বসুখে
আর্দ্র করি দিয়ে যাও ধরিত্রীর নির্মল ললাট
আশীর্বাদে। নিত্যবিগলিত তব অন্তর বিরাট,
আদি অন্ত স্নেহরাশি,—আদি অন্ত তাহার কোথা রে,
কোথা তার তল, কোথা কূল। বলো কে বুঝিতে পারে
তাহার অগাধ শান্তি, তাহার অপার ব্যাকুলতা,
তার সুগম্ভীর মৌন, তার সমুচ্ছল কলকথা,
তার হাস্য, তার অশ্রুরাশি।—কখনো বা আপনারে
রাখিতে পার না যেন, স্নেহপূর্ণ স্ফীতস্তনভারে
উন্মাদিনী ছুটে এসে ধরণীরে বক্ষে ধর চাপি
নির্দয় আবেগে; ধরা প্রচণ্ড পীড়নে উঠে কাঁপি,
রুদ্ধশ্বাসে উর্ধ্বস্বরে চীৎকারি উঠিতে চাহে কাঁদি,
উন্মত্ত স্নেহক্ষুধায় রাক্ষসীর মতো তারে বাঁধি
পীড়িয়া নাড়িয়া যেন টুটিয়া ফেলিয়া একেবারে
অসীম অতৃপ্তিমাঝে গ্রাসিতে নাশিতে চাহ তারে
প্রকাণ্ড প্রলয়ে। পরক্ষণে মহা অপরাধী প্রায়
পড়ে থাক তটতলে স্তব্ধ হয়ে বিষণ্ণ ব্যথায়
নিষণ্ণ নিশ্চল;— ধীরে ধীরে প্রভাত উঠিয়া এসে
শান্তদৃষ্টি চাহে তোমাপানে; সন্ধ্যাসখী ভালোবেসে
স্নেহকরস্পর্শ দিয়ে সান্ত্বনা করিয়ে চুপেচুপে
চলে যায় তিমির-মন্দিরে; রাত্রি শোনে বন্ধুরূপে
গুমরি-ক্রন্দন তব রুদ্ধ অনুতাপে ফুলে ফুলে।

আমি পৃথিবীর শিশু বসে আছি তব উপকূলে,

শুনিতেছি ধ্বনি তব ; ভাবিতেছি, বুঝা যায় যেন
কিছু কিছু মর্ম তার— বোবার ইঙ্গিতভাষা-হেন
আত্মীয়ের কাছে। মনে হয়, অন্তরের মাঝখানে
নাড়ীতে যে-রক্ত বহে, সেও যেন ওই ভাষা জানে,
আর কিছু শেখে নাই। মনে হয়, যেন মনে পড়ে
যখন বিলীনভাবে ছিনু ওই বিরাট জঠরে
অজাত ভুবন-ভ্রূণমাঝে,— লক্ষকোটি বর্ষ ধ'রে
ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে
মুদ্রিত হইয়া গেছে ; সেই জন্মপূর্বের স্মরণ,—
গর্ভস্থ পৃথিবী'পরে সেই নিত্য জীবনস্পন্দন
তব মাতৃহৃদয়ের— অতি ক্ষীণ আভাসের মতো
জাগে যেন সমস্ত শিরায়, শুনি যবে নেত্র করি নত
বসি জনশূন্য তীরে ওই পুরাতন কলধ্বনি।
দিক্ হতে দিগন্তরে যুগ হতে যুগান্তর গনি'
তখন আছিলে তুমি একাকিনী অখণ্ড অকূল
আত্মহারা ; প্রথম গর্ভের মহা রহস্য বিপুল
না বুঝিয়া। দিবারাত্রি গূঢ় এক স্নেহব্যাকুলতা,
গর্ভিণীর পূর্বরাগ, অলক্ষিতে অপূর্ব মমতা,
অজ্ঞাত আকাঙ্ক্ষারাশি, নিঃসন্তান শূন্য বক্ষোদেশে
নিরন্তর উঠিত ব্যাকুলি। প্রতি প্রাতে উষা এসে
অনুমান করি যেত মহাসন্তানের জন্মদিন,
নক্ষত্র রহিত চাহি নিশি নিশি নিমেষবিহীন
শিশুহীন শয়ন-শিয়রে। সেই আদিজননীর
জনশূন্য জীবশূন্য স্নেহচঞ্চলতা সুগভীর,
আসন্ন প্রতীক্ষাপূর্ণ সেই তব জাগ্রত বাসনা,
অগাধ প্রাণের তলে সেই তব অজানা বেদনা
অনাগত মহাভবিষ্যৎ লাগি, হৃদয়ে আমার
যুগান্তর-স্মৃতিসম উদিত হতেছে বারম্বার।
আমারো চিত্তের মাঝে তেমনি অজ্ঞাত ব্যথাভরে,
তেমনি অচেনা প্রত্যাশায়, অলক্ষ্য সুদূর তরে

উঠিছে মর্মর স্বর। মানবহৃদয়-সিন্ধুতলে
যেন নব মহাদেশ সৃজন হতেছে পলে পলে,
আপনি সে নাহি জানে। শুধু অর্ধ-অনুভব তারি
ব্যাকুল করেছে তারে, মনে তার দিয়েছে সঞ্চারি
আকারপ্রকারহীন তৃপ্তিহীন এক মহা আশা—
প্রমাণের অগোচর, প্রত্যক্ষের বাহিরেতে বাসা।
তর্ক তারে পরিহাসে, মর্ম তারে সত্য বলি জানে,
সহস্র ব্যাঘাতমাঝে তবুও সে সন্দেহ না মানে,
জননী যেমন জানে জঠরের গোপন শিশুরে,
প্রাণে যবে স্নেহ জাগে, স্তনে যবে দুগ্ধ উঠে পুরে।
প্রাণভরা ভাষাহরা দিশাহারা সেই আশা নিয়ে
চেয়ে আছি তোমা পানে; তুমি সিন্ধু, প্রকাণ্ড হাসিয়ে
টানিয়া নিতেছ যেন মহাবেগে কী নাড়ীর টানে
আমার এ মর্মখানি তোমার তরঙ্গমাঝখানে
কোলের শিশুর মতো।

হে জলধি, বুঝিবে কি তুমি
আমার মানব-ভাষা। জান কি তোমার ধরাভূমি
পীড়ায় পীড়িত আজি ফিরিতেছে এ-পাশ ও-পাশ,
চক্ষে বহে অশ্রুধারা, ঘন ঘন বহে উষ্ণ শ্বাস।
নাহি জানে কী যে চায়, নাহি জানে কিসে ঘুচে তৃষা,
আপনার মনোমাঝে আপনি সে হারায়েছে দিশা
বিকারের মরীচিকা-জালে। অতল গম্ভীর তব
অন্তর হইতে কহ সান্ত্বনার বাক্য অভিনব
আষাঢ়ের জলদমন্দ্রের মতো; স্নিগ্ধ মাতৃপাণি
চিন্তাতপ্ত ভালে তার তালে তালে বারম্বার হানি,
সর্বাঙ্গে সহস্রবার দিয়া তারে স্নেহময় চুমা,
বলো তারে "শান্তি, শান্তি", বলো তারে "ঘুমা, ঘুমা, ঘুমা"।

রামপুর বোয়ালিয়া
১৭ চৈত্র, ১২৯৯

প্রতীক্ষা

ওরে মৃত্যু, জানি তুই আমার বক্ষের মাঝে
বেঁধেছিস বাসা।
যেখানে নির্জন কুঞ্জে ফুটে আছে যত মোর
স্নেহ-ভালোবাসা,
গোপন মনের আশা, জীবনের দুঃখ-সুখ,
মর্মের বেদনা,
চির-দিবসের যত হাসি-অশ্রু-চিহ্ন-আঁকা
বাসনা-সাধনা;
যেখানে নন্দন-ছায়ে নিঃশঙ্কে করিছে খেলা
অন্তরের ধন,
স্নেহের পুত্তলিগুলি, আজন্মের স্নেহস্মৃতি,
আনন্দ-কিরণ;
কত আলো, কত ছায়া, কত ক্ষুদ্র বিহঙ্গের
গীতিময়ী ভাষা,—
ওরে মৃত্যু, জানিয়াছি, তারি মাঝখানে এসে
বেঁধেছিস বাসা।

নিশিদিন নিরন্তর জগৎ জুড়িয়া খেলা
জীবন চঞ্চল।
চেয়ে দেখি রাজপথে চলেছে অশ্রান্তগতি
যত পান্থদল;
রৌদ্রপাণ্ডু নীলাম্বরে পাখিগুলি উড়ে যায়
প্রাণপূর্ণ বেগে,
সমীরকম্পিত বনে নিশিশেষে নব নব
পুষ্প উঠে জেগে;
চারি দিকে কত শত দেখাশোনা আনাগোনা
প্রভাতে সন্ধ্যায়;

দিনগুলি প্রতি প্রাতে খুলিতেছে জীবনের
নূতন অধ্যায় ;
তুমি শুধু এক প্রান্তে বসে আছ অহর্নিশি
স্তব্ধ নেত্র খুলি,—
মাঝে মাঝে রাত্রিবেলা উঠ পক্ষ ঝাপটিয়া
বক্ষ উঠে দুলি।

যে সুদূর সমুদ্রের পরপার-রাজ্য হতে
আসিয়াছ হেথা,
এনেছ কি সেথাকার নূতন সংবাদ কিছু
গোপন বারতা।
সেথা শব্দহীন তীরে ঊর্মিগুলি তালে তালে
মহামন্দ্রে বাজে,
সেই ধ্বনি কী করিয়া ধ্বনিয়া তুলিছ মোর
ক্ষুদ্র বক্ষমাঝে।
রাত্রিদিন ধুকধুক হৃদয়পঞ্জর-তটে
অনন্তের ঢেউ,
অবিশ্রাম বাজিতেছে সুগম্ভীর সমতানে
শুনিছে না কেউ।
আমার এ হৃদয়ের ছোটোখাটো গীতগুলি,
স্নেহ-কলরব,
তারি মাঝে কে আনিল দিশাহীন সমুদ্রের
সংগীত ভৈরব।

তুই কি বাসিস ভালো আমার এ বক্ষোবাসী
পরান-পক্ষীরে,
তাই এর পার্শ্বে এসে কাছে বসেছিস ঘেঁষে
অতি ধীরে ধীরে ?

দিনরাত্রি নির্নিমেষে চাহিয়া নেত্রের পানে
নীরব সাধনা,
নিস্তব্ধ আসনে বসি একাগ্র আগ্রহভরে
রুদ্ধ আরাধনা।
চপল চঞ্চল প্রিয়া ধরা নাহি দিতে চায়,
স্থির নাহি থাকে,
মেলি নানাবর্ণ পাখা উড়ে উড়ে চলে যায়
নব নব শাখে ;
তুই তবু একমনে মৌনব্রত একাসনে
বসি নিরলস।
ক্রমে সে পড়িবে ধরা, গীত বন্ধ হয়ে যাবে
মানিবে সে বশ।

তখন কোথায় তারে ভুলায়ে লইয়া যাবি—
কোন্ শূন্যপথে,
অচৈতন্য প্রেয়সীরে অবহেলে লয়ে কোলে
অন্ধকার রথে!
যেথায় অনাদি রাত্রি রয়েছে চির-কুমারী,—
আলোক-পরশ
একটি রোমাঞ্চরেখা আঁকেনি তাহার গাত্রে
অসংখ্য বরষ ;
সৃজনের পরপ্রান্তে যে অনন্ত অন্তঃপুরে
কভু দৈববশে
দূরতম জ্যোতিষ্কের ক্ষীণতম পদধ্বনি
তিল নাহি পশে,
সেথায় বিরাট পক্ষ দিবি তুই বিস্তারিয়া
বন্ধনবিহীন,
কাঁপিবে বক্ষের কাছে নবপরিণীতা বধূ
নূতন স্বাধীন।

ক্রমে সে কি ভুলে যাবে ধরণীর নীড়খানি
তৃণে পত্রে গাঁথা,
এ আনন্দ-সূর্যালোক, এই স্নেহ, এই গেহ,
এই পুষ্পপাতা ?
ক্রমে সে প্রণয়ভরে তোরেও কি করি লবে
আত্মীয় স্বজন,
অন্ধকার বাসরেতে হবে কি দুজনে মিলি
মৌন আলাপন।
তোর স্নিগ্ধ সুগম্ভীর অচঞ্চল প্রেমমূর্তি,
অসীম নির্ভর,
নির্নিমেষ নীল নেত্র, বিশ্বব্যাপ্ত জটাজূট,
নির্বাক অধর—
তার কাছে পৃথিবীর চঞ্চল আনন্দগুলি
তুচ্ছ মনে হবে,
সমুদ্রে মিশিলে নদী বিচিত্র তটের স্মৃতি
স্মরণে কি রবে ?

ওগো মৃত্যু, ওগো প্রিয়, তবু থাক্ কিছুকাল
ভুবনমাঝারে।
এরি মাঝে বধূবেশে অনন্তবাসর-দেশে
লইয়ো না তারে।
এখনো সকল গান করেনি সে সমাপন
সন্ধ্যায় প্রভাতে ;
নিজের বক্ষের তাপে মধুর উত্তপ্ত নীড়ে
সুপ্ত আছে রাতে ;
পান্থপাখিদের সাথে এখনো যে যেতে হবে
নব নব দেশে,
সিন্ধুতীরে কুঞ্জবনে নব নব বসন্তের
আনন্দ-উদ্দেশে ;

ওগো মৃত্যু, কেন তুই এখনি তাহার নীড়ে
বসেছিস এসে ?
তার সব ভালোবাসা আঁধার করিতে চাস
তুই ভালোবেসে ?

এ যদি সত্যই হয় মৃত্তিকার পৃথ্বী'পরে
মুহূর্তের খেলা,
এই সব মুখোমুখি এই সব দেখাশোনা
ক্ষণিকের মেলা,
প্রাণপণ ভালোবাসা সেও যদি হয় শুধু
মিথ্যার বন্ধন,
পরশে খসিয়া পড়ে, তার পরে দণ্ড-দুই
অরণ্যে ক্রন্দন,
তুমি শুধু চিরস্থায়ী, তুমি শুধু সীমাশূন্য
মহাপরিণাম,
যত আশা যত প্রেম তোমার তিমিরে লভে
অনন্ত বিশ্রাম,
তবে মৃত্যু, দূরে যাও, এখনি দিয়ো না ভেঙে
এ খেলার পুরী—
ক্ষণেক বিলম্ব করো, আমার দু-দিন হতে
করিয়ো না চুরি।

একদা নামিবে সন্ধ্যা, বাজিবে আরতিশঙ্খ
অদূর মন্দিরে,
বিহঙ্গ নীরব হবে, উঠিবে ঝিল্লীর ধ্বনি
অরণ্য-গভীরে,
সমাপ্ত হইবে কর্ম, সংসার-সংগ্রাম-শেষে
জয়পরাজয়,

আসিবে তন্দ্রার ঘোর পান্থের নয়ন'পরে
ক্লান্ত অতিশয়,
দিনান্তের শেষ আলো দিগন্তে মিলায়ে যাবে,
ধরণী আঁধার,
সুদূরে জ্বলিবে শুধু অনন্তের যাত্রাপথে
প্রদীপ তারার,
শিয়রে শয়ন-শেষে বসি যারা অনিমেষে
তাহাদের চোখে
আসিবে শ্রান্তির ভার নিদ্রাহীন যামিনীতে
স্তিমিত আলোকে,—

একে একে চলে যাবে আপন আলয়ে সবে
সখাতে সখীতে,
তৈলহীন দীপশিখা নিবিয়া আসিবে ক্রমে
অর্ধরজনীতে,
উচ্ছ্বসিত সমীরণ আনিবে সুগন্ধ বহি
অদৃশ্য ফুলের,
অন্ধকার পূর্ণ করি আসিবে তরঙ্গধ্বনি
অজ্ঞাত কূলের,
ওগো মৃত্যু, সেই লগ্নে নির্জন শয়নপ্রান্তে
এসো বরবেশে,
আমার পরান-বধূ ক্লান্ত হস্ত প্রসারিয়া
বহু ভালোবেসে
ধরিবে তোমার বাহু; তখন তাহারে তুমি
মন্ত্র পড়ি নিয়ো;
রক্তিম অধর তার নিবিড় চুম্বনদানে
পাণ্ডু করি দিয়ো।

শিলাইদহ, বোট
১৭ অগ্রহায়ণ, ১২৯৯

মানসসুন্দরী

আজ কোনো কাজ নয় ;— সব ফেলে দিয়ে
ছন্দোবন্ধ-গ্রন্থগীত— এস তুমি প্রিয়ে,
আজন্ম-সাধন-ধন সুন্দরী আমার
কবিতা, কল্পনা-লতা। শুধু একবার
কাছে বসো। আজ শুধু কূজন গুঞ্জন
তোমাতে আমাতে ; শুধু নীরবে ভুঞ্জন
এই সন্ধ্যা-কিরণের সুবর্ণ মদিরা,—
যতক্ষণ অন্তরের শিরা-উপশিরা
লাবণ্য-প্রবাহভরে ভরি নাহি উঠে,
যতক্ষণে মহানন্দে নাহি যায় টুটে
চেতনাবেদনাবন্ধ, ভুলে যাই সব
কী আশা মেটেনি প্রাণে, কী সংগীতরব
গিয়েছে নীরব হয়ে, কী আনন্দসুধা
অধরের প্রান্তে এসে অন্তরের ক্ষুধা
না মিটায়ে গিয়াছে শুকায়ে। এই শান্তি,
এই মধুরতা, দিক সৌম্য ম্লান কান্তি
জীবনের দুঃখদৈন্য-অতৃপ্তির 'পর—
করুণকোমল আভা গভীর সুন্দর।

বীণা ফেলে দিয়ে এস, মানস-সুন্দরী,
দুটি রিক্ত হস্ত শুধু আলিঙ্গনে ভরি
কণ্ঠে জড়াইয়া দাও,— মৃণাল-পরশে
রোমাঞ্চ অঙ্কুরি উঠে মর্মান্ত হরষে,—
কম্পিত চঞ্চল বক্ষ, চক্ষু ছলছল,
মুগ্ধ তনু মরি যায়, অন্তর কেবল
অঙ্গের সীমান্ত-প্রান্তে উদ্ভাসিয়া উঠে,
এখনি ইন্দ্রিয়বন্ধ বুঝি টুটে টুটে।

অর্ধেক অঞ্চল পাতি বসাও যতনে
পার্শ্বে তব ; সুমধুর প্রিয় সম্বোধনে
ডাকো মোরে, বলো, প্রিয়, বলো, প্রিয়তম ;—
কুন্তল-আকুল মুখ বক্ষে রাখি মম
হৃদয়ের কানে কানে অতি মৃদু ভাষে
সংগোপনে বলে যাও যাহা মুখে আসে
অর্থহারা ভাবে-ভরা ভাষা। অয়ি প্রিয়া,
চুম্বন মাগিব যবে, ঈষৎ হাসিয়া
বাঁকায়ো না গ্রীবাখানি, ফিরায়ো না মুখ,
উজ্জ্বল রক্তিমবর্ণ সুধাপূর্ণ সুখ
রেখো ওষ্ঠাধরপুটে, ভক্ত ভৃঙ্গ তরে
সম্পূর্ণ চুম্বন এক, হাসি স্তরে স্তরে
সরস সুন্দর ;—নবস্ফুট পুষ্পসম
হেলায়ে বঙ্কিম গ্রীবা বৃন্ত নিরুপম
মুখখানি তুলে ধোরো ; আনন্দ-আভায়
বড়ো বড়ো দুটি চক্ষু পল্লব-প্রচ্ছায়
রেখো মোর মুখপানে প্রশান্ত বিশ্বাসে,
নিতান্ত নির্ভরে। যদি চোখে জল আসে
কাঁদিব দু-জনে ; যদি ললিত কপোলে
মৃদু হাসি ভাসি উঠে, বসি মোর কোলে,
বক্ষ বাঁধি বাহুপাশে, স্কন্ধে মুখ রাখি
হাসিয়ো নীরবে অর্ধ-নিমীলিত আঁখি।
যদি কথা পড়ে মনে তবে কলস্বরে
বলে যেয়ো কথা, তরল আনন্দভরে
নির্ঝরের মতো, অর্ধেক রজনী ধরি
কত না কাহিনী স্মৃতি কল্পনালহরী
মধুমাখা কণ্ঠের কাকলি। যদি গান
ভালো লাগে, গেয়ো গান। যদি মুগ্ধপ্রাণ
নিঃশব্দ নিস্তব্ধ শান্ত সম্মুখে চাহিয়া
বসিয়া থাকিতে চাও, তাই রব প্রিয়া।

হেরিব অদূরে পদ্মা, উচ্চতটতলে
শ্রান্ত রূপসীর মতো বিস্তীর্ণ অঞ্চলে
প্রসারিয়া তনুখানি, সায়াহ্ন-আলোকে
শুয়ে আছে ; অন্ধকার নেমে আসে চোখে
চোখের পাতার মতো ; সন্ধ্যাতারা ধীরে
সন্তর্পণে করে পদার্পণ, নদীতীরে
অরণ্য-শিয়রে ; যামিনী শয়ন তার
দেয় বিছাইয়া, একখানি অন্ধকার
অনন্ত ভুবনে। দোঁহে মোরা রব চাহি
অপার তিমিরে ; আর কোথা কিছু নাহি,
শুধু মোর করে তব করতলখানি,
শুধু অতি কাছাকাছি দুটি জনপ্রাণী
অসীম নির্জনে ; বিষণ্ণ বিচ্ছেদরাশি
চরাচরে আর-সব ফেলিয়াছে গ্রাসি—
শুধু এক প্রান্তে তার প্রলয়-মগন
বাকি আছে একখানি শঙ্কিত মিলন,
দুটি হাত, ত্রস্ত কপোতের মতো দুটি
বক্ষ দুরুদুরু, দুই প্রাণে আছে ফুটি
শুধু একখানি ভয়, একখানি আশা,
একখানি অশ্রুভরে নম্র ভালোবাসা।

আজিকে এমনি তবে কাটিবে যামিনী
আলস্য-বিলাসে। অয়ি নিরভিমানিনী,
অয়ি মোর জীবনের প্রথম প্রেয়সী,
মোর ভাগ্য-গগনের সৌন্দর্যের শশী,
মনে আছে কবে কোন্ ফুল্লযূথীবনে,
বহুবাল্যকালে, দেখা হত দুই জনে
আধো-চেনাশোনা ? তুমি এই পৃথিবীর
প্রতিবেশিনীর মেয়ে, ধরার অস্থির

এক বালকের সাথে কী খেলা খেলাতে
সখী, আসিতে হাসিয়া, তরুণ প্রভাতে
নবীন বালিকা-মূর্তি, শুভ্রবস্ত্র পরি
উষার কিরণধারে সদ্য স্নান করি
বিকচ কুসুমসম ফুল্ল মুখখানি
নিদ্রাভঙ্গে দেখা দিতে, নিয়ে যেতে টানি
উপবনে কুড়াতে শেফালি। বারে বারে
শৈশব-কর্তব্য হতে ভুলায়ে আমারে,
ফেলে দিয়ে পুঁথিপত্র, কেড়ে নিয়ে খড়ি,
দেখায়ে গোপন পথ দিতে মুক্ত করি
পাঠশালা-কারা হতে; কোথা গৃহকোণে
নিয়ে যেতে নির্জনেতে রহস্য-ভবনে;
জনশূন্য গৃহছাদে আকাশের তলে
কী করিতে খেলা, কী বিচিত্র কথা ব'লে
ভুলাতে আমারে, স্বপ্নসম চমৎকার
অর্থহীন, সত্য মিথ্যা তুমি জান তার।
দুটি কর্ণে দুলিত মুকুতা, দুটি করে
সোনার বলয়, দুটি কপোলের 'পরে
খেলিত অলক, দুটি স্বচ্ছ নেত্র হতে
কাঁপিত আলোক নির্মল নির্ঝর-স্রোতে
চূর্ণরশ্মিসম। দোঁহে দোঁহা ভালো করে
চিনিবার আগে নিশ্চিন্ত বিশ্বাসভরে
খেলাধুলা ছুটাছুটি দু-জনে সতত,
কথাবার্তা বেশবাস বিথান বিতত।

তার পরে এক দিন— কী জানি সে কবে—
জীবনের বনে, যৌবন-বসন্তে যবে
প্রথম মলয় বায়ু ফেলেছে নিশ্বাস,
মুকুলিয়া উঠিতেছে শত নব আশ,

সহসা চকিত হয়ে আপন সংগীতে
চমকিয়া হেরিলাম— খেলাক্ষেত্র হতে
কখন অন্তরলক্ষ্মী এসেছ অন্তরে,
আপনার অন্তঃপুরে গৌরবের ভরে
বসি আছ মহিষীর মতো। কে তোমারে
এনেছিল বরণ করিয়া। পুরদ্বারে
কে দিয়েছে হুলুধ্বনি। ভরিয়া অঞ্চল
কে করেছে বরিষন নব পুষ্পদল
তোমার আনম্র শিরে আনন্দে আদরে।
সুন্দর সাহানা রাগে বংশীর সুস্বরে
কী উৎসব হয়েছিল আমার জগতে,
যেদিন প্রথম তুমি পুষ্পফুল্ল পথে
লজ্জামুকুলিত মুখে রক্তিম অম্বরে
বধূ হয়ে প্রবেশিলে চিরদিনতরে
আমার অন্তর-গৃহে— যে গুপ্ত আলয়ে
অন্তর্যামী জেগে আছে সুখদুঃখ লয়ে,
যেখানে আমার যত লজ্জা আশা ভয়
সদা কম্পমান, পরশ নাহিকো সয়
এত সুকুমার। ছিলে খেলার সঙ্গিনী,
এখন হয়েছ মোর মর্মের গেহিনী,
জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কোথা সেই
অমূলক হাসি-অশ্রু, সে চাঞ্চল্য নেই,
সে বাহুল্য কথা। স্নিগ্ধ দৃষ্টি সুগম্ভীর
স্বচ্ছ নীলাম্বরসম ; হাসিখানি স্থির
অশ্রুশিশিরেতে ধৌত ; পরিপূর্ণ দেহ
মঞ্জরিত বল্লরীর মতো ; প্রীতিস্নেহ
গম্ভীর সংগীত-তানে উঠিছে ধ্বনিয়া
স্বর্ণবীণাতন্ত্রী হতে রনিয়া রনিয়া
অনন্ত বেদনা বহি। সে অবধি প্রিয়ে,
রয়েছি বিস্মিত হয়ে তোমারে চাহিয়ে

কোথাও না পাই সীমা। কোন্ বিশ্বপার
আছে তব জন্মভূমি। সংগীত তোমার
কত দূরে নিয়ে যাবে, কোন্ কল্পলোকে
আমারে করিবে বন্দী, গানের পুলকে
বিমুগ্ধ কুরঙ্গসম। এই যে বেদনা,
এর কোনো ভাষা আছে? এই যে বাসনা,
এর কোনো তৃপ্তি আছে? এই যে উদার
সমুদ্রের মাঝখানে হয়ে কর্ণধার
ভাসায়েছ সুন্দর তরণী, দশ দিশি
অস্ফুট কল্লোলধ্বনি চির দিবানিশি
কী কথা বলিছে কিছু নারি বুঝিবারে,
এর কোনো কূল আছে? সৌন্দর্য-পাথারে
যে বেদনা-বায়ুভরে ছুটে মন-তরী,
সে বাতাসে, কত বার মনে শঙ্কা করি
ছিন্ন হয়ে গেল বুঝি হৃদয়ের পাল;
অভয় আশ্বাসভরা নয়ন বিশাল
হেরিয়া ভরসা পাই; বিশ্বাস বিপুল
জাগে মনে— আছে এক মহা উপকূল
এই সৌন্দর্যের তটে, বাসনার তীরে
মোদের দোঁহার গৃহ।

হাসিতেছ ধীরে
চাহি মোর মুখে, ওগো রহস্যমধুরা।
কী বলিতে চাহ মোরে প্রণয়বিধুরা
সীমন্তিনী মোর, কী কথা বুঝাতে চাও।
কিছু ব'লে কাজ নাই— শুধু ঢেকে দাও
আমার সর্বাঙ্গমন তোমার অঞ্চলে,
সম্পূর্ণ হরণ করি লহ গো সবলে

আমার আমারে ; নগ্ন বক্ষে বক্ষ দিয়া
অন্তর-রহস্য তব শুনে নিই প্রিয়া।
তোমার হৃদয়কম্প অঙ্গুলির মতো
আমার হৃদয়তন্ত্রী করিবে প্রহত,
সংগীত-তরঙ্গধ্বনি উঠিবে গুঞ্জরি
সমস্ত জীবন ব্যাপি থরথর করি।
নাই বা বুঝিনু কিছু, নাই বা বলিনু,
নাই বা গাঁথিনু গান, নাই বা চলিনু
ছন্দোবদ্ধ পথে, সলজ্জ হৃদয়খানি
টানিয়া বাহিরে। শুধু ভুলে গিয়ে বাণী
কাঁপিব সংগীতভরে, নক্ষত্রের প্রায়
শিহরি জলিব শুধু কম্পিত শিখায়,
শুধু তরঙ্গের মতো ভাঙিয়া পড়িব
তোমার তরঙ্গপানে, বাঁচিব মরিব
শুধু, আর কিছু করিব না। দাও সেই
প্রকাণ্ড প্রবাহ, যাহে এক মুহূর্তেই
জীবন করিয়া পূর্ণ, কথা না বলিয়া
উন্মত্ত হইয়া যাই উদ্দাম চলিয়া।

মানসীরূপিণী ওগো, বাসনাবাসিনী,
আলোকবসনা ওগো, নীরবভাষিণী,
পরজন্মে তুমি কি গো মূর্তিমতী হয়ে
জন্মিবে মানব-গৃহে নারীরূপ লয়ে
অনিন্দ্যসুন্দরী ? এখন ভাসিছ তুমি
অনন্তের মাঝে ; স্বর্গ হতে মর্ত্যভূমি
করিছ বিহার ; সন্ধ্যার কনকবর্ণে
রাঙিছ অঞ্চল ; উষার গলিত স্বর্ণে
গড়িছ মেখলা ; পূর্ণ তটিনীর জলে
করিছ বিস্তার, তলতল ছলছলে

ললিত যৌবনখানি, বসন্ত-বাতাসে
চঞ্চল বাসনাব্যথা সুগন্ধ নিশ্বাসে
করিছ প্রকাশ ; নিষুপ্ত পূর্ণিমা রাতে
নির্জন গগনে, একাকিনী ক্লান্ত হাতে
বিছাইছ দুগ্ধশুভ্র বিরহ-শয়ন ;
শরৎ-প্রত্যুষে উঠি করিছ চয়ন
শেফালি, গাঁথিতে মালা, ভুলে গিয়ে শেষে,
তরুতলে ফেলে দিয়ে, আলুলিত কেশে
গভীর অরণ্যছায়ে উদাসিনী হয়ে
বসে থাক ; ঝিকিমিকি আলোছায়া লয়ে
কম্পিত অঙ্গুলি দিয়ে বিকালবেলায়
বসন বয়ন কর বকুলতলায় ;
অবসন্ন দিবালোকে কোথা হতে ধীরে
ঘনপল্লবিত কুঞ্জে সরোবর-তীরে
করুণ কপোতকণ্ঠে গাও মুলতান ;
কখন অজ্ঞাতে আসি ছুঁয়ে যাও প্রাণ
সকৌতুকে ; করি দাও হৃদয় বিকল,
অঞ্চল ধরিতে গেলে পালাও চঞ্চল
কলকণ্ঠে হাসি', অসীম আকাঙ্ক্ষারাশি
জাগাইয়া প্রাণে, দ্রুতপদে উপহাসি'
মিলাইয়া যাও নভোনীলিমার মাঝে।
কখনো মগন হয়ে আছি যবে কাজে
স্খলিতবসন তব শুভ্র রূপখানি
নগ্ন বিদ্যুতের আলো নয়নেতে হানি
চকিতে চমকি চলে যায়। জানালায়
একেলা বসিয়ে যবে আঁধার সন্ধ্যায়,—
মুখে হাত দিয়ে, মাতৃহীন বালকের
মতো বহুক্ষণ কাঁদি স্নেহ-আলোকের
তরে ; ইচ্ছা করি, নিশার আঁধারস্রোতে
মুছে ফেলে দিয়ে যায় সৃষ্টিপট হতে

এই ক্ষীণ অর্থহীন অস্তিত্বের রেখা,
তখন করুণাময়ী দাও তুমি দেখা
তারকা-আলোক-জ্বালা স্তব্ধ রজনীর
প্রান্ত হতে নিঃশব্দে আসিয়া ; অশ্রুনীর
অঞ্চলে মুছায়ে দাও ; চাও মুখপানে
স্নেহময় প্রশ্নভরা করুণ নয়ানে ;
নয়ন চুম্বন কর ; স্নিগ্ধ হস্তখানি
ললাটে বুলায়ে দাও ; না কহিয়া বাণী,
সান্ত্বনা ভরিয়া প্রাণে, কবিরে তোমার
ঘুম পাড়াইয়া দিয়া কখন্ আবার
চলে যাও নিঃশব্দ চরণে ।

সেই তুমি
মূর্তিতে দিবে কি ধরা । এই মর্ত্যভূমি
পরশ করিবে রাঙা চরণের তলে ?
অন্তরে বাহিরে বিশ্বে শূন্যে জলে স্থলে
সর্ব ঠাঁই হতে সর্বময়ী আপনারে
করিয়া হরণ— ধরণীর একধারে
ধরিবে কি একখানি মধুর মুরতি ।
নদী হতে লতা হতে আনি তব গতি
অঙ্গে অঙ্গে নানা ভঙ্গে দিবে হিল্লোলিয়া
বাহুতে বাঁকিয়া পড়ি গ্রীবায় হেলিয়া
ভাবের বিকাশভরে ? কী নীল বসন
পরিবে সুন্দরী তুমি । কেমন কঙ্কণ
ধরিবে দুখানি হাতে । কবরী কেমনে
বাঁধিবে, নিপুণ বেণী বিনায়ে যতনে ?
কচি কেশগুলি পড়ি শুভ্র গ্রীবা'পরে
শিরীষ কুসুমসম সমীরণভরে

কাঁপিবে কেমন ? শ্রাবণে দিগন্তপারে
যে গভীর স্নিগ্ধ দৃষ্টি ঘন মেঘভারে
দেখা দেয় নব নীল অতি সুকুমার,
সে দৃষ্টি না জানি ধরে কেমন আকার
নারীচক্ষে। কী সঘন পল্লবের ছায়,
কী সুদীর্ঘ কী নিবিড় তিমির-আভায়
মুগ্ধ অন্তরের মাঝে ঘনাইয়া আনে
সুখবিভাবরী। অধর কী সুধাদানে
রহিবে উন্মুখ, পরিপূর্ণ বাণীভরে
নিশ্চল নীরব। লাবণ্যের থরে থরে
অঙ্গখানি কী করিয়া মুকুলি বিকশি
অনিবার সৌন্দর্যেতে উঠিবে উচ্ছ্বসি
নিঃসহ যৌবনে।

জানি, আমি জানি, সখী,
যদি আমাদের দোঁহে হয় চোখোচোখি
সেই পরজন্ম-পথে— দাঁড়াব থমকি,
নিদ্রিত অতীত কাঁপি উঠিবে চমকি
লভিয়া চেতনা। জানি মনে হবে মম
চিরজীবনের মোর ধ্রুবতারাসম
চিরপরিচয়-ভরা ওই কালো চোখ।
আমার নয়ন হতে লইয়া আলোক,
আমার অন্তর হতে লইয়া বাসনা
আমার গোপন প্রেম করেছে রচনা
এই মুখখানি। তুমিও কি মনে মনে
চিনিবে আমারে। আমাদের দুই জনে
হবে কি মিলন। দুটি বাহু দিয়ে বালা
কখনো কি এই কণ্ঠে পরাইবে মালা

বসন্তের ফুলে। কখনো কি বক্ষ ভরি
নিবিড় বন্ধনে, তোমারে, হৃদয়েশ্বরী,
পারিব বাঁধিতে। পরশে পরশে দোঁহে
করি বিনিময় মরিব মধুর মোহে
দেহের দুয়ারে? জীবনের প্রতিদিন
তোমার আলোক পাবে বিচ্ছেদবিহীন—
জীবনের প্রতিরাত্রি হবে সুমধুর
মাধুর্যে তোমার! বাজিবে তোমার সুর
সর্ব দেহে মনে? জীবনের প্রতি সুখে
পড়িবে তোমার শুভ্র হাসি, প্রতি দুখে
পড়িবে তোমার অশ্রুজল, প্রতি কাজে
রবে তব শুভহস্ত দুটি। গৃহমাঝে
জাগায়ে রাখিবে সদা সুমঙ্গল জ্যোতি।
এ কি শুধু বাসনার বিফল মিনতি,
কল্পনার ছল। কার এত দিব্যজ্ঞান,
কে বলিতে পারে মোরে নিশ্চয় প্রমাণ—
পূর্বজন্মে নারীরূপে ছিলে কি না তুমি
আমারি জীবন-বনে সৌন্দর্যে কুসুমি
প্রণয়ে বিকশি। মিলনে আছিলে বাঁধা
শুধু একঠাঁই, বিরহে টুটিয়া বাধা
আজি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে গেছ, প্রিয়ে,
তোমারে দেখিতে পাই সর্বত্র চাহিয়ে।
ধূপ দগ্ধ হয়ে গেছে, গন্ধবাষ্প তার
পূর্ণ করি ফেলিয়াছে আজি চারিধার।
গৃহের বনিতা ছিলে— টুটিয়া আলয়
বিশ্বের কবিতারূপে হয়েছ উদয়,—
তবু কোন্ মায়াডোরে চির-সোহাগিনী
হৃদয়ে দিয়েছ ধরা, বিচিত্র রাগিণী
জাগায়ে তুলিছ প্রাণে চিরস্মৃতিময়।
তাই তো এখনো মনে আশা জেগে রয়

আবার তোমারে পাব পরশ-বন্ধনে।
এমনি সমস্ত বিশ্ব প্রলয়ে সৃজনে
জ্বলিছে নিবিছে, যেন খদ্যোতের জ্যোতি—
কখনো বা ভাবময়, কখনো মুরতি।

রজনী গভীর হল, দীপ নিবে আসে;
পদ্মার সুদূর পারে পশ্চিম আকাশে
কখন যে সায়াহ্নের শেষ স্বর্ণরেখা
মিলাইয়া গেছে; সপ্তর্ষি দিয়েছে দেখা
তিমির-গগনে; শেষ ঘট পূর্ণ করে
কখন বালিকা-বধূ চলে গেছে ঘরে;
হেরি' কৃষ্ণপক্ষ রাত্রি একাদশী তিথি
দীর্ঘপথ শূন্যক্ষেত্র, হয়েছে অতিথি
গ্রামে গৃহস্থের ঘরে পান্থ পরবাসী;
কখন গিয়েছে থেমে কলরবরাশি
মাঠপারে কৃষিপল্লী হতে; নদীতীরে
বৃদ্ধ কৃষাণের জীর্ণ নিভৃত কুটিরে
কখন জ্বলিয়াছিল সন্ধ্যাদীপখানি,
কখন নিবিয়া গেছে— কিছুই না জানি।

কী কথা বলিতেছিনু, কী জানি, প্রেয়সী,
অর্ধ-অচেতনভাবে মনোমাঝে পশি
স্বপ্নমুগ্ধ-মতো। কেহ শুনেছিলে সে কি,
কিছু বুঝেছিলে প্রিয়ে, কোথাও আছে কি
কোনো অর্থ তার। সব কথা গেছি ভুলে,
শুধু এই নিদ্রাপূর্ণ নিশীথের কূলে
অন্তরের অন্তহীন অশ্রু-পারাবার
উদ্বেলিয়া উঠিয়াছে হৃদয়ে আমার
গম্ভীর নিস্বনে।

এস সুপ্তি, এস শান্তি,
এস প্রিয়ে, মুগ্ধ মৌন সকরুণ কান্তি,
বক্ষে মোরে লহ টানি,— শোয়াও যতনে
মরণ-সুস্নিগ্ধ শুভ্র বিস্মৃতি শয়নে।

শিলাইদহ, বোট
৪ পৌষ, ১২৯৯

অনাদৃত

তখন তরুণ রবি প্রভাতকালে
আনিছে উষার পূজা সোনার থালে।
সীমাহীন নীল জল
করিতেছে থলথল,
রাঙা রেখা জলজল
কিরণমালে।
তখন উঠিছে রবি গগনভালে।

গাঁথিতেছিলাম জাল বসিয়া তীরে।
বারেক অতলপানে চাহিনু ধীরে;
শুনিনু কাহার বাণী,
পরান লইল টানি,
যতনে সে জালখানি
তুলিয়া শিরে
ঘুরায়ে ফেলিয়া দিনু সুদূর নীরে।

নাহি জানি কত কী যে উঠিল জালে।
কোনোটা হাসির মতো কিরণ ঢালে,
কোনোটা বা টলটল
কঠিন নয়নজল,
কোনোটা শরম-ছল
বধূর গালে,
সেদিন সাগরতীরে প্রভাতকালে।

বেলা বেড়ে ওঠে, রবি ছাড়ি পুরবে
গগনের মাঝখানে ওঠে গরবে।
ক্ষুধাতৃষ্ণা সব ভুলি
জাল ফেলে টেনে তুলি,
উঠিল গোধূলি-ধূলি
ধূসর নভে।
গাভীগণ গৃহে ধায় হরষ-রবে।

লয়ে দিবসের ভার ফিরিনু ঘরে,
তখন উঠিছে চাঁদ আকাশ 'পরে।
গ্রামপথে নাহি লোক,
পড়ে আছে ছায়ালোক,
মুদে আসে দুটি চোখ
স্বপনভরে ;
ডাকিছে বিরহী পাখি কাতর স্বরে।

সে তখন গৃহকাজ সমাধা করি
কাননে বসিয়া ছিল মালাটি পরি।
কুসুম একটি দুটি
তরু হতে পড়ে টুটি,
সে করিছে কুটিকুটি
নখেতে ধরি ;
আলসে আপন মনে সময় হরি'।

বারেক আগিয়ে যাই বারেক পিছু।
কাছে গিয়ে দাঁড়ালেম, নয়ন নিচু।
যা ছিল চরণে রেখে
ভূমিতল দিনু ঢেকে ;

সে কহিল দেখে দেখে,
"চিনিনে কিছু।"
শুনি রহিলাম শির করিয়া নিচু।

ভাবিলাম, সারাদিন সারাটি বেলা
বসে বসে করিয়াছি কী ছেলেখেলা।
না জানি কী মোহে ভুলে
গেনু অকূলের কূলে,
ঝাঁপ দিনু কুতূহলে,
আনিনু মেলা
অজানা সাগর হতে অজানা ঢেলা।

বুঝি নাই, খুঁজি নাই হাটের মাঝে,
এমন হেলার ধন দেওয়া কি সাজে।
কোনো দুখ নাহি যার,
কোনো তৃষা বাসনার,
এ-সব লাগিবে তার
কিসের কাজে।
কুড়ায়ে লইনু পুন মনের লাজে।

সারাটি রজনী বসি দুয়ার-দেশে
একে একে ফেলে দিনু পথের শেষে।
সুখহীন ধনহীন
চলে গেনু উদাসীন,
প্রভাতে পরের দিন
পথিকে এসে
সব তুলে নিয়ে গেল আপন দেশে।

তালদণ্ডা খাল
পাণ্ডুয়া হইতে কটকের পথে
২২ ফাল্গুন, ১২৯৯

নদীপথে

গগন ঢাকা ঘন মেঘে,
পবন বহে খর বেগে।
অশনি ঝনঝন
ধ্বনিছে ঘন ঘন,
নদীতে ঢেউ উঠে জেগে,
পবন বহে খর বেগে।

তীরেতে তরুরাজি দোলে
আকুল মর্মর-রোলে।
চিকুর চিকিমিকে
চকিয়া দিকে দিকে
তিমির চিরি যায় চলে।
তীরেতে তরুরাজি দোলে।

ঝরিছে বাদলের ধারা
বিরাম-বিশ্রামহারা।
বারেক থেমে আসে,
দ্বিগুণ উচ্ছ্বাসে
আবার পাগলের পারা
ঝরিছে বাদলের ধারা।

মেঘেতে পথরেখা লীন,
প্রহর তাই গতিহীন।
গগনপানে চাই,
জানিতে নাহি পাই
গেছে কি নাহি গেছে দিন ;
প্রহর তাই গতিহীন।

তীরেতে বাঁধিয়াছি তরী,
রয়েছি সারাদিন ধরি।
এখনো পথ নাকি
অনেক আছে বাকি,
আসিছে ঘোর বিভাবরী।
তীরেতে বাঁধিয়াছি তরী।

বসিয়া তরণীর কোণে
একেলা ভাবি মনে মনে,—
মেঝেতে শেজ পাতি
সে আজি জাগে রাতি
নিদ্রা নাহি দু-নয়নে।
বসিয়া ভাবি মনে মনে।

মেঘের ডাক শুনে কাঁপে,
হৃদয় দুই হাতে চাপে।
আকাশপানে চায়
ভরসা নাহি পায়,
তরাসে সারা নিশি যাপে,
মেঘের ডাক শুনে কাঁপে।

কভু বা বায়ুবেগভরে
দুয়ার ঝনঝনি পড়ে।
প্রদীপ নিবে আসে,
ছায়াটি কাঁপে ত্রাসে,
নয়নে আঁখিজল ঝরে,
বক্ষ কাঁপে থরথরে।

চকিত আঁখি দুটি তার
মনে আসিছে বার বার।
বাহিরে মহা ঝড়,
বজ্র কড়মড়,
আকাশ করে হাহাকার।
মনে পড়িছে আঁখি তার।

গগন ঢাকা ঘন মেঘে,
পবন বহে খর বেগে।
অশনি ঝনঝন
ধ্বনিছে ঘনঘন,
নদীতে ঢেউ উঠে জেগে।
পবন বহে আজি বেগে।

খালপথে। ঝড়বৃষ্টি। অপরাহ্ণ
২৩ ফাল্গুন, ১২৯৯

দেউল

রচিয়াছিনু দেউল একখানি
অনেক দিনে অনেক দুখ মানি
রাখিনি তার জানালা দ্বার,
সকল দিক অন্ধকার,
ভূধর হতে পাষাণভার
যতনে বহি আনি
রচিয়াছিনু দেউল একখানি।

দেবতাটিরে বসায়ে মাঝখানে
ছিলাম চেয়ে তাহারি মুখপানে।

বাহিরে ফেলি এ ত্রিভুবন
ভুলিয়া গিয়া বিশ্বজন
ধেয়ান তারি অনুক্ষণ
করেছি একপ্রাণে,
দেবতাটিরে বসায়ে মাঝখানে।

যাপন করি অন্তহীন রাতি
জালায়ে শত গন্ধময় বাতি।
কনকমণি-পাত্রপুটে,
সুরভি ধূপ-ধূম্র উঠে,
গুরু অগুরু-গন্ধ ছুটে,
পরান উঠে মাতি।
যাপন করি অন্তহীন রাতি।

নিদ্রাহীন বসিয়া এক চিতে
চিত্র কত এঁকেছি চারিভিতে।
স্বপ্নসম চমৎকার
কোথাও নাহি উপমা তার,
কত বরন, কত আকার
কে পারে বরনিতে,
চিত্র যত এঁকেছি চারিভিতে।

স্তম্ভগুলি জড়ায়ে শত পাকে
নাগবালিকা ফণা তুলিয়া থাকে।
উপরে ঘিরি চারিটি ধার
দৈত্যগুলি বিকটাকার,
পাষাণময় ছাদের ভার
মাথায় ধরি রাখে।
নাগবালিকা ফণা তুলিয়া থাকে।

সৃষ্টিছাড়া সৃজন কত-মতো।
পক্ষীরাজ উড়িছে শত শত।
ফুলের মতো লতার মাঝে
নারীর মুখ বিকশি রাজে,
প্রণয়ভরা বিনয়ে লাজে
নয়ন করি নত,
সৃষ্টিছাড়া সৃজন কত-মতো।

ধ্বনিত এই ধরার মাঝখানে
শুধু এ গৃহ শব্দ নাহি জানে।
ব্যাঘ্রাজিন আসন পাতি
বিবিধরূপ ছন্দ গাঁথি
মন্ত্র পড়ি দিবস-রাতি
গুঞ্জরিত তানে,
শব্দহীন গৃহের মাঝখানে।

এমন করে গিয়েছে কত দিন,
জানিনে কিছু আছি আপন-লীন
চিত্ত মোর নিমেষহত
ঊর্ধ্বমুখী শিখার মতো,
শরীরখানি মূর্ছাহত
ভাবের তাপে ক্ষীণ।
এমন করে গিয়েছে কত দিন।

একদা এক বিষম ঘোর স্বরে
বজ্র আসি পড়িল মোর ঘরে।
বেদনা এক তীক্ষ্ণতম
পশিল গিয়ে হৃদয়ে মম,
অগ্নিময় সর্পসম
কাটিল অন্তরে।
বজ্র আসি পড়িল মোর ঘরে।

পাষাণরাশি সহসা গেল টুটি,
গৃহের মাঝে দিবস উঠে ফুটি।
নীরব ধ্যান করিয়া চুর
কঠিন বাঁধ করিয়া দূর
সংসারের অশেষ সুর
ভিতরে এল ছুটি,
পাষাণরাশি সহসা গেল টুটি।

দেবতাপানে চাহিনু একবার,
আলোক আসি পড়েছে মুখে তাঁর।
নূতন এক মহিমারাশি
ললাটে তাঁর উঠেছে ভাসি,
জাগিছে এক প্রসাদ-হাসি
অধর-চারিধার।
দেবতাপানে চাহিনু একবার।

শরমে দীপ মলিন একেবারে
লুকাতে চাহে চির-অন্ধকারে।
শিকলে বাঁধা স্বপ্নমতো
ভিত্তি-আঁকা চিত্র যত
আলোক দেখি লজ্জাহত
পালাতে নাহি পারে,
শরমে দীপ মলিন একেবারে।

যে গান আমি নারিনু রচিবারে
সে গান আজি উঠিল চারিধারে।
আমার দীপ জ্বালিল রবি,
প্রকৃতি আসি আঁকিল ছবি,
গাঁথিল গান শতেক কবি
কতই ছন্দ-হারে,
কী গান আজি উঠিল চারিধারে।

দেউলে মোর দুয়ার গেল খুলি,
ভিতরে আর বাহিরে কোলাকুলি,
দেবের কর-পরশ লাগি
দেবতা মোর উঠিল জাগি,
বন্দী নিশি গেল সে ভাগি
আঁধার পাখা তুলি।
দেউলে মোর দুয়ার গেল খুলি।

তালদণ্ডা খাল
বালিয়া হইতে কটক পথে
২৩ ফাল্গুন, ১২৯৯

বিশ্বনৃত্য

বিপুল গভীর মধুর মন্দ্রে
কে বাজাবে সেই বাজনা
উঠিবে চিত্ত করিয়া নৃত্য
বিস্মৃত হবে আপনা।
টুটিবে বন্ধ, মহা আনন্দ,
নব সংগীতে নূতন ছন্দ,
হৃদয়-সাগরে পূর্ণচন্দ্র
জাগাবে নবীন বাসনা।

সঘন অশ্রুমগন হাস্য
জাগিবে তাহার বদনে।
প্রভাত-অরুণ-কিরণ-রশ্মি
ফুটিবে তাহার নয়নে।
দক্ষিণ করে ধরিয়া যন্ত্র
ঝনন রণন স্বর্ণ তন্ত্র,
কাঁপিয়া উঠিবে মোহন মন্ত্র
নির্মল নীল গগনে।

হাহা করি সবে উচ্ছল রবে
চঞ্চল কলকলিয়া,
চৌদিক হতে উন্মাদ স্রোতে
আসিবে তূর্ণ চলিয়া।
ছুটিবে সঙ্গে মহা তরঙ্গে
ঘিরিয়া তাঁহারে হরষ-রঙ্গে
বিঘ্নতরণ চরণভঙ্গে
পথকণ্টক দলিয়া।

দ্যুলোক চাহিয়া সে লোকসিন্ধু
বন্ধনপাশ নাশিবে,
অসীম পুলকে বিশ্ব-ভূলোকে
অঙ্কে তুলিয়া হাসিবে।
ঊর্মিলীলায় সূর্যকিরণ
ঠিকরি উঠিবে হিরণবরন
বিঘ্ন-বিপদ দুঃখ-মরণ
ফেনের মতন ভাসিবে।

ওগো কে বাজায়— বুঝি শোনা যায়—
মহারহস্যে রসিয়া
চিরকাল ধরে গম্ভীর স্বরে
অম্বর ’পরে বসিয়া।
গ্রহমণ্ডল হয়েছে পাগল,
ফিরিছে নাচিয়া চিরচঞ্চল,
গগনে গগনে জ্যোতি-অঞ্চল
পড়িছে খসিয়া খসিয়া।

ওগো কে বাজায়— কে শুনিতে পায়—
না জানি কী মহা রাগিণী।

দুলিয়া ফুলিয়া নাচিছে সিন্ধু
সহস্রশির নাগিনী।
ঘন অরণ্য আনন্দে দুলে,
অনন্ত নভে শত বাহু তুলে,
কী গাহিতে গিয়ে কথা যায় ভুলে,
মর্মরে দিনযামিনী।

নির্ঝর ঝরে উচ্ছ্বাসভরে
বন্ধুর শিলাসরণে।
ছন্দে ছন্দে সুন্দর গতি
পাষাণহৃদয়-হরণে।
কোমল কণ্ঠে কুল্ কুলু স্বর,
ফুটে অবিরল তরল মধুর,
সদাশিঞ্জিত মানিকনূপুর
বাঁধা চঞ্চল চরণে।

নাচে ছয় ঋতু না মানে বিরাম,
বাহুতে বাহুতে ধরিয়া,
শ্যামল স্বর্ণ বিবিধ বর্ণ
নব নব বাস পরিয়া।
চরণ ফেলিতে কত বনফুল
ফুটে ফুটে টুটে হইয়া আকুল,
উঠে ধরণীর হৃদয় বিপুল
হাসি-ক্রন্দনে ভরিয়া।

পশু-বিহঙ্গ কীটপতঙ্গ
জীবনের ধারা ছুটিছে।
কী মহা খেলায় মরণ-বেলায়
তরঙ্গ তার টুটিছে।

কোনোখানে আলো কোনোখানে ছায়া,
জেগে জেগে ওঠে নব নব কায়া,
চেতনাপূর্ণ অদ্ভুত মায়া
বুদ্বুদসম ফুটিছে।

ওই কে বাজায় দিবস-নিশায়
বসি অন্তর-আসনে।
কালের যন্ত্রে বিচিত্র সুর,
কেহ শোনে কেহ না শোনে।
অর্থ কী তার ভাবিয়া না পাই,
কত গুণী জ্ঞানী চিন্তিছে তাই,
মহান মানব-মানস সদাই
উঠে পড়ে তারি শাসনে।

শুধু হেথা কেন আনন্দ নাই,
কেন আছে সবে নীরবে।
তারকা না দেখি পশ্চিমাকাশে,
প্রভাত না দেখি পুরবে।
শুধু চারিদিকে প্রাচীন পাষাণ
জগৎ-ব্যাপ্ত সমাধি-সমান
গ্রাসিয়া রেখেছে অযুত পরান,
রয়েছে অটল গরবে।

সংসারস্রোত জাহ্নবীসম
বহু দূরে গেছে সরিয়া।
এ শুধু উষর বালুকাধূসর
মরুরূপে আছে মরিয়া।
নাহি কোনো গতি, নাহি কোনো গান,
নাহি কোনো কাজ, নাহি কোনো প্রাণ,
বসে আছে এক মহানির্বাণ,
আঁধার-মুকুট পরিয়া।

হৃদয় আমার ক্রন্দন করে
মানব-হৃদয়ে মিশিতে।
নিখিলের সাথে মহা রাজপথে
চলিতে দিবস-নিশীথে।
আজন্মকাল পড়ে আছি মৃত,
জড়তার মাঝে হয়ে পরাজিত,
একটি বিন্দু জীবন-অমৃত
কে গো দিবে এই তৃষিতে।

জগৎ-মাতানো সংগীত-তানে
কে দিবে এদের নাচায়ে।
জগতের প্রাণ করাইয়া পান
কে দিবে এদের বাঁচায়ে।
ছিঁড়িয়া ফেলিবে জাতিজালপাশ,
মুক্ত হৃদয়ে লাগিবে বাতাস,
ঘুচায়ে ফেলিয়া মিথ্যা তরাস
ভাঙিবে জীর্ণ খাঁচা এ।

বিপুল গভীর মধুর মন্দ্রে
বাজুক বিশ্ববাজনা।
উঠুক চিত্ত করিয়া নৃত্য
বিস্মৃত হয়ে আপনা।
টুটুক বন্ধ, মহা আনন্দ,
নব সংগীতে নূতন ছন্দ,
হৃদয়-সাগরে পূর্ণচন্দ্র
জাগাক নবীন বাসনা।

বৈতরণী, জাহাজ "উড়িয়া"
কটক হইতে কলিকাতা পথে
২৬ ফাল্গুন, ১২৯৯

দুর্বোধ

তুমি মোরে পার না বুঝিতে ?
প্রশান্ত বিষাদভরে
দুটি আঁখি প্রশ্ন ক'রে
অর্থ মোর চাহিছে খুঁজিতে,
চন্দ্রমা যেমন ভাবে স্থির নত মুখে
চেয়ে দেখে সমুদ্রের বুকে।

কিছু আমি করিনি গোপন।
যাহা আছে, সব আছে
তোমার আঁখির কাছে
প্রসারিত অবারিত মন।
দিয়েছি সমস্ত মোর করিতে ধারণা,
তাই মোরে বুঝিতে পার না ?

এ যদি হইত শুধু মণি,
শত খণ্ড করি তারে
সযত্নে বিবিধাকারে
একটি একটি করি গনি
একখানি সূত্রে গাঁথি একখানি হার
পরাতেম গলায় তোমার।

এ যদি হইত শুধু ফুল,
সুগোল সুন্দর ছোটো,
উষালোকে ফোটো-ফোটো,
বসন্তের পবনে দোদুল—
বৃন্ত হতে সযতনে আনিতাম তুলে—
পরায়ে দিতেম কালো চুলে।

এ যে সখী, সমস্ত হৃদয় ।
কোথা জল, কোথা কূল,
দিক্‌ হয়ে যায় ভুল,
অন্তহীন রহস্য-নিলয় ।
এ রাজ্যের আদি অন্ত নাহি জান রানী,
এ তবু তোমার রাজধানী ।

কী তোমারে চাহি বুঝাইতে ।
গভীর হৃদয়মাঝে
নাহি জানি কী যে বাজে
নিশিদিন নীরব সংগীতে—
শব্দহীন স্তব্ধতায় ব্যাপিয়া গগন
রজনীর ধ্বনির মতন ।

এ যদি হইত শুধু সুখ,
কেবল একটি হাসি
অধরের প্রান্তে আসি
আনন্দ করিত জাগরূক ।
মুহূর্তে বুঝিয়া নিতে হৃদয়-বারতা,
বলিতে হত না কোনো কথা ।

এ যদি হইত শুধু দুখ,
দুটি বিন্দু অশ্রুজল
দুই চক্ষে ছলছল,
বিষণ্ণ অধর ম্লান মুখ—
প্রত্যক্ষ দেখিতে পেতে অন্তরের ব্যথা,
নীরবে প্রকাশ হত কথা ।

এ যে সখী, হৃদয়ের প্রেম।
সুখদুঃখবেদনার
আদি অন্ত নাহি যার—
চিরদৈন্য, চিরপূর্ণ হেম।
নব নব ব্যাকুলতা জাগে দিবারাতে
তাই আমি না পারি বুঝাতে।

নাই বা বুঝিলে তুমি মোরে।
চিরকাল চোখে চোখে
নূতন নূতনালোকে
পাঠ করো রাত্রিদিন ধরে।
বুঝা যায় আধ প্রেম, আধখানা মন,
সমস্ত কে বুঝেছে কখন।

পদ্মায়, "মিনো" জাহাজ
রাজসাহী যাইবার পথে
১১ চৈত্র, ১২৯৯

ঝুলন

আমি পরানের সাথে খেলিব আজিকে
মরণ-খেলা
নিশীথবেলা।
সঘন বরষা, গগন আঁধার,
হেরো বারিধারে কাঁদে চারিধার,
ভীষণ রঙ্গে ভবতরঙ্গে
ভাসাই ভেলা;
বাহির হয়েছি স্বপ্নশয়ন
করিয়া হেলা,
রাত্রিবেলা।

ওগো পবনে গগনে সাগরে আজিকে
কী কল্লোল,
দে দোল্ দোল্।
পশ্চাৎ হতে হাহা ক'রে হাসি'
মত্ত ঝটিকা ঠেলা দেয় আসি,
যেন এ লক্ষ যক্ষশিশুর
অট্টরোল।
আকাশে পাতালে পাগলে মাতালে
হট্টগোল।
দে দোল্ দোল্।

আজি জাগিয়া উঠিয়া পরান আমার
বসিয়া আছে
বুকের কাছে।
থাকিয়া থাকিয়া উঠিছে কাঁপিয়া,
ধরিছে আমার বক্ষ চাপিয়া,
নিঠুর নিবিড় বন্ধনসুখে
হৃদয় নাচে,
ত্রাসে উল্লাসে পরান আমার
ব্যাকুলিয়াছে
বুকের কাছে।

হায়, এতকাল আমি রেখেছিনু তারে
যতনভরে
শয়ন 'পরে।
ব্যথা পাছে লাগে, দুখ পাছে জাগে
নিশিদিন তাই বহু অনুরাগে

বাসর-শয়ন করেছি রচন
কুসুম-থরে,
দুয়ার রুধিয়া রেখেছিনু তারে
গোপন ঘরে
যতনভরে।

কত সোহাগ করেছি চুম্বন করি
নয়নপাতে
স্নেহের সাথে।
শুনায়েছি তারে মাথা রাখি পাশে
কত প্রিয় নাম মৃদু মধুভাষে,
গুঞ্জরতান করিয়াছি গান
জ্যোৎস্না-রাতে,
যা-কিছু মধুর দিয়েছিনু তার
দুখানি হাতে
স্নেহের সাথে।

শেষে সুখের শয়নে শ্রান্ত পরান
আলস-রসে,
আবেশবশে।
পরশ করিলে জাগে না সে আর
কুসুমের হার লাগে গুরুভার,
ঘুমে জাগরণে মিশি একাকার
নিশি-দিবসে;
বেদনাবিহীন অসাড় বিরাগ
মরমে পশে
আবেশবশে।

ঢালি' মধুরে মধুর বধূরে আমার
হারাই বুঝি
পাইনে খুঁজি।

বাসরের দীপ নিবে নিবে আসে,
ব্যাকুল নয়নে হেরি চারিপাশে,
শুধু রাশি রাশি শুষ্ক কুসুম
হয়েছে পুঁজি।
অতল স্বপ্ন-সাগরে ডুবিয়া
মরি যে যুঝি
কাহারে খুঁজি।

তাই ভেবেছি আজিকে খেলিতে হইবে
নূতন খেলা
রাত্রিবেলা।
মরণদোলায় ধরি রশিগাছি
বসিব দু-জনে বড়ো কাছাকাছি,
ঝঞ্ঝা আসিয়া অট্ট হাসিয়া
মারিবে ঠেলা,
আমাতে প্রাণেতে খেলিব দু-জনে
ঝুলন-খেলা
নিশীথবেলা।

দে দোল্ দোল্।
দে দোল্ দোল্।
এ মহাসাগরে তুফান তোল্।
বধূরে আমার পেয়েছি আবার
ভরেছে কোল।
প্রিয়ারে আমার তুলেছে জাগায়ে
প্রলয়রোল।
বক্ষশোণিতে উঠেছে আবার
কী হিল্লোল,
ভিতরে বাহিরে জেগেছে আমার
কী কল্লোল।

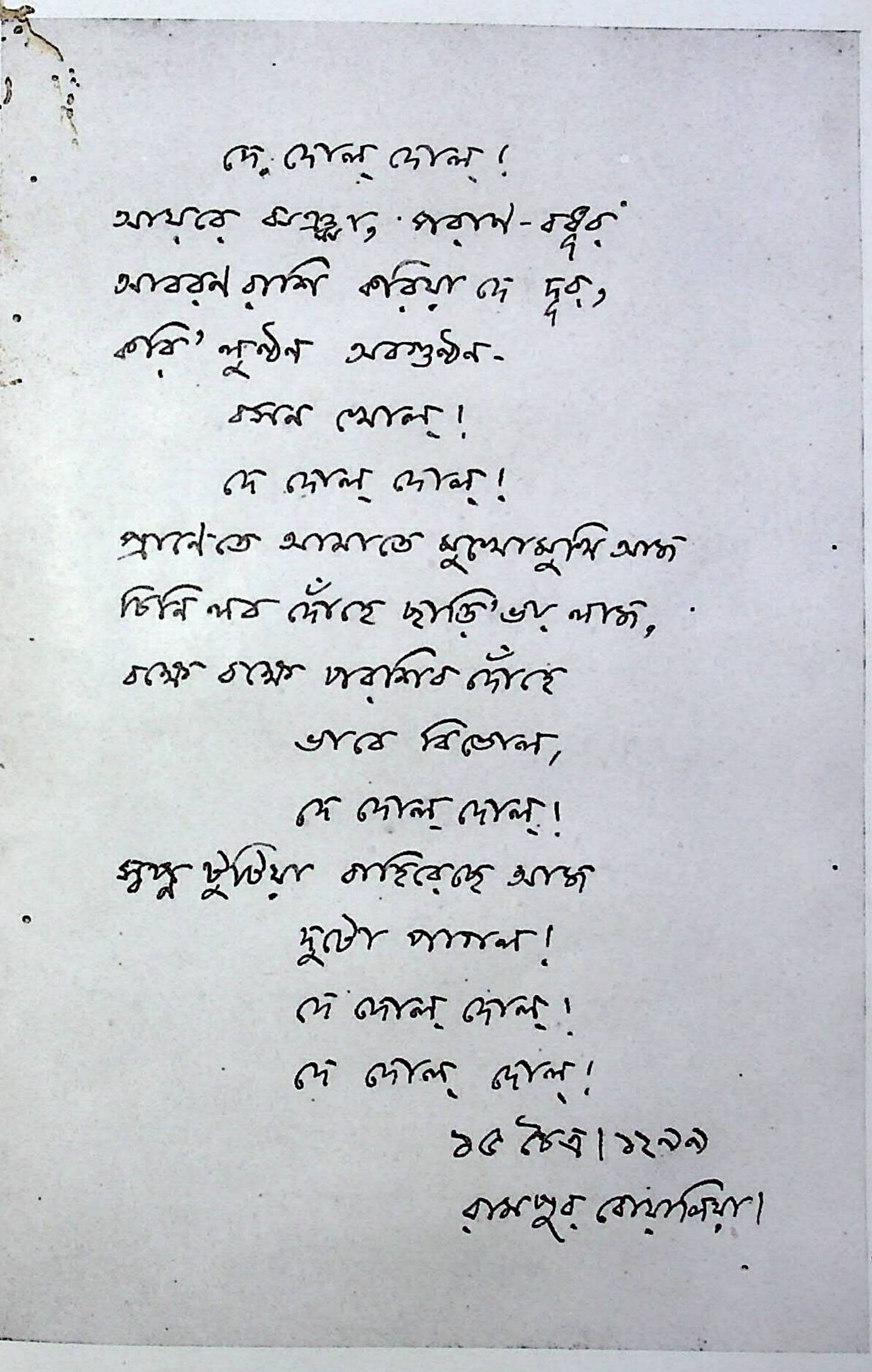

দে দোল্ দোল্!
আয়রে ঝঞ্ঝা, পরাণ-বধূর
আবরণরাশি করিয়া দে দূর,
করি' লুণ্ঠন অবগুণ্ঠন-
বসন খোল্!
দে দোল্ দোল্!
প্রাণেতে আমাতে মুখোমুখি আজ
চিনি লব দোঁহে ছাড়ি' ভয় লাজ,
বক্ষে বক্ষে পরশিব দোঁহে
ভাবে বিভোল,
দে দোল্ দোল্!
স্বপ্ন টুটিয়া বাহিরেছে আজ
দুটো পাগল!
দে দোল্ দোল্!
দে দোল্ দোল্!
১৫ চৈত্র। ১২৯৯
রামপুর বোয়ালিয়া।

'সোনার তরী'র পাণ্ডুলিপির এক পৃষ্ঠার প্রতিলিপি

উড়ে কুন্তল, উড়ে অঞ্চল,
উড়ে বনমালা বায়ুচঞ্চল,
বাজে কঙ্কণ বাজে কিঙ্কিণী
মত্ত-বোল।
দে দোল্ দোল্।
আয় রে ঝঞ্ঝা, পরান-বধূর
আবরণরাশি করিয়া দে দূর,
করি লুণ্ঠন অবগুণ্ঠন-
বসন খোল্।
দে দোল্ দোল্।

প্রাণেতে আমাতে মুখোমুখি আজ,
চিনি লব দোঁহে ছাড়ি ভয়-লাজ,
বক্ষে বক্ষে পরশিব দোঁহে
ভাবে বিভোল।
দে দোল্ দোল্।
স্বপ্ন টুটিয়া বাহিরেছে আজ
দুটো পাগল।
দে দোল্ দোল্।

রামপুর বোয়ালিয়া
১৫ চৈত্র, ১২৯৯

হৃদয়যমুনা

যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ, এস ওগো, এস মোর
হৃদয়নীরে।
তলতল ছলছল কাঁদিবে গভীর জল
ওই দুটি সুকোমল চরণ ঘিরে।
আজি বর্ষা গাঢ়তম ; নিবিড় কুন্তলসম
মেঘ নামিয়াছে মম দুইটি তীরে।

ওই যে শবদ চিনি, নূপুর রিনিকিঝিনি,
কে গো তুমি একাকিনী আসিছ ধীরে।
যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ, এস ওগো এস, মোর
হৃদয়নীরে।

যদি কলস ভাসায়ে জলে বসিয়া থাকিতে চাও
আপনা ভুলে ;
হেথা শ্যাম দূর্বাদল, নবনীল নভস্তল,
বিকশিত বনস্থল বিকচ ফুলে।
দুটি কালো আঁখি দিয়া মন যাবে বাহিরিয়া,
অঞ্চল খসিয়া গিয়া পড়িবে খুলে,
চাহিয়া বঞ্জুলবনে কী জানি পড়িবে মনে
বসি কুঞ্জে তৃণাসনে শ্যামল কূলে।
যদি কলস ভাসায়ে জলে বসিয়া থাকিতে চাও
আপনা ভুলে।

যদি গাহন করিতে চাহ, এস নেমে এস হেথা
গহনতলে।
নীলাম্বরে কিবা কাজ, তীরে ফেলে এস আজ,
ঢেকে দিবে সব লাজ সুনীল জলে।
সোহাগ-তরঙ্গরাশি অঙ্গখানি দিবে গ্রাসি,
উচ্ছ্বসি পড়িবে আসি উরসে গলে।
ঘুরে ফিরে চারি পাশে কভু কাঁদে কভু হাসে,
কুলুকুলু কলভাষে কত কী ছলে।
যদি গাহন করিতে চাহ, এস নেমে এস, হেথা
গহনতলে।

যদি মরণ লভিতে চাও, এস তবে ঝাঁপ দাও
সলিল-মাঝে
স্নিগ্ধ, শান্ত, সুগভীর নাহি তল, নাহি তীর,
মৃত্যুসম নীল নীর স্থির বিরাজে।

নাহি রাত্রি, দিনমান, আদি অন্ত পরিমাণ,
সে অতলে গীত-গান কিছু না বাজে।
যাও সব যাও ভুলে নিখিল বন্ধন খুলে
ফেলে দিয়ে এস কূলে সকল কাজে।
যদি মরণ লভিতে চাও, এস তবে ঝাঁপ দাও
সলিল-মাঝে।

১২ আষাঢ়, ১৩০০

ব্যর্থ যৌবন

আজি যে-রজনী যায় ফিরাইব তায়
কেমনে।
কেন নয়নের জল ঝরিছে বিফল
নয়নে।
এ বেশভূষণ লহ সখী, লহ,
এ কুসুমমালা হয়েছে অসহ,
এমন যামিনী কাটিল বিরহ-
শয়নে।
আজি যে-রজনী যায় ফিরাইব তায়
কেমনে।

আমি বৃথা অভিসারে এ যমুনাপারে
এসেছি।
বহি বৃথা মনো-আশা এত ভালোবাসা
বেসেছি।
শেষে নিশিশেষে বদন মলিন,
ক্লান্ত চরণ, মন উদাসীন,

ফিরিয়া চলেছি কোন্ সুখহীন
ভবনে।
হায়, যে-রজনী যায় ফিরাইব তায়
কেমনে।

কত উঠেছিল চাঁদ নিশীথ-অগাধ
আকাশে।
বনে দুলেছিল ফুল গন্ধব্যাকুল
বাতাসে।
তরুমর্মর, নদী-কলতান,
কানে লেগেছিল স্বপ্ন-সমান—
দূর হতে আসি পশেছিল গান
শ্রবণে।
আজি সে রজনী যায় ফিরাইব তায়
কেমনে।

মনে লেগেছিল হেন, আমারে সে যেন
ডেকেছে।
যেন চিরযুগ ধরে মোরে মনে করে
রেখেছে।
সে আনিবে বহি ভরা অনুরাগ,
যৌবননদী করিবে সজাগ,
আসিবে নিশীথে, বাঁধিবে সোহাগ-
বাঁধনে।
আহা সে রজনী যায়, ফিরাইব তায়
কেমনে।

ওগো ভোলা ভালো তবে, কাঁদিয়া কী হবে
মিছে আর।

যদি যেতে হল হায়, প্রাণ কেন চায়
পিছে আর।
কুঞ্জদুয়ারে অবোধের মতো
রজনী-প্রভাতে বসে রব কত।
এবারের মত বসন্ত গত
জীবনে।
হায় যে-রজনী যায় ফিরাইব তায়
কেমনে।

১৬ আষাঢ়, ১৩০০

ভরা ভাদরে

নদী ভরা কূলে কূলে, খেতে ভরা ধান।
আমি ভাবিতেছি বসে কী গাহিব গান।
কেতকী জলের ধারে
ফুটিয়াছে ঝোপে ঝাড়ে
নিরাকুল ফুলভারে
বকুল-বাগান।
কানায় কানায় পূর্ণ আমার পরান।

ঝিলিমিলি করে পাতা, ঝিকিমিকি আলো।
আমি ভাবিতেছি কার আঁখিদুটি কালো।
কদম্বগাছের সার,
চিকন পল্লবে তার
গন্ধে-ভরা অন্ধকার
হয়েছে ঘোরালো।
কারে বলিবারে চাহি কারে বাসি ভালো।

অম্লান উজ্জ্বল দিন, বৃষ্টি অবসান।
আমি ভাবিতেছি আজি কী করিব দান।
মেঘখণ্ড থরে থরে
উদাস বাতাসভরে
নানা ঠাঁই ঘুরে মরে
হতাশ-সমান।
সাধ যায় আপনারে করি শতখান।

দিবস অবশ যেন হয়েছে আলসে।
আমি ভাবি আর কেহ কী ভাবিছে বসে।
তরুশাখে হেলাফেলা
কামিনীফুলের মেলা,
থেকে থেকে সারাবেলা
পড়ে খসে খসে।
কী বাঁশি বাজিছে সদা প্রভাতে প্রদোষে।

পাখির প্রমোদগানে পূর্ণ বনস্থল।
আমি ভাবিতেছি চোখে কেন আসে জল।
দোয়েল দুলায়ে শাখা
গাহিছে অমৃতমাখা,
নিভৃত পাতায় ঢাকা
কপোতযুগল।
আমারে সকলে মিলে করেছে বিকল।

২৭ আষাঢ়, ১৩০০

প্রত্যাখ্যান

অমন দীন-নয়নে তুমি
চেয়ো না।
অমন সুধা-করুণ সুরে
গেয়ো না।
সকালবেলা সকল কাজে
আসিতে যেতে পথের মাঝে
আমারি এই আঙিনা দিয়ে
যেয়ো না।
অমন দীন-নয়নে তুমি
চেয়ো না।

মনের কথা রেখেছি মনে
যতনে ;
ফিরিছ মিছে মাগিয়া সেই
রতনে।
তুচ্ছ অতি, কিছু সে নয়
দু-চারিফোঁটা-অশ্রুময়
একটি শুধু শোণিত-রাঙা
বেদনা।
অমন দীন-নয়নে তুমি
চেয়ো না।

কাহার আশে দুয়ারে কর
হানিছ।
না জানি তুমি কী মোরে মনে
মানিছ।
রয়েছি হেথা লুকাতে লাজ
নাহিকো মোর রানীর সাজ,

পরিয়া আছি জীর্ণচীর
বাসনা।
অমন দীন-নয়নে তুমি
চেয়ো না।

কী ধন তুমি এনেছ ভরি
দু-হাতে।
অমন করি যেয়ো না ফেলি
ধুলাতে।
এ ঋণ যদি শুধিতে চাই,
কী আছে হেন, কোথায় পাই,
জনম তরে বিকাতে হবে
আপনা।
অমন দীন-নয়নে তুমি
চেয়ো না।

ভেবেছি মনে ঘরের কোণে
রহিব।
গোপন দুখ আপন বুকে
বহিব।
কিসের লাগি করিব আশা,
বলিতে চাহি, নাহিকো ভাষা,—
রয়েছে সাধ, না জানি তার
সাধনা।
অমন দীন-নয়নে তুমি
চেয়ো না।

যে-সুর তুমি ভরেছ তব
বাঁশিতে,
উহার সাথে আমি কি পারি
গাহিতে।

গাহিতে গেলে ভাঙিয়া গান
উছলি উঠে সকল প্রাণ,
না মানে রোধ অতি অবোধ
রোদনা।
অমন দীন-নয়নে তুমি
চেয়ো না।

এসেছ তুমি গলায় মালা
ধরিয়া,
নবীন বেশ, শোভন ভূষা
পরিয়া।
হেথায় কোথা কনক-থালা,
কোথায় ফুল, কোথায় মালা,
বাসরসেবা করিবে কে বা
রচনা।
অমন দীন-নয়নে তুমি
চেয়ো না।

ভুলিয়া পথ এসেছ সখা,
এ ঘরে।
অন্ধকারে মালা-বদল
কে করে।
সন্ধ্যা হতে কঠিন ভুঁয়ে
একাকী আমি রয়েছি শুয়ে,
নিবায়ে দীপ জীবননিশি
যাপনা।
অমন দীন-নয়নে আর
চেয়ো না।

২৭ আষাঢ়, ১৩০০

লজ্জা

আমার হৃদয় প্রাণ
সকলি করেছি দান,
কেবল শরমখানি রেখেছি।
চাহিয়া নিজের পানে
নিশিদিন সাবধানে
সযতনে আপনারে ঢেকেছি।

হে বঁধু, এ স্বচ্ছ বাস
করে মোরে পরিহাস,
সতত রাখিতে নারি ধরিয়া,
চাহিয়া আঁখির কোণে
তুমি হাস মনে মনে
আমি তাই লাজে যাই মরিয়া।

দক্ষিণ পবনভরে
অঞ্চল উড়িয়া পড়ে,
কখন যে, নাহি পারি লখিতে,
পুলক-ব্যাকুল হিয়া
অঙ্গে উঠে বিকশিয়া,
আবার চেতনা হয় চকিতে।

বদ্ধ গৃহে করি' বাস
রুদ্ধ যবে হয় শ্বাস,
আধেক বসনবন্ধ খুলিয়া
বসি গিয়া বাতায়নে
সুখসন্ধ্যাসমীরণে
ক্ষণতরে আপনারে ভুলিয়া।

পূর্ণচন্দ্রকররাশি
মূর্ছাতুর পড়ে আসি
এই নবযৌবনের মুকুলে,
অঙ্গ মোর ভালোবেসে
ঢেকে দেয় মৃদু হেসে
আপনার লাবণ্যের দুকূলে ;

মুখে বক্ষে কেশপাশে,
ফিরে বায়ু খেলা-আশে
কুসুমের গন্ধ ভাসে গগনে,
হেনকালে তুমি এলে
মনে হয় স্বপ্ন বলে
কিছু আর নাহি থাকে স্মরণে।

থাক্ বঁধু, দাও ছেড়ে
ওটুকু নিয়ো না কেড়ে,
এ শরম দাও মোরে রাখিতে,
সকলের অবশেষ
এইটুকু লাজলেশ
আপনারে আধখানি ঢাকিতে।

ছলছল-দু'নয়ান
করিয়ো না অভিমান,
আমিও যে কত নিশি কেঁদেছি,
বুঝাতে পারিনে যেন
সব দিয়ে তবু কেন
সবটুকু লাজ দিয়ে বেঁধেছি—

কেন যে তোমার কাছে
একটু গোপন আছে,
একটু রয়েছি মুখ হেলায়ে।
এ নহে গো অবিশ্বাস,
নহে সখা, পরিহাস,—
নহে নহে ছলনার খেলা এ।

বসন্তনিশীথে বঁধু,
লহ গন্ধ, লহ মধু,
সোহাগে মুখের পানে তাকিয়ো।
দিয়ো দোল আশেপাশে,
কোয়ো কথা মৃদু ভাষে,
শুধু এর বৃন্তটুকু রাখিয়ো।

সেটুকুতে ভর করি
এমন মাধুরী ধরি
তোমাপানে আছি আমি ফুটিয়া,
এমন মোহনভঙ্গে
আমার সকল অঙ্গে
নবীন লাবণ্য যায় লুটিয়া।

এমন সকল বেলা
পবনে চঞ্চল খেলা,
বসন্তকুসুম-মেলা দুধারি।
শুন বঁধু, শুন তবে,
সকলি তোমার হবে,
কেবল শরম থাক্ আমারি।

২৮ আষাঢ়, ১৩০০

পুরস্কার

সেদিন বরষা ঝরঝর ঝরে
কহিল কবির স্ত্রী,—
"রাশি রাশি মিল করিয়াছ জড়ো,
রচিতেছ বসি পুঁথি বড়ো বড়ো,
মাথার উপরে বাড়ি পড়ো-পড়ো
তার খোঁজ রাখ কি।
গাঁথিছ ছন্দ দীর্ঘ হ্রস্ব,
মাথা ও মুণ্ড, ছাই ও ভস্ম,
মিলিবে কি তাহে হস্তী অশ্ব—
না মিলে শস্যকণা।
অন্ন জোটে না, কথা জোটে মেলা—
নিশিদিন ধরে এ কী ছেলেখেলা,
ভারতীরে ছাড়ি ধরো এইবেলা
লক্ষ্মীর উপাসনা।
ওগো ফেলে দাও পুঁথি ও লেখনী,
যা করিতে হয় করহ এখনি,
এত শিখিয়াছ এটুকু শেখনি
কিসে কড়ি আসে দুটো!"
দেখি সে মুরতি সর্বনাশিয়া,
কবির পরান উঠিল ত্রাসিয়া,
পরিহাসছলে ঈষৎ হাসিয়া
কহে জুড়ি করপুট,—
"ভয় নাহি করি ও মুখনাড়ারে,
লক্ষ্মী সদয় লক্ষ্মীছাড়ারে,
ঘরেতে আছেন নাইকো ভাঁড়ারে
এ-কথা শুনিবে কে বা।
আমার কপালে বিপরীত ফল,
চপলা লক্ষ্মী মোরে অচপল,

ভারতী না থাকে থির এক পল
এত করি তাঁর সেবা।
তাই তো কপাটে লাগাইয়া খিল
স্বর্গে মর্ত্যে খুঁজিতেছি মিল,
আনমনা যদি হই এক তিল
অমনি সর্বনাশ।”
মনে মনে হাসি’ মুখ করি ভার
কহে কবিজায়া, “পারিনেকো আর,
ঘর-সংসার গেল ছারেখার,
সব তাতে পরিহাস।”
এতেক বলিয়া বাঁকায়ে মুখানি
শিঞ্জিত করি কাঁকন দুখানি
চঞ্চল করে অঞ্চল টানি
রোষছলে যায় চলি।
হেরি সে ভুবন-গরব-দমন
অভিমানবেগে অধীর গমন,
উচাটন কবি কহিল, “অমন
যেয়ো না হৃদয় দলি।
ধরা নাহি দিলে ধরিব দু-পায়
কী করিতে হবে বলো সে উপায়,
ঘর ভরি দিব সোনায় রুপায়
বুদ্ধি জোগাও তুমি।
একটুকু ফাঁকা যেখানে যা পাই
তোমার মুরতি সেখানে চাপাই,
বুদ্ধির চাষ কোনোখানে নাই,
সমস্ত মরুভূমি।”
“হয়েছে, হয়েছে, এত ভালো নয়”
হাসিয়া রুষিয়া গৃহিণী ভনয়,—
“যেমন বিনয় তেমনি প্রণয়,
আমার কপালগুণে।

কথার কখনো ঘটেনি অভাব,
যখনি বলেছি পেয়েছি জবাব,
একবার ওগো বাক্য-নবাব
চলো দেখি কথা শুনে।
শুভ দিনখন দেখো পাঁজি খুলি,
সঙ্গে করিয়া লহ পুঁথিগুলি,
ক্ষণিকের তরে আলস্য ভুলি
চলো রাজসভামাঝে।
আমাদের রাজা গুণীর পালক,
মানুষ হইয়া গেল কত লোক,
ঘরে তুমি জমা করিলে শোলোক
লাগিবে কিসের কাজে।”
কবির মাথায় ভাঙি পড়ে বাজ,
ভাবিল,— বিপদ দেখিতেছি আজ,
কখনো জানিনে রাজামহারাজ,
কপালে কী জানি আছে।
মুখে হেসে বলে, “এই বই নয়?
আমি বলি আরো কী করিতে হয়।
প্রাণ দিতে পারি, শুধু জাগে ভয়
বিধবা হইবে পাছে।
যেতে যদি হয় দেরিতে কী কাজ,
ত্বরা করে তবে নিয়ে এস সাজ—
হেমকুণ্ডল, মণিময় তাজ,
কেয়ূর, কনকহার।
বলে দাও মোর সারথিরে ডেকে
ঘোড়া বেছে নেয় ভালো ভালো দেখে,
কিংকরগণ সাথে যাবে কে কে
আয়োজন করো তার।”
ব্রাহ্মণী কহে, “মুখাগ্রে যার
বাধে না কিছুই, কী চাহে সে আর,

মুখ ছুটাইলে রথাশ্বে আর
না দেখি আবশ্যক।
নানা বেশভূষা হীরা রুপা সোনা
এনেছি পাড়ার করি উপাসনা,
সাজ করে লও পুরায়ে বাসনা,
রসনা ক্ষান্ত হোক।”
এতেক বলিয়া ত্বরিত-চরণ
আনে বেশবাস নানান-ধরন,
কবি ভাবে মুখ করি বিবরন,
আজিকে গতিক মন্দ।
গৃহিণী স্বয়ং নিকটে বসিয়া
তুলিল তাহারে মাজিয়া ঘষিয়া,
আপনার হাতে যতনে কষিয়া
পরাইল কটিবন্ধ।
উষ্ণীষ আনি মাথায় চড়ায়,
কণ্ঠি আনিয়া কণ্ঠে জড়ায়,
অঙ্গদ দুটি বাহুতে পরায়,
কুণ্ডল দেয় কানে।
অঙ্গে যতই চাপায় রতন
কবি বসি থাকে ছবির মতন,
প্রেয়সীর নিজ হাতের যতন
সেও আজি হার মানে।
এই মতে দুই প্রহর ধরিয়া
বেশভূষা সব সমাধা করিয়া,
গৃহিণী নিরখে ঈষৎ সরিয়া
বাঁকায়ে মধুর গ্রীবা।
হেরিয়া কবির গম্ভীর মুখ
হৃদয়ে উপজে মহাকৌতুক,
হাসি উঠি কহে ধরিয়া চিবুক
“আ মরি সেজেছ কিবা।”

ধরিল সমুখে আরশি আনিয়া,
কহিল বচন অমিয় ছানিয়া,
"পুরনারীদের পরান হানিয়া
ফিরিয়া আসিবে আজি,
তখন দাসীরে ভুলো না গরবে,
এই উপকার মনে রেখো তবে,
মোরেও এমনি পরাইতে হবে
রতনভূষণরাজি।"
কোলের উপরে বসি' বাহুপাশে
বাঁধিয়া কবিরে সোহাগে সহাসে
কপোল রাখিয়া কপোলের পাশে
কানে কানে কথা কয়।
দেখিতে দেখিতে কবির অধরে
হাসিরাশি আর কিছুতে না ধরে,
মুগ্ধ হৃদয় গলিয়া আদরে
ফাটিয়া বাহির হয়।
কহে উচ্ছ্বসি, "কিছু না মানিব,
এমনি মধুর শ্লোক বাখানিব,
রাজভাণ্ডার টানিয়া আনিব
ও রাঙা চরণতলে।"
বলিতে বলিতে বুক উঠে ফুলি
উষ্ণীষপরা মস্তক তুলি
পথে বাহিরায় গৃহদ্বার খুলি
দ্রুত রাজগৃহে চলে।
কবির রমণী কুতূহলে ভাসে,
তাড়াতাড়ি উঠি বাতায়নপাশে
উঁকি মারি চায়, মনে মনে হাসে,
কালো চোখে আলো নাচে।
কহে মনে মনে বিপুল পুলকে,
"রাজপথ দিয়ে চলে এত লোকে

এমনটি আর পড়িল না চোখে
আমার যেমন আছে।”

এদিকে কবির উৎসাহ ক্রমে
নিমেষে নিমেষে আসিতেছে কমে,
যখন পশিল নৃপ-আশ্রমে
মরিতে পাইলে বাঁচে।
রাজসভাসদ সৈন্য পাহারা
গৃহিণীর মতো নহে তো তাহারা,
সারি সারি দাড়ি করে দিশাহারা,
হেথা কি আসিতে আছে।
হেসে ভালোবেসে দুটো কথা কয়
রাজসভাগৃহ হেন ঠাঁই নয়,
মন্ত্রী হইতে দ্বারী মহাশয়
সবে গম্ভীর মুখ।
মানুষে কেন যে মানুষের প্রতি
ধরি আছে হেন যমের মুরতি,
তাই ভাবি কবি না পায় ফুরতি,
দমি যায় তার বুক।
বসি মহারাজ মহেন্দ্র রায়
মহোচ্চ গিরিশিখরের প্রায়,
জন-অরণ্য হেরিছে হেলায়
অচল অটল ছবি।
কৃপানির্ঝর পড়িছে ঝরিয়া
শত শত দেশ সরস করিয়া,
সে মহা মহিমা নয়ন ভরিয়া
চাহিয়া দেখিল কবি।
বিচার সমাধা হল যবে, শেষে
ইঙ্গিত পেয়ে মন্ত্রি-আদেশে

জোড়করপুটে দাঁড়াইল এসে
দেশের প্রধান চর।
অতি সাধু-মতো আকারপ্রকার,
এক তিল নাহি মুখের বিকার,
ব্যবসা যে তাঁর মানুষ-শিকার
নাহি জানে কোনো নর।
ব্রত নানামতো সতত পালয়ে,
এক কানাকড়ি মূল্য না লয়ে
ধর্মোপদেশ আলয়ে আলয়ে
বিতরিছে যাকে তাকে।
চোরা কটাক্ষ চক্ষে ঠিকরে,
কী ঘটিছে কার, কে কোথা কী করে,
পাতায় পাতায় শিকড়ে শিকড়ে
সন্ধান তার রাখে।
নামাবলী গায়ে বৈষ্ণবরূপে
যখন সে আসি প্রণমিল ভূপে,
মন্ত্রী রাজারে অতি চুপে চুপে
কী করিল নিবেদন।
অমনি আদেশ হইল রাজার
"দেহ এঁরে টাকা পঞ্চ হাজার,"
"সাধু, সাধু" কহে সভার মাঝার
যত সভাসদজন।
পুলক প্রকাশে সবার গাত্রে,—
"এ যে দান ইহা যোগ্য পাত্রে,
দেশের আবালবনিতামাত্রে
ইথে না মানিবে দ্বেষ।"
সাধু নুয়ে পড়ে নম্রতাভরে,
দেখি সভাজন আহা আহা করে,
মন্ত্রীর শুধু জাগিল অধরে
ঈষৎ হাস্যলেশ।

আসে গুটি গুটি বৈয়াকরণ
ধূলিভরা দুটি লইয়া চরণ
চিহ্নিত করি রাজাস্তরণ
  পবিত্র পদপঙ্কে।
ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম,
বলি-অঙ্কিত শিথিল চর্ম,
প্রখরমূর্তি অগ্নিশর্ম,
  ছাত্র মরে আতঙ্কে।
কোনো দিকে কোনো লক্ষ্য না ক’রে
পড়ি গেল শ্লোক বিকট হাঁ ক’রে
মটর-কড়াই মিশায়ে কাঁকরে
  চিবাইল যেন দাঁতে।
কেহ তার নাহি বুঝে আগুপিছু,
সবে বসি থাকে মাথা করি নিচু,
রাজা বলে, “এঁরে দক্ষিণা কিছু
  দাও দক্ষিণ হাতে।”
তার পরে এল গণৎকার,
গণনায় রাজা চমৎকার,
টাকা ঝন্ ঝন্ ঝনৎকার
  বাজায়ে সে গেল চলি।
আসে এক বুড়া গণ্যমান্য
করপুটে লয়ে দূর্বাধান্য,
রাজা তাঁর প্রতি অতি বদান্য
  ভরিয়া দিলেন থলি।
আসে নটভাট রাজপুরোহিত,
কেহ একা কেহ শিষ্য-সহিত,
কারো বা মাথায় পাগড়ি লোহিত,
  কারো বা হরিৎবর্ণ।
আসে দ্বিজগণ পরমারাধ্য—
কন্যার দায়, পিতার শ্রাদ্ধ,

যার যথামতো পায় বরাদ্দ,
রাজা আজি দাতাকর্ণ।
যে যাহার সবে যায় স্বভবনে,
কবি কী করিবে ভাবে মনে মনে,
রাজা দেখে তারে সভাগৃহকোণে
বিপন্নমুখছবি।
কহে ভূপ, "হোথা বসিয়া কে ওই,
এস তো মন্ত্রী, সন্ধান লই।"
কবি কহি উঠে, "আমি কেহ নই,
আমি শুধু এক কবি।"
রাজা কহে, "বটে, এস এস তবে,
আজিকে কাব্য-আলোচনা হবে।"
বসাইলা কাছে মহাগৌরবে
ধরি তার কর ছুটি।
মন্ত্রী ভাবিল, যাই এইবেলা,
এখন তো শুরু হবে ছেলেখেলা।—
কহে, "মহারাজ, কাজ আছে মেলা,
আদেশ পাইলে উঠি।"
রাজা শুধু মৃদু নাড়িলা হস্ত,
নৃপ-ইঙ্গিতে মহা তটস্থ
বহির হইয়া গেল সমস্ত
সভাস্থ দলবল।
পাত্র মিত্র অমাত্য আদি,
অর্থী প্রার্থী বাদী প্রতিবাদী,
উচ্চ তুচ্ছ বিবিধ উপাধি
বন্যার যেন জল।

চলি গেল যবে সভ্যস্থজন,
মুখোমুখি করি বসিলা দু-জন,

রাজা বলে, “এবে কাব্যকূজন
আরম্ভ করো কবি।”
কবি তবে দুই কর জুড়ি বুকে
বাণীবন্দনা করে নতমুখে,
“প্রকাশো জননী, নয়ন-সমুখে
প্রসন্ন মুখছবি।
বিমল মানস-সরসবাসিনী
শুক্লবসনা শুভ্রহাসিনী,
বীণাগঞ্জিত মঞ্জুভাষিণী
কমলকুঞ্জাসনা।
তোমারে হৃদয়ে করিয়া আসীন
সুখে গৃহকোণে ধনমানহীন
খ্যাপার মতন আছি চিরদিন
উদাসীন আনমনা।
চারি দিকে সবে বাঁটিয়া দুনিয়া
আপন অংশ নিতেছে গুনিয়া
আমি তব স্নেহবচন শুনিয়া
পেয়েছি স্বরগসুধা।
সেই মোর ভালো, সেই বহু মানি,
তবু মাঝে মাঝে কেঁদে ওঠে প্রাণী,
সুরের খাদ্যে জান তো মা বাণী,
নরের মিটে না ক্ষুধা।
যা হবার হবে, সে-কথা ভাবি না,
মা গো, একবার ঝংকারো বীণা,
ধরহ রাগিণী বিশ্বপ্লাবিনা
অমৃত-উৎসধারা।
যে রাগিণী শুনি নিশিদিনমান
বিপুল হর্ষে দ্রব ভগবান
মলিন মর্ত্যমাঝে বহমান
নিয়ত আত্মহারা।

যে রাগিণী সদা গগন ছাপিয়া
হোমশিখাসম উঠিছে কাঁপিয়া,
অনাদি অসীমে পড়িছে ঝাঁপিয়া,
বিশ্বতন্ত্রী হতে।
যে রাগিণী চিরজন্ম ধরিয়া
চিত্তকুহরে উঠে কুহরিয়া
অশ্রুহাসিতে জীবন ভরিয়া
ছুটে সহস্র স্রোতে।
কে আছে কোথায়, কে আসে, কে যায়,
নিমেষে প্রকাশে, নিমেষে মিলায়,
বালুকার 'পরে কালের বেলায়
ছায়া-আলোকের খেলা।
জগতের যত রাজামহারাজ,
কাল ছিল যারা কোথা তারা আজ,
সকালে ফুটিছে সুখদুখলাজ,
টুটিছে সন্ধ্যাবেলা।
শুধু তার মাঝে ধ্বনিতেছে সুর
বিপুল বৃহৎ গভীর মধুর,
চিরদিন তাহে আছে ভরপুর,
মগন গগনতল।
যে-জন শুনেছে সে অনাদি ধ্বনি
ভাসায়ে দিয়েছে হৃদয়তরণী,—
জানে না আপনা, জানে না ধরণী—
সংসার-কোলাহল।
সে-জন পাগল, পরান বিকল,
ভবকুল হতে ছিঁড়িয়া শিকল
কেমনে এসেছে ছাড়িয়া সকল
ঠেকেছে চরণে তব।
তোমার অমল কমলগন্ধ
হৃদয়ে ঢালিছে মহা আনন্দ,

অপূর্ব গীত, অলোক ছন্দ
শুনিছে নিত্য নব।
বাজুক সে বীণা, মজুক ধরণী,
বারেকের তরে ভুলাও জননী,
কে বড়ো কে ছোটো কে দীন কে ধনী,
কেবা আগে কেবা পিছে,
কার জয় হল কার পরাজয়,
কাহার বৃদ্ধি, কার হল ক্ষয়,
কেবা ভালো, আর কেবা ভালো নয়,
কে উপরে কেবা নিচে।
গাঁথা হয়ে যাক এক গীতরবে
ছোটো জগতের ছোটো-বড়ো সবে,
সুখে পড়ে রবে পদপল্লবে
যেন মালা একখানি।
তুমি মানসের মাঝখানে আসি
দাঁড়াও মধুর মুরতি বিকাশি,
কুন্দবরন সুন্দর হাসি
বীণাহাতে বীণাপাণি।
ভাসিয়া চলিবে রবিশশীতারা,
সারি সারি যত মানবের ধারা,
অনাদিকালের পান্থ যাহারা,
তব সংগীতস্রোতে।
দেখিতে পাইব ব্যোমে মহাকাল
ছন্দে ছন্দে বাজাইছে তাল,
দশ দিক্‌বধূ খুলি কেশজাল
নাচে দশ দিক হতে।”
এতেক বলিয়া ক্ষণপরে কবি
করুণ কথায় প্রকাশিল ছবি
পুণ্যকাহিনী রঘুকুলরবি
রাঘবের ইতিহাস।

অসহ দুঃখ সহি নিরবধি
কেমনে জনম গিয়েছে দগধি
জীবনের শেষ দিবস অবধি
অসীম নিরাশ্বাস।
কহিল, বারেক ভাবি দেখো মনে
সেই এক দিন কেটেছে কেমনে
যেদিন মলিন বাকল-বসনে
চলিলা বনের পথে,
ভাই লক্ষ্মণ বয়স নবীন,
ম্লান ছায়াসম বিষাদ-বিলীন,
নববধূ সীতা আভরণহীন
উঠিলা বিদায় রথে।
রাজপুরীমাঝে উঠে হাহাকার,
প্রজা কাঁদিতেছে পথে সারে সার,
এমন বজ্র কখনো কি আর
পড়েছে এমন ঘরে।
অভিষেক হবে, উৎসবে তার
আনন্দময় ছিল চারিধার,
মঙ্গলদীপ নিবিয়া আঁধার
শুধু নিমেষের ঝড়ে।
আর্-এক দিন ভেবে দেখো মনে
যেদিন শ্রীরাম লয়ে লক্ষ্মণে
ফিরিয়া নিভৃত কুটির-ভবনে
দেখিলা জানকী নাহি,—
'জানকী জানকী' আর্ত রোদনে
ডাকিয়া ফিরিলা কাননে কাননে,
মহা-অরণ্য আঁধার-আননে
রহিল নীরবে চাহি।
তার পরে দেখো শেষ কোথা এর,
ভেবে দেখো কথা সেই দিবসের,—

এত বিষাদের এত বিরহের
এত সাধনের ধন,
সেই সীতাদেবী রাজসভামাঝে
বিদায়-বিনয়ে নমি' রঘুরাজে
দ্বিধা ধরাতলে অভিমানে লাজে
হইলা অদর্শন।
সে-সকল দিন সেও চলে যায়,—
সে অসহ শোক, চিহ্ন কোথায়,—
যায়নি তো এঁকে ধরণীর গায়
অসীম দগ্ধ রেখা।
দ্বিধা ধরাভূমি জুড়েছে আবার,
দণ্ডকবনে ফুটে ফুলভার,
সরযূর কূলে দুলে তৃণসার
প্রফুল্ল শ্যামলেখা।
শুধু সেদিনের একখানি সুর
চিরদিন ধরে বহু বহু দূর
কাঁদিয়া হৃদয় করিছে বিধুর
মধুর করুণ তানে;
সে মহাপ্রাণের মাঝখানটিতে
যে মহারাগিণী আছিল ধ্বনিতে
আজিও সে গীত মহাসংগীতে
বাজে মানবের কানে।
তার পরে কবি কহিল সে কথা,
কুরুপাণ্ডব-সমর-বারতা;—
গৃহবিবাদের ঘোর মত্ততা
ব্যাপিল সর্ব দেশ,
দুইটি যমজ তরু পাশাপাশি,
ঘর্ষণে জলে হুতাশনরাশি,
মহাদাবানল ফেলে শেষে গ্রাসি
অরণ্য-পরিবেশ।

এক গিরি হতে দুই স্রোত-পারা
দুইটি শীর্ণ বিদ্বেষধারা
সরীসৃপগতি মিলিল তাহারা
নিষ্ঠুর অভিমানে—
দেখিতে দেখিতে হল উপনীত
ভারতের যত ক্ষত্র-শোণিত,
ত্রাসিত ধরণী করিল ধ্বনিত
প্রলয়বন্যা-গানে।
দেখিতে দেখিতে ডুবে গেল কূল,
আত্ম ও পর হয়ে গেল ভুল,
গৃহবন্ধন করি নির্মূল
ছুটিল রক্তধারা,
ফেনায়ে উঠিল মরণাম্বুধি,
বিশ্ব রহিল নিশ্বাস রুধি,
কাঁপিল গগন শত আঁখি মুদি
নিবায়ে সূর্যতারা।
সমরবন্যা যবে অবসান
সোনার ভারত বিপুল শ্মশান,
রাজগৃহ যত ভূতল-শয়ান
পড়ে আছে ঠাঁই ঠাঁই,—
ভীষণা শান্তি রক্তনয়নে
বসিয়া শোণিত-পঙ্কশয়নে,
চাহি ধরাপানে আনত বয়নে
মুখেতে বচন নাই।
বহুদিন পরে ঘুচিয়াছে খেদ,
মরণে মিটেছে সব বিচ্ছেদ,
সমাধা যজ্ঞ মহানরমেধ
বিদ্বেষ-হুতাশনে।
সকল কামনা করিয়া পূর্ণ,
সকল দম্ভ করিয়া চূর্ণ,

পাঁচ ভাই গিয়া বসিলা শূন্য
স্বর্ণসিংহাসনে।
স্তব্ধ প্রাসাদ বিষাদ-আঁধার,
শ্মশান হইতে আসে হাহাকার—
রাজপুরবধূ যত অনাথার
মর্মবিদার রব।
“জয় জয় জয় পাণ্ডুতনয়”
সারি সারি দ্বারী দাঁড়াইয়া কয়,
পরিহাস বলে আজি মনে হয়,
মিছে মনে হয় সব।
কালি যে ভারত সারাদিন ধরি
অট্ট গরজে অম্বর ভরি
রাজার রক্তে খেলেছিল হোরি
ছাড়ি কুলভয়লাজে,
পরদিনে চিতাভস্ম মাখিয়া
সন্ন্যাসীবেশে অঙ্গ ঢাকিয়া
বসি একাকিনী শোকার্তহিয়া
শূন্য শ্মশানমাঝে।
কুরুপাণ্ডব মুছে গেছে সব,
সে রণরঙ্গ হয়েছে নীরব,
সে চিতাবহ্নি অতি ভৈরব
ভস্মও নাহি তার;
যে ভূমি লইয়া এত হানাহানি
সে আজি কাহার তাহাও না জানি,
কোথা ছিল রাজা, কোথা রাজধানী
চিহ্ন নাহিকো আর।
তবু কোথা হতে আসিছে সে স্বর,—
যেন সে অমর সমর-সাগর
গ্রহণ করেছে নব কলেবর
একটি বিরাট গানে;

বিজয়ের শেষে সে মহাপ্রয়াণ,
সফল আশার বিষাদ মহান,
উদাস শান্তি করিতেছে দান
চিরমানবের প্রাণে।
হায়, এ ধরায় কত অনন্ত
বরষে বরষে শীত বসন্ত
সুখে দুখে ভরি দিক্‌দিগন্ত
হাসিয়া গিয়াছে ভাসি,
এমনি বরষা আজিকার মতো
কতদিন কত হয়ে গেছে গত,
নব মেঘভারে গগন আনত
ফেলেছে অশ্রুরাশি।
যুগে যুগে লোক গিয়েছে এসেছে,
দুখীরা কেঁদেছে, সুখীরা হেসেছে,
প্রেমিক যে জন ভালো সে বেসেছে
আজি আমাদেরি মতো ;
তারা গেছে, শুধু তাহাদের গান
দু-হাতে ছড়ায়ে করে গেছে দান—
দেশে দেশে, তার নাহি পরিমাণ,
ভেসে ভেসে যায় কত।
শ্যামলা বিপুলা এ ধরার পানে
চেয়ে দেখি আমি মুগ্ধ নয়ানে ;
সমস্ত প্রাণে কেন যে কে জানে
ভরে আসে আঁখিজল,—
বহু মানবের প্রেম দিয়ে ঢাকা,
বহু দিবসের সুখে দুখে আঁকা,
লক্ষ যুগের সংগীতে মাখা
সুন্দর ধরাতল।
এ ধরার মাঝে তুলিয়া নিনাদ
চাহিনে করিতে বাদপ্রতিবাদ,

যে কদিন আছি মানসের সাধ
মিটাব আপন মনে;
যার যাহা আছে তার থাক্ তাই,
কারো অধিকারে যেতে নাহি চাই,
শান্তিতে যদি থাকিবারে পাই
একটি নিভৃত কোণে।
শুধু বাঁশিখানি হাতে দাও তুলি,
বাজাই বসিয়া প্রাণমন খুলি,
পুষ্পের মতো সংগীতগুলি
ফুটাই আকাশভালে।
অন্তর হতে আহরি বচন
আনন্দলোক করি বিরচন,
গীতরসধারা করি সিঞ্চন
সংসার-ধূলিজালে।
অতি দুর্গম সৃষ্টিশিখরে
অসীম কালের মহাকন্দরে
সতত বিশ্বনির্ঝর ঝরে
ঝর্ঝর সংগীতে,
স্বরতরঙ্গ যত গ্রহতারা
ছুটিছে শূন্যে উদ্দেশহারা,—
সেথা হতে টানি লব গীতধারা
ছোটো এই বাঁশরিতে।
ধরণীর শ্যাম করপুটখানি
ভরি দিব আমি সেই গীত আনি,
বাতাসে মিশায়ে দিব এক বাণী
মধুর অর্থভরা।
নবীন আষাঢ়ে রচি নব মায়া
এঁকে দিয়ে যাব ঘনতর ছায়া,
করে দিয়ে যাব বসন্তকায়া
বাসন্তীবাস-পরা।

ধরণীর তলে, গগনের গায়,
সাগরের জলে, অরণ্য-ছায়
আরেকটুখানি নবীন আভায়
    রঙিন করিয়া দিব।
সংসারমাঝে দু-একটি সুর
রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর,
দু-একটি কাঁটা করি দিব দূর—
    তার পরে ছুটি নিব।
সুখহাসি আরো হবে উজ্জ্বল,
সুন্দর হবে নয়নের জল,
স্নেহসুধামাখা বাসগৃহতল
    আরো আপনার হবে।
প্রেয়সী নারীর নয়নে অধরে
আরেকটু মধু দিয়ে যাব ভরে,
আরেকটু স্নেহ শিশুমুখ ’পরে
    শিশিরের মতো রবে।
না পারে বুঝাতে আপনি না বুঝে
মানুষ ফিরিছে কথা খুঁজে খুঁজে,
কোকিল যেমন পঞ্চমে কূজে
    মাগিছে তেমনি সুর ;
কিছু ঘুচাইব সেই ব্যাকুলতা,
কিছু মিটাইব প্রকাশের ব্যথা,
বিদায়ের আগে দু-চারিটা কথা
    রেখে যাব সুমধুর।
থাকো হৃদাসনে জননী ভারতী,
তোমারি চরণে প্রাণের আরতি,
চাহি না চাহিতে আর কারো প্রতি,
    রাখি না কাহারো আশা।
কত সুখ ছিল হয়ে গেছে দুখ,
কত বান্ধব হয়েছে বিমুখ,

ম্লান হয়ে গেছে কত উৎসুক
উন্মুখ ভালোবাসা।
শুধু ও-চরণ হৃদয়ে বিরাজে,
শুধু ওই বীণা চিরদিন বাজে,
স্নেহস্বরে ডাকে অন্তরমাঝে,—
আয় রে বৎস আয়,
ফেলে রেখে আয় হাসিক্রন্দন,
ছিঁড়ে আয় যত মিছে বন্ধন,
হেথা ছায়া আছে চিরনন্দন
চিরবসন্ত বায়।
সেই ভালো মা গো, যাক যাহা যায়,
জন্মের মতো বরিনু তোমায়,
কমলগন্ধ কোমল দু-পায়
বার বার নমো নম।
এত বলি কবি থামাইল গান,
বসিয়া রহিল মুগ্ধ নয়ান,
বাজিতে লাগিল হৃদয় পরান
বীণাঝংকারসম।
পুলকিত রাজা, আঁখি ছলছল,
আসন ছাড়িয়া নামিলা ভূতল,
দু-বাহু বাড়ায়ে পরান উতল
কবিরে লইলা বুকে,
কহিলা, "ধন্য, কবি গো, ধন্য,
আনন্দে মন সমাচ্ছন্ন,
তোমারে কী আমি কহিব অন্য,
চিরদিন থাকো সুখে।
ভাবিয়া না পাই কী দিব তোমারে,
করি পরিতোষ কোন্ উপহারে,
যাহা কিছু আছে রাজভাণ্ডারে
সব দিতে পারি আনি।"

প্রেমোচ্ছ্বসিত আনন্দ-জলে
ভরি দু-নয়ন কবি তাঁরে বলে,
“কণ্ঠ হইতে দেহ মোর গলে
ওই ফুলমালাখানি।”

মালা বাঁধি কেশে কবি যায় পথে,
কেহ শিবিকায়, কেহ ধায় রথে,
নানা দিকে লোক যায় নানা মতে
কাজের অন্বেষণে;
কবি নিজ মনে ফিরিছে লুব্ধ,
যেন সে তাহার নয়ন মুগ্ধ
কল্পধেনুর অমৃত-দুগ্ধ
দোহন করিছে মনে।
কবির রমণী বাঁধি কেশপাশ,
সন্ধ্যার মতো পরি রাঙা বাস,
বসি একাকিনী বাতায়ন-পাশ,
সুখহাস মুখে ফুটে।
কপোতের দল চারিদিকে ঘিরে
নাচিয়া ডাকিয়া বেড়াইছে ফিরে,
যবের কণিকা তুলিয়া সে ধীরে
দিতেছে চঞ্চুপুটে।
অঙ্গুলি তার চলিছে যেমন
কত কী যে কথা ভাবিতেছে মন,
হেনকালে পথে ফেলিয়া নয়ন
সহসা কবিরে হেরি’
বাহুখানি নাড়ি মৃদু ঝিনি ঝিনি
বাজাইয়া দিল করকিঙ্কিণী,
হাসিজালখানি অতুলহাসিনী
ফেলিলা কবিরে ঘেরি।

কবির চিত্ত উঠে উল্লাসি,
অতি সত্বর সম্মুখে আসি
কহে কৌতুকে মৃদু মৃদু হাসি,
"দেখো কী এনেছি, বালা।
নানা লোকে নানা পেয়েছে রতন,
আমি আনিয়াছি করিয়া যতন
তোমার কণ্ঠে দেবার মতন
রাজকণ্ঠের মালা।"
এত বলি মালা শির হতে খুলি
প্রিয়ার গলায় দিতে গেল তুলি,
কবিনারী রোষে কর দিল ঠেলি
ফিরায়ে রহিল মুখ।
মিছে ছল করি মুখে করে রাগ,
মনে মনে তার জাগিছে সোহাগ,
গরবে ভরিয়া উঠে অনুরাগ,
হৃদয়ে উথলে সুখ।
কবি ভাবে, বিধি অপ্রসন্ন,
বিপদ আজিকে হেরি আসন্ন,—
বসি থাকে মুখ করি বিষণ্ণ
শূন্যে নয়ন মেলি।
কবির ললনা আধখানি বেঁকে
চোরা-কটাক্ষে চাহে থেকে থেকে,—
পতির মুখের ভাবখানা দেখে
মুখের বসন ফেলি
উচ্চকণ্ঠে উঠিল হাসিয়া,
তুচ্ছ ছলনা গেল সে ভাসিয়া,
চকিতে সরিয়া নিকটে আসিয়া
পড়িল তাহার বুকে,—
সেথায় লুকায়ে হাসিয়া কাঁদিয়া,
কবির কণ্ঠ বাহুতে বাঁধিয়া,

শতবার করি আপনি সাধিয়া
চুম্বিল তার মুখে।
বিস্মিত কবি বিহ্বলপ্রায়,
আনন্দে কথা খুঁজিয়া না পায় ;—
মালাখানি লয়ে আপন গলায়
আদরে পরিলা সতী।
ভক্তি-আবেগে কবি ভাবে মনে
চেয়ে সেই প্রেমপূর্ণ বদনে—
বাঁধা প'ল এক মাল্য-বাঁধনে
লক্ষ্মী-সরস্বতী।

১৩ শ্রাবণ, ১৩০০

বসুন্ধরা

আমারে ফিরায়ে লহ, অয়ি বসুন্ধরে,
কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে,
বিপুল অঞ্চলতলে। ওগো মা মৃন্ময়ী,
তোমার মৃত্তিকামাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই ;
দিগ্বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দের মতো ; বিদারিয়া
এ বক্ষ-পঞ্জর, টুটিয়া পাষাণ-বন্ধ
সংকীর্ণ প্রাচীর, আপনার নিরানন্দ
অন্ধ কারাগার— হিল্লোলিয়া, মর্ম্মরিয়া,
কম্পিয়া, স্খলিয়া, বিকিরিয়া, বিচ্ছুরিয়া,
শিহরিয়া, সচকিয়া আলোকে পুলকে
প্রবাহিয়া চলে যাই সমস্ত ভূলোকে
প্রান্ত হতে প্রান্তভাগে ; উত্তরে দক্ষিণে,
পুরবে পশ্চিমে ; শৈবালে শাদ্বলে তৃণে

শাখায় বল্কলে পত্রে উঠি সরসিয়া
নিগূঢ় জীবনরসে ; যাই পরশিয়া
স্বর্ণশীর্ষে-আনমিত শস্যক্ষেত্রতল
অঙ্গুলির আন্দোলনে ; নব পুষ্পদল
করি পূর্ণ সংগোপনে সুবর্ণলেখায়
সুধাগন্ধে মধুবিন্দুভারে ; নীলিমায়
পরিব্যাপ্ত করি দিয়া মহাসিন্ধুনীর
তীরে তীরে করি নৃত্য স্তব্ধ ধরণীর
অনন্ত কল্লোলগীতে ; উল্লসিত রঙ্গে
ভাষা প্রসারিয়া দিই তরঙ্গে তরঙ্গে
দিক্‌-দিগন্তরে ; শুভ্র উত্তরীয়প্রায়
শৈলশৃঙ্গে বিছাইয়া দিই আপনায়
নিষ্কলঙ্ক নীহারের উত্তুঙ্গ নির্জনে,
নিঃশব্দ নিভৃতে।

যে-ইচ্ছা গোপনে মনে
উৎসসম উঠিতেছে অজ্ঞাতে আমার
বহুকাল ধ'রে— হৃদয়ের চারিধার
ক্রমে পরিপূর্ণ করি বাহিরিতে চাহে
উদ্বেল উদ্দাম মুক্ত উদার প্রবাহে
সিঞ্চিতে তোমায়— ব্যথিত সে বাসনারে
বন্ধমুক্ত করি দিয়া শতলক্ষ ধারে
দেশে দেশে দিকে দিকে পাঠাব কেমনে
অন্তর ভেদিয়া। বসি শুধু গৃহকোণে
লুব্ধ চিত্তে করিতেছি সদা অধ্যয়ন
দেশে দেশান্তরে কারা করেছে ভ্রমণ
কৌতূহলবশে ; আমি তাহাদের সনে
করিতেছি তোমারে বেষ্টন মনে মনে
কল্পনার জালে।

সুদুর্গম দূরদেশ,—
পথশূন্য তরুশূন্য প্রান্তর অশেষ,
মহাপিপাসার রঙ্গভূমি ; রৌদ্রালোকে
জলন্ত বালুকারাশি সূচি বিঁধে চোখে ;
দিগন্তবিস্তৃত যেন ধূলিশয্যা 'পরে
জ্বরাতুরা বসুন্ধরা লুটাইছে পড়ে
তপ্তদেহ, উষ্ণশ্বাস বহ্নিজ্বালাময়,
শুষ্ককণ্ঠ, সঙ্গহীন, নিঃশব্দ, নির্দয়।
কতদিন গৃহপ্রান্তে বসি বাতায়নে
দূরদূরান্তের দৃশ্য আঁকিয়াছি মনে
চাহিয়া সম্মুখে ;— চারিদিকে শৈলমালা,
মধ্যে নীল সরোবর নিস্তব্ধ নিরালা,
স্ফটিকনির্মল স্বচ্ছ ; খণ্ড মেঘগণ
মাতৃস্তনপানরত শিশুর মতন
পড়ে আছে শিখর আঁকড়ি ; হিমরেখা
নীলগিরিশ্রেণী 'পরে দূরে যায় দেখা
দৃষ্টিরোধ করি', যেন নিশ্চল নিষেধ
উঠিয়াছে সারি সারি স্বর্গ করি ভেদ
যোগমগ্ন ধূর্জটির তপোবন-দ্বারে।
মনে মনে ভ্রমিয়াছি দূর সিন্ধুপারে
মহামেরুদেশে— যেখানে লয়েছে ধরা
অনন্তকুমারীব্রত, হিমবস্ত্রপরা,
নিঃসঙ্গ নিঃস্পৃহ, সর্ব-আভরণহীন ;
যেথা দীর্ঘরাত্রিশেষে ফিরে আসে দিন
শব্দশূন্য সংগীতবিহীন ; রাত্রি আসে —
ঘুমাবার কেহ নাই, অনন্ত আকাশে
অনিমেষ জেগে থাকে নিদ্রাতন্দ্রাহত
শূন্যশয্যা মৃতপুত্রা জননীর মতো।
নূতন দেশের নাম যত পাঠ করি,
বিচিত্র বর্ণনা শুনি, চিত্ত অগ্রসরি

সমস্ত স্পর্শিতে চাহে ; সমুদ্রের তটে
ছোটো ছোটো নীলবর্ণ পর্বতসংকটে
একখানি গ্রাম, তীরে শুকাইছে জাল,
জলে ভাসিতেছে তরী, উড়িতেছে পাল,
জেলে ধরিতেছে মাছ, গিরিমধ্যপথে
সংকীর্ণ নদীটি চলি আসে কোনোমতে
আঁকিয়া বাঁকিয়া ; ইচ্ছা করে সে নিভৃত
গিরিক্রোড়ে সুখাসীন উর্মিমুখরিত
লোকনীড়খানি হৃদয়ে বেষ্টিয়া ধরি
বাহুপাশে। ইচ্ছা করে, আপনার করি
যেখানে যা-কিছু আছে ;— নদীস্রোতোনীরে
আপনারে গলাইয়া দুই তীরে তীরে
নব নব লোকালয়ে করে যাই দান
পিপাসার জল, গেয়ে যাই কলগান
দিবসে নিশীথে ; পৃথিবীর মাঝখানে
উদয়সমুদ্র হতে অস্তসিন্ধুপানে
প্রসারিয়া আপনারে তুঙ্গ গিরিরাজি
আপনার সুদুর্গম রহস্যে বিরাজি ;
কঠিন পাষাণক্রোড়ে তীব্র হিমবায়ে
মানুষ করিয়া তুলি লুকায়ে লুকায়ে
নব নব জাতি। ইচ্ছা করে মনে মনে
স্বজাতি হইয়া থাকি সর্বলোকসনে
দেশে দেশান্তরে ; উষ্ট্রদুগ্ধ করি পান
মরুতে মানুষ হই আরব-সন্তান
দুর্দম স্বাধীন ; তিব্বতের গিরিতটে
নির্লিপ্ত প্রস্তরপুরীমাঝে, বৌদ্ধমঠে
করি বিচরণ। দ্রাক্ষাপায়ী পারসিক
গোলাপকাননবাসী, তাতার নির্ভীক
অশ্বারূঢ়, শিষ্টাচারী সতেজ জাপান,
প্রবীণ প্রাচীন চীন নিশিদিনমান

কর্ম-অনুরত,— সকলের ঘরে ঘরে
জন্মলাভ করে লই হেন ইচ্ছা করে।
অরুগ্ন বলিষ্ঠ হিংস্র নগ্ন বর্বরতা—
নাহি কোনো ধর্মাধর্ম, নাহি সাধু প্রথা,
নাহি কোনো বাধাবন্ধ, নাহি চিন্তাজ্বর,
নাহি কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্ব, নাহি ঘর-পর,
উন্মুক্ত জীবনস্রোত বহে দিনরাত
সম্মুখে আঘাত করি সহিয়া আঘাত
অকাতরে; পরিতাপ-জর্জর পরানে
বৃথা ক্ষোভে নাহি চায় অতীতের পানে,
ভবিষ্যৎ নাহি হেরে মিথ্যা দুরাশায়—
বর্তমান-তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায়
নৃত্য করে চলে যায় আবেগে উল্লাসি,—
উচ্ছৃঙ্খল সে-জীবন সে-ও ভালোবাসি—
কত বার ইচ্ছা করে সেই প্রাণঝড়ে
ছুটিয়া চলিয়া যাই পূর্ণপালভরে
লঘুতরীসম।

হিংস্র ব্যাঘ্র অটবীর—
আপন প্রচণ্ড বলে প্রকাণ্ড শরীর
বহিতেছে অবহেলে,— দেহ দীপ্তোজ্জ্বল
অরণ্যমেঘের তলে প্রচ্ছন্ন-অনল
বজ্রের মতন, রুদ্র মেঘমন্দ্র স্বরে
পড়ে আসি অতর্কিত শিকারের ’পরে
বিদ্যুতের বেগে, অনায়াস সে মহিমা,
হিংসাতীব্র সে আনন্দ, সে দৃপ্ত গরিমা,
ইচ্ছা করে একবার লভি তার স্বাদ;
ইচ্ছা করে বারবার মিটাইতে সাধ
পান করি বিশ্বের সকল পাত্র হতে
আনন্দমদিরাধারা নব নব স্রোতে।

হে সুন্দরী বসুন্ধরে, তোমা পানে চেয়ে
কত বার প্রাণ মোর উঠিয়াছে গেয়ে
প্রকাণ্ড উল্লাসভরে ; ইচ্ছা করিয়াছে
সবলে আঁকড়ি ধরি এ বক্ষের কাছে
সমুদ্রমেখলা-পরা তব কটিদেশ ;
প্রভাত-রৌদ্রের মতো অনন্ত অশেষ
ব্যাপ্ত হয়ে দিকে দিকে, অরণ্যে ভূধরে
কম্পমান পল্লবের হিল্লোলের 'পরে
করি নৃত্য সারাবেলা, করিয়া চুম্বন
প্রত্যেক কুসুমকলি, করি' আলিঙ্গন
সঘন কোমল শ্যাম তৃণক্ষেত্রগুলি,
প্রত্যেক তরঙ্গ'পরে সারাদিন তুলি'
আনন্দ-দোলায়। রজনীতে চুপে চুপে
নিঃশব্দ চরণে, বিশ্বব্যাপী নিদ্রারূপে
তোমার সমস্ত পশুপক্ষীর নয়নে
অঙ্গুলি বুলায়ে দিই, শয়নে শয়নে
নীড়ে নীড়ে গৃহে গৃহে গুহায় গুহায়
করিয়া প্রবেশ, বৃহৎ অঞ্চলপ্রায়
আপনারে বিস্তারিয়া ঢাকি বিশ্বভূমি
সুস্নিগ্ধ আঁধারে।

আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের ; তোমার মৃত্তিকা সনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্ত চরণে, করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল, অসংখ্য রজনীদিন
যুগযুগান্তর ধরি আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
পত্রফুলফল গন্ধরেণু। তাই আজি

কোনোদিন আনমনে বসিয়া একাকী
পদ্মাতীরে, সম্মুখে মেলিয়া মুগ্ধ আঁখি
সর্ব অঙ্গে সর্ব মনে অনুভব করি
তোমার মৃত্তিকামাঝে কেমনে শিহরি
উঠিতেছে তৃণাঙ্কুর; তোমার অন্তরে
কী জীবন-রসধারা অহর্নিশি ধরে
করিতেছে সঞ্চরণ; কুসুম-মুকুল
কী অন্ধ আনন্দভরে ফুটিয়া আকুল
সুন্দর বৃন্তের মুখে; নব রৌদ্রালোকে
তরুলতাতৃণগুল্ম কী গূঢ় পুলকে
কী মূঢ় প্রমোদ-রসে উঠে হরষিয়া—
মাতৃস্তনপানশ্রান্ত পরিতৃপ্ত-হিয়া
সুখস্বপ্নহাস্যমুখ শিশুর মতন।
তাই আজি কোনো দিন— শরৎ-কিরণ
পড়ে যবে পক্বশীর্ষ স্বর্ণক্ষেত্র ’পরে,
নারিকেলদলগুলি কাঁপে বায়ুভরে
আলোকে ঝিকিয়া, জাগে মহাব্যাকুলতা,
মনে পড়ে বুঝি সেই দিবসের কথা
মন যবে ছিল মোর সর্বব্যাপী হয়ে
জলে স্থলে, অরণ্যের পল্লবনিলয়ে,
আকাশের নীলিমায়। ডাকে যেন মোরে
অব্যক্ত আহ্বান-রবে শতবার করে
সমস্ত ভুবন; সে বিচিত্র সে বৃহৎ
খেলাঘর হতে, মিশ্রিত মর্মরবৎ
শুনিবারে পাই যেন চিরদিনকার
সঙ্গীদের লক্ষবিধ আনন্দ-খেলার
পরিচিত রব। সেথায় ফিরায়ে লহ
মোরে আরবার; দূর করো সে বিরহ,
যে বিরহ থেকে থেকে জেগে ওঠে মনে
হেরি যবে সম্মুখেতে সন্ধ্যার কিরণে

বিশাল প্রান্তর, যবে ফিরে গাভীগুলি
দূর গোষ্ঠে— মাঠপথে উড়াইয়া ধূলি,
তরুঘেরা গ্রাম হতে উঠে ধূমলেখা
সন্ধ্যাকাশে ; যবে চন্দ্র দূরে দেয় দেখা
শ্রান্ত পথিকের মতো অতি ধীরে ধীরে
নদীপ্রান্তে জনশূন্য বালুকার তীরে ;
মনে হয় আপনারে একাকী প্রবাসী
নির্বাসিত ; বাহু বাড়াইয়া ধেয়ে আসি
সমস্ত বাহিরখানি লইতে অন্তরে—
এ আকাশ, এ ধরণী, এই নদী'পরে
শুভ্র শান্ত সুপ্ত জ্যোৎস্নারাশি। কিছু নাহি
পারি পরশিতে, শুধু শূন্যে থাকি চাহি
বিষাদব্যাকুল। আমারে ফিরায়ে লহ
সেই সর্বমাঝে, যেথা হতে অহরহ
অঙ্কুরিছে মুকুলিছে মুঞ্জরিছে প্রাণ
শতেক সহস্ররূপে,— গুঞ্জরিছে গান
শতলক্ষ সুরে, উচ্ছ্বসি উঠিছে নৃত্য
অসংখ্য ভঙ্গীতে, প্রবাহি যেতেছে চিত্ত
ভাবস্রোতে, ছিদ্রে ছিদ্রে বাজিতেছে বেণু ;—
দাঁড়ায়ে রয়েছ তুমি শ্যাম কল্পধেনু,
তোমারে সহস্র দিকে করিছে দোহন
তরুলতা পশুপক্ষী কত অগণন
তৃষিত পরানি যত, আনন্দের রস
কতরূপে হতেছে বর্ষণ, দিক দশ
ধ্বনিছে কল্লোলগীতে। নিখিলের সেই
বিচিত্র আনন্দ যত এক মুহূর্তেই
একত্রে করিব আস্বাদন, এক হয়ে
সকলের সনে। আমার আনন্দ লয়ে
হবে না কি শ্যামতর অরণ্য তোমার,—
প্রভাত-আলোকমাঝে হবে না সঞ্চার

নবীন কিরণকম্প ? মোর মুগ্ধ ভাবে
আকাশ ধরণীতল আঁকা হয়ে যাবে
হৃদয়ের রঙে— যা দেখে কবির মনে
জাগিবে কবিতা, প্রেমিকের দু-নয়নে
লাগিবে ভাবের ঘোর, বিহঙ্গের মুখে
সহসা আসিবে গান। সহস্রের সুখে
রঞ্জিত হইয়া আছে সর্বাঙ্গ তোমার
হে বসুধে, জীবস্রোত কত বারম্বার
তোমারে মণ্ডিত করি আপন জীবনে
গিয়েছে ফিরেছে, তোমার মৃত্তিকাসনে
মিশায়েছে অন্তরের প্রেম, গেছে লিখে
কত লেখা, বিছায়েছে কত দিকে দিকে
ব্যাকুল প্রাণের আলিঙ্গন, তারি সনে
আমার সমস্ত প্রেম মিশায়ে যতনে
তোমার অঞ্চলখানি দিব রাঙাইয়া
সজীব বরনে ; আমার সকল দিয়া
সাজাব তোমারে। নদীজলে মোর গান
পাবে না কি শুনিবারে কোনো মুগ্ধ কান
নদীকূল হতে। উষালোকে মোর হাসি
পাবে না কি দেখিবারে কোনো মর্ত্যবাসী
নিদ্রা হতে উঠি। আজ শতবর্ষ পরে
এ সুন্দর অরণ্যের পল্লবের স্তরে
কাঁপিবে না আমার পরান ? ঘরে ঘরে
কত শত নরনারী চিরকাল ধরে
পাতিবে সংসারখেলা, তাহাদের প্রেমে
কিছু কি রব না আমি। আসিব না নেমে
তাদের মুখের 'পরে হাসির মতন,
তাদের সর্বাঙ্গমাঝে সরস যৌবন,
তাদের বসন্ত-দিনে অকস্মাৎ সুখ,
তাদের মনের কোণে নবীন উন্মুখ

প্রেমের অঙ্কুররূপে ? ছেড়ে দিবে তুমি
আমারে কি একেবারে ওগো মাতৃভূমি,—
যুগযুগান্তের মহা মৃত্তিকা-বন্ধন
সহসা কি ছিঁড়ে যাবে। করিব গমন
ছাড়ি লক্ষ বরষের স্নিগ্ধ ক্রোড়খানি ?
চতুর্দিক হতে মোরে লবে না কি টানি
এই সব তরু লতা গিরি নদী বন,
এই চিরদিবসের সুনীল গগন,
এ জীবনপরিপূর্ণ উদার সমীর,
জাগরণপূর্ণ আলো, সমস্ত প্রাণীর
অন্তরে অন্তরে গাঁথা জীবন-সমাজ।
ফিরিব তোমারে ঘিরি, করিব বিরাজ
তোমার আত্মীয়মাঝে ; কীট পশু পাখি
তরু গুল্ম লতা রূপে বারম্বার ডাকি
আমারে লইবে তব প্রাণতপ্ত বুকে ;
যুগে যুগে জন্মে জন্মে স্তন দিয়ে মুখে
মিটাইবে জীবনের শত লক্ষ ক্ষুধা,
শত লক্ষ আনন্দের স্তন্যরসসুধা
নিঃশেষে নিবিড় স্নেহে করাইয়া পান।
তার পরে ধরিত্রীর যুবক সন্তান
বাহিরিব জগতের মহাদেশমাঝে
অতি দূর দূরান্তরে জ্যোতিষ্কসমাজে
সুদুর্গম পথে। এখনো মিটেনি আশা,
এখনো তোমার স্তন-অমৃত-পিপাসা
মুখেতে রয়েছে লাগি, তোমার আনন
এখনো জাগায় চোখে সুন্দর স্বপন,
এখনো কিছুই তব করি নাই শেষ ;
সকলি রহস্যপূর্ণ, নেত্র অনিমেষ
বিস্ময়ের শেষতল খুঁজে নাহি পায়,
এখনো তোমার বুকে আছি শিশুপ্রায়

মুখপানে চেয়ে। জননী, লহ গো মোরে—
সঘনবন্ধন তব বাহুযুগে ধরে
আমারে করিয়া লহ তোমার বুকের,—
তোমার বিপুল প্রাণ বিচিত্র সুখের
উৎস উঠিতেছে যেথা, সে গোপন পুরে
আমারে লইয়া যাও— রাখিয়ো না দূরে।

২৬ কার্তিক, ১৩০০

মায়াবাদ

হা রে নিরানন্দ দেশ, পরি জীর্ণ জরা,
বহি বিজ্ঞতার বোঝা, ভাবিতেছ মনে
ঈশ্বরের প্রবঞ্চনা পড়িয়াছে ধরা
সুচতুর সূক্ষ্মদৃষ্টি তোমার নয়নে।
লয়ে কুশাঙ্কুর বুদ্ধি শাণিত প্রখরা
কর্মহীন রাত্রিদিন বসি গৃহকোণে
মিথ্যা বলে জানিয়াছ বিশ্ব-বসুন্ধরা
গ্রহতারাময় সৃষ্টি অনন্ত গগনে।
যুগযুগান্তর ধরে পশু পক্ষী প্রাণী
অচল নির্ভয়ে হেথা নিতেছে নিশ্বাস
বিধাতার জগতেরে মাতৃক্রোড় মানি ;
তুমি বৃদ্ধ কিছুরেই কর না বিশ্বাস।
লক্ষ কোটি জীব লয়ে এ বিশ্বের মেলা
তুমি জানিতেছ মনে সব ছেলেখেলা।

খেলা

হোক খেলা, এ খেলায় যোগ দিতে হবে
আনন্দকল্লোলাকুল নিখিলের সনে।
সব ছেড়ে মৌনী হয়ে কোথা বসে রবে
আপনার অন্তরের অন্ধকার কোণে।
জেনো মনে শিশু তুমি এ বিপুল ভবে
অনন্ত কালের কোলে গগন-প্রাঙ্গণে,
যত জান মনে কর কিছুই জান না।
বিনয়ে বিশ্বাসে প্রেমে হাতে লহ তুলি
বর্ণগন্ধগীতময় যে মহা-খেলনা
তোমারে দিয়াছে মাতা ; হয় যদি ধূলি
হোক ধূলি, এ ধূলির কোথায় তুলনা।
থেকো না অকালবৃদ্ধ বসিয়া একেলা,
কেমনে মানুষ হবে না করিলে খেলা।

বন্ধন

বন্ধন ? বন্ধন বটে, সকলি বন্ধন
স্নেহ প্রেম সুখতৃষ্ণা ; সে যে মাতৃপাণি
স্তন হতে স্তনান্তরে লইতেছে টানি,
নব নব রসস্রোতে পূর্ণ করি মন
সদা করাইছে পান। স্তন্যের পিপাসা
কল্যাণদায়িনীরূপে থাকে শিশুমুখে—
তেমনি সহজ তৃষ্ণা আশা ভালোবাসা
সমস্ত বিশ্বের রস কত সুখে দুখে
করিতেছে আকর্ষণ, জনমে জনমে
প্রাণে মনে পূর্ণ করি গঠিতেছে ক্রমে
দুর্লভ জীবন ; পলে পলে নব আশ
নিয়ে যায় নব নব আস্বাদে আশ্রমে।

স্তন্যতৃষ্ণা নষ্ট করি মাতৃবন্ধপাশ
ছিন্ন করিবারে চাস কোন্ মুক্তিভ্রমে।

গতি

জানি আমি সুখে দুঃখে হাসি ও ক্রন্দনে
পরিপূর্ণ এ জীবন; কঠোর বন্ধনে
ক্ষতচিহ্ন পড়ে যায় গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে,
জানি আমি সংসারের সমুদ্র মন্থিতে
কারো ভাগ্যে সুধা ওঠে, কারো হলাহল।
জানি না কেন এ সব, কোন্ ফলাফল
আছে এই বিশ্বব্যাপী কর্মশৃঙ্খলার,—
জানি না কী হবে পরে, সবি অন্ধকার
আদি অন্ত এ সংসারে; নিখিল দুঃখের
অন্ত আছে কি না আছে, সুখ-বুভুক্ষের
মিটে কি না চির-আশা। পণ্ডিতের দ্বারে
চাহি না এ জনম-রহস্য জানিবারে।
চাহি না ছিঁড়িতে একা বিশ্বব্যাপী ডোর,
লক্ষকোটি প্রাণী সাথে এক গতি মোর।

মুক্তি

চক্ষু কর্ণ বুদ্ধি মন সব রুদ্ধ করি,
বিমুখ হইয়া সর্ব জগতের পানে,
শুদ্ধ আপনার ক্ষুদ্র আত্মাটিরে ধরি,
মুক্তি-আশে সন্তরিব কোথায় কে জানে।
পার্শ্ব দিয়ে ভেসে যাবে বিশ্ব-মহাতরী
অম্বর আকুল করি যাত্রীদের গানে,
শুভ্র কিরণের পালে দশ দিক্ ভরি',
বিচিত্র সৌন্দর্যে পূর্ণ অসংখ্য পরানে।

ধীরে ধীরে চলে যাবে দূর হতে দূরে
অখিল ক্রন্দন হাসি আঁধার আলোক,
বহে যাবে শূন্যপথে সকরুণ স্বরে
অনন্ত জগৎভরা যত দুঃখশোক।
বিশ্ব যদি চলে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে
আমি একা বসে রব মুক্তি-সমাধিতে ?

অক্ষমা

যেখানে এসেছি আমি, আমি সেথাকার,
দরিদ্র সন্তান আমি দীন ধরণীর।
জন্মাবধি যা পেয়েছি সুখদুঃখভার
বহু ভাগ্য বলে তাই করিয়াছি স্থির।
অসীম ঐশ্বর্যরাশি নাই তোর হাতে
হে শ্যামলা সর্বসহা জননী মৃন্ময়ী।
সকলের মুখে অন্ন চাহিস জোগাতে,
পারিসনে কত বার,— কই অন্ন কই,
কাঁদে তোর সন্তানেরা ম্লান শুষ্ক মুখ ;—
জানি মা গো, তোর হাতে অসম্পূর্ণ সুখ,
যা-কিছু গড়িয়া দিস ভেঙে ভেঙে যায়,
সব তাতে হাত দেয় মৃত্যু সর্বভুক,
সব আশা মিটাইতে পারিসনে হায়
তা বলে কি ছেড়ে যাব তোর তপ্ত বুক।

দরিদ্রা

দরিদ্রা বলিয়া তোরে বেশি ভালোবাসি
হে ধরিত্রী, স্নেহ তোর বেশি ভালো লাগে,
বেদনাকাতর মুখে সকরুণ হাসি,
দেখে মোর মর্মমাঝে বড়ো ব্যথা জাগে।

আপনার বক্ষ হতে রসরক্ত নিয়ে
প্রাণটুকু দিয়েছিস সন্তানের দেহে,
অহর্নিশি মুখে তার আছিস তাকিয়ে
অমৃত নারিস দিতে প্রাণপণ স্নেহে।
কত যুগ হতে তুই বর্ণগন্ধগীতে
সৃজন করিতেছিস আনন্দ-আবাস,
আজো শেষ নাহি হল দিবসে নিশীথে,—
স্বর্গ নাই, রচেছিস স্বর্গের আভাস।
তাই তোর মুখখানি বিষাদকোমল,
সকল সৌন্দর্যে তোর ভরা অশ্রুজল।

আত্মসমর্পণ

তোমার আনন্দগানে আমি দিব সুর
যাহা জানি দু-একটি প্রীতিসুমধুর
অন্তরের ছন্দোগাথা; দুঃখের ক্রন্দনে
বাজিবে আমার কণ্ঠ বিষাদবিধুর
তোমার কণ্ঠের সনে; কুসুমে চন্দনে
তোমারে পূজিব আমি; পরাব সিন্দুর
তোমার সীমন্তে ভালে; বিচিত্র বন্ধনে
তোমারে বাঁধিব আমি; প্রমোদসিন্ধুর
তরঙ্গেতে দিব দোলা নব ছন্দে তানে।
মানব-আত্মার গর্ব আর নাহি মোর
চেয়ে তোর স্নিগ্ধশ্যাম মাতৃমুখ-পানে,
ভালোবাসিয়াছি আমি ধূলিমাটি তোর।
জন্মেছি যে মর্ত্য-কোলে ঘৃণা করি তারে
ছুটিব না স্বর্গ আর মুক্তি খুঁজিবারে।

৫ অগ্রহায়ণ, ১৩০০

অচল স্মৃতি

আমার হৃদয়ভূমি-মাঝখানে
জাগিয়া রয়েছে নিতি
অচল ধবল শৈলসমান
একটি অচল স্মৃতি।
প্রতিদিন ঘিরি ঘিরি
সে নীরব হিমগিরি
আমার দিবস আমার রজনী
আসিছে যেতেছে ফিরি।

যেখানে চরণ রেখেছে, সে মোর
মর্ম গভীরতম,—
উন্নত শির রয়েছে তুলিয়া
সকল উচ্চে মম।
মোর কল্পনা শত
রঙিন মেঘের মতো
তাহারে ঘেরিয়া হাসিছে কাঁদিছে
সোহাগে হতেছে নত।

আমার শ্যামল তরুলতাগুলি
ফুলপল্লবভারে
সরস কোমল বাহুবেষ্টনে
বাঁধিতে চাহিছে তারে।
শিখর গগনলীন
দুর্গম জনহীন,
বাসনা-বিহগ একেলা সেথায়
ধাইছে রাত্রিদিন।

চারিদিকে তার কত আসা-যাওয়া,
কত গীত কত কথা,—
মাঝখানে শুধু ধ্যানের মতন
নিশ্চল নীরবতা।
দূরে গেলে তবু, একা
সে শিখর যায় দেখা,—
চিত্তগগনে আঁকা থাকে তার
নিত্য-নীহার-রেখা।

উডফীল্ড, সিমলা
১১ অগ্রহায়ণ, ১৩৪০

কণ্টকের কথা

একদা পুলকে প্রভাত-আলোকে
গাহিছে পাখি;
কহে কণ্টক বাঁকা কটাক্ষে
কুসুমে ডাকি;—
তুমি তো কোমল বিলাসী কমল,
দুলায় বায়ু,
দিনের কিরণ ফুরাতে ফুরাতে
ফুরায় আয়ু;
এ পাশে মধুপ মধুমদে ভোর,
ও পাশে পবন পরিমল-চোর,
বনের দুলাল, হাসি পায় তোর
আদর দেখে।
আহা মরি মরি কী রঙিন বেশ,
সোহাগ-হাসির নাহি আর শেষ,
সারাবেলা ধরি রসালসাবেশ
গন্ধ মেখে।

হায় কদিনের আদর-সোহাগ
সাধের খেলা,
ললিত মাধুরী, রঙিন বিলাস,
মধুপ-মেলা।

ওগো নহি আমি তোদের মতন
সুখের প্রাণী,
হাব ভাব হাস, নানারঙা বাস
নাহিকো জানি।
রয়েছি নগ্ন, জগতে লগ্ন
আপন বলে,
কে পারে তাড়াতে আমারে গাড়াতে
ধরণীতলে।
তোদের মতন নহি নিমেষের,
আমি এ নিখিলে চিরদিবসের,
বৃষ্টিবাদল ঝড়বাতাসের
না রাখি ভয়।
সতত একাকী, সঙ্গীবিহীন,
কারো কাছে কোনো নাহি প্রেম-ঋণ,
চাটুগান শুনি সারা নিশিদিন
করি না ক্ষয়।
আসিবে তো শীত, বিহঙ্গগীত
যাইবে থামি,
ফুলপল্লব ঝরে যাবে সব,
রহিব আমি।

চেয়ে দেখো মোরে, কোনো বাহুল্য
কোথাও নাই,
স্পষ্ট সকলি, আমার মূল্য
জানে সবাই।

এ ভীরু জগতে যার কাঠিন্য
জগৎ তারি।
নখের আঁচড়ে আপন চিহ্ন
রাখিতে পারি।
কেহ জগতেরে চামর ঢুলায়,
চরণে কোমল হস্ত বুলায়,
নতমস্তকে লুটায়ে ধুলায়
প্রণাম করে।
ভুলাইতে মন কত করে ছল,
কাহারো বর্ণ, কারো পরিমল,
বিফল বাসরসজ্জা, কেবল
হ্লাদন-তরে।
কিছুই করি না, নীরবে দাঁড়ায়ে
তুলিয়া শির
বিঁধিয়া রয়েছি অন্তরমাঝে
এ পৃথিবীর।

আমারে তোমরা চাহ না চাহিতে
চোখের কোণে,
গরবে ফাটিয়া উঠেছ ফুটিয়া
আপন-মনে।
আছে তব মধু, থাক্ সে তোমার,
আমার নাহি।
আছে তব রূপ,— মোর পানে কেহ
দেখে না চাহি।
কারো আছে:শাখা, কারো আছে দল,
কারো আছে ফুল, কারো আছে ফল,
আমারি হস্ত রিক্ত কেবল
দিবসযামি।

ওহে তরু, তুমি বৃহৎ প্রবীণ,
আমাদের প্রতি অতি উদাসীন,
আমি বড়ো নহি, আমি ছায়াহীন,
ক্ষুদ্র আমি।
হই না ক্ষুদ্র, তবুও রুদ্র
ভীষণ ভয়,
আমার দৈন্য সে মোর সৈন্য
তাহারি জয়।

২৯ কার্তিক, ১৩০০

নিরুদ্দেশ যাত্রা

আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে
হে সুন্দরী ?
বলো কোন্ পার ভিড়িবে তোমার
সোনার তরী।
যখনি শুধাই, ওগো বিদেশিনী,
তুমি হাস শুধু, মধুরহাসিনী,
বুঝিতে না পারি, কী জানি কী আছে
তোমার মনে।
নীরবে দেখাও অঙ্গুলি তুলি
অকূল সিন্ধু উঠিছে আকুলি,
দূরে পশ্চিমে ডুবিছে তপন
গগন-কোণে।
কী আছে হোথায়— চলেছি কিসের
অন্বেষণে।

বলো দেখি মোরে শুধাই তোমায়,
অপরিচিতা,—
ওই যেথা জলে সন্ধ্যার কূলে
দিনের চিতা,
ঝলিতেছে জল তরল অনল,
গলিয়া পড়িছে অম্বরতল,
দিক্‌বধূ যেন ছলছল-আঁখি
অশ্রুজলে,
হোথায় কি আছে আলয় তোমার
ঊর্মিমুখর সাগরের পার,
মেঘচুম্বিত অস্তগিরির
চরণতলে।
তুমি হাস শুধু মুখপানে চেয়ে
কথা না বলে।

হুহু করে বায়ু ফেলিছে সতত
দীর্ঘশ্বাস।
অন্ধ আবেগে করে গর্জন
জলোচ্ছ্বাস।
সংশয়ময় ঘননীল নীর,
কোনো দিকে চেয়ে নাহি হেরি তীর,
অসীম রোদন জগৎ প্লাবিয়া
দুলিছে যেন ;
তারি ’পরে ভাসে তরণী হিরণ,
তারি ’পরে পড়ে সন্ধ্যাকিরণ,
তারি মাঝে বসি এ নীরব হাসি
হাসিছ কেন।
আমি তো বুঝি না কী লাগি তোমার
বিলাস হেন।

যখন প্রথম ডেকেছিলে তুমি—
“কে যাবে সাথে,”
চাহিনু বারেক তোমার নয়নে
নবীন প্রাতে।
দেখালে সমুখে প্রসারিয়া কর
পশ্চিমপানে অসীম সাগর,
চঞ্চল আলো আশার মতন
কাঁপিছে জলে।
তরীতে উঠিয়া শুধানু তখন
আছে কি হোথায় নবীন জীবন,
আশার স্বপন ফলে কি হোথায়
সোনার ফলে?
মুখপানে চেয়ে হাসিলে কেবল
কথা না বলে।

তার পরে কভু উঠিয়াছে মেঘ,
কখনো রবি,
কখনো ক্ষুব্ধ সাগর, কখনো
শান্ত ছবি।
বেলা বহে যায়, পালে লাগে বায়,
সোনার তরণী কোথা চলে যায়,
পশ্চিমে হেরি নামিছে তপন
অস্তাচলে।
এখন বারেক শুধাই তোমায়
স্নিগ্ধ মরণ আছে কি হোথায়,
আছে কি শান্তি, আছে কি সুপ্তি
তিমিরতলে?
হাসিতেছ তুমি তুলিয়া নয়ন
কথা না বলে।

আঁধার রজনী আসিবে এখনি
মেলিয়া পাখা,
সন্ধ্যা-আকাশে স্বর্ণ-আলোক
পড়িবে ঢাকা।
শুধু ভাসে তব দেহসৌরভ,
শুধু কানে আসে জল-কলরব,
গায়ে উড়ে পড়ে বায়ুভরে তব
কেশের রাশি।
বিকল হৃদয় বিবশ শরীর
ডাকিয়া তোমারে কহিব অধীর,—
"কোথা আছ ওগো, করহ পরশ
নিকটে আসি।"
কহিবে না কথা, দেখিতে পাব না
নীরব হাসি।

২৭ অগ্রহায়ণ, ১৩০০

নাটক ও প্রহসন

চিত্রাঙ্গদা

উৎসর্গ

স্নেহাস্পদ শ্রীমান অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
পরমকল্যাণীয়েষু

বৎস,

তুমি আমাকে তোমার যত্নরচিত চিত্রগুলি উপহার দিয়াছ, আমি তোমাকে আমার কাব্য এবং স্নেহ-আশীর্বাদ দিলাম।

১৫ শ্রাবণ
১২৯৯

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সূচনা

অনেক বছর আগে রেলগাড়িতে যাচ্ছিলুম শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতার দিকে। তখন বোধ করি চৈত্রমাস হবে। রেল লাইনের ধারে ধারে আগাছার জঙ্গল। হলদে বেগনি সাদা রঙের ফুল ফুটেছে অজস্র। দেখতে দেখতে এই ভাবনা এল মনে যে আর কিছুকাল পরেই রৌদ্র হবে প্রখর, ফুলগুলি তার রঙের মরীচিকা নিয়ে যাবে মিলিয়ে—তখন পল্লীপ্রাঙ্গণে আম ধরবে গাছের ডালে ডালে, তরুপ্রকৃতি তার অন্তরের নিগূঢ় রসসঞ্চয়ের স্থায়ী পরিচয় দেবে আপন অপ্রগল্‌ভ ফল-সম্ভারে। সেই সঙ্গে কেন জানি হঠাৎ আমার মনে হল সুন্দরী যুবতী যদি অনুভব করে যে সে তার যৌবনের মায়া দিয়ে প্রেমিকের হৃদয় ভুলিয়েছে তাহলে সে তার সুরূপকেই আপন সৌভাগ্যের মুখ্য অংশে ভাগ বসাবার অভিযোগে সতিন বলে ধিক্‌কার দিতে পারে। এ যে তার বাইরের জিনিস, এ যেন ঋতুরাজ বসন্তের কাছ থেকে পাওয়া বর, ক্ষণিক মোহ বিস্তারের দ্বারা জৈব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্যে। যদি তার অন্তরের মধ্যে যথার্থ চারিত্রশক্তি থাকে তবে সেই মোহমুক্ত শক্তির দানই তার প্রেমিকের পক্ষে মহৎ লাভ, যুগল জীবনের জয়যাত্রার সহায়। সেই দানেই আত্মার স্থায়ী পরিচয়, এর পরিণামে ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই, অভ্যাসের ধূলিপ্রলেপে উজ্জ্বলতার মালিন্য নেই। এই চারিত্রশক্তি জীবনের ধ্রুব সম্বল, নির্মম প্রকৃতির আশু প্রয়োজনের প্রতি তার নির্ভর নয়। অর্থাৎ এর মূল্য মানবিক, এ নয় প্রাকৃতিক।

এই ভাবটাকে নাট্য আকারে প্রকাশ-ইচ্ছা তখনি মনে এল, সেই সঙ্গেই মনে পড়ল মহাভারতের চিত্রাঙ্গদার কাহিনী। এই কাহিনীটি কিছু রূপান্তর নিয়ে অনেক দিন আমার মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল। অবশেষে লেখবার আনন্দিত অবকাশ পাওয়া গেল উড়িষ্যায় পাণ্ডুয়া বলে একটি নিভৃত পল্লীতে গিয়ে।

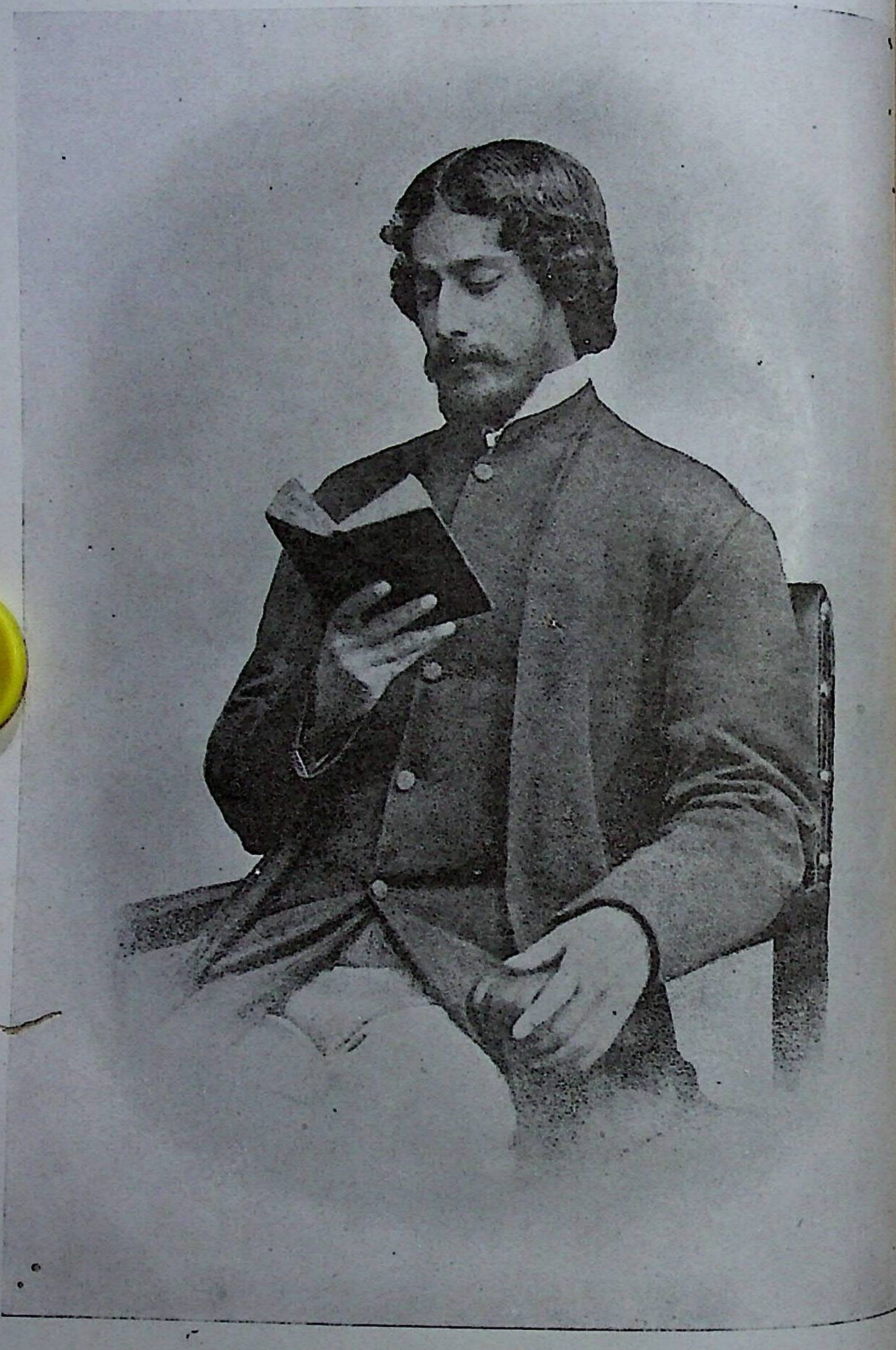

রবীন্দ্রনাথ

১২৯১

চিত্রাঙ্গদা

১

অনঙ্গ-আশ্রম

চিত্রাঙ্গদা, মদন ও বসন্ত

চিত্রাঙ্গদা। তুমি পঞ্চশর ?
মদন। আমি সেই মনসিজ,
টেনে আনি নিখিলের নরনারী-হিয়া
বেদনা-বন্ধনে।
চিত্রাঙ্গদা। কী বেদনা কী বন্ধন
জানে তাহা দাসী। প্রণমি তোমার পদে।
প্রভু, তুমি কোন্ দেব ?
বসন্ত। আমি ঋতুরাজ।
জরা মৃত্যু দুই দৈত্য নিমেষে নিমেষে
বাহির করিতে চাহে বিশ্বের কঙ্কাল ;
আমি পিছে পিছে ফিরে পদে পদে তারে
করি আক্রমণ ; রাত্রিদিন সে সংগ্রাম।
আমি অখিলের সেই অনন্ত যৌবন।
চিত্রাঙ্গদা। প্রণাম তোমারে ভগবন্। চরিতার্থ
দাসী দেব-দরশনে।
মদন। কল্যাণী, কী লাগি
এ কঠোর ব্রত তব ? তপস্যার তাপে
করিছ মলিন খিন্ন যৌবন-কুসুম,—
অনঙ্গ-পূজার নহে এমন বিধান।
কে তুমি, কী চাও ভদ্রে।

চিত্রাঙ্গদা। দয়া কর যদি,
শোনো মোর ইতিহাস। জানাব প্রার্থনা
তার পরে।
মদন। শুনিবারে রহিনু উৎসুক।
চিত্রাঙ্গদা। আমি চিত্রাঙ্গদা। মণিপুর-রাজকন্যা।
মোর পিতৃবংশে কভু পুত্রী জন্মিবে না—
দিয়াছিলা হেন বর দেব উমাপতি
তপে তুষ্ট হয়ে। আমি সেই মহাবর
ব্যর্থ করিয়াছি। অমোঘ দেবতা-বাক্য
মাতৃগর্ভে পশি দুর্বল প্রারম্ভ মোর
পারিল না পুরুষ করিতে শৈব তেজে,
এমনি কঠিন নারী আমি।
মদন। শুনিয়াছি
বটে। তাই তব পিতা পুত্রের সমান
পালিয়াছে তোমা। শিখায়েছে ধনুর্বিদ্যা
রাজদণ্ডনীতি।
চিত্রাঙ্গদা। তাই পুরুষের বেশে
নিত্য করি রাজকাজ যুবরাজরূপে,
ফিরি স্বেচ্ছামতে; নাহি জানি লজ্জা ভয়,
অন্তঃপুরবাস; নাহি জানি হাবভাব,
বিলাস-চাতুরী; শিখিয়াছি ধনুর্বিদ্যা,
শুধু শিখি নাই, দেব, তব পুষ্পধনু
কেমনে বাঁকাতে হয় নয়নের কোণে।
বসন্ত। সুনয়নে, সে-বিদ্যা শিখে না কোনো নারী;
নয়ন আপনি করে আপনার কাজ,
বুকে যার বাজে সে-ই বোঝে।
চিত্রাঙ্গদা। এক দিন
গিয়েছিনু মৃগ-অন্বেষণে একাকিনী
ঘন বনে, পূর্ণা-নদীতীরে। তরুমূলে
বাঁধি অশ্ব, দুর্গম কুটিল বনপথে

পশিলাম মৃগপদচিহ্ন অনুসরি।
ঝিল্লিমন্দ্রমুখরিত নিত্য-অন্ধকার
লতাগুল্মে গহন গম্ভীর মহারণ্যে
কিছু দূর অগ্রসরি দেখিনু সহসা
রুধিয়া সংকীর্ণ পথ রয়েছে শয়ান
ভূমিতলে, চিরধারী মলিন পুরুষ।
উঠিতে কহিনু তারে অবজ্ঞার স্বরে
সরে যেতে,— নড়িল না, চাহিল না ফিরে।
উদ্ধত অধীর রোষে ধনু-অগ্রভাগে
করিনু তাড়না ;— সরল সুদীর্ঘ দেহ
মুহূর্তেই তীরবেগে উঠিল দাঁড়ায়ে
সম্মুখে আমার,— ভস্মসুপ্ত অগ্নি যথা
ঘৃতাহুতি পেয়ে, শিখারূপে উঠে ঊর্ধ্বে
চক্ষের নিমেষে। শুধু ক্ষণেকের তরে
চাহিলা আমার মুখপানে,— রোষদৃষ্টি
মিলাল পলকে ; নাচিল অধরপ্রান্তে
স্নিগ্ধ গুপ্ত কৌতুকের মৃদুহাস্যরেখা
বুঝি সে বালক-মূর্তি হেরিয়া আমার।
শিখে পুরুষের বিদ্যা, প'রে পুরুষের
বেশ, পুরুষের সাথে থেকে, এতদিন
ভুলে ছিনু যাহা, সেই মুখে চেয়ে, সেই
আপনাতে-আপনি-অটল মূর্তি হেরি',
সেই মুহূর্তেই জানিলাম মনে, নারী
আমি। সেই মুহূর্তেই প্রথম দেখিনু
সম্মুখে পুরুষ মোর।

মদন। সে-শিক্ষা আমারি
সুলক্ষণে। আমিই চেতন করে দিই
একদিন জীবনের শুভ পুণ্যক্ষণে
নারীরে হইতে নারী, পুরুষে পুরুষ।
কী ঘটিল পরে ?

চিত্রাঙ্গদা। সভয়বিস্ময়কণ্ঠে
শুধানু "কে তুমি ?" শুনিনু উত্তর "আমি
পার্থ, কুরুবংশধর।"
রহিনু দাঁড়ায়ে
চিত্রপ্রায়, ভুলে গেনু প্রণাম করিতে।
এই পার্থ ? আজন্মের বিস্ময় আমার ?
শুনেছিনু বটে, সত্যপালনের তরে
দ্বাদশ বৎসর বনে বনে ব্রহ্মচর্য
পালিছে অর্জুন। এই সেই পার্থবীর !
বাল্য-দুরাশায় কত দিন করিয়াছি
মনে, পার্থকীর্তি করিব নিষ্প্রভ আমি
নিজ ভুজবলে ; সাধিব অব্যর্থ লক্ষ্য ;
পুরুষের ছদ্মবেশে মাগিব সংগ্রাম
তাঁর সাথে, বীরত্বের দিব পরিচয়।
হা রে মুগ্ধে, কোথায় চলিয়া গেল সেই
স্পর্ধা তোর ! যে-ভূমিতে আছেন দাঁড়ায়ে
সে-ভূমির তৃণদল হইতাম যদি,
শৌর্যবীর্য যাহা কিছু ধুলায় মিলায়ে
লভিতাম দুর্লভ মরণ, সেই তাঁর
চরণের তলে।
কী ভাবিতেছিনু, মনে
নাই। দেখিনু চাহিয়া, ধীরে চলি গেলা
বীর বন-অন্তরালে। উঠিনু চমকি ;
সেইক্ষণে জন্মিল চেতনা ; আপনারে
দিলাম ধিক্কার শতবার। ছি ছি মূঢ়ে,
না করিলি সম্ভাষণ, না শুধালি কথা,
না চাহিলি ক্ষমাভিক্ষা,— বর্বরের মতো
রহিলি দাঁড়ায়ে— হেলা করি চলি গেলা
বীর। বাঁচিতাম, সে-মুহূর্তে মরিতাম
যদি।

পরদিন প্রাতে দূরে ফেলে দিনু
পুরুষের বেশ। পরিলাম রক্তাম্বর,
কঙ্কণ কিঙ্কিণী কাঞ্চি। অনভ্যস্ত সাজ
লজ্জায় জড়ায়ে অঙ্গ রহিল একান্ত
সসংকোচে।
গোপনে গেলাম সেই বনে
অরণ্যের শিবালয়ে দেখিলাম তাঁরে।—

মদন। বলে যাও বালা। মোর কাছে করিয়ো না
কোনো লাজ। আমি মনসিজ; মানসের
সকল রহস্য জানি।

চিত্রাঙ্গদা। মনে নাই ভালো,
তার পরে কী কহিনু আমি, কী উত্তর
শুনিলাম। আর শুধায়ো না, ভগবন্।
মাথায় পড়িল ভেঙে লজ্জা বজ্ররূপে,
তবু মোরে পারিল না শতধা করিতে—
নারী হয়ে এমনি পুরুষ-প্রাণ মোর।
নাহি জানি কেমনে এলেম ঘরে ফিরে
দুঃস্বপ্নবিহ্বলসম। শেষ কথা তাঁর
কর্ণে মোর বাজিতে লাগিল তপ্ত শূল—
"ব্রহ্মচারিব্রতধারী আমি। পতিযোগ্য
নহি বরাঙ্গনে।"
পুরুষের ব্রহ্মচর্য!
ধিক্ মোরে, তাও আমি নারিনু টলাতে।
তুমি জান, মীনকেতু, কত ঋষি মুনি
করিয়াছে বিসর্জন নারীপদতলে
চিরার্জিত তপস্যার ফল। ক্ষত্রিয়ের
ব্রহ্মচর্য! গৃহে গিয়ে ভাঙিয়ে ফেলিনু
ধনুঃশর যাহা কিছু ছিল; কিণাঙ্কিত
এ কঠিন বাহু—ছিল যা গর্বের ধন
এত কাল মোর—লাঞ্ছনা করিনু তারে

নিষ্ফল আক্রোশভরে। এতদিন পরে
বুঝিলাম, নারী হয়ে পুরুষের মন
না যদি জিনিতে পারি বৃথা বিদ্যা যত।
অবলার কোমল মৃণাল-বাহুদুটি
এ বাহুর চেয়ে ধরে শতগুণ বল।
ধন্য সেই মুগ্ধ মূর্খ ক্ষীণ-তনুলতা
পরাবলম্বিতা, লজ্জাভয়ে লীনাঙ্গিনী
সামান্য ললনা, যার ত্রস্ত নেত্রপাতে
মানে পরাভব বীর্যবল, তপস্যার
তেজ।

হে অনঙ্গদেব, সব দম্ভ মোর
এক দণ্ডে লয়েছ ছিনিয়া—সব বিদ্যা
সব বল করেছ তোমার পদানত।
এখন তোমার বিদ্যা শিখাও আমায়,
দাও মোরে অবলার বল, নিরস্ত্রের
অস্ত্র যত।

মদন। আমি হব সহায় তোমার।
অয়ি শুভে, বিশ্বজয়ী অর্জুনে জিনিয়া
বন্দী করি আনি দিব সম্মুখে তোমার।
রাজ্ঞী হয়ে দিয়ো তারে দণ্ড পুরস্কার
যথা ইচ্ছা। বিদ্রোহীরে করিয়ো শাসন।

চিত্রাঙ্গদা। সময় থাকিত যদি, একাকিনী আমি
তিলে তিলে হৃদয় তাঁহার করিতাম
অধিকার, নাহি চাহিতাম দেবতার
সহায়তা। সঙ্গীরূপে থাকিতাম সাথে,
রণক্ষেত্রে হতেম সারথি, মৃগয়াতে
রহিতাম অনুচর, শিবিরের দ্বারে
জাগিতাম রাত্রির প্রহরী, ভক্তরূপে
পূজিতাম, ভৃত্যরূপে করিতাম সেবা,
ক্ষত্রিয়ের মহাব্রত আর্ত-পরিত্রাণে

সখারূপে হইতাম সহায় তাঁহার।
একদিন কৌতূহলে দেখিতেন চাহি
ভাবিতেন মনে মনে "এ কোন্ বালক,
পূর্বজনমের চিরদাস, এ জনমে
সঙ্গ লইয়াছে মোর সুকৃতির মতো।"
ক্রমে খুলিতাম তাঁর হৃদয়ের দ্বার,
চিরস্থান লভিতাম সেথা। জানি আমি
এ প্রেম আমার শুধু ক্রন্দনের নহে ;
যে-নারী নির্বাক্ ধৈর্যে চিরমর্মব্যথা
নিশীথ-নয়নজলে করয়ে পালন,
দিবালোকে ঢেকে রাখে ম্লান হাসিতলে,
আজন্মবিধবা, আমি সে-রমণী নহি ;
আমার কামনা কভু হবে না নিষ্ফল।
নিজেরে বারেক যদি প্রকাশিতে পারি,
নিশ্চয় সে দিবে ধরা। হায় হতবিধি,
সেদিন কী দেখেছিল! শরমে কুঞ্চিত
শঙ্কিত কম্পিত নারী, বিবশ বিহ্বল
প্রলাপবাদিনী। কিন্তু আমি যথার্থ কি
তাই? যেমন সহস্র নারী পথে গৃহে
চারিদিকে, শুধু ক্রন্দনের অধিকারী,
তার চেয়ে বেশি নই আমি? কিন্তু হায়
আপনার পরিচয় দেওয়া, বহু ধৈর্যে
বহু দিনে ঘটে, চিরজীবনের কাজ,
জন্মজন্মান্তের ব্রত। তাই আসিয়াছি
দ্বারে তোমাদের, করেছি কঠোর তপ।
হে ভুবনজয়ী দেব, হে মহাসুন্দর
ঋতুরাজ, শুধু এক দিবসের তরে
ঘুচাইয়া দাও, জন্মদাতা বিধাতার
বিনাদোষে অভিশাপ, নারীর কুরূপ।
করো মোরে অপূর্ব সুন্দরী। দাও মোরে

সেই এক দিন—তার পরে চিরদিন
রহিল আমার হাতে।— যখন প্রথম
দেখিলাম তারে, যেন মুহূর্তের মাঝে
অনন্ত বসন্ত ঋতু পশিল হৃদয়ে।
বড়ো ইচ্ছা হয়েছিল সে যৌবনোচ্ছ্বাসে
সমস্ত শরীর যদি দেখিতে দেখিতে
অপূর্ব পুলকভরে উঠে প্রস্ফুটিয়া
লক্ষ্মীর চরণশায়ী পদ্মের মতন।
হে বসন্ত, হে বসন্তসখে। সে-বাসনা
পুরাও আমার শুধু দিনেকের তরে।

মদন। তথাস্তু।

বসন্ত। তথাস্তু। শুধু এক দিন নহে,
বসন্তের পুষ্পশোভা এক বর্ষ ধরি
ঘেরিয়া তোমার তনু রহিবে বিকশি।

২

মণিপুর। অরণ্যে শিবালয়

অর্জুন

অর্জুন। কাহারে হেরিনু? সে কি সত্য, কিম্বা মায়া?
নিবিড় নির্জন বনে নির্মল সরসী;—
এমনি নিভৃত নিরালয়, মনে হয়
নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে সেথা বনলক্ষ্মীগণ
স্নান করে যায়; গভীর পূর্ণিমারাত্রে,
সেই সুপ্ত সরসীর স্নিগ্ধ শষ্পতটে
শয়ন করেন সুখে নিঃশঙ্ক বিশ্রামে
স্খলিত অঞ্চলে।

সেথা তরু-অন্তরালে
অপরাহ্ণবেলাশেষে, ভাবিতেছিলাম
আশৈশব জীবনের কথা ; সংসারের
মূঢ় খেলা দুঃখসুখ উলটি পালটি ;
জীবনের অসন্তোষ, অসম্পূর্ণ আশা,
অনন্ত দারিদ্র্য এই মর্ত্য মানবের।
হেনকালে ঘনতরু-অন্ধকার হতে
ধীরে ধীরে বাহিরিয়া, কে আসি দাঁড়াল
সরোবর-সোপানের শ্বেত শিলাপটে।
কী অপূর্ব রূপ। কোমল চরণতলে
ধরাতল কেমনে নিশ্চল হয়ে ছিল ?
উষার কনক মেঘ, দেখিতে দেখিতে
যেমন মিলায়ে যায়, পূর্ব পর্বতের
শুভ্র শিরে অকলঙ্ক নগ্ন শোভাখানি
করি বিকশিত, তেমনি বসন তার
মিলাতে চাহিতেছিল অঙ্গের লাবণ্যে
সুখাবেশে। নামি ধীরে সরোবরতীরে
কৌতূহলে দেখিল সে নিজ মুখচ্ছায়া ;
উঠিল চমকি। ক্ষণপরে মৃদু হাসি'
হেলাইয়া বাম বাহুখানি, হেলাভরে
এলাইয়া দিলা কেশপাশ ; মুক্ত কেশ
পড়িল বিহ্বল হয়ে চরণের কাছে।
অঞ্চল খসায়ে দিয়ে হেরিল আপন
আনন্দিত বাহুখানি— পরশের রসে
কোমল কাতর, প্রেমের করুণামাখা।
নিরখিলা নত করি শির, পরিস্ফুট
দেহতটে যৌবনের উন্মুখ বিকাশ।
দেখিলা চাহিয়া নব গৌরতনুতলে
আরক্তিম আলজ্জ আভাস ; সরোবরে
পা-দুখানি ডুবাইয়া দেখিলা আপন

চরণের আভা। বিস্ময়ের নাই সীমা।
সেই যেন প্রথম দেখিল আপনারে।
শ্বেত শতদল যেন কোরক-বয়স
যাপিল নয়ন মুদি,— যেদিন প্রভাতে
প্রথম লভিল পূর্ণ শোভা, সেইদিন
হেলাইয়া গ্রীবা, নীল সরোবর-জলে
প্রথম হেরিল আপনারে, সারাদিন
রহিল চাহিয়া সবিস্ময়ে। ক্ষণপরে,
কী জানি কী দুখে, হাসি মিলাইল মুখে,
ম্লান হল দুটি আঁখি; বাঁধিয়া তুলিল
কেশপাশ; অঞ্চলে ঢাকিল দেহখানি;
নিশ্বাস ফেলিয়া, ধীরে ধীরে চলে গেল;
সোনার সায়াহ্ন যথা ম্লান মুখ করি
আঁধার রজনীপানে ধায় মৃদুপদে।

ভাবিলাম মনে, ধরণী খুলিয়া দিল
ঐশ্বর্য আপন। কামনার সম্পূর্ণতা
চমকিয়া মিলাইয়া গেল। ভাবিলাম
কত যুদ্ধ, কত হিংসা, কত আড়ম্বর,
পুরুষের পৌরুষগৌরব, বীরত্বের
নিত্য কীর্তিতৃষা, শান্ত হয়ে লুটাইয়া
পড়ে ভূমে, ওই পূর্ণ সৌন্দর্যের কাছে;
পশুরাজ সিংহ যথা সিংহবাহিনীর
ভুবনবাঞ্ছিত অরুণ-চরণতলে।
আর এক বার যদি— কে দুয়ার ঠেলে!

দ্বার খুলিয়া

এ কী! সেই মূর্তি! শান্ত হও হে হৃদয়।
কোনো ভয় নাই মোরে, বরাননে। আমি
ক্ষত্রকুলজাত; ভয়ভীত দুর্বলের
ভয়হারী।

চিত্রাঙ্গদা। আর্য, তুমি অতিথি আমার।
এ মন্দির আমার আশ্রম। নাহি জানি
কেমনে করিব অভ্যর্থনা, কী সৎকারে
তোমারে তুষিব আমি।
অর্জুন। অতিথি-সৎকার
তব দরশনে, হে সুন্দরী, শিষ্টবাক্য
সমূহ সৌভাগ্য মোর। যদি নাহি লহ
অপরাধ, প্রশ্ন এক শুধাইতে চাহি,
চিত্ত মোর কুতূহলী।
চিত্রাঙ্গদা। শুধাও নির্ভয়ে।
অর্জুন। শুচিস্মিতে, কোন্ সুকঠোর ব্রত লাগি
জনহীন দেবালয়ে হেন রূপরাশি
হেলায় দিতেছ বিসর্জন, হতভাগ্য
মর্ত্যজনে করিয়া বঞ্চিত।
চিত্রাঙ্গদা। গুপ্ত এক
কামনা সাধনাতরে, একমনে করি
শিবপূজা।
অর্জুন। হায়, কারে করিছে কামনা
জগতের কামনার ধন। সুদর্শনে,
উদয়শিখর হতে অস্তাচলভূমি
ভ্রমণ করেছি আমি; সপ্তদ্বীপমাঝে
যেখানে যা-কিছু আছে দুর্লভ সুন্দর,
অচিন্ত্য মহান্, সকলি দেখেছি চোখে;
কী চাও, কাহারে চাও, যদি বল মোরে
মোর কাছে পাইবে বারতা।
চিত্রাঙ্গদা। ত্রিভুবনে
পরিচিত তিনি, আমি যাঁরে চাহি।
অর্জুন। হেন
নর কে আছে ধরায়। কার যশোরাশি
অমরকাঙ্ক্ষিত তব মনোরাজ্যমাঝে

করিয়াছে অধিকার দুর্লভ আসন।
কহ নাম তার, শুনিয়া কৃতার্থ হই।
চিত্রাঙ্গদা। জন্ম তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতিকুলে,
সর্বশ্রেষ্ঠ বীর।
অর্জুন। মিথ্যা খ্যাতি বেড়ে ওঠে
মুখে মুখে কথায় কথায়; ক্ষণস্থায়ী
বাষ্প যথা উষারে ছলনা করে ঢাকে
যতক্ষণ সূর্য নাহি ওঠে। হে সরলে,
মিথ্যারে কোরো না উপাসনা, এ দুর্লভ
সৌন্দর্যসম্পদে। কহ শুনি সর্বশ্রেষ্ঠ
কোন্ বীর, ধরণীর সর্বশ্রেষ্ঠ কুলে।
চিত্রাঙ্গদা। পরকীর্তি-অসহিষ্ণু কে তুমি সন্ন্যাসী!
কে না জানে কুরুবংশ এ-ভুবনমাঝে
রাজবংশচূড়া।
অর্জুন। কুরুবংশ!
চিত্রাঙ্গদা। সেই বংশে
কে আছে অক্ষয়যশ বীরেন্দ্রকেশরী
নাম শুনিয়াছ?
অর্জুন বলো, শুনি তব মুখে।
চিত্রাঙ্গদা। অর্জুন, গাণ্ডীবধনু, ভুবনবিজয়ী।
সমস্ত জগৎ হতে সে-অক্ষয় নাম,
করিয়া লুণ্ঠন, লুকায়ে রেখেছি যত্নে
কুমারী-হৃদয় পূর্ণ করি। ব্রহ্মচারী,
কেন এ অধৈর্য তব?
তবে মিথ্যা এ কি?
মিথ্যা সে অর্জুন নাম? কহ এই বেলা
মিথ্যা যদি হয় তবে হৃদয় ভাঙিয়া
ছেড়ে দিই তারে, বেড়াক সে উড়ে উড়ে
শূন্যে শূন্যে মুখে মুখে। তার স্থান নহে
নারীর অন্তরাসনে।

অর্জুন। অয়ি বরাঙ্গনে,
সে অর্জুন, সে পাণ্ডব, সে গাণ্ডীবধনু,
চরণে শরণাগত সেই ভাগ্যবান।
নাম তার, খ্যাতি তার, শৌর্যবীর্য তার,
মিথ্যা হোক, সত্য হোক, যে দুর্লভ লোকে
করেছ তাহারে স্থান দান, সেথা হতে
আর তারে ক'রো না বিচ্যুত, ক্ষীণপুণ্য
হৃতস্বর্গ হতভাগ্যসম।
চিত্রাঙ্গদা। তুমি পার্থ?
অর্জুন। আমি পার্থ, দেবী, তোমার হৃদয়দ্বারে
প্রেমার্ত অতিথি।
চিত্রাঙ্গদা। শুনেছিনু ব্রহ্মচর্য
পালিছে অর্জুন দ্বাদশবরষব্যাপী।
সেই বীর কামিনীরে করিছে কামনা
ব্রত ভঙ্গ করি'! হে সন্ন্যাসী, তুমি পার্থ!
অর্জুন। তুমি ভাঙিয়াছ ব্রত মোর। চন্দ্র উঠি
যেমন নিমেষে ভেঙে দেয় নিশীথের
যোগনিদ্রা-অন্ধকার।
চিত্রাঙ্গদা। ধিক্, পার্থ, ধিক্।
কে আমি, কী আছে মোর, কী দেখেছ তুমি,
কী জান আমারে। কার লাগি আপনারে
হতেছ বিস্মৃত। মুহূর্তেকে সত্য ভঙ্গ
করি, অর্জুনেরে করিতেছ অনর্জুন
কার তরে? মোর তরে নহে। এই দুটি
নীলোৎপল নয়নের তরে; এই দুটি
নবনীনিন্দিত বাহুপাশে সব্যসাচী
অর্জুন দিয়াছে আসি ধরা, দুই হস্তে
ছিন্ন করি সত্যের বন্ধন। কোথা গেল
প্রেমের মর্যাদা? কোথায় রহিল পড়ে
নারীর সম্মান? হায়, আমারে করিল

অতিক্রম আমার এ তুচ্ছ দেহখানা,
মৃত্যুহীন অন্তরের এই ছদ্মবেশ
ক্ষণস্থায়ী। এতক্ষণে পারিনু জানিতে
মিথ্যা খ্যাতি, বীরত্ব তোমার।

অর্জুন। খ্যাতি মিথ্যা,
বীর্য মিথ্যা আজ বুঝিয়াছি। আজ মোরে
সপ্তলোক স্বপ্ন মনে হয়। শুধু একা
পূর্ণ তুমি, সর্ব তুমি, বিশ্বের ঐশ্বর্য
তুমি, এক নারী সকল দৈন্যের তুমি
মহা অবসান, সকল কর্মের তুমি
বিশ্রামরূপিণী। কেন জানি অকস্মাৎ
তোমারে হেরিয়া বুঝিতে পেরেছি আমি
কী আনন্দ-কিরণেতে প্রথম প্রত্যূষে
অন্ধকার মহার্ণবে সৃষ্টি-শতদল
দিগ্বিদিকে উঠেছিল উন্মেষিত হয়ে
এক মুহূর্তের মাঝে। আর সকলেরে
পলে পলে তিলে তিলে তবে জানা যায়
বহু দিনে; তোমাপানে যেমনি চেয়েছি
অমনি সমস্ত তব পেয়েছি দেখিতে
তবু পাই নাই শেষ।—কৈলাসশিখরে
একদা মৃগয়াশ্রান্ত তৃষিত তাপিত
গিয়েছিনু দ্বিপ্রহরে কুসুমবিচিত্র
মানসের তীরে। যেমনি দেখিনু চেয়ে
সেই সুর-সরসীর সলিলের পানে
অমনি পড়িল চোখে অনন্ত অতল।
স্বচ্ছ জল, যত নিম্নে চাই। মধ্যাহ্নের
রবিরশ্মিরেখাগুলি স্বর্ণনলিনীর
সুবর্ণ মৃণাল সাথে মিশি নেমে গেছে
অগাধ অসীমে; কাঁপিতেছে আঁকি বাঁকি
জলের হিল্লোলে, লক্ষকোটি অগ্নিময়ী

নাগিনীর মতো। মনে হল ভগবান
সূর্যদেব সহস্র অঙ্গুলি নির্দেশিয়া
দিলেন দেখায়ে, জন্মশ্রান্ত কর্মক্লান্ত
মর্ত্যজনে, কোথা আছে সুন্দর মরণ
অনন্ত শীতল। সেই স্বচ্ছ অতলতা
দেখেছি তোমার মাঝে। চারিদিক হতে
দেবের অঙ্গুলি যেন দেখায়ে দিতেছে
মোরে, ওই তব অলোক আলোকমাঝে
কীর্তিক্লিষ্ট জীবনের পূর্ণ নির্বাপন।

চিত্রাঙ্গদা। আমি নহি, আমি নহি, হায় পার্থ, হায়,
কোন্ দেবের ছলনা! যাও যাও ফিরে
যাও, ফিরে যাও বীর। মিথ্যারে ক'রো না
উপাসনা। শৌর্য বীর্য মহত্ত্ব তোমার
দিয়ো না মিথ্যার পদে। যাও, ফিরে যাও।

৩

তরুতলে চিত্রাঙ্গদা

চিত্রাঙ্গদা। হায়, হায়, সে কি ফিরাইতে পারি! সেই
থরথর ব্যাকুলতা বীর-হৃদয়ের,
তৃষার্ত কম্পিত এক স্ফুলিঙ্গনিশ্বাসী
হোমাগ্নিশিখার মতো; সেই নয়নের
দৃষ্টি যেন অন্তরের বাহু হয়ে, কেড়ে
নিতে আসিছে আমায়; উত্তপ্ত হৃদয়
ছুটিয়া আসিতে চাহে সর্বাঙ্গ টুটিয়া,
তাহার ক্রন্দনধ্বনি প্রতি অঙ্গে যেন
যায় শুনা। এ-তৃষ্ণা কি ফিরাইতে পারি?

বসন্ত ও মদনের প্রবেশ

হে অনঙ্গদেব, এ কী রূপ-হুতাশনে
ঘিরেছ আমারে, দগ্ধ হই, দগ্ধ করে
মারি।
মদন। বলো, তন্বী, কালিকার বিবরণ।
মুক্ত পুষ্পশর মোর কোথা কী সাধিল
কাজ, শুনিতে বাসনা।
চিত্রাঙ্গদা। কাল সন্ধ্যাবেলা
সরসীর তৃণপুঞ্জ তীরে পেতেছিনু
পুষ্পশয্যা, বসন্তের ঝরা ফুল দিয়ে।
শ্রান্ত কলেবরে শুয়েছিনু আনমনে,
রাখিয়া অলস শির বাম বাহু 'পরে
ভাবিতেছিলাম গতদিবসের কথা।
শুনেছিনু যেই স্তুতি অর্জুনের মুখে
আনিতেছিলাম তাহা মনে; দিবসের
সঞ্চিত অমৃত হতে বিন্দু বিন্দু লয়ে
করিতেছিলাম পান; ভুলিতেছিলাম
পূর্ব ইতিহাস, গতজন্মকথাসম।
যেন আমি রাজকন্যা নহি; যেন মোর
নাই পূর্বপর; যেন আমি ধরাতলে
এক দিনে উঠেছি ফুটিয়া, অরণ্যের
পিতৃমাতৃহীন ফুল; শুধু এক বেলা
পরমায়ু, তারি মাঝে শুনে নিতে হবে
ভ্রমরগুঞ্জনগীতি, বন-বনান্তের
আনন্দমর্মর; পরে নীলাম্বর হতে
ধীরে নামাইয়া আঁখি, নুমাইয়া গ্রীবা,
টুটিয়া লুটিয়া যাব বায়ুস্পর্শভরে
ক্রন্দনবিহীন, মাঝখানে ফুরাইবে
কুসুমকাহিনীখানি আদিঅন্তহারা।

বসন্ত। একটি প্রভাতে ফুটে অনন্ত জীবন,
হে সুন্দরী।
মদন। সংগীতে যেমন, ক্ষণিকের
তানে, গুঞ্জরি' কাঁদিয়া ওঠে অন্তহীন
কথা। তার পরে বলো।
চিত্রাঙ্গদা। ভাবিতে ভাবিতে
সর্বাঙ্গে হানিতেছিল ঘুমের হিল্লোল
দক্ষিণের বায়ু। সপ্তপর্ণশাখা হতে
ফুল্ল মালতীর লতা আলস্য-আবেশে
মোর গৌরতনু'পরে পাঠাইতেছিল
নিঃশব্দ চুম্বন ; ফুলগুলি কেহ চুলে,
কেহ পদতলে, কেহ স্তনতটমূলে
বিছাইল আপনার মরণ-শয়ন।

অচেতনে গেল কত ক্ষণ। হেনকালে
ঘুমঘোরে কখন করিনু অনুভব
যেন কার মুগ্ধ নয়নের দৃষ্টিপাত
দশ অঙ্গুলির মতো পরশ করিছে
রভস-লালসে মোর নিদ্রালস তনু।
চমকি উঠিনু জাগি।

দেখিনু, সন্ন্যাসী
পদপ্রান্তে নির্নিমেষ দাঁড়ায়ে রয়েছে
স্থির প্রতিমূর্তিসম। পূর্বাচল হতে
ধীরে ধীরে সরে এসে পশ্চিমে হেলিয়া
দ্বাদশীর শশী, সমস্ত হিমাংশুরাশি
দিয়াছে ঢালিয়া, স্খলিতবসন মোর
অম্লাননূতন শুভ্র সৌন্দর্যের 'পরে।
পুষ্পগন্ধে পূর্ণ তরুতল ; ঝিল্লিরবে
তন্দ্রামগ্ন নিশীথিনী ; স্বচ্ছ সরোবরে
অকম্পিত চন্দ্রকরচ্ছায়া ; সুপ্ত বায়ু ;

শিরে লয়ে জ্যোৎস্নালোকে মসৃণ চিক্কণ
রাশি রাশি অন্ধকার পল্লবের ভার
স্তম্ভিত অটবী। সেইমতো চিত্রার্পিত
দাঁড়াইয়া দীর্ঘকায় বনস্পতিসম,
দণ্ডধারী ব্রহ্মচারী ছায়াসহচর।

প্রথম সে-নিদ্রাভঙ্গে চারিদিক চেয়ে
মনে হল্, কবে কোন্ বিস্মৃত প্রদোষে
জীবন ত্যজিয়া, স্বপ্নজন্ম লভিয়াছি
কোন্ এক অপরূপ মোহনিদ্রালোকে,
জনশূন্য ম্লানজ্যোৎস্না বৈতরণীতীরে।

দাঁড়ানু উঠিয়া। মিথ্যা শরম সংকোচ
খসিয়া পড়িল শ্লথ বসনের মতো
পদতলে। শুনিলাম, "প্রিয়ে, প্রিয়তমে।"
গম্ভীর আহ্বানে, মোর এক দেহমাঝে
জন্ম জন্ম শত জন্ম উঠিল জাগিয়া।
কহিলাম, "লহ, লহ, যাহা কিছু আছে
সব লহ জীবনবল্লভ।" দুই বাহু
দিলাম বাড়ায়ে।— চন্দ্র অস্ত গেল বনে,
অন্ধকারে ঝাঁপিল মেদিনী। স্বর্গমর্ত্য
দেশকাল দুঃখসুখ জীবন-মরণ
অচেতন হয়ে গেল অসহ্য পুলকে।

প্রভাতের প্রথম কিরণে, বিহঙ্গের
প্রথম সংগীতে, বাম করে দিয়া ভর
ধীরে ধীরে শয্যাতলে উঠিয়া বসিনু।
দেখিনু চাহিয়া, সুখসুপ্ত বীরবর।
শ্রান্ত হাস্য লেগে আছে ওষ্ঠপ্রান্তে তাঁর
প্রভাতের চন্দ্রকলাসম, রজনীর
আনন্দের শীর্ণ অবশেষ। নিপতিত

উন্নত ললাটপটে অরুণের আভা;
মর্ত্যলোকে যেন নব উদয়পর্বতে
নবকীর্তি-সূর্যোদয় পাইবে প্রকাশ।

উঠিনু শয়ন ছাড়ি নিশ্বাস ফেলিয়া;
মালতীর লতাজাল দিলাম নামায়ে
সাবধানে, রবিকর করি অন্তরাল
সুপ্তমুখ হতে। দেখিলাম চতুর্দিকে
সেই পূর্বপরিচিত প্রাচীন পৃথিবী।
আপনারে আরবার মনে পড়ে গেল,
ছুটিয়া পলায়ে এনু, নব প্রভাতের
শেফালি-বিকীর্ণ-তৃণ বনস্থলী দিয়ে,
আপনার ছায়াত্রস্তা হরিণীর মতো।
বিজন বিতানতলে বসি, করপুটে
মুখ আবরিয়া, কাঁদিবারে চাহিলাম,
এল না ক্রন্দন।

মদন। হায়, মানবনন্দিনী,
স্বর্গের সুখের দিন স্বহস্তে ভাঙিয়া
ধরণীর একরাত্রি পূর্ণ করি তাহে
যত্নে ধরিলাম তব অধরসম্মুখে—
শচীর প্রসাদসুধা, রতির চুম্বিত,
নন্দনবনের গন্ধে মোদিত-মধুর,
তোমারে করানু পান, তবু এ ক্রন্দন!

চিত্রাঙ্গদা। কারে, দেব, করাইলে পান! কার তৃষা
মিটাইলে! সে চুম্বন, সে প্রেমসংগম
এখনো উঠিছে কাঁপি যে-অঙ্গ ব্যাপিয়া
বীণার ঝংকার সম, সে তো মোর নহে
বহুকাল সাধনায় এক দণ্ড শুধু
পাওয়া যায় প্রথম মিলন, সে-মিলন
কে লইল লুটি, আমারে বঞ্চিত করি!

সে চিরদুর্লভ মিলনের সুখস্মৃতি
সঙ্গে করে ঝরে পড়ে যাবে অতিস্ফুট
পুষ্পদলসম, এ মায়া-লাবণ্য মোর ;
অন্তরের দরিদ্র রমণী, রিক্তদেহে
বসে রবে চিরদিনরাত। মীনকেতু,
কোন্ মহারাক্ষসীরে দিয়াছ বাঁধিয়া
অঙ্গসহচরী করি ছায়ার মতন—
কী অভিসম্পাত। চিরন্তন তৃষ্ণাতুর
লোলুপ ওষ্ঠের কাছে আসিল চুম্বন,
সে করিল পান। সেই প্রেমদৃষ্টিপাত
এমনি আগ্রহপূর্ণ, যে-অঙ্গেতে পড়ে
সেথা যেন অঙ্কিত করিয়া রেখে যায়
বাসনার রাঙা চিহ্নরেখা, সেই দৃষ্টি
রবিরশ্মিসম, চিররাত্রিতাপসিনী
কুমারী-হৃদয়পদ্মপানে ছুটে এল,
সে তাহারে লইল ভুলায়ে।

মদন। কল্য নিশি
ব্যর্থ গেছে তবে! শুধু, কূলের সম্মুখে
এসে আশার তরণী গেছে ফিরে ফিরে
তরঙ্গ-আঘাতে ?

চিত্রাঙ্গদা। কাল রাত্রে কিছু নাহি
মনে ছিল দেব। সুখস্বর্গ এত কাছে
দিয়েছিল ধরা, পেয়েছি কি না পেয়েছি
করিনি গণনা আত্মবিস্মরণসুখে।
আজ প্রাতে উঠে, নৈরাশ্যধিক্‌কারবেগে
অন্তরে অন্তরে টুটিছে হৃদয়। মনে
পড়িতেছে একে একে রজনীর কথা।
বিদ্যুৎবেদনাসহ হতেছে চেতনা
অন্তরে বাহিরে মোর হয়েছে সতিন,
আর তাহা নারিব ভুলিতে। সপত্নীরে

স্বহস্তে সাজায়ে সযতনে, প্রতিদিন
পাঠাইতে হবে, আমার আকাঙ্ক্ষা-তীর্থ
বাসরশয্যায় ; অবিশ্রাম সঙ্গে রহি
প্রতিক্ষণ দেখিতে হইবে চক্ষু মেলি
তাহার আদর। ওগো, দেহের সোহাগে
অন্তর জ্বলিবে হিংসানলে, হেন শাপ
নরলোকে কে পেয়েছে আর। হে অতনু,
বর তব ফিরে লও।
মদন। যদি ফিরে লই,—
ছলনার আবরণ খুলে ফেলে দিয়ে
কাল প্রাতে কোন্ লাজে দাঁড়াইবে আসি
পার্থের সম্মুখে, কুসুমপল্লবহীন
হেমন্তের হিমশীর্ণ লতা ? প্রমোদের
প্রথম আস্বাদটুকু দিয়ে, মুখ হতে
সুধাপাত্র কেড়ে নিয়ে চূর্ণ কর যদি
ভূমিতলে, অকস্মাৎ সে আঘাতভরে
চমকিয়া, কী আক্রোশে হেরিবে তোমায় !
চিত্রাঙ্গদা। সেও ভালো। এই ছদ্মরূপিণীর চেয়ে
শ্রেষ্ঠ আমি শতগুণে। সেই আপনারে
করিব প্রকাশ ; ভালো যদি নাই লাগে,
ঘৃণাভরে চান যদি, বুক ফেটে
মরি যদি আমি, তবু আমি, আমি রব।
সেও ভালো, ইন্দ্রসখা।
বসন্ত। শোনো মোর কথা।
ফুলের ফুরায় যবে ফুটিবার কাজ
তখন প্রকাশ পায় ফল। যথাকালে
আপনি ঝরিয়া পড়ে যাবে, তাপক্লিষ্ট
লঘু লাবণ্যের দল ; আপন গৌরবে
তখন বাহির হবে ; হেরিয়া তোমারে
নূতন সৌভাগ্য বলি মানিবে ফাল্গুনী।
যাও ফিরে যাও, বৎসে, যৌবন-উৎসবে।

৪

অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদা

চিত্রাঙ্গদা। কী দেখিছ বীর।
অর্জুন। দেখিতেছি পুষ্পবৃন্ত
ধরি কোমল অঙ্গুলিগুলি রচিতেছে
মালা ; নিপুণতা চারুতায় দুই বোনে
মিলি খেলা করিতেছে যেন, সারাবেলা
চঞ্চল উল্লাসে, অঙ্গুলির আগে আগে।
দেখিতেছি আর ভাবিতেছি।
চিত্রাঙ্গদা। কী ভাবিছ।
অর্জুন। ভাবিতেছি অমনি সুন্দর ক'রে ধরে
সরসিয়া ওই রাঙা পরশের রসে
প্রবাস-দিবসগুলি গেঁথে গেঁথে প্রিয়ে
অমনি রচিবে মালা ; মাথায় পরিয়া
অক্ষয় আনন্দ-হার গৃহে ফিরে যাব।
চিত্রাঙ্গদা। এ প্রেমের গৃহ আছে ?
অর্জুন। গৃহ নাই ?
চিত্রাঙ্গদা। নাই।
গৃহে নিয়ে যাবে ! বোলো না গৃহের কথা।
গৃহ চির বরষের ; নিত্য যাহা তাই
গৃহে নিয়ে যেয়ো। অরণ্যের ফুল যবে
শুকাইবে, গৃহে কোথা ফেলে দিবে তারে,
অনাদরে পাষাণের মাঝে ? তার চেয়ে
অরণ্যের অন্তঃপুরে নিত্য নিত্য যেথা
মরিছে অঙ্কুর, পড়িছে পল্লবরাশি,
ঝরিছে কেশর, খসিছে কুসুমদল,
ক্ষণিক জীবনগুলি ফুটিছে টুটিছে
প্রতি পলে পলে,— দিনান্তে আমার খেলা

সাঙ্গ হলে ঝরিব সেথায়, কাননের
শত শত সমাপ্ত সুখের সাথে। কোনো
খেদ রহিবে না কারো মনে।

অর্জুন। এই শুধু?

চিত্রাঙ্গদা। শুধু এই। বীরবর, তাহে দুঃখ কেন।
আলস্যের দিনে যাহা ভালো লেগেছিল,
আলস্যের দিনে তাহা ফেলো শেষ করে।
সুখেরে তাহার বেশি একদণ্ডকাল
বাঁধিয়া রাখিলে, সুখ দুঃখ হয়ে ওঠে।
যাহা আছে তাই লও, যতক্ষণ আছে
ততক্ষণ রাখো। কামনার প্রাতঃকালে
যতটুকু চেয়েছিলে, তৃপ্তির সন্ধ্যায়
তার বেশি আশা করিয়ো না।
দিন গেল।
এই মালা পরো গলে। শ্রান্ত মোর তনু
ওই তব বাহু 'পরে টেনে লও বীর।
সন্ধি হোক অধরের সুখ-সম্মিলনে
ক্ষান্ত করি' মিথ্যা অসন্তোষ। বাহুবন্ধে
এস বন্দী করি দোঁহে দোঁহা, প্রণয়ের
সুধাময় চিরপরাজয়ে।

অর্জুন। ওই শোনো
প্রিয়তমে, বনান্তের দূর লোকালয়ে
আরতির শান্তিশঙ্খ উঠিল বাজিয়া।

৫

মদন ও বসন্ত

মদন। আমি পঞ্চশর, সখা ; এক শরে হাসি,
অশ্রু এক শরে ; এক শরে আশা, অন্য
শরে ভয় ; এক শরে বিরহ-মিলন-
আশা-ভয়-দুঃখ-সুখ এক নিমেষেই।
বসন্ত। শ্রান্ত আমি, ক্ষান্ত দাও সখা। হে অনঙ্গ,
সাঙ্গ করো রণরঙ্গ তব ; রাত্রিদিন
সচেতন থেকে, তব হুতাশনে আর
কত কাল করিব ব্যজন। মাঝে মাঝে
নিদ্রা আসে চোখে, নত হয়ে পড়ে পাখা,
ভস্মে ম্লান হয়ে আসে তপ্তদীপ্তিরাশি।
চমকিয়া জেগে, আবার নূতন শ্বাসে
জাগাইয়া তুলি তার নব-উজ্জ্বলতা।
এবার বিদায় দাও সখা।
মদন। জানি তুমি
অনন্ত অস্থির, চিরশিশু। চিরদিন
বন্ধনবিহীন হয়ে দ্যুলোকে ভূলোকে
করিতেছ খেলা। একান্ত যতনে যারে
তুলিছ সুন্দর করি বহুকাল ধরে
নিমেষে যেতেছ তারে ফেলি ধূলিতলে
পিছে না ফিরিয়া। আর বেশি দিন নাই ;
আনন্দচঞ্চল দিনগুলি, লঘুবেগে,
তব পক্ষ-সমীরণে, হুহু করি কোথা
যেতেছে উড়িয়া, চ্যুত পল্লবের মতো।
হর্ষ-অচেতন বর্ষ শেষ হয়ে এল।

৬

অরণ্যে অর্জুন

অর্জুন। আমি যেন পাইয়াছি, প্রভাতে জাগিয়া
ঘুম হতে, স্বপ্নলব্ধ অমূল্য রতন।
রাখিবার স্থান তার নাহি এ ধরায়;
ধরে রাখে এমন কিরীট নাই কোথা,
গেঁথে রাখে হেন সূত্র নাই, ফেলে যাই
হেন নরাধম নহি; তারে লয়ে তাই
চিররাত্রি চিরদিন ক্ষত্রিয়ের বাহু
বদ্ধ হয়ে পড়ে আছে কর্তব্যবিহীন।

চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ

চিত্রাঙ্গদা। কী ভাবিছ।
অর্জুন। ভাবিতেছি মৃগয়ার কথা।
ওই দেখো বৃষ্টিধারা আসিয়াছে নেমে
পর্বতের ’পরে; অরণ্যেতে ঘনঘোর
ছায়া; নির্ঝরিণী উঠেছে দুরন্ত হয়ে,
কলগর্ব-উপহাসে তটের তর্জন
করিতেছে অবহেলা; মনে পড়িতেছে
এমনি বর্ষার দিনে পঞ্চ ভ্রাতা মিলে
চিত্রক অরণ্যতলে যেতেম শিকারে।
সারাদিন রৌদ্রহীন স্নিগ্ধ অন্ধকারে
কাটিত উৎসাহে; গুরুগুরু মেঘমন্দ্রে
নৃত্য করি উঠিত হৃদয়; ঝরঝর
বৃষ্টিজলে, মুখর নির্ঝর-কলোল্লাসে
সাবধান পদশব্দ শুনিতে পেত না
মৃগ; চিত্রব্যাঘ্র পঞ্চনখচিহ্নরেখা
রেখে যেত পথপঙ্ক’পরে, দিয়ে যেত

আপনার গৃহের সন্ধান। কেকারবে
অরণ্য ধ্বনিত। শিকার সমাধা হলে
পঞ্চ সঙ্গী পণ করি মোরা, সন্তরণে
হইতাম পার, বর্ষার সৌভাগ্যগর্বে
স্ফীত তরঙ্গিণী। সেই মতো বাহিরিব
মৃগয়ায়, করিয়াছি মনে।

চিত্রাঙ্গদা। হে শিকারী,
যে-মৃগয়া আরম্ভ করেছ, আগে তাই
হোক শেষ। তবে কি জেনেছ স্থির
এই স্বর্ণ মায়ামৃগ তোমারে দিয়েছে
ধরা? নহে, তাহা নহে। এ বন্য হরিণী
আপনি রাখিতে নারে আপনারে ধরি।
চকিতে ছুটিয়া যায় কে জানে কখন
স্বপনের মতো। ক্ষণিকের খেলা সহে,
চিরদিবসের পাশ বহিতে পারে না।
ওই চেয়ে দেখো, যেমন করিছে খেলা
বায়ুতে বৃষ্টিতে,—শ্যাম বর্ষা হানিতেছে
নিমেষে সহস্র শর বায়ুপৃষ্ঠ 'পরে,
তবু সে দুরন্ত মৃগ মাতিয়া বেড়ায়
অক্ষত অজেয়; তোমাতে আমাতে, নাথ,
সেইমতো খেলা, আজি বরষার দিনে;—
চঞ্চলারে করিবে শিকার, প্রাণপণ
করি; যত শর, যত অস্ত্র আছে তূণে
একাগ্র আগ্রহভরে করিবে বর্ষণ।
কভু অন্ধকার, কভু বা চকিত আলো
চমকিয়া হাসিয়া মিলায়, কভু স্নিগ্ধ
বৃষ্টি-বরিষন, কভু দীপ্ত বজ্রজ্বালা।
মায়ামৃগী ছুটিয়া বেড়ায়, মেঘাচ্ছন্ন
জগতের মাঝে, বাধাহীন চিরদিন;

৭

মদন ও চিত্রাঙ্গদা

চিত্রাঙ্গদা। হে মন্মথ, কী জানি কী দিয়েছ মাখায়ে
সর্বদেহে মোর। তীব্র মদিরার মতো
রক্তসাথে মিশে, উন্মাদ করেছে মোরে।
আপনার গতিগর্বে মত্ত মৃগী আমি
ধাইতেছি মুক্তকেশে, উচ্ছ্বসিত বেশে
পৃথিবী লঙ্ঘিয়া। ধনুর্ধর ঘনশ্যাম
ব্যাধেরে আমার, করিয়াছি পরিশ্রান্ত
আশাহতপ্রায়, ফিরাতেছি পথে পথে
বনে বনে তারে। নির্দয় বিজয়সুখে
হাসিতেছি কৌতুকের হাসি। এ খেলায়
ভঙ্গ দিতে হইতেছে ভয়, এক দণ্ড
স্থির হলে পাছে, ক্রন্দনে হৃদয় ভরে
ফেটে পড়ে যায়।

মদন। থাক্। ভাঙিয়ো না খেলা।
এ খেলা আমার। ছুটুক ফুটুক বাণ,
টুটুক হৃদয়। আমার মৃগয়া আজি
অরণ্যের মাঝখানে নবীন বর্ষায়।
দাও দাও শ্রান্ত করে দাও, করো তারে
পদানত, বাঁধো তারে দৃঢ় পাশে; দয়া
করিয়ো না, হাসিতে জর্জর করে দাও,
অমৃতে-বিষেতে-মাখা খর বাক্যবাণ
হানো বুকে। শিকারে দয়ার বিধি নাই।

৮

অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদা

অর্জুন। কোনো গৃহ নাই তব প্রিয়ে, যে-ভবনে
কাঁদিছে বিরহে তব প্রিয়পরিজন?
নিত্য স্নেহসেবা দিয়ে যে আনন্দপুরী
রেখেছিলে সুধামগ্ন করে, যেথাকার
প্রদীপ নিবায়ে দিয়ে এসেছ চলিয়া
অরণ্যের মাঝে? আপন শৈশবস্মৃতি
যেথায় কাঁদিতে যায় হেন স্থান নাই?

চিত্রাঙ্গদা। প্রশ্ন কেন? তবে কি আনন্দ মিটে গেছে?
যা দেখিছ তাই আমি, আর কিছু নাই
পরিচয়। প্রভাতে এই যে দুলিতেছে
কিংশুকের একটি পল্লবপ্রান্তভাগে
একটি শিশির, এর কোনো নামধাম
আছে? এর কি শুধায় কেহ পরিচয়।
তুমি যারে ভালোবাসিয়াছ, সে এমনি
শিশিরের কণা, নামধামহীন।

অর্জুন। কিছু
তার নাই কি বন্ধন পৃথিবীতে। এক
বিন্দু স্বর্গ শুধু ভূমিতলে ভুলে পড়ে
গেছে?

চিত্রাঙ্গদা। তাই বটে। শুধু নিমেষের তরে
দিয়েছে আপন উজ্জ্বলতা অরণ্যের
কুসুমেরে।

অর্জুন। তাই সদা হারাই হারাই
করে প্রাণ, তৃপ্তি নাহি পাই, শান্তি নাহি
মানি। সুদুর্লভে, আরো কাছাকাছি এস।
নামধামগোত্রগৃহ বাক্যদেহমনে

সহস্র বন্ধনপাশে ধরা দাও প্রিয়ে।
চারি পার্শ্ব হতে ঘেরি পরশি তোমায়,
নির্ভয় নির্ভরে করি বাস। নাম নাই ?
তবে কোন্ প্রেমমন্ত্রে জপিব তোমারে
হৃদয়মন্দিরমাঝে ? গোত্র নাই ? তবে
কী মৃণালে এ কমল ধরিয়া রাখিব ?

চিত্রাঙ্গদা। নাই, নাই, নাই। যারে বাঁধিবারে চাও
কখনো সে বন্ধন জানেনি। সে কেবল
মেঘের স্বর্ণছটা, গন্ধ কুসুমের,
তরঙ্গের গতি।

অর্জুন। তাহারে যে ভালোবাসে
অভাগা সে। প্রিয়ে, দিয়ো না প্রেমের হাতে
আকাশকুসুম। বুকে রাখিবার ধন
দাও তারে, সুখে দুঃখে সুদিনে দুর্দিনে।

চিত্রাঙ্গদা। এখনো যে বর্ষ যায় নাই, শ্রান্তি এরি
মাঝে ? হায় হায়, এখন বুঝিনু, পুষ্প
স্বল্পপরমায়ু দেবতার আশীর্বাদে।
গত বসন্তের যত মৃতপুষ্পসাথে
ঝরিয়া পড়িত যদি এ মোহন তনু
আদরে মরিত তবে। বেশি দিন নহে
পার্থ। যে কদিন আছে, আশা মিটাইয়া
কুতূহলে, আনন্দের মধুটুকু তার
নিঃশেষ করিয়া করো পান। এর পরে
বারবার আসিয়ো না স্মৃতির কুহকে
ফিরে ফিরে, গত সায়াহ্নের চ্যুতবৃন্ত
মাধবীর আশে তৃষিত ভৃঙ্গের মতো।

৯

বনচরগণ ও অর্জুন

বনচর। হায় হায়, কে রক্ষা করিবে ?
অর্জুন। কী হয়েছে ?
বনচর। উত্তর-পর্বত হতে আসিছে ছুটিয়া
দস্যুদল, বরষার পার্বত্য বন্যার
মতো বেগে, বিনাশ করিতে লোকালয়।
অর্জুন। এ রাজ্যে রক্ষক কেহ নাই ?
বনচর। রাজকন্যা
চিত্রাঙ্গদা আছিলেন দুষ্টের দমন ;
তাঁর ভয়ে রাজ্যে নাহি ছিল কোনো ভয়,
যমভয় ছাড়া। শুনেছি গেছেন তিনি
তীর্থপর্যটনে, অজ্ঞাত ভ্রমণব্রত।
অর্জুন। এ রাজ্যের রক্ষক রমণী ?
বনচর। এক দেহে
তিনি পিতামাতা অনুরক্ত প্রজাদের।
স্নেহে তিনি রাজমাতা, বীর্যে যুবরাজ। [প্রস্থান

চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ

চিত্রাঙ্গদা। কী ভাবিছ নাথ।
অর্জুন। রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা
কেমন না জানি তাই ভাবিতেছি মনে।
প্রতিদিন শুনিতেছি শত মুখ হতে
তারি কথা, নব নব অপূর্ব কাহিনী।
চিত্রাঙ্গদা। কুৎসিত, কুরূপ। এমন বঙ্কিম ভুরু
নাই তার— এমন নিবিড় কৃষ্ণতারা।

কঠিন সবল বাহু বিঁধিতে শিখেছে
লক্ষ্য, বাঁধিতে পারে না বীরতনু, হেন
সুকোমল নাগপাশে।

অর্জুন। কিন্তু শুনিয়াছি,
স্নেহে নারী বীর্যে সে পুরুষ।

চিত্রাঙ্গদা। ছি ছি, সেই
তার মন্দভাগ্য। নারী যদি নারী হয়
শুধু, শুধু ধরণীর শোভা, শুধু আলো,
শুধু ভালোবাসা, শুধু সুমধুর ছলে,
শতরূপ ভঙ্গিমায় পলকে পলকে
লুটায়ে জড়ায়ে বেঁকে বেঁধে হেসে কেঁদে
সেবায় সোহাগে ছেয়ে চেয়ে থাকে সদা,
তবে তার সার্থক জনম। কী হইবে
কর্মকীর্তি বীর্যবল শিক্ষাদীক্ষা তার।
হে পৌরব, কাল যদি দেখিতে তাহারে
এই বনপথপার্শ্বে, এই পূর্ণাতীরে,
ওই দেবালয়মাঝে— হেসে চলে যেতে।
হায় হায়, আজ এত হয়েছে অরুচি
নারীর সৌন্দর্যে, নারীতে খুঁজিতে চাও
পৌরুষের স্বাদ!
এস নাথ, ওই দেখো
গাঢ়চ্ছায়া শৈলগুহামুখে, বিছাইয়া
রাখিয়াছি আমাদের মধ্যাহ্ন-শয়ন,
কচি কচি পীতশ্যাম কিশলয় তুলি
আর্দ্র করি ঝরনার শীকরনিকরে।
গভীর পল্লবছায়ে বসি, ক্লান্তকণ্ঠে
কাঁদিছে কপোত, "বেলা যায়" "বেলা যায়"
বলি। কুলু কুলু বহিয়া চলেছে নদী
ছায়াতল দিয়া। শিলাখণ্ডে স্তরে স্তরে
সরস সুস্নিগ্ধ সিক্ত শ্যামল শৈবাল

নয়ন চুম্বন করে কোমল অধরে।
এস নাথ বিরল বিরামে।

অর্জুন। আজ নহে
প্রিয়ে।

চিত্রাঙ্গদা। কেন নাথ।

অর্জুন। শুনিয়াছি দস্যুদল
আসিছে নাশিতে জনপদ। ভীত জনে
করিব রক্ষণ।

চিত্রাঙ্গদা। কোনো ভয় নাই প্রভু।
তীর্থযাত্রাকালে, রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা
স্থাপন করিয়া গেছে সতর্ক প্রহরী
দিকে দিকে; বিপদের যত পথ ছিল
বন্ধ করে দিয়ে গেছে বহু তর্ক করি।

অর্জুন। তবু আজ্ঞা করো প্রিয়ে, স্বল্পকালতরে
করে আসি কর্তব্যসন্ধান। বহুদিন
রয়েছে অলস হয়ে ক্ষত্রিয়ের বাহু।
সুমধ্যমে, ক্ষীণকীর্তি এই ভুজদ্বয়
পুনর্বার নবীন গৌরবে ভরি আনি
তোমার মস্তকতলে যতনে রাখিব,
হবে তব যোগ্য উপাধান।

চিত্রাঙ্গদা। যদি আমি
না-ই যেতে দিই? যদি বেঁধে রাখি? ছিন্ন
করে যাবে? তাই যাও। কিন্তু মনে রেখো
ছিন্ন লতা জোড়া নাহি লাগে। যদি তৃপ্তি
হয়ে থাকে, তবে যাও, করিব না মানা;
যদি তৃপ্তি নাহি হয়ে থাকে, তবে মনে
রেখো, চঞ্চলা সুখের লক্ষ্মী কারো তরে
বসে নাহি থাকে; সে কাহারো সেবাদাসী
নহে; তার সেবা করে নরনারী, অতি
ভয়ে ভয়ে, নিশিদিন রাখে চোখে চোখে

যত দিন প্রসন্ন সে থাকে। রেখে যাবে
যারে সুখের কলিকা, কর্মক্ষেত্র হতে
ফিরে এসে সন্ধ্যাকালে দেখিবে তাহার
দলগুলি ফুটে ঝরে পড়ে গেছে ভূমে,
সব কর্ম ব্যর্থ মনে হবে। চিরদিন
রহিবে জীবনমাঝে জীবন্ত অতৃপ্তি
ক্ষুধাতুরা। এস নাথ, বসো। কেন আজি
এত অন্যমন। কার কথা ভাবিতেছ?
চিত্রাঙ্গদা? আজ তার এত ভাগ্য কেন।

অর্জুন। ভাবিতেছি বীরাঙ্গনা কিসের লাগিয়া
ধরেছে দুষ্কর ব্রত। কী অভাব তার।

চিত্রাঙ্গদা। কী অভাব তার? কী ছিল সে অভাগীর।
বীর্য তার অভ্রভেদী দুর্গ সুদুর্গম
রেখেছিল চতুর্দিকে অবরুদ্ধ করি
রুধ্যমান রমণী-হৃদয়। রমণী তো
সহজেই অন্তরবাসিনী; সংগোপনে
থাকে আপনাতে; কে তারে দেখিতে পায়,
হৃদয়ের প্রতিবিম্ব দেহের শোভায়
প্রকাশ না পায় যদি। কী অভাব তার!
অরুণলাবণ্যলেখা-চিরনির্বাপিত
উষার মতন, যে-রমণী আপনার
শতস্তর তিমিরের তলে বসে থাকে
বীর্যশৈলশৃঙ্গ'পরে নিত্য-একাকিনী
কী অভাব তার! থাক্, থাক্ তার কথা;
পুরুষের শ্রুতিসুমধুর নহে তার
ইতিহাস।

অর্জুন। বলো বলো। শ্রবণলালসা
ক্রমশ বাড়িছে মোর। হৃদয় তাহার
করিতেছি অনুভব হৃদয়ের মাঝে।
যেন পান্থ আমি, প্রবেশ করেছি গিয়া

কোন্ অপরূপ দেশে অর্ধরজনীতে।
নদীগিরিবনভূমি সুপ্তিনিমগন,
শুভ্রসৌধকিরীটিনী উদার নগরী
ছায়াসম অর্ধস্ফুট দেখা যায়, শুনা
যায় সাগর-গর্জন ; প্রভাত-প্রকাশে
বিচিত্র বিস্ময়ে যেন ফুটিবে চৌদিক ;
প্রতীক্ষা করিয়া আছি উৎসুক হৃদয়ে
তারি তরে। বলো বলো, শুনি তার কথা।

চিত্রাঙ্গদা। কী আর শুনিবে ?

অর্জুন। দেখিতে পেতেছি তারে
বাম করে অশ্বরশ্মি ধরি অবহেলে
দক্ষিণেতে ধনুঃশর, হৃষ্ট নগরের
বিজয়লক্ষ্মীর মতো, আর্ত প্রজাগণে
করিছেন বরাভয় দান। দরিদ্রের
সংকীর্ণ দুয়ারে, রাজার মহিমা যেথা
নত হয় প্রবেশ করিতে, মাতৃরূপ
ধরি সেথা, করিছেন দয়া বিতরণ।
সিংহিনীর মতো, চারিদিকে আপনার
বৎসগণে রয়েছেন আগলিয়া, শত্রু
কেহ কাছে নাহি আসে ডরে। ফিরিছেন
মুক্তলজ্জা ভয়হীনা প্রসন্নহাসিনী,
বীর্যসিংহ'পরে চড়ি জগদ্ধাত্রী দয়া।
রমণীর কমনীয় দুই বাহু'পরে
স্বাধীন সে অসংকোচ বল, ধিক থাক্
তার কাছে রুনুঝুনু কঙ্কণ কিঙ্কিণী।
অয়ি বরারোহে, বহুদিন কর্মহীন
এ পরান মোর, উঠিছে অশান্ত হয়ে
দীর্ঘশীতসুপ্তোত্থিত ভুজঙ্গের মতো।
এস এস দোঁহে দুই মত্ত অশ্ব লয়ে
পাশাপাশি ছুটে চলে যাই, মহাবেগে

তুই দীপ্ত জ্যোতিষ্কের মতো। বাহিরিয়া
যাই, এই রুদ্ধ সমীরণ, এই তিক্ত
পুষ্পগন্ধমদিরায় নিদ্রাঘনঘোর
অরণ্যের অন্ধগর্ভ হতে।

চিত্রাঙ্গদা। হে কৌন্তেয়,
যদি এ লালিত্য, এই কোমল ভীরুতা,
স্পর্শক্লেশসকাতর শিরীষপেলব
এই রূপ, ছিন্ন করে ঘৃণাভরে ফেলি
পদতলে, পরের বসনখণ্ড সম—
সে-ক্ষতি কি সহিতে পারিবে। কামিনীর
ছলাকলা মায়ামন্ত্র দূর করে দিয়ে
উঠিয়া দাঁড়াই যদি সরল উন্নত
বীর্যমন্ত অন্তরের বলে, পর্বতের
তেজস্বী তরুণ তরুসম, বায়ুভরে
আনম্র সুন্দর, কিন্তু লতিকার মতো
নহে নিত্য কুণ্ঠিত লুণ্ঠিত,— সে কি ভালো
লাগিবে পুরুষ-চোখে। থাক্ থাক্, তার
চেয়ে এই ভালো। আপন যৌবনখানি
দু-দিনের বহুমূল্য ধন, সাজাইয়া
সযতনে, পথ চেয়ে বসিয়া রহিব ;
অবসরে আসিবে যখন, আপনার
সুধাটুকু দেহপাত্রে আকর্ণ পুরিয়া
করাইব পান ; সুখস্বাদে শ্রান্তি হলে
চলে যাবে কর্মের সন্ধানে ; পুরাতন
হলে, যেথা স্থান দিবে, সেথায় রহিব
পার্শ্বে পড়ি। যামিনীর নর্মসহচরী,
যদি হয় দিবসের কর্মসহচরী,
সতত প্রস্তুত থাকে বাম হস্তসম
দক্ষিণ হস্তের অনুচর, সে কি ভালো
লাগিবে বীরের প্রাণে ?

অর্জুন বুঝিতে পারিনে
আমি রহস্য তোমার। এতদিন আছি,
তবু যেন পাইনি সন্ধান। তুমি যেন
বঞ্চিত করিছ মোরে গুপ্ত থেকে সদা ;
তুমি যেন দেবীর মতন, প্রতিমার
অন্তরালে থেকে আমারে করিছ দান
অমূল্য চুম্বন-রত্ন, আলিঙ্গন-সুধা ;
নিজে কিছু চাহ না, লহ না। অঙ্গহীন
ছন্দোহীন প্রেম প্রতিক্ষণে পরিতাপ
জাগায় অন্তরে। তেজস্বিনী, পরিচয়
পাই তব মাঝে মাঝে কথায় কথায়।
তার কাছে এ সৌন্দর্যরাশি, মনে হয়
মৃত্তিকার মূর্তি শুধু, নিপুণচিত্রিত
শিল্প-যবনিকা। মাঝে মাঝে মনে হয়
তোমারে তোমার রূপ ধারণ করিতে
পারিছে না আর, কাঁপিতেছে টলমল
করি। নিত্যদীপ্ত হাসির অন্তরে
ভরা অশ্রু করিতেছে বাস, মাঝে মাঝে
ছলছল করে ওঠে, মুহূর্তের মাঝে
ফাটিয়া পড়িবে যেন আবরণ টুটি।
সাধকের কাছে, প্রথমেতে ভ্রান্তি আসে
মনোহর মায়া-কায়া ধরি ; তার পরে
সত্য দেখা দেয়, ভূষণবিহীন রূপে
আলো করি অন্তর বাহির। সেই সত্য
কোথা আছে তোমার মাঝারে, দাও তারে।
আমার যে-সত্য তাই লও। শ্রান্তিহীন
সে-মিলন চিরদিবসের।— অশ্রু কেন
প্রিয়ে। বাহুতে লুকায়ে মুখ কেন এই
ব্যাকুলতা। বেদনা দিয়েছি প্রিয়তমে ?
তবে থাক্, তবে থাক্। ওই মনোহর

রূপ পুণ্যফল মোর। এই যে সংগীত
শোনা যায় মাঝে মাঝে বসন্ত-সমীরে
এ যৌবন-যমুনার পরপার হতে,
এই মোর বহুভাগ্য। এ বেদনা মোর
সুখের অধিক সুখ, আশার অধিক
আশা, হৃদয়ের চেয়ে বড়ো, তাই তারে
হৃদয়ের ব্যথা বলে মনে হয়, প্রিয়ে।

১০

মদন, বসন্ত ও চিত্রাঙ্গদা

মদন। শেষ রাত্রি আজি।
বসন্ত। আজ রাত্রি-অবসানে
তব অঙ্গশোভা ফিরে যাবে বসন্তের
অক্ষয় ভাণ্ডারে। পার্থের চুম্বনস্মৃতি
ভুলে গিয়ে, তব ওষ্ঠরাগ, দুটি নব
কিশলয়ে মঞ্জরি উঠিবে লতিকায়।
অঙ্গের বরন তব, শত শ্বেত ফুলে
ধরিয়া নূতন তনু, গতজন্মকথা
ত্যজিবে স্বপ্নের মতো নব জাগরণে।
চিত্রাঙ্গদা। হে অনঙ্গ, হে বসন্ত, আজ রাত্রে তবে
এ মুমূর্ষু রূপ মোর, শেষ রজনীতে
অন্তিম শিখার মতো শ্রান্ত প্রদীপের
আচম্বিতে উঠুক উজ্জ্বলতম হয়ে।
মদন। তবে তাই হোক। সখা, দক্ষিণ পবন
দাও তবে নিশ্বসিয়া প্রাণপূর্ণ বেগে।
অঙ্গে অঙ্গে উঠুক উচ্ছ্বসি পুনর্বার
নবোল্লাসে যৌবনের ক্লান্ত মন্দ স্রোত।
আমি মোর পঞ্চ পুষ্পশরে নিশীথের

নিদ্রাভেদ করি, ভোগবতী তটিনীর
তরঙ্গ-উচ্ছ্বাসে, প্লাবিত করিয়া দিব
বাহুপাশে বদ্ধ দুটি প্রেমিকের তনু।

১১

শেষ রাত্রি

অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদা

চিত্রাঙ্গদা। প্রভু, মিটিয়াছে সাধ? এই সুললিত
সুগঠিত নবনীকোমল সৌন্দর্যের
যত গন্ধ যত মধু ছিল সকলি কি
করিয়াছ পান! আর-কিছু বাকি আছে?
আর-কিছু চাও? আমার যা-কিছু ছিল
সব হয়ে গেছে শেষ? হয় নাই প্রভু।
ভালো হোক, মন্দ হোক, আরো কিছু বাকি
আছে, সে আজিকে দিব।

প্রিয়তম, ভালো
লেগেছিল ব'লে করেছিনু নিবেদন
এ সৌন্দর্য-পুষ্পরাশি চরণকমলে—
নন্দনকানন হতে তুলে নিয়ে এসে
বহু সাধনায়। যদি সাঙ্গ হল পূজা
তবে আজ্ঞা করো প্রভু, নির্মাল্যের ডালি
ফেলে দিই মন্দির-বাহিরে। এইবার
প্রসন্ন নয়নে চাও সেবিকার পানে।

যে-ফুলে করেছি পূজা, নহি আমি কভু
সে-ফুলের মতো, প্রভু, এত সুমধুর,
এত সুকোমল, এত সম্পূর্ণ সুন্দর।
দোষ আছে, গুণ আছে, পাপ আছে, পুণ্য

আছে ; কত দৈন্য আছে ; আছে আজন্মের
কত অতৃপ্ত তিয়াষা। সংসার-পথের
পান্থ, ধূলিলিপ্তবাস বিক্ষতচরণ ;
কোথা পাব কুসুম-লাবণ্য, দু-দণ্ডের
জীবনের অকলঙ্ক শোভা। কিন্তু আছে
অক্ষয় অমর এক রমণী-হৃদয়।
দুঃখ সুখ আশা ভয় লজ্জা দুর্বলতা—
ধূলিময়ী ধরণীর কোলের সন্তান,
তার কত ভ্রান্তি, তার কত ব্যথা, তার
কত ভালোবাসা, মিশ্রিত জড়িত হয়ে
আছে একসাথে। আছে এক সীমাহীন
অপূর্ণতা, অনন্ত মহৎ। কুসুমের
সৌরভ মিলায়ে থাকে যদি, এইবার
সেই জন্মজন্মান্তের সেবিকার পানে
চাও।

সূর্যোদয়

অবগুণ্ঠন খুলিয়া

আমি চিত্রাঙ্গদা। রাজেন্দ্রনন্দিনী।
হয়তো পড়িবে মনে, সেই একদিন
সেই সরোবরতীরে শিবালয়ে দেখা
দিয়েছিল এক নারী, বহু আভরণে
ভারাক্রান্ত করি তার রূপহীন তনু।
কী জানি কী বলেছিল নির্লজ্জ মুখরা,
পুরুষেরে করেছিল পুরুষ-প্রথায়
আরাধনা ; প্রত্যাখ্যান করেছিলে তারে।
ভালোই করেছ। সামান্য সে নারীরূপে
গ্রহণ করিতে যদি তারে, অনুতাপ
বিঁধিত তাহার বুকে আমরণ কাল।
প্রভু, আমি সেই নারী। তবু আমি সেই

নারী নহি ; সে আমার হীন ছদ্মবেশ ।
তার পরে পেয়েছিনু বসন্তের বরে
বর্ষকাল অপরূপ রূপ । দিয়েছিনু
শ্রান্ত করি বীরের হৃদয়, ছলনার
ভারে । সে-ও আমি নহি ।
আমি চিত্রাঙ্গদা
দেবী নহি, আমি নহি সামান্যা রমণী ।
পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি
নই, অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নহি । যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সংকটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী,
আমার পাইবে তবে পরিচয় । গর্ভে
আমি ধরেছি যে সন্তান তোমার, যদি
পুত্র হয়, আশৈশব বীরশিক্ষা দিয়ে
দ্বিতীয় অর্জুন করি তারে একদিন
পাঠাইয়া দিব যবে পিতার চরণে,
তখন জানিবে মোরে, প্রিয়তম ।
আজ
শুধু নিবেদি চরণে, আমি চিত্রাঙ্গদা,
রাজেন্দ্রনন্দিনী ।

অর্জুন । প্রিয়ে, আজ ধন্য আমি ।

কটক
২৮ ভাদ্র, ১২৯৮

গোড়ায় গলদ

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন
প্রিয়বন্ধুবরেষু

নাটকের পাত্রগণ

বিনোদবিহারী	
চন্দ্রকান্ত	
নলিনাক্ষ	
নিমাই	
শ্রীপতি	
ভূপতি	
নিবারণ	চন্দ্রকান্তের প্রতিবেশী
শিবচরণ	নিমাইয়ের পিতা
কমলমুখী	নিবারণের পালিতা কন্যা
ইন্দুমতী	নিবারণের কন্যা
ক্ষান্তমণি	চন্দ্রকান্তের স্ত্রী

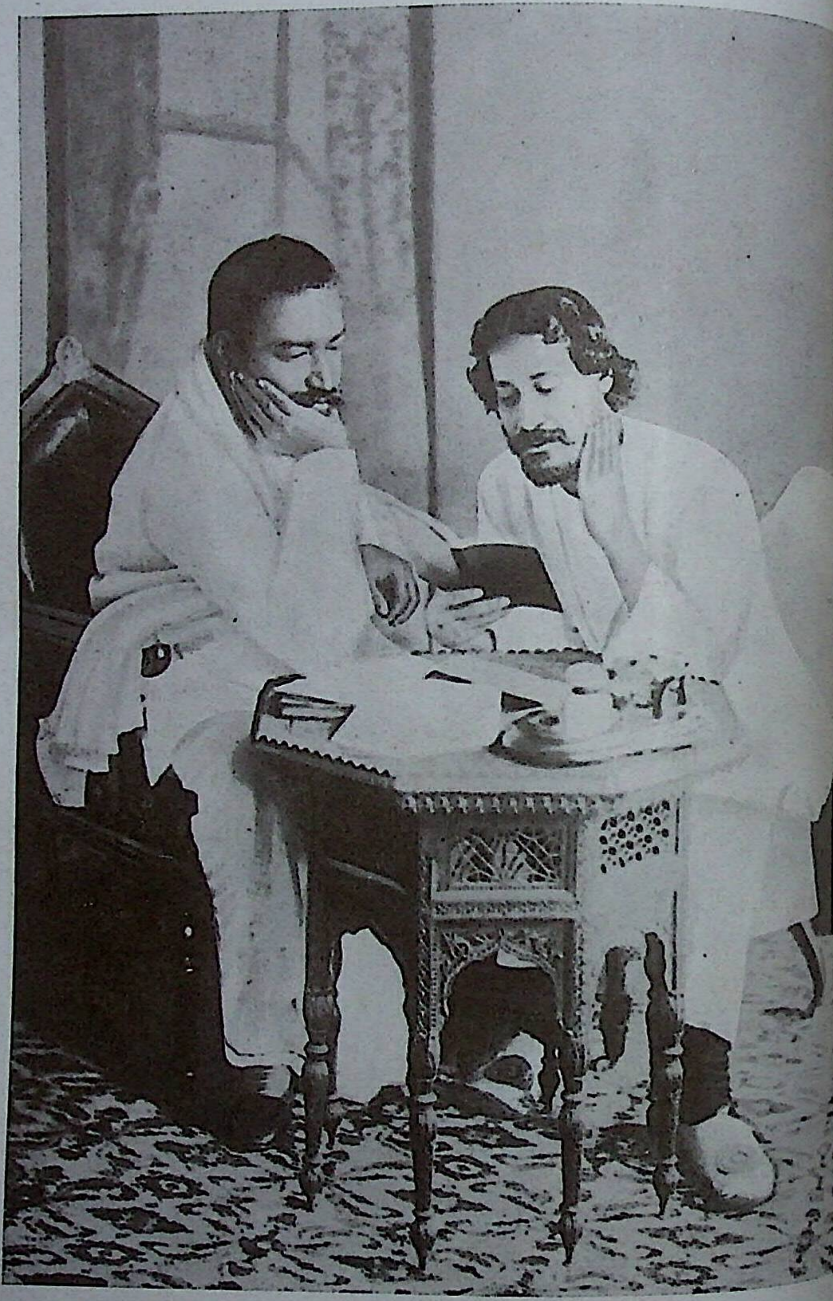

প্রিয়নাথ সেন ও রবীন্দ্রনাথ

গোড়ায় গলদ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

চন্দ্রকান্তের বাসা

বিনোদবিহারী, নলিনাক্ষ ও চন্দ্রকান্ত

চন্দ্রকান্ত। আচ্ছা বিনদা, সত্যি বলো না ভাই, জগৎটা কি বেবাক শূন্য মনে হয়।

নলিনাক্ষ। তুমি একেবারে আকাশ থেকে পড়লে যে। তোমার হয় না, নাকি। আমাদের তো হয়।

চন্দ্রকান্ত। তবু কী রকমটা হয় শুনিই না।

নলিনাক্ষ। বুঝতে পারছ না? সমস্ত কেমন যেন শূন্য— যেন ফাঁকা— যেন মরুভূমি—

চন্দ্রকান্ত। যেন নেড়া মাথার মতো। আমারও বোধ করি ঐ রকমই মনে হয় কিন্তু ঠিক বুঝতে পারিনে— আচ্ছা, বিনদা, জগৎটা যদি মরুভূমিই হল—

বিনোদবিহারী। বড্ড বেজার করলে যে হে! কে বলছে মরুভূমি! তা হলে পৃথিবীশুদ্ধ এতগুলো গোরু চরে বেড়াচ্ছে কোন্‌খানে। জগতে গোরুর খাবার ঘাসও যথেষ্ট আছে এবং ঘাস খাবার গোরুরও অভাব নেই।

চন্দ্রকান্ত। দিব্যি গুছিয়ে বলেছ বিনু। ঐ যা বললে ভাই। সবাই কেবল চিবোচ্ছে আর জাওর কাটছে আর ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে— কিছু একটা হচ্ছে না—

বিনোদবিহারী। কিছু না, কিছু না। দেখো না, দুটি ব্রাহ্মণ এবং একটি কায়স্থকুলতিলক বসে বসে খোপের মধ্যে দুপুরবেলাকার পায়রার মতো সমস্ত ক্ষণ কেবল বকবক করছি, তার না আছে অর্থ, না আছে তাৎপর্য।

নলিনাক্ষ। ঠিক। না আছে অর্থ, না আছে কিছু।

চন্দ্রকান্ত। কিন্তু সত্যি কথা বলছি, ভাই নলিন, রাগ করিসনে, এ-সব কথা বিনদার মুখে যেমন মানায় তোর মুখে তেমন মানায় না। তুই কেমন ঠিক সুরটি লাগাতে পারিসনে। বিনু যখন বলে জগৎটা শূন্য—তখন দেখতে দেখতে চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবীটা যেন একটা ঘষা পয়সার মতো চেহারা বের করে।

বিনোদবিহারী। চন্দ্র, তোমার কাছে কথা কয়ে সুখ আছে, তার মধ্যে দুটো নতুন সুর লাগাতে পার। নইলে নিজের প্রতিধ্বনি শুনে শুনে নিজের উপর বিরক্ত ধরে গেল।

নলিনাক্ষ। ঠিক বলেছ। বিরক্ত ধরে গেছে। প্রাণের কথা কেউ বুঝতে পারে না—

বিনোদবিহারী। নলিন, সকালবেলাটায় আর তোমার প্রাণের কথা তুলো না—একটু চুপ করো তো দাদা। আজ রবিবারটা আছে, আজ একটা কিছু করা যাক, যাতে মনটা বেশ তাজা হয়ে ধড়ফড়িয়ে ওঠে।

চন্দ্রকান্ত। ঠিক বলেছ। ওষুধের শিশির মতো নিদেন হপ্তার মধ্যে একটা দিন নিজেকে খানিকটা ঝাঁকানি দিয়ে নেওয়া আবশ্যক—নইলে শরীরে যা কিছু পদার্থ ছিল সমস্তই তলায় থিতিয়ে গেল। কী করা যায় বলো দেখি। চলো, গড়ের মাঠে বেড়িয়ে আসা যাক।

বিনোদবিহারী। হাঃ—গড়ের মাঠে কে যায়। তুমিও যেমন।

চন্দ্রকান্ত। তবে ক্লাবে চলো।

বিনোদবিহারী। রাম! কেবল কতকগুলো মনুষ্যমূর্তি দেখে আসা, তাও আবার প্রায়ই চেনা লোক।

চন্দ্রকান্ত। তবে এক কাজ করা যাক। চলো আমরা বোষ্টম ভিক্ষুক সেজে বেরিয়ে পড়ি—দেখি তিনটে প্রাণী সমস্ত দিন শহরে কত ভিক্ষে কুড়োতে পারি।

বিনোদবিহারী। কথাটা মন্দ নয়, কিন্তু বড়ো ল্যাঠা।

চন্দ্রকান্ত। তা হলে আর একটা প্ল্যান মাথায় এসেছে—

বিনোদবিহারী। কী বলো দেখি।

চন্দ্রকান্ত। যেমন আছি এমনিই বসে থাকি।

বিনোদবিহারী। ঠিক বলেছ। সেটা এতক্ষণ আমার মাথায় আসেনি। আজ তবে এমনি বসে থাকাই যাক।—দেখো দেখি চন্দর, একে কি বেঁচে থাকা বলে। সোমবার থেকে শনিবার পর্যন্ত কেবল কালেজ যাচ্ছি, আইন পড়ছি আর সেই

পটলডাঙার বাসার মধ্যে পড়ে পড়ে ট্রামের ঘড়ঘড় শুনছি। হপ্তার মধ্যে একটার বেশি রবিবার আসে না, তাও কিসে খরচ করব ভেবে পাওয়া যায় না।

চন্দ্রকান্ত। আচ্ছা বর্ষার দিনে যেমন চালকড়াইভাজা তেমনি রবিবার দিনে কী হলে ঠিক হত বলো দেখি বিনদা।

বিনোদবিহারী। তবে সত্যি কথা বলব। অ্যাঁ! একটি রাঙা পাড়, একটু মিষ্টি হাসি, দুটো নরম কথা,— তার থেকে ক্রমে দীর্ঘনিশ্বাস, ক্রমে অশ্রুজল, ক্রমে ছটফটানি—

চন্দ্রকান্ত। এমন কি, আত্মহত্যা পর্যন্ত—

বিনোদবিহারী। হাঁ— এই হলে জীবনটার একটুখানি স্বাদ পাওয়া যায়। ভাই, ওই কালো চোখ, টুকটুকে ঠোঁট, মিষ্টিমুখের সঙ্গে মাঝে মাঝে মিশল না হলে এই রোজ রোজ নিরিমিষ দিনগুলো আর তো মুখে রোচে না। কেবল এই শুকনো বইয়ের বোঝা টেনে এই পঁচিশটা বৎসর কী করে কাটল বলো দেখি।

চন্দ্রকান্ত। এর চেয়ে সাধের মানবজন্ম একেবারেই ঘুচিয়ে দিয়ে যদি কোনো গতিকে একটা ইংরেজ নভেলিস্টের মাথার মধ্যে সেঁধোতে পারা যেত, বেশ দিব্যি সোনার জলে বাঁধানো একখানি তকতকে বইয়ের মধ্যে ছাপা হয়ে বেরোতুম— কখনো ঈডিথ, কখনো এলেন, কখনো লিওনোরার সঙ্গে বেশ ভালো ইংরিজিতে প্রেমালাপ করছি— মেয়ের বাপ বিয়ে দিতে চাচ্ছে না, মেয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে মরতে চাচ্ছে, শেষকালে নভেলের শেষ পাতায় বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে দুটিতে মিলে ঘরকরনা করছি— হুহু করে এডিশনের পর এডিশন উঠে যাচ্ছে আর পাঁচ-পাঁচ শিলিঙে বিক্রি হচ্ছি।

বিনোদবিহারী। চমৎকার! কত মেরি-ফ্যানি-ল্যুসির হাতে হাতে কোলে কোলে দিনপাত করা যাচ্ছে। যে-সব নীল চোখ কোনো জন্মে আমাদের প্রতি কটাক্ষপাতও করত না তারা হুহু শব্দে আমাদের জন্যে অশ্রুবর্ষণ করছে। তা না হয়ে জন্মালুম বাঙালির ঘরে— কেবল একুইটি আর এভিডেন্স অ্যাক্ট মুখস্থ করে করেই দুর্লভ জীবনটা কাটালুম।

নলিনাক্ষ। চললুম ভাই বিনোদ। আমি থাকলে তোমার ভালো লাগে না, তোমাদের গল্প জমে না— চন্দর ছাড়া আর কারো সঙ্গে তোমার প্রাণের কথা হয় না। —"ভালোবাসা ভুলে যাব, মনেরে বুঝাইব, পৃথিবীতে আর যেন কেউ কারেও ভালোবাসে না!"

[দ্রুতপ্রস্থান

বিনোদবিহারী। এই দেখো। রোম্যান্সের কথা হচ্ছিল এই এক রোম্যান্স।

পোড়া অদৃষ্ট এমনি, ভালোবাসা বল যা বল সবই জুটল, কেবল বিধির বিপাকে একটু ব্যাকরণের ভুল হয়েই সব মাটি করে দিয়েছে।

চন্দ্রকান্ত। কেবল একটা দীর্ঘ ঈর জন্যে। নলিনাক্ষ না হয়ে যদি নলিনাক্ষী হত। হায় হায়! কিন্তু তা হলে এই মিনসে চন্দ্রবিন্দুটাকে লোপ করে দেবার জায়গা পেতে না।

নিমাইয়ের প্রবেশ

নিমাই। কী হচ্ছে।

বিনোদবিহারী। যা রোজ হয় তাই হচ্ছে।

নিমাই। সেন্টিমেণ্টাল আলোচনা! তোমাদের আচ্ছা এক কাজ হয়েছে যা হোক। ওটা একটা শারীরিক ব্যামো তা জান? বেশ ভালো করে আহারটি করলে এবং সেটি হজম করতে পারলে কবিত্বরোগ কাছে ঘেঁষতে পারে না। আর আধপেটা করে খাও, আর অম্বলের ব্যামোটি বাধাও, আর অমনি কোথায় আকাশের চাঁদ, কোথায় দক্ষিণের বাতাস, কোথায় কোকিল পক্ষীর ডাক, এই নিয়ে ভারি মাথাব্যথা পড়ে যায়— জানালার কাছে বসে বসে মনে হয় কী যেন চাই— যা চাও সেটি যে হচ্ছে বাইকার্বোনেট.অফ সোডা তা কিছুতেই বুঝতে পার না।

বিনোদবিহারী। তা যদি বল তা হলে জীবনটাই তো একটা প্রধান রোগ, এবং সকল রোগের গোড়া। জড়পদার্থ কেমন সুস্থ আছে— মাঝের থেকে হঠাৎ প্রাণ নামক একটা ব্যাধি জুটে প্রাণীগুলোকে খেপিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। বাতাসে একটা ঢেউ উঠল অমনি কানের মধ্যে ভোঁ করে উঠল, ঈথর একটু নড়ে উঠল অমনি চোখের মধ্যে চিকমিক করতে লাগল, সকালবেলায় উঠেই পেটের মধ্যে চোঁ চোঁ করতে আরম্ভ করেছে— এ কি কখনো স্বাভাবিক অবস্থা হতে পারে। স্বাভাবিক যদি বলতে চাও সে কেবল কাঠ পাথর মাটি—

নিমাই। আরে, অতটা দূর গেলে তো কথাই নেই। কিন্তু তোমরা ওই যে যাকে ভালোবাসা বল সেটা যে শুদ্ধ একটা স্নায়ুর ব্যামো তার আর সন্দেহ নেই। আমার বিশ্বাস অন্যান্য ব্যামোর মতো তারও একটা ওষুধ বের হবে। বালক-বালিকাদের যেমন হাম হয়, যুবকযুবতীদের তেমনি ওই একটা স্নায়ুর উৎপাত ঘটে, কারো বা খুব উৎকট, কারো বা একটু মৃদু রকমের। যখন ও রোগটা চিকিৎসা-শাস্ত্রের অধীনে আসবে তখন লক্ষণ মিলিয়ে ওষুধ ঠিক করতে হবে— ডাক্তার রোগীকে জিজ্ঞাসা করবে,— "আচ্ছা, তাকে কি তোমার সর্বদাই মনে পড়ে। তার কাছে থাকলে

বেশি ভালোবাসা বোধ হয় না দূরে গেলে? তাকে দেখতে আস না দেখা দিতে আস?” এই সমস্ত নির্ণয় করে তবে ওষুধ আনতে হবে।

চন্দ্রকান্ত। কাগজে বিজ্ঞাপন বেরোবে— “হৃদয়বেদনার জন্য অতি উত্তম মালিশ, উত্তম মালিশ, উত্তম মালিশ। বিরহ-নিবারিণী বটিকা। রাত্রে একটি, সকালে একটি সেবন করিলে সমস্ত বিরহ দূর হইয়া অন্তঃকরণ পরিষ্কার হইয়া যাইবে।”

বিনোদবিহারী। আবার প্রশংসাপত্র বেরোবে— কেউ লিখবে— “আমি একাদিক্রমে আড়াইমাস কাল আমার প্রতিবেশিনীর প্রেমে ভুগিতেছিলাম— নানারূপ চিকিৎসায় কোনো আরাম না পাইয়া অবশেষে আপনার জগদ্বিখ্যাত প্রেমাঙ্কুশ রস সেবন করিয়া প্রায় সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছি— এক্ষণে উক্ত প্রতিবেশিনীর জন্য ভ্যালুপেয়েব্লে বড়ো এক শিশি পাঠাইয়া বাধিত করিবেন, তাঁহার ব্যাধিটা আমার অপেক্ষাও অনেক প্রবল জানিবেন। ইতি— ”

নিমাই। ওহে চন্দর, তামাক ডাকো। তোমরা ধোঁয়ার মধ্যে বাস কর, তোমাদের আর তামাকের দরকার হয় না, আমরা পৃথিবীতে থাকি আমাদের তামাকটা পানটা, এমন কি সামান্য ভাতটা ডালটারও আবশ্যক ঠেকে।

চন্দ্রকান্ত। বটে বটে, ভুল হয়ে গেছে, মাপ করো নিমাই। ওরে ভুতো, —আবাগের বেটা ভূত— তামাক দিয়ে যা।— আচ্ছা ভাই বিনু, মেয়েমানুষের কথা যে বলছিলে কী রকম মেয়েমানুষ তোমার পছন্দসই। তোমার আইডিয়ালটি কী আমাকে বলো দেখি।

বিনোদবিহারী। আমি কী রকম চাই জান? যাকে কিছু বোঝবার জো নেই। যাকে ধরতে গেলে পালিয়ে যায়— পালাতে গেলে ধরে টেনে নিয়ে আসে। যে শরতের আকাশের মতো এদিকে বেশ নির্মল কিন্তু কখন রোদ উঠবে, কখন মেঘ করবে, কখন বৃষ্টি হবে, কখন বিদ্যুৎ দেখা দেবে, তা স্বয়ং বিজ্ঞানশাস্ত্রের পিতৃ-পিতামহও ঠিক করে বলতে পারে না।

চন্দ্রকান্ত। বুঝেছি— যে কোনোকালেই পুরোনো হবে না। মনের কথা টেনে বলেছ ভাই। কিন্তু পাওয়া শক্ত। আমরা ভুক্তভোগী, জানি কি না, বিয়ে করলেই মেয়েগুলো দু-দিনেই বহুকেলে পড়া পুঁথির মতো হয়ে আসে; মলাটটা আধখানা ছিঁড়ে ঢলঢল করছে, পাতাগুলো দাগি হয়ে খুলে খুলে আসছে— কোথায় সে আঁটসাঁট বাঁধুনি, কোথায় সে সোনার জলের ছাপ— তা ছাড়া যেখানে খুলে দেখ সেই এক কথা— “কমলিনী অতি সুবোধ মেয়ে, সে ঘরকন্নায় কদাচ আলস্য করে না; সে প্রত্যুষে উঠিয়াই গৃহমার্জন এবং গোময়লেপন করে; যথাসময়ে স্বামীর অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত

করিয়া রাখে, যাহাতে তাঁহার আপিসে যাইতে বিলম্ব না হয়; আপিস হইতে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার গাড়ু-গামছা ঠিক করিয়া রাখে এবং রাত্রিকালে তাঁহার মশারি ঝাড়িয়া দেয়!" আগাগোড়া একটা নীতি-উপদেশের মতো। স্ত্রী হবে কেমন— রোজ এক-এক পাতা ওলটাবে আর এক-একটা নতুন চ্যাপ্টার বেরোবে।

নিমাই। অর্থাৎ কোনোদিন বা গৃহমার্জন করবে, কোনোদিন বা স্বামীর পৃষ্ঠমার্জন করবে! একদিন বা মেঝেতে গোময় লেপন করলে একদিন বা স্বামীর পবিত্র মাথার উপর ঘোল সেচন করলে—পূর্বাহ্নে কিছুই ঠিক করবার জো নেই।

চন্দ্রকান্ত। সে যেন হল— আর চেহারাটা কী রকম হবে।

বিনোদবিহারী। চেহারাটি বেশ ছিপছিপে, মাটির সঙ্গে অতি অল্পই সম্পর্ক, যেন "সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব।" অর্থাৎ যাকে দেখে মনে হবে অতি ক্ষীণবল— অস্তিত্বটুকু কেবল নামমাত্র— অথচ ওইটুকুর মধ্যে যে এত লীলা, এত বল, এত কৌতুক তাই দেখে পলকে পলকে আশ্চর্য বোধ হবে। যেন বিদ্যুতের মতো, একটিমাত্র আলোর রেখা— কিন্তু তার ভিতরে কত চাঞ্চল্য, কত হাসি, কত বজ্রতেজ।

চন্দ্রকান্ত। আর বেশি বলতে হবে না— আমি বুঝে নিয়েছি। তুমি চাও পদ্যর মতো চোদ্দটি অক্ষরে বাঁধাসাঁধা, ছিপছিপে; অমনি, চলতে ফিরতে ছন্দটি রেখে চলে, কিন্তু এদিকে মল্লিনাথ, ভরত শিরোমণি, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি বড়ো বড়ো পণ্ডিত তাঁর টিকে ভাষ্য করে থই পায় না। বুঝেছ বিনদা, আমিও তাই চাই, কিন্তু চাইলেই তো পাওয়া যায় না—

বিনোদবিহারী। কেন, তোমার কপালে তো মন্দ জোটেনি।

চন্দ্রকান্ত। মন্দ বলতে সাহস করিনে— কিন্তু ভাই, পদ্য নয় সে গদ্য,—বিধাতা অক্ষর মিলিয়ে তাকে তৈরি করেননি, কলমে যা এসেছে তাই বসিয়ে গেছেন—এই প্রতিদিন যে-ভাষায় কথাবার্তা চলে তাই আর-কি। ওর মধ্যে বেশ একটি ছাঁদ পাওয়া যাচ্ছে না।

নিমাই। আর ছাঁদে কাজ নেই ভাই। আবার তোমার কী রকম ছাঁদ সেটাও তো দেখতে হবে। বিনোদ লেখক-মানুষ, ওর মুখে সকলরকম খ্যাপামিই শোভা পায়, ও যদি হঠাৎ মাঝের থেকে বিদ্যুৎ কিংবা অনুষ্টুভ ছন্দকে বিয়ে করে বসে ও তাদের সামলাতে পারে, বরঞ্চ ওকে নিয়েই তারা কিছু ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু চন্দরদা, তোমার সঙ্গে একটি আস্ত পদ্য জুড়ে দিলে কি আর রক্ষে ছিল। এক লাইন পদ্য আর এক লাইন গদ্যে কখনো মিল হয়?

চন্দ্রকান্ত। সে-কথা অস্বীকার করবার জো নেই। কিন্তু আমাকে বাইরে থেকে যা দেখিস নিমাই, ভিতরে যে কিছু পদ্য নেই তা বলতে পারিনে। আমি, যাকে বলে, চম্পূকাব্য! গঙ্গাজল ছুঁয়ে বললেও কেউ বিশ্বাস করে না, কিন্তু মাইরি বলছি আমারও মন এক-একদিন উড়ু-উড়ু করে— এমন কি, চাঁদের আলোয় শুয়ে পড়ে পড়ে এমনও ভেবেছি— আহা, এই সময়ে প্রেয়সী যদি চুলটি বেঁধে, গাটি ধুয়ে, একখানি বাসন্তী রঙের কাপড় প'রে, একগাছি বেলফুলের মালা হাতে করে নিয়ে এসে গলায় পরিয়ে দেয় আর মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে বলতে থাকে—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল,
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়ে জুড়ন না গেল।

প্রেয়সীও আসে, দু-চার কথা বলেও থাকে, কিন্তু আমার ঐ বর্ণনার সঙ্গে ঠিকটি মেলে না।

নিমাই। দেখো বিনোদ, তোমাদের সঙ্গে একটা বিষয়ে আমার ভারি মতের অনৈক্য হয়। মেয়েমানুষ যদি বড্ড বেশি জ্যান্ত গোছের হয় তাকে নিয়ে পুরুষের কখনোই পোষায় না। দু-জন জ্যান্ত লোকে কখনো রীতিমত মিল হতে পারে? তোমার কাপড়টি যেমন বেশ নির্বিবাদে গায়ে লেগে রয়েছে স্ত্রীটি ঠিক তেমনি হওয়া চাই—এ বিষয়ে আমি ভাই সম্পূর্ণ রক্ষণশীল কিংবা স্থিতিশীল, কিংবা যা বল।

চন্দ্রকান্ত। তা বটে। মনে করো তোমার জামাটাও যদি জ্যান্ত হত, প্রতি কথায় দু-জনে আপস করতে করতেই দিন যেত, ফস করে যে মাথাটা গলিয়ে দিয়ে পরে ফেলবে তার জো থাকত না। তুমি যখন বোতাম আঁটতে চাও সে হয়তো তার গর্তগুলো প্রাণপণে এঁটে বসে রইল। তোমার নেমন্তন্ন আছে, খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে, তোমার শাল অভিমান করে বসে আছেন; যতই টানাটানি কর কিছুতেই তাঁর আর ভাঁজ খোলে না।

নিমাই। সেই কথাই বলছি। দেখিস, আমি যাকে বিয়ে করব সে মাটি থেকে মুখ তুলবে না, তার হাসি ঘোমটার মধ্যেই মিলিয়ে যাবে, তার পায়ের মলের শব্দ শুনতে কানে দুরবীন কষতে হবে। যা হোক বিনোদ, তুমি একটা বিয়ে করে ফেলো। সর্বদা তুমি যে মনটা বিগড়ে বসে রয়েছ সে কেবল গৃহলক্ষ্মীর অভাবে। পূর্বকালে সে ছিল ভালো, বাপমায়ে ছেলেবেলায় বিয়ে দিয়ে দিত— একেবারে শিশুকালেই প্রেমরোগের টিকে দিয়ে রাখা হত।

চন্দ্রকান্ত। আমিও বিনুকে এক-একবার সে-কথা বলেছি। একটি স্ত্রী সহস্র

দুশ্চিন্তার জায়গা জুড়ে বসে থাকেন— বেদনার উপরে যেমন বেলেস্তারা অন্যা॥ ভবযন্ত্রণার উপরে স্ত্রীর প্রয়োগটাও তেমনি।

পাশের বাড়ি হইতে গানের শব্দ

বিনোদবিহারী। ঐ শোনো, সেই গান হচ্ছে।

নিমাই। কার গান হে?

চন্দ্রকান্ত। চুপ করে খানিকটা শোনোই না; পরে পরিচয় দেব।

গান

বিনোদবিহারী। চন্দ্র, আজ কী করব ভাবছিলুম, একটা মতলব মাথায় এসেছে।

চন্দ্রকান্ত। কী বলো দেখি।

বিনোদবিহারী। চলো— যে মেয়েটি গান গায় ওর সঙ্গে আজই আমার বিয়ের সম্বন্ধ করে আসিগে।

চন্দ্রকান্ত। বল কী!

বিনোদবিহারী। একটা তো কিছু করা চাই। আর তো বসে বসে ভালো লাগছে না। বিয়ে করে আসা যাকগে। অমনতরো গান শুনলে মানুষ খামকা সকল রকম দুঃসাহসিক কাজই করে ফেলতে পারে।

চন্দ্রকান্ত। কিন্তু দেখাশুনো তো করবে, আলাপ-পরিচয় তো করতে হবে? আমাদের মতো তো আর বাপমায়ে দু-হাতে চোখ-কান বুজে ধরে বিয়ে গিলিয়ে দেবে না।

বিনোদবিহারী। না, আমি তাকে দেখতে চাইনে। মনে করো আমি কেবল ওই গানকেই বিয়ে করছি। গান তো দৃষ্টিগোচর নয়।

চন্দ্রকান্ত। বিনু, এ-কথাটা তোর মুখেও একটু বাড়াবাড়ি শোনাচ্ছে। কেবল গান বিয়ে করতে চাস তো একটা আর্গিন কেন্‌ না? এ যে ভাই মানুষ, বড়ো সহজ জন্তু নয়! এ যেমন গান গাইতে পারে তেমনি পাঁচ কথা শুনিয়ে দিতেও পারে। একই কণ্ঠ থেকে দু-রকম বিপরীত স্বর বের করতে পারে। গানটি পেতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে আস্ত স্ত্রীলোকটিকেও নিতে হয় এবং তাঁকে নিতে গেলেই একটু দেখেশুনে নেওয়া ভালো।

বিনোদবিহারী। না ভাই, আসল রত্নটুকুর অনুসন্ধান পাওয়া গেছে, এখন চোখ-কান বুজে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। আহা, এক বার ভেবে দেখো দেখি

চন্দ্র, প্রত্যেক দিনটির সঙ্গে সকালে সন্ধে দুটি-একটি করে তেমন-তেমন মিষ্টি সুর যদি লাগে, তা হলে জীবনের এক-একটা দিন এক-এক পাত্র মদের মতো এক চুমুকে নিঃশেষ করে ফেলা যায়—

চন্দ্রকান্ত। এখন বুঝি কেবল মুখ সিট্‌কে চিরেতা খাচ্ছিস।

বিনোদবিহারী। তা নয় তো কী। তুমি যে দেখে নিতে বলছ, দেখব কাকে। মানুষ কি চোখ চাইলেই দেখা যায়। দৈবাৎ হাতে ঠেকে। তুমিও যেমন! রাখো জীবনটা বাজি— চক্ষু বুজে দান তুলে নাও, তার পর হয় রাজা নয় ফকির— একেই তো বলে খেলা।

চন্দ্রকান্ত। উঃ! কী সাহস! তোমার কথা শুনলে আমার মতো মরচে-পড়া বিবাহিত লোকেরও বুক সাত হাত হয়ে ওঠে— ফের আর-একটা বিয়ে করতে ইচ্ছে করে। সত্যি, তোমাদের দেখে হিংসে হয়। একেবারে আঠারো আনা কবিত্ব করে নিলে হে। না দেখে বিয়ে তো আমরাও করেছি কিন্তু তার মধ্যে এমনতরো নেশা ছিল না। এ যে একেবারে দেখতে-না-দেখতে এক মুহূর্তে ভোঁ হয়ে উঠল!

নিমাই। তা বলি, বিয়ে যদি করতে হয় নিজে না দেখে করাই ভালো। যেমন ডাক্তারের পক্ষে নিজের কিংবা আত্মীয়ের চিকিৎসে করাটা কিছু নয়। কিন্তু বন্ধুবান্ধবদের দেখে শুনে নেওয়া উচিত। মেয়েটি কে বলো তো হে চন্দরদা।

চন্দ্রকান্ত। আমাদের নিবারণবাবুর বাড়িতে থাকেন, নাম কমলমুখী। আদিত্যবাবু আর নিবারণবাবু পরমবন্ধু ছিলেন। আদিত্য মরবার সময় মেয়েটিকে নিবারণবাবুর হাতে সমর্পণ করে দিয়ে গেছেন। নিবারণবাবু লোকটি কিছু নতুন ধরনের। যেমন কাঁচাপাকা মাথা, তেমনি কাঁচাপাকা স্বভাবের মানুষটিও। অনেক বিষয়ে সেকেলে অথচ অনেকগুলো একেলে ভাবও আছে। মেয়েটির বয়স হয়েছে, শুনেছি লেখাপড়াও কিছু অতিরিক্ত রকম শেখানো হয়েছে। বিনু যখন মুখনাড়া খাবেন তার মধ্যে ব্যাকরণের ভুল বের করতে পারবেন না। মনে করো, আমার গৃহিণী যখন উক্ত কার্যে প্রবৃত্ত হন তখন প্রায়ই তাঁর দুটো-চারটে গ্রাম্যতা-দোষ সংশোধন করে দিতে হয়, কিন্তু—

নিমাই। যাই হোক, একবার দেখে আসতে হচ্ছে।

বিনোদবিহারী। খেপেছ নিমাই! সে তো আর কচি মেয়ে নয় যে, ক-টি দাঁত উঠেছে শুনতে যাবে কিংবা বর্ণপরিচয়ের পরীক্ষা নেবে।

নিমাই। তা বটে, গিয়ে নিজেই অপ্রতিভ হয়ে বসে থাকতে হবে, ভয় হবে পাছে আমাকেই একজামিন করে বসে।

বিনোদবিহারী। আচ্ছা, একটা বাজি রাখা যাক! কী রকম তাকে দেখতে। গান শুনে আমার মনে একটা চেহারা উঠেছে— রং গৌরবর্ণ, পাতলা শরীর, চোখ দুটি খুব চঞ্চল, উজ্জ্বল হাসি এবং কথা মুখে বাধে না। চুল খুব যে বড়ো তা নয় কিন্তু কুঁকড়ে কুঁকড়ে মুখের চার দিকে পড়েছে!

নিমাই। আচ্ছা, আমি বলছি সে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, দোহারা আকৃতি, বেশ ধীর সুগম্ভীর ভাব, বড়ো বড়ো স্থির চক্ষু, বেশি কথা কইতে ভালোবাসে না, প্রশান্তভাবে ঘরকন্নার কাজ করে— খুব দীর্ঘ ঘন চুল পিঠ আচ্ছন্ন করে পড়েছে।

চন্দ্রকান্ত। আচ্ছা, আমি বলব! রংটি দুধে আলতায়; সর্বদা প্রফুল্ল; অন্যের ঠাট্টায় খুব হাসে কিন্তু নিজে ঠাট্টা করতে পারে না; সরল অথচ বুদ্ধির অভাব নেই,— একটু সামান্য আঘাতে মুখখানি ম্লান হয়ে আসে,— যেমন অল্প উচ্ছ্বাসেই গান গেয়ে ওঠে তেমনি অল্প বাধাতেই গান বন্ধ হয়ে যায়,— ঠিক যাকে চঞ্চল বলে তা নয় কিন্তু বেশ একটি যেন হিল্লোল আছে।

নিমাই। তুমি তোমার প্রতিবেশিনীকে আগে থাকতেই দেখনি তো?

চন্দ্রকান্ত। মাইরি বলছি, না! আমার কি আর আশেপাশে দেখবার জো আছে। আমার এ দুটি চক্ষুই একেবারে দস্তখতি সীলমোহর করা, অন হার ম্যাজিস্টিস্ সর্ভিস! তবে শুনেছি বটে দেখতে ভালো এবং স্বভাবটিও ভালো।

নিমাই। আচ্ছা, এখন তা হলে আমরা কেউ দেখব না; একেবারে সেই বিবাহের রাত্রে মিলিয়ে দেখা যাবে।

চন্দ্রকান্ত। এ কিন্তু বড়ো মজা হচ্ছে ভাই— আমার লাগছে বেশ। সত্যি সত্যি একটা গুরুতর যে কিছু হচ্ছে তা মনেই হচ্ছে না। বাস্তবিক, বিনোদের যদি বিয়ে করতে হয় তো এইরকম বিয়েই ভালো। নইলে, ও যে গম্ভীরভাবে রীতিমত প্রণালীতে ঘটকালি দিয়ে দরদাম ঠিক করে একটি ছিঁচকাঁদুনে দুধের মেয়ে বিয়ে করে এনে মানুষ করতে বসবে, সে কিছুতেই মনে করতে পারিনে।

তোমরা একটু বসো ভাই, আমি অমনি বাড়ির ভিতর থেকে চট্ করে চাদরটা পরে আসি। [প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

চন্দ্রকান্তের অন্তঃপুর

চন্দ্রকান্ত ও ক্ষান্তমণি

চন্দ্রকান্ত। বড়োবউ, ও বড়োবউ। চাবিটা দাও দেখি।

ক্ষান্তমণি। কেন জীবনসর্বস্ব নয়নমণি, দাসীকে কেন মনে পড়ল?

চন্দ্রকান্ত। ও আবার কী।

ক্ষান্তমণি। নাথ, একটু বসো, তোমার ঐ মুখচন্দ্রমা বসে বসে একটু নিরীক্ষণ করি—

চন্দ্রকান্ত। ব্যাপারটা কী। যাত্রার দল খুলবে নাকি। আপাতত একটা সাফ দেখে চাদর বের করে দাও দেখি, এখনি বেরোতে হবে—

ক্ষান্তমণি। (অগ্রসর হইয়া) আদর চাই! প্রিয়তম! তা আদর করছি!

চন্দ্রকান্ত। (পশ্চাতে হঠিয়া) আরে ছি ছি ছি! ও কী ও!

ক্ষান্তমণি। নাথ, বেলফুলের মালা গেঁথে রেখেছি এখন কেবল চাঁদ উঠলেই হয় —কিন্তু সেই শোলোকটি লিখে দিয়ে যাও, আমি ততক্ষণ মুখস্থ করে রাখি—

চন্দ্রকান্ত। ওঃ! গুণবর্ণনা আড়াল থেকে সমস্ত শোনা হয়েছে দেখছি। বড়োবউ, কাজটা ভালো হয়নি! ওটা বিধাতার অভিপ্রায় নয়— তিনি মানুষের শ্রবণশক্তির একটা সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন— তার কারণই হচ্ছে পাছে অসাক্ষাতে যে কথাগুলো হয় তাও মানুষ শুনতে পায়; তা হলে পৃথিবীতে বন্ধুত্ব বল, আত্মীয়তা বল, কিছুই টিঁকতে পারে না।

ক্ষান্তমণি। ঢের হয়েছে গোঁসাই ঠাকুর, আর ধর্মোপদেশ দিতে হবে না। আমাকে তোমার পছন্দ হয় না, না?

চন্দ্রকান্ত। কে বললে পছন্দ হয় না?

ক্ষান্তমণি। আমি গদ্য আমি পদ্য নই, আমি শোলোক পড়িনে, আমি বেলফুলের মালা পরাইনে—

চন্দ্রকান্ত। আমি গললগ্নীকৃতবস্ত্র হয়ে বলছি দোহাই তোমার, তুমি শোলোক পোড়ো না, তুমি মালা পরিয়ো না, ওগুলো সবাইকে মানায় না—

ক্ষান্তমণি। কী বললে?

চন্দ্রকান্ত। আমি বললুম যে, বেলফুলের মালা আমাকে মানায় না, তার চেয়ে সাফ চাদরে ঢের বেশি শোভা হয়— পরীক্ষা করে দেখো।

ক্ষান্তমণি। যাও যাও, আর ঠাট্টা ভালো লাগে না। (অঞ্চলে মুখ আবরণ করিয়া) আমি গন্ধ, আমি বেলেস্তারা! [রোদন

চন্দ্রকান্ত। (নিকটে আসিয়া) কথাটা বুঝলে না ভাই! কেবল রাগই করলে। ওটা, শুদ্ধ অভিমানের কথা, আর কিছুই নয়। ভালোবাসা থাকলেই মানুষ অমন কথা বলে। আচ্ছা, তুমি আমার গা ছুঁয়ে বলো, তুমি ঘাটে পদ্মঠাকুরঝিকে বলনি— "আমার এমনি পোড়াকপাল যে বিয়ে করে ইস্তিক সুখ কাকে বলে একদিনের তরে জানলুম না।" আমি কি সে-কথা শুনতে গিয়েছিলুম না শুনলে রাগ করতুম।

ক্ষান্তমণি। আমি ককখনো পদ্মঠাকুরঝিকে ও-কথা বলিনি।

চন্দ্রকান্ত। আহা, পদ্মঠাকুরঝিকে না বলতে পার, আর ঠিক ওই কথাটিই না হতেও পারে কিন্তু কাউকে কিছু বলনি? আচ্ছা, আমার গা ছুঁয়ে বলো।

ক্ষান্তমণি। তা আমি সৌরভীদিদিকে বলেছিলুম—

চন্দ্রকান্ত। কী বলেছিলে।

ক্ষান্তমণি। আমি বলেছিলুম—

চন্দ্রকান্ত। বলেই ফেলো না! দেখো, আমি রাগ করব না।

ক্ষান্তমণি। আমার গায়ে গয়না দেখতে পায় না বলে সৌরভীদিদি দুঃখু করছিল তাই আমি কথায় কথায় বলেছিলুম— গয়না কোত্থেকে হবে! হাতে যা থাকে বই কিনতে আর বই বাঁধাতেই সব যায়। তাঁর যত শখ সব বইয়েতেই মিটেছে। বউ না হয়ে বই হলে আদর বেশি পাওয়া যেত। তা আমি বলেছিলুম!

চন্দ্রকান্ত। (গম্ভীর মুখে) হাটে ঘাটে যেখানে সেখানে বলে বেড়াও তোমার স্বামী গরিব, তোমাকে একখানা গয়না দিতে পারে না— স্ত্রী ও রকম অপবাদ রটিয়ে বেড়ানোর চেয়ে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যাওয়া ভালো।

ক্ষান্তমণি। তোমার পায়ে পড়ি ও রকম করে বোলো না। আমার দোষ হয়েছিল মানছি— আমি আর কখনো এমন বলব না!

চন্দ্রকান্ত। মুখে বল আর না বল মনে মনে আছে তো! মনে মনে ভাব তো এই লক্ষ্মীছাড়াটার সঙ্গে বিয়ে হয়ে আমার গায়ে একখানা গয়না চড়ল না— তার চেয়ে যদি মুখুজ্জেদের বড়ো ছেলে কেবলকৃষ্ণর সঙ্গে—

ক্ষান্তমণি। (চন্দ্রের মুখ চাপা দিয়া) অমন কথা তুমি ঠাট্টা করেও বোলো না,

আমার ভালো লাগে না। আমার গয়নায় কাজ নেই— আমি জন্ম জন্ম শিবপুজো করেছিলুম তাই তোমার মতো এমন স্বামী পেয়েছি—

চন্দ্রকান্ত। আচ্ছা, তাহলে আমার চাদরখানা দাও।

ক্ষান্তমণি। (চাদর আনিয়া দিয়া) তুমি বাইরে বেরোচ্ছ যদি, চুলগুলো অমন কাগের বাসার মতো ক'রে বেরিয়ো না। একটু বোসো তোমার চুল ঠিক করে দিই।

[চিরুনি ব্রুশ লইয়া আঁচড়াইতে প্রবৃত্ত

চন্দ্রকান্ত। হয়েছে, হয়েছে।

ক্ষান্তমণি। না হয়নি— এক দণ্ড মাথাটা স্থির করে রাখো দেখি।

চন্দ্রকান্ত। তোমার সামনে আমার মাথার ঠিক থাকে না, দেখতে দেখতে ঘুরে যায়—

ক্ষান্তমণি। অত ঠাট্টায় কাজ কী! না হয় আমার রূপ নেই, গুণ নেই— যে তোমার মাথা ঘোরাতে পারে এমন একটা খোঁজ করোগে— আমি চললুম।

[চিরুনি ব্রুশ ফেলিয়া দ্রুত প্রস্থান

চন্দ্রকান্ত। এখন আর সময় নেই, ফিরে এসে রাগ ভাঙাতে হবে।

বিনোদবিহারী। (নেপথ্য হইতে) ওহে! আর কতক্ষণ বসিয়ে রাখবে? তোমাদের প্রেমাভিনয় সাঙ্গ হল কি।

চন্দ্রকান্ত। এইমাত্র পঞ্চমাঙ্কের যবনিকাপতন হয়ে গেল। হৃদয়বিদারক ট্রাজেডি!

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

নিবারণের বাড়ি

নিবারণ ও শিবচরণ

নিবারণ। তবে তাই ঠিক রইল? এখন আমার ইন্দুমতীকে তোমার নিমাইয়ের পছন্দ হলে হয়।

শিবচরণ। সে-বেটার আবার পছন্দ কী। বিয়েটা তো আগে হয়ে যাক, তার পর পছন্দ সময়মতো পরে করলেই হবে।

নিবারণ। না ভাই, কালের যে রকম গতি সেই অনুসারেই চলতে হয়।

শিবচরণ। তা হোক না কালের গতি— অসম্ভব কখনো সম্ভব হতে পারে না। একটু ভেবেই দেখো না, যে ছোঁড়া পূর্বে একবারও বিবাহ করেনি সে স্ত্রী চিনবে কী করে। সকল কাজেই তো অভিজ্ঞতা চাই। পাট না চিনলে পাটের দালালি করা যায় না। আর স্ত্রীলোক কি পাটের চেয়ে সিধে জিনিস। আজ পঁয়ত্রিশ বৎসর হল আমি নিমাইয়ের মাকে বিবাহ করেছি তার থেকে পাঁচটা বৎসর বাদ দাও— তিনি গত হয়েছেন সে আজ বছর পাঁচেকের কথা হবে— যা হোক তিরিশটা বৎসর তাঁকে নিয়ে চালিয়ে এসেছি— আমি আমার ছেলের বউ পছন্দ করতে পারব না, আর সে ছোঁড়া ভূমিষ্ঠ হয়েই আমার চেয়ে পেকে উঠল? তবে যদি তোমার মেয়ের কোনো ধনুকভঙ্গ পণ থাকে, আমার নিমাইকে যাচিয়ে নিতে চান, সে আলাদা কথা।

নিবারণ। নাঃ, আমার মেয়ে কোনো আপত্তিই করবে না, তাকে যা বলব সে তাই শুনবে। কিন্তু তোমার নিমাইকে আমি একবার দেখতে চাই।

ইন্দুমতী। (অন্তরাল হইতে) তাই বই কী। আমি কখনো শুনব না। নিমাই! মা গো, নাম শুনলে গায়ে জ্বর আসে! আমি তাকে বিয়ে করলুম বলে!

নিবারণ। আর-একটা কথা আছে— জান তো আদিত্য মরবার সময় তার মেয়ে কমলমুখীকে আমার হাতে সমর্পণ করে গেছে— তার বিয়ে না দিয়ে আমি আমার মেয়ের বিয়ে দিতে পারিনে।

শিবচরণ। আমার হাতে দুই-একটি পাত্র আছে, আমিও সন্ধান দেখছি।

নিবারণ। আর-একটি কথা তোমাকে বলা উচিত। আমার মেয়েটির কিছু বয়স হয়েছে।

শিবচরণ। আমিও তাই চাই। ঘরে যদি গিন্নি থাকতেন তা হলে বউমা ছোটো হলে ক্ষতি ছিল না— তিনি দেখিয়ে শুনিয়ে ঘরকন্না শিখিয়ে ক্রমে তাকে মানুষ করে তুলতেন। এখন এই বুড়োটাকে দেখে শোনে আর ছেলেটাকে বেশ শাসনে রাখতে পারে এমন একটি মেয়ে না হলে সংসারটি গেল। ছেলেটা কালেজে যায়, আমি তো শহরের নাড়ি টিপে ঘুরে বেড়াই, বাড়িতে কেউ নেই— ঘরে ফিরে এলে মনে হয় না ঘরে এলুম— মনে হয় যেন বাসা ভাড়া করে আছি।

নিবারণ। তা হলে তোমার একটি অভিভাবকের নিতান্ত দরকার দেখছি।

শিবচরণ। হাঁ ভাই, মা ইন্দুকে বোলো, আমার নিমাইয়ের ঘরে এলে এই বুড়ো নাবালকটিকে প্রতিপালনের ভার তাঁকেই নিতে হবে। তখন দেখব তিনি কেমন মা।

নিবারণ। তা ইন্দুর সে অভ্যেস আছে। বহুকাল একটি আস্ত বুড়ো বাপ

তারই হাতে পড়েছে। দেখতেই তো পাচ্ছ, ভাই, খাইয়ে দাইয়ে বেশ একরকম ভালো অবস্থাতেই রেখেছে।

শিবচরণ। তাই তো। তাঁর হাতের কাজটিকে দেখে তারিফ করতে হয়। তাই বটে, তোমার এখনো আধ-মাথা কাঁচাচুল দেখা যাচ্ছে— হায় হায়, আমার মাথাটা কেবল অযত্নেই আগাগোড়া পেকে গেল— নইলে, বয়েস এমনিই কী বেশি হয়েছে। যা হোক আজ তবে আসি। গুটিদুয়েক রুগি এখনো মরতে বাকি আছে। [প্রস্থান

ইন্দুমতীর প্রবেশ

ইন্দুমতী। ও বুড়োটা কে এসেছিল বাবা?

নিবারণ। কেন মা, বুড়ো বুড়ো করছিস— তোর বাবাও তো বুড়ো।

ইন্দুমতী। (নিবারণের পাকা চুলের মধ্যে হাত বুলাইয়া) তুমি তো আমাদের আদ্যিকালের বদ্যি বুড়ো, তোমার সঙ্গে কার তুলনা। কিন্তু ওটা কে। ওকে তো কখনো দেখিনি।

নিবারণ। ওর সঙ্গে ক্রমে খুবই পরিচয় হবে—

ইন্দুমতী। আমি খুব পরিচয় করতে চাইনে।

নিবারণ। তোর তো এ বাবা ক্রমে পুরানো ঝরঝরে হয়ে এসেছে, এখন একবার বাবা বদল করে দেখবিনে ইন্দু?

ইন্দুমতী। তবে আমি চললুম।

নিবারণ। না না, শোন্ না। তুই তো তোর বাবার মা হয়ে উঠেছিস এখন একটা কথা বলি একটু ভালো করে বুঝে দেখ্ দেখি। তোরই যেন বাবার দরকার নেই, আমার তো একটি বাপের পদ খালি আছে— তাই আমি একটি সন্ধান করে বের করেছি মা— এখন আমার নতুন বাপের হাতে আমার পুরোনো মা-টিকে সমর্পণ করে আমার কর্তব্য কর্ম্ম শেষ করে যাই।

ইন্দুমতী। তুমি কী বকছ আমি বুঝতে পারছিনে।

নিবারণ। নাঃ, তুমি আমার তেমনি হাবা মেয়ে কি না। সব বুঝতে পেরেছিস, কেবল দুষ্টুমি! তবে বলি শোন্— যে বুড়োটি এসেছিল ও আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু, কলেজ ছাড়ার পর থেকে ওর সঙ্গে আমার এই প্রথম সাক্ষাৎ। ওর নিমাই বলে একটি ছেলে আছে—

ইন্দুমতী। আমাদের নিমাই গয়লা?

নিবারণ। দুর পাগলী!

ইন্দুমতী। চন্দরবাবুদের বাড়িতে যে তাঁতিনী আসে তার সেই ন্যাংলা ছেলেটা?

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। তিনটি বাবু এসেছে দেখা করতে।

ইন্দুমতী। তাদের যেতে বলে দে। সকাল থেকে কেবলই বাবু আসছে!

নিবারণ। না না, ভদ্রলোক এসেছে, দেখা করা চাই।

ইন্দুমতী। তোমার যে নাবার সময় হয়েছে।

নিবারণ। একবার শুনে নিই কী জন্যে এসেছেন, বেশি দেরি হবে না—

ইন্দুমতী। তুমি একবার গল্প পেলে আর উঠতে চাইবে না, আবার কালকের মতো খেতে দেরি করবে। আচ্ছা আমি ওই পাশের ঘরে দাঁড়িয়ে রইলুম, পাঁচ মিনিট বাদে ডেকে পাঠাব।

নিবারণ। তোর শাসনের জ্বালায় আমি আর বাঁচিনে। চাণক্যের শ্লোক জানিস তো? প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ। তা আমার কি সে বয়স পেরোয়নি?

ইন্দুমতী। তোমার রোজ বয়স কমে আসছে। আর দেখো, তোমার ঐ ভদ্রলোকদের বোলো, তাদের কারো যদি নিমাই কিংবা বলাই বলে ছেলে থাকে তো সে-কথা তুলে তোমার নাবার দেরি করে দেবার দরকার নেই। তাদের ছেলে আছে তাদেরই থাক্ না বাপু। আদরে থাকবে। [প্রস্থান

নিবারণ। (ভৃত্যের প্রতি) বাবুদের ডেকে নিয়ে আয়।

চন্দ্রকান্ত, বিনোদবিহারী ও নিমাইয়ের প্রবেশ

নিবারণ। এই যে চন্দ্রবাবু! আসতে আজ্ঞা হোক! আপনারা সকলে বসুন। ওরে তামাক দিয়ে যা।

চন্দ্রকান্ত। আজ্ঞে না, তামাক থাক্।

নিবারণ। তা, ভালো আছেন চন্দ্রবাবু?

চন্দ্রকান্ত। আজ্ঞে হাঁ, আপনার আশীর্বাদে একরকম আছি ভালো।

নিবারণ। আপনাদের কোথায় থাকা হয়?

বিনোদবিহারী। আমরা কলকাতাতেই থাকি।

চন্দ্রকান্ত। মশায়ের কাছে আমাদের একটি প্রস্তাব আছে।

নিবারণ। (শশব্যস্ত হইয়া) কী বলুন।

চন্দ্রকান্ত। মশায়ের ঘরে আদিত্যবাবুর যে অবিবাহিতা কন্যাটি আছেন তাঁর জন্যে একটি সৎপাত্র পাওয়া গেছে— মশায় যদি অভিপ্রায় করেন—

নিবারণ। অতি উত্তম কথা। শুনে বড়ো সন্তোষ লাভ করলেম। পাত্রটি কে।

চন্দ্রকান্ত। আপনি বিনোদবিহারীবাবুর নাম শুনেছেন বোধ করি?

নিবারণ। বিলক্ষণ! তা আর শুনিনি! তিনি আমাদের দেশের এক জন প্রধান লেখক! "জ্ঞানরত্নাকর" তো তাঁরই লেখা!

চন্দ্রকান্ত। আজ্ঞে না। সে বৈকুণ্ঠ বসাক বলে একটি লোকের লেখা।

নিবারণ। তাই বটে। আমার ভুল হয়েছে। তবে "প্রবোধলহরী" তাঁর লেখা হবে। আমি ওই দুটোতে বরাবর ভুল করে থাকি।

চন্দ্রকান্ত। আজ্ঞে না। "প্রবোধলহরী" তাঁর লেখা নয়— সেটা কার বলতে পারিনে। ও বইটার নাম পূর্বে কখনো শুনিনি।

নিবারণ। তবে তাঁর একখানা বইয়ের নাম করুন দেখি।

চন্দ্রকান্ত। "কাননকুসুমিকা" দেখেছেন কি?

নিবারণ। "কাননকুসুমিকা!" না, আমি দেখিনি। অবশ্য, খুব ভালো বই হবে। নামটি অতি সুললিত। বাংলা বই বহুকাল পড়িনি— সেই বাল্যকালে পড়তেম— তখন অবশ্যই "কাননকুসুমিকা" পড়ে থাকব কিন্তু স্মরণ হচ্ছে না। যাই হোক, বিনোদবাবুর পুত্রের কথা বলছেন বুঝি? তা তাঁর বয়স কত হল এবং কটি পাশ করেছেন?

চন্দ্রকান্ত। মশায় ভুল করছেন। বিনোদবাবুর বয়স অতি অল্প। তিনি এম. এ. পাশ করে বি. এল. পড়ছেন। তাঁর বিবাহ হয়নি। তাঁরই কথা মশায়কে বলছিলুম। তা আপনার কাছে প্রকাশ করে বলাই ভালো—এই এঁর নাম বিনোদবাবু।

নিবারণ। আপনি বিনোদবাবু! আজ আমার কী সৌভাগ্য! বাংলা দেশে আপনাকে কে না জানে। আপনার রচনা কে না পড়েছে। আপনারা হচ্ছেন ক্ষণজন্মা লোক—

বিনোদবিহারী। আজ্ঞে ও-কথা বলে আর লজ্জা দেবেন না। বাংলা দেশে মতি হালদারের বই সকলে পড়ে বটে, আমার লেখা তো সকলের পড়বার মতন নয়।

নিবারণ। মতি হালদার? যাঁর পাঁচালি? হাঁ, তাঁর রচনার ক্ষমতা আছে বটে। তা আপনারও লেখা মন্দ হবে না। আমি মেয়েদের কাছে শুনেছি আপনি দিব্যি লিখতে পারেন। যা হোক আপনার বিনয়গুণে বড়ো মুগ্ধ হলেম।

চন্দ্রকান্ত। তা, এঁর সঙ্গে আপনার ভাইঝির বিবাহ দিতে যদি আপত্তি না থাকে—

নিবারণ। আপত্তি? আমার পরম সৌভাগ্য!

চন্দ্রকান্ত। তা হ'লে এ সম্বন্ধে যা যা স্থির করবার আছে কাল এসে মশায়ের সঙ্গে কথা হবে!

নিবারণ। যে আজ্ঞে। কিন্তু একটা কথা বলে রাখি—মেয়েটির বাপ টাকাকড়ি কিছুই রেখে যেতে পারেননি তবে এই পর্যন্ত বলতে পারি এমন লক্ষ্মী মেয়ে আর পাবেন না।

ইন্দুমতী। (অন্তরালে কমলমুখীকে টানিয়া আনিয়া) দিদি, ও দিদি, ঐ দেখ্ ভাই, তোর পরম সৌভাগ্য ঐ মাঝখানটিতে বসে রয়েছেন— মেঝের ভিতর থেকে কবিত্ব বেরোতে পারে কি না, তাই নিরীক্ষণ করে দেখছেন।

কমলমুখী। তুই যে বললি বোসেদের বাড়ির নূতন জামাই এসেছে, তাই তো আমি ছুটে দেখতে এলুম।

ইন্দুমতী। সত্যি কথাটা শুনলে আরো বেশি ছুটে আসতিস। যা দেখতে এসেছিলি তার চেয়ে ভালো জিনিস দেখলি তো ভাই! আর পরের বাড়ির জামাই দেখে কী হবে এখন নিজের সন্ধান দেখ্।

কমলমুখী। তোর আবশ্যক হয়ে থাকে তুই দেখ্। এখন আমার অন্য কাজ আছে। [প্রস্থান

চন্দ্রকান্ত। মশায়, অনুমতি হয় তো এখন আসি।

নিবারণ। এত শীঘ্র যাবেন? বলেন কী। আর-একটু বসুন না!

চন্দ্রকান্ত। আপনার এখনো নাওয়া-খাওয়া হয়নি—

নিবারণ। সে এখনো ঢের সময় আছে। বেলা তো বেশি হয়নি—

চন্দ্রকান্ত। আজ্ঞে বেলা নিতান্ত কম হয়নি— এখন যদি আজ্ঞা করেন তো উঠি—

নিবারণ। তবে আসুন। দেখুন চন্দরবাবু, মতি হালদারের ওই যে "কুসুমকানন", না কী বইখানা বললেন ওটা লিখে দিয়ে যাবেন তো—

চন্দ্রকান্ত। "কাননকুসুমিকা"? বইখানা পাঠিয়ে দেব কিন্তু সেটা মতি হালদারের নয়—

নিবারণ। তবে থাক্। বরঞ্চ বিনোদবাবুর একখানা "প্রবোধলহরী" যদি থাকে তো একবার—

চন্দ্রকান্ত। "প্রবোধলহরী" তো বিনোদবাবুর—

বিনোদবিহারী। আঃ থামো না। তা, যে আজ্ঞে, আমিই পাঠিয়ে দেব।

আমার প্রবোধলহরী, বারবেলাকথন, তিথিদোষখণ্ডন, প্রায়শ্চিত্তবিধি, এবং নূতন পঞ্জিকা আপনাকে পাঠিয়ে দেব— আজ তবে আসি। [প্রস্থান

নিবারণ। নাঃ লোকটার বিদ্যে আছে। বাঁচা গেল, একটি মনের মতো সৎপাত্র পাওয়া গেল। কমলের জন্যে আমার বড়ো ভাবনা ছিল।

ইন্দুমতীর প্রবেশ

ইন্দুমতী। বাবা, তোমার হল ?

নিবারণ। ও ইন্দু, তুই তো দেখলিনে— তোরা সেই যে বিনোদবাবুর লেখার এত প্রশংসা করিস তিনি আজ এসেছিলেন।

ইন্দুমতী। আমার তো আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, তোমার এখানে যত রাজ্যির অকেজো লোক এসে জোটে আর আমি আড়াল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের দেখি! আচ্ছা বাবা, চন্দ্রবাবু বিনোদবাবু ছাড়া আর একটি যে লোক এসেছিল— বদচেহারা লক্ষ্মীছাড়ার মতো দেখতে, সে কে ?

নিবারণ। তবে তুই যে বলছিলি আড়াল থেকে দেখিসনে ? বদ চেহারা আবার কার দেখলি। বাবুটি তো দিব্যি বেশ ফুট্‌ফুটে কার্তিকটির মতো দেখতে। তাঁর নামটি কী জিজ্ঞাসা করা হয়নি।

ইন্দুমতী। তাকে আবার ভালো দেখতে হল ? দিনে দিনে তোমার কী যে পছন্দ হচ্ছে বাবা। এখন নাইতে চলো। [নিবারণের প্রস্থান

না, সত্যি, দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। যদি কার্তিককে এঁর মতন দেখতে হয় তা হলে কার্তিককে ভালো দেখতে, বলতে হবে। মুখে একটি কথা ছিল না, কিন্তু কেমন বসে বসে সব দেখছিল আর মজা করে মুখ টিপে টিপে হাসছিল— না সত্যি, বেশ হাসিখানি। বাবা যেমন, একবার জিজ্ঞাসাও করলেন না তার নাম কী, বাড়ি কোথায়। আর কোথা থেকে যত সব নিমাই নেপাল নিলু জুটিয়ে নিয়ে আসেন। বাবা যখন মতি হালদারের সঙ্গে বিনোদবাবুর তুলনা করছিলেন তখন সে বিনোদবাবুর মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে কেমন হাসছিল! আর, বাবা যখন বিনোদবাবুর ছেলের কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন তখন কেমন— আমি কক্‌খনো নিমাই গয়লাকে— সেই বুড়ো ডাক্তারের ছেলেকে বিয়ে করব না। কক্‌খনো না। সেই বুড়োটার উপর আমার এমন রাগ ধরছে!— আজ একবার ক্ষান্তদিদির কাছে যেতে হচ্ছে, তাঁর কাছ থেকে সমস্ত সন্ধান পাওয়া যাবে।

কমলমুখীর প্রবেশ

দিদিভাই, তুমি যে বলতে কাননকুসুমিকা তোমার আদবে ভালো লাগে না, তা হলে বইখানা আর-একবার তো ফিরে পড়তে হবে— এবারে বোধ করি মত একটু-আধটু বদলাতেও পারে।

কমলমুখী। আমি ভাই দরকার বুঝে মত বদলাতে পারিনে।

ইন্দুমতী। তা ভাই, শুনেছি স্বামীর জন্যে সবই করতে হয়— জীবনের অনেকখানি নতুন করে বদলে ফেলতে হয়। বিধাতা তো আর আমাকে ঠিক তাঁর শ্রীচরণকমলের মাপ নিয়ে বানাননি। স্বামীরা আবার কোথাও একটু আঁট সইতে পারেন না।

কমলমুখী। তা আমরা তাঁদের মনের মতো মত বদলাতে না পারলে তাঁরা তো আমাদের বদলে ফেলতে পারেন— তাতে তো কেউ বাধা দেবার নেই। আমি যা আছি তা আছি, এতদিন পরে যে কারো মনোরঞ্জনের জন্যে আবার ধার-করা মালমসলা নিয়ে আপনাকে ফরমাশে গড়তে হবে সে তো ভাই আর পারব না। এতে যদি কারো পছন্দ না হয় তো সে আমার অদৃষ্টের দোষ।

ইন্দুমতী। কিন্তু তোর তো সে-কথা বলবার জো নেই, তাঁকে তো তোর পছন্দ করতেই হবে।

কমলমুখী। আমি তো আর স্বয়ংবরা হতে যাচ্ছিনে বোন, তা আমার আবার পছন্দ! দুটো-একটা কাপড়চোপড় ছাড়া জীবনের কটা জিনিসই বা নিজের পছন্দ অনুসারে পাওয়া গেছে। বিধাতা কোনো বিষয়ে কারো তো মত জিজ্ঞাসা করেন না। আপনাকেই আপনি পছন্দ করে নিতে পারিনি। যদি পারতুম তা হলে বোধ হয় এর চেয়ে ঢের ভালো মানুষটিকে পেতুম— কিন্তু তবু তো আপনাকে কম ভালোবাসিনে— তাকেও বোধ হয় তেমনি ভালোবাসব!

ইন্দুমতী। তুই ভাই কথায় কথায় বড়ো বেশি গম্ভীর হয়ে পড়িস, বিনোদের কাছে যদি অমনি করে থাকিস তা হলে সে তোর সঙ্গে প্রেমালাপ করতে সাহস করবে না—

কমলমুখী। সে জন্যে না হয় তুই নিযুক্ত থাকিস।

ইন্দুমতী। তা হলে যে তোর গাম্ভীর্য আরো সাত গুণ বেড়ে যাবে। দেখ্ ভাই, তুই তো একটা পোষা কবি হাতে পেলি এবার তাকে দিয়ে তোর নিজের নামে কবিতা লিখিয়ে নিস— যতক্ষণ পছন্দ না হয় ছাড়িসনে— চাই কি, দুটো-একটা

খুব মিষ্টি সম্বোধন নিজে বসিয়ে দিতে পারিস। নিজের নামে কবিতা দেখলে কী রকম লাগে কে জানে।

কমলমুখী। মনে হয়, আমার নাম করে আর-কাকে লিখছে। তোর যদি শখ থাকে আমি তোর নামে একটা লিখিয়ে নেব—

ইন্দুমতী। তুমি কেন, সে আমি নিজে করে নেব। আমার যে সম্পর্ক আমি যে কান ধরে লিখিয়ে নিতে পারি। তুমি তো তা পারবে না!

কমলমুখী। সে যখনকার কথা তখন হবে এখন তোর চুলটা বেঁধে দিই চল্।

ইন্দুমতী। আজ থাক্ ভাই। আমি এখন ক্ষান্তদিদির ওখানে যাচ্ছি। আমার ভারি দরকার আছে।

চতুর্থ দৃশ্য

চন্দ্রকান্তের অন্তঃপুর

ক্ষান্তমণি ও ইন্দুমতী

ক্ষান্তমণি। তোমরা ভাই নানা রকম বই পড়েছ, তোমরা বলতে পার কী করলে ভালো হয়।

ইন্দুমতী। তোমার স্বামী ঠাট্টা করে বলে, সে কি আর সত্যি।

ক্ষান্তমণি। না ভাই, ঠাট্টা কি সত্যি ঠিক বুঝতে পারিনে। আর, সত্যি হবারই বা আটক কী। আমার বাপ-মা আমাকে ঘরকন্না ছাড়া আর তো কিছুই শেখায়-নি। এদানিং বাংলা বইগুলো সব পড়ে নিয়েছি, তাতে অনেক রকম কথাবার্তা আছে কিন্তু সেগুলো নিয়ে কোনো সুবিধে করতে পারছিনে। আমার স্বামী যে রকম চায় সে ভাই আমাকে কিছুতেই মানায় না।

ইন্দুমতী। তোমার স্বামীর আবার তেমনি সব বন্ধু জুটেছে, তারাই পাঁচ জনে পাঁচ কথা কয়ে তাঁর মন উতলা করে দেয়। বিশেষ, সেদিন বিনোদবাবু আর তোমার স্বামীর সঙ্গে আর একটি কে বাবু আমাদের বাড়িতে গিয়েছিল, তাকে দেখে আমার আদবে ভালো লাগল না। লোকটা কে ভাই?

ক্ষান্তমণি। কী জানি ভাই। বন্ধু একটি-আধটি তো নয় সবগুলোকে আবার চিনিওনে। ললিতবাবু হবে বুঝি।

ইন্দুমতী। (স্বগত) নিশ্চয় ললিতবাবু হবে। নাম শুনেই মনে হচ্ছে তাঁর নাম বটে।

ক্ষান্তমণি। কী রকম বলো দেখি। সুন্দর-হানো? পাতলা?

ইন্দুমতী। হাঁ—

ক্ষান্তমণি। চোখে চশমা আছে?

ইন্দুমতী। হাঁ হাঁ, চশমা আছে— আর সকল কথাতেই মুচকে মুচকে হাসে— দেখে গা জলে যায়।

ক্ষান্তমণি। তবে আমাদের ললিত চাটুজ্জে তার আর সন্দেহ নেই।

ইন্দুমতী। ললিত চাটুজ্জে!

ক্ষান্তমণি। জান না? ঐ কলুটোলার নৃত্যকালী চাটুজ্জের ছেলে। ছোকরাটি কিন্তু মন্দ না ভাই। এম. এ. পাশ করে জলপানি পাচ্ছে।

ইন্দুমতী। ওদের ঘরে স্ত্রীপুত্রপরিবার কেউ নেই নাকি! অমনতরো লক্ষ্মীছাড়ার মতো যেখানে সেখানে টো টো করে ঘুরে বেড়ায় কেন।

ক্ষান্তমণি। স্ত্রীপুত্র থেকেই বা কী হয়। ওর তো তবু নেই। ললিত আবার বাপকে বলেছে রোজগার না করে সে বিয়ে করবে না। সে-কথা যাক। এখন আমাকে একটা পরামর্শ দে না ভাই।

ইন্দুমতী। আচ্ছা, এক কাজ করা যাক। মনে করো আমি চন্দ্রবাবু; আপিস থেকে ফিরে এসেছি, খিদেয় প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে— তার পরে তুমি কী করবে বলো দেখি। র’সো ভাই, চন্দ্রবাবুর ঐ চাপকান আর শামলাটা পরে নিই, নইলে আমাকে চন্দ্রবাবু মনে হবে না। [আপিসের বেশ পরিধান ও ক্ষান্তমণির উচ্চহাস্য (গম্ভীর ভাবে) ক্ষান্তমণি, স্বামীর প্রতি এরূপ পরিহাস অত্যন্ত গর্হিত কার্য। কোনো পতিব্রতা রমণী স্বামীর সমক্ষে কদাপি উচ্চহাস্য করেন না। যদি দৈবাৎ কোনো কারণে হাস্য অনিবার্য হইয়া উঠে তবে সাধ্বী স্ত্রী প্রথমে স্বামীর অনুমতি লইয়া পরে বদনে অঞ্চল দিয়া ঈষৎ হাসিতে পারেন। যা হোক আমি আপিস থেকে ফিরে এসেছি— এখন তোমার কী কর্তব্য বলো।

ক্ষান্তমণি। প্রথমে তোমার চাপকানটি এবং শামলাটি খুলে দিই, তার পরে জলখাবার—

ইন্দুমতী। নাঃ, তোমার কিছু শিক্ষা হয়নি। আমি তোমাকে সেদিন এত করে দেখিয়ে দিলুম কিছু মনে নেই?

ক্ষান্তমণি। সে ভাই, আমি ভালো পারিনে।

ইন্দুমতী। সেই জন্যেই তো এত করে মুখস্থ করাচ্ছি। আচ্ছা, তুমি তবে চন্দ্রবাবু সাজো, আমি তোমার স্ত্রী সাজছি—

ক্ষান্তমণি। না ভাই, সে আমি পারব না—

ইন্দুমতী। তবে যা বলে দিয়েছি তাই করো। আচ্ছা, তবে আরম্ভ হোক। বড়োবউ, চাপকানটা খুলে আমার ধুতি-চাদরটা এনে দাও তো।

ক্ষান্তমণি। (উঠিয়া) এই দিচ্ছি।

ইন্দুমতী। ও কী করছ! তুমি ওইখানে হাতের উপর মাথা রেখে বসে থাকো, বলো— নাথ, আজ সন্ধেবেলায় কী সুন্দর বাতাস দিচ্ছে! আজ আর কিছুতে মন লাগছে না, ইচ্ছে করছে পাখি হয়ে উড়ে যাই।

ক্ষান্তমণি। (যথাশিক্ষামতো) নাথ, আজ সন্ধেবেলায় কী সুন্দর বাতাস দিচ্ছে। আজ আর কিছুতে মন লাগছে না, ইচ্ছে করছে পাখি হয়ে উড়ে যাই।

ইন্দুমতী। কোথায় উড়ে যাবে? তার আগে আমায় লুচি দিয়ে যাও, ভারি খিদে পেয়েছে—

ক্ষান্তমণি। (তাড়াতাড়ি উঠিয়া) এই দিচ্ছি—

ইন্দুমতী। এই দেখো, সব মাটি করলে। তুমি যেমন ছিলে তেমনি থাকো, বলো— লুচি? কই, লুচি তো আজ ভাজিনি। মনে ছিল না। আচ্ছা, লুচি কাল হবে এখন। আজ এস এখানে এই মধুর বাতাসে বসে—

চন্দ্রকান্ত। (নেপথ্য হইতে) বড়োবউ।

ইন্দুমতী। ওই চন্দ্রবাবু আসছেন। আমাকে দেখতে পেয়েছেন বোধ হল। তুমি ব'লো তো ভাই, বাগবাজারের চৌধুরীদের কাদম্বিনী। আমার পরিচয় দিয়ো না, লক্ষ্মীটি, মাথা খাও! [পলায়ন

পঞ্চম দৃশ্য

পার্শ্বের ঘর

নিমাই আসীন

চাপকান-শামলাপরা ইন্দুমতীর ছুটিয়া প্রবেশ

নিমাই। এ কী!

ইন্দুমতী। ছি ছি, আর-একটু হলেই চন্দ্রবাবুর কাছে এই বেশে ধরা পড়তুম। তিনি কী মনে করতেন? আমাকে বোধ হয় দেখতে পাননি। (হঠাৎ নিমাইকে

দেখিয়া) ও মা, এ যে সেই ললিতবাবু। আর তো পালাবার পথ নেই! (সামলাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে চাপকান-শামলা খুলিয়া নিমাইয়ের প্রতি) তোমার বাবুর এই শামলা, আর এই চাপকান। সাবধান করে রেখো, হারিয়ো না। আর শিগ্‌গির দেখে এস দেখি বাগবাজারের চৌধুরীবাবুদের বাড়ি থেকে পালকি এসেছে কিনা।

নিমাই। (ঈষৎ হাসিয়া) যে আজ্ঞা। [প্রস্থান

ইন্দুমতী। ছি ছি! লজ্জায় ললিতবাবুকে ভালো করে দেখে নিতেও পারলুম না! আজ কী করলুম! ললিতবাবু কী মনে করলেন! যা হোক, আমাকে তো চেনেন না। ভাগ্যিস্ হঠাৎ বুদ্ধি জোগাল, বাগবাজারের চৌধুরীদের নাম করে দিলুম। চন্দ্রবাবুর এ বাসাটিও হয়েছে তেমনি। অন্দর বাহির সব এক। এখন আমি কোন্ দিক দিয়ে পালাই! ওই আবার আসছে। মানুষটি তো ভালো নয়! অন্য কোনো লোক হলে অবস্থা বুঝে চলে যেত! ও আবার ছল করে যে ফিরে আসে! কেন বাপু, দেখবার জিনিস কী এমন আছে?

নিমাইয়ের প্রবেশ

নিমাই। ঠাকরুন, পালকি তো আসেনি। এখন কী আজ্ঞা করেন।

ইন্দুমতী। এখন তুমি তোমার কাজে যেতে পার। না না, ওই যে তোমার মনিব এদিকে আসছেন। ওঁকে আমার সম্বন্ধে খবর দেবার কোনো দরকার নেই, আমার পালকি নিশ্চয় এসেছে। [প্রস্থান

নিমাই। কী চমৎকার রূপ! আর কী উপস্থিত বুদ্ধি! চোখে মুখে কেমন উজ্জ্বল জীবন্ত ভাব! বা, বা! আমাকে হঠাৎ চাকর বানিয়ে দিয়ে গেল— সেও আমার পরম ভাগ্যি! বাঙালির ছেলে চাকরি করতেই জন্মেছি কিন্তু এমন মনিব কি অদৃষ্টে জুটবে! পুরুষের কাপড়ও যেমন মানিয়েছিল ওইটুকু নির্লজ্জতাও ওকে কেমন বেশ শোভা পেয়েছিল। আহা, এই শামলা আর এই চাপকান চন্দরকে ফিরিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে না। বাগবাজারের চৌধুরী! সন্ধান নিতে হচ্ছে।

চন্দ্রকান্তের প্রবেশ

চন্দ্রকান্ত। তুমি এ ঘরে ছিলে না কি। তবে তো দেখেছ?

নিমাই। চক্ষু থাকলেই দেখতে হয়—কিন্তু কে বলো দেখি?

চন্দ্রকান্ত। বাগবাজারের চৌধুরীদের মেয়ে কাদম্বিনী। আমার স্ত্রীর একটি বন্ধু।

নিমাই। ওর স্বামী বোধ করি স্বাধীনতাওয়ালা ?

চন্দ্রকান্ত। ওঁর আবার স্বামী কোথায় ?

নিমাই। মরেছে বুঝি ? আপদ গেছে। কিন্তু বিধবার মতো বেশ নয় তো—

চন্দ্রকান্ত। বিধবা নয় হে— কুমারী। যদি হঠাৎ স্নায়ুর ব্যামো ঘটে থাকে তো বলো, ঘটকালি করি।

নিমাই। তেমন স্নায়ু হলে এতদিনে গলায় দড়ি দিয়ে মরতুম।

চন্দ্রকান্ত। তা হলে চলো একবার বিনোদকে দেখে আসা যাক। তার বিশ্বাস সে ভারি একটা অসমসাহসিক কাজ করতে প্রবৃত্ত হয়েছে, তাই একেবারে সপ্তমে চড়ে রয়েছে— যেন তার পূর্বে বঙ্গদেশে বিবাহ আর কেউ করেনি !

নিমাই। মেয়েমানুষকে বিয়ে করতে হবে তার আবার ভয় কিসের ? এমন যদি হত, না দেখে বিয়ে করতে গিয়ে দৈবাৎ একটা পুরুষমানুষ বেরিয়ে পড়ত তা হলে বটে !

চন্দ্রকান্ত। বল কী নিমাই ? বিধাতার আশীর্বাদে জন্মালুম পুরুষমানুষ হয়ে, কী জানি কার শাপে বিয়ে করতে গেলুম মেয়েমানুষকে, এ কি কম সাহসের কথা ?

নলিনাক্ষের প্রবেশ

চন্দ্রকান্ত। আরে, আরে, এস নলিনদা। ভালো তো ?

নলিনাক্ষ। (নিমাইয়ের প্রতি) বিনোদ কোথায় ?

চন্দ্রকান্ত। বিনোদ যেখানেই থাক্, আপাতত আমার মতো এতবড়ো লোকটা কি তোমার নলিনাক্ষগোচর হচ্ছে না। তোমার ভাব দেখে হঠাৎ ভয় হয়, তবে আমি হয়তো বা নেই।

নলিনাক্ষ। আমি বিনোদকে খুঁজছি।

চন্দ্রকান্ত। ইচ্ছা করলে অমনি ইতিমধ্যে আমার সঙ্গেও দুটো-একটা কথা কয়ে নিতে পার। তা চলো, আমরাও তার কাছে যাচ্ছি।

নলিনাক্ষ। তা হলে তোমরা এগোও। আমি পরে যাব এখন। [প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নিমাইয়ের ঘর

নিমাই লিখিতে প্রবৃত্ত

নিমাই। মুখে এত কথা অনর্গল বকে যাই কিছু বাধে না, সেইগুলোই চোদ্দটা অক্ষরে ভাগ করা যে এত মুশকিল তা জানতুম না।

কাদম্বিনী যেমনি আমায় প্রথম দেখিলে,
কেমন করে ভৃত্য বলে তখনি চিনিলে!

ভাবটা বেশ নতুন রকমের হয়েছে কিন্তু কিছুতেই এই হতভাগা ছন্দ বাগাতে পারছিনে। (গণনা করিয়া) প্রথম লাইনটা হয়েছে ষোলো, দ্বিতীয়টা হয়ে গেছে পনেরো। ওর মধ্যে একটা অক্ষরও তো বাদ দেবার জো দেখছিনে। [চিন্তা "আমায়" কে "আমা" বললে কেমন শোনায়?— 'কাদম্বিনী যেমনি আমা প্রথম দেখিলে'— আমার কানে তো খারাপ ঠেকছে না। কিন্তু তবু একটা অক্ষর বেশি থাকে। কাদম্বিনীর "নী"টা কেটে যদি সংক্ষেপ করে দেওয়া যায়! পুরো নামের চেয়ে সে তো আরো আদরের শুনতে হবে। "কাদম্বি"— না— কই তেমন আদরের শোনাচ্ছে না তো। "কদম্ব"— ঠিক হয়েছে—

দম্ব যেমনি আমা প্রথম দেখিলে
কেমন ক'রে ভৃত্য বলে তখনি চিনিলে!

উঁহুঁ, ও হচ্ছে না। দ্বিতীয় লাইনটাকে কাবু করি কী করে? "কেমন করে" কথাটাকে তো কমাবার জো নেই— এক "কেমন করিয়া" হয়— কিন্তু তাতে আরো একটা অক্ষর বেড়ে যায়। "তখনি চিনিলে"র জায়গায় "তৎক্ষণাৎ চিনিলে" বসিয়ে দিতে পারি কিন্তু তাতে বড়ো সুবিধে হয় না, এক দমে কতকগুলো অক্ষর বেড়ে যায়। ভাষাটা আমাদের বহু পূর্বে তৈরি হয়ে গেছে কিছুই নিজে বানাবার জো নেই— অথচ ওরই মধ্যে আবার কবিতা লিখতে হবে! দূর হোকগে, ও পনেরো অক্ষরই থাক্— কানে খারাপ না লাগলেই হল। ও পনেরোও যা ষোলোও তা সতেরোও তাই, কানে সমানই ঠেকে, কেবল পড়বার দোষেই খারাপ শুনতে হয়। চোদ্দ অক্ষর, ও একটা প্রেজুডিস।

শিবচরণের প্রবেশ

শিবচরণ। কী হচ্ছে নিমাই।

নিমাই। আজ্ঞে অ্যানাটমির নোটগুলো একবার দেখে নিচ্ছি, একজামিন খুব কাছে এসেছে—

শিবচরণ। দেখো বাপু, একটা কথা আছে। তোমার বয়স হয়েছে, তাই আমি তোমার জন্যে একটি কন্যা ঠিক করেছি।

নিমাই। কী সর্বনাশ।

শিবচরণ। নিবারণবাবুকে জান বোধ করি—

নিমাই। আজ্ঞে হাঁ জানি।

শিবচরণ। তাঁরই কন্যা ইন্দুমতী। মেয়েটি দেখতে শুনতে ভালো। বয়সেও তোমার যোগ্য। দিনও এক রকম স্থির করা হয়েছে।

নিমাই। একেবারে স্থির করেছেন? কিন্তু এখন তো হতে পারে না।

শিবচরণ। কেন বাপু?

নিমাই। আমার এখন একজামিন কাছে এসেছে—

শিবচরণ। তা হোক না একজামিন! বিয়ের সঙ্গে একজামিনের যোগটা কী? বউমাকে বাপের বাড়ি রেখে দেব, তার পরে তোমার একজামিন হয়ে গেলে ঘরে আনব।

নিমাই। ডাক্তারিটা পাশ না করে বিয়ে করাটা ভালো বোধ হয় না।

শিবচরণ। কেন বাপু, তোমার সঙ্গে তো একটা শক্ত ব্যায়রামের বিয়ে দিচ্ছিনে। মানুষ ডাক্তারি না জেনেও বিয়ে করে। কিন্তু তোমার আপত্তিটা কিসের জন্যে হচ্ছে।

নিমাই। উপার্জনক্ষম না হয়ে বিয়ে করাটা—

শিবচরণ। উপার্জন? আমি কি তোমাকে আমার বিষয় থেকে বঞ্চিত করতে যাচ্ছি। তুমি কি সাহেব হয়েছ যে বিয়ে করেই স্বাধীন ঘরকন্না করতে যাবে। (নিমাই নিরুত্তর) তোমার হল কী। বিয়ে করবে তার আবার এত ভাবনা কী। আমি কি তোমার ফাঁসির হুকুম দিলুম।

নিমাই। বাবা, আপনার পায়ে পড়ি আমাকে এখন বিয়ে করতে অনুরোধ করবেন না।

শিবচরণ। (সরোষে) অনুরোধ কী বেটা। হুকুম করব। আমি বলছি, তোকে বিয়ে করতেই হবে।

নিমাই। আমাকে মাপ করুন, আমি এখন কিছুতেই বিয়ে করতে পারব না।

শিবচরণ। (উচ্চস্বরে) কেন পারবিনে। তোর বাপ-পিতামহ, তোর চোদ্দপুরুষ বরাবর বিয়ে করে এসেছে, আর তুই বেটা দু-পাতা ইংরেজি উলটে আর বিয়ে করতে পারবিনে! এর শক্তটা কোন্‌খানে। কনের বাপ সম্প্রদান করবে আর তুই মন্ত্র পড়ে হাত পেতে নিবি— তোকে গড়ের বাদ্যিও বাজাতে হবে না, ময়ূরপংখিও বইতে হবে না, আর বাতি জ্বালাবার ভারও তোর উপর দিচ্ছিনে।

নিমাই। আমি মিনতি করে বলছি বাবা— একেবারে মর্মান্তিক অনিচ্ছে না থাকলে আমি কখনোই আপনার প্রস্তাবে না বলতুম না।

শিবচরণ। কই বাপু, বিয়ে করতে তো কোনো ভদ্রলোকের ছেলের এতদূর অনিচ্ছে দেখা যায় না, বরঞ্চ অবিবাহিত থাকতে আপত্তি হতেও পারে। আর তুমি বেটা আমার বংশে জন্মগ্রহণ করে হঠাৎ একদিনে এতবড়ো বৈরাগী হয়ে উঠলে কোথা থেকে! এমন সৃষ্টিছাড়া অনিচ্ছেটা হল কেন সেটা তো শোনা আবশ্যক।

নিমাই। আচ্ছা, আমি মাসিমাকে সব কথা বলব, আপনি তাঁর কাছে জানতে পারবেন।

শিবচরণ। আচ্ছা। (স্বগত) লোকের কাছে শুনলুম, নিমাই বাগবাজারের রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়— গেরস্তর বাড়ির দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকে— সেই শুনেই তো আরো আমি ওর বিয়ের জন্যে এত তাড়াতাড়ি করছি। [প্রস্থান

নিমাই। আমার ছন্দ মিল ভাব সমস্ত ঘুলিয়ে গেল, এখন যে আর এক লাইনও মাথায় আসবে এমন সম্ভাবনা দেখিনে।

চন্দ্রকান্তের প্রবেশ

চন্দ্রকান্ত। এই যে নিমাই। একা একা বসে রয়েছ! তোমার হল কী বলো দেখি। আজকাল তোমার যে দেখা পাবারই জো নেই।

নিমাই। আর ভাই, একজামিনের যে তাড়া পড়েছে—

চন্দ্রকান্ত। সেদিন সন্ধেবেলায় ট্রামে করে আসতে আসতে দেখি, তুমি বাগবাজারের রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাঁ করে তারা দেখছ। আজকাল কি তুমি ডাক্তারি ছেড়ে অ্যাস্ট্রনমি ধরেছ? যা হোক আজ বিনোদের বিয়ে মনে আছে তো?

নিমাই। তাই তো, ভুলে গিয়েছিলুম বটে।

চন্দ্রকান্ত। তোমার স্মরণশক্তির যে রকম অবস্থা দেখছি একজামিনের পক্ষে সুবিধে নয়। তা চলো।

নিমাই। আজ শরীরটা তেমন ভালো ঠেকছে না, আজ থাক্—

চন্দ্রকান্ত। বিনোদের বিয়েটা তো বছরের মধ্যে সদাসর্বদা হবে না নিমাই। যা হবার আজই চুকে যাবে। অতএব আজ তোমাকে ছাড়ছিনে, চলো।

নিমাই। চলো। [প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

চন্দ্রকান্তের অন্তঃপুর

ক্ষান্তমণি ও ইন্দুমতী

ক্ষান্তমণি। তোমাদের বাড়ির আয়োজন সব হল?

ইন্দুমতী। হাঁ ভাই, এক রকম হল। এখন তোমাদের বাড়ি কী হচ্ছে তাই দেখতে এসেছি। আমি বরের ঘরেও আছি, কনের ঘরেও আছি। বর তো তোমাদের এখান থেকে বেরোবেন? তাঁর তিন কুলে আর কেউ নেই না কি।

ক্ষান্তমণি। ওই তো ভাই, ওদের কথা বুঝবে কে। বাপ-মা নেই বটে, কিন্তু শুনেছি দেশে পিসি-মাসি সব আছে—কিন্তু তাদের খবরও দেয়নি। বলে যে, বিয়ে করছি হাট বসাচ্ছিনে তো! ওঁকে বললুম, তুমি তাদের খবর দাও— উনি বলেন তাতে খরচপত্র বিস্তর বেড়ে যাবে— বিয়ে করতেই যদি বেবাক খরচ হয়ে যায় তো ঘরকন্না করতে বাকি থাকবে কী— শুনেছ একবার কথা! আবার বলে কী —এ তো আর শুম্ভনিশুম্ভর যুদ্ধ হচ্ছে না, কেবল দুটিমাত্র প্রাণীর বিয়ে, এর জন্যে এত শোরসরাবৎ লোকলস্করের দরকার কী?

ইন্দুমতী। কিছু ধুমধাম নেই, আমার ভাই এ মন উঠছে না। আমাদের হাতে একবার পড়লে তাকে আচ্ছা করে শিক্ষা দিতে হবে— দুটিমাত্র প্রাণীর বিয়ে যে কতবড়ো ব্যাপার তা তাকে এক রকম মোটামুটি বুঝিয়ে দেব।—আজ যে তুমি বাইরের ঘরে?

ক্ষান্তমণি। এই ঘরে সব বরযাত্রী জুটবে। দেখ্ না ভাই ঘরের অবস্থাখানা। তারা আসবার আগে একটুখানি গুছিয়ে নেবার চেষ্টায় আছি।

ইন্দুমতী। তোমার একলার কর্ম নয় এস ভাই দু-জনে এ জঞ্জাল সাফ করা যাক। এগুলো দরকারি নাকি ?

ক্ষান্তমণি। কিচ্ছু না। যত রাজ্যির পুরোনো খবরের কাগজ জমেছে। কাগজগুলো যেখানে পড়া হয়ে যায় সেইখানেই পড়ে থাকে। ওগুলো যে ফেলে দেওয়া কি গুছিয়ে রাখা তার নাম নেই।

ইন্দুমতী। তবে ওই সঙ্গে এগুলোও ফেলে দিই ?

ক্ষান্তমণি। না না, ওগুলো ওঁর মকদ্দমার কাগজ— হারাতে পারলে বাঁচেন বোধ হয়, মক্কেলদের হাত থেকে উদ্ধার পান। কেন যে হারায় না তাও তো বুঝতে পারিনে। কতকগুলো গদির নিচে গোঁজা, কতক আলমারির মাথায়, কতক ময়লা চাপকানের পকেটে,—যখন কোনোটার দরকার পড়ে বাড়ি মাথায় করে বেড়ান,—আঁস্তাকুড় থেকে আর বাড়ির ছাত পর্যন্ত এমন জায়গা নেই যেখানে না খুঁজতে হয়।

ইন্দুমতী। এর সঙ্গে যে ইংরেজি নভেলও আছে— তারও আবার পাতা ছেঁড়া। কতকগুলো চিঠি— এ কি দরকারি।

ক্ষান্তমণি। ওর মধ্যে দরকারি আছে অদরকারিও আছে, কিচ্ছু বলবার জো নেই। খুব গোপনীয়ও আছে, সেগুলো চারদিকে ছড়ানো। খুব বেশি দরকারি চিঠি সাবধান করে রাখবার জন্যে বইয়ের মধ্যে গুঁজে রাখা হয়, সে আর কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যায় না, ভুলেও যেতে হয়। বন্ধুরা বই পড়তে নিয়ে যায়, তার পরে কোন্ চিঠি কোন্ বইয়ের সঙ্গে কোন্ বন্ধুর বাড়ি গিয়ে পৌঁছয় তা কিছুই বলবার জো নেই। এক-একদিন বড়ো আবশ্যকের সময় গাড়িভাড়া করে বন্ধুদের বাড়ি-বাড়ি খোঁজ করে বেড়ান।

ইন্দুমতী। এক কাজ করো না ভাই। কাউকে দিয়ে বন্ধুদের গাল দিয়ে কতকগুলো চিঠি লেখাও না—সেগুলো বইয়ের মধ্যে গোঁজা থাকবে—বন্ধুরা যখন বই ধার করে পড়বেন নিজেদের সম্বন্ধে অনেক জ্ঞানলাভ করবেন এবং সেই সুযোগে দুটি-পাঁচটি ঝরে যেতেও পারেন।

ক্ষান্তমণি। আঃ, তা হলে তো হাড় জুড়োয়।

ইন্দুমতী। এ-সব কী ? কতকগুলো লেখা, কতকগুলো প্রুফ, খালি দেশলাইয়ের বাক্স, কাননকুসুমিকা, কাগজের পুঁটুলির মধ্যে ছাতাধরা মসলা, একখানা তোয়ালে, গোটাকতক দাবার ঘুঁটি, একটি ইস্কাবনের গোলাম, ছাতার বাঁট—এ চাবির গোচ্ছা ফেলে দিলে বোধ হয় চলবে না—

ক্ষান্তমণি। এই দেখো! এই চাবির মধ্যে ওঁর যথাসর্বস্ব আছে। আজ সকালে একবার খোঁজ পড়েছিল, কোথাও সন্ধান না পেয়ে শেষে উমাপতিদের বাড়ি থেকে সতেরোটা টাকা ধার করে নিয়ে এলেন। দাও তো ভাই, এ চাবি ওঁকে সহজে দেওয়া হবে না। ওই ভাই, ওরা আসছে— চলো ও ঘরে পালাই। [প্রস্থান

বিনোদ, চন্দ্রকান্ত, নিমাই, নলিনাক্ষ, শ্রীপতি ও ভূপতির প্রবেশ

বিনোদবিহারী। (টোপর পরিয়া) সং তো সাজলুম, এখন তোমরা পাঁচজনে মিলে হাততালি দাও— উৎসাহ হোক, নইলে থেকে থেকে মনটা দমে যাচ্ছে।

চন্দ্রকান্ত। এখন তো কেবল নেপথ্যবিধান চলছে, আগে অভিনয় আরম্ভ হোক তার পরে হাততালি দেবার সময় হবে।

বিনোদবিহারী। আচ্ছা চন্দর, অভিনয়টা হবে কিসের বলো তো হে। কী সাজব আমাকে বুঝিয়ে দাও দেখি।

চন্দ্রকান্ত। মহারানীর বিদূষক সাজতে হবে আর কী। যাতে তিনি একটু প্রফুল্ল থাকেন আজ রাত্রি থেকে এই তোমার একমাত্র কাজ হল।

বিনোদবিহারী। তা সাজটিও যথোপযুক্ত হয়েছে। এই টোপরটা দেখলে মনে পড়ে সেকেলে ইংরেজ রাজাদের যে "ফুল"গুলো ছিল তাদেরও টুপিটা এই আকারের।

চন্দ্রকান্ত। সেজের বাতি নিবিয়ে দেবার ঠোঙাগুলোরও ওই রকম চেহারা। এই পঁচিশটা বৎসর যা কিছু শিক্ষাদীক্ষা হয়েছে, যা কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষা জন্মেছিল,— ভারতের ঐক্য, বাণিজ্যের উন্নতি, সমাজের সংস্কার, সাহেবের ছেলে পিটোনো প্রভৃতি যে-সকল উঁচু উঁচু ভাবের পলতে মগজের ঘি খেয়ে খুব উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠেছিল, সেগুলিকে ওই টোপরটা চাপা দিয়ে এক দমে নিবিয়ে সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা হয়ে বসতে হবে—

নলিনাক্ষ। আর আমাদেরও মনে থাকবে না— একেবারে ভুলে যাবে— দেখা করতে এলে বলবে সময় নেই—

চন্দ্রকান্ত। কিংবা মহারানীর হুকুম নেই। কিন্তু সেটা তোমার ভারি ভুল। বন্ধুত্ব তখন আরো প্রগাঢ় হয়ে উঠবে। ওঁর জীবনের মধ্যাহ্নসূর্যটি যখন ঠিক ব্রহ্মরন্ধ্রের উপর ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকবেন তখন এই কালো কালো ছায়াগুলিকে নিতান্ত খারাপ লাগবে না। কিন্তু দেখ্ বিনোদ, কিছু মনে করিসনে— আরম্ভেতে একটুখানি দমিয়ে দেওয়া ভালো— তা হলে আসল ধাক্কা সামলাবার বেলায় নিতান্ত অসহ্য বোধ হবে না। তখন মনে হবে, চন্দর যতটা ভয় দেখাত আসলে ততটা কিছু নয়। সে

বলেছিল আগুনে ঝলসাবার কথা কিন্তু এ তো কেবলমাত্র উলটে-পালটে তাওয়ায় সেঁকা— তখন কী অনির্বচনীয় আরাম বোধ হবে!

শ্রীপতি। চন্দরদা, ও কী তুমি বকছ! আজ বিয়ের দিনে কি ও-সব কথা শোভা পায়! একে তো বাজনা নেই আলো নেই, উলু নেই শাঁখ নেই, তার পরে যদি আবার অন্তিমকালের বোলচাল দিতে আরম্ভ কর তা হলে তো আর বাঁচিনে!

ভূপতি। মিছে না! চন্দরদার ও সমস্ত মুখের আস্ফালন বেশ জানি— এদিকে রাত্তির দশটার পর যদি আর-এক মিনিট ধরে রাখা যায়, তা হলে ব্রাহ্মণ বিরহের জ্বালায় একেবারে অস্থির হয়ে পড়ে—

চন্দ্রকান্ত। ভূপতির আর কোনো গুণ না থাক্ ও মানুষ চেনে তা স্বীকার করতে হয়। ঘড়িতে ওই যে ছুঁচোলো মিনিটের কাঁটা দেখছ উনি যে কেবল কানের কাছে টিক টিক করে সময় নির্দেশ করেন তা নয় অনেক সময় প্যাঁট প্যাঁট করে বেঁধেন— মন-মাতঙ্গকে অঙ্কুশের মতো গৃহাভিমুখে তাড়না করেন। রাত্তির দশটার পর আমি যদি বাইরে থাকি তা হলে প্রতি মিনিট আমাকে একটি করে খোঁচা মেরে মনে করিয়ে দেন ঘরে আমার অন্ন ঠাণ্ডা এবং গৃহিণী গরম হচ্ছেন।— বিনুদার ঘড়ির সঙ্গে আজকাল কোনো সম্পর্কই নেই— এবার থেকে ঘড়ির ওই চন্দ্রবদনে নানা রকম ভাব দেখতে পাবেন— কখনো প্রসন্ন কখনো ভীষণ। (নিমাইয়ের প্রতি) আচ্ছা ভাই বৈজ্ঞানিক, তুমি আজ অমন চুপচাপ কেন? এমন করলে তো চলবে না।

শ্রীপতি। সত্যি, বিনু যে বিয়ে করতে যাচ্ছে তা মনে হচ্ছে না। আমরা কতকগুলো পুরুষমানুষে জটলা করেছি— কী করতে হবে কেউ কিছু জানিনে— মহা মুশকিল! চন্দরদা, তুমি তো বিয়ে করেছ, বলো না কী করতে হবে— হাঁ করে সবাই মিলে বসে থাকলে কি বিয়ে-বিয়ে মনে হয়?

চন্দ্রকান্ত। আমার বিয়ে সে যে পুরাতত্ত্বের কথা হল— আমার স্মরণশক্তি ততদূর পৌছয় না। কেবল বিবাহের যেটি সর্বপ্রধান আয়োজন, যেটিকে কিছুতে ভোলবার জো নেই, সেইটিই অন্তরে বাহিরে জেগে আছে, মন্তর-তন্তর পুরুত-ভাট সে সমস্ত ভুলে গেছি।

ভূপতি। বাসরঘরে শ্যালীর কানমলা?

চন্দ্রকান্ত। হায় পোড়াকপাল! শ্যালীই নেই তো শ্যালীর কানমলা— মাথা নেই তার মাথাব্যথা! শ্যালী থাকলে তবু তো বিবাহের সংকীর্ণতা অনেকটা দূর হয়ে যায়— ওরই মধ্যে একটুখানি নিশ্বেস ফেলবার, পাশ ফেরবার জায়গা পাওয়া যায়— শ্বশুরমশায় একেবারে কড়ায় গণ্ডায় ওজন করে দিয়েছেন সিকিপয়সার ফাউ দেননি।

বিনোদবিহারী। বাস্তবিক— বর মনোনীত করবার সময় যেমন জিজ্ঞাসা করে, কটি পাশ আছে, কনে বাছবার সময় তেমনি খোঁজ নেওয়া উচিত ক-টি ভগ্নী আছে।

চন্দ্রকান্ত। চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে— ঠিক বিয়ের দিনটিতে বুঝি তোমার চৈতন্য হল? তা তোমারও একটি আছে শুনেছি তাঁর নামটি হচ্ছে ইন্দুমতী— স্বভাবের পরিচয় ক্রমে পাবে।

নিমাই। (স্বগত) যাঁকে আমার স্কন্ধের উপরে উদ্যত করা হয়েছে— সর্বনাশ আর কী!

শ্রীপতি। এদিকে যে বেরোবার সময় হয়ে এল তা দেখছ? এতক্ষণ কী যে হল তার ঠিক নেই! নিদেন ইংরেজ ছোঁড়াগুলোর মতো খুব খানিকটা হো হা করতে পারলেও আসর গরম হয়ে উঠত। খানিকটা চেঁচিয়ে বেসুরো গান গাইলেও একটু জমাট হত— (উচ্চৈঃস্বরে) "আজ তোমায় ধরব চাঁদ আঁচল পেতে।"

চন্দ্রকান্ত। আরে থাম্ থাম্— তোর পায়ে পড়ি ভাই, থাম্; দেখ্ আর্য ঋষিগণ যে রাগরাগিণীর সৃষ্টি করেছিলেন সে কেবল লোকের মনোরঞ্জনের জন্যে— কোনো রকম নিষ্ঠুর অভিপ্রায় তাঁদের ছিল না।

ভূপতি। এস তবে বরকনের উদ্দেশে থ্রী চিয়ার্স দিয়ে বেরিয়ে পড়া যাক— হিপ হিপ হুরে—

চন্দ্রকান্ত। দেখো, আমার প্রিয় বন্ধুর বিয়েতে আমি কখনোই এ রকম অনাচার হতে দেব না; শুভকর্মে অমন বিদেশী শেয়াল-ডাক ডেকে বেরোলে নিশ্চয় অযাত্রা হবে। তার চেয়ে সবাই মিলে উলু দেবার চেষ্টা করো না! ঘরে একটিমাত্র স্ত্রীলোক আছেন তিনি শাঁখ বাজাবেন এখন। আহা, এই সময়ে থাকত তাঁর গুটি দুই-তিন সহোদরা তা হলে কোকিলকণ্ঠের উলু শুনে আজ কান জুড়িয়ে যেত।

বিনোদবিহারী। তা হলে তোমার দুটি কান সামলাতেই দিন বয়ে যেত।

ভূপতি। বিনোদ তবে ওঠো, সময় হল!

নলিনাক্ষ। এই তবে আমাদের অবিবাহিত বন্ধুত্বের শেষ মিলন। জীবনস্রোতে তুমি এক দিকে যাবে আমি এক দিকে যাব। প্রার্থনা করি, তুমি সুখে থাকো। কিন্তু মুহূর্তের জন্যে ভেবে দেখো বিনু, এই মরুময় জগতে তুমি কোথায় যাচ্ছ—

চন্দ্রকান্ত। বিনু, তুই বল্, মা, আমি তোমার জন্যে দাসী আনতে যাচ্ছি। তা হলে কনকাঞ্জলিটা হয়ে যায়।

শ্রীপতি। এইবার তবে উলু আরম্ভ হোক।

সকলে উলুর চেষ্টা। নেপথ্যে উলু ও শঙ্খধ্বনি

নিমাই। ওই যে উলুর জোগাড় করে রেখেছ, এতক্ষণে একটুখানি বিয়ের সুর লাগল। নইলে কতকগুলো মিন্‌সেয় মিলে যে রকম বেসুরো লাগিয়েছিলে, বরযাত্রা কি গঙ্গাযাত্রা কিছু বোঝবার জো ছিল না। [সকলের প্রস্থান

ইন্দুমতী ও ক্ষান্তমণির প্রবেশ

ক্ষান্তমণি। শুনলি তো ভাই আমার কর্তাটির মধুর কথাগুলি?

ইন্দুমতী। কেন ভাই আমার তো মন্দ লাগেনি।

ক্ষান্তমণি। তোর মন্দ লাগবে কেন? তোর তো আর বাজেনি। যার বেজেছে সেই জানে।

ইন্দুমতী। তুমি যে আবার একেবারে ঠাট্টা সইতে পার না। তোমার স্বামী কিন্তু ভাই, তোমাকে সত্যি ভালোবাসে। দিনকতক বাপের বাড়ি গিয়ে বরং পরীক্ষা করে দেখো না—

ক্ষান্তমণি। তাই একবার ইচ্ছা করে, কিন্তু জানি থাকতে পারব না। তা যা হোক, এখন তোদের ওখানে যাই। ওরা তো বউবাজারের রাস্তা ঘুরে যাবে সে এখনো ঢের দেরি আছে।

ইন্দুমতী। তুমি এগোও ভাই, আমি তোমার স্বামীর এই বইগুলি গুছিয়ে দিয়ে যাই। (ক্ষান্তমণির প্রস্থান) আজ ললিতবাবু এমন চুপচাপ গম্ভীর হয়ে বসেছিলেন। কী কথা ভাবছিলেন কে জানে। সত্যি আমার জানতে ইচ্ছে করে। থেকে থেকে একটা খাতা খুলে দেখছিলেন। সেই খাতাটা ওই ভুলে ফেলে গেছেন। ওটা আমাকে দেখতে হচ্ছে। (খাতা খুলিয়া) ও মা! এ যে কবিতা! কাদম্বিনীর প্রতি! আ মরণ! সে পোড়ারমুখী আবার কে।

জল দিবে অথবা বজ্র, ওগো কাদম্বিনী,
হতভাগ্য চাতক তাই ভাবিছে দিনরজনী!

ইস! ভারি যে অবস্থা খারাপ দেখছি! এত বেশি ভাবনার কাজ কী! আমি যদি পোড়াকপালী কাদম্বিনী হতুম তা হলে জলও দিতুম না বজ্রও দিতুম না, হতভাগ্য চাতকের মাথায় খানিকটা কবিরাজের তেল ঢেলে দিতুম। খেয়ে দেয়ে তো কাজ নেই— কোথাকার কাদম্বিনীর নামে কবিতা, তাও আবার দুটো লাইন ছন্দ মেলেনি। এর চেয়ে আমি ভালো লিখতে পারি।

আর কিছু দাও বা না দাও, অয়ি অবলে সরলে,
বাঁচি সেই হাসিভরা মুখ আর একবার দেখিলে।

আহা হা হা হা! অবলে সরলে! কোন্ এক বেহায়া মেয়ে ওঁকে হাসিভরা কালামুখ দেখিয়ে দিয়েছিল, একতিল লজ্জাও করেনি। বাস্তবিক, পুরুষগুলো ভারি বোকা। মনে করলে ওঁর প্রতি ভারি অনুগ্রহ করে সে হেসে গেল— হাসতে নাকি সিকি পয়সার খরচ হয়। দাঁতগুলো বোধ হয় একটু ভালো দেখতে ছিল তাই একটা ছুতো করে দেখিয়ে দিয়ে গেল। কই আমাদের কাছে তো কোনো কাদম্বিনী সাত পুরুষে এমন করে হাসতে আসে না। অবলে সরলে! সত্যি বাপু, মেয়ে জাতটাই ভালো নয়। এত ছলও জানে! ছি ছি! এ কবিতাও তেমনি হয়েছে। আমি যদি কাদম্বিনী হতুম তো এমন পুরুষের মুখ দেখতুম না। যে লোক চোদ্দটা অক্ষর সামলে চলতে পারে না, তার সঙ্গে আবার প্রণয়! এ খাতা আমি ছিঁড়ে ফেলব— পৃথিবীর একটা উপকার করব— কাদম্বিনীর দেমাক বাড়তে দেব না।

পুরুষের বেশে হরিলে পুরুষের মন,
(এবার) নারীবেশে কেড়ে নিয়ে যাও জীবন মরণ।

এর মানে কী!

কদম্ব যেমনি আমা প্রথম দেখিলে,
কেমন ক'রে ভৃত্য বলে তখনি চিনিলে!

ও মা! ও মা! ও মা! এ যে আমারই কথা! এইবার বুঝেছি পোড়ারমুখী কাদম্বিনী কে! (হাস্য) তাই বলি, এমন করে কাকে লিখলেন! ও মা, কত কথাই বলেছেন! আর-একবার ভালো করে সমস্তটা পড়ি! কিন্তু কী চমৎকার হাতের অক্ষর! একেবারে যেন মুক্তো বসিয়ে গেছে। [নীরবে পাঠ

পশ্চাৎ হইতে খাতা অন্বেষণে নিমাইয়ের প্রবেশ

কিন্তু ছন্দ থাক্ না থাক্ পড়তে তো কিছুই খারাপ হয়নি। সত্যি, ছন্দ নেই বলে আরো মনের সরল ভাবটা ঠিক যেন প্রকাশ হয়েছে। আমার তো বেশ লাগছে। আমার বোধ হয় ছেলেদের প্রথম ভাঙা কথা যেমন মিষ্টি লাগে, কবিদের প্রথম ভাঙা ছন্দ তেমনি মিষ্টি লাগে; পড়তে গেলে বুকের ভিতরটা কী একরকম করে ওঠে— বড়ো বড়ো কবিতা পড়ে এমন হয় না। মেঘনাদবধ, বৃত্রসংহার, পলাশির যুদ্ধ, সে-সব যেন ইস্কুলের বই— এমন সত্যিকার না। (খাতা বুকে চাপিয়া) এ খাতা আমি

নিয়ে যাব— এ তো আমাকেই লিখেছেন। আমার এমনি আনন্দ হচ্ছে! ইচ্ছে করছে এখনি দিদিকে গিয়ে জড়িয়ে ধরি গে! আহা, দিদি যাকে বিয়ে করছে তাকে নিয়ে যেন খুব খুব খুব সুখে থাকে— যেন চিরজীবন আদরে সোহাগে কাটাতে পারে। (প্রস্থানোদ্যম। পশ্চাতে ফিরিয়া নিমাইকে দেখিয়া) ও মা! [মুখ আচ্ছাদন

নিমাই। ঠাকরুন, আমি একখানা খাতা খুঁজতে এসেছিলুম— (ইন্দুমতীর দ্রুত পলায়ন) জন্ম জন্ম সহস্র বার আমার সহস্র খাতা হারাক— কবিতার বদলে যা পেয়েছি কালিদাস তাঁর কুমারসম্ভব শকুন্তলা বাঁধা রেখে এমন জিনিস পায় না।

[মহা উল্লাসে প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

বিবাহসভা

লোকারণ্য। শঙ্খ, হুলুধ্বনি। শানাই

নিবারণ। কানাই! ও কানাই! কী করি বলো দেখি। কানাই গেল কোথায়?

শিবচরণ। তুমি ব্যস্ত হোয়ো না ভাই। এ ব্যস্ত হবার কাজ নয়। আমি সমস্ত ঠিক করে দিচ্ছি। তুমি পাত পাড়া হল কি না দেখে এস দেখি।

ভৃত্য। বাবু, আসন এসে পৌঁচেছে সেগুলো রাখি কোথায়?

নিবারণ। এসেছে! বাঁচা গেছে। তা সেগুলো ছাতে—

শিবচরণ। ব্যস্ত হচ্ছ কেন দাদা। কী হয়েছে বলো দেখি? কী রে বেটা, তুই হাঁ করে দাঁড়িয়ে রয়েছিস কেন? কাজকর্ম কিছু হাতে নেই না কি।

ভৃত্য। আসন এসেছে সেগুলো রাখি কোথায় তাই জিজ্ঞাসা করছি।

শিবচরণ। আমার মাথায়! একটু গুছিয়ে গাছিয়ে নিজের বুদ্ধিতে কাজ করা, তা তোদের দ্বারা হবে না! চল্ আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। ওরে বাতিগুলো যে এখনো জ্বালালে না! এখানে কোনো কাজেরই একটা বিধিব্যবস্থা নেই— সমস্ত বে-বন্দোবস্ত! নিবারণ, তুমি ভাই একটু ঠাণ্ডা হয়ে বসো দেখি— ব্যস্ত হয়ে বেড়ালে কোনো কাজই হয় না। আঃ বেটাদের কেবল ফাঁকি। বেহারা বেটারা সবাই পালিয়েছে দেখছি— আচ্ছা করে তাদের কানমলা না দিলে—

নিবারণ। পালিয়েছে নাকি! কী করা যায়!

শিবচরণ। ব্যস্ত হোয়ো না ভাই— সব ঠিক হয়ে যাবে। বড়ো বড়ো ক্রিয়াকর্মের সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখা ভারি দরকার। কিন্তু এই রেধো বেটার সঙ্গে তো আর পারিনে! আমি তাকে পই পই করে বললুম, তুমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে লুচিগুলো ভাজিয়ো, কিন্তু কাল থেকে হতভাগা বেটার চুলের টিকি দেখবার জো নেই। লুচি যেন কিছু কম পড়েছে বোধ হচ্ছে।

নিবারণ। বল কী শিবু! তা হলে তো সর্বনাশ।

শিবচরণ। ভয় কী দাদা! তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, সে আমি করে নিচ্ছি। একবার রাধুর দেখা পেলে হয়, তাকে আচ্ছা করে শুনিয়ে দিতে হবে।

চন্দ্রকান্ত, নিমাই প্রভৃতির প্রবেশ

নিবারণ। আহার প্রস্তুত, চন্দ্রবাবু, কিছু খাবেন চলুন।

চন্দ্রকান্ত। আমাদের পরে হবে, আগে সকলের হোক।

শিবচরণ। না না, একে একে সব হয়ে যাক। চলো চন্দর তোমাদের খাইয়ে আনি। নিবারণ, তুমি কিচ্ছু ব্যস্ত হোয়ো না, আমি সব ঠিক করে নিচ্ছি। কিন্তু লুচিটা কিছু কম পড়বে বোধ হচ্ছে।

নিবারণ। তা হলে কী হবে শিবু!

শিবচরণ। ঐ দেখো! মিছিমিছি ভাব কেন! সে সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন কেবল সন্দেশগুলো এসে পৌঁছলে বাঁচি। আমার তো বোধ হচ্ছে ময়রা বেটা বায়না নিয়ে ফাঁকি দিলে।

নিবারণ। বল কী ভাই!

শিবচরণ। ব্যস্ত হোয়ো না, আমি সব দেখে শুনে নিচ্ছি।

[সকলকে ডাকিয়া লইয়া প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

বাসর-ঘর

বিনোদবিহারী। কমলমুখী ও অন্য স্ত্রীগণ

সম্মুখবর্তী পথ দিয়া আহারার্থী বরযাত্রিগণ যাতায়াত করিতেছে

ইন্দুমতী। এতক্ষণে বুঝি তোমার মুখ ফুটল !

বিনোদবিহারী। আপনার ও-হাতের স্পর্শে বোবার মুখ খুলে যায় আমি তো কেবল বর।

ক্ষান্তমণি। দেখেছিস ভাই, আমরা এতক্ষণ এত চেষ্টা করে একটা কথা কওয়াতে পারলুম না আর ইন্দুর হাতের কানমলা খেয়ে তবে ওর কথা বেরোল।

প্রথমা। ও ইন্দু, তোর কাছে ওর কথার চাবি ছিল না কি ! তুই কী কল ঘুরিয়ে দিলি লো।

দ্বিতীয়া। তা দে ভাই, তবে আর এক পাক দে। ওর পেটে যত কথা আছে বেরিয়ে যাক। (মৃদুস্বরে) জিগ্‌গেস কর্ না, আমাদের নাতনিকে লাগছে কেমন—

ইন্দুমতী। কী বল ঠাকুরজামাই, তবে আর একবার দম দিয়ে নিই।

কমলমুখী। (মৃদুস্বরে) ইন্দু, তুই আর জ্বালাসনে ভাই— একটু থাম্।

ইন্দুমতী। দিদি, ওর কানে একটু মোচড় দিলেই অমনি তোমার প্রাণে দ্বিগু বেজে উঠছে কেন ? তুমি কি ওর তানপুরোর তার !

প্রথমা। ওলো ও কমল, তোর রকম দেখে তো আর বাঁচিনে। হ্যাঁ লো, এরই মধ্যে ওর কানের ’পরে তোর এত দরদ হয়েছে ! তা ভাবিসনে ভাবিসনে— আমরা ওর দুটো কান কেটে নিচ্ছিনে, নিদেন একটা তোর জন্যে রেখে দেব।

চন্দ্রকান্ত। (জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া) দরদ হবে না কেন। আজ থেকে উনি আমাদের বিনুদার কর্ণধার হলেন— সে কর্ণ উনি যদি না সামলাবেন তো কে সামলাবে।

দ্বিতীয়া। ও মিনসে আবার কে ভাই !

ক্ষান্তমণি। (তাড়াতাড়ি) ও বরের ভাই হয়।— ওগো, মশায়, তোমার

বিনুদার হয়ে জবাব দিতে হবে না! উনি বেশ সেয়ানা হয়েছেন— এখন দিব্যি কথা ফুটেছে। তুমি এখন নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে যাও।

চন্দ্রকান্ত। যে আজ্ঞে, আদেশ পেলেই নির্ভয়ে যেতে পারি। এখন বোধ করি কিছুক্ষণ ঘরে টিকতে পারব। [প্রস্থান

ইন্দুমতী। না ভাই, এখানে বড্ড আনাগোনার রাস্তা— বাইরে ওই দরজাটা দিয়ে আসি। [উঠিয়া দ্বারের নিকট আগমন

নিমাই। একবার উঁকি মেরে বিনুদার অবস্থাটা দেখে যেতে হচ্ছে।

[ইন্দুমতীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত

ইন্দুমতী। আপনারা বেশি ব্যস্ত হবেন না, আপনাদের প্রাণের বন্ধুটি জলে পড়েননি।

নিমাই। সে জন্যে আমি কিছু ব্যস্ত হইনি। আমার নিজের একটা জিনিস হারিয়েছে আমি তারই খোঁজ করে বেড়াচ্ছি।

ইন্দুমতী। হারাবার মতো জিনিস যেখানে সেখানে ফেলে রাখেন কেন?

নিমাই। সে আমাদের জাতের স্বধর্ম— আমরা সাবধান হতে শিখিনি। সে খাতাটা যদি আপনার হাতে পড়ে থাকে—

ইন্দুমতী। খাতা? হিসেবের খাতা?

নিমাই। তাতে কেবল খরচের হিসেবটাই ছিল, জমার হিসেবটা যদি বসিয়ে দেন তো আপনার কাছেই থাক্।

ইন্দুমতী। ছি ছি, আজ আমি কী যে বকাবকি করছি তার ঠিক নেই। আজ আমার কী হয়েছে! [দ্রুত দ্বার রোধ

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বাগবাজারের রাস্তা

নিমাই

নিমাই। আহা, এই বাড়িটা আমার শরীর থেকে আমার মনটুকুকে যেন শুষে নিচ্ছে— ব্লটিং যেমন কাগজ থেকে কালি শুষে নেয়। কিন্তু কোন্‌দিকে সে থাকে এ পর্যন্ত কিছুই সন্ধান করতে পারলুম না। ঐ যে পশ্চিমের জানালার ভিতর দিয়ে একটা সাদা কাপড়ের মতো যেন দেখা গেল— না না, ও তো নয়, ও তো এক জন দাসী দেখছি— ও কী করছে। একটা ভিজে শাড়ি শুকোতে দিচ্ছে। বোধ হয় তাঁরই শাড়ি। আহা, নাগাল পেলে একবার স্পর্শ করে নিতুম। তা হলে এতক্ষণে তাঁর স্নান হল। পিঠের উপরে ভিজে চুল ফেলে সাফ কাপড়টি পরে এখন কী করছেন। একবার কিছুতেই কি দেখা হতে পারে না। আমরা কি বনের জন্তু। আমাদের কেন এত ভয়। এত করে এতগুলো দেয়াল গেঁথে এতগুলো দরজা-জানলা বন্ধ করে মানুষের কাছ থেকে মানুষ লুকিয়ে থাকে কেন।

পালকিতে শিবচরণের প্রবেশ

শিবচরণ। (বেহারার প্রতি) আরে রাখ্‌ রাখ্‌। [পালকি হইতে অবতরণ

বেটার তবু হুঁশ নেই! দেখো না, হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে দেখো না! যেন খিদে পেয়েছে, এই বাড়ির ইটকাঠগুলো গিলে খাবে। ছোঁড়ার হল কী? খাঁচার পাখির দিকে বেড়াল যেমন তাকিয়ে থাকে তেমনি করে উপরের দিকে তাকিয়ে আছে। রোসো, এবারে ওকে জব্দ করছি— বাবাজি হাতে হাতে ধরা পড়েছেন। হতভাগা কালেজে যাবার নাম করে রোজ বাগবাজারে এসে ঘুর্‌ ঘুর্‌ করে। (নিকটে আসিয়া) বাপু, মেডিকেল কালেজটা কোন্‌দিকে একবার দেখিয়ে দাও দেখি।

নিমাই। কী সর্বনাশ! এ যে বাবা!

শিবচরণ। শুনছ? কালেজ কোন্‌দিকে! তোমার অ্যানাটমির নোট কি ওই দেয়ালের গায়ে লেখা আছে। তোমার সমস্ত ডাক্তারি শাস্ত্র কি ওই জানলায় গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে। (নিমাই নিরুত্তর) মুখে কথা নেই যে! লক্ষ্মীছাড়া, এই তোর একজামিন! এইখানে তোর মেডিকেল কালেজ!

নিমাই। খেয়েই কালেজে গেলে আমার অসুখ করে তাই একটুখানি বেড়িয়ে নিয়ে—

শিবচরণ। বাগবাজারে তুমি হাওয়া খেতে এস? শহরের আর কোথাও বিশুদ্ধ বায়ু নেই! এ তোমার দার্জিলিং সিমলে পাহাড়! বাগবাজারের হাওয়া খেয়ে খেয়ে আজকাল যে চেহারা বেরিয়েছে একবার আয়নাতে দেখা হয় কি। আমি বলি ছোঁড়াটা একজামিনের তাড়াতেই শুকিয়ে যাচ্ছে— তোমাকে যে ভূতে তাড়া করে বাগবাজারে ঘোরাচ্ছে তা তো জানতুম না!

নিমাই। আজকাল বেশি পড়তে হয় বলে রোজ খানিকটা করে একসেসাইজ করে নিই—

শিবচরণ। রাস্তার ধারে কাঠের পুতুলের মতো হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকে তোমার একসেসাইজ হয়, বাড়িতে তোমার দাঁড়াবার জায়গা নেই!

নিমাই। অনেকটা চলে এসে শ্রান্ত হয়েছিলুম তাই একটু বিশ্রাম করা যাচ্ছিল।

শিবচরণ। শ্রান্ত হয়েছিস, তবে ওঠ্ আমার পালকিতে। যা এখনি কালেজ যা। গেরস্তর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে শ্রান্তি দূর করতে হবে না!

নিমাই। সে কী কথা! আপনি কী করে যাবেন?

শিবচরণ। আমি যেমন করে হোক যাব, তুই এখন পালকিতে ওঠ্। ওঠ্ বলছি।

নিমাই। অনেকটা জিরিয়ে নিয়েছি— এখন আমি অনায়াসে হেঁটে যেতে পারব।

শিবচরণ। না, সে হবে না— তুই ওঠ্ আমি দেখে যাই—

নিমাই। আপনার যে ভারি কষ্ট হবে।

শিবচরণ। সে জন্যে তোকে কিছু ভাবতে হবে না— তুই ওঠ্ পালকিতে।

নিমাই। কী করি—পালকিতে ওঠা যাক, আজ সকালবেলাটা মাটি হল।

[পালকি-আরোহণ

শিবচরণ। (বেহারার প্রতি) দেখ্ একেবারে সেই পটলডাঙার কালেজে নিয়ে যাবি কোথাও থামাবিনে! [পালকি লইয়া বেহারাগণ প্রস্থানোন্মুখ

নিমাই। (জনান্তিকে বেহারাদের প্রতি) মির্জাপুর চন্দ্রবাবুর বাসায় চল্, তোদের এক টাকা বকশিশ দেব, ছুটে চল্। [প্রস্থান

শিবচরণ। আজ আর রুগি দেখা হল না। আমার সকালবেলাটা মাটি করে দিলে। [প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

চন্দ্রকান্তের বাসা

চন্দ্রকান্ত

চন্দ্রকান্ত। নাঃ! এ আগাগোড়া কেবল ছেলেমানুষি করা হয়েছে। আমার এমন অনুতাপ হচ্ছে! মনে হচ্ছে, যেন আমিই এ সমস্ত কাণ্ডটি ঘটিয়েছি। ইদিকে এত কল্পনা, এত কবিত্ব, এত মাতামাতি, আর বিয়ের দু-দিন না যেতে যেতেই কিছু আর মনে ধরছে না। ওঁদের জন্যে একটি আলাদা জগৎ ফরমাশ দিতে হবে। একটি শান্তিপুরে ফিনফিনে জগৎ— কেবল চাঁদের আলো, ঘুমের ঘোর আর পাগলের পাগলামি দিয়ে তৈরি!

নিমাইয়ের প্রবেশ

নিমাই। কী হচ্ছে চন্দরদা।

চন্দ্রকান্ত। না, নিমাই, তোরা আর বিয়েথাওয়া করিসনে।

নিমাই। কেন বলো দেখি— তোমার ঘাড়ে ম্যাল্‌থসের ভূত চাপল নাকি।

চন্দ্রকান্ত। এখনকার ছেলেরা তোরা মেয়েমানুষকে বিয়ে করবার যোগ্য ন'স। তোরা কেবল লম্বাচওড়া কথা ক'বি আর কবিতা লিখবি, তাতে যে পৃথিবীর কী উপকার হবে ভগবান জানেন।

নিমাই। কবিতা লিখে পৃথিবীর কী উপকার হয় বলা শক্ত, কিন্তু এক-এক সময়ে নিজের কাজে লেগে যায় সন্দেহ নেই। যা হোক এত রাগ কেন?

চন্দ্রকান্ত। শুনেছ তো সমস্তই। আমাদের বিনুর তাঁর স্ত্রীকে পছন্দ হচ্ছে না।

নিমাই। বাস্তবিক, এ রকম গুরুতর ব্যাপার নিয়ে খেলা করাটা ভালো হয়নি।

চন্দ্রকান্ত। বিনুটা যে এত অপদার্থ তা কি জানতুম? একটা স্ত্রীলোককে ভালোবাসবার ক্ষমতাটুকুও নেই? একবার ভেবে দেখ্ দেখি ভাই— একটি বালিকা হঠাৎ একদিন রাত্রে তার আশৈশব আত্মীয়স্বজনের বন্ধন বিচ্ছিন্ন করে সমস্ত ইহকাল পরকাল তোমার বাম হস্তে তুলে দিলে আর তার পরদিন সক্কালবেলা উঠে কিনা তাকে তোমার পছন্দ হল না! এ কি পছন্দের কথা!

নিমাই। সেই জন্য তো ভাই গোড়ায় একবার দেখে শুনে নেওয়া উচিত ছিল। তা এখন কী করবে বলো দেখি।

চন্দ্রকান্ত। আমি তো আর তার মুখদর্শন করছিনে। এই নিয়ে তার সঙ্গে আমার ভারি ঝগড়া হয়ে গেছে।

নিমাই। তুমি তাকে ছাড়লে সে যে নেহাত অধঃপাতে যাবে।

চন্দ্রকান্ত। না, তার সঙ্গে আমি কিছুতেই মিশছিনে, সে যদি আমার পায়ে ধরে এসে পড়ে তবু না। তুমি ঠিক বলেছিলে নিমাই, আজকাল সবাই যাকে ভালোবাসা বলে সেটা একটা স্নায়ুর ব্যামো— হঠাৎ কাঁপুনি দিয়ে ধরে, আবার হঠাৎ ঘাম দিয়ে ছেড়ে যায়।

নিমাই। সে-সব বিজ্ঞানশাস্ত্রের কথা পরে হবে, আপাতত আমার একটা কাজ করে দিতে হচ্ছে।

চন্দ্রকান্ত। যে কাজ বল তাতেই রাজি আছি কিন্তু ঘটকালি আর করছিনে।

নিমাই। ওই ঘটকালিই করতে হবে।

চন্দ্রকান্ত। (ব্যগ্রভাবে) কী রকম শুনি।

নিমাই। বাগবাজারের চৌধুরীদের বাড়ির কাদম্বিনী, তার সঙ্গে আমার—

চন্দ্রকান্ত। (উচ্চস্বরে) নিমাই, তোমারও কবিত্ব! তবে তোমারও স্নায়ু বলে একটা বালাই আছে!

নিমাই। তা আছে ভাই। বোধ হয় একটু বেশি পরিমাণেই আছে। অবস্থা এমনি হয়েছে কিছুতেই একজামিনের পড়ায় মন দিতে পারিনে— শিগগির আমার একটি সদ্গতি না করলে—

চন্দ্রকান্ত। বুঝেছি। কিন্তু নিমাই, আমার ঘাড়ে পাপের বোঝা আর চাপাসনে। ভেবে দেখ্, পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে দুটি অবলার সর্বনাশ করেছি— একটিকে স্বহস্তে নিয়েছি, আর একটিকে প্রিয় বন্ধুর হাতে সমর্পণ করেছি— আর স্ত্রীহত্যার পাতকে আমাকে লিপ্ত করিসনে।

নিমাই। কিচ্ছু ভেবো না ভাই। এবার যা করবে তাতে তোমার পূর্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে।

চন্দ্রকান্ত। ভ্যালা মোর দাদা। এ বেশ কথা বলেছিস ভাই। সকাল থেকে মরে ছিলুম। এখন একটু প্রাণ পাওয়া গেল। আমি এক্‌খনি যাচ্ছি। চাদরখানা নিয়ে আসি। অমনি বড়োবউয়ের পরামর্শটাও জানা ভালো। [প্রস্থান

(অনতিবিলম্বে ছুটিয়া আসিয়া) বড়োবউ রাগ করে বাপের বাড়ি চলে গেছে। এ সমস্তই কেবল তোদের জন্যে। না, আমি আর তোদের কারো সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখছিনে। তোরা পাঁচ জনে এসে জুটিস, আমিও ছেলেমানুষদের সঙ্গে মিশে যা

মুখে আসে তাই বকি, আর এই সমস্ত অনর্থ বাধে। আমার চিরকালের ঘরের স্ত্রীটিকেই যদি ঘরে না রাখতে পারব তো তোদের স্ত্রী জুটিয়ে দিয়ে আমার কী এমন পরমার্থ লাভ হবে বল্‌ দেখি। না, তোদের কারো সঙ্গে আমি আর বাক্যালাপ করছিনে।

বিনোদবিহারী ও নলিনাক্ষের প্রবেশ

বিনোদবিহারী। চন্দরদা, তুমি আমার উপর রাগ করে চলে এলে ভাই, আমি আর থাকতে পারলুম না।

চন্দ্রকান্ত। না ভাই, তোদের উপর কি আমি রাগ করতে পারি। তবে মনে একটু দুঃখ হয়েছিল তা স্বীকার করি।

বিনোদবিহারী। কী করব চন্দরদা। আমি এত চেষ্টা করছি কিছুতেই পেরে উঠছিনে—

চন্দ্রকান্ত। কেন বল্‌ দেখি। ওর মধ্যে শক্তটা কী। মেয়েমানুষকে ভালোবাসতে পারিসনে? তুই কি কাঠের পুতুল।

নলিনাক্ষ। চন্দ্রবাবুর সঙ্গে কিন্তু আমার মতের একটুও মিল হচ্ছে না। ভালোবাসা কখনো জোর করে হয় না। একটা গান আছে—

ভালোবাসিবে ব'লে ভালোবাসিনে।
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে।

আমি কিন্তু বিনু, সম্পূর্ণ তোমার দিকে।

বিনোদবিহারী। নলিন, একটু থাম্‌ তুই—এই বড়ো দুঃখের সময় আর হাসাসনে! চন্দরদা, কী জানি ভাই, একাদিক্রমে পঁচিশ বৎসরকাল বিয়ে না করে বিয়ে না-করাটাই যেন একেবারে মুখস্থ হয়ে গেছে। এখন হঠাৎ এই বিয়েটা কিছুতেই মনের মধ্যে গ্রহণ করতে পারছিনে।

চন্দ্রকান্ত। তোর পায়ে পড়ি বিনু, তুই আমার গা ছুঁয়ে বল্‌, নিদেন আমার খাতিরে তোর স্ত্রীকে ভালোবাসবি। মনে কর্‌, তুই আমার বোনকে বিয়ে করেছিস।

নলিনাক্ষ। চন্দ্রবাবুর এ নিতান্ত অন্যায় কথা! বিনুর প্রতি উনি—

বিনোদবিহারী। তুই আর জ্বালাসনে নলিন। বুঝেছ চন্দরদা, যা কিছু মনে করবার তা করেছি— তাকে আমি চোখ বুজে পরী অপ্সরী রম্ভা তিলোত্তমা বলে কল্পনা করি কিন্তু তাতে ফল পাইনে। তবে সত্যি কথা বলি চন্দর, আসলে হয়েছে কী,

আজকাল টাকার বড়ো টানাটানি— বই থেকে কিছু পাইনে, দেশে যা বিষয় আছে মামাতো ভাইরা লুঠ করে খেলে—নিজে পাড়াগাঁয়ে পড়ে থেকে বিষয় দেখা, সে মরে গেলেও পারব না— ওকালতি ব্যবসা সবে ধরেছি, ঘর থেকে কেবল গাড়িভাড়াই দিচ্ছি। একলা যখন থাকতুম, আমার কোণের ঘরের ভাঙা চৌকিটিতে এসে বসতুম, আপনাকে রাজা মনে হত। এখন নড়তে চড়তে কেবল মনে হয় আমার এই ভাঙা ঘর ছেঁড়া বিছানাটুকুও বেদখল হয়ে গেছে— আমাকে আর কোথাও ভালো করে ধরে না। নিমাই, তুমি শুনে রাগ করছ, কিন্তু একটু বুঝে দেখো, একটা জুতোর মধ্যে দুটো পা ঢোকে না, তা দুই পায়ে যতই প্রণয় থাক্।

নলিনাক্ষ। বিনু যা বলছে ওর সমস্ত কথাই আমি মানি।

নিমাই। তা হলে তোমার ভালোবাসার অভাব নেই, কেবল টাকার অভাব।

বিনোদবিহারী। কথাটা যে প্রায় একই দাঁড়ায়—

নিমাই। কী বল! কথাটা একই! ভালোবাসাকে তুমি একেবারে উড়িয়ে দিতে চাও—

বিনোদবিহারী। না ভাই, আমি ভালোবাসাটাকে স্নায়ুর ব্যামো কিংবা মিথ্যে বলছিনে; আমি বলছি ও জিনিসটা কিছু শৌখিন জাতের। ওর বিস্তর আসবাবের দরকার। টানাটানির বাজারে ওকে নিয়ে বড়ো বিব্রত হয়ে পড়তে হয়। আমি বেশ বুঝতে পারি, চতুর্দিকটি বেশ মনের মতো হত, ট্রামের ঘড়ঘড় না থাকত, দাসীমাগী ঝগড়া না করত, গয়লা ঠিক নিয়মিত দুধ জোগাত এবং দাম না চাইত, মাসান্তে বাড়িওয়ালা একবার করে অপমান করে না যেত, জজসাহেব বিচারাসনে বসে আমার ইংরিজি ভুল সংশোধন করে না দিত, তা হলে আমিও ক্রমে ক্রমে ভালোবাসতে পারতুম— কিন্তু এখন সংগীত, চাঁদের আলো, প্রেমালাপ, এ কিছুই রুচছে না— আমার পটলডাঙার সেই বাসার মধ্যে এ সমস্ত শৌখিন জিনিস পুষতে পারছিনে।

চন্দ্রকান্ত। ভালোবাসা যে এতবড়ো ফুলবাবু তা জানতুম না— কী করেই বা জানব, ওঁর সঙ্গে আমার কখনোই পরিচয় নেই।

নিমাই। ছি ছি বিনোদ, তোমার এতদিনকার কবিত্ব শেষকালে পয়সার থলির মধ্যে গুঁজলে হে!

বিনোদবিহারী। নিমাই, তুমি এমন কথাটা বললে! আমি দুর্গন্ধ পয়সার কাঙাল! ছোঃ! অভাবকে কি আমি অভাব বলে ডরাই— তা নয়, কিন্তু তার চেহারাটা অতি বিশ্রী, জীর্ণশীর্ণ মলিন কুৎসিত কদাকার হাড়-বের-করা, নিতান্ত গায়ের কাছে তাকে সর্বদা সহ্য হয় না। তার ময়লা হাতে সে পৃথিবীর যা-কিছু ছোঁয় তাই

দাগি হয়ে যায়, তা চাঁদের আলোই বল, আর প্রেয়সীর হাসিই বল। এতদিন আমার টাকা ছিল না, অভাবও ছিল না— বিয়ের পর থেকে দারিদ্র্য বলে একটা কদর্য মড়াখেকো শ্মশানের কুকুর জিব বের করে সর্বদা আমার চোখের সামনে হ্যাঁহ্যাঁ ক'রে বেড়াচ্ছে— তাকে আমি দু-চক্ষে দেখতে পারিনে। আসল কথা, আমার চারি দিকে আমি একটি সৌন্দর্যের সামঞ্জস্য দেখতে চাই— জীবনটি বেশ একটি অখণ্ড রাগিণীর মতো হবে, তবে আমার মধ্যে যা-কিছু পদার্থ আছে তা ভালো করে প্রকাশ পাবে। কিন্তু আমার এই নতুন স্ত্রীর সঙ্গে আমার পুরোনো অবস্থার ঠিক সুর মেলাতে পারছিনে, আমার কোনো জিনিস তাঁকে কেমন খাপ খাচ্ছে না, আর তাই ক্রমাগত আমাকে ছুঁচের মতো বিঁধছে। থাকত যদি আরব্য উপন্যাসের একটি পোষা দৈত্য, স্ত্রী ঘরে পদার্পণ করলেন অমনি একটি কিংকরী সোনার থালে হ্যামিল্টনের দোকানের সমস্ত ভালো ভালো গয়না এনে তাঁর পায়ের কাছে রেখে গেল, দু-জন দাসী বসবার ঘরে মছলন্দ বিছিয়ে চামর হাতে করে দুই দিকে দাঁড়াল, চারি দিক থেকে সংগীত উঠছে, বাগান থেকে ফুলের গন্ধ আসছে— যেদিকে চোখ পড়ছে তক তক ঝক ঝক করছে— সে হলে এক রকম হত— আর এই এক জীর্ণ ঘরে ছেঁড়া মাদুরে উঠতে-বসতে লজ্জিত হয়ে আছি! যা বলিস ভাই, স্ত্রীর কাছে মান রাখতে সকলেরই সাধ যায়, এমন কি, সেইজন্যে মনু বলে গেছেন স্ত্রীর কাছে মিথ্যা বলতে পাপ নেই। তা ভাই, মিথ্যা কথা দিয়ে যদি আমার পটলডাঙার বাসাটা ঢেকে ফেলতে পারতুম, আমার বর্তমান অবস্থা আগাগোড়া গিলটি করে দিতে পারতুম, তা হলে মিথ্যে আমার মুখে বাধত না— কিন্তু এতখানি ছেঁড়া বেরিয়ে পড়ছে যে কেবল কথা দিয়ে আর রিফু চলে না। এখন এ অবস্থায় সে কি আমাকে মনে মনে শ্রদ্ধা করতে পারে। আমার মধ্যে যেটুকু পদার্থ আছে সে কি আমি তার কাছে প্রকাশ করতে পেরেছি। আমার সঙ্গে প্রথম পরিচয়েই সে আমাকে কী হীনতার মধ্যে দেখছে বলো দেখি। তুমি কি বল এ অবস্থায় মানুষের বসে বসে প্রেমালাপ করতে শখ যায়। এই তো ভাই আমার যে রকম স্বভাব তা খুলে বললুম, খুব যে উঁচুদরের বীরত্বময় মহত্ত্বপূর্ণ তা নয়— কিন্তু উঁচু নিচু মাঝারি এই তিন রকমেরই মানুষ আছে, ওর মধ্যে আমাকে যে দলেই ফেল আমার আপত্তি নেই— কিন্তু ভুল বুঝো না।

চন্দ্রকান্ত। তোমার সঙ্গে বক্তৃতায় কে পারবে বলো। যা হোক এখন কর্তব কী বলো দেখি।

বিনোদবিহারী। আমি তাঁকে তাঁর বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি।

চন্দ্রকান্ত। তুমি নিজে চেষ্টা করে? না তিনি রাগ করে গেছেন?

বিনোদবিহারী। না, আমি তাঁকে একরকম বুঝিয়ে দিলুম—

চন্দ্রকান্ত। যে, এখানে তিনি টিকতে পারবেন না! তুমি সব পার। যদি বন্ধুত্ব রাখতে চাও তো ও-আলোচনায় আর কাজ নেই, তোমার যা কর্তব্য বোধ হয় তুমি কোরো। নিমাই ভাই, তোমার সে-কথাটা মনে রইল— আগে একবার নিজের শ্বশুরবাড়িটা ঘুরে আসি তার পরে বেশ উৎসাহের সঙ্গে কাজটায় লাগতে পারব। বিনু, আজ আমার মনটা কিছু অস্থির আছে, আজ আর থাকতে পারছিনে— কাল তোমার বাসায় এক বার যাওয়া যাবে। [প্রস্থান

নলিনাক্ষ। চলো ভাই বিনু, আমরা দু-জনে মিলে গোলদিঘির ধারে বেড়াতে যাইগে।

বিনোদবিহারী। আমার এখন গোলদিঘি বেড়াবার শখ নেই নলিন। সেখানে যখন যাব একেবারে দড়ি-কলসি হাতে করে নিয়ে যাব।

নলিনাক্ষ। কেন ভাই, অনর্থক তুমি ও রকম মন খারাপ করে রয়েছ? একে তো এই পোড়া সংসারে যথেষ্ট অসুখ আছে তার পরে আবার—

বিনোদবিহারী। বন্ধু লাগলে আরো অসহ্য হয়ে ওঠে।

নলিনাক্ষ। কী করলে তোমার দগ্ধ হৃদয়ে আমি একটুখানি সান্ত্বনা দিতে পারি ভাই।

বিনোদবিহারী। নলিন, তোর দুটি পায়ে পড়ি আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে এত অবিশ্রাম চেষ্টা করিসনে, মাঝে মাঝে একটু একটু হাঁপ ছাড়তে দিস।

নলিনাক্ষ। তুমি এখন কোথায় যাচ্ছ?

বিনোদবিহারী। বাড়ি যাচ্ছি।

নলিনাক্ষ। তবে আমিও তোমার সঙ্গে যাই। এখন তুমি সেখানে একলা, মনে করছি কিছু দিন তোমার সঙ্গে একত্র থেকে—

বিনোদবিহারী। না না, আমি শীঘ্রই আমার স্ত্রীকে ঘরে আনছি— নলিন, আজ ভাই তুমি চন্দরকে নিয়ে গোলদিঘিতে বেড়াতে যাও— আমাকে একটু ছুটি দিতেই হচ্ছে।

নলিনাক্ষ। (সনিশ্বাসে) তবে বিদায় ভাই! কিন্তু এই শেষ কথা বলে যাচ্ছি, যাঁদের তুমি তোমার প্রাণের বন্ধু বলে জান, তাঁরা তোমাকে হয়তো এক কথায় ত্যাগ করতে পারেন কিন্তু নলিনাক্ষ তোমাকে কখনোই ছাড়বে না।

বিনোদবিহারী। সে আমি খুবই জানি নলিন্।

নলিনাক্ষ। আর-এটা নিশ্চয় মনে রেখো, তুমি যা কর আমি তোমার পক্ষে আছি।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

নিবারণের অন্তঃপুর

ইন্দুমতী ও কমলমুখী

কমলমুখী। না ভাই ইন্দু, ও রকম করে তুই বলিসনে। তুই যতটা বাড়িয়ে দেখছিস আসলে ততটা কিছু নয়—

ইন্দুমতী। না তা কিছু নয়! তিনি অতি উত্তম কাজ করেছেন— বাঙালির ঘরে এতবড়ো মহাপুরুষ আর জন্মগ্রহণ করেননি— ওঁর মহত্ত্বের কথা সোনার জলে ছাপিয়ে কপালে মেরে ওঁকে একবার ঘরে ঘরে দেখিয়ে আনলে হয়! দিদি, এই ক-দিনে তোর বুদ্ধি খারাপ হয়ে গেছে। তুই কি বলতে চাস আমাদের বিনোদবাবু ভারি উদার স্বভাবের পরিচয় দিয়েছেন।

কমলমুখী। তুই ভাই সব কথা বড়ো বেশি বাড়িয়ে বলিস, ওটা তোর একটা দোষ ইন্দু। একবার ভালো করে ভেবে দেখ্‌ দেখি, হঠাৎ একজন লোককে বলা গেল আজ থেকে তুমি অমুক লোকটাকে ভালোবাসবে, সে যদি অমনি তক্‌খনি ঘোড়ায় চড়ে আদেশ পালন করতে না পারে তা হলে তাকে কি দোষ দেওয়া যায়। বিয়ের মন্তর সত্যি যদি ভালোবাসার মন্তর হত তা হলে খেমাপিসির এমন দুর্দশা কেন, তা হলে বিরাজদিদি এতকাল কেঁদে মরছেন কেন।

ইন্দুমতী। ভাই, তোকে দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি। বিয়ের মন্তর যে ভালোবাসার মন্তর নয় তা কে বলবে। আচ্ছা দিদি, এক রাত্তিরে তোর এত ভালোবাসা জন্মাল কোথা থেকে— বিয়ে হলে কী রকম মনে হয় আমাকে সত্যি করে বল্‌ দেখি।

কমলমুখী। কী জানি, বিয়ের পরেই মনে হয়, বিধাতা সমস্ত জগৎ থেকে একটি মানুষকে স্বতন্ত্র করে নিয়ে তার সমস্ত সুখদুঃখের ভার আমার উপর দিলেন— আমি তাকে দেখব, সেবা করব, যত্ন করব, তার সংসারের ভার লাঘব করব, আর-সকলের কাছ থেকে তার সমস্ত দোষ-দুর্বলতা আবরণ করে রেখে দেব। এইমাত্র যে তাকে বিয়ে করলুম তা মনে হয় না; মনে হয় আজন্ম কাল এবং জন্মাবার পূর্বে থেকে এই একমাত্র মানুষের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ হয়েছিল—

ইন্দুমতী। তোর যদি এতটা হল, তো বিনোদবাবুর হয় না কেন?

কমলমুখী। তুই বুঝিসনে ইন্দু, ওরা যে পুরুষমানুষ। আমাদের এক ভাব ওদের আর-এক ভাব। জানিসনে, মার কোলে ছেলেটি হবামাত্রই সে কালোই হোক আর সুন্দরই হোক তাকে সেই মুহূর্ত থেকে ভালোবাসতে না পারলে এ সংসার চলে না—তেমনি স্ত্রীর অদৃষ্টে যে-স্বামীই জোটে তক্ষুনি যদি সে তাকে ভালোবাসতে না পারে তা হলে সে স্ত্রীরই বা কী দশা হয় আর এই পৃথিবীই বা টেঁকে কী করে। মেয়েমানুষের ভালোবাসা সবুর করতে পারে না, বিধাতা তার হাতে সে অবসর দেন-নি। পুরুষমানুষ রয়ে বসে অনেক ঠেকে অনেক ঘা খেয়ে তার পরে ভালোবাসতে শেখে, ততদিন পৃথিবী সবুর করে থাকে, কাজের ব্যাঘাত হয় না।

ইন্দুমতী। ইস! কী সব নবাব! আচ্ছা, দিদি, তুই কি বলিস নিমে গয়লার সঙ্গে আজই যদি আমার বিয়ে হয় অমনি কাল ভোর থেকেই তাড়াতাড়ি তার চরণদুটো ধরে সেবা করতে বসে যাব— মনে করব, ইনি আমার চিরকালের গয়লা, আমার পূর্ব জন্মের গয়লা, বিধাতা এঁকে এবং এঁর অন্য গোরুগুলিকে গোয়ালসুদ্ধ আমারই হাতে সমর্পণ করে দিয়েছেন।

কমলমুখী। ইন্দু, তুই কী যে বকিস আমি তোর সঙ্গে পেরে উঠিনে! নিমে গয়লাকে তুই বিয়ে করতে যাবি কেন— সে একে গয়লা তাতে আবার তার দুই বিয়ে।

ইন্দুমতী। আচ্ছা না হয় নিমে গয়লা নাই হল—পৃথিবীতে নিমাইচন্দ্রের তো অভাব নেই।

কমলমুখী। তা তোর অদৃষ্টে যদি কোনো নিমাই থাকে তা হলে অবশ্যি তাকে ভালোবাসবি —

ইন্দুমতী। কক্খনো বাসব না! আচ্ছা তুমি দেখো। বিয়ে করেছি বলেই যে অমনি তার পরদিন থেকে নিমাই নিমাই করে খেপে বেড়াব আমাকে তেমন মেয়ে পাওনি। আমি দিদি, তোর মতন না ভাই! তোরা ওই রকম করিস বলেই তো পুরুষগুলোর দেমাক বেড়ে যায়। নইলে তাদের আছে কী? যেমন মূর্তি তেমনি স্বভাব! সাধে তাদের পায়া ভারি হয়— তোদের যে সেই পায়ে তেল দিতে একদণ্ড তর সয় না। তুই হাসছিস দিদি, কিন্তু আমি সত্যি বলছি, ঐ দাড়িমুখগুলো না হলে কি আর আমাদের একেবারে চলে না। কেন ভাই, তোতে আমাতে তো বেশ ছিলুম। আমাদের কিসের অভাব ছিল। মাঝখানে একজন অপরিচিত পুরুষ এসে আমাদের অপমান করে যায় কেন। যেন আমরা ওঁদের বাড়ির বাগানের বেগুন, ইচ্ছে করলেই তুলে নিতে পারেন, ইচ্ছে করলেই ফেলে দিতে পারেন। আচ্ছা, মনে

কর্‌ না, আমিই তোর স্বামী। আমি তোকে যত যত্ন করব, যত ভালোবাসব, তোর সাতগণ্ডা গোঁফদাড়ি তেমন পারবে না।

কমলমুখী। আসলে জানিস ইন্দু, ওদের না হলে আমাদের চলতে পারে কিন্তু আমাদের না হলে পুরুষমানুষের চলে না, সেই জন্যে ওদের আমরা ভালোবাসি। ওরা নিজের যত্ন নিজে করতে জানে না— ওদের সর্বদা সামলে রাখবার এবং দেখবার লোক একজন চাই। মনে হয় যেন আমাদের চেয়ে ওদের ঢের বেশি জিনিসের দরকার, ওদের মস্ত শরীর, মস্ত খিদে, মস্ত আবদার। আমাদের সব তাতেই চলে যায়, ওদের একটু কিছু হলেই একেবারে অস্থির হয়ে পড়ে। আমাদের মতো ওদের এমন মনের জোর নেই—ওরা এত সহ্য করতে পারে না। সেই জন্যেই তো ওদের এতটা বেশি ভালোবাসতে হয়, নইলে ওদের কী দশা হত।

নিবারণের প্রবেশ

নিবারণ। মা, তোমাকে দেখলে আমি চোখের জল রাখতে পারিনে। আমার মার কাছে আমি অপরাধী— তোমার কাছে আমার দাঁড়ানো উচিত হয় না।

কমলমুখী। কাকা, আপনি অমন করে বলবেন না, আমার অদৃষ্টে যা ছিল তাই হয়েছে—

ইন্দুমতী। বাবা, আসলে যার অপরাধ তাকে কিছু না বলে তার অপরাধ তোমরা পাঁচ জনে কেন ভাগ করে নিচ্ছ আমি তো বুঝতে পারিনে।

নিবারণ। থাক্‌ মা, সে-সব আলোচনা থাক্‌— এখন একটা কাজের কথা বলি, কমল, মন দিয়ে শোনো। তোমাকে এতদিন গরিবের মেয়ে বলে পরিচয় দিয়ে এসেছি, সে-কথাটা ঠিক নয়। তোমার বাপের বিষয়সম্পত্তি নিতান্ত সামান্য ছিল না— আমারই হাতে সে সমস্ত আছে— ইতিমধ্যে অনেক টাকা জমেছে এবং সুদেও বেড়েছে। তোমার বাপ বলে গিয়েছিলেন তোমার কুড়ি বৎসর বয়স হলে তবে এই সমস্ত বিষয়সম্পত্তি তোমার হাতে দেওয়া হয়। তাঁর আশঙ্কা ছিল পাছে তোমার বিষয়ের লোভে কেউ তোমাকে বিবাহ করে, তার পরে মদ খেয়ে অসৎ ব্যয় করে উড়িয়ে দেয়! তোমার বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে বিষয় পেলে তুমি তার ইচ্ছামতো ব্যবহার করতে পারবে। যদিও তোমার সে বয়স হয়নি, কিন্তু সুবুদ্ধিতে তোমার সমান আর কে আছে মা! অতএব তোমার সমস্ত বিষয় তুমি এখনই নাও। খুব সম্ভব তা হলে তোমার স্বামীও তোমার কাছে আপনি এসে ধরা দেবে।

ইন্দুমতী। (কানে কানে) বেশ হয়েছে ভাই, এইবার তুই খুব জব্দ করে নিস !

কমলমুখী। কাকা, তাঁকে আপনি এ সংবাদ দেবেন না। আর, এ কথাটা যাতে কেউ টের না পায় আপনাকে তাই করতে হবে।

নিবারণ। কেন বলো দেখি মা।

কমলমুখী। একটু কারণ আছে। সমস্তটা ভেবে আপনাকে পরে বলব।

নিবারণ। আচ্ছা। [প্রস্থান

ইন্দুমতী। তোর মতলবটা কী আমাকে বল্ তো।

কমলমুখী। আমি আর-একটা বাড়ি নিয়ে ছদ্মবেশে ওঁর কাছে অন্য স্ত্রীলোক বলে পরিচয় দেব।

ইন্দুমতী। সে তো বেশ হবে ভাই। তাহলে আবার তোর সঙ্গে তার ভাব হবে। ওরা ঠিক নিজের স্ত্রীকে ভালোবেসে সুখ পায় না। কিন্তু বরাবর রাখতে পারবি তো ?

কমলমুখী। বরাবর রাখবার ইচ্ছে তো আমার নেই বোন—

ইন্দুমতী। ফের আবার এক দিন স্বামী-স্ত্রী সাজতে হবে না কি।

কমলমুখী। হাঁ ভাই, যতদিন যবনিকাপতন না হয়।

তৃতীয় দৃশ্য

নিমাইয়ের ঘর

নিমাই ও শিবচরণ

শিবচরণ। এই বুড়োবয়েসে তুই যে একটা সামান্য বিষয়ে আমাকে এত দুঃখ দিবি তা কে জানত।

নিমাই। বাবা, এটা কি সামান্য বিষয় হল।

শিবচরণ। আরে বাপু, সামান্য না তো কী। বিয়ে করা বই তো নয়। রাস্তার মুটেমজুরগুলোও যে বিয়ে করছে। ওতে তো খুব বেশি বুদ্ধি খরচ করতে হয় না, বরঞ্চ কিছু টাকা খরচ আছে, তা সেও বাপমায়ে জোগায়। তুই এমন বুদ্ধিমান ছেলে, এতগুলো পাশ করে শেষকালে এইখানে এসে ঠেকল ?

নিমাই। আপনি তো সব শুনেছেন— আমি তো বিয়ে করতে অসম্মত নই—

শিবচরণ। আরে, তাতেই তো আমার বুঝতে আরো গোল বেধেছে। যদি বিয়ে করতেই আপত্তি না থাকে তবে না হয় একটাকে না করে আর-একটাকেই করলি। নিবারণকে কথা দিয়েছি— আমি তার কাছে মুখ দেখাই কী করে।

নিমাই। নিবারণবাবুকে ভালো করে বুঝিয়ে বললেই সব—

শিবচরণ। আরে, আমি নিজে বুঝতে পারিনে, নিবারণকে বোঝাব কী। আমি যদি তোর মাকে বিয়ে না করে তোর মাসিকে বিয়ে করবার প্রস্তাব মুখে আনতুম, তা হলে তোর ঠাকুরদাদা কি আমার দুখানা হাড় একত্র রাখত। পড়েছিস ভালোমানুষের হাতে—

নিমাই। শুনেছি আমার ঠাকুর্দামশায়ের মেজাজ ভালো ছিল না—

শিবচরণ। কী বলিস বেটা! মেজাজ ভালো ছিল না! তোর বাবার চেয়ে তিন-শ গুণে ভালো ছিল! কিছু বলিনে বলে বটে!— সে যা হোক, এখন যা হয় একটা কথা ঠিক করেই বল্।

নিমাই। আমি তো বরাবর এক কথাই বলে আসছি।

শিবচরণ। (সরোষে) তুই তো বলছিস এক কথা। আমিই কি এক কথার বেশি বলছি। মাঝের থেকে কথা যে আপনিই দুটো হয়ে যাচ্ছে। আমি এখন নিবারণকে বলি কী। তা সে যা হোক, তুই তা হলে নিবারণের মেয়ে ইন্দুমতীকে কিছুতেই বিয়ে করবিনে? যা বলবি এক কথা বল্।

নিমাই। কিছুতেই না বাবা।

শিবচরণ। একমাত্র বাগবাজারের কাদম্বিনীকেই বিয়ে করবি? ঠিক করে বলিস।

নিমাই। সেই রকমই স্থির করেছি—

শিবচরণ। বড়ো উত্তম কাজ করেছ— এখন আমি নিবারণকে কী বলব?

নিমাই। বলবেন, আপনার অবাধ্য ছেলে তাঁর কন্যা ইন্দুমতীর যোগ্য নয়।

শিবচরণ। কোথাকার নির্লজ্জ! আমাকে আর তোর শেখাতে হবে না। কী বলতে হবে তা আমি বিলক্ষণ জানি। তবে ওর আর কিছুতেই নড়চড় হবে না?

নিমাই। না বাবা, সেজন্যে আপনি ভাববেন না।

শিবচরণ। আরে ম'ল! আমি সেই জন্যেই ভেবে মরছি আর-কি। আমি ভাবছি, নিবারণকে বলি কী!

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সুসজ্জিত গৃহ

বিনোদবিহারী

বিনোদবিহারী। এরা বেছে বেছে এত দেশ থাকতে আমাকে উকিল পাকড়ালে কী করে আমি তাই ভাবছি। আমার অদৃষ্ট ভালো বলতে হবে। এখন টিকতে পারলে হয়। যখন মেয়ে প্রভু তখন একটু একটু আশা হয়—একবার কোনো সুযোগে মনটি জোগাড় করতে পারলে স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আর কোনো ভাবনা নেই। তা বলি, স্ত্রীলোকের থাকবার স্থান এই বটে। ওরা যে রানীর জাত, দারিদ্র্য ওদের আদবে শোভা পায় না। পুরুষমানুষ জন্মগরিব—সাজসজ্জা ঐশ্বর্য অলংকার আমাদের তেমন মানায় না। সেই জন্যই তো লক্ষ্মী যেমন সৌন্দর্যের দেবতা তেমনি ধনের দেবতা। শিবটা হল ভিক্ষুক আর দুর্গা হলেন অন্নপূর্ণা। মেয়েমানুষ একেবারে ভরা ভাণ্ডারের মাঝখানে এসে দাঁড়াবে চারি দিক ঝলসে দেবে— কোথাও যে কিছু অভাব আছে তা কারো চোখে পড়বে না, মনে থাকবে না। আর আমরা গোলাম ওঁদের জন্যে দিনরাত্রি মজুরি করে মরব। বাস্তবিক, ভেবে দেখতে গেলে পুরুষরা যে এত বেশি খেটে মরে সে কেবল মেয়েরা খাটবার জন্যে হয়নি বলে,—পাছে ওঁদেরও খাটতে হয়, সেই জন্যে পুরুষকে পুরুষ আর মেয়ে দুয়ের জন্যেই একলা খেটে দিতে হয়—এই জন্যেই পুরুষের চেহারা এবং ভাবখানা এমন চোয়াড়ের মতো—কেবল খেটে খাবার উপযুক্ত—খাটুনির মতো এমন আর কিছু তাকে শোভা পায় না। রানী বসন্তকুমারীকে বোধ করি এই অতুল ঐশ্বর্যেরই উপযুক্ত দেখতে হবে। আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি তাঁর এমন একটি মহিমা আছে যে, তাঁর পায়ের নিচে পৃথিবী নিজের ধুলোমাটির জন্যে ভারি অপ্রতিভ হয়ে পড়ে আছে। কী করবে, বেচারার নড়ে বসবার জায়গা নেই।

ঘোমটা পরিয়া কমলমুখীর প্রবেশ

যা মনে করেছিলুম তাই বটে। আহা, মুখটি দেখতে পেলে বেশ হত।—আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন?

কমলমুখী। হাঁ। আপনি বোধ হয় আমার অবস্থা সবই জানেন।

বিনোদবিহারী। কিছু কিছু শুনেছি।— গলাটা যে তারই মতন শোনাচ্ছে। সব মেয়েরই গলা প্রায় একরকম দেখছি। কিন্তু তার চেয়ে কত মিষ্টি!

কমলমুখী। আমার পুরুষ অভিভাবক কেউ নেই—বিবাহ করিনি পাছে স্বামী আমার চেয়ে আমার বিষয়সম্পত্তির বেশি আদর করেন—পাছে শাঁসটুকু নিয়ে আমাকে খোলার মতো ফেলে দেন।

বিনোদবিহারী। আপনি আমাকে বৈষয়িক পরামর্শের জন্যে ডেকেছেন, অন্য কোনো বিষয়ে কথা বলা আমার উচিত হয় না; কিন্তু মানুষের মানসিক বিষয়েও আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে। আপনি বোধ হয় শুনে থাকবেন আমি অবসরমতো কিঞ্চিৎ সাহিত্যচর্চাও করে থাকি।—আমাকে ক্ষমা করবেন, কিন্তু বিবাহ সম্বন্ধে আপনি যে রকম ভাবছেন ওটা আপনার ভুল। যেমন বোঁটার সঙ্গে ফুল তেমনি ধনের সঙ্গে স্ত্রী। অর্থাৎ ধন থাকলে স্ত্রীকে গ্রহণ করবার সুবিধা হয়—নইলে তাকে বেশ সুচারুরূপে ধরে রাখবার সুযোগ হয় না। অনেক সময় বোঁটা নেই বলে ফুল হাত থেকে পড়ে যায়, কিন্তু এতবড়ো অরসিক মূর্খ কে আছে যে ফুল ফেলে দিয়ে বোঁটাটি রেখে দেয়!

কমলমুখী। আমি পুরুষজাতকে ভালো চিনিনে, কাজেই সাহস পাইনে। যাই হোক, সংসারকার্যে পুরুষেরা যতই অনাবশ্যক হোক বিষয়কর্ম তাদের না হলে চলে না। তাই আমি আমার সমস্ত বিষয়সম্পত্তির অধ্যক্ষতার ভার আপনার উপর দিতে ইচ্ছে করি—

বিনোদবিহারী। আমার প্রাণপণ সাধ্যে আমি আপনার কাজ করে দেব। সে যে কেবল বেতনের প্রত্যাশায়, অনুগ্রহ করে তা মনে করবেন না। আমাকে কেবলমাত্র আপনার ভৃত্য বলে জানবেন না, আমি—

কমলমুখী। না, না, আপনি ভৃত্যের ভাবে থাকবেন কেন—আপনাকে আমার বন্ধুস্বরূপ জ্ঞান করব—আপনি মনে করবেন যেন আপনারই কাজ আপনি করছেন—

বিনোদবিহারী। তার চেয়ে ঢের বেশি মনে করব—কারণ, এ পর্যন্ত কখনো আপনার কাজে আপনি যথেষ্ট মন দিইনি। নিজের স্বার্থরক্ষার চেয়ে উচ্চতর মহত্তর কর্তব্য যেমনভাবে সম্পন্ন করতে হয় আমি তেমনি ভাবে কাজ করব— দেবতার কাজ যেমন প্রাণপণে—

কমলমুখী। না, না, আপনি অতটা বেশি কিছু ভাববেন না। আমার সম্পত্তি আপনি দেবোত্তর সম্পত্তি মনে করবেন না। কেবল এইটুকু মনে করলেই যথেষ্ট হবে যে,

একজন অনাথা অবলা একান্ত বিশ্বাসপূর্বক আপনার হাতে তার যথাসর্বস্ব সমর্পণ করছে—

বিনোদবিহারী। আপনি আমার উপর এই বিশ্বাস স্থাপন করে আমাকে যে কতখানি অনুগ্রহ করলেন তা আমি বলতে পারিনে। আপনাকে তবে সত্যি কথা বলি, আমি নিতান্ত একটা লক্ষ্মীছাড়া অকর্মণ্য লোক, বোধ হয় শূন্য অহংকারে ফুলে উঠে স্রোতের ফেনার মতো মৃত্যুকাল পর্যন্ত কেবল ভেসে ভেসে বেড়াতুম—আপনার এই বিশ্বাসে আমাকে মানুষ করে তুলবে, আমার জীবনের একটা উদ্দেশ্য হবে—আমি—

কমলমুখী। আপনি এত কথা কেন বলছেন আমি বুঝতে পারছিনে—আমার এ অতি সামান্য কাজ—এর সঙ্গে আপনার জীবনের উদ্দেশ্যের যোগ কী?

বিনোদবিহারী। কাজ যেমনই হোক না, আপনাদের বিশ্বাস আমাদের যে কত বল দেয় তা আপনারা জানেন না। এই একজন অজ্ঞাত অপরিচিত পুরুষের প্রতি আপনি যে এমন অসন্দিগ্ধভাবে নির্ভর স্থাপন করলেন এ জন্যে আপনাকে কখনোই এক মুহূর্তের জন্যও একতিল অনুতাপ করতে হবে না।

কমলমুখী। আপনার কথায় আমি বড়ো নিশ্চিন্ত হলুম। আমার একটা মস্ত ভার দূর হল। আপনাকে আর বেশিক্ষণ আবদ্ধ করে রাখতে চাইনে, আপনার বোধ করি অনেক কাজ আছে—

বিনোদবিহারী। না, না, সে জন্যে আপনি ভাববেন না। আমার সহস্র কাজ থাকলেও সমস্ত পরিত্যাগ করে আমি—

কমলমুখী। তা হলে আমার কর্মচারীদের কাছ থেকে আপনি সমস্ত বুঝে পড়ে নিন। নিবারণবাবু এখনই আসবেন, তিনি এলে তাঁর কাছ থেকেও অনেকটা জেনেশুনে নিতে পারবেন।

বিনোদবিহারী। নিবারণবাবু?

কমলমুখী। আপনি তাঁকে চেনেন বোধ হয়, কারণ তিনিই প্রথমে আপনার জন্যে আমার কাছে অনুরোধ করে দিয়েছেন।

বিনোদবিহারী। (স্বগত) ছি ছি ছি, বড়ো লজ্জা বোধ হচ্ছে। আমি কালই আমার স্ত্রীকে ঘরে নিয়ে আসব। এখন তো আমার কোনো অভাব নেই।

কমলমুখী। তবে আমি আসি। [প্রস্থান

বিনোদবিহারী। না, এ রকম স্ত্রীলোক আমি কখনো দেখিনি। কেমন বুদ্ধি, কেমন বেশ আপনাকে আপনি যেন ধারণ করে রেখেছেন। জড়োসড়ো নির্বোধ কাঁচুমাচু ভাব কিছু নেই, অথচ কেমন সলজ্জ সসম্ভ্রম ব্যবহার। আমার মতো একজন

অপরিচিত পুরুষের প্রতি এতটা পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভরের কথা বললেন অথচ সেটা কেমন স্বাভাবিক সরল শুনতে হল— কিছুমাত্র বাড়াবাড়ি মনে হল না। এই রকম স্ত্রীলোক দেখলে পুরুষগুলোকে নিতান্ত আনাড়ি জড়ভরত মনে হয়। এই দুটি-চারটি কথা কয়েই মনে হচ্ছে যেন ওঁর সঙ্গে আমার চিরকালের জানাশোনা আছে— যেন ওঁর কাজ করা, ওঁর সেবা করা আমার একটা পরম কর্তব্য। কিন্তু নিবারণবাবুর সঙ্গে রানীর আলাপ আছে শুনে আমার ভয় হচ্ছে পাছে আমার স্ত্রীর কথা সমস্ত শুনতে পান। ছি ছি, সে বড়ো লজ্জার বিষয় হবে। উনি হয়তো ঠিক আমার মনের ভাবটা বুঝতে পারবেন না, আমাকে কী মনে করবেন কে জানে। আমি আজই নিবারণবাবুর বাড়ি গিয়ে আমার স্ত্রীকে নিয়ে আসব।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কমলমুখীর গৃহ

নিবারণ ও কমলমুখী

কমলমুখী। আমার জন্যে আপনি আর কিছু ভাববেন না— এখন ইন্দুর এই গোলটা চুকে গেলেই বাঁচা যায়!

নিবারণ। তাই তো মা, আমাকে ভারি ভাবনা ধরিয়ে দিয়েছে। আমি এদিকে শিবু ডাক্তারের সঙ্গে কথাবার্তা একরকম স্থির করে বসে আছি, এখন তাকেই বা কী বলি, ললিত চাটুজ্যেকেই বা কোথায় পাওয়া যায়, আর সে বিয়ে করতে রাজি হয় কি না তাই বা কে জানে।

কমলমুখী। সে জন্যে ভাববেন না কাকা। আমাদের ইন্দুকে চোখে দেখলে বিয়ে করতে নারাজ হবে এমন ছেলে কেউ জন্মায়নি।

নিবারণ। ওদের দেখাশুনা হয় কী করে।

কমলমুখী। সে আমি সব ঠিক করেছি।

নিবারণ। তুমি কী করে ঠিক করলে মা।

কমলমুখী। আমি ওঁকে বলে দিয়েছি ওঁর সমস্ত বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে। তা হলে সেই সঙ্গে ললিতবাবুও আসবেন, তার পর একটা কোনো উপায় বের করা যাবে।

নিবারণ। তা সব যেন হ'ল, আমি ভাবছি শিবুকে কী বলব।

কমলমুখী। ঐ উনি আসছেন। আমি তবে যাই। [প্রস্থান

বিনোদবিহারীর প্রবেশ

বিনোদবিহারী। এই যে, আমি এখনই আপনার ওখানেই যাচ্ছিলুম।

নিবারণ। কেন বাপু, আমার ওখানে তো তোমার কোনো মক্কেল নেই।

বিনোদবিহারী। আজ্ঞে, আমাকে আর লজ্জা দেবেন না— আপনি বুঝতেই পারছেন—

নিবারণ। না বাপু, আমি এখনকার কিছুই বুঝতে পারিনে— একটু পরিষ্কার করে খুলে না বললে তোমাদের কথাবার্তা রকমসকম আমার ভালোরূপ ধারণা হয় না।

বিনোদবিহারী। আমার স্ত্রী আপনার ওখানে আছেন—

নিবারণ। তা অবশ্য— তাঁকে তো আমরা ত্যাগ করতে পারিনে—

বিনোদবিহারী। আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে তাঁকে যদি আমার ওখানে পাঠিয়ে দেন—

নিবারণ। বাপু, আবার কেন পালকিভাড়াটা লাগাবে ?

বিনোদবিহারী। আপনারা আমাকে কিছু ভুল বুঝছেন। আমার অবস্থা খারাপ ছিল বলেই আমার স্ত্রীকে আপনার ওখানে পাঠিয়েছিলুম, নইলে তাঁকে ত্যাগ করবার অভিপ্রায় ছিল না। এখন আপনারই অনুগ্রহে আমার অবস্থা অনেকটা ভালো হয়েছে— এখন অনায়াসে—

নিবারণ। বাপু, এ তো তোমার পোষা পাখি নয়। সে যে সহজে তোমার ওখানে যেতে রাজি হবে এমন আমার বোধ হয় না।

বিনোদবিহারী। আপনি অনুমতি দিলে আমি নিজে গিয়ে তাঁকে অনুনয়-বিনয় করে নিয়ে আসতে পারি।

নিবারণ। আচ্ছা সে বিষয়ে বিবেচনা করে পরে বলব। [প্রস্থান

বিনোদবিহারী। বুড়োও তো কম একগুঁয়ে নয় দেখছি। যা হোক এ পর্যন্ত রানীকে কিছু বলেনি বোধ হয়।

চন্দ্রকান্তের প্রবেশ

বিনোদবিহারী। কী হে চন্দর।

চন্দ্রকান্ত। আর ভাই, মহা বিপদে পড়েছি।

বিনোদবিহারী। কেন, কী হয়েছে।

চন্দ্রকান্ত। কী জানি ভাই, কখন তোদের সাক্ষাতে কথায় কথায় কী কতকগুলো মিছে কথা বলেছিলুম, তাই শুনে ব্রাহ্মণী বাপের বাড়ি এমনি গা-ঢাকা হয়েছেন যে, কিছুতেই তাঁর আর নাগাল পাচ্ছিনে।

বিনোদবিহারী। বল কী দাদা। তোমার বাড়িতে তো এ দণ্ডবিধি পূর্বে প্রচলিত ছিল না।

চন্দ্রকান্ত। না ভাই, কালক্রমে কতই যে হচ্ছে কিছু বুঝতে পারছিনে। ইদিকে আবার দাসী পাঠিয়ে দু-বেলা খোঁজ নেওয়া আছে, তা আমি জানতে পাই। আবার শাশুড়ী-ঠাকরুনের নাম করে যথাসময়ে অন্নব্যঞ্জনও আসে। মনে করি রাগ করে খাব না; কিন্তু ভাই, খিদের সময়ে আমি না খেয়ে থাকতে পারিনে তা যতই রাগ হোক।

বিনোদবিহারী। তবে তোমার ভাবনা কী। যদি শ্বশুড়বাড়ি থেকে আর সমস্তই পাচ্ছ, না হয় একটি বাকি রইল।

চন্দ্রকান্ত। না বিনু, তোরা ঠিক বুঝতে পারবিনে। তুই সেদিন বলছিলি বিয়ে না-করাটাই তোর মুখস্থ হয়ে গেছে। আমার ঠিক তার উলটো। প্রায় সমস্ত জীবন ধরে ওই স্ত্রীটিকে এমনি বিশ্রী অভ্যেস করে ফেলেছি যে, হঠাৎ বুকের হাড়-কখানা খসে গেলে যেমন একদম খালি-খালি ঠেকে, ওই স্ত্রীটি আড়াল হলেও তেমনি নেহাত ফাঁকা বোধ হয়। মাইরি, সন্ধের পর আমার সে ঘরে আর ঢুকতে ইচ্ছে করে না।

বিনোদবিহারী। এখন উপায় কী।

চন্দ্রকান্ত। মনে করছি আমি উলটে রাগ করব। আমিও ঘর ছেড়ে চলে আসব। তোর এখানেই থাকব। আমার বন্ধুদের মধ্যে তোকেই সে সব চেয়ে বেশি ভয় করে। তার বিশ্বাস, তুই আমার মাথাটি খেয়েছিস; আমি তাকে বলি, আমার এ ঝুনো মাথায় বিনুর দন্তস্ফুট করবার জো নেই, কিন্তু সে বোঝে না। সে যদি খবর পায় আমি চব্বিশ ঘণ্টা তোর সংসর্গে কাটিয়েছি, তা হলে পতিত-উদ্ধারের জন্যে পতিতপাবনী অমনি তৎক্ষণাৎ ছুটে চলে আসবে!

বিনোদবিহারী। তা বেশ কথা। তুমি এখানেই থাকো, যতক্ষণ তোমার সঙ্গ পাওয়া যায় ততক্ষণই লাভ। কিন্তু আমাকে যে আবার শ্বশুরবাড়ি যেতে হচ্ছে।

চন্দ্রকান্ত। কার শ্বশুরবাড়ি।

বিনোদবিহারী। আমার নিজের, আবার কার।

চন্দ্রকান্ত। (সানন্দে বিনোদের পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিয়া) সত্যি বলছিস বিনু?

বিনোদবিহারী। হাঁ ভাই, নিতান্ত লক্ষ্মীছাড়ার মতো থাকতে আর ইচ্ছে করছে না। স্ত্রীকে ঘরে এনে একটু ভদ্রলোকের মতো হতে হচ্ছে। বিবাহ করে আইবুড়ো থাকলে লোকে বলবে কী।

চন্দ্রকান্ত। সে আর আমাকে বোঝাতে হবে না— কিন্তু এতদিন তোর এ আক্কেল ছিল কোথায়। যতকাল আমার সংসর্গে ছিলি এমন সব সদালাপ সৎপ্রসঙ্গ তো শুনতে পাইনি, দু-দিন আমার দেখা পাসনি আর তোর বুদ্ধি এতদূর পরিষ্কার হয়ে এল? যা হোক তা হলে আর বিলম্বে কাজ নেই— এখনি চল্— শুভবুদ্ধি মানুষের মাথায় দৈবাৎ উদয় হয় তখন তাকে অবহেলা করা কিছু নয়।

তৃতীয় দৃশ্য

কমলমুখীর গৃহ

ইন্দুমতী ও কমলমুখী

কমলমুখী। তোর জ্বালায় তো আর বাঁচিনে ইন্দু। তুই আবার এ কী জট পাকিয়ে বসে আছিস। ললিতবাবুর কাছে তোকে কাদম্বিনী বলে উল্লেখ করতে হবে না কি?

ইন্দুমতী। তা কী করব দিদি। কাদম্বিনী না বললে যদি সে না চিনতে পারে তা হলে ইন্দু বলে পরিচয় দিয়ে লাভটা কী।

কমলমুখী। ইতিমধ্যে তুই এত কাণ্ড কখন করে তুললি তা তো জানিনে। একটা যে আস্ত নাটক বানিয়ে বসেছিস।

ইন্দুমতী। তোমার বিনোদবাবুকে বোলো, তিনি লিখে ফেলবেন এখন, তার পর মেট্রপলিটান থিয়েটারে অভিনয় দেখতে যাব।

কমলমুখী। তোমার ললিতবাবু সাজতে পারে এমন ছোকরা কি তারা কোথাও খুঁজে পাবে। তুই হয়তো মাঝখান থেকে "ও হয়নি, ও হয়নি" বলে চেঁচিয়ে উঠবি।

ইন্দুমতী। ওই ভাই, তোমার বিনোদবাবু আসছেন, আমি পালাই। [প্রস্থান

বিনোদবিহারীর প্রবেশ

বিনোদবিহারী। মহারানী, আমার বন্ধুরা এলে কোথায় তাঁদের বসাব।

কমলমুখী। এই ঘরেই বসাবেন।

বিনোদবিহারী। ললিতের সঙ্গে আপনার যে বন্ধুর বিবাহ স্থির করতে হবে তাঁর নামটি কী।

কমলমুখী। কাদম্বিনী। বাগবাজারের চৌধুরীদের মেয়ে।

বিনোদবিহারী। আপনি যখন আদেশ করছেন আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। কিন্তু ললিতের কথা আমি কিছুই বলতে পারিনে। সে যে এ-সব প্রস্তাবে আমাদের কারো কথায় কর্ণপাত করবে এমন বোধ হয় না—

কমলমুখী। আপনাকে সে জন্যে বোধ হয় বেশি চেষ্টা করতেও হবে না— কাদম্বিনীর নাম শুনলেই তিনি আর বড়ো আপত্তি করবেন না।

বিনোদবিহারী। তা হলে তো আর কথাই নেই।

কমলমুখী। মাপ করেন যদি আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।

বিনোদবিহারী। এখনি। (স্বগত) স্ত্রীর কথা না তুললে বাঁচি!

কমলমুখী। আপনার স্ত্রী নেই কি।

বিনোদবিহারী। কেন বলুন দেখি। স্ত্রীর কথা কেন জিজ্ঞাসা করছেন।

কমলমুখী। আপনি তো অনুগ্রহ করে এই বাড়িতেই বাস করছেন, তা হলে আপনার স্ত্রীকে আমি আমার সঙ্গিনীর মতো করে রাখতে চাই। অবিশ্যি যদি আপনার কোনো আপত্তি না থাকে।

বিনোদবিহারী। আপত্তি! কোনো আপত্তিই থাকতে পারে না। এ তো আমার সৌভাগ্যের কথা।

কমলমুখী। আজ সন্ধের সময় তাঁকে আনতে পারেন না?

বিনোদবিহারী। আমি বিশেষ চেষ্টা করব। [কমলের প্রস্থান

কিন্তু কী বিপদেই পড়েছি। এদিকে আবার আমার স্ত্রী কিছুতেই আমার বাড়ি আসতে চায় না— আমার সঙ্গে দেখা করতেই চায় না। কী যে করি ভেবে পাইনে। অনুনয় করে একখানা চিঠি লিখতে হচ্ছে।

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। একটি সাহেব-বাবু এসেছেন।

বিনোদবিহারী। এইখানেই ডেকে নিয়ে আয়।

সাহেবি বেশে ললিতের প্রবেশ

ললিত। (শেকহাণ্ড করিয়া) Well! How goes the world? ভালো তো?

বিনোদবিহারী। এক রকম ভালোয় মন্দয়। তোমার কী রকম চলছে?

ললিত। Pretty well! জান, I am going in for studentship next year!

বিনোদবিহারী। ওহে, আর কত দিন একজামিন দিয়ে মরবে? বিয়েথাওয়া করতে হবে না, না কি। এদিকে যৌবনটা যে ভাঁটিয়ে গেল।

ললিত। Hallo! you seem to have queer ideas on the subject! কেবল যৌবনটুকু নিয়ে one can't marry! I suppose first of all you must get a girl whom you—

বিনোদবিহারী। আহা তা তো বটেই। আমি কি বলছি তুমি তোমার নিজের হাতপাগুলোকে বিয়ে করবে? অবশ্যি মেয়ে একটি আছে।

ললিত। I know that! একটি কেন। মেয়ে there is enough and to spare! কিন্তু তা নিয়ে তো কথা হচ্ছে না।

বিনোদবিহারী। আহা, তোমাকে নিয়ে তো ভালো বিপদে পড়া গেল। পৃথিবীর সমস্ত কন্যাদায় তোমাকে হরণ করতে হবে না। কিন্তু যদি একটি বেশ সুন্দরী সুশিক্ষিত বয়ঃপ্রাপ্ত মেয়ে তোমাকে দেওয়া যায় তা হলে কী বল?

ললিত। I admire your cheek. বিনু। তুমি wife select করবে আর আমি marry করব! I don't see any rhyme or reason in such co-operation। পোলিটিক্যাল ইকনমিতে division of labour আছে কিন্তু there is no such thing in marriage।

বিনোদবিহারী। তা বেশ তো, তুমি দেখো, তার পরে তোমার পছন্দ না হয় বিয়ে কোরো না—

ললিত। My dear fellow, you are very kind! কিন্তু আমি বলি কি, you need not bother yourself about my happiness! আমার বিশ্বাস আমি যদি কখনো কোনো girlকে love করি I will love her without your help এবং তার পরে যখন বিয়ে করব you'll get your invitation in due form!

বিনোদবিহারী। আচ্ছা ললিত, যদি সে মেয়েটির নাম শুনলেই তোমার পছন্দ হয়?

ললিত। The idea! নাম শুনে পছন্দ! যদি মেয়েটিকে বাদ দিয়ে simply নামটিকে বিয়ে করতে বল, that's a safe proposition!

বিনোদবিহারী। আগে শোনো, তার পর যা বলতে হয় ব'লো— মেয়েটির নাম— কাদম্বিনী।

ললিত। কাদম্বিনী! She may be all that is nice and good কিন্তু I must confess তার নাম নিয়ে তাকে congratulate করা যায় না। যদি তার নামটাই তার best qualification হয় তা হলে I should try my luck in some other quarter!

বিনোদবিহারী। (স্বগত) এর মানে কী। তবে যে রানী বললেন কাদম্বিনীর নাম শুনলেই লাফিয়ে উঠবে। দূর হোকগে। একে খাওয়ানোটাই বাজে খরচ হল— আবার এই ম্লেচ্ছটার সঙ্গে আরো আমাকে নিদেন দু-ঘণ্টা কাল কাটাতে হবে দেখছি।

ললিত। I say, it's infernally hot here— চলো না বারান্দায় গিয়ে বসা যাক।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কমলমুখীর অন্তঃপুর

কমলমুখী ও ইন্দুমতী

ইন্দুমতী। দিদি, আর বলিসনে, দিদি, আর বলিসনে। পুরুষমানুষকে আমি চিনেছি। তুই বাবাকে বলিস আমি আর কাউকে বিয়ে করব না।

কমলমুখী। তুই ললিতবাবু থেকে সব পুরুষ চিনলি কী করে ইন্দু।

ইন্দুমতী। আমি জানি, ওরা কেবল কবিতায় ভালোবাসে, তা ছন্দ মিলুক আর না মিলুক। তার পরে যখন সুখদুঃখ সমেত ভালোবাসার সমস্ত কর্তব্যভার মাথায় করবার সময় আসে তখন ওদের আর সাড়া পাওয়া যায় না। ছি ছি ছি ছি, দিদি, আমার এমনি লজ্জা করছে! ইচ্ছে করছে মাটির সঙ্গে মাটি হয়ে মিশে যাই। বাবাকে আমার এ মুখ দেখাব কী করে। কাদম্বিনীকে সে চেনে না? মিথ্যেবাদী! কাদম্বিনীর নামে কবিতা লিখেছে সে-খাতা এখনো আমার কাছে আছে।

কমলমুখী। যা হয়ে গেছে তা নিয়ে ভেবে আর করবি কী। এখন কাকা যাকে

বলছেন তাকে বিয়ে কর্‌। তুই কি সেই মিথ্যেবাদী অবিশ্বাসীর জন্যে চিরজীবন কুমারী হয়ে থাকবি। একে বেশি বয়স পর্যন্ত মেয়ে রাখার জন্যে কাকাকে প্রায় একঘরে করেছে।

ইন্দুমতী। তা, দিদি, কলাগাছ তো আছে। সে তো কোনো উৎপাত করে না। ঐ বাবা আসছেন, আমি যাই ভাই। [প্রস্থান

নিবারণের প্রবেশ

নিবারণ। কী করি বল্‌ তো মা। ললিত চাটুজ্যে যা বলেছে সে তো সব শুনেছিস। সে বিনোদকে কেবল মারতে বাকি রেখেছে, অপমান যা হবার তা হয়েছে।

কমলমুখী। না কাকা, তার কাছে ইন্দুর নাম করা হয়নি, আপনার মেয়ের কথা হচ্ছে তাও সে জানে না।

নিবারণ। ইদিকে আবার শিবুকে কথা দিয়েছি তাকেই বা কী বলি। আবার মেয়ের পছন্দ না হলে জোর করে বিয়ে দেওয়া সে আমি পারব না— একটি যা হয়ে গেছে তারই অনুতাপ রাখবার জায়গা পাচ্ছিনে। তুমি মা, ইন্দুকে বলে কয়ে ওদের দু-জনের দেখা করিয়ে দিতে পার তো বড়ো ভালো হয়। আমি নিশ্চয় জানি ওরা পরস্পরকে এক বার দেখলে পছন্দ না করে থাকতে পারবে না। নিমাই ছেলেটিকে বড়ো ভালো দেখতে— তাকে দর্শনমাত্রেই স্নেহ জন্মায়।

কমলমুখী। নিমাইয়ের মনের ইচ্ছে কী সেটাও তো জানতে হবে কাকা। আবার কি এইরকম একটি কাণ্ড বাধানো ভালো।

নিবারণ। সে আমি তার বাপের কাছে শুনেছি। সে বলে আমি উপার্জন না করে বিয়ে করব না। সে তো আমার মেয়েকে কখনো চক্ষে দেখেনি। একবার দেখলে ও-সব কথা ছেড়ে দেবে। বিশেষ, তার বাপ তাকে খুব পীড়াপীড়ি করছে। আমি চন্দ্রবাবুকে বলে তাকে একবার ইন্দুর সঙ্গে দেখা করতে রাজি করব। চন্দ্রবাবুর কথা সে খুব মানে।

কমলমুখী। তা ইন্দুকে আমি সম্মত করাতে পারব। [নিবারণের প্রস্থান

ইন্দুমতীর প্রবেশ

কমলমুখী। লক্ষ্মী দিদি আমার, আমার একটি অনুরোধ তোকে রাখতে হবে।

ইন্দুমতী। কী বল্‌ না ভাই।

কমলমুখী। একবার নিমাইবাবুর সঙ্গে তুই দেখা কর্‌।

ইন্দুমতী। কেন দিদি, তাতে আমার কী প্রায়শ্চিত্তটা হবে।

কমলমুখী। দেখ্‌, ইন্দু, এ তো ভাই ইংরেজের ঘর নয়, তোকে তো বিয়ে করতেই হবে। মনটাকে অমন করে বন্ধ করে রাখিসনে— তুই যা মনে করিস ভাই, পুরুষমানুষ নিতান্তই বাঘভাল্লুকের জাত নয়— বাইরে থেকে খুব ভয়ংকর দেখায় কিন্তু ওদের বশ করা খুব সহজ। একবার পোষ মানলে ওই মস্ত প্রাণীগুলো এমনি গরিব গোবেচারা হয়ে থাকে যে দেখে হাসি পায়। পুরুষমানুষের মধ্যে তুই কি ভদ্রলোক দেখিসনি। কেন ভাই, কাকার কথা একবার ভেবে দেখ্‌ না।

ইন্দুমতী। তুই আমাকে এত কথা বলছিস কেন দিদি। আমি কি পুরুষমানুষের দুয়োরে আগুন দিতে যাচ্ছি। তারা খুব ভালো লোক, আমি তাদের কোনো অনিষ্ট করতে চাইনে।

কমলমুখী। তোর যখন যা ইচ্ছে তাই করেছিস ইন্দু, কাকা তাতে কোনো বাধা দেননি। আজ কাকার একটি অনুরোধ রাখবিনে?

ইন্দুমতী। রাখব ভাই— তিনি যা বলবেন তাই শুনব।

কমলমুখী। তবে চল্‌, তোর চুলটা একটু ভালো করে দিই। নিজের উপরে এতটা অযত্ন করিসনে। [প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

কমলমুখীর গৃহ

নিমাই

নিমাই। চন্দর যখন পীড়াপীড়ি করছে তা না-হয় একবার ইন্দুমতীর সঙ্গে দেখা করাই যাক। শুনেছি তিনি বেশ বুদ্ধিমতী সুশিক্ষিতা মেয়ে— তাঁকে আমার অবস্থা বুঝিয়ে বললে তিনি নিজেই আমাকে বিয়ে করতে অসম্মত হবেন। তা হলে আমার ঘাড় থেকে দায়টা যাবে— বাবাও আর পীড়াপীড়ি করবেন না।

ঘোমটা পরিয়া ইন্দুমতীর প্রবেশ

ইন্দুমতী। বাবা যখন বলছেন তখন দেখা করতেই হবে; কিন্তু কারো অনুরোধে তো আর পছন্দ হয় না। বাবা কখনোই আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে দেবেন না।

নিমাই। (নতশিরে ইন্দুর প্রতি) আমাদের মা বাপ আমাদের পরস্পরের বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি করছেন, কিন্তু আপনি যদি ক্ষমা করেন তো আপনাকে একটি কথা বলি—

ইন্দুমতী। এ কী! এ যে ললিতবাবু। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) ললিতবাবু, আপনাকে বিবাহের জন্য যাঁরা পীড়াপীড়ি করছেন তাঁদের আপনি জানাবেন বিবাহ এক পক্ষের সম্মতিতে হয় না। আমাকে আপনার বিবাহের কথা বলে কেন অপমান করছেন।

নিমাই। এ কী! এ যে কাদম্বিনী। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) আপনি এখানে আমি তা জানতুম না। আমি মনে করেছিলুম নিবারণবাবুর কন্যা ইন্দুমতীর সঙ্গে আমি কথা কচ্ছি— কিন্তু আমার যে এমন সৌভাগ্য হবে—

ইন্দুমতী। ললিতবাবু, আপনার সৌভাগ্য আপনি মনে মনে রেখে দেবেন, সে-কথা আমার কাছে প্রচার করবার দরকার দেখিনে।

নিমাই। আপনি কাকে ললিতবাবু বলছেন? ললিতবাবু বারান্দায় বিনোদের সঙ্গে গল্প করছেন— যদি আবশ্যক থাকে তাঁকে ডেকে নিয়ে আসি।

ইন্দুমতী। না না, তাঁকে ডাকতে হবে না।— আপনি তা হলে কে।

নিমাই। এর মধ্যেই ভুলে গেলেন? চন্দ্রবাবুর বাসায় আপনি নিজে আমাকে চাকরি দিয়েছেন, আমি তৎক্ষণাৎ তা মাথায় করে নিয়েছি— ইতিমধ্যে বরখাস্ত হবার মতো কোনো অপরাধ করিনি তো।

ইন্দুমতী। আপনার নাম কি ললিতবাবু নয়।

নিমাই। যদি পছন্দ করেন তো ওই নামই শিরোধার্য করে নিতে পারি কিন্তু বাপ-মায়ে আমার নাম রেখেছিলেন নিমাই।

ইন্দুমতী। নিমাই?— ছি ছি, একথা আমি আগে জানতে পারলুম না কেন?

নিমাই। তা হলে কি চাকরি দিতেন না? তবে তো না জেনে ভালোই হয়েছে। এখন কী আদেশ করেন।

ইন্দুমতী। আমি আদেশ করছি ভবিষ্যতে যখন আপনি কবিতা লিখবেন তখন কাদম্বিনীর পরিবর্তে ইন্দুমতী নামটি ব্যবহার করবেন এবং ছন্দ মিলিয়ে লিখবেন।

নিমাই। যে দুটো আদেশ করলেন ও দুটোই যে আমার পক্ষে সমান অসাধ্য।

ইন্দুমতী। আচ্ছা, ছন্দ মেলাবার ভার আমি নেব এখন, নামটা আপনি বদলে নেবেন—

নিমাই। এমন নিষ্ঠুর আদেশ কেন করছেন। চোদ্দটা অক্ষরের জায়গায় সতেরোটা বসানো কি এমনি গুরুতর অপরাধ যে সে জন্যে ভৃত্যকে একেবারে—

ইন্দুমতী। না, সে অপরাধ আমি সহস্র বার মার্জনা করতে পারি কিন্তু ইন্দুমতীকে কাদম্বিনী বলে ভুল করলে আমার সহ্য হবে না—

নিমাই। আপনার নাম তবে—

ইন্দুমতী। ইন্দুমতী। তার প্রধান কারণ আপনার বাপ-মা যেমন আপনার নাম রেখেছেন নিমাই, তেমনি আমার বাপ-মা আমার নাম রেখেছেন ইন্দুমতী।

নিমাই। হায় হায়, আমি এতদিন কী ভুলটাই করেছি। বাগবাজারের রাস্তায় রাস্তায় বৃথা ঘুরে বেড়িয়েছি, বাবা আমাকে উঠতে বসতে দু-বেলা বাপান্ত করেছেন, কাদম্বিনী নামটা ছন্দের ভিতর পুরতে মাথা ভাঙাভাঙি করেছি—

(মৃদুস্বরে) যেমনি আমায় ইন্দু প্রথম দেখিলে
কেমন করে চকোর বলে তখনি চিনিলে—

কিংবা

কেমন করে চাকর বলে তখনি চিনিলে

আহা সে কেমন হত!

ইন্দুমতী। তবে, এখন ভ্রম সংশোধন করুন— এই নিন আপনার খাতা। আমি চললুম। [প্রস্থানোদ্যম

নিমাই। আপনারও বোধ হচ্ছে যেন একটা ভ্রম হয়েছিল— সেটাও অনুগ্রহ করে সংশোধন করে নেবেন— আপনার একটা সুবিধে আছে, আপনাকে আর সেই সঙ্গে ছন্দ বদলাতে হবে না। [ইন্দুমতীর প্রস্থান

নিবারণের প্রবেশ

নিবারণ। দেখো বাপু, শিবু আমার বাল্যকালের বন্ধু— আমার বড়ো ইচ্ছে তাঁর সঙ্গে আমার একটা পারিবারিক বন্ধন হয়। এখন তোমাদের ইচ্ছের উপরেই সমস্ত নির্ভর করছে।

নিমাই। আমার ইচ্ছের জন্যে আপনি কিছু ভাববেন না, আপনার আদেশ পেলেই আমি কৃতার্থ হই।

নিবারণ। (স্বগত) যা মনে করেছিলুম তাই। বুড়ো বাপ মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করে যা করতে না পারলে, একবার ইন্দুকে দেখবামাত্র সমস্ত ঠিক হয়ে গেল। বুড়োরাই শাস্ত্র মেনে চলে— যুবোদের শাস্ত্রই এক আলাদা।— তা বাপু, তোমার কথা

শুনে বড়ো আনন্দ হল। তা হলে একবার আমার মেয়েকে তার মতটা জিজ্ঞাসা করে আসি। তোমরা শিক্ষিত লোক, বুঝতেই পার, বয়ঃপ্রাপ্ত মেয়ে, তার সম্মতি না নিয়ে তাকে বিবাহ দেওয়া যায় না।

নিমাই। তা অবশ্য।

নিবারণ। তা হলে আমি একবার আসি। চন্দ্রবাবুদের এই ঘরে ডেকে দিয়ে যাই। [প্রস্থান

শিবচরণের প্রবেশ

শিবচরণ। তুই এখানে বসে রয়েছিস, আমি তোকে পৃথিবীশুদ্ধ খুঁজে বেড়াচ্ছি।

নিমাই। কেন বাবা।

শিবচরণ। তোকে যে আজ তারা দেখতে আসবে।

নিমাই। কারা।

শিবচরণ। বাগবাজারের চৌধুরীরা।

নিমাই। কেন।

শিবচরণ। কেন! না-দেখে না-শুনে অমনি ফস করে বিয়ে হয়ে যাবে? তোর বুঝি আর সবুর সইছে না?

নিমাই। বিয়ে কার সঙ্গে হবে।

শিবচরণ। ভয় নেই রে বাপু, তুই যাকে চাস তারই সঙ্গে হবে। আমার ছেলে হয়ে তুই যে এত টাকা চিনেছিস তা তো জানতুম না; তা সেই বাগবাজারের ট্যাঁকশালের সঙ্গেই তোর বিয়ে স্থির করে এসেছি।

নিমাই। সে কী বাবা। আপনার মতের বিরুদ্ধে আমি বিয়ে করতে চাইনে— বিশেষ, আপনি নিবারণবাবুকে কথা দিয়েছেন—

শিবচরণ। (অনেকক্ষণ হাঁ করিয়া নিমাইয়ের মুখের দিকে নিরীক্ষণ) তুই খেপেছিস না আমি খেপেছি আমাকে কে বুঝিয়ে দেবে! কথাটা একটু পরিষ্কার করে বল্, আমি ভালো করে বুঝি।

নিমাই। আমি সে চৌধুরীদের মেয়ে বিয়ে করব না।

শিবচরণ। চৌধুরীদের মেয়ে বিয়ে করবিনে! তবে কাকে করবি!

নিমাই। নিবারণবাবুর মেয়ে ইন্দুমতীকে।

শিবচরণ। (উচ্চৈঃস্বরে) কী! হতভাগা পাজি লক্ষ্মীছাড়া বেটা! যখন ইন্দুমতীর সঙ্গে তোর সম্বন্ধ করি তখন বলিস কাদম্বিনীকে বিয়ে করবি, আবার যখন

কাদম্বিনীর সঙ্গে সম্বন্ধ করি, তখন বলিস ইন্দুমতীকে বিয়ে করবি— তুই তোর বুড়ো বাপকে একবার বাগবাজার একবার মির্জাপুর খেপিয়ে নিয়ে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াতে চাস!

নিমাই। আমাকে মাপ করুন বাবা, আমার একটা মস্ত ভুল হয়ে গিয়েছিল—

শিবচরণ। ভুল কী রে বেটা! তোকে সেই বাগবাজারে বিয়ে করতেই হবে! তাদের কোনো পুরুষে চিনিনে, আমি নিজে গিয়ে তাদের স্তুতিমিনতি করে এলুম, যেন আমারই কন্যেদায় হয়েছে— তার পরে যখন সমস্ত ঠিকঠাক হয়ে গেল, আজ তারা আশীর্বাদ করতে আসবে তখন বলে কি না আমি বিয়ে করব না। আমি এখন চৌধুরীদের বলি কী।

চন্দ্রকান্তের প্রবেশ

চন্দ্রকান্ত। (নিমাইয়ের প্রতি) সমস্ত শুনলুম। ভালো একটি গোল বাধিয়েছ যা হোক।— এই যে ডাক্তারবাবু, ভালো আছেন তো?

শিবচরণ। ভালো আর থাকতে দিলে কই। এই দেখো না চন্দর, ওঁর নিজেরই কথামতো একটি পাত্রী স্থির করলুম— যখন সমস্ত স্থির হয়ে গেল তখন বলে কি না, তাকে বিয়ে করব না। আমি এখন চৌধুরীদের বলি কী।

নিমাই। বাবা, আপনি তাদের একটু বুঝিয়ে বললেই—

শিবচরণ। তোমার মাথা! তাদের বোঝাতে হবে আমার ভীমরতি ধরেছে আর আমার ছেলেটি একটি আস্ত খেপা— তা তাদের বুঝতে বিলম্ব হবে না।

চন্দ্রকান্ত। আপনি কিছু ভাববেন না। সে মেয়েটির আর-একটি পাত্র জুটিয়ে দিলেই হবে।

শিবচরণ। সে তেমন মেয়েই নয়। তার টাকা আছে ঢের কিন্তু চেহারা দেখে পাত্র এগোয় না। আমার বংশের এই অকালকুষ্মাণ্ডের মতো হঠাৎ এতবড়ো হতভাগা তুমি দ্বিতীয় আর কোথায় পাবে যে তাকে বিয়ে করতে রাজি হবে।

চন্দ্রকান্ত। সে আমার উপর ভার রইল। আমি সমস্ত ঠিকঠাক করে দেব। এখন নিশ্চিন্ত মনে নিবারণবাবুর মেয়ের সঙ্গে বিবাহ স্থির করুন।

শিবচরণ। যদি পার চন্দর তো বড়ো উপকার হয়। এই বাগবাজারের হাত থেকে মানে মানে নিস্তার পেলে বাঁচি। এদিকে আমি নিবারণের কাছে মুখ দেখাতে পারছিনে, পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি।

চন্দ্রকান্ত। সে জন্যে কোনো ভাবনা নেই। আমি প্রায় অর্ধেক কাজ গুছিয়ে এসে তবে আপনাকে বলছি। এখন বাকিটুকু সেরে আসি। [প্রস্থান

নিবারণের প্রবেশ

শিবচরণ। আরে এসো ভাই এসো।

নিবারণ। ভালো আছ ভাই? যা হোক শিবু, কথা তো স্থির?

শিবচরণ। সে তো বরাবরই স্থির আছে, এখন তোমার মর্জি হলেই হয়।

নিবারণ। আমারও তো সমস্ত ঠিক হয়ে আছে, এখন হয়ে গেলেই চুকে যায়।

শিবচরণ। তবে আর কী, দিনক্ষণ দেখে—

নিবারণ। সে-সব কথা পরে হবে—এখন কিছু মিষ্টিমুখ করবে চলো।

শিবচরণ। না ভাই, এখন আমার খাওয়াটা অভ্যাস নেই, এখন থাক্—অসময়ে খেয়েছি কি, আর আমার মাথা ধরেছে—

নিবারণ। না না, সে হবে না, কিছু খেতে হচ্ছে। বাপু, তুমিও এসো।

তৃতীয় দৃশ্য

কমলমুখীর অন্তঃপুর

কমলমুখী ও ইন্দুমতী

কমলমুখী। ছি ছি, ইন্দু, তুই কী কাণ্ডটাই করলি বল্ দেখি।

ইন্দুমতী। তা বেশ করেছি। ভাই, পরে গোল বাধার চেয়ে আগে গোল চুকে যাওয়া ভালো।

কমলমুখী। এখন পুরুষজাতটাকে কী রকম লাগছে।

ইন্দুমতী। মন্দ না ভাই, একরকম চলনসই।

কমলমুখী। তুই যে বলেছিলি ইন্দু, নিমাই গয়লাকে তুই কক্খনো বিয়ে করবিনে।

ইন্দুমতী। না ভাই, নিমাই নামটি খারাপ নয় তা তোমরা যাই বল। তোমার নলিনীকান্ত, ললনামোহন, রমণীরঞ্জনের চেয়ে সহস্র গুণে ভালো। নিমাই নামটি খুব আদরের নাম, অথচ পুরুষমানুষকে বেশ মানায়। রাগ করিসনে দিদি, তোর বিনোদের চেয়ে ঢের ভালো—

কমলমুখী। কী হিসেবে ভালো শুনি।

ইন্দুমতী। বিনোদবিহারী নামটা যেন টাটকা নভেল-নাটক থেকে পেড়ে এনেছে—বড্ডো বেশি গায়ে-পড়া কবিত্ব। মানুষের চেয়ে নামটা জাঁকালো। আর,

নিমাই নামটি কেমন বেশ সাদাসিধে, কোনো দেমাক নেই, ভঙ্গিমে নেই—বেশ নিতান্ত আপনার লোকটির মতো।

কমলমুখী। কিন্তু যখন বই ছাপাবে, বইয়ে ও নাম তো মানাবে না।

ইন্দুমতী। আমি তো ওঁকে ছাপতে দেব না, খাতাখানি আগে আটক করে রাখব। আমার ততটুকু বুদ্ধি আছে দিদি—

কমলমুখী। তা যে নমুনা দেখিয়েছিলি।— তোর সেটুকু বুদ্ধি আছে জানি কিন্তু শুনেছি বিয়ে করলে আবার স্বামীর লেখা সম্বন্ধে মত বদলাতে হয়।

ইন্দুমতী। আমার তো তার দরকার হবে না। সে লেখা তোদের ভালো লাগে না—আমার ভালো লেগেছে। সে আরো ভালো—আমার কবি কেবল আমারই কবি থাকবে, পৃথিবীতে তাঁর কেবল একটিমাত্র পাঠক থাকবে—

কমলমুখী। ছাপবার খরচ বেঁচে যাবে—

ইন্দুমতী। সবাই তাঁর কবিত্বের প্রশংসা করলে আমার প্রশংসার মূল্য থাকবে না।

কমলমুখী। সে ভয় তোকে করতে হবে না। যা হোক তোর গয়লাটিকে তোর পছন্দ হয়েছে তা নিয়ে তোর সঙ্গে ঝগড়া করতে চাইনে। তাকে নিয়ে তুই চিরকাল সুখে থাক্ বোন। তোর গোয়াল দিনে দিনে পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক।

ইন্দুমতী। ঐ বিনোদবাবু আসছেন। মুখটা ভারি বিমর্ষ দেখছি। [প্রস্থান

বিনোদবিহারীর প্রবেশ

কমলমুখী। তাঁকে এনেছেন?

বিনোদবিহারী। তিনি তাঁর বাপের বাড়ি গেছেন, তাঁকে আনবার তেমন সুবিধে হচ্ছে না।

কমলমুখী। আমার বোধ হচ্ছে তিনি যে আমার সঙ্গিনীভাবে এখানে থাকেন সেটা আপনার আন্তরিক ইচ্ছে নয়।

বিনোদবিহারী। আপনাকে আমি বলতে পারিনে, তিনি এখানে আপনার কাছে থাকলে আমি কত সুখী হই। আপনার দৃষ্টান্তে তাঁর কত শিক্ষা হয়। যথার্থ ভদ্র স্ত্রীলোকের কী রকম আচারব্যবহার কথাবার্তা হওয়া উচিত তা আপনার কাছে থাকলে তিনি বুঝতে পারবেন। বেশ সম্ভ্রম রক্ষা করে চলা অথচ নিতান্ত জড়োসড়ো হয়ে না থাকা, বেশ শোভন লজ্জাটুকু রাখা অথচ সহজভাবে চলাফেরা, একদিকে উদার সহৃদয়তা আর একদিকে উজ্জ্বল বুদ্ধি, এমন দৃষ্টান্ত তিনি আর কোথায় পাবেন।

কমলমুখী। আমার দৃষ্টান্ত হয়তো তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। শুনেছি আপনি তাঁকে অল্পদিন হল বিবাহ করেছেন, হয়তো তাঁকে ভালো করে জানেন না—

বিনোদবিহারী। তা বটে। কিন্তু যদিও তিনি আমার স্ত্রী তবু এ-কথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে আপনার সঙ্গে তাঁর তুলনা হতে পারে না।

কমলমুখী। ও-কথা বলবেন না। আপনি হয়তো জানেন না আমি তাঁকে বাল্যকাল হতে চিনি। তাঁর চেয়ে আমি যে কোনো অংশে শ্রেষ্ঠ এমন আমার বোধ হয় না।

বিনোদবিহারী। আপনি তাঁকে চেনেন ?

কমলমুখী। খুব ভালোরকম চিনি।

বিনোদবিহারী। আমার সম্বন্ধে তিনি আপনার কাছে কোনো কথা বলেছেন ?

কমলমুখী। কিছু না। কেবল বলেছেন, তিনি আপনার ভালোবাসার যোগ্য নন। আপনাকে সুখী করতে না পেরে এবং আপনার ভালোবাসা না পেয়ে তাঁর সমস্ত জীবনটা ব্যর্থ হয়ে আছে।

বিনোদবিহারী। এ তাঁর ভারি ভ্রম ! তবে আপনার কাছে স্পষ্ট স্বীকার করি, আমিই তাঁর ভালোবাসার যোগ্য নই। আমি তাঁর প্রতি বড়ো অন্যায় করেছি, কিন্তু সে তাঁকে ভালোবাসিনে বলে নয়। আমি দরিদ্র, বিবাহের পূর্বে সে-কথা ভালো বুঝতে পারতুম না— কিন্তু লক্ষ্মীকে ঘরে এনেই যেন অলক্ষ্মীকে দ্বিগুণ স্পষ্ট দেখতে পেলুম ; মনটা প্রতিমুহূর্তে অসুখী হতে লাগল। সেই জন্যেই আমি তাঁকে বাপের বাড়ি পাঠিয়েছিলুম। তার পরে আপনার অনুগ্রহে আমার অবস্থা সচ্ছল হয়ে অবধি তাঁর অভাব আমি সর্বদাই অনুভব করি— তাঁকে আনবার অনেক চেষ্টা করছি কিন্তু কিছুতেই তিনি আসছেন না। অবশ্য তিনি রাগ করতে পারেন কিন্তু আমি কী এত বেশি অপরাধ করেছি !

কমলমুখী। তবে আর একটি সংবাদ আপনাকে দিই। আপনার স্ত্রীকে আমি এখানে আনিয়ে রেখেছি।

বিনোদবিহারী। (আগ্রহে) কোথায় আছেন তিনি, আমার সঙ্গে একবার দেখা করিয়ে দিন।

কমলমুখী। তিনি ভয় করছেন পাছে আপনি তাঁকে ক্ষমা না করেন— যদি অভয় দেন—

বিনোদবিহারী। বলেন কী, আমি তাঁকে ক্ষমা করব ! তিনি যদি আমাকে ক্ষমা করতে পারেন—

কমলমুখী। তিনি কোনোকালেই আপনাকে অপরাধী করেননি, সে জন্যে আপনি ভাববেন না—

বিনোদবিহারী। তবে এত মিনতি করছি তিনি আমাকে দেখা দিচ্ছেন না কেন?

কমলমুখী। আপনি সত্যই যে তাঁর দেখা চান এ জানতে পারলে তিনি এক মুহূর্ত গোপন থাকতেন না। তবে নিতান্ত যদি সেই পোড়ারমুখ দেখতে চান তো দেখুন। [মুখ উদ্‌ঘাটন

বিনোদবিহারী। আপনি! তুমি! কমল! আমাকে মাপ করলে!

ইন্দুমতীর প্রবেশ

ইন্দুমতী। মাপ করিসনে দিদি। আগে উপযুক্ত শাস্তি হোক তার পরে মাপ।

বিনোদবিহারী। তা হলে অপরাধীকে আর-একবার বাসরঘরে আপনার হাতে সমর্পণ করতে হয়।

ইন্দুমতী। দেখেছিস ভাই, কতবড়ো নির্লজ্জ। এরি মধ্যে মুখে কথা ফুটেছে। ওদের একটু আদর দিয়েছিস কি আর ওদের সামলে রাখবার জো নেই। মেয়েমানুষের হাতে পড়েই ওদের উপযুক্তমতো শাসন হয় না। যদি ওদের নিজের জাতের সঙ্গে ঘরকন্না করতে হত তা হলে দেখতুম ওদের এত আদর থাকত কোথায়।

বিনোদবিহারী। তা হলে ভূভারহরণের জন্য মাঝে মাঝে অবতারের আবশ্যক হত না; পরস্পরকে কেটেকুটে সংসারটা অনেকটা সংক্ষেপ করে আনতে পারতুম।

কমলমুখী। ঐ ক্ষান্তদিদি আসছেন। (বিনোদের প্রতি) তোমার সাক্ষাতে উনি বেরোবেন না। [বিনোদবিহারীর প্রস্থান

ক্ষান্তমণির প্রবেশ

ক্ষান্তমণি। তা বেশ হয়েছে ভাই, বেশ হয়েছে। এই বুঝি তোর নতুন বাড়ি। এ যে রাজার ঐশ্বর্য। তা বেশ হয়েছে। এখন তোর স্বামী ধরা দিলেই আর কোনো খেদ থাকে না।

ইন্দুমতী। সে বুঝি আর বাকি আছে! স্বামিরত্নটিকে ভাঁড়ারে পুরেছেন।

ক্ষান্তমণি। আহা, তা বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে। কমলের মতো এমন লক্ষ্মী মেয়ে কি কখনো অসুখী হতে পারে।

ইন্দুমতী। ক্ষান্তদিদি, তুমি যে এই ভরসন্ধের সময় ঘরকন্না ফেলে এখানে ছুটে এসেছ?

ক্ষান্তমণি! আর ভাই ঘরকন্না। আমি দু-দিন বাপের বাড়ি গিয়েছিলুম, এই ওঁর

আর সহ্য হল না। রাগ করে ঘর ছেড়ে শুনলুম তোদের এই বাড়িতে এসে রয়েছেন। তা ভাই, বিয়ে করেছি বলেই কি বাপ-মা একেবারে পর হয়ে গেছে। দু-দিন সেখানে থাকতে পাব না! যা হোক, খবরটা পেয়ে চলে আসতে হল।

ইন্দুমতী। আবার তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে বুঝি!

ক্ষান্তমণি। তা ভাই, একলা তো আর ঘরকন্না হয় না। ওদের যে চাই, ওদের যে নইলে নয়। নইলে আমার কি সাধ ওদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখি।

ইন্দুমতী। তোমার কর্তাটিকে দেখবে তো এসো, ওই ঘর থেকে দেখা যাবে।

চতুর্থ দৃশ্য

ঘর

শিবচরণ, নিমাই, নিবারণ ও চন্দ্রকান্ত

চন্দ্রকান্ত। সমস্ত ঠিক হয়ে গেছে।

শিবচরণ। কী হল বলো দেখি।

চন্দ্রকান্ত। ললিতের সঙ্গে কাদম্বিনীর বিবাহ স্থির হয়ে গেল।

নিবারণ। সে কী! সে যে বিবাহ করবে না শুনলুম?

চন্দ্রকান্ত। সে তো স্ত্রীকে বিবাহ করছে না। তার টাকা বিয়ে করে টাকাটি সঙ্গে নিয়ে বিলেত যাবে। যা হোক, এখন আর-একবার আমাদের নিমাইবাবুর মত নেওয়া উচিত—ইতিমধ্যে যদি আবার বদল হয়ে থাকে।

শিবচরণ। (ব্যস্তভাবে) না না, আর মত বদলাতে সময় দেওয়া হবে না। তার পূর্বেই আমরা পাঁচ জনে পড়ে কোনো গতিকে ওর বিয়েটা দিয়ে দিতে হচ্ছে। চলো নিমাই অনেক আয়োজন করবার আছে। (নিবারণের প্রতি) তবে চললেম ভাই।

নিবারণ। এসো। [নিমাই ও শিবচরণের প্রস্থান

চন্দরবাবু, আপনার তো খাওয়া হল না, কেবল ঘুরে ঘুরেই অস্থির হলেন—একটু বসুন, আপনার জন্যে জলখাবারের আয়োজন করে আসিগে। [প্রস্থান

ক্ষান্তমণির প্রবেশ

ক্ষান্তমণি। এখন বাড়ি যেতে হবে? না কী।

চন্দ্রকান্ত। (দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া) নাঃ, আমি এখানে বেশ আছি।

ক্ষান্তমণি। তা তো দেখতে পাচ্ছি। তা চিরকাল এইখানেই কাটাবে না কি।

চন্দ্রকান্ত। বিনুর সঙ্গে আমার তো সেইরকমই কথা হয়েছে।

ক্ষান্তমণি। বিনু তোমার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী কিনা; বিনুর সঙ্গে কথা হয়েছে! এখন ঢের হয়েছে চলো।

চন্দ্রকান্ত। (জিব কাটিয়া মাথা নাড়িয়া) সে কি হয়! বন্ধুমানুষকে কথা দিয়েছি এখন কি সে ভাঙতে পারি।

ক্ষান্তমণি। আমার ঘাট হয়েছে, আমাকে মাপ করো তুমি। আমি আর কখনো বাপের বাড়ি গিয়ে থাকব না। তা তোমার তো অযত্ন হয়নি— আমি তো সেখান থেকে সমস্ত রেঁধে তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছি।

চন্দ্রকান্ত। বড়োবউ, আমি কি তোমার রান্নার জন্যে তোমাকে বিয়ে করেছিলুম। যে-বৎসর তোমার সঙ্গে অভাগার শুভবিবাহ হয় সে-বৎসর কলকাতা শহরে কি রাঁধুনি বামুনের মড়ক হয়েছিল।

ক্ষান্তমণি। আমি বলছি, আমার একশ-বার ঘাট হয়েছে, আমাকে মাপ করো,— আমি আর-কখনো এমন কাজ করব না। এখন তুমি ঘরে চলো।

চন্দ্রকান্ত। তবে একটু রোসো। নিবারণবাবু আমার জলখাবারের ব্যবস্থা করতে গেছেন—উপস্থিত ত্যাগ করে যাওয়াটা শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

ক্ষান্তমণি। আমি সেখানে সব ঠিক করে রেখেছি, তুমি এখনি চলো।

চন্দ্রকান্ত। বল কী, নিবারণবাবু—

ক্ষান্তমণি। সে আমি নিবারণবাবুকে বলে পাঠাব এখন, তুমি চলো।

চন্দ্রকান্ত। তবে চলো। সকল গোরুগুলিই তো একে একে গোষ্ঠে গেল। আমিও যাই।

বন্ধুগণ। (নেপথ্য হইতে) চন্দরদা।

ক্ষান্তমণি। ওই রে, আবার ওরা আসছে! ওদের হাতে পড়লে আর তোমার রক্ষে নেই।

চন্দ্রকান্ত। ওদের হাতে তুমি আমি দু-জনেই পড়ার চেয়ে এক জন পড়া ভালো। শাস্ত্রে লিখছে "সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ"; অতএব এ-স্থলে আমার অর্ধাঙ্গের সরাই ভালো।

ক্ষান্তমণি। তোমার ঐ বন্ধুগুলোর জ্বালায় আমি কি মাথামোড় খুঁড়ে মরব।
[প্রস্থান

বিনোদবিহারী, নিমাই ও নলিনাক্ষের প্রবেশ

চন্দ্রকান্ত। কেমন মনে হচ্ছে বিনু?

বিনোদবিহারী। সে আর কী বলব দাদা।

চন্দ্রকান্ত। নিমাই, তোর স্নায়ুরোগের বর্তমান লক্ষণটা কী বল্ দেখি।

নিমাই। অত্যন্ত সাংঘাতিক। ইচ্ছে করছে দিগ্বিদিকে নেচে বেড়াই।

চন্দ্রকান্ত। ভাই, নাচতে হয় তো দিকে নেচো, আবার বিদিকে নেচো না। পূর্বে তোমার যে রকম দিগ্‌ভ্রম হয়েছিল— কোথায় মির্জাপুর আর কোথায় বাগবাজার!

নিমাই। এখন তোমার খবরটা কী চন্দরদা?

চন্দ্রকান্ত। আমি কিছু দ্বিধায় পড়ে গেছি। এখানেও আহার তৈরি হচ্ছে ঘরেও আহার প্রস্তুত— কিন্তু ঘরের দিকে ডবল টান পড়েছে।

নলিনাক্ষ। বিনু, এই মরুজগৎ তোমার কাছে তো আবার নন্দনকানন হয়ে উঠল —তুমি তো ভাই সুখী হলে—

চন্দ্রকান্ত। সেজন্যে ওকে আর লজ্জা দিসনে নলিন, সে ওর দোষ নয়। সুখী না হবার জন্যে ও যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল, এমন কি, প্রায় সম্পূর্ণ কৃতকার্য হয়েছিল; এমন সময় বিধাতা ওর সঙ্গে লাগলেন— নিতান্ত ওকে কানে ধরে সুখী করে দিলেন। সেজন্যে ওকে মাপ করতে হবে।

বিনোদবিহারী। দেখ্, নলিন, তুই আমাকে ত্যাগ কর্। দুধের সাধ আর ঘোলে মেটাসনে। তুইও একটা বিয়ে করে ফেল্— আর এই জগৎটাকে শখের মরুভূমি করে রাখিসনে।

চন্দ্রকান্ত। একদিন প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, নলিন, জীবনে আর কখনো ঘটকালি করব না— আজ তোর খাতিরে সে প্রতিজ্ঞা আমি এখনি ভঙ্গ করতে প্রস্তুত আছি।

নিমাই। এখনি?

চন্দ্রকান্ত। হাঁ এখনি। এক বার কেবল বাড়ি থেকে চাদরটা বদলে আসতে হবে।

নিমাই। সেই কথাটা খুলে বলো। আর এ পর্যন্ত তোমার প্রতিজ্ঞা যে কী রকম রক্ষা করে এসেছ সে আর প্রকাশ করে কাজ নেই।

বিনোদবিহারী। নলিন, আমার গা ছুঁয়ে বল্ দেখি তুই বিয়ে করবি।

নলিনাক্ষ। তুমি যদি বল বিনু, তা হলে আমি নিশ্চয় করব। এ পর্যন্ত আমি তোমার কোন্ অনুরোধটা রাখিনি বলো।

বিনোদবিহারী। চন্দরদা, তবে আর কী! একটা খোঁজ করো। একটি সংকায়স্থের মেয়ে। ওঁদের আবার একটু সুবিধে আছে— খাদ্যের সঙ্গে হজমিগুলিটুকু পান, রাজকন্যার সঙ্গে অর্ধেক রাজত্বের জোগাড় হয়।

চন্দ্রকান্ত। তা বেশ কথা। আমি এই সংসার-সমুদ্রে দিব্যি একটি খেয়া

জমিয়েছি— একে একে তোদের দুটিকে আইবুড়ো-কূল থেকে বিবাহ-কূলে পার করে দিয়েছি— মিস্টার চাটুজ্যেকেও একহাঁটু কাদার মধ্যে নাবিয়ে দিয়ে এসেছি, এখন আর কে কে যাত্রী আছে ডাক দাও—

বিনোদবিহারী। এখন এই অনাথ যুবকটিকে পার করে দাও।

নলিনাক্ষ। বিনু ভাই, আর কেউ নয়, কেবল তুমি যাকে পছন্দ করে দেবে, আমি তাকেই নেব। দেখেছি তোমার সঙ্গে আমার রুচির মিল হয়।

বিনোদবিহারী। তাই সই। তবে আমি সন্ধানে বেরোব। চন্দরদার আবার চাদর বদলাতে বড়ো বিলম্ব হয় দেখেছি। ততক্ষণ আমিই খেয়া দেব।

নিমাই। আজ তবে সভাভঙ্গ হোক। ওদিকে যতই রাত বয়ে যাচ্ছে আমাদের চন্দ্র ততই ম্লান হয়ে আসছেন।

চন্দ্রকান্ত। উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু আগে আমাদের ভাগ্যলক্ষ্মীদের একটি বন্দনা গেয়ে তার পরে বেরোনো যাবে। এটি বিরহকালে আমার নিজের রচনা— বিরহ না হলে গান বাঁধবার অবসর পাওয়া যায় না। মিলনের সময় মিলনটা নিয়েই কিছু ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকতে হয়।

গান। প্রথমে চন্দ্র পরে সকলে মিলিয়া

বাউলের সুর

যার অদৃষ্টে যেমনি জুটুক তোমরা সবাই ভালো!
আমাদের এই আঁধার ঘরে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালো।
কেউ বা অতি জ্বল-জ্বল, কেউ বা ম্লান ছল-ছল,
কেউ বা কিছু দহন করে, কেউ বা স্নিগ্ধ আলো।
নূতন প্রেমে নূতন বধূ আগাগোড়া কেবল মধু,
পুরাতনে অম্লমধুর একটুকু ঝাঁঝালো।
বাক্য যখন বিদায় করে, চক্ষু এসে পায়ে ধরে,
রাগের সঙ্গে অনুরাগে সমান ভাগে ঢালো।
আমরা তৃষ্ণা তোমরা সুধা, তোমরা তৃপ্তি আমরা ক্ষুধা,
তোমার কথা বলতে কবির কথা ফুরালো।
যে মূর্তি নয়নে জাগে সবই আমার ভালো লাগে—
কেউ বা দিব্যি গৌরবরন, কেউ বা দিব্যি কালো।

উপন্যাস ও গল্প

চোখের বালি

সূচনা

আমার সাহিত্যের পথযাত্রা পূর্বাপর অনুসরণ করে দেখলে ধরা পড়বে যে 'চোখের বালি' উপন্যাসটা আকস্মিক, কেবল আমার মধ্যে নয় সেদিনকার বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে। বাইরে থেকে কোন্ ইশারা এসেছিল আমার মনে, সে প্রশ্নটা দুরূহ। সবচেয়ে সহজ জবাব হচ্ছে ধারাবাহিক লম্বা গল্পের উপর মাসিক পত্রের চিরকেলে দাবি নিয়ে। বঙ্গদর্শনের নবপর্যায় বের করলেন শ্রীশচন্দ্র। আমার নাম যোজনা করা হল, তাতে আমার প্রসন্ন মনের সমর্থন ছিল না। কোনো পূর্বতন খ্যাতির উত্তরাধিকার গ্রহণ করা সংকটের অবস্থা, আমার মনে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সংকোচ ছিল। কিন্তু আমার মনে উপরোধ-অনুরোধের দ্বন্দ্ব যেখানেই ঘটেছে সেখানে প্রায়ই আমি জয়লাভ করতে পারিনি, এবারেও তাই হল।

আমরা একদা বঙ্গদর্শনে বিষবৃক্ষ উপন্যাসের রস সম্ভোগ করেছি। তখনকার দিনে সে রস ছিল নতুন। পরে সেই বঙ্গদর্শনকে নব পর্যায়ে টেনে আনা যেতে পারে কিন্তু সেই প্রথম পালার পুনরাবৃত্তি হতে পারে না। সেদিনের আসর ভেঙে গেছে, নতুন সম্পাদককে রাস্তার মোড় ফেরাতেই হবে। সহ-সম্পাদক শৈলেশের বিশ্বাস ছিল, আমি এই মাসিকের বর্ষব্যাপী ভোজে গল্পের পুরো পরিমাণ জোগান দিতে পারি। অতএব কোমর বাঁধতে হবে আমাকে। এ যেন মাসিকের দেওয়ানি আইন অনুসারে সম্পাদকের কাছ থেকে উপযুক্ত খোরপোশের দাবি করা। বস্তুত ফরমাশ এসেছিল বাইরে থেকে। এর পূর্বে মহাকায় গল্প সৃষ্টিতে হাত দিইনি। ছোটো গল্পের উল্কাবৃষ্টি করেছি। ঠিক করতে হল, এবারকার গল্প বানাতে হবে এ-যুগের কারখানা-ঘরে। শয়তানের হাতে বিষবৃক্ষের চাষ তখনও হত এখনও হয়, তবে কিনা তার ক্ষেত্র আলাদা, অন্তত গল্পের এলাকার মধ্যে। এখনকার ছবি খুব স্পষ্ট,

সাজসজ্জার অলংকারে তাকে আচ্ছন্ন করলে তাকে ঝাপসা করে দেওয়া হয়, তার আধুনিক স্বভাব হয় নষ্ট। তাই গল্পের আবদার যখন এড়াতে পারলুম না তখন নামতে হল মানব-সংসারের সেই কারখানা-ঘরে যেখানে আগুনের জ্বলুনি হাতুড়ির পিটুনি থেকে দৃঢ় ধাতুর মূর্তি জেগে উঠতে থাকে। মানব-বিধাতার এই নির্মম সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার বিবরণ তার পূর্বে গল্প অবলম্বন করে বাংলা ভাষায় আর প্রকাশ পায়নি। তার পরে ওই পর্দার বাইরেকার সদর রাস্তাতেই ক্রমে ক্রমে দেখা দিয়েছে গোরা, ঘরে-বাইরে, চতুরঙ্গ। শুধু তাই নয়, ছোটো গল্পের পরিকল্পনায় আমার লেখনী সংসারের রূঢ় স্পর্শ এড়িয়ে যায়নি। নষ্টনীড় বা শাস্তি এরা নির্মম সাহিত্যের পর্যায়েই পড়বে। তারপরে পলাতকার কবিতাগুলির মধ্যেও সংসারের সঙ্গে সেই মোকাবিলার আলাপ চলেছে। বঙ্গদর্শনের নবপর্যায় এক দিকে তখন আমার মনকে রাষ্ট্রনৈতিক সমাজনৈতিক চিন্তার আবর্তে টেনে এনেছিল, আর-এক দিকে এনেছিল গল্পে এমন-কি কাব্যেও মানবচরিত্রের কঠিন সংস্পর্শে। অল্পে অল্পে এর শুরু হয়েছিল সাধনার যুগেই, তারপরে সবুজপত্র পসরা জমিয়েছিল। চোখের বালির গল্পকে ভিতর থেকে ধাক্কা দিয়ে দারুণ করে তুলেছে মায়ের ঈর্ষা। এই ঈর্ষা মহেন্দ্রের সেই রিপুকে কুৎসিত অবকাশ দিয়েছে যা সহজ অবস্থায় এমন করে দাঁত-নখ বের করত না। যেন পশুশালার দরজা খুলে দেওয়া হল, বেরিয়ে পড়ল হিংস্র ঘটনাগুলো অসংযত হয়ে। সাহিত্যের নবপর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনাপরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো। সেই পদ্ধতিই দেখা দিল চোখের বালিতে।

চোখের বালি

১

বিনোদিনীর মাতা হরিমতি মহেন্দ্রের মাতা রাজলক্ষ্মীর কাছে আসিয়া ধন্না দিয়া পড়িল। দুই জনেই এক গ্রামের মেয়ে, বাল্যকালে একত্রে খেলা করিয়াছেন।

রাজলক্ষ্মী মহেন্দ্রকে ধরিয়া পড়িলেন, "বাবা মহিন, গরিবের মেয়েটিকে উদ্ধার করিতে হইবে। শুনিয়াছি মেয়েটি বড়ো সুন্দরী, আবার মেমের কাছে পড়াশুনাও করিয়াছে— তোদের আজকালকার পছন্দর সঙ্গে মিলিবে।"

মহেন্দ্র কহিল, "মা, আজকালকার ছেলে তো আমি ছাড়াও আরো ঢের আছে।"

রাজলক্ষ্মী। মহিন, ওই তোর দোষ, তোর কাছে বিয়ের কথাটি পাড়িবার জো নাই।

মহেন্দ্র। মা, ও-কথাটা বাদ দিয়াও সংসারে কথার অভাব হয় না। অতএব ওটা মারাত্মক দোষ নয়।

মহেন্দ্র শৈশবেই পিতৃহীন। মা-সম্বন্ধে তাহার ব্যবহার সাধারণ লোকের মতো ছিল না। বয়স প্রায় বাইশ হইল, এম. এ. পাস করিয়া ডাক্তারি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে; তবু মাকে লইয়া তাহার প্রতিদিন মান-অভিমান আদর-আবদারের অন্ত ছিল না। কাঙারু-শাবকের মতো মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াও মাতার বহির্গর্ভের থলিটির মধ্যে আবৃত থাকাই তাহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। মার সাহায্য ব্যতীত তাহার আহার-বিহার আরাম-বিরাম কিছুই সম্পন্ন হইবার জো ছিল না।

এবারে মা যখন বিনোদিনীর জন্য তাহাকে অত্যন্ত ধরিয়া পড়িলেন, তখন মহেন্দ্র বলিল, "আচ্ছা, কন্যাটি এক বার দেখিয়া আসি।"

দেখিতে যাইবার দিন বলিল, "দেখিয়া আর কী হইবে। তোমাকে খুশি করিবার জন্য বিবাহ করিতেছি, ভালোমন্দ বিচার করা মিথ্যা।"

কথাটার মধ্যে একটু রাগের উত্তাপ ছিল, কিন্তু মা ভাবিলেন, শুভদৃষ্টির সময় তাঁহার পছন্দর সহিত যখন পুত্রের পছন্দর নিশ্চয় মিল হইবে, তখন মহেন্দ্রের কড়িস্বর কোমল হইয়া আসিবে।

রাজলক্ষ্মী নিশ্চিন্তচিত্তে বিবাহের দিন স্থির করিলেন। দিন যত নিকটে আসিতে

লাগিল, মহেন্দ্রের মন ততই উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল— অবশেষে দুই-চার দিন আগে সে বলিয়া বসিল, “না মা, আমি কিছুতেই পারিব না।”

বাল্যকাল হইতে মহেন্দ্র দেবতা ও মানবের কাছে সর্বপ্রকারে প্রশ্রয় পাইয়াছে, এইজন্য তাহার ইচ্ছার বেগ উচ্ছৃঙ্খল। পরের ইচ্ছার চাপ সে সহিতে পারে না। তাহাকে নিজের প্রতিজ্ঞা এবং পরের অনুরোধ একান্ত বাধ্য করিয়া তুলিয়াছে বলিয়াই বিবাহ-প্রস্তাবের প্রতি তাহার অকারণ বিতৃষ্ণা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল এবং আসন্নকালে সে একেবারেই বিমুখ হইয়া বসিল।

মহেন্দ্রের পরম বন্ধু ছিল বিহারী; সে মহেন্দ্রকে দাদা এবং মহেন্দ্রের মাকে মা বলিত। মা তাহাকে স্টীমবোটের পশ্চাতে আবদ্ধ গাধাবোটের মতো মহেন্দ্রের একটি আবশ্যক ভারবহ আসবাবের স্বরূপ দেখিতেন ও সেই হিসাবে মমতাও করিতেন। রাজলক্ষ্মী তাহাকে বলিলেন, “বাবা, এ কাজ তো তোমাকেই করিতে হয়, নহিলে গরিবের মেয়ে—”

বিহারী জোড়হাত করিয়া কহিল, “মা, ওইটে পারিব না। যে-মেঠাই তোমার মহেন্দ্র ভালো লাগিল না বলিয়া রাখিয়া দেয়, সে-মেঠাই তোমার অনুরোধে পড়িয়া আমি অনেক খাইয়াছি, কিন্তু কন্যার বেলা সেটা সহিবে না।”

রাজলক্ষ্মী ভাবিলেন, “বিহারী আবার বিয়ে করিবে! ও কেবল মহিনকে লইয়াই আছে, বউ আনিবার কথা মনেও স্থান দেয় না।”

এই ভাবিয়া বিহারীর প্রতি তাঁহার কৃপামিশ্রিত মমতা আর-একটুখানি বাড়িল।

বিনোদিনীর বাপ বিশেষ ধনী ছিল না, কিন্তু তাহার একমাত্র কন্যাকে সে মিশনারি মেম রাখিয়া বহুযত্নে পড়াশুনা ও কারুকার্য শিখাইয়াছিল। কন্যার বিবাহের বয়স ক্রমেই বহিয়া যাইতেছিল, তবু তাহার হুঁশ ছিল না। অবশেষে তাহার মৃত্যুর পরে বিধবা মাতা পাত্র খুঁজিয়া অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। টাকাকড়িও নাই, কন্যার বয়সও অধিক।

তখন রাজলক্ষ্মী তাঁহার জন্মভূমি বারাশতের গ্রামসম্পর্কীয় এক ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত উক্ত কন্যা বিনোদিনীর বিবাহ দেওয়াইলেন।

অনতিকাল পরে কন্যা বিধবা হইল। মহেন্দ্র হাসিয়া কহিল, “ভাগ্যে বিবাহ করি নাই, স্ত্রী বিধবা হইলে তো এক দণ্ডও টিকিতে পারিতাম না!”

বছর-তিনেক পরে আর-এক দিন মাতাপুত্রে কথা হইতেছিল।

“বাবা, লোকে যে আমাকেই নিন্দা করে।”

“কেন মা, লোকের তুমি কী সর্বনাশ করিয়াছ?”

"পাছে বউ আসিলে ছেলে পর হইয়া যায়, এই ভয়ে তোর বিবাহ দিতেছি না, লোকে এইরূপ বলাবলি করে।"

মহেন্দ্র কহিল, "ভয় তো হওয়াই উচিত। আমি মা হইলে প্রাণ ধরিয়া ছেলের বিবাহ দিতে পারিতাম না। লোকের নিন্দা মাথা পাতিয়া লইতাম।"

মা হাসিয়া কহিলেন, "শোনো একবার ছেলের কথা শোনো।"

মহেন্দ্র কহিল, "বউ আসিয়া তো ছেলেকে জুড়িয়া বসেই। তখন এত কষ্টের এত স্নেহের মা কোথায় সরিয়া যায়, এ যদি-বা তোমার ভালো লাগে, আমার ভালো লাগে না।"

রাজলক্ষ্মী মনে মনে পুলকিত হইয়া তাঁহার সদ্যসমাগতা বিধবা জাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "শোনো ভাই মেজবউ, মহিন কী বলে শোনো। বউ পাছে মাকে ছাড়াইয়া উঠে, এই ভয়ে ও বিয়ে করিতে চায় না এমন সৃষ্টিছাড়া কথা কখনো শুনিয়াছ?"

কাকী কহিলেন, "এ তোমার বাছা, বাড়াবাড়ি। যখনকার যা, তখন তাই শোভা পায়। এখন মার আঁচল ছাড়িয়া বউ লইয়া ঘরকন্না করিবার সময় আসিয়াছে, এখন ছোটো ছেলেটির মতো ব্যবহার দেখিলে লজ্জা বোধ হয়।"

এ-কথা রাজলক্ষ্মীর ঠিক মধুর লাগিল না এবং এই প্রসঙ্গে তিনি যে-কটি কথা বলিলেন, তাহা সরল হইতে পারে, কিন্তু মধুমাখা নহে। কহিলেন, "আমার ছেলে যদি অন্যের ছেলেদের চেয়ে মাকে বেশি ভালোবাসে, তোমার তাতে লজ্জা করে কেন মেজবউ। ছেলে থাকিলে ছেলের মর্ম বুঝিতে।"

রাজলক্ষ্মী মনে করিলেন, পুত্রসৌভাগ্যবতীকে পুত্রহীনা ঈর্ষা করিতেছে।

মেজবউ কহিলেন, "তুমিই বউ আনিবার কথা পাড়িলে বলিয়া কথাটা উঠিল,—নহিলে আমার অধিকার কী।"

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "আমার ছেলে যদি বউ না আনে, তোমার বুকে তাতে শেল বেঁধে কেন। বেশ তো, এতদিন যদি ছেলেকে মানুষ করিয়া আসিতে পারি, এখনো উহাকে দেখিতে শুনিতে পারিব, আর কাহারো দরকার হইবে না।"

মেজবউ অশ্রুপাত করিয়া নীরবে চলিয়া গেলেন। মহেন্দ্র মনে মনে আঘাত পাইল এবং কালেজ হইতে সকাল-সকাল ফিরিয়াই তাহার কাকীর ঘরে উপস্থিত হইল।

কাকী তাহাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে স্নেহ ছাড়া আর কিছুই ছিল না, ইহা সে নিশ্চয় জানিত। এবং ইহাও তাহার জানা ছিল, কাকীর একটি পিতৃমাতৃ-

হীনা বোনঝি আছে, এবং মহেন্দ্রের সহিত তাহার বিবাহ দিয়া সন্তানহীনা বিধবা কোনো সূত্রে আপনার ভগিনীর মেয়েটিকে কাছে আনিয়া সুখী দেখিতে চান। যদিচ বিবাহে সে নারাজ, তবু কাকীর এই মনোগত ইচ্ছাটি তাহার কাছে স্বাভাবিক এবং অত্যন্ত করুণাবহ বলিয়া মনে হইত।

মহেন্দ্র তাঁহার ঘরে যখন গেল, তখন বেলা আর বড়ো বাকি নাই। কাকী অন্নপূর্ণা তাঁহার ঘরের কাটা জানালার গরাদের উপর মাথা রাখিয়া শুষ্কবিমর্ষমুখে বসিয়াছিলেন। পাশের ঘরে ভাত ঢাকা পড়িয়া আছে, এখনো স্পর্শ করেন নাই।

অল্প কারণেই মহেন্দ্রের চোখে জল আসিত। কাকীকে দেখিয়া তাহার চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। কাছে আসিয়া স্নিগ্ধস্বরে ডাকিল, “কাকীমা।”

অন্নপূর্ণা হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন, “আয় মহিন, বোস।”

মহেন্দ্র কহিল, “ভারি ক্ষুধা পাইয়াছে, প্রসাদ খাইতে চাই।”

অন্নপূর্ণা মহেন্দ্রের কৌশল বুঝিয়া উচ্ছ্বসিত অশ্রু কষ্টে সংবরণ করিলেন এবং নিজে খাইয়া মহেন্দ্রকে খাওয়াইলেন।

মহেন্দ্রের হৃদয় তখন করুণায় আর্দ্র ছিল। কাকীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য আহারান্তে হঠাৎ মনের ঝোঁকে বলিয়া বসিল, “কাকী, তোমার সেই যে বোনঝির কথা বলিয়াছিলে, তাহাকে এক বার দেখাইবে না ?”

কথাটা উচ্চারণ করিয়াই সে ভীত হইয়া পড়িল।

অন্নপূর্ণা হাসিয়া কহিলেন, “তোর আবার বিবাহে মন গেল নাকি, মহিন।”

মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি কহিল, “না, আমার জন্য নয় কাকী, আমি বিহারীকে রাজি করিয়াছি। তুমি দেখিবার দিন ঠিক করিয়া দাও।”

অন্নপূর্ণা কহিলেন, “আহা, তাহার কি এমন ভাগ্য হইবে। বিহারীর মতো ছেলে কি তাহার কপালে আছে।”

কাকীর ঘর হইতে বাহির হইয়া মহেন্দ্র দ্বারের কাছে আসিতেই মার সঙ্গে দেখা হইল। রাজলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিলেন, “কী মহেন্দ্র, এতক্ষণ তোদের কী পরামর্শ হইতেছিল।”

মহেন্দ্র কহিল, “পরামর্শ কিছুই না, পান লইতে আসিয়াছি।”

মা কহিলেন, “তোর পান তো আমার ঘরে সাজা আছে।”

মহেন্দ্র উত্তর না করিয়া চলিয়া গেল।

রাজলক্ষ্মী ঘরে ঢুকিয়া অন্নপূর্ণার রোদনস্ফীত চক্ষু দেখিবামাত্র অনেক কথা

কল্পনা করিয়া লইলেন। ফোঁস করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কী গো মেজঠাকরুন, ছেলের কাছে লাগালাগি করিতেছিলে বুঝি।"

বলিয়া উত্তরমাত্র না শুনিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেলেন।

২

মেয়ে দেখিবার কথা মহেন্দ্র প্রায় ভুলিয়াছিল, অন্নপূর্ণা ভোলেন নাই। তিনি শ্যামবাজারে মেয়ের অভিভাবক জেঠার বাড়িতে পত্র লিখিয়া দেখিতে যাইবার দিন স্থির করিয়া পাঠাইলেন।

দিন স্থির হইয়াছে শুনিয়াই মহেন্দ্র কহিল, "এত তাড়াতাড়ি কাজটা করিলে কেন, কাকী। এখনো বিহারীকে বলাই হয় নাই।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "সে কি হয়, মহিম। এখন না দেখিতে গেলে তাহারা কী মনে করিবে।"

মহেন্দ্র বিহারীকে ডাকিয়া সকল কথা বলিল। কহিল, "চলো তো, পছন্দ না হইলে তো তোমার উপর জোর চলিবে না।"

বিহারী কহিল, "সে-কথা বলিতে পারি না। কাকীর বোনঝিকে দেখিতে গিয়া পছন্দ হইল না বলা আমার মুখ দিয়া আসিবে না।"

মহেন্দ্র কহিল, "সে তো উত্তম কথা।"

বিহারী কহিল, "কিন্তু তোমার পক্ষে অন্যায় কাজ হইয়াছে, মহিনদা। নিজেকে হালকা রাখিয়া পরের স্কন্ধে এরূপ ভার চাপানো তোমার উচিত হয় নাই। এখন কাকীর মনে আঘাত দেওয়া আমার পক্ষে বড়োই কঠিন হইবে।"

মহেন্দ্র একটু লজ্জিত ও রুষ্ট হইয়া কহিল, "তবে কী করিতে চাও।"

বিহারী কহিল, "যখন তুমি আমার নাম করিয়া তাঁহাকে আশা দিয়াছ, তখন আমি বিবাহ করিব— দেখিতে যাইবার ভড়ং করিবার দরকার নাই।"

অন্নপূর্ণাকে বিহারী দেবীর মতো ভক্তি করিত।

অবশেষে অন্নপূর্ণা বিহারীকে নিজে ডাকিয়া কহিলেন, "সে কি হয়, বাছা। না দেখিয়া বিবাহ করিবে, সে কিছুতেই হইবে না। যদি পছন্দ না হয়, তবে বিবাহে সম্মতি দিতে পারিবে না, এই আমার শপথ রহিল।"

নির্ধারিত দিনে মহেন্দ্র কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া মাকে কহিল, "আমার সেই রেশমের জামা এবং ঢাকাই ধুতিটা বাহির করিয়া দাও।"

মা কহিলেন, "কেন, কোথায় যাবি।"

মহেন্দ্র কহিল, "দরকার আছে মা, তুমি দাও না, আমি পরে বলিব।"

মহেন্দ্র একটু সাজ না করিয়া থাকিতে পারিল না। পরের জন্য হইলেও কন্যা দেখিবার প্রসঙ্গমাত্রেই যৌবনধর্ম আপনি চুলটা একটু ফিরাইয়া লয়, চাদরে কিছু গন্ধ ঢালে।

দুই বন্ধু কন্যা দেখিতে বাহির হইল।

কন্যার জেঠা শ্যামবাজারের অনুকূলবাবু— নিজের উপার্জিত ধনের দ্বারায় তাঁহার বাগানসমেত তিনতলা বাড়িটাকে পাড়ার মাথার উপর তুলিয়াছেন।

দরিদ্র ভ্রাতার মৃত্যুর পর পিতৃমাতৃহীনা ভ্রাতুষ্পুত্রীকে তিনি নিজের বাড়িতে আনিয়া রাখিয়াছেন। মাসি অন্নপূর্ণা বলিয়াছিলেন, "আমার কাছে থাক্।" তাহাতে ব্যয়লাঘবের সুবিধা ছিল বটে, কিন্তু গৌরবলাঘবের ভয়ে অনুকূল রাজি হইলেন না। এমন-কি, দেখাসাক্ষাৎ করিবার জন্যও কন্যাকে কখনো মাসির বাড়ি পাঠাইতেন না, নিজেদের মর্যাদা সম্বন্ধে তিনি এতই কড়া ছিলেন।

কন্যাটির বিবাহ-ভাবনার সময় আসিল কিন্তু আজকালকার দিনে কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" কথাটা খাটে না। ভাবনার সঙ্গে খরচও চাই। কিন্তু পণের কথা উঠিলেই অনুকূল বলেন, "আমার তো নিজের মেয়ে আছে, আমি একা আর কত পারিয়া উঠিব।" এমনি করিয়া দিন বহিয়া যাইতেছিল। এমন সময় সাজিয়া-গুজিয়া গন্ধ মাখিয়া রঙ্গভূমিতে বন্ধুকে লইয়া মহেন্দ্র প্রবেশ করিলেন।

তখন চৈত্রমাসের দিবসান্তে সূর্য অস্তোন্মুখ। দোতলার দক্ষিণ-বারান্দায় চিত্রিত চিক্কণ চীনের টালি গাঁথা; তাহারই প্রান্তে দুই অভ্যাগতের জন্য রুপার রেকাবি ফলমূলমিষ্টান্নে শোভমান এবং বরফজলপূর্ণ রুপার গ্লাস শীতল শিশিরবিন্দুজালে মণ্ডিত। মহেন্দ্র বিহারীকে লইয়া আলজ্জিতভাবে খাইতে বসিয়াছেন। নিচে বাগানে মালী তখন ঝারিতে করিয়া গাছে গাছে জল দিতেছিল; সেই সিক্ত মৃত্তিকার স্নিগ্ধ গন্ধ বহন করিয়া চৈত্রের দক্ষিণ-বাতাস মহেন্দ্রের শুভ্র কুঞ্চিত সুবাসিত চাদরের প্রান্তকে দুর্দাম করিয়া তুলিতেছিল। আশপাশের দ্বার-জানালার ছিদ্রান্তরাল হইতে একটু-আধটু চাপা হাসি, ফিসফিস কথা, দুটা-একটা গহনার টুংটাং যেন শুনা যায়।

আহারের পর অনুকূলবাবু ভিতরের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "চুনি, পান নিয়ে আয় তো রে।"

কিছুক্ষণ পরে সংকোচের ভাবে পশ্চাতের একটা দরজা খুলিয়া গেল এবং একটি

বালিকা কোথা হইতে সর্বাঙ্গে রাজ্যের লজ্জা জড়াইয়া আনিয়া পানের বাটা হাতে অনুকূলবাবুর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তিনি কহিলেন, “লজ্জা কী, মা। বাটা ওই ওঁদের সামনে রাখো।”

বালিকা নত হইয়া কম্পিতহস্তে পানের বাটা অতিথিদের আসন-পার্শ্বে ভূমিতে রাখিয়া দিল। বারান্দার পশ্চিম-প্রান্ত হইতে সূর্যাস্ত-আভা তাহার লজ্জিত মুখকে মণ্ডিত করিয়া গেল। সেই অবকাশে মহেন্দ্র সেই কম্পান্বিতা বালিকার করুণ মুখচ্ছবি দেখিয়া লইল।

বালিকা তখনি চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে অনুকূলবাবু কহিলেন, “একটু দাঁড়া, চুনি। বিহারীবাবু, এইটি আমার ছোটো ভাই অপূর্বর কন্যা। সে তো চলিয়া গেছে, এখন আমি ছাড়া ইহার আর কেহ নাই।” বলিয়া তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

মহেন্দ্রের হৃদয়ে দয়ার আঘাত লাগিল। অনাথার দিকে আর-একবার চাহিয়া দেখিল।

কেহ তাহার বয়স স্পষ্ট করিয়া বলিত না। আত্মীয়েরা বলিত, “এই বারো-তেরো হইবে।” অর্থাৎ চৌদ্দ-পনেরো হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। কিন্তু অনুগ্রহপালিত বলিয়া একটি কুণ্ঠিত ভীরু ভাবে তাহার নবযৌবনারম্ভকে সংযত সংবৃত করিয়া রাখিয়াছে।

আর্দ্রচিত্ত মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার নাম কী।” অনুকূলবাবু উৎসাহ দিয়া কহিলেন, “বলো মা, তোমার নাম বলো।” বালিকা তাহার অভ্যস্ত আদেশ-পালনের ভাবে নতমুখে বলিল, “আমার নাম আশালতা।”

আশা! মহেন্দ্রের মনে হইল নামটি বড়ো করুণ এবং কণ্ঠটি বড়ো কোমল। অনাথা আশা!

দুই বন্ধু পথে বাহির হইয়া আসিয়া গাড়ি ছাড়িয়া দিল। মহেন্দ্র কহিল, “বিহারী, এ মেয়েটিকে তুমি ছাড়িয়ো না।”

বিহারী তাহার স্পষ্ট উত্তর না করিয়া কহিল, “মেয়েটিকে দেখিয়া উহার মাসিমাকে মনে পড়ে; বোধ হয় অমনি লক্ষ্মী হইবে।”

মহেন্দ্র কহিল, “তোমার স্কন্ধে যে বোঝা চাপাইলাম, এখন বোধ হয় তাহার ভার তত গুরুতর বোধ হইতেছে না।”

বিহারী কহিল, “না, বোধ হয় সহ্য করিতে পারিব।”

মহেন্দ্র কহিল, “কাজ কী এত কষ্ট করিয়া। তোমার বোঝা না হয় আমিই স্কন্ধে তুলিয়া লই। কী বল।”

বিহারী গম্ভীরভাবে মহেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিল। কহিল, "মহিনদা, সত্য বলিতেছ ? এখনো ঠিক করিয়া বলো। তুমি বিবাহ করিলে কাকী ঢের বেশি খুশি হইবেন— তাহা হইলে তিনি মেয়েটিকে সর্বদাই কাছে রাখিতে পারিবেন।"

মহেন্দ্র কহিল, "তুমি পাগল হইয়াছ ? সে হইলে অনেক কাল আগে হইয়া যাইত।"

বিহারী অধিক আপত্তি না করিয়া চলিয়া গেল, মহেন্দ্রও সোজা পথ ছাড়িয়া দীর্ঘ পথ ধরিয়া বহুবিলম্বে ধীরে ধীরে বাড়ি গিয়া পৌঁছিল।

মা তখন লুচিভাজা-ব্যাপারে ব্যস্ত ছিলেন, কাকী তখনো তাঁহার বোনঝির নিকট হইতে ফেরেন নাই।

মহেন্দ্র একা নির্জন ছাদের উপর গিয়া মাদুর পাতিয়া শুইল। কলিকাতার হর্ম্যশিখরপুঞ্জের উপর শুক্লসপ্তমীর অর্ধচন্দ্র নিঃশব্দে আপন অপরূপ মায়ামন্ত্র বিকীর্ণ করিতেছিল। মা যখন খাবার খবর দিলেন, মহেন্দ্র অলসস্বরে কহিল, "বেশ আছি, এখন আর উঠিতে পারি না।"

মা কহিলেন, "এইখানেই আনিয়া দিই না ?"

মহেন্দ্র কহিল, "আজ আর খাইব না, আমি খাইয়া আসিয়াছি।"

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় খাইতে গিয়াছিলি।"

মহেন্দ্র কহিল, "সে অনেক কথা, পরে বলিব।"

মহেন্দ্রের এই অভূতপূর্ব ব্যবহারে অভিমানিনী মাতা কোনো উত্তর না করিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন।

তখন মুহূর্তের মধ্যে আত্মসংবরণ করিয়া অনুতপ্ত মহেন্দ্র কহিল, "মা, আমার খাবার এইখানেই আনো।"

মা কহিলেন, "ক্ষুধা না থাকে তো দরকার কী।"

এই লইয়া ছেলেতে মায়েতে কিয়ৎক্ষণ মান-অভিমানের পর মহেন্দ্রকে পুনশ্চ আহারে বসিতে হইল।

৩

রাত্রে মহেন্দ্রের ভালো নিদ্রা হইল না। প্রত্যুষেই সে বিহারীর বাসায় আসিয়া উপস্থিত। কহিল, "ভাই, ভাবিয়া দেখিলাম, কাকীমার মনোগত ইচ্ছা আমিই তাঁহার বোনঝিকে বিবাহ করি।"

বিহারী কহিল, "সেজন্য তো হঠাৎ নূতন করিয়া ভাবিবার কোনো দরকার ছিল না। তিনি তো ইচ্ছা নানাপ্রকারেই ব্যক্ত করিয়াছেন।"

মহেন্দ্র কহিল, "তাই বলিতেছি, আমার মনে হয়, আশাকে আমি বিবাহ না করিলে তাঁহার মনে একটা খেদ থাকিয়া যাইবে।"

বিহারী কহিল, "সম্ভব বটে।"

মহেন্দ্র কহিল, "আমার মনে হয়, সেটা আমার পক্ষে নিতান্ত অন্যায় হইবে।"

বিহারী কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিক উৎসাহের সহিত কহিল, "বেশ কথা, সে তো ভালো কথা, তুমি রাজি হইলে তো আর কোনো কথাই থাকে না। এ কর্তব্যবুদ্ধি কাল তোমার মাথায় আসিলেই তো ভালো হইত।"

মহেন্দ্র। একদিন দেরিতে আসিয়া কী এমন ক্ষতি হইল।

যেই বিবাহের প্রস্তাবে মহেন্দ্র মনকে লাগাম ছাড়িয়া দিল, সেই তাহার পক্ষে ধৈর্য রক্ষা করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, "আর অধিক কথাবার্তা না হইয়া কাজটা সম্পন্ন হইয়া গেলেই ভালো হয়।"

মাকে গিয়া কহিল, "আচ্ছা মা, তোমার অনুরোধ রাখিব। বিবাহ করিতে রাজি হইলাম।"

মা মনে মনে কহিলেন, "বুঝিয়াছি, সেদিন মেজবউ কেন হঠাৎ তাহার বোনঝিকে দেখিতে চলিয়া গেল এবং মহেন্দ্র সাজিয়া বাহির হইল।"

তাঁহার বারংবার অনুরোধ অপেক্ষা অন্নপূর্ণার চক্রান্ত যে সফল হইল, ইহাতে তিনি সমস্ত বিশ্ববিধানের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "একটি ভালো মেয়ে সন্ধান করিতেছি।"

মহেন্দ্র আশার উল্লেখ করিয়া কহিল, "কন্যা তো পাওয়া গেছে।"

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "সে-কন্যা হইবে না বাছা, তাহা আমি বলিয়া রাখিতেছি।"

মহেন্দ্র যথেষ্ট সংযত ভাষায় কহিল, "কেন মা, মেয়েটি তো মন্দ নয়।"

রাজলক্ষ্মী। তাহার তিন কুলে কেহ নাই, তাহার সহিত বিবাহ দিয়া আমার কুটুম্বের সুখ কী হইবে।

মহেন্দ্র। কুটুম্বের সুখ না হইলেও আমি দুঃখিত হইব না, কিন্তু মেয়েটিকে আমার বেশ পছন্দ হইয়াছে, মা।

ছেলের জেদ দেখিয়া রাজলক্ষ্মীর চিত্ত আরো কঠিন হইয়া উঠিল। অন্নপূর্ণাকে গিয়া কহিলেন, "বাপ-মা-মরা অলক্ষণা কন্যার সহিত আমার এক ছেলের বিবাহ দিয়া তুমি আমার ছেলেকে আমার কাছ হইতে ভাঙাইয়া লইতে চাও? এতবড়ো শয়তানি!"

অন্নপূর্ণা কাঁদিয়া কহিলেন, "মহিনের সঙ্গে বিবাহের কোনো কথাই হয় নাই, সে আপন ইচ্ছামতো তোমাকে কী বলিয়াছে, আমিও জানি না।"

৩—৩৮

মহেন্দ্রের মা সে-কথা কিছুমাত্র বিশ্বাস করিলেন না। তখন অন্নপূর্ণা বিহারীকে ডাকাইয়া সাশ্রুনেত্রে কহিলেন, "তোমার সঙ্গেই তো সব ঠিক হইয়াছিল, আবার কেন উল্‌টাইয়া দিলে। আবার তোমাকেই মত দিতে হইবে। তুমি উদ্ধার না করিলে আমাকে বড়ো লজ্জায় পড়িতে হইবে। মেয়েটি বড়ো লক্ষ্মী, তোমার অযোগ্য হইবে না।"

বিহারী কহিল, "কাকীমা, সে-কথা আমাকে বলা বাহুল্য। তোমার বোনঝি যখন, তখন আমার অমতের কোনো কথাই নাই। কিন্তু মহেন্দ্র— "

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "না বাছা, মহেন্দ্রের সঙ্গে তাহার কোনোমতেই বিবাহ হইবার নয়। আমি তোমাকে সত্য কথাই বলিতেছি, তোমার সঙ্গে বিবাহ হইলেই আমি সব চেয়ে নিশ্চিন্ত হই। মহিনের সঙ্গে সম্বন্ধে আমার মত নাই।"

বিহারী কহিল, "কাকী, তোমার যদি মত না থাকে, তাহা হইলে কোনো কথাই নাই।"

এই বলিয়া সে রাজলক্ষ্মীর নিকটে গিয়া কহিল, "মা, কাকীর বোনঝির সঙ্গে আমার বিবাহ স্থির হইয়া গেছে, আত্মীয় স্ত্রীলোক কেহ কাছে নাই— কাজেই লজ্জার মাথা খাইয়া নিজেই খবরটা দিতে হইল।"

রাজলক্ষ্মী। বলিস কী, বিহারী। বড়ো খুশি হইলাম। মেয়েটি লক্ষ্মী মেয়ে, তোর উপযুক্ত। এ মেয়ে কিছুতেই হাতছাড়া করিসনে।

বিহারী। হাতছাড়া কেন হইবে। মহিনদা নিজে পছন্দ করিয়া আমার সঙ্গে সম্বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

এই সকল বাধাবিঘ্নে মহেন্দ্র দ্বিগুণ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সে মা ও কাকীর উপর রাগ করিয়া একটা দীনহীন ছাত্রাবাসে গিয়া আশ্রয় লইল।

রাজলক্ষ্মী কাঁদিয়া অন্নপূর্ণার ঘরে উপস্থিত হইলেন— কহিলেন, "মেজবউ, আমার ছেলে বুঝি উদাস হইয়া ঘর ছাড়িল, তাহাকে রক্ষা করো।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "দিদি, একটু ধৈর্য ধরিয়া থাকো— দু-দিন বাদেই তাহার রাগ পড়িয়া যাইবে।"

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "তুমি তাহাকে জান না। সে যাহা চায়, না পাইলে যাহা-খুশি করিতে পারে। তোমার বোনঝির সঙ্গে যেমন করিয়া হউক, তার— "

অন্নপূর্ণা। 'দিদি, সে কী করিয়া হয়— বিহারীর সঙ্গে কথাবার্তা একপ্রকার পাকা হইয়াছে।

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "সে ভাঙিতে কতক্ষণ।" বলিয়া বিহারীকে ডাকিয়া কহিলেন,

"বাবা, তোমার জন্য ভালো পাত্রী দেখিয়া দিতেছি, এই কন্যাটি ছাড়িয়া দিতে হইবে, এ তোমার যোগ্যই নয়।"

বিহারী কহিল, "না মা, সে হয় না। সে সমস্তই ঠিক হইয়া গেছে।"

তখন রাজলক্ষ্মী অন্নপূর্ণাকে গিয়া কহিলেন, "আমার মাথা খাও মেজবউ, তোমার পায়ে ধরি, তুমি বিহারীকে বলিলেই সব ঠিক হইবে।"

অন্নপূর্ণা বিহারীকে কহিলেন, "বিহারী, তোমাকে বলিতে আমার মুখ সরিতেছে না, কিন্তু কী করি বলো। আশা তোমার হাতে পড়িলেই আমি বড়ো নিশ্চিন্ত হইতাম, কিন্তু সব তো জানিতেছই—"

বিহারী। বুঝিয়াছি, কাকী। তুমি যেমন আদেশ করিবে, তাহাই হইবে। কিন্তু আমাকে আর কখনো কাহারো সঙ্গে বিবাহের জন্য অনুরোধ করিয়ো না।

বলিয়া বিহারী চলিয়া গেল। অন্নপূর্ণার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল, মহেন্দ্রের অকল্যাণ-আশঙ্কায় মুছিয়া ফেলিলেন। বার বার মনকে বুঝাইলেন—যাহা হইল, তাহা ভালোই হইল।

এইরূপে রাজলক্ষ্মী, অন্নপূর্ণা এবং মহেন্দ্রের মধ্যে নিষ্ঠুর নিগূঢ় নীরব ঘাত-প্রতিঘাত চলিতে চলিতে বিবাহের দিন সমাগত হইল। বাতি উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিল, শানাই মধুর হইয়া বাজিল, মিষ্টান্নে মিষ্টের ভাগ লেশমাত্র কম পড়িল না।

আশা সজ্জিতসুন্দরদেহে, লজ্জিতমুগ্ধমুখে আপন নূতন সংসারে প্রথম পদার্পণ করিল; তাহার এই কুলায়ের মধ্যে কোথাও যে কোনো কণ্টক আছে, তাহা তাহার কম্পিত-কোমল হৃদয় অনুভব করিল না; বরঞ্চ জগতে তাহার একমাত্র মাতৃস্থানীয়া অন্নপূর্ণার কাছে আসিতেছে বলিয়া আশ্বাসে ও আনন্দে তাহার সর্বপ্রকার ভয় সংশয় দূর হইয়া গেল।

বিবাহের পর রাজলক্ষ্মী মহেন্দ্রকে ডাকিয়া কহিলেন, "আমি বলি, এখন বউমা কিছুদিন তাঁর জেঠার বাড়ি গিয়াই থাকুন।"

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "কেন মা।"

মা কহিলেন, "এবারে তোমার একজামিন আছে, পড়াশুনার ব্যাঘাত হইতে পারে।"

মহেন্দ্র। আমি কি ছেলেমানুষ। নিজের ভালোমন্দ বুঝে চলিতে পারি না?

রাজলক্ষ্মী। তা হোক না বাপু, আর-একটা বৎসর বই তো নয়।

মহেন্দ্র কহিল, "বউয়ের বাপ-মা যদি কেহ থাকিতেন, তাহাদের কাছে পাঠাইতে আপত্তি ছিল না—কিন্তু জেঠার বাড়িতে আমি উহাকে রাখিতে পারিব না।"

রাজলক্ষ্মী। (আত্মগত) ওরে বাস্‌ রে! উনিই কর্তা, শাশুড়ী কেহ নয়! কাল বিয়ে করিয়া আজই এত দরদ! কর্তারা তো আমাদেরও একদিন বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু এমন স্ত্রৈণতা, এমন বেহায়াপনা তো তখন ছিল না!

মহেন্দ্র খুব জোরের সহিত কহিল, "কিছু ভাবিয়ো না মা। একজামিনের কোনো ক্ষতি হইবে না।"

৪

রাজলক্ষ্মী তখন হঠাৎ অপরিমিত উৎসাহে বধূকে ঘরকন্নার কাজ শিখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভাঁড়ার-ঘর, রান্নাঘর, ঠাকুরঘরেই আশার দিনগুলি কাটিল, রাত্রে রাজলক্ষ্মী তাহাকে নিজের বিছানায় শোয়াইয়া তাহার আত্মীয়বিচ্ছেদের ক্ষতিপূরণ করিতে লাগিলেন।

অন্নপূর্ণা অনেক বিবেচনা করিয়া বোনঝির নিকট হইতে দূরেই থাকিতেন।

যখন কোনো প্রবল অভিভাবক একটা ইক্ষুদণ্ডের সমস্ত রস প্রায় নিঃশেষপূর্বক চর্বণ করিতে থাকে তখন হতাশ্বাস লুব্ধ বালকের ক্ষোভ উত্তরোত্তর যেমন অসহ্য বাড়িয়া উঠে, মহেন্দ্রের সেই দশা হইল। ঠিক তাহার চোখের সম্মুখেই নবযৌবনা নববধূর সমস্ত মিষ্টরস যে কেবল ঘরকন্নার দ্বারা পিষ্ট হইতে থাকিবে, ইহা কি সহ্য হয়।

মহেন্দ্র অন্নপূর্ণাকে গিয়া কহিল, "কাকী, মা বউকে যেরূপ খাটাইয়া মারিতেছেন, আমি তো তাহা দেখিতে পারি না।"

অন্নপূর্ণা জানিতেন, রাজলক্ষ্মী বাড়াবাড়ি করিতেছেন, কিন্তু বলিলেন, "কেন মহিন, বউকে ঘরের কাজ শেখানো হইতেছে, ভালোই হইতেছে। এখনকার মেয়েদের মতো নভেল পড়িয়া, কার্পেট বুনিয়া, বাবু হইয়া থাকা কি ভালো।"

মহেন্দ্র উত্তেজিত হইয়া বলিল, "এখনকার মেয়ে এখনকার মেয়ের মতোই হইবে, তা ভালোই হউক আর মন্দই হউক। আমার স্ত্রী যদি আমারই মতো নভেল পড়িয়া রস গ্রহণ করিতে পারে, তবে তাহাতে পরিতাপ বা পরিহাসের বিষয় কিছুই দেখি না।"

অন্নপূর্ণার ঘরে পুত্রের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া রাজলক্ষ্মী সব কর্ম ফেলিয়া চলিয়া আসিলেন। তীব্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী! তোমাদের কিসের পরামর্শ চলিতেছে।"

মহেন্দ্র উত্তেজিতভাবেই বলিল, "পরামর্শ কিছু নয় মা, বউকে ঘরের কাজে আমি দাসীর মতো খাটিতে দিতে পারিব না।"

মা তাঁহার উদ্দীপ্ত জ্বালা দমন করিয়া অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ধীর ভাবে কহিলেন, "তাঁহাকে লইয়া কী করিতে হইবে !"

মহেন্দ্র কহিল, "তাহাকে আমি লেখাপড়া শিখাইব।"

রাজলক্ষ্মী কিছু না কহিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন ও মুহূর্তপরে বধূর হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া মহেন্দ্রের সম্মুখে স্থাপিত করিয়া কহিলেন, "এই লও, তোমার বধূকে তুমি লেখাপড়া শেখাও।"

এই বলিয়া অন্নপূর্ণার দিকে ফিরিয়া গলবস্ত্র-জোড়করে কহিলেন, "মাপ করো মেজগিন্নি, মাপ করো। তোমার বোনঝির মর্যাদা আমি বুঝিতে পারি নাই ; উঁহার কোমল হাতে আমি হলুদের দাগ লাগাইয়াছি, এখন তুমি উঁহাকে ধুইয়া মুছিয়া বিবি সাজাইয়া মহিনের হাতে দাও— উনি পায়ের উপর পা দিয়া লেখাপড়া শিখুন, দাসীবৃত্তি আমি করিব।"

এই বলিয়া রাজলক্ষ্মী নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া সশব্দে অর্গল বন্ধ করিলেন।

অন্নপূর্ণা ক্ষোভে মাটির উপর বসিয়া পড়িলেন। আশা এই আকস্মিক গৃহ-বিপ্লবের কোনো তাৎপর্য না বুঝিয়া লজ্জায় ভয়ে দুঃখে বিবর্ণ হইয়া গেল। মহেন্দ্র অত্যন্ত রাগিয়া মনে মনে কহিল, "আর নয়, নিজের স্ত্রীর ভার নিজের হাতে লইতেই হইবে, নহিলে অন্যায় হইবে।"

ইচ্ছার সহিত কর্তব্যবুদ্ধি মিলিত হইতেই হাওয়ার সঙ্গে আগুন লাগিয়া গেল। কোথায় গেল কালেজ, এক্‌জামিন, বন্ধুকৃত্য, সামাজিকতা ; স্ত্রীর উন্নতি সাধন করিতে মহেন্দ্র তাহাকে লইয়া ঘরে ঢুকিল— কাজের প্রতি দৃক্‌পাত বা লোকের প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্রও করিল না।

অভিমানিনী রাজলক্ষ্মী মনে মনে কহিলেন, "মহেন্দ্র যদি এখন তার বউকে লইয়া আমার দ্বারে হত্যা দিয়া পড়ে, তবু আমি তাকাইব না, দেখি সে তার মাকে বাদ দিয়া স্ত্রীকে লইয়া কেমন করিয়া কাটায়।"

দিন যায়— দ্বারের কাছে কোনো অনুতপ্তের পদশব্দ শুনা গেল না।

রাজলক্ষ্মী স্থির করিলেন, ক্ষমা চাহিতে আসিলে ক্ষমা করিবেন— নহিলে মহেন্দ্রকে অত্যন্ত ব্যথা দেওয়া হইবে।

ক্ষমার আবেদন আসিয়া পৌঁছিল না। তখন রাজলক্ষ্মী স্থির করিলেন, তিনি নিজে গিয়াই ক্ষমা করিয়া আসিবেন। ছেলে অভিমান করিয়া আছে বলিয়া কি মাও অভিমান করিয়া থাকিবে।

তেতলার ছাদের এক কোণে একটি ক্ষুদ্র গৃহে মহেন্দ্রের শয়ন এবং অধ্যয়নের

স্থান। এ কয়দিন মা তাহার কাপড় গোছানো, বিছানা তৈরি, ঘরদুয়ার পরিষ্কার করায় সম্পূর্ণ অবহেলা করিয়াছিলেন। কয়দিন মাতৃস্নেহের চিরাভ্যস্ত কর্তব্যগুলি পালন না করিয়া তাঁহার হৃদয় স্তন্যভারাতুর স্তনের ন্যায় অন্তরে অন্তরে ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেদিন দ্বিপ্রহরে ভাবিলেন, "মহেন্দ্র এতক্ষণে কালেজে গেছে, এই অবকাশে তাহার ঘর ঠিক করিয়া আসি— কালেজ হইতে ফিরিয়া আসিলেই সে অবিলম্বে বুঝিতে পারিবে, তাহার ঘরে মাতৃহস্ত পড়িয়াছে।"

রাজলক্ষ্মী সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিলেন। মহেন্দ্রের শয়নগৃহের একটা দ্বার খোলা ছিল, তাহার সম্মুখে আসিতেই যেন হঠাৎ কাঁটা বিঁধিল, চমকিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন, নিচের বিছানায় মহেন্দ্র নিদ্রিত এবং দ্বারের দিকে পশ্চাৎ করিয়া বধূ ধীরে ধীরে তাহার পায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছে। মধ্যাহ্নের প্রখর আলোকে উন্মুক্ত দ্বারে দাম্পত্যলীলার এই অভিনয় দেখিয়া রাজলক্ষ্মী লজ্জায় ধিক্‌কারে সংকুচিত হইয়া নিঃশব্দে নিচে নামিয়া আসিলেন।

৫

কিছুকাল অনাবৃষ্টিতে যে শস্যদল শুষ্ক পীতবর্ণ হইয়া আসে, বৃষ্টি পাইবামাত্র সে আর বিলম্ব করে না; হঠাৎ বাড়িয়া উঠিয়া দীর্ঘকালের উপবাসদৈন্য দূর করিয়া দেয়, দুর্বল নত ভাব ত্যাগ করিয়া শস্যক্ষেত্রের মধ্যে অসংকোচে অসংশয়ে আপনার অধিকার উন্নত ও উজ্জ্বল করিয়া তোলে, আশার সেইরূপ হইল। যেখানে তাহার রক্তের সম্বন্ধ ছিল, সেখানে সে কখনো আত্মীয়তার দাবি করিতে পায় নাই; আজ পরের ঘরে আসিয়া সে যখন বিনা প্রার্থনায় এক নিকটতম সম্বন্ধ এবং নিঃসন্দিগ্ধ অধিকার প্রাপ্ত হইল, যখন সেই অযত্নলালিতা অনাথার মস্তকে স্বামী স্বহস্তে লক্ষ্মীর মুকুট পরাইয়া দিলেন, তখন সে আপন গৌরবপদ গ্রহণ করিতে লেশমাত্র বিলম্ব করিল না, নববধূযোগ্য লজ্জাভয় দূর করিয়া দিয়া সৌভাগ্যবতী স্ত্রীর মহিমায় মুহূর্তের মধ্যেই স্বামীর পদপ্রান্তে অসংকোচে আপন সিংহাসন অধিকার করিল।

রাজলক্ষ্মী সেদিন মধ্যাহ্নে সেই সিংহাসনে এই নূতন-আগত পরের মেয়েকে এমন চিরাভ্যস্তবৎ স্পর্ধার সহিত বসিয়া থাকিতে দেখিয়া দুঃসহ বিস্ময়ে নিচে নামিয়া আসিলেন। নিজের চিত্তদাহে অন্নপূর্ণাকে দগ্ধ করিতে গেলেন। কহিলেন, "ওগো দেখো গে, তোমার নবাবের পুত্রী নবাবের ঘর হইতে কী শিক্ষা লইয়া আসিয়াছেন। কর্তারা থাকিলে আজ—"

অন্নপূর্ণা কাতর হইয়া কহিলেন, "দিদি, তোমার বউকে তুমি শিক্ষা দিবে, শাসন করিবে, আমাকে কেন বলিতেছ।"

রাজলক্ষ্মী ধনুষ্টংকারের মতো বাজিয়া উঠিলেন, "আমার বউ? তুমি মন্ত্রী থাকিতে সে আমাকে গ্রাহ্য করিবে!"

তখন অন্নপূর্ণা সশব্দপদক্ষেপে দম্পতিকে সচকিত সচেতন করিয়া মহেন্দ্রের শয়নগৃহে উপস্থিত হইলেন। আশাকে কহিলেন, "তুই এমনি করিয়া আমার মাথা হেঁট করিবি পোড়ারমুখী? লজ্জা নাই, শরম নাই, সময় নাই, অসময় নাই, বৃদ্ধা শাশুড়ীর উপর সমস্ত ঘরকন্না চাপাইয়া তুমি এখানে আরাম করিতেছ? আমার পোড়াকপাল, আমি তোমাকে এই ঘরে আনিয়াছিলাম!"

বলিতে বলিতে তাঁহার চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িল— আশাও নতমুখে বস্ত্রাঞ্চল খুঁটিতে খুঁটিতে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল।

মহেন্দ্র কহিল, "কাকী, তুমি বউকে কেন অন্যায় ভর্ৎসনা করিতেছ। আমিই তো উহাকে ধরিয়া রাখিয়াছি।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "সে কি ভালো কাজ করিয়াছ? ও বালিকা, অনাথা, মার কাছ হইতে কোনোদিন কোনো শিক্ষা পায় নাই, ও ভালোমন্দর কী জানে। তুমি উহাকে কী শিক্ষা দিতেছ?"

মহেন্দ্র কহিল, "এই দেখো, উহার জন্যে স্লেট, খাতা, বই কিনিয়া আনিয়াছি। আমি বউকে লেখাপড়া শিখাইব, তা লোকে নিন্দাই করুক, আর তোমরা রাগই কর।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "তাই কি সমস্ত দিনই শিখাইতে হইবে। সন্ধ্যার পর এক-আধ ঘণ্টা পড়ালেই তো ঢের হয়।"

মহেন্দ্র। অত সহজ নয়, কাকী—পড়াশুনায় একটু সময়ের দরকার হয়।

অন্নপূর্ণা বিরক্ত হইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। আশাও ধীরে ধীরে তাঁহার অনুসরণের উপক্রম করিল— মহেন্দ্র দ্বার রোধ করিয়া দাঁড়াইল— আশার করুণ সজল নেত্রের কাতর অনুনয় মানিল না। কহিল, "রোসো, ঘুমাইয়া সময় নষ্ট করিয়াছি, সেটা পোষাইয়া লইতে হইবে।"

এমন গম্ভীরপ্রকৃতি শ্রদ্ধেয় মূঢ় থাকিতেও পারেন যিনি মনে করিবেন, মহেন্দ্র নিদ্রাবেশে পড়াইবার সময় নষ্ট করিয়াছে; বিশেষরূপে তাঁহাদের অবগতির জন্য বলা আবশ্যক যে, মহেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে অধ্যাপন-কার্য যেরূপে নির্বাহ হয়, কোনো স্কুলের ইনস্পেক্টর তাহার অনুমোদন করিবেন না।

আশা তাহার স্বামীকে বিশ্বাস করিয়াছিল; সে বস্তুতই মনে করিয়াছিল, লেখাপড়া শেখা তাহার পক্ষে নানা কারণে সহজ নহে বটে, কিন্তু স্বামীর আদেশবশত নিতান্তই কর্তব্য। এইজন্য সে প্রাণপণে অশান্ত বিক্ষিপ্ত মনকে সংযত করিয়া আনিত, শয়নগৃহের মেঝের উপর ঢালা বিছানার এক পার্শ্বে অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বসিত এবং পুঁথিপত্রের দিকে একেবারে ঝুঁকিয়া পড়িয়া মাথা দুলাইয়া মুখস্থ করিতে আরম্ভ করিত। শয়নগৃহের অপর প্রান্তে ছোটো টেবিলের উপর ডাক্তারি বই খুলিয়া মাস্টারমশায় চৌকিতে বসিয়া আছেন, মাঝে মাঝে কটাক্ষপাতে ছাত্রীর মনোযোগ লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছেন। দেখিতে দেখিতে হঠাৎ ডাক্তারি বই বন্ধ করিয়া মহেন্দ্র আশার ডাক-নাম ধরিয়া ডাকিল, "চুনি।" চকিত আশা মুখ তুলিয়া চাহিল। মহেন্দ্র কহিল, "বইটা আনো দেখি— দেখি কোন্‌খানটা পড়িতেছ।"

আশার ভয় উপস্থিত হইল, পাছে মহেন্দ্র পরীক্ষা করে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার আশা অল্পই ছিল। কারণ, চারুপাঠের চারুত্ব-প্রলোভনে তাহার অবাধ্য মন কিছুতেই বশ মানে না; বল্মীক সম্বন্ধে সে যতই জ্ঞানলাভের চেষ্টা করে, অক্ষরগুলো ততই তাহার দৃষ্টিপথের উপর দিয়া কালো পিপীলিকার মতো সার বাঁধিয়া চলিয়া যায়।

পরীক্ষকের ডাক শুনিয়া অপরাধীর মতো আশা ভয়ে ভয়ে বইখানি লইয়া মহেন্দ্রের চৌকির পাশে আসিয়া উপস্থিত হয়। মহেন্দ্র এক হাতে কটিদেশ বেষ্টনপূর্বক তাহাকে দৃঢ়রূপে বন্দী করিয়া অপর হাতে বই ধরিয়া কহে, "আজ কতটা পড়িলে দেখি।" আশা যতগুলা লাইনে চোখ বুলাইয়াছিল, দেখাইয়া দেয়। মহেন্দ্র ক্ষুণ্ণস্বরে বলে, "উঃ! এতটা পড়িতে পারিয়াছ? আমি কতটা পড়িয়াছি দেখিবে?" বলিয়া তাহার ডাক্তারি বইয়ের কোনো-একটা অধ্যায়ের শিরোনামাটুকু মাত্র দেখাইয়া দেয়। আশা বিস্ময়ে চোখদুটো ডাগর করিয়া বলে, "তবে এতক্ষণ কী করিতেছিলে।" মহেন্দ্র তাহার চিবুক ধরিয়া বলে, "আমি এক জনের কথা ভাবিতেছিলাম, কিন্তু যাহার কথা ভাবিতেছিলাম সেই নিষ্ঠুর তখন চারুপাঠে উইপোকার অত্যন্ত মনোহর বিবরণ লইয়া ভুলিয়া ছিল।" আশা এই অমূলক অভিযোগের বিরুদ্ধে উপযুক্ত জবাব দিতে পারিত— কিন্তু হায়, কেবলমাত্র লজ্জার খাতিরে প্রেমের প্রতিযোগিতায় অন্যায় পরাভব নীরবে মানিয়া লইতে হয়।

ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হইবে, মহেন্দ্রের এই পাঠশালাটি সরকারি বা বেসরকারি কোনো বিদ্যালয়ের কোনো নিয়ম মানিয়া চলে না।

হয়তো এক দিন মহেন্দ্র উপস্থিত নাই—সেই সুযোগে আশা পাঠে মন দিবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় কোথা হইতে মহেন্দ্র আসিয়া তাহার চোখ টিপিয়া

ধরিল, পরে তাহার বই কাড়িয়া লইল, কহিল, "নিষ্ঠুর, আমি না থাকিলে তুমি আমার কথা ভাব না, পড়া লইয়া থাক ?"

আশা কহিল, "তুমি আমাকে মূর্খ করিয়া রাখিবে ?"

মহেন্দ্র কহিল, "তোমার কল্যাণে আমারই বা বিদ্যা এমনই কী অগ্রসর হইতেছে।"

কথাটা আশাকে হঠাৎ বাজিল ; তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইবার উপক্রম করিয়া কহিল, "আমি তোমার পড়ায় কী বাধা দিয়াছি।"

মহেন্দ্র তাহার হাত ধরিয়া কহিল, "তুমি তাহার কী বুঝিবে। আমাকে ছাড়িয়া তুমি যত সহজে পড়া করিতে পার, তোমাকে ছাড়িয়া তত সহজে আমি আমার পড়া করিতে পারি না।"

গুরুতর দোষারোপ। ইহার পরে স্বভাবতই শরতের এক পসলার মতো এক দফা কান্নার সৃষ্টি হয় এবং অনতিকালমধ্যেই কেবল একটি সজল উজ্জ্বলতা রাখিয়া সোহাগের সূর্যালোকে তাহা বিলীন হইয়া যায়।

শিক্ষক যদি শিক্ষার সর্বপ্রধান অন্তরায় হন, তবে অবলা ছাত্রীর সাধ্য কী বিদ্যারণ্যের মধ্যে পথ করিয়া চলে। মাঝে মাঝে মাসিমার তীব্র ভর্ৎসনা মনে পড়িয়া চিত্ত বিচলিত হয়— বুঝিতে পারে, লেখাপড়া একটা ছুতা মাত্র ; শাশুড়ীকে দেখিলে লজ্জায় মরিয়া যায়। কিন্তু শাশুড়ী তাহাকে কোনো কাজ করিতে বলেন না, কোনো উপদেশ দেন না ; অনাদিষ্ট হইয়া আশা শাশুড়ীর গৃহকার্যে সাহায্য করিতে গেলে, তিনি ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলেন, "কর কী, কর কী, শোবার ঘরে যাও, তোমার পড়া কামাই যাইতেছে।"

অবশেষে অন্নপূর্ণা আশাকে কহিলেন, "তোর যা শিক্ষা হইতেছে, সে তো দেখিতেছি, এখন মহিনকেও কি ডাক্তারি দিতে দিবি না।"

শুনিয়া আশা মনকে খুব শক্ত করিল— মহেন্দ্রকে বলিল, "তোমার একজামিনের পড়া হইতেছে না— আজ হইতে আমি নিচে মাসিমার ঘরে গিয়া থাকিব।"

এ বয়সে এতবড়ো কঠিন সন্ন্যাসব্রত ! শয়নালয় হইতে একেবারে মাসিমার ঘরে আত্মনির্বাসন ! এই কঠোর প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করিতে তাহার চোখের প্রান্তে জল আসিয়া পড়িল, তাহার অবাধ্য ক্ষুদ্র অধর কাঁপিয়া উঠিল এবং কণ্ঠস্বর রুদ্ধপ্রায় হইয়া আসিল।

মহেন্দ্র কহিল, "তবে তাই চলো, কাকীর ঘরেই যাওয়া যাক— কিন্তু তাহা হইলে তাঁহাকে উপরে আমাদের ঘরে আসিতে হইবে।"

আশা এতবড়ো উদার গম্ভীর প্রস্তাবে পরিহাস প্রাপ্ত হইয়া রাগ করিল। মহেন্দ্র

কহিল, "তার চেয়ে তুমি স্বয়ং দিনরাত্রি আমাকে চোখে চোখে রাখিয়া পাহারা দাও, দেখো আমি এক্‌জামিনের পড়া মুখস্থ করি কি না।"

অতি সহজেই সেই কথা স্থির হইল। চোখে চোখে পাহারার কার্য কিরূপ ভাবে নির্বাহ হইত, তাহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া অনাবশ্যক— কেবল এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সে-বৎসর মহেন্দ্র পরীক্ষায় ফেল করিল এবং চারুপাঠের বিস্তারিত বর্ণনা সত্ত্বেও পুরুভুজ সম্বন্ধে আশার অনভিজ্ঞতা দূর হইল না।

এইরূপ অপূর্ব পঠন-পাঠন-ব্যাপার যে সম্পূর্ণ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। বিহারী মাঝে মাঝে আসিয়া অত্যন্ত গোল বাধাইয়া দিত। "মহিনদা, মহিনদা" করিয়া সে পাড়া মাথায় করিয়া তুলিত। মহেন্দ্রকে তাহার শয়নগৃহের বিবর হইতে টানিয়া না বাহির করিয়া সে কোনোমতেই ছাড়িত না। পড়ায় শৈথিল্য করিতেছে বলিয়া সে মহেন্দ্রকে বিস্তর ভর্ৎসনা করিত। আশাকে বলিত, "বউঠান, গিলিয়া খাইলে হজম হয় না, চিবাইয়া খাইতে হয়— এখন সমস্ত অন্ন এক গ্রাসে গিলিতেছ, ইহার পরে হজমি গুলি খুঁজিয়া পাইবে না।"

মহেন্দ্র বলিত, "চুনি, ও-কথা শুনিয়ো না— বিহারী আমাদের সুখে হিংসা করিতেছে।"

বিহারী বলিত, "সুখ যখন তোমার হাতেই আছে, তখন এমন করিয়া ভোগ করো যাহাতে পরের হিংসা না হয়।"

মহেন্দ্র উত্তর করিত, "পরের হিংসা পাইতে যে সুখ আছে। চুনি, আর একটু হইলেই আমি গর্দভের মতো তোমাকে বিহারীর হাতে সমর্পণ করিতেছিলাম।"

বিহারী রক্তবর্ণ হইয়া বলিয়া উঠিত, "চুপ!"

এই সকল ব্যাপারে আশা মনে মনে বিহারীর উপরে ভারি বিরক্ত হইত। এক সময় তাহার সহিত বিহারীর বিবাহ-প্রস্তাব হইয়াছিল বলিয়াই বিহারীর প্রতি তাহার এক প্রকার বিমুখ ভাব ছিল, বিহারী তাহা বুঝিত এবং মহেন্দ্র তাহা লইয়া আমোদ করিত।

রাজলক্ষ্মী বিহারীকে ডাকিয়া দুঃখ করিতেন। বিহারী কহিত, "মা, পোকা যখন গুটি বাঁধে, তখন তত বেশি ভয় নয়— কিন্তু যখন কাটিয়া উড়িয়া যায়, তখন ফেরানো শক্ত। কে মনে করিয়াছিল, ও তোমার বন্ধন এমন করিয়া কাটিবে।"

মহেন্দ্রের ফেল-করা সংবাদে রাজলক্ষ্মী গ্রীষ্মকালের আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডের মতো দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু তাহার গর্জন এবং দাহনটা সম্পূর্ণ ভোগ করিলেন অন্নপূর্ণা। তাঁহার আহারনিদ্রা দূর হইল।

৬

একদিন নববর্ষার বর্ষণমুখরিত মেঘাচ্ছন্ন সায়াহ্নে গায়ে একখানি সুবাসিত ফুরফুরে চাদর এবং গলায় একগাছি জুঁইফুলের গোড়ে মালা পরিয়া মহেন্দ্র আনন্দমনে শয়নগৃহে প্রবেশ করিল। হঠাৎ আশাকে বিস্ময়ে চকিত করিবে বলিয়া জুতার শব্দ করিল না। ঘরে উঁকি দিয়া দেখিল, পুবদিকের খোলা জানালা দিয়া প্রবল বাতাস বৃষ্টির ছাঁট লইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, বাতাসে দীপ নিবিয়া গেছে এবং আশা নিচের বিছানার উপরে পড়িয়া অব্যক্তকণ্ঠে কাঁদিতেছে।

মহেন্দ্র দ্রুতপদে কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কী হইয়াছে।"

বালিকা দ্বিগুণ আবেগে কাঁদিয়া উঠিল। অনেকক্ষণ পরে মহেন্দ্র ক্রমশ উত্তর পাইল যে, মাসিমা আর সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার পিসতুত ভাইয়ের বাসায় চলিয়া গেছেন।

মহেন্দ্র রাগিয়া মনে করিল, "গেলেন যদি, এমন বাদলার সন্ধ্যাটা মাটি করিয়া গেলেন!"

শেষকালে সমস্ত রাগ মাতার উপরে পড়িল। তিনিই তো সকল অশান্তির মূল।

মহেন্দ্র কহিল, "কাকী যেখানে গেছেন, আমরাও সেইখানে যাইব, দেখি, মা কাহাকে লইয়া ঝগড়া করেন।"

বলিয়া অনাবশ্যক শোরগোল করিয়া জিনিসপত্র বাঁধাবাঁধি মুটে-ডাকাডাকি শুরু করিয়া দিল।

রাজলক্ষ্মী সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিলেন। ধীরে ধীরে মহেন্দ্রের কাছে আসিয়া শান্তস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাইতেছিস।"

মহেন্দ্র প্রথমে কোনো উত্তর করিল না। দুই-তিনবার প্রশ্নের পর উত্তর করিল, "কাকীর কাছে যাইব।"

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "তোদের কোথাও যাইতে হইবে না, আমিই তোর কাকীকে আনিয়া দিতেছি।"

বলিয়া তৎক্ষণাৎ পালকি চড়িয়া অন্নপূর্ণার বাসায় গেলেন। গলায় কাপড় দিয়া জোড়হাত করিয়া কহিলেন, "প্রসন্ন হও মেজবউ, মাপ করো।"

অন্নপূর্ণা শশব্যস্ত হইয়া রাজলক্ষ্মীর পায়ের ধুলা লইয়া কাতরস্বরে কহিলেন, "দিদি, কেন আমাকে অপরাধী করিতেছ। তুমি যেমন আজ্ঞা করিবে তাই করিব।"

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "তুমি চলিয়া আসিয়াছ বলিয়া আমার ছেলে বউ ঘর ছাড়িয়া আসিতেছে।" বলিতে বলিতে অভিমানে ক্রোধে ধিক্‌কারে তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন।

দুই জা বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন। তখনো বৃষ্টি পড়িতেছে। অন্নপূর্ণা মহেন্দ্রের ঘরে যখন গেলেন, তখন আশার রোদন শান্ত হইয়াছে এবং মহেন্দ্র নানা কথার ছলে তাহাকে হাসাইবার চেষ্টা করিতেছে। লক্ষণ দেখিয়া বোধ হয়, বাদলার সন্ধ্যাটা সম্পূর্ণ ব্যর্থ না যাইতেও পারে।

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "চুনি, তুই আমাকে ঘরেও থাকিতে দিবি না, অন্য কোথাও গেলেও সঙ্গে লাগিবি? আমার কি কোথাও শান্তি নাই?"

আশা অকস্মাৎ বিদ্ধ মৃগীর মতো চকিত হইয়া উঠিল।

মহেন্দ্র একান্ত বিরক্ত হইয়া কহিল, "কেন কাকী, চুনি তোমার কী করিয়াছে।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "বউ-মানুষের এত বেহায়াপনা দেখিতে পারি না বলিয়াই চলিয়া গিয়াছিলাম, আবার শাশুড়ীকে কাঁদাইয়া কেন আমাকে ধরিয়া আনিল পোড়ারমুখী।"

জীবনের কবিত্ব-অধ্যায়ে মা-খুড়ী যে এমন বিঘ্ন, তাহা মহেন্দ্র জানিত না।

পরদিন রাজলক্ষ্মী বিহারীকে ডাকাইয়া কহিলেন, "বাছা, তুমি একবার মহিনকে বলো, অনেক দিন দেশে যাই নাই, আমি বারাশতে যাইতে চাই।"

বিহারী কহিল, "অনেক দিনই যখন যান নাই তখন আর নাই গেলেন। আচ্ছা, আমি মহিনদাকে বলিয়া দেখি, কিন্তু সে যে কিছুতেই রাজি হইবে, তা বোধ হয় না।"

মহেন্দ্র কহিল, "তা, জন্মস্থান দেখিতে ইচ্ছা হয় বটে। কিন্তু বেশি দিন মার সেখানে না থাকাই ভালো— বর্ষার সময় জায়গাটা ভালো নয়।"

মহেন্দ্র সহজেই সম্মতি দিল দেখিয়া বিহারী বিরক্ত হইল। কহিল, "মা একলা যাইবেন, কে তাঁহাকে দেখিবে। বোঠানকেও সঙ্গে পাঠাইয়া দাও না!" বলিয়া একটু হাসিল।

বিহারীর গূঢ় ভর্ৎসনায় মহেন্দ্র কুণ্ঠিত হইয়া কহিল, "তা বুঝি আর পারি না!" কিন্তু কথাটা ইহার অধিক আর অগ্রসর হইল না।

এমনি করিয়াই বিহারী আশার চিত্ত বিমুখ করিয়া দেয়, এবং আশা তাহার উপরে বিরক্ত হইতেছে মনে করিয়া সে যেন একপ্রকারের শুষ্ক আমোদ অনুভব করে।

বলা বাহুল্য, রাজলক্ষ্মী জন্মস্থান দেখিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক ছিলেন না। গ্রীষ্মে নদী যখন কমিয়া আসে, তখন মাঝি যেমন পদে পদে লগি ফেলিয়া দেখে কোথায় কত জল, রাজলক্ষ্মীও তেমনি ভাবান্তরের সময় মাতাপুত্রের সম্পর্কের মধ্যে লগি ফেলিয়া দেখিতেছিলেন। তাঁহার বারাশতে যাওয়ার প্রস্তাব যে এত শীঘ্র এত সহজেই তল পাইবে, তাহা তিনি আশা করেন নাই। মনে মনে কহিলেন, "অন্নপূর্ণার গৃহত্যাগে এবং আমার গৃহত্যাগে প্রভেদ আছে— সে হইল মন্ত্র-জানা ডাইনী, আর আমি হইলাম শুদ্ধমাত্র মা, আমার যাওয়াই ভালো।"

অন্নপূর্ণা ভিতরকার কথাটা বুঝিলেন, তিনি মহেন্দ্রকে বলিলেন, "দিদি গেলে আমিও থাকিতে পারিব না।"

মহেন্দ্র রাজলক্ষ্মীকে কহিল, "শুনিতেছ মা? তুমি গেলে কাকীও যাইবেন, তাহা হইলে আমাদের ঘরের কাজ চলিবে কী করিয়া।"

রাজলক্ষ্মী বিদ্বেষবিষে জর্জরিত হইয়া কহিলেন, "তুমি যাইবে মেজবউ? এও কি কখনো হয়। তুমি গেলে চলিবে কী করিয়া। তোমার থাকা চাই-ই।"

রাজলক্ষ্মীর আর বিলম্ব সহিল না। পরদিন মধ্যাহ্নেই তিনি দেশে যাইবার জন্য প্রস্তুত। মহেন্দ্রই যে তাঁহাকে দেশে রাখিয়া আসিবে, এ বিষয়ে বিহারীর বা আর-কাহারো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু সময়কালে দেখা গেল, মহেন্দ্র মার সঙ্গে এক জন সরকার ও দরোয়ান পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে।

বিহারী কহিল, "মহিনদা, তুমি যে এখনো তৈরি হও নাই?"

মহেন্দ্র লজ্জিত হইয়া কহিল, "আমার আবার কালেজের—।"

বিহারী কহিল, "আচ্ছা তুমি থাকো, মাকে আমি পৌঁছাইয়া দিয়া আসিব।"

মহেন্দ্র মনে মনে রাগিল। বিরলে আশাকে কহিল, "বাস্তবিক, বিহারী বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছে। ও দেখাইতে চায়, যেন ও আমার চেয়ে মার কথা বেশি ভাবে।"

অন্নপূর্ণাকে থাকিতে হইল, কিন্তু তিনি লজ্জায় ক্ষোভে ও বিরক্তিতে সংকুচিত হইয়া রহিলেন। খুড়ীর এইরূপ দূরভাব দেখিয়া মহেন্দ্র রাগ করিল এবং আশাও অভিমান করিয়া রহিল।

৭

রাজলক্ষ্মী জন্মভূমিতে পৌঁছিলেন। বিহারী তাঁহাকে পৌঁছাইয়া চলিয়া আসিবে, এরূপ কথা ছিল, কিন্তু সেখানকার অবস্থা দেখিয়া সে ফিরিল না।

রাজলক্ষ্মীর পৈতৃক বাটীতে দুই-একটি অতিবৃদ্ধা বিধবা বাঁচিয়া ছিলেন মাত্র। চারিদিকে ঘন জঙ্গল ও বাঁশবন, পুষ্করিণীর জল সবুজবর্ণ, দিনে-দুপুরে শেয়ালের ডাকে রাজলক্ষ্মীর চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠে।

বিহারী কহিল, "মা, জন্মভূমি বটে, কিন্তু 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' কোনোমতেই বলিতে পারি না। কলিকাতায় চলো। এখানে তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলে আমার অধর্ম হইবে।"

রাজলক্ষ্মীরও প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল, এমন সময় বিনোদিনী আসিয়া তাঁহাকে আশ্রয় দিল এবং আশ্রয় করিল।

বিনোদিনীর পরিচয় প্রথমেই দেওয়া হইয়াছে। এক সময়ে মহেন্দ্র এবং তদভাবে বিহারীর সহিত তাহার বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল। বিধিনির্বন্ধে যাহার সহিত তাহার শুভবিবাহ হয়, সে লোকটির সমস্ত অন্তরিন্দ্রিয়ের মধ্যে প্লীহাই ছিল সর্বাপেক্ষা প্রবল। সেই প্লীহার অতিভারেই সে দীর্ঘকাল জীবনধারণ করিতে পারিল না।

তাহার মৃত্যুর পর হইতে বিনোদিনী, জঙ্গলের মধ্যে একটিমাত্র উদ্যানলতার মতো, নিরানন্দ পল্লীর মধ্যে মুহ্যমান ভাবে জীবনযাপন করিতেছিল। অদ্য সেই অনাথা আসিয়া তাহার রাজলক্ষ্মী-পিস্‌শাশঠাকরুনকে ভক্তিভরে প্রণাম করিল এবং তাঁহার সেবায় আত্মসমর্পণ করিয়া দিল।

সেবা ইহাকেই বলে! মুহূর্তের জন্য আলস্য নাই। কেমন পরিপাটি কাজ, কেমন সুন্দর রান্না, কেমন সুমিষ্ট কথাবার্তা।

রাজলক্ষ্মী বলেন, "বেলা হইল মা, তুমি দুটি খাও গে যাও।"

সে কি শোনে? পাখা করিয়া পিসিমাকে ঘুম না পাড়াইয়া সে উঠে না।

রাজলক্ষ্মী বলেন, "এমন করিলে যে তোমার অসুখ করিবে, মা।"

বিনোদিনী নিজের প্রতি নিরতিশয় তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়া বলে, "আমাদের দুঃখের শরীরে অসুখ করে না, পিসিমা। আহা, কত দিন পরে জন্মভূমিতে আসিয়াছ, এখানে কী আছে, কী দিয়া তোমাকে আদর করিব।"

বিহারী দুই দিনে পাড়ার কর্তা হইয়া উঠিল। কেহ তাহার কাছে রোগের ঔষধ কেহ বা মোকদ্দমার পরামর্শ লইতে আসে, কেহ বা নিজের ছেলেকে বড়ো আপিসে কাজ জুটাইয়া দিবার জন্য তাহাকে ধরে, কেহ বা তাহার কাছে দরখাস্ত লিখাইয়া লয়। বৃদ্ধদের তাসপাশার বৈঠক হইতে বাগদিদের তাড়িপানসভা পর্যন্ত সর্বত্র সে তাহার সকৌতুক কৌতূহল এবং স্বাভাবিক হৃদ্যতা লইয়া যাতায়াত করিত— কেহ তাহাকে দূর মনে করিত না, অথচ সকলেই তাহাকে সম্মান করিত।

বিনোদিনী এই অস্থানে পতিত কলিকাতার ছেলেটির নির্বাসনদণ্ডও যথাসাধ্য লঘু করিবার জন্য অন্তঃপুরের অন্তরাল হইতে চেষ্টা করিত। বিহারী প্রত্যেক বার পাড়া পর্যটন করিয়া আসিয়া দেখিত, কে তাহার ঘরটিকে প্রত্যেক বার পরিপাটি পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, একটি কাঁসার গ্লাসে দু-চারটি ফুল এবং পাতার তোড়া সাজাইয়াছে এবং তাহার গদির একধারে বঙ্কিম ও দীনবন্ধুর গ্রন্থাবলী গুছাইয়া রাখিয়াছে। গ্রন্থের ভিতরের মলাটে মেয়েলি অথচ পাকা অক্ষরে বিনোদিনীর নাম লেখা।

পল্লীগ্রামের প্রচলিত আতিথ্যের সহিত ইহার একটু প্রভেদ ছিল। বিহারী তাহারই উল্লেখ করিয়া প্রশংসাবাদ করিলে রাজলক্ষ্মী কহিতেন, "এই মেয়েকে কি না তোরা অগ্রাহ্য করিলি।"

বিহারী হাসিয়া কহিত, "ভালো করি নাই মা, ঠকিয়াছি। কিন্তু বিবাহ না করিয়া ঠকা ভালো— বিবাহ করিয়া ঠকিলেই মুশকিল।"

রাজলক্ষ্মী কেবলি মনে করিতে লাগিলেন, "আহা, এই মেয়েই তো আমার বধূ হইতে পারিত। কেন হইল না।"

রাজলক্ষ্মী কলিকাতায় ফিরিবার প্রসঙ্গমাত্র উত্থাপন করিলে বিনোদিনীর চোখ ছলছল করিয়া উঠিত। সে বলিত, "পিসিমা, তুমি দু-দিনের জন্যে কেন এলে। যখন তোমাকে জানিতাম না, দিন তো এক রকম করিয়া কাটিত। এখন তোমাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া থাকিব।"

রাজলক্ষ্মী মনের আবেগে বলিয়া ফেলিতেন, "মা, তুই আমার ঘরের বউ হলিনে কেন, তা হইলে তোকে বুকের মধ্যে করিয়া রাখিতাম।"

সে-কথা শুনিয়া বিনোদিনী কোনো ছুতায় লজ্জায় সেখান হইতে উঠিয়া যাইত।

রাজলক্ষ্মী কলিকাতা হইতে একটা কাতর অনুনয়পত্রের অপেক্ষায় ছিলেন। তাঁহার মহিন জন্মাবধি কখনো এতদিন মাকে ছাড়িয়া থাকে নাই— নিশ্চয় এতদিনে মার বিচ্ছেদ তাহাকে অধীর করিয়া তুলিতেছে। রাজলক্ষ্মী তাঁহার ছেলের অভিমান এবং আবদারের সেই চিঠিখানির জন্য তৃষিত হইয়া ছিলেন।

বিহারী মহেন্দ্রের চিঠি পাইল। মহেন্দ্র লিখিয়াছে, "মা বোধ হয় অনেক দিন পরে জন্মভূমিতে গিয়া বেশ সুখে আছেন।"

রাজলক্ষ্মী ভাবিলেন, "আহা, মহেন্দ্র অভিমান করিয়া লিখিয়াছে। সুখে আছেন! হতভাগিনী মা নাকি মহেন্দ্রকে ছাড়িয়া কোথাও সুখে থাকিতে পারে।"

"ও বিহারী, তার পরে মহিন কী লিখিয়াছে, পড়িয়া শোনা না বাছা।"

বিহারী কহিল, "তার পরে কিছুই না মা।" বলিয়া চিঠিখানা মুঠার মধ্যে দলিত করিয়া একটা বহির মধ্যে পুরিয়া ঘরের এক কোণে ধপ করিয়া ফেলিয়া দিল।

রাজলক্ষ্মী কি আর স্থির থাকিতে পারেন। নিশ্চয়ই মহিন মার উপর এমন রাগ করিয়া লিখিয়াছে যে, বিহারী তাঁহাকে পড়িয়া শোনাইল না।

বাছুর যেমন গাভীর স্তনে আঘাত করিয়া দুগ্ধ এবং বাৎসল্যের সঞ্চার করে, মহেন্দ্রের রাগ তেমনি রাজলক্ষ্মীকে আঘাত করিয়া তাঁহার অবরুদ্ধ বাৎসল্যকে উৎসারিত করিয়া দিল। তিনি মহেন্দ্রকে ক্ষমা করিলেন। কহিলেন, "আহা, বউ লইয়া মহিন সুখে আছে, সুখে থাক্— যেমন করিয়া হোক সে সুখী হোক। বউকে লইয়া আমি তাহাকে আর কোনো কষ্ট দিব না। আহা, যে-মা কখনো তাহাকে এক দণ্ড ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, সেই মা চলিয়া আসিয়াছে বলিয়া মহিন মার 'পরে রাগ করিয়াছে!" বার বার তাঁর চোখ দিয়া জল উছলিয়া উঠিতে লাগিল।

সেদিন রাজলক্ষ্মী বিহারীকে বার বার আসিয়া বলিলেন, "যাও বাবা, তুমি স্নান করো গে যাও। এখানে তোমার বড়ো অনিয়ম হইতেছে।"

বিহারীরও সেদিন স্নানাহারে যেন প্রবৃত্তি ছিল না— সে কহিল, "মা, আমার মতো লক্ষ্মীছাড়ারা অনিয়মেই ভালো থাকে।"

রাজলক্ষ্মী পীড়াপীড়ি করিয়া কহিলেন, "না বাছা, তুমি স্নান করিতে যাও।"

বিহারী সহস্র বার অনুরুদ্ধ হইয়া নাহিতে গেল। সে ঘরের বাহির হইবামাত্রই রাজলক্ষ্মী বহির ভিতর হইতে তাড়াতাড়ি সেই কুঞ্চিতদলিত চিঠিখানি বাহির করিয়া লইলেন।

বিনোদিনীর হাতে চিঠি দিয়া কহিলেন, "দেখো তো মা, মহিন বিহারীকে কী লিখিয়াছে।"

বিনোদিনী পড়িয়া শুনাইতে লাগিল। মহেন্দ্র প্রথমটা মার কথা লিখিয়াছে; কিন্তু সে অতি অল্পই— বিহারী যতটুকু শুনাইয়াছিল, তাহার অধিক নহে।

তার পরেই আশার কথা। মহেন্দ্র রঙ্গে রহস্যে আনন্দে যেন মাতাল হইয়া লিখিয়াছে।

বিনোদিনী একটুখানি পড়িয়া শুনাইয়াই লজ্জিত হইয়া থামিয়া কহিল, "পিসিমা, ও আর কী শুনিবে।"

রাজলক্ষ্মীর স্নেহব্যগ্র মুখের ভাব এক মুহূর্তের মধ্যেই পাথরের মতো শক্ত হইয়া যেন জমিয়া গেল। রাজলক্ষ্মী একটুখানি চুপ করিয়া রহিলেন, তার পরে বলিলেন, "থাক্।" বলিয়া চিঠি ফেরত না লইয়াই চলিয়া গেলেন।

বিনোদিনী সেই চিঠিখানা লইয়া ঘরে ঢুকিল। ভিতর হইতে দ্বার বন্ধ করিয়া বিছানার উপর বসিয়া পড়িতে লাগিল।

চিঠির মধ্যে বিনোদিনী কী রস পাইল, তাহা বিনোদিনীই জানে। কিন্তু তাহা কৌতুকরস নহে। বার বার করিয়া পড়িতে পড়িতে তাহার দুই চক্ষু মধ্যাহ্নের বালুকার মতো জ্বলিতে লাগিল, তাহার নিশ্বাস মরুভূমির বাতাসের মতো উত্তপ্ত হইয়া উঠিল।

মহেন্দ্র কেমন, আশা কেমন, মহেন্দ্র-আশার প্রণয় কেমন, ইহাই তাহার মনের মধ্যে কেবলই পাক খাইতে লাগিল। চিঠিখানা কোলের উপর চাপিয়া ধরিয়া পা ছড়াইয়া দেয়ালের উপর হেলান দিয়া অনেকক্ষণ সম্মুখে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

মহেন্দ্রের সে-চিঠি বিহারী আর খুঁজিয়া পাইল না।

সেইদিন মধ্যাহ্নে হঠাৎ অন্নপূর্ণা আসিয়া উপস্থিত। দুঃসংবাদের আশঙ্কা করিয়া রাজলক্ষ্মীর বুকটা হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিল— কোনো প্রশ্ন করিতে তিনি সাহস করিলেন না, অন্নপূর্ণার দিকে পাংশুবর্ণ মুখে চাহিয়া রহিলেন।

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "দিদি, কলিকাতার খবর সব ভালো।"

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "তবে তুমি এখানে যে।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "দিদি, তোমার ঘরকন্নার ভার তুমি লও'সে। আমার আর সংসারে মন নাই। আমি কাশী যাইব বলিয়া যাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছি। তাই তোমাকে প্রণাম করিতে আসিলাম। জ্ঞানে অজ্ঞানে অনেক অপরাধ করিয়াছি, মাপ করিয়ো। আর তোমার বউ, (বলিতে বলিতে চোখ ভরিয়া উঠিয়া জল পড়িতে লাগিল) সে ছেলেমানুষ, তার মা নাই, সে দোষী হোক নির্দোষ হোক সে তোমার।" আর বলিতে পারিলেন না।

রাজলক্ষ্মী ব্যস্ত হইয়া তাঁহার স্নানাহারের ব্যবস্থা করিতে গেলেন। বিহারী খবর পাইয়া গদাই ঘোষের চণ্ডীমণ্ডপ হইতে ছুটিয়া আসিল। অন্নপূর্ণাকে প্রণাম করিয়া কহিল, "কাকীমা, সে কি হয়? আমাদের তুমি নির্মম হইয়া ফেলিয়া যাইবে?"

অন্নপূর্ণা অশ্রু দমন করিয়া কহিলেন, "আমাকে আর ফিরাইবার চেষ্টা করিসনে, বেহারি— তোরা সব সুখে থাক্, আমার জন্যে কিছুই আটকাইবে না।"

বিহারী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তারপরে কহিল, "মহেন্দ্রের ভাগ্য মন্দ, তোমাকে সে বিদায় করিয়া দিল।"

অন্নপূর্ণা চকিত হইয়া কহিলেন, "অমন কথা বলিসনে। আমি মহিনের উপর কিছুই রাগ করি নাই। আমি না গেলে সংসারের মঙ্গল হইবে না।"

বিহারী দূরের দিকে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। অন্নপূর্ণা অঞ্চল হইতে এক জোড়া মোটা সোনার বালা খুলিয়া কহিলেন, “বাবা, এই বালাজোড়া তুমি রাখো— বউমা যখন আসিবেন, আমার আশীর্বাদ দিয়া তাঁহাকে পরাইয়া দিয়ো।”

বিহারী বালাজোড়া মাথায় ঠেকাইয়া অশ্রু সংবরণ করিতে পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

বিদায়কালে অন্নপূর্ণা কহিলেন, “বেহারি, আমার মহিনকে আর আমার আশাকে দেখিস।” রাজলক্ষ্মীর হস্তে একখানি কাগজ দিয়া বলিলেন, “শ্বশুরের সম্পত্তিতে আমার যে অংশ আছে, তাহা এই দানপত্রে মহেন্দ্রকে লিখিয়া দিলাম। আমাকে কেবল মাসে মাসে পনেরোটি করিয়া টাকা পাঠাইয়া দিয়ো।”

বলিয়া ভূতলে পড়িয়া রাজলক্ষ্মীর পদধূলি মাথায় তুলিয়া লইলেন এবং বিদায় হইয়া তীর্থোদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

৮

আশা কেমন ভয় পাইয়া গেল। এ কী হইল। মা চলিয়া যান, মাসিমা চলিয়া যান। তাহাদের সুখ যেন সকলকেই তাড়াইতেছে, এবার যেন তাহাকেই তাড়াইবার পালা। পরিত্যক্ত শূন্য গৃহস্থালির মাঝখানে দাম্পত্যের নূতন প্রেমলীলা তাহার কাছে কেমন অসংগত ঠেকিতে লাগিল।

সংসারের কঠিন কর্তব্য হইতে প্রেমকে ফুলের মতো ছিঁড়িয়া স্বতন্ত্র করিয়া লইলে, তাহা কেবল আপনার রসে আপনাকে সজীব রাখিতে পারে না, তাহা ক্রমেই বিমর্ষ ও বিকৃত হইয়া আসে। আশাও মনে মনে দেখিতে লাগিল, তাহাদের অবিশ্রাম মিলনের মধ্যে একটা শ্রান্তি ও দুর্বলতা আছে। সে মিলন যেন থাকিয়া থাকিয়া কেবলই মুষড়িয়া পড়ে— সংসারের দৃঢ় ও প্রশস্ত আশ্রয়ের অভাবে তাহাকে টানিয়া খাড়া রাখাই কঠিন হয়। কাজের মধ্যেই প্রেমের মূল না থাকিলে, ভোগের বিকাশ পরিপূর্ণ এবং স্থায়ী হয় না।

মহেন্দ্রও আপনার বিমুখ সংসারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া আপন প্রেমোৎসবের সকল বাতিগুলাই একসঙ্গে জ্বালাইয়া খুব সমারোহের সহিত শূন্যগৃহের অকল্যাণের মধ্যে মিলনের আনন্দ সমাধা করিতে চেষ্টা করিল। আশার মনে সে একটুখানি খোঁচা দিয়াই কহিল, “চুনি, তোমার আজকাল কী হইয়াছে বলো দেখি। মাসি গেছেন, তা লইয়া অমন মন ভার করিয়া আছ কেন। আমাদের দু-জনার ভালোবাসাতেই কি সকল ভালোবাসার অবসান নয়?”

আশা দুঃখিত হইয়া ভাবিত, "তবে তো আমার ভালোবাসায় একটা কী অসম্পূর্ণতা আছে। আমি তো মাসির কথা প্রায়ই ভাবি ; শাশুড়ী চলিয়া গেছেন বলিয়া তো আমার ভয় হয়।" তখন সে প্রাণপণে এই সকল প্রেমের অপরাধ ক্ষালন করিতে চেষ্টা করে।

এখন গৃহকর্ম ভালো করিয়া চলে না— চাকরবাকরেরা ফাঁকি দিতে আরম্ভ করিয়াছে। একদিন ঝি অসুখ করিয়াছে বলিয়া আসিল না, বামুনঠাকুর মদ খাইয়া নিরুদ্দেশ হইয়া রহিল। মহেন্দ্র আশাকে কহিল, "বেশ মজা হইয়াছে, আজ আমরা নিজেরা রন্ধনের কাজ সারিয়া লইব।"

মহেন্দ্র গাড়ি করিয়া নিউ মার্কেটে বাজার করিতে গেল। কোন্ জিনিসটা কী পরিমাণে দরকার, তাহা তাহার কিছুমাত্র জানা ছিল না— কতকগুলা বোঝা লইয়া আনন্দে ঘরে ফিরিয়া আসিল। সেগুলা লইয়া যে কী করিতে হইবে, আশাও তাহা ভালোরূপ জানে না। পরীক্ষায় বেলা দুটা-তিনটা হইয়া গেল এবং নানাবিধ অভূতপূর্ব অখাদ্য উদ্ভাবন করিয়া মহেন্দ্র অত্যন্ত আমোদ বোধ করিল। আশা মহেন্দ্রের আমোদে যোগ দিতে পারিল না, আপন অজ্ঞতা ও অক্ষমতায় মনে মনে অত্যন্ত লজ্জা ও ক্ষোভ পাইল।

ঘরে ঘরে জিনিসপত্রের এমনি বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে যে, আবশ্যকের সময়ে কোনো জিনিস খুঁজিয়া পাওয়াই কঠিন। মহেন্দ্রের চিকিৎসার অস্ত্র একদিন তরকারি কুটিবার কার্যে নিযুক্ত হইয়া আবর্জনার মধ্যে অজ্ঞাতবাস গ্রহণ করিল এবং তাহার নোটের খাতা হাতপাখার অ্যাকটিনি করিয়া রান্নাঘরের ভস্মশয্যায় বিশ্রাম করিতে লাগিল।

এই সকল অভাবনীয় ব্যবস্থাবিপর্যয়ে মহেন্দ্রের কৌতুকের সীমা রহিল না, কিন্তু আশা ব্যথিত হইতে থাকিল। উচ্ছৃঙ্খল যথেচ্ছাচারের স্রোতে সমস্ত ঘরকন্না ভাসাইয়া হাস্যমুখে ভাসিয়া চলা বালিকার কাছে বিভীষিকাজনক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

একদিন সন্ধ্যার সময় দুই জনে ঢাকা-বারান্দায় বিছানা করিয়া বসিয়াছে। সম্মুখে খোলা ছাদ। বৃষ্টির পরে কলিকাতার দিগন্তব্যাপী সৌধশিখরশ্রেণী জ্যোৎস্নায় প্লাবিত। বাগান হইতে রাশীকৃত ভিজা বকুল সংগ্রহ করিয়া আশা নতশিরে মালা গাঁথিতেছে। মহেন্দ্র তাহা লইয়া টানাটানি করিয়া, বাধা ঘটাইয়া, প্রতিকূল সমালোচনা করিয়া, অনর্থক একটা কলহ সৃষ্টি করিবার উদ্‌যোগ করিতেছিল। আশা এই সকল অকারণ উৎপীড়ন লইয়া তাহাকে ভর্ৎসনা করিবার উপক্রম

করিবামাত্র মহেন্দ্র কোনো একটি কৃত্রিম উপায়ে আশার মুখ বন্ধ করিয়া শাসনবাক্য অঙ্কুরেই বিনাশ করিতেছিল।

এমন সময় প্রতিবেশীর বাড়ির পিঞ্জরের মধ্য হইতে পোষা কোকিল কুহু কুহু করিয়া ডাকিয়া উঠিল। তখনই মহেন্দ্র এবং আশা তাহাদের মাথার উপরে দোতুল্যমান খাঁচার দিকে দৃষ্টিপাত করিল। তাহাদের কোকিল প্রতিবেশী কোকিলের কুহুধ্বনি কখনো নীরবে সহ্য করে নাই, আজ সে জবাব দেয় না কেন?

আশা উৎকণ্ঠিত হইয়া কহিল, “পাখির আজ কী হইল।”

মহেন্দ্র কহিল, “তোমার কণ্ঠ শুনিয়া লজ্জাবোধ করিতেছে।”

আশা সানুনয়স্বরে কহিল, “না, ঠাট্টা নয়, দেখো না উহার কী হইয়াছে।”

মহেন্দ্র তখন খাঁচা পাড়িয়া নামাইল। খাঁচার আবরণ খুলিয়া দেখিল, পাখি মরিয়া গেছে। অন্নপূর্ণার যাওয়ার পর বেহারা ছুটি লইয়া গিয়াছিল, পাখিকে কেহ দেখে নাই।

দেখিতে দেখিতে আশার মুখ ম্লান হইয়া গেল। তাহার আঙুল চলিল না— ফুল পড়িয়া রহিল। মহেন্দ্রের মনে আঘাত লাগিলেও, অকালে রসভঙ্গের আশঙ্কায় ব্যাপারটা সে হাসিয়া উড়াইবার চেষ্টা করিল। কহিল, “ভালোই হইয়াছে; আমি ডাক্তারি করিতে যাইতাম, আর ওটা কুহুস্বরে তোমাকে জ্বালাইয়া মারিত।” এই বলিয়া মহেন্দ্র আশাকে বাহুপাশে বেষ্টন করিয়া কাছে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিল।

আশা আস্তে আস্তে আপনাকে ছাড়াইয়া লইয়া আঁচল শূন্য করিয়া বকুলগুলা ফেলিয়া দিল। কহিল, “আর কেন। ছি ছি। তুমি শীঘ্র যাও, মাকে ফিরাইয়া আনো গে।”

৯

এমন সময় দোতলা হইতে “মহিনদা মহিনদা” রব উঠিল। “আরে কে হে, এস এস।” বলিয়া মহেন্দ্র জবাব দিল। বিহারীর সাড়া পাইয়া মহেন্দ্রের চিত্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বিবাহের পর বিহারী মাঝে মাঝে তাহাদের সুখের বাধাস্বরূপ আসিয়াছে— আজ সেই বাধাই সুখের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইল।

আশাও বিহারীর আগমনে আরাম বোধ করিল। মাথায় কাপড় দিয়া সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল দেখিয়া মহেন্দ্র কহিল, “যাও কোথায়। আর তো কেহ নয়, বিহারী আসিতেছে।”

আশা কহিল, "ঠাকুরপোর জলখাবারের বন্দোবস্ত করিয়া দিই গে।"

একটা কিছু কর্ম করিবার উপলক্ষ্য আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে আশার অবসাদ কতকটা লঘু হইয়া গেল।

আশা শাশুড়ীর সংবাদ জানিবার জন্য মাথায় কাপড় দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বিহারীর সহিত এখনো সে কথা কয় না।

বিহারী প্রবেশ করিয়াই কহিল, "আ সর্বনাশ। কী কবিত্বের মাঝখানেই পা ফেলিলাম। ভয় নাই বোঠান, তুমি বসো, আমি পালাই।"

আশা মহেন্দ্রের মুখে চাহিল। মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "বিহারী, মার কী খবর।"

বিহারী কহিল, "মা-খুড়ীর কথা আজ কেন ভাই। সে ঢের সময় আছে। Such a night was not made for sleep, nor for mothers and aunts!"

বলিয়া বিহারী ফিরিতে উদ্যত হইলে, মহেন্দ্র তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া আনিয়া বসাইল। বিহারী কহিল, "বোঠান, দেখো আমার অপরাধ নাই— আমাকে জোর করিয়া আনিল— পাপ করিল মহিনদা, তাহার অভিশাপটা আমার উপরে যেন না পড়ে।"

কোনো জবাব দিতে পারে না বলিয়াই এই সব কথায় আশা অত্যন্ত বিরক্ত হয়। বিহারী ইচ্ছা করিয়া তাহাকে জ্বালাতন করে।

বিহারী কহিল, "বাড়ির শ্রী তো দেখিতেছি— মাকে এখনো আনাইবার কি সময় হয় নাই।"

মহেন্দ্র কহিল, "বিলক্ষণ। আমরা তো তাঁর জন্যই অপেক্ষা করিয়া আছি।"

বিহারী কহিল, "সেই কথাটি তাঁহাকে জানাইয়া পত্র লিখিতে তোমার অল্পই সময় লাগিবে, কিন্তু তাঁহার সুখের সীমা থাকিবে না। বোঠান, মহিনদাকে সেই দু-মিনিট ছুটি দিতে হইবে, তোমার কাছে আমার এই আবেদন।"

আশা রাগিয়া চলিয়া গেল— তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

মহেন্দ্র কহিল, "কী শুভক্ষণেই যে তোমাদের দেখা হইয়াছিল। কিছুতেই সন্ধি হইল না— কেবলি ঠুকঠাক চলিতেছে।"

বিহারী কহিল, "তোমাকে তোমার মা তো নষ্ট করিয়াছেন, আবার স্ত্রীও নষ্ট করিতে বসিয়াছে। সেইটে দেখিতে পারি না বলিয়াই সময় পাইলে দুই-এক কথা বলি।"

মহেন্দ্র। তাহাতে ফল কী হয়।

বিহারী। ফল তোমার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই হয় না, আমার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ হয়।

১০

বিহারী নিজে বসিয়া মহেন্দ্রকে দিয়া চিঠি লিখাইয়া লইল এবং সে-চিঠি লইয়া পরদিনই রাজলক্ষ্মীকে আনিতে গেল। রাজলক্ষ্মী বুঝিলেন, এ-চিঠি বিহারীই লিখাইয়াছে— কিন্তু তবু আর থাকিতে পারিলেন না। সঙ্গে বিনোদিনী আসিল।

গৃহিণী ফিরিয়া আসিয়া গৃহের যেরূপ দুরবস্থা দেখিলেন— সমস্ত অমার্জিত, মলিন, বিপর্যস্ত— তাহাতে বধূর প্রতি তাঁহার মন আরো যেন বক্র হইয়া উঠিল।

কিন্তু বধূর এ কী পরিবর্তন। সে যে ছায়ার মতো তাঁহার অনুসরণ করে। আদেশ না পাইলেও তাঁহার কর্মে সহায়তা করিতে অগ্রসর হয়। তিনি শশব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠেন, "রাখো, রাখো, ও তুমি নষ্ট করিয়া ফেলিবে। জান না যে-কাজ সে-কাজে কেন হাত দেওয়া।"

রাজলক্ষ্মী স্থির করিলেন, অন্নপূর্ণা চলিয়া যাওয়াতেই বধূর এত উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু তিনি ভাবিলেন, "মহেন্দ্র মনে করিবে, খুড়ী যখন ছিল, তখন বধূকে লইয়া আমি বেশ নিষ্কণ্টকে সুখে ছিলাম— আর মা আসিতেই আমার বিরহদুঃখ আরম্ভ হইল। ইহাতে অন্নপূর্ণা যে তাহার হিতৈষী এবং মা যে তাহার সুখের অন্তরায়, ইহাই প্রমাণ হইবে। কাজ কী।"

আজকাল দিনের বেলা মহেন্দ্র ডাকিয়া পাঠাইলে, বধূ যাইতে ইতস্তত করিত— কিন্তু রাজলক্ষ্মী ভর্ৎসনা করিয়া বলিতেন, "মহিন ডাকিতেছে, সে বুঝি আর কানে তুলিতে নাই। বেশি আদর পাইলে শেষকালে এমনই ঘটিয়া থাকে। যাও, তোমার আর তরকারিতে হাত দিতে হইবে না।"

আবার সেই শ্লেট-পেনসিল-চারুপাঠ লইয়া মিথ্যা খেলা। ভালোবাসার অমূলক অভিযোগ লইয়া পরস্পরকে অপরাধী করা। উভয়ের মধ্যে কাহার প্রেমের ওজন বেশি, তাহা লইয়া বিনা-যুক্তিমূলে তুমুল তর্কবিতর্ক। বর্ষার দিনকে রাত্রি করা এবং জ্যোৎস্নারাত্রিকে দিন করিয়া তোলা। শ্রান্তি এবং অবসাদকে গায়ের জোরে দূর করিয়া দেওয়া। পরস্পরকে এমনি করিয়া অভ্যাস করা যে, সঙ্গ যখন অসাড় চিত্তে আনন্দ দিতেছে না তখনো ক্ষণকালের জন্য মিলনপাশ হইতে মুক্তি ভয়াবহ মনে হয়— সম্ভোগসুখ ভস্মাচ্ছন্ন, অথচ কর্মান্তরে যাইতেও পা ওঠে না। ভোগসুখের এই ভয়ংকর অভিশাপ যে, সুখ অধিক দিন থাকে না, কিন্তু বন্ধন দুশ্ছেদ্য হইয়া উঠে।

এমন সময় বিনোদিনী এক দিন আসিয়া আশার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "ভাই, তোমার সৌভাগ্য চিরকাল অক্ষয় হোক, কিন্তু আমি দুঃখিনী বলিয়া কি আমার দিকে একবার তাকাইতে নাই।"

আত্মীয়গৃহে বাল্যকাল হইতে পরের মতো লালিত হইয়াছিল বলিয়া, লোকসাধারণের নিকট আশার একপ্রকার আন্তরিক কুণ্ঠিতভাব ছিল। ভয় হইত, পাছে কেহ প্রত্যাখ্যান করে। বিনোদিনী যখন তাহার জোড়া ভুরু ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, তাহার নিখুঁত মুখ ও নিটোল যৌবন লইয়া উপস্থিত হইল, তখন আশা অগ্রসর হইয়া তাহার পরিচয় লইতে সাহস করিল না।

আশা দেখিল, শাশুড়ী রাজলক্ষ্মীর নিকট বিনোদিনীর কোনোপ্রকার সংকোচ নাই। রাজলক্ষ্মীও যেন আশাকে বিশেষ করিয়া দেখাইয়া দেখাইয়া বিনোদিনীকে বহুমান দিতেছেন, সময়ে-অসময়ে আশাকে বিশেষ করিয়া শুনাইয়া শুনাইয়া বিনোদিনীর প্রশংসাবাক্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছেন। আশা দেখিল, বিনোদিনী সর্বপ্রকার গৃহকর্মে সুনিপুণ,— প্রভুত্ব যেন তাহার পক্ষে নিতান্ত সহজ স্বভাবসিদ্ধ— দাসদাসীদিগকে কর্মে নিয়োগ করিতে, ভর্ৎসনা করিতে ও আদেশ করিতে সে লেশমাত্র কুণ্ঠিত নহে। এই সমস্ত দেখিয়া আশা বিনোদিনীর কাছে নিজেকে নিতান্ত ক্ষুদ্র মনে করিল।

সেই সর্বগুণশালিনী বিনোদিনী যখন অগ্রসর হইয়া আশার প্রণয় প্রার্থনা করিল, তখন সংকোচের বাধায় ঠেকিয়াই বালিকার আনন্দ আরো চার গুণ উছলিয়া পড়িল। জাদুকরের মায়াতরুর মতো তাহাদের প্রণয়বীজ এক দিনেই অঙ্কুরিত, পল্লবিত ও পুষ্পিত হইয়া উঠিল।

আশা কহিল, "এস ভাই, তোমার সঙ্গে একটা কিছু পাতাই।"

বিনোদিনী হাসিয়া কহিল, "কী পাতাইবে।"

আশা গঙ্গাজল, বকুলফুল প্রভৃতি অনেকগুলি ভালো ভালো জিনিসের নাম করিল।

বিনোদিনী কহিল, "ও-সব পুরানো হইয়া গেছে; আদরের নামের আর আদর নাই!"

আশা কহিল, "তোমার কোন্‌টা পছন্দ।"

বিনোদিনী হাসিয়া কহিল, "চোখের বালি।"

শ্রুতিমধুর নামের দিকেই আশার ঝোঁক ছিল, কিন্তু বিনোদিনীর পরামর্শে আদরের গালটিই গ্রহণ করিল। বিনোদিনীর গলা ধরিয়া বলিল, "চোখের বালি।" বলিয়া হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল।

১১

আশার পক্ষে সঙ্গিনীর বড়ো দরকার হইয়াছিল। ভালোবাসার উৎসবও কেবলমাত্র দুটি লোকের দ্বারা সম্পন্ন হয় না— সুখালাপের মিষ্টান্ন বিতরণের জন্য বাহিরের লোকের দরকার হয়।

ক্ষুধিতহৃদয়া বিনোদিনীও নববধূর নবপ্রেমের ইতিহাস মাতালের জ্বালাময় মদের মতো কান পাতিয়া পান করিতে লাগিল। তাহার মস্তিষ্ক মাতিয়া শরীরের রক্ত জ্বলিয়া উঠিল।

নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে মা যখন ঘুমাইতেছেন, দাসদাসীরা একতলার বিশ্রামশালায় অদৃশ্য, মহেন্দ্র বিহারীর তাড়নায় ক্ষণকালের জন্য কালেজে গেছে এবং রৌদ্রতপ্ত নীলিমার শেষ প্রান্ত হইতে চিলের তীব্র কণ্ঠ অতিক্ষীণ স্বরে কদাচিৎ শুনা যাইতেছে, তখন নির্জন শয়নগৃহে নিচের বিছানার বালিশের উপর আশা তাহার খোলা চুল ছড়াইয়া শুইত এবং বিনোদিনী বুকের নিচে বালিশ টানিয়া উপুড় হইয়া শুইয়া গুনগুন-গুঞ্জরিত কাহিনীর মধ্যে আবিষ্ট হইয়া রহিত, তাহার কর্ণমূল আরক্ত হইয়া উঠিত, নিশ্বাস বেগে প্রবাহিত হইতে থাকিত।

বিনোদিনী প্রশ্ন করিয়া করিয়া তুচ্ছতম কথাটি পর্যন্ত বাহির করিত, এক কথা বার বার করিয়া শুনিত, ঘটনা নিঃশেষ হইয়া গেলে কল্পনার অবতারণা করিত— কহিত, “আচ্ছা ভাই, যদি এমন হইত তো কী হইত, যদি অমন হইত তো কী করিতে।” সেই সকল অসম্ভাবিত কল্পনার পথে সুখালোচনাকে সুদীর্ঘ করিয়া টানিয়া লইয়া চলিতে আশারও ভালো লাগিত।

বিনোদিনী কহিত, “আচ্ছা ভাই চোখের বালি, তোর সঙ্গে যদি বিহারীবাবুর বিবাহ হইত।”

আশা। না ভাই, ও-কথা তুমি বলিয়ো না— ছি ছি, আমার বড়ো লজ্জা করে। কিন্তু তোমার সঙ্গে হইলে বেশ হইত, তোমার সঙ্গেও তো কথা হইয়াছিল।

বিনোদিনী। আমার সঙ্গে তো ঢের লোকের ঢের কথা হইয়াছিল। না হইয়াছে, বেশ হইয়াছে— আমি যা আছি, বেশ আছি।

আশা তাহার প্রতিবাদ করে। বিনোদিনীর অবস্থা যে তাহার অবস্থার চেয়ে ভালো, এ-কথা সে কেমন করিয়া স্বীকার করিবে। “একবার মনে করিয়া দেখো দেখি ভাই বালি, যদি আমার স্বামীর সঙ্গে তোমার বিবাহ হইয়া যাইত। আর একটু হলেই তো হইত।”

তা তো হইতই। না হইল কেন। আশার এই বিছানা, এই খাট তো এক দিন তাহারই জন্য অপেক্ষা করিয়া ছিল। বিনোদিনী এই সুসজ্জিত শয়নঘরের দিকে চায়, আর সে-কথা কিছুতেই ভুলিতে পারে না। এ-ঘরে আজ সে অতিথিমাত্র—আজ স্থান পাইয়াছে, কাল আবার উঠিয়া যাইতে হইবে।

অপরাহ্ণে বিনোদিনী নিজে উদ্‌যোগী হইয়া অপরূপ নৈপুণ্যের সহিত আশার চুল বাঁধিয়া সাজাইয়া তাহাকে স্বামিসম্মিলনে পাঠাইয়া দিত। তাহার কল্পনা যেন অবগুণ্ঠিতা হইয়া এই সজ্জিতা বধূর পশ্চাৎ পশ্চাৎ মুগ্ধ যুবকের অভিসারে জনহীন কক্ষে গমন করিত। আবার এক-এক দিন কিছুতেই আশাকে ছাড়িয়া দিত না। বলিত, “আঃ, আর-একটু বসোই না। তোমার স্বামী তো পালাইতেছেন না। তিনি তো বনের মায়ামৃগ নন, তিনি অঞ্চলের পোষা হরিণ।” এই বলিয়া নানা ছলে ধরিয়া রাখিয়া দেরি করাইবার চেষ্টা করিত।

মহেন্দ্র অত্যন্ত রাগ করিয়া বলিত, “তোমার সখী যে নড়িবার নাম করেন না—তিনি বাড়ি ফিরিবেন কবে।”

আশা ব্যগ্র হইয়া বলিত, “না, তুমি আমার চোখের বালির উপর রাগ করিয়ো না। তুমি জান না, সে তোমার কথা শুনিতে কত ভালোবাসে—কত যত্ন করিয়া সাজাইয়া আমাকে তোমার কাছে পাঠাইয়া দেয়।”

রাজলক্ষ্মী আশাকে কাজ করিতে দিতেন না। বিনোদিনী বধূর পক্ষ লইয়া তাহাকে কাজে প্রবৃত্ত করাইল। প্রায় সমস্ত দিনই বিনোদিনীর কাজে আলস্য নাই, সেই সঙ্গে আশাকেও সে আর ছুটি দিতে চায় না। বিনোদিনী পরে-পরে এমনি কাজের শৃঙ্খল বানাইতেছিল যে, তাহার মধ্যে ফাঁক পাওয়া আশার পক্ষে ভারি কঠিন হইয়া উঠিল। আশার স্বামী ছাদের উপরকার শূন্য ঘরের কোণে বসিয়া আক্রোশে ছটফট করিতেছে, ইহা কল্পনা করিয়া বিনোদিনী মনে মনে তীব্র কঠিন হাসি হাসিত। আশা উদ্‌বিগ্ন হইয়া বলিত, “এবার যাই ভাই চোখের বালি, তিনি আবার রাগ করিবেন।”

বিনোদিনী তাড়াতাড়ি বলিত, “রোসো, এইটুকু শেষ করিয়া যাও। আর বেশি দেরি হইবে না।”

খানিক বাদে আশা আবার ছটফট করিয়া বলিয়া উঠিত, “না, ভাই, এবার তিনি সত্যসত্যই রাগ করিবেন—আমাকে ছাড়ো, আমি যাই।”

বিনোদিনী বলিত, “আহা, একটু রাগ করিলই বা। সোহাগের সঙ্গে রাগ না মিশিলে ভালোবাসার স্বাদ থাকে না—তরকারিতে লঙ্কামরিচের মতো।”

কিন্তু লঙ্কামরিচের স্বাদটা যে কী, তাহা বিনোদিনীই বুঝিতেছিল—কেবল সঙ্গে তাহার তরকারি ছিল না। তাহার শিরায় শিরায় যেন আগুন ধরিয়া গেল। সে যেদিকে চায়, তাহার চোখে যেন স্ফুলিঙ্গবর্ষণ হইতে থাকে। এমন সুখের ঘরকন্না—এমন সোহাগের স্বামী। এ-ঘরকে যে আমি রাজার রাজত্ব, এ-স্বামীকে যে আমি পায়ের দাস করিয়া রাখিতে পারিতাম। তখন কি এ-ঘরের এই দশা, এ-মানুষের এই ছিরি থাকিত। আমার জায়গায় কি না এই কচি খুকি, এই খেলার পুতুল। (আশার গলা জড়াইয়া) ভাই চোখের বালি, বলো না ভাই, কাল তোমাদের কী কথা হইল ভাই। আমি তোমাকে যাহা শিখাইয়া দিয়াছিলাম তাহা বলিয়াছিলে? তোমাদের ভালোবাসার কথা শুনিলে আমার ক্ষুধাতৃষ্ণা থাকে না ভাই।”

১২

মহেন্দ্র এক দিন বিরক্ত হইয়া তাহার মাকে ডাকিয়া কহিল, “এ কি ভালো হইতেছে? পরের ঘরের যুবতী বিধবাকে আনিয়া একটা দায় ঘাড়ে করিবার দরকার কী। আমার তো ইহাতে মত নাই—কী জানি কখন কী সংকট ঘটিতে পারে।”

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “ও যে আমাদের বিপিনের বউ, উহাকে আমি তো পর মনে করি না।”

মহেন্দ্র কহিল, “না মা, ভালো হইতেছে না। আমার মতে উঁহাকে রাখা উচিত হয় না।”

রাজলক্ষ্মী বেশ জানিতেন, মহেন্দ্রের মত অগ্রাহ্য করা সহজ নহে। তিনি বিহারীকে ডাকিয়া কহিলেন, “ও বেহারি, তুই একবার মহিনকে বুঝাইয়া বল্। বিপিনের বউ আছে বলিয়াই এই বৃদ্ধবয়সে আমি একটু বিশ্রাম করিতে পাই। পর হউক, যা হউক, আপন লোকের কাছ হইতে এমন সেবা তো কখনো পাই নাই।”

বিহারী রাজলক্ষ্মীকে কোনো উত্তর না করিয়া মহেন্দ্রের কাছে গেল— কহিল, “মহিনদা, বিনোদিনীর কথা কিছু ভাবিতেছ?”

মহেন্দ্র হাসিয়া কহিল, “ভাবিয়া রাত্রে ঘুম হয় না। তোমার বোঠানকে জিজ্ঞাসা করো না, আজকাল বিনোদিনীর ধ্যানে আমার আর-সকল ধ্যানই ভঙ্গ হইয়াছে।”

আশা ঘোমটার ভিতর হইতে মহেন্দ্রকে নীরবে তর্জন করিল।

বিহারী কহিল, “বল কী। দ্বিতীয় বিষবৃক্ষ।”

মহেন্দ্র। ঠিক তাই। এখন উহাকে বিদায় করিবার জন্য চুনি ছটফট করিতেছে।

ঘোমটার ভিতর হইতে আশার দুই চক্ষু আবার ভর্ৎসনা বর্ষণ করিল।

বিহারী কহিল, "বিদায় করিলেও ফিরিতে কতক্ষণ। বিধবার বিবাহ দিয়া দাও—বিষদাঁত একেবারে ভাঙিবে।"

মহেন্দ্র। কুন্দরও তো বিবাহ দেওয়া হইয়াছিল।

বিহারী কহিল, "থাক্, ও উপমাটা এখন রাখো। বিনোদিনীর কথা আমি মাঝে মাঝে ভাবি। তোমার এখানে উনি তো চিরদিন থাকিতে পারেন না। তাহার পরে, যে বন দেখিয়া আসিয়াছি সেখানে উঁহাকে যাবজ্জীবন বনবাসে পাঠানো, সেও বড়ো কঠিন দণ্ড।"

মহেন্দ্রের সম্মুখে এ পর্যন্ত বিনোদিনী বাহির হয় নাই, কিন্তু বিহারী তাহাকে দেখিয়াছে। বিহারী এটুকু বুঝিয়াছে, এ নারী জঙ্গলে ফেলিয়া রাখিবার নহে। কিন্তু শিখা এক ভাবে ঘরের প্রদীপরূপে জ্বলে, আর-এক ভাবে ঘরে আগুন ধরাইয়া দেয়—সে আশঙ্কাও বিহারীর মনে ছিল।

মহেন্দ্র বিহারীকে এই কথা লইয়া অনেক পরিহাস করিল। বিহারীও তাহার জবাব দিল। কিন্তু তাহার মন বুঝিয়াছিল, এ-নারী খেলা করিবার নহে, ইহাকে উপেক্ষা করাও যায় না।

রাজলক্ষ্মী বিনোদিনীকে সাবধান করিয়া দিলেন। কহিলেন, "দেখো বাছা, বউকে লইয়া তুমি অত টানাটানি করিয়ো না। তুমি পাড়াগাঁয়ের গৃহস্থ-ঘরে ছিলে—আজকালকার চালচলন জান না। তুমি বুদ্ধিমতী, ভালো করিয়া বুঝিয়া চলিয়ো।"

ইহার পর বিনোদিনী অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্বক আশাকে দূরে দূরে রাখিল। কহিল, "আমি ভাই কে। আমার মতো অবস্থার লোক আপন মান বাঁচাইয়া চলিতে না জানিলে, কোন্ দিন কী ঘটে, বলা যায় কি।"

আশা সাধাসাধি কান্নাকাটি করিয়া মরে—বিনোদিনী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। মনের কথায় আশা আকণ্ঠ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, কিন্তু বিনোদিনী আমল দিল না।

এদিকে মহেন্দ্রের বাহুপাশ শিথিল এবং তাহার মুগ্ধদৃষ্টি যেন ক্লান্তিতে আবৃত হইয়া আসিয়াছে। পূর্বে যে-সকল অনিয়ম-উচ্ছৃঙ্খলা তাহার কাছে কৌতুকজনক বোধ হইত, এখন তাহা অল্পে অল্পে তাহাকে পীড়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আশার সাংসারিক অপটুতায় সে ক্ষণে ক্ষণে বিরক্ত হয়, কিন্তু প্রকাশ করিয়া বলে না। প্রকাশ না করিলেও আশা অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়াছে, নিরবচ্ছিন্ন মিলনে প্রেমের মর্যাদা ম্লান হইয়া যাইতেছে। মহেন্দ্রের সোহাগের মধ্যে বেসুর লাগিতেছিল—কতকটা মিথ্যা বাড়াবাড়ি, কতকটা আত্মপ্রতারণা।

এ সময়ে পলায়ন ছাড়া পরিত্রাণ নাই, বিচ্ছেদ ছাড়া ঔষধ নাই। স্ত্রীলোকের স্বভাবসিদ্ধ সংস্কারবশে আশা আজকাল মহেন্দ্রকে ফেলিয়া যাইবার চেষ্টা করিত। কিন্তু বিনোদিনী ছাড়া তাহার যাইবার স্থান কোথায়।

মহেন্দ্র প্রণয়ের উত্তপ্ত বাসরশয্যার মধ্যে চক্ষু উন্মীলন করিয়া ধীরে ধীরে সংসারের কাজকর্ম পড়াশুনার প্রতি একটু সজাগ হইয়া পাশ ফিরিল। ডাক্তারি বইগুলাকে নানা অসম্ভব স্থান হইতে উদ্ধার করিয়া ধুলা ঝাড়িতে লাগিল এবং চাপকান প্যান্টলুন-কয়টা রৌদ্রে দিবার উপক্রম করিল।

১৩

বিনোদিনী যখন নিতান্তই ধরা দিল না তখন আশার মাথায় একটা ফন্দি আসিল। সে বিনোদিনীকে কহিল, "ভাই বালি, তুমি আমার স্বামীর সম্মুখে বাহির হও না কেন। পলাইয়া বেড়াও কী জন্য।"

বিনোদিনী অতি সংক্ষেপে এবং সতেজে উত্তর করিল; "ছি ছি।"

আশা কহিল, "কেন। মার কাছে শুনিয়াছি, তুমি তো আমাদের পর নও।"

বিনোদিনী গম্ভীরমুখে কহিল, "সংসারে আপন-পর কেহই নাই। যে আপন মনে করে সেই আপন— যে পর বলিয়া জানে, সে আপন হইলেও পর।"

আশা মনে মনে ভাবিল, "এ-কথার আর উত্তর নাই। বাস্তবিকই তাহার স্বামী বিনোদিনীর প্রতি অন্যায় করেন, বাস্তবিকই তাহাকে পর ভাবেন এবং তাহার প্রতি অকারণে বিরক্ত হন।"

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় আশা স্বামীকে অত্যন্ত আবদার করিয়া ধরিল, "আমার চোখের বালির সঙ্গে তোমাকে আলাপ করিতে হইবে।"

মহেন্দ্র হাসিয়া কহিল, "তোমার সাহস তো কম নয়।"

আশা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, ভয় কিসের।"

মহেন্দ্র। তোমার সখীর যে-রকম রূপের বর্ণনা কর, সে তো বড়ো নিরাপদ জায়গা নয়।

আশা কহিল, "আচ্ছা, সে আমি সামলাইতে পারিব। তুমি ঠাট্টা রাখিয়া দাও— তার সঙ্গে আলাপ করিবে কিনা বলো।"

বিনোদিনীকে দেখিবে বলিয়া মহেন্দ্রের যে কৌতূহল ছিল না, তাহা নহে। এমন কি, আজকাল তাহাকে দেখিবার জন্য মাঝে মাঝে আগ্রহও জন্মে। সেই অনাবশ্যক আগ্রহটা তাহার নিজের কাছে উচিত বলিয়া ঠেকে নাই।

হৃদয়ের সম্পর্ক সম্বন্ধে মহেন্দ্রের উচিত-অনুচিতের আদর্শ সাধারণের অপেক্ষা কিছু কড়া। পাছে মাতার অধিকার লেশমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়, এইজন্য ইতিপূর্বে সে বিবাহের প্রসঙ্গমাত্র কানে আনিত না। আজকাল, আশার সহিত সম্বন্ধকে সে এমনভাবে রক্ষা করিতে চায় যে, অন্য স্ত্রীলোকের প্রতি সামান্য কৌতূহলকেও সে মনে স্থান দিতে চায় না। প্রেমের বিষয়ে সে যে বড়ো খুঁতখুঁতে এবং অত্যন্ত খাঁটি, এই লইয়া তাহার মনে একটা গর্ব ছিল। এমন কি, বিহারীকে সে বন্ধু বলিত বলিয়া অন্য কাহাকেও বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিতেই চাহিত না। অন্য কেহ যদি তাহার নিকট আকৃষ্ট হইয়া আসিত, তবে মহেন্দ্র যেন তাহাকে গায়ে পড়িয়া উপেক্ষা দেখাইত, এবং বিহারীর নিকটে সেই হতভাগ্য সম্বন্ধে উপহাসতীব্র অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া ইতরসাধারণের প্রতি নিজের একান্ত ঔদাসীন্য ঘোষণা করিত। বিহারী ইহাতে আপত্তি করিলে মহেন্দ্র বলিত, "তুমি পার বিহারী, যেখানে যাও তোমার বন্ধুর অভাব হয় না; আমি কিন্তু যাকে-তাকে বন্ধু বলিয়া টানাটানি করিতে পারি না।"

সেই মহেন্দ্রের মন আজকাল যখন মাঝে মাঝে অনিবার্য ব্যগ্রতা ও কৌতূহলের সহিত এই অপরিচিতার প্রতি আপনি ধাবিত হইতে থাকিত তখন সে নিজের আদর্শের কাছে যেন খাটো হইয়া পড়িত। অবশেষে বিরক্ত হইয়া বিনোদিনীকে বাটী হইতে বিদায় করিয়া দিবার জন্য সে তাহার মাকে পীড়াপীড়ি করিতে আরম্ভ করিল।

মহেন্দ্র কহিল, "থাক্‌ চুনি। তোমার চোখের বালির সঙ্গে আলাপ করিবার সময় কই। পড়িবার সময় ডাক্তারি বই পড়িব, অবকাশের সময় তুমি আছ, ইহার মধ্যে সখীকে কোথায় আনিবে।"

আশা কহিল, "আচ্ছা, তোমার ডাক্তারিতে ভাগ বসাইব না, আমারই অংশ আমি বালিকে দিব।"

মহেন্দ্র কহিল, "তুমি তো দিবে, আমি দিতে দিব কেন।"

আশা যে বিনোদিনীকে ভালোবাসিতে পারে, মহেন্দ্র বলে, ইহাতে তাহার স্বামীর প্রতি প্রেমের খর্বতা প্রতিপন্ন হয়। মহেন্দ্র অহংকার করিয়া বলিত, "আমার মতো অনন্যনিষ্ঠ প্রেম তোমার নহে।" আশা তাহা কিছুতেই মানিত না— ইহা লইয়া ঝগড়া করিত, কাঁদিত, কিন্তু তর্কে জিতিতে পারিত না।

মহেন্দ্র তাহাদের দু-জনের মাঝখানে বিনোদিনীকে সূচ্যগ্র স্থান ছাড়িয়া দিতে চায় না, ইহাই তাহার গর্বের বিষয় হইয়া উঠিল। মহেন্দ্রের এই গর্ব আশার সহ্য হইত না, কিন্তু আজ সে পরাভব স্বীকার করিয়া কহিল, "আচ্ছা বেশ, আমার খাতিরেই তুমি আমার বালির সঙ্গে আলাপ করো।"

আশার নিকট মহেন্দ্র নিজের ভালোবাসার দৃঢ়তা ও শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করিয়া অবশেষে বিনোদিনীর সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য অনুগ্রহপূর্বক রাজি হইল। বলিয়া রাখিল, "কিন্তু তাই বলিয়া যখন-তখন উৎপাত করিলে বাঁচিব না।"

পরদিন প্রত্যুষে বিনোদিনীকে আশা তাহার বিছানায় গিয়া জড়াইয়া ধরিল। বিনোদিনী কহিল, "এ কী আশ্চর্য। চকোরী যে আজ চাঁদকে ছাড়িয়া মেঘের দরবারে।"

আশা কহিল, "তোমাদের ও-সব কবিতার কথা আমার আসে না ভাই, কেন বেনাবনে মুক্তা ছড়ানো। যে তোমার কথার জবাব দিতে পারিবে, একবার তাহার কাছে কথা শোনাও'সে।"

বিনোদিনী কহিল, "সে রসিক লোকটি কে।"

আশা কহিল, "তোমার দেবর, আমার স্বামী। না ভাই ঠাট্টা নয়— তিনি তোমার সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছেন।"

বিনোদিনী মনে মনে কহিল, "স্ত্রীর হুকুমে আমার প্রতি তলব পড়িয়াছে, আমি অমনি ছুটিয়া যাইব, আমাকে তেমন পাও নাই।"

বিনোদিনী কোনোমতেই রাজি হইল না। আশা তখন স্বামীর কাছে বড়ো অপ্রতিভ হইল।

মহেন্দ্র মনে মনে বড়ো রাগ করিল। তাহার কাছে বাহির হইতে আপত্তি। তাহাকে অন্য সাধারণ পুরুষের মতো জ্ঞান করা। আর কেহ হইলে তো এতদিনে অগ্রসর হইয়া নানা কৌশলে বিনোদিনীর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয় করিত। মহেন্দ্র যে তাহার চেষ্টামাত্রও করে নাই, ইহাতেই কি বিনোদিনী তাহার পরিচয় পায় নাই। বিনোদিনী যদি একবার ভালো করিয়া জানে, তবে অন্য পুরুষ এবং মহেন্দ্রের প্রভেদ বুঝিতে পারে।

বিনোদিনীও দু-দিন পূর্বে আক্রোশের সহিত মনে মনে বলিয়াছিল, "এতকাল বাড়িতে আছি, মহেন্দ্র যে একবার আমাকে দেখিবার চেষ্টাও করে না। যখন পিসিমার ঘরে থাকি তখন কোনো ছুতা করিয়াও যে মার ঘরে আসে না। এত ঔদাসীন্য কিসের। আমি কি জড়পদার্থ। আমি কি মানুষ না। আমি কি স্ত্রীলোক নই। একবার যদি আমার পরিচয় পাইত, তবে আদরের চুনির সঙ্গে বিনোদিনীর প্রভেদ বুঝিতে পারিত।"

আশা স্বামীর কাছে প্রস্তাব করিল, "তুমি কালেজে গেছ বলিয়া চোখের বালিকে আমাদের ঘরে আনিব, তাহার পরে বাহির হইতে তুমি হঠাৎ আসিয়া পড়িবে— তা হইলেই সে জব্দ হইবে।"

মহেন্দ্র কহিল, "কী অপরাধে তাহাকে এতবড়ো কঠিন শাসনের আয়োজন।"

আশা কহিল, "না, সত্যই আমার ভারি রাগ হইয়াছে। তোমার সঙ্গে দেখা করিতেও তার আপত্তি! প্রতিজ্ঞা ভাঙিব তবে ছাড়িব।"

মহেন্দ্র কহিল, "তোমার প্রিয়সখীর দর্শনাভাবে আমি মরিয়া যাইতেছি না। আমি অমন চুরি করিয়া দেখা করিতে চাই না।"

আশা সানুনয়ে মহেন্দ্রের হাত ধরিয়া কহিল, "মাথা খাও, একটি বার তোমাকে এ-কাজ করিতেই হইবে। একবার যে করিয়া হোক, তাহার গুমর ভাঙিতে চাই, তার পর তোমাদের যেমন ইচ্ছা তাই করিয়ো।"

মহেন্দ্র নিরুত্তর হইয়া রহিল। আশা কহিল, "লক্ষ্মীটি, আমার অনুরোধ রাখো।"

মহেন্দ্রের আগ্রহ প্রবল হইয়া উঠিতেছিল— সেইজন্য অতিরিক্ত মাত্রায় ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া সম্মতি দিল।

শরৎকালের স্বচ্ছ নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে বিনোদিনী মহেন্দ্রের নির্জন শয়নগৃহে বসিয়া আশাকে কার্পেটের জুতা বুনিতে শিখাইতেছিল। আশা অন্যমনস্ক হইয়া ঘন ঘন দ্বারের দিকে চাহিয়া গণনায় ভুল করিয়া বিনোদিনীর নিকট নিজের অসাধ্য অপটুত্ব প্রকাশ করিতেছিল।

অবশেষে বিনোদিনী বিরক্ত হইয়া তাহার হাত হইতে কার্পেট টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল, "ও তোমার হইবে না, আমার কাজ আছে, আমি যাই।"

আশা কহিল, "আর একটু বসো, এবার দেখো, আমি ভুল করিব না।" বলিয়া আবার সেলাই লইয়া পড়িল।

ইতিমধ্যে নিঃশব্দপদে বিনোদিনীর পশ্চাতে দ্বারের নিকট মহেন্দ্র আসিয়া দাঁড়াইল। আশা সেলাই হইতে মুখ না তুলিয়া আস্তে আস্তে হাসিতে লাগিল।

বিনোদিনী কহিল, "হঠাৎ হাসির কথা কী মনে পড়িল।" আশা আর থাকিতে পারিল না। উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিয়া কার্পেট বিনোদিনীর গায়ের উপরে ফেলিয়া দিয়া কহিল, "না ভাই, ঠিক বলিয়াছ—ও আমার হইবে না"— বলিয়া বিনোদিনীর গলা জড়াইয়া দ্বিগুণ হাসিতে লাগিল।

প্রথম হইতেই বিনোদিনী সব বুঝিয়াছিল। আশার চাঞ্চল্যে এবং ভাবভঙ্গিতে তাহার নিকট কিছুই গোপন ছিল না। কখন মহেন্দ্র পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাও সে বেশ জানিতে পারিয়াছিল। নিতান্ত সরল নিরীহের মতো সে আশার এই অত্যন্ত ক্ষীণ ফাঁদের মধ্যে ধরা দিল।

মহেন্দ্র ঘরে ঢুকিয়া কহিল, "হাসির কারণ হইতে আমি হতভাগ্য কেন বঞ্চিত হই।"

বিনোদিনী চমকিয়া মাথায় কাপড় টানিয়া উঠিবার উপক্রম করিল। আশা তাহার হাত চাপিয়া ধরিল।

মহেন্দ্র হাসিয়া কহিল, "হয় আপনি বসুন আমি যাই, নয় আপনিও বসুন আমিও বসি।"

বিনোদিনী সাধারণ মেয়ের মতো আশার সহিত হাত-কাড়াকাড়ি করিয়া মহাকোলাহলে লজ্জার ধুম বাধাইয়া দিল না। সহজ সুরেই বলিল, "কেবল আপনার অনুরোধেই বসিলাম, কিন্তু মনে মনে অভিশাপ দিবেন না।"

মহেন্দ্র কহিল, "এই বলিয়া অভিশাপ দিব, আপনার যেন অনেকক্ষণ চলৎশক্তি না থাকে।"

বিনোদিনী কহিল, "সে অভিশাপকে আমি ভয় করি না। কেননা, আপনার অনেক ক্ষণ খুব বেশি ক্ষণ হইবে না। বোধ হয়, সময় উত্তীর্ণ হইয়া আসিল।"

বলিয়া আবার সে উঠিবার চেষ্টা করিল। আশা তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "মাথা খাও, আর একটু বসো।"

১৪

আশা জিজ্ঞাসা করিল, "সত্য করিয়া বলো, আমার চোখের বালিকে কেমন লাগিল।"

মহেন্দ্র কহিল, "মন্দ নয়।"

আশা অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, "তোমার কাউকে আর পছন্দই হয় না।"

মহেন্দ্র। কেবল একটি লোক ছাড়া।

আশা কহিল, "আচ্ছা, ওর সঙ্গে আর একটু ভালো করিয়া আলাপ হউক, তার পরে বুঝিব, পছন্দ হয় কি না।"

মহেন্দ্র কহিল, "আবার আলাপ। এখন বুঝি বরাবরই এমনি চলিবে।"

আশা কহিল, "ভদ্রতার খাতিরেও তো মানুষের সঙ্গে আলাপ করিতে হয়। এক দিন পরিচয়ের পরেই যদি দেখাশুনা বন্ধ কর, তবে চোখের বালি কী মনে করিবে বলো দেখি। তোমার কিন্তু সকলই আশ্চর্য। আর কেউ হইলে অমন মেয়ের সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য সাধিয়া বেড়াইত; তোমার যেন একটা মস্ত বিপদ উপস্থিত হইল।"

অন্য লোকের সঙ্গে তাহার এই প্রভেদের কথা শুনিয়া মহেন্দ্র ভারি খুশি হইল। কহিল, "আচ্ছা বেশ তো। ব্যস্ত হইবার দরকার কী। আমার তো পালাইবার

স্থান নাই, তোমার সখীরও পালাইবার তাড়া দেখি না— সুতরাং দেখা মাঝে মাঝে হইবেই, এবং দেখা হইলে ভদ্রতা রক্ষা করিবে, তোমার স্বামীর সেটুকু শিক্ষা আছে।"

মহেন্দ্র মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, বিনোদিনী এখন হইতে কোনো-না-কোনো ছুতায় দেখা দিবেই। ভুল বুঝিয়াছিল। বিনোদিনী কাছ দিয়াও যায় না— দৈবাৎ যাতায়াতের পথেও দেখা হয় না।

পাছে কিছুমাত্র ব্যগ্রতা প্রকাশ হয় বলিয়া মহেন্দ্র বিনোদিনীর প্রসঙ্গ স্ত্রীর কাছে উত্থাপন করিতে পারে না। মাঝে মাঝে বিনোদিনীর সঙ্গলাভের জন্য স্বাভাবিক সামান্য ইচ্ছাকেও গোপন ও দমন করিতে গিয়া মহেন্দ্রের ব্যগ্রতা আরো যেন বাড়িয়া উঠিতে থাকে। তাহার পরে বিনোদিনীর ঔদাস্যে তাহাকে আরো উত্তেজিত করিতে থাকিল।

বিনোদিনীর সঙ্গে দেখা হইবার পরদিনে মহেন্দ্র নিতান্তই যেন প্রসঙ্গক্রমে হাস্যচ্ছলে আশাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, তোমার অযোগ্য এই স্বামীটিকে চোখের বালির কেমন লাগিল।"

প্রশ্ন করিবার পূর্বেই আশার কাছ হইতে এ-সম্বন্ধে উচ্ছ্বাসপূর্ণ বিস্তারিত রিপোর্ট পাইবে, মহেন্দ্রের এরূপ দৃঢ় প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু সেজন্য সবুর করিয়া যখন ফল পাইল না, তখন লীলাচ্ছলে প্রশ্নটা উত্থাপন করিল।

আশা মুশকিলে পড়িল। চোখের বালি কোনো কথাই বলে নাই। তাহাতে আশা সখীর উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিল।

স্বামীকে বলিল, "রোসো, দু-চারি দিন আগে আলাপ হউক, তার পরে তো বলিবে। কাল কতক্ষণেরই বা দেখা, কটা কথাই বা হইয়াছিল।"

ইহাতেও মহেন্দ্র কিছু নিরাশ হইল এবং বিনোদিনী সম্বন্ধে নিশ্চেষ্টতা দেখানো তাহার পক্ষে আরো দুরূহ হইল।

এই-সকল আলোচনার মধ্যে বিহারী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কী মহিনদা, আজ তোমাদের তর্কটা কী লইয়া।"

মহেন্দ্র কহিল, "দেখো তো ভাই, কুমুদিনী না প্রমোদিনী না কার সঙ্গে তোমার বোঠান চুলের দড়ি না মাছের কাঁটা না কী একটা পাতাইয়াছেন, কিন্তু আমাকেও তাই বলিয়া তাঁর সঙ্গে চুরোটের ছাই কিংবা দেশালাইয়ের কাঠি পাতাইতে হইবে, এ হইলে তো বাঁচা যায় না।"

আশার ঘোমটার মধ্যে নীরবে তুমুল কলহ ঘনাইয়া উঠিল। বিহারী ক্ষণকাল

নিরুত্তরে মহেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল— কহিল, "বোঠান, লক্ষণ ভালো নয়। এ-সব ভোলাইবার কথা। তোমার চোখের বালিকে আমি দেখিয়াছি। আরো যদি ঘন ঘন দেখিতে পাই, তবে সেটাকে দুর্ঘটনা বলিয়া মনে করিব না, সে আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি। কিন্তু মহিনদা যখন এত করিয়া বেকবুল যাইতেছে তখন বড়ো সন্দেহের কথা।"

মহেন্দ্রের সঙ্গে বিহারীর যে অনেক প্রভেদ, আশা তাহার আর-একটি প্রমাণ পাইল।

হঠাৎ মহেন্দ্রের ফোটোগ্রাফ-অভ্যাসের শখ চাপিল। পূর্বে সে একবার ফোটোগ্রাফি শিখিতে আরম্ভ করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল। এখন আবার ক্যামেরা মেরামত করিয়া আরক কিনিয়া ছবি তুলিতে শুরু করিল। বাড়ির চাকর-বেহারাদের পর্যন্ত ছবি তুলিতে লাগিল।

আশা ধরিয়া পড়িল, চোখের বালির একটা ছবি লইতেই হইবে।

মহেন্দ্র অত্যন্ত সংক্ষেপে বলিল, "আচ্ছা।"

চোখের বালি তদপেক্ষা সংক্ষেপে বলিল, "না।"

আশাকে আবার একটা কৌশল করিতে হইল এবং সে কৌশল গোড়া হইতেই বিনোদিনীর অগোচর রহিল না।

মতলব এই হইল, মধ্যাহ্নে আশা তাহাকে নিজের শোবার ঘরে আনিয়া কোনোমতে ঘুম পাড়াইবে এবং মহেন্দ্র সেই অবস্থার ছবি তুলিয়া অবাধ্য সখীকে উপযুক্তরূপ জব্দ করিবে।

আশ্চর্য এই, বিনোদিনী কোনোদিন দিনের বেলায় ঘুমায় না। কিন্তু আশার ঘরে আসিয়া সেদিন তাহার চোখ ঢুলিয়া পড়িল। গায়ে একখানি লাল শাল দিয়া খোলা জানালার দিকে মুখ করিয়া হাতে মাথা রাখিয়া এমনই সুন্দর ভঙ্গিতে ঘুমাইয়া পড়িল যে মহেন্দ্র কহিল, "ঠিক মনে হইতেছে, যেন ছবি লইবার জন্য ইচ্ছা করিয়াই প্রস্তুত হইয়াছে।"

মহেন্দ্র পা টিপিয়া টিপিয়া ক্যামেরা আনিল। কোন্ দিক হইতে ছবি লইলে ভালো হইবে, তাহা স্থির করিবার জন্য বিনোদিনীকে অনেক ক্ষণ ধরিয়া নানাদিক হইতে বেশ করিয়া দেখিয়া লইতে হইল। এমন কি, আর্টের খাতিরে অতি সন্তর্পণে শিয়রের কাছে তাহার খোলা চুল এক জায়গায় একটু সরাইয়া দিতে হইল— পছন্দ না হওয়ায় পুনরায় তাহা সংশোধন করিয়া লইতে হইল। আশাকে কানে কানে কহিল, "পায়ের কাছে শালটা একটুখানি বাঁ-দিকে সরাইয়া দাও।"

অপটু আশা কানে কানে কহিল, "আমি ঠিক পারিব না, ঘুম ভাঙাইয়া দিব— তুমি সরাইয়া দাও।"

মহেন্দ্র সরাইয়া দিল।

অবশেষে যেই ছবি লইবার জন্য ক্যামেরার মধ্যে কাচ পুরিয়া দিল, অমনি যেন কিসের শব্দে বিনোদিনী নড়িয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিল। আশা উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। বিনোদিনী বড়োই রাগ করিল— তাহার জ্যোতির্ময় চক্ষু দুইটি হইতে মহেন্দ্রের প্রতি অগ্নিবাণ বর্ষণ করিয়া কহিল, "ভারি অন্যায়।"

মহেন্দ্র কহিল, "অন্যায়, তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু চুরিও করিলাম, অথচ চোরাই মাল ঘরে আসিল না, ইহাতে যে আমার ইহকাল পরকাল দুই গেল। অন্যায়টাকে শেষ করিতে দিয়া তাহার পরে দণ্ড দিবেন।"

আশাও বিনোদিনীকে অত্যন্ত ধরিয়া পড়িল। ছবি লওয়া হইল। কিন্তু প্রথম ছবিটা খারাপ হইয়া গেল। সুতরাং পরের দিন আর-একটা ছবি না লইয়া চিত্রকর ছাড়িল না। তার পরে আবার দুই সখীকে একত্র করিয়া বন্ধুত্বের চিরনিদর্শনস্বরূপ একখানি ছবি তোলার প্রস্তাবে বিনোদিনী 'না' বলিতে পারিল না। কহিল, "কিন্তু এইটেই শেষ ছবি।"

শুনিয়া মহেন্দ্র সে-ছবিটাকে নষ্ট করিয়া ফেলিল। এমনি করিয়া ছবি তুলিতে তুলিতে আলাপ-পরিচয় বহুদূর অগ্রসর হইয়া গেল।

১৫

বাহির হইতে নাড়া পাইলে ছাই-চাপা আগুন আবার জ্বলিয়া উঠে। নবদম্পতির প্রেমের উৎসাহ যেটুকু ম্লান হইতেছিল, তৃতীয় পক্ষের ঘা খাইয়া সেটুকু আবার জাগিয়া উঠিল।

আশার হাস্যালাপ করিবার শক্তি ছিল না, কিন্তু বিনোদিনী তাহা অজস্র জোগাইতে পারিত; এইজন্য বিনোদিনীর অন্তরালে আশা ভারি একটা আশ্রয় পাইল। মহেন্দ্রকে সর্বদাই আমোদের উত্তেজনায় রাখিতে তাহাকে আর অসাধ্যসাধন করিতে হইত না।

বিবাহের অল্পকালের মধ্যেই মহেন্দ্র এবং আশা পরস্পরের কাছে নিজেকে নিঃশেষ করিবার উপক্রম করিয়াছিল— প্রেমের সংগীত একেবারেই তারস্বরের নিখাদ হইতেই শুরু হইয়াছিল— সুদ ভাঙিয়া না খাইয়া তাহারা একেবারে মূলধন উজাড় করিবার

চেষ্টায় ছিল। এই খেপামির বন্যাকে তাহারা প্রাত্যহিক সংসারের সহজ স্রোতে কেমন করিয়া পরিণত করিবে। নেশার পরেই মাঝখানে যে অবসাদ আসে, সেই দূর করিতে মানুষ আবার যে-নেশা চায় সে-নেশা আশা কোথা হইতে জোগাইবে। এমন সময় বিনোদিনী নবীন রঙিন পাত্র ভরিয়া আশার হাতে আনিয়া দিল। আশা স্বামীকে প্রফুল্ল দেখিয়া আরাম পাইল।

এখন আর তাহার নিজের চেষ্টা রহিল না। মহেন্দ্র-বিনোদিনী যখন উপহাস-পরিহাস করিত, তখন সে কেবল প্রাণ খুলিয়া হাসিতে যোগ দিত। তাসখেলায় মহেন্দ্র যখন আশাকে অন্যায় ফাঁকি দিত তখন সে বিনোদিনীকে বিচারক মানিয়া সকরুণ অভিযোগের অবতারণা করিত। মহেন্দ্র তাহাকে ঠাট্টা করিলে বা কোনো অসংগত কথা বলিলে সে প্রত্যাশা করিত, বিনোদিনী তাহার হইয়া উপযুক্ত জবাব দিয়া দিবে। এইরূপে তিনজনের সভা জমিয়া উঠিল।

কিন্তু তাই বলিয়া বিনোদিনীর কাজে শৈথিল্য ছিল না। রাঁধাবাড়া, ঘরকন্না দেখা, রাজলক্ষ্মীর সেবা করা, সমস্ত সে নিঃশেষপূর্বক সমাধা করিয়া তবে আমোদে যোগ দিত। মহেন্দ্র অস্থির হইয়া বলিত, "চাকরদাসীগুলাকে না কাজ করিতে দিয়া তুমি মাটি করিবে দেখিতেছি।" বিনোদিনী বলিত, "নিজে কাজ না করিয়া মাটি হওয়ার চেয়ে সে ভালো। যাও, তুমি কালেজে যাও।"

মহেন্দ্র। আজ বাদলার দিনটাতে—

বিনোদিনী। না সে হইবে না— তোমার গাড়ি তৈরি হইয়া আছে— কালেজে যাইতে হইবে।

মহেন্দ্র। আমি তো গাড়ি বারণ করিয়া দিয়াছিলাম।

বিনোদিনী। আমি বলিয়া দিয়াছি।— বলিয়া মহেন্দ্রের কালেজে যাইবার কাপড় আনিয়া সম্মুখে উপস্থিত করিল।

মহেন্দ্র। তোমার রাজপুতের ঘরে জন্মানো উচিত ছিল, যুদ্ধকালে আত্মীয়কে বর্ম পরাইয়া দিতে।

আমোদের প্রলোভনে ছুটি লওয়া, পড়া ফাঁকি দেওয়া, বিনোদিনী কোনোমতেই প্রশ্রয় দিত না। তাহার কঠিন শাসনে দিনে দুপুরে অনিয়ত আমোদ একেবারে উঠিয়া গেল, এবং এইরূপে সায়াহ্নের অবকাশ মহেন্দ্রের কাছে অত্যন্ত রমণীয় লোভনীয় হইয়া উঠিল। তাহার দিনটা নিজের অবসানের জন্য যেন প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত।

পূর্বে মাঝে মাঝে ঠিক সময়মতো আহার প্রস্তুত হইত না এবং সেই ছুতা করিয়া

মহেন্দ্র আনন্দে কালেজ কামাই করিত। এখন বিনোদিনী স্বয়ং বন্দোবস্ত করিয়া মহেন্দ্রের কালেজের খাওয়া সকাল-সকাল ঠিক করিয়া দেয় এবং খাওয়া হইলেই মহেন্দ্র খবর পায়— গাড়ি তৈয়ার। পূর্বে কাপড়গুলি প্রতিদিন এমন ভাঁজ-করা পরিপাটি অবস্থায় পাওয়া দূরে থাক্, ধোপার বাড়ি গেছে কি আলমারির কোনো-একটা অনির্দেশ্য স্থানে অগোচরে পড়িয়া আছে, তাহা দীর্ঘকাল সন্ধান ব্যতীত জানা যাইত না।

প্রথম-প্রথম বিনোদিনী এই সকল বিশৃঙ্খলা লইয়া মহেন্দ্রের সম্মুখে আশাকে সহাস্য ভর্ৎসনা করিত— মহেন্দ্রও আশার নিরুপায় নৈপুণ্যহীনতায় সস্নেহে হাসিত। অবশেষে সখিবাৎসল্যবশে আশার হাত হইতে তাহার কর্তব্যভার বিনোদিনী নিজের হাতে কাড়িয়া লইল। ঘরের শ্রী ফিরিয়া গেল।

চাপকানের বোতাম ছিঁড়িয়া গেছে, আশা আশু তাহার কোনো উপায় করিতে পারিতেছে না— বিনোদিনী দ্রুত আসিয়া হতবুদ্ধি আশার হাত হইতে চাপকান কাড়িয়া লইয়া চটপট সেলাই করিয়া দেয়। একদিন মহেন্দ্রের প্রস্তুত অন্নে বিড়ালে মুখ দিল— আশা ভাবিয়া অস্থির; বিনোদিনী তখনি রান্নাঘরে গিয়া কোথা হইতে কী সংগ্রহ করিয়া গুছাইয়া কাজ চালাইয়া দিল, আশা আশ্চর্য হইয়া গেল।

মহেন্দ্র এইরূপে আহারে ও আচ্ছাদনে, কর্মে ও বিশ্রামে, সর্বত্রই নানা আকারে বিনোদিনীর সেবাহস্ত অনুভব করিতে লাগিল। বিনোদিনীর রচিত পশমের জুতা তাহার পায়ে এবং বিনোদিনীর বোনা পশমের গলাবন্ধ তাহার কণ্ঠদেশে একটা যেন কোমল মানসিক সংস্পর্শের মতো বেষ্টন করিল। আশা আজকাল সখিহস্তের প্রসাধনে পরিপাটি-পরিচ্ছন্ন হইয়া সুন্দরবেশে সুগন্ধ মাখিয়া মহেন্দ্রের নিকট উপস্থিত হয়, তাহার মধ্যে যেন কতকটা আশার নিজের, কতকটা আর-একজনের— তাহার সাজসজ্জা-সৌন্দর্যে আনন্দে সে যেন গঙ্গাযমুনার মতো তাহার সখীর সঙ্গে মিলিয়া গেছে।

বিহারীর আজকাল পূর্বের মতো আদর নাই— তাহার ডাক পড়ে না। বিহারী মহেন্দ্রকে লিখিয়া পাঠাইয়াছিল, কাল রবিবার আছে, দুপুরবেলা আসিয়া সে মহেন্দ্রের মার রান্না খাইবে। মহেন্দ্র দেখিল রবিবারটা নিতান্ত মাটি হয়, তাড়াতাড়ি লিখিয়া পাঠাইল, রবিবারে বিশেষ কাজে তাহাকে বাহিরে যাইতে হইবে।

তবু বিহারী আহারান্তে একবার মহেন্দ্রের বাড়ির খোঁজ লইতে আসিল। বেহারার কাছে শুনিল, মহেন্দ্র বাড়ি হইতে বাহিরে যায় নাই। "মহিনদা" বলিয়া সিঁড়ি হইতে হাঁকিয়া বিহারী মহেন্দ্রের ঘরে গেল। মহেন্দ্র অপ্রস্তুত হইয়া কহিল,

"ভারি মাথা ধরিয়াছে।" বলিয়া তাকিয়ায় ঠেস দিয়া পড়িল। আশা সে-কথা শুনিয়া এবং মহেন্দ্রের মুখের ভাব দেখিয়া শশব্যস্ত হইয়া উঠিল— কী করা কর্তব্য, স্থির করিবার জন্য বিনোদিনীর মুখের দিকে চাহিল। বিনোদিনী বেশ জানিত ব্যাপারটা গুরুতর নহে, তবু অত্যন্ত উদ্‌বিগ্নভাবে কহিল, "অনেকক্ষণ বসিয়া আছ, একটুখানি শোও। আমি ওডিকলোন আনিয়া দিই।"

মহেন্দ্র বলিল, "থাক্, দরকার নাই।"

বিনোদিনী শুনিল না, দ্রুতপদে ওডিকলোন বরফজলে মিশাইয়া উপস্থিত করিল। আশার হাতে ভিজা রুমাল দিয়া কহিল, "মহেন্দ্রবাবুর মাথায় বাঁধিয়া দাও।"

মহেন্দ্র বার বার বলিতে লাগিল, "থাক্ না।" বিহারী অবরুদ্ধহাস্যে নীরবে অভিনয় দেখিতে লাগিল। মহেন্দ্র সগর্বে ভাবিল, "বিহারীটা দেখুক, আমার কত আদর।"

আশা বিহারীর সম্মুখে লজ্জাকম্পিত হস্তে ভালো করিয়া বাঁধিতে পারিল না— ফোঁটাখানেক ওডিকলোন গড়াইয়া মহেন্দ্রের চোখে পড়িল। বিনোদিনী আশার হাত হইতে রুমাল লইয়া সুনিপুণ করিয়া বাঁধিল এবং আর-একটি বস্ত্রখণ্ডে ওডিকলোন ভিজাইয়া অল্প-অল্প করিয়া নিংড়াইয়া দিল— আশা মাথায় ঘোমটা টানিয়া পাখা করিতে লাগিল।

বিনোদিনী স্নিগ্ধস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "মহেন্দ্রবাবু, আরাম পাচ্ছেন কি।"

এইরূপে কণ্ঠস্বরে মধু ঢালিয়া দিয়া বিনোদিনী দ্রুতকটাক্ষে একবার বিহারীর মুখের দিকে চাহিয়া লইল। দেখিল, বিহারীর চক্ষু কৌতুকে হাসিতেছে। সমস্ত ব্যাপারটা তাহার কাছে প্রহসন। বিনোদিনী বুঝিয়া লইল, এ লোকটিকে ভোলানো সহজ ব্যাপার নহে— কিছুই ইহার নজর এড়ায় না।

বিহারী হাসিয়া কহিল, "বিনোদ-বোঠান, এমনতরো শুশ্রূষা পাইলে রোগ সারিবে না, বাড়িয়া যাইবে।"

বিনোদিনী। তা কেমন করিয়া জানিব, আমরা মূর্খ মেয়েমানুষ। আপনাদের ডাক্তারিশাস্ত্রে বুঝি এইমতো লেখা আছে।

বিহারী। আছেই তো। সেবা দেখিয়া আমারও কপাল ধরিয়া উঠিতেছে। কিন্তু পোড়াকপালকে বিনা-চিকিৎসাতেই চটপট সারিয়া উঠিতে হয়। মহিনদার কপালের জোর বেশি।

বিনোদিনী ভিজা বস্ত্রখণ্ড রাখিয়া দিয়া কহিল, "কাজ নাই, বন্ধুর চিকিৎসা বন্ধুতেই করুন।"

বিহারী সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া ভিতরে ভিতরে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এ কয় দিন সে অধ্যয়নে ব্যস্ত ছিল, ইতিমধ্যে মহেন্দ্র বিনোদিনী ও আশায় মিলিয়া আপনা-আপনি যে এতখানি তাল পাকাইয়া তুলিয়াছে তাহা সে জানিত না। আজ সে বিনোদিনীকে বিশেষ করিয়া দেখিল, বিনোদিনীও তাহাকে দেখিয়া লইল।

বিহারী কিছু তীক্ষ্ণস্বরে কহিল, "ঠিক কথা। বন্ধুর চিকিৎসা বন্ধুই করিবে। আমিই মাথাধরা আনিয়াছিলাম, আমিই তাহা সঙ্গে লইয়া চলিলাম। ওডিকলোন আর বাজে খরচ করিবেন না।" আশার দিকে চাহিয়া কহিল, "বোঠান, চিকিৎসা করিয়া রোগ সারানোর চেয়ে রোগ না হইতে দেওয়াই ভালো।"

১৬

বিহারী ভাবিল, "আর দূরে থাকিলে চলিবে না, যেমন করিয়া হউক, ইহাদের মাঝখানে আমাকেও একটা স্থান লইতে হইবে। ইহাদের কেহই আমাকে চাহিবে না, তবু আমাকে থাকিতে হইবে।"

বিহারী আহ্বান-অভ্যর্থনার অপেক্ষা না রাখিয়াই মহেন্দ্রের ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। বিনোদিনীকে কহিল, "বিনোদ-বোঠান, এই ছেলেটিকে ইহার মা মাটি করিয়াছে, বন্ধু মাটি করিয়াছে, স্ত্রী মাটি করিতেছে— তুমিও সেই দলে না ভিড়িয়া একটা নূতন পথ দেখাও— দোহাই তোমার।"

মহেন্দ্র। অর্থাৎ—

বিহারী। অর্থাৎ আমার মতো লোক, যাহাকে কেহ কোনোকালে পোঁছে না—

মহেন্দ্র। তাহাকে মাটি করো। মাটি হইবার উমেদারি সহজ নয় হে বিহারী, দরখাস্ত পেশ করিলেই হয় না।

বিনোদিনী হাসিয়া কহিল, "মাটি হইবার ক্ষমতা থাকা চাই, বিহারীবাবু।"

বিহারী কহিল, "নিজগুণ না থাকিলেও হাতের গুণে হইতে পারে। একবার প্রশ্রয় দিয়া দেখোই না।"

বিনোদিনী। আগে হইতে প্রস্তুত হইয়া আসিলে কিছু হয় না, অসাবধান থাকিতে হয়। কী বল, ভাই চোখের বালি। তোমার এই দেওরের ভার তুমিই লও না, ভাই।

আশা তাহাকে দুই অঙ্গুলি দিয়া ঠেলিয়া দিল। বিহারীও এ ঠাট্টায় যোগ দিল না।

আশার সম্বন্ধে বিহারীর কোনো ঠাট্টা সহিবে না, এটুকু বিনোদিনীর কাছে এড়াইতে পারে নাই। বিহারী আশাকে শ্রদ্ধা করে এবং বিনোদিনীকে হালকা করিতে চায়, ইহা বিনোদিনীকে বিঁধিল।

সে পুনরায় আশাকে কহিল, "তোমার এই ভিক্ষুক দেওরটি আমাকে উপলক্ষ্য করিয়া তোমারই কাছে আদর ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে— কিছু দে, ভাই।"

আশা অত্যন্ত বিরক্ত হইল। ক্ষণকালের জন্য বিহারীর মুখ লাল হইল, পরক্ষণেই হাসিয়া কহিল, "আমার বেলাতেই কি পরের উপর বরাত চালাইবে, আর মহিনদার সঙ্গেই নগদ কারবার।"

বিহারী সমস্ত মাটি করিতে আসিয়াছে, বিনোদিনীর ইহা বুঝিতে বাকি রহিল না। বুঝিল, বিহারীর সম্মুখে সশস্ত্রে থাকিতে হইবে।

মহেন্দ্রও বিরক্ত হইল। খোলসা কথায় কবিত্বের মাধুর্য নষ্ট হয়। সে ঈষৎ তীব্র স্বরেই কহিল, "বিহারী, তোমার মহিনদা কোনো কারবারে যান না— হাতে যা আছে, তাতেই তিনি সন্তুষ্ট।"

বিহারী। তিনি না যেতে পারেন, কিন্তু ভাগ্যে লেখা থাকিলে কারবারের ঢেউ বাহির হইতে আসিয়াও লাগে।

বিনোদিনী। আপনার উপস্থিত হাতে কিছুই নাই, কিন্তু আপনার ঢেউটা কোন্ দিক হইতে আসিতেছে!— বলিয়া সে সকটাক্ষহাস্যে আশাকে টিপিল। আশা বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গেল। বিহারী পরাভূত হইয়া ক্রোধে নীরব হইল; উঠিবার উপক্রম করিতেই বিনোদিনী কহিল, "হতাশ হইয়া যাবেন না, বিহারীবাবু। আমি চোখের বালিকে পাঠাইয়া দিতেছি।"

বিনোদিনী চলিয়া যাইতেই সভাভঙ্গে মহেন্দ্র মনে-মনে রাগিল। মহেন্দ্রের অপ্রসন্ন মুখ দেখিয়া বিহারীর রুদ্ধ আবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কহিল, "মহিনদা, নিজের সর্বনাশ করিতে চাও, করো— বরাবর তোমার সেই অভ্যাস হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু যে সরলহৃদয়া সাধ্বী তোমাকে একান্ত-বিশ্বাসে আশ্রয় করিয়া আছে, তাহার সর্বনাশ করিয়ো না। এখনো বলিতেছি, তাহার সর্বনাশ করিয়ো না!" বলিতে বলিতে বিহারীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

মহেন্দ্র রুদ্ধরোষে কহিল, "বিহারী, তোমার কথা আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। হেঁয়ালি ছাড়িয়া স্পষ্ট কথা কও।"

বিহারী কহিল, "স্পষ্টই কহিব। বিনোদিনী তোমাকে ইচ্ছা করিয়া অধর্মের দিকে টানিতেছে এবং তুমি না জানিয়া মূঢ়ের মতো অপথে পা বাড়াইতেছ।"

মহেন্দ্র গর্জন করিয়া উঠিয়া কহিল, "মিথ্যা কথা। তুমি যদি ভদ্রলোকের মেয়েকে এমন অন্যায় সন্দেহের চোখে দেখ, তবে অন্তঃপুরে তোমার আসা উচিত নয়।"

এমন সময় একটি থালায় মিষ্টান্ন সাজাইয়া বিনোদিনী হাস্যমুখে তাহা বিহারীর সম্মুখে রাখিল। বিহারী কহিল, "এ কী ব্যাপার। আমার তো ক্ষুধা নাই।"

বিনোদিনী কহিল, "সে কি হয়। একটু মিষ্টমুখ করিয়া আপনাকে যাইতেই হইবে।"

বিহারী হাসিয়া কহিল, "আমার দরখাস্ত মঞ্জুর হইল বুঝি। সমাদর আরম্ভ হইল।"

বিনোদিনী অত্যন্ত টিপিয়া হাসিল— কহিল, "আপনি যখন দেওর তখন সম্পর্কের যে জোর আছে। যেখানে দাবি করা চলে সেখানে ভিক্ষা করা কেন। আদর যে কাড়িয়া লইতে পারেন। কী বলেন, মহেন্দ্রবাবু।"

মহেন্দ্রবাবুর তখন বাক্যস্ফূর্তি হইতেছিল না।

বিনোদিনী। বিহারীবাবু, লজ্জা করিয়া খাইতেছেন না, না রাগ করিয়া? আর-কাহাকেও ডাকিয়া আনিতে হইবে?

বিহারী। কোনো দরকার নাই। যাহা পাইলাম তাহাই প্রচুর।

বিনোদিনী। ঠাট্টা? আপনার সঙ্গে পারিবার জো নাই। মিষ্টান্ন দিলেও মুখ বন্ধ হয় না।

রাত্রে আশা মহেন্দ্রের নিকটে বিহারী সম্বন্ধে রাগ প্রকাশ করিল— মহেন্দ্র অন্য দিনের মতো হাসিয়া উড়াইয়া দিল না— সম্পূর্ণ যোগ দিল।

প্রাতঃকালে উঠিয়াই মহেন্দ্র বিহারীর বাড়ি গেল। কহিল, "বিহারী, বিনোদিনী হাজার হউক ঠিক বাড়ির মেয়ে নয়— তুমি সামনে আসিলে সে যেন কিছু বিরক্ত হয়।"

বিহারী কহিল, "তাই না কি। তবে তো কাজটা ভালো হয় না। তিনি যদি আপত্তি করেন, তাঁর সামনে নাই গেলাম।"

মহেন্দ্র নিশ্চিন্ত হইল। এত সহজে এই অপ্রিয় কার্য শেষ হইবে, তাহা সে মনে করে নাই। বিহারীকে মহেন্দ্র ভয় করে।

সেই দিনই বিহারী মহেন্দ্রের অন্তঃপুরে গিয়া কহিল, "বিনোদ-বোঠান, মাপ করিতে হইবে।"

বিনোদিনী। কেন, বিহারীবাবু।

বিহারী। মহেন্দ্রের কাছে শুনিলাম, আমি অন্তঃপুরে আপনার সামনে বাহির হই বলিয়া আপনি বিরক্ত হইয়াছেন। তাই ক্ষমা চাহিয়া বিদায় হইব।

বিনোদিনী। সে কি হয়, বিহারীবাবু। আমি আজ আছি কাল নাই, আপনি আমার জন্য কেন যাইবেন। এত গোল হইবে জানিলে আমি এখানে আসিতাম না।— এই বলিয়া বিনোদিনী মুখ ম্লান করিয়া যেন অশ্রুসংবরণ করিতে দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

বিহারী ক্ষণকালের জন্য মনে করিল, "মিথ্যা সন্দেহ করিয়া আমি বিনোদিনীকে অন্যায় আঘাত করিয়াছি।"

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় রাজলক্ষ্মী বিপন্নভাবে আসিয়া কহিলেন, "মহিন, বিপিনের বউ যে বাড়ি যাইবে বলিয়া ধরিয়া বসিয়াছে।"

মহেন্দ্র কহিল, "কেন মা, এখানে তাঁর কি অসুবিধা হইতেছে।"

রাজলক্ষ্মী। অসুবিধা না। বউ বলিতেছে, তাহার মতো সমর্থবয়সের বিধবা মেয়ে পরের বাড়ি বেশি দিন থাকিলে লোকে নিন্দা করিবে।

মহেন্দ্র ক্ষুব্ধভাবে কহিল, "এ বুঝি পরের বাড়ি হইল।"

বিহারী বসিয়া ছিল— মহেন্দ্র তাহার প্রতি ভর্ৎসনাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

অনুতপ্ত বিহারী ভাবিল, "কাল আমার কথাবার্তায় একটু যেন নিন্দার আভাস ছিল; বিনোদিনী বোধ হয় তাহাতেই বেদনা পাইয়াছে।"

স্বামী স্ত্রী উভয়ে মিলিয়া বিনোদিনীর উপর অভিমান করিয়া বসিল।

ইনি বলিলেন, "আমাদের পর মনে কর, ভাই!" উনি বলিলেন, "এতদিন পরে আমরা পর হইলাম!"

বিনোদিনী কহিল, "আমাকে কি তোমরা চিরকাল ধরিয়া রাখিবে, ভাই।"

মহেন্দ্র কহিল, "এত কি আমাদের স্পর্ধা।"

আশা কহিল, "তবে কেন এমন করিয়া আমাদের মন কাড়িয়া লইলে।"

সেদিন কিছুই স্থির হইল না। বিনোদিনী কহিল, "না ভাই, কাজ নাই, দু দিনের জন্য মায়া না বাড়ানোই ভালো।" বলিয়া ব্যাকুলচক্ষে একবার মহেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিল।

পরদিন বিহারী আসিয়া কহিল, "বিনোদ-বোঠান, যাবার কথা কেন বলিতেছেন। কিছু দোষ করিয়াছি কি— তাহারই শাস্তি?"

বিনোদিনী একটু মুখ ফিরাইয়া কহিল, "দোষ আপনি কেন করিবেন, আমার অদৃষ্টের দোষ।"

বিহারী। আপনি যদি চলিয়া যান তো আমার কেবলি মনে হইবে, আমারই উপর রাগ করিয়া গেলেন।

বিনোদিনী করুণচক্ষে মিনতি প্রকাশ করিয়া বিহারীর মুখের দিকে চাহিল— কহিল, "আমার কি থাকা উচিত হয়, আপনিই বলুন না।"

বিহারী মুশকিলে পড়িল। থাকা উচিত, এ-কথা সে কেমন করিয়া বলিবে। কহিল, "অবশ্য আপনাকে তো যাইতেই হইবে, না-হয় আর দু-চার দিন থাকিয়া গেলেন, তাহাতে ক্ষতি কী।"

বিনোদিনী দুই চক্ষু নত করিয়া কহিল, "আপনারা সকলেই আমাকে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন— আপনাদের কথা এড়াইয়া যাওয়া আমার পক্ষে কঠিন— কিন্তু আপনারা বড়ো অন্যায় করিতেছেন।

বলিতে বলিতে তাহার ঘনদীর্ঘ চক্ষুপল্লবের মধ্য দিয়া মোটা মোটা অশ্রুর ফোঁটা দ্রুতবেগে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

বিহারী এই নীরব অজস্র অশ্রুজলে ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, "কয়দিনমাত্র আসিয়া আপনার গুণে আপনি সকলকে বশ করিয়া লইয়াছেন, সেইজন্যই আপনাকে কেহ ছাড়িতে চান না— কিছু মনে করিবেন না বিনোদ-বোঠান, এমন লক্ষ্মীকে কে ইচ্ছা করিয়া বিদায় দেয়।"

আশা এক কোণে ঘোমটা দিয়া বসিয়া ছিল, সে আঁচল তুলিয়া ঘনঘন চোখ মুছিতে লাগিল।

ইহার পরে বিনোদিনী আর যাইবার কথা উত্থাপন করিল না।

১৭

মাঝখানের এই গোলমালটা একেবারে মুছিয়া ফেলিবার জন্য মহেন্দ্র প্রস্তাব করিল, "আসছে রবিবারে দমদমের বাগানে চড়িভাতি করিয়া আসা যাক।"

আশা অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিল। বিনোদিনী কিছুতেই রাজি হইল না। মহেন্দ্র ও আশা বিনোদিনীর আপত্তিতে ভারি মুষড়িয়া গেল। তাহারা মনে করিল, আজকাল বিনোদিনী কেমন যেন দূরে সরিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে।

বিকালবেলায় বিহারী আসিবামাত্র বিনোদিনী কহিল, "দেখুন তো বিহারীবাবু, মহিনবাবু দমদমের বাগানে চড়িভাতি করিতে যাইবেন, আমি সঙ্গে যাইতে চাহি নাই বলিয়া আজ সকাল হইতে দুই জনে মিলিয়া রাগ করিয়া বসিয়াছেন।"

বিহারী কহিল, "অন্যায় রাগ করেন নাই। আপনি না গেলে ইহাদের চড়িভাতিতে যে কাণ্ডটা হইবে, অতিবড়ো শত্রুরও যেন তেমন না হয়।"

বিনোদিনী। চলুন না, বিহারীবাবু। আপনি যদি যান, তবে আমি যাইতে রাজি আছি।

বিহারী। উত্তম কথা। কিন্তু কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, কর্তা কী বলেন।

বিহারীর প্রতি বিনোদিনীর এই বিশেষ পক্ষপাতে কর্তা গৃহিণী উভয়েই মনে মনে ক্ষুণ্ন হইল। বিহারীকে সঙ্গে লইবার প্রস্তাবে মহেন্দ্রের অর্ধেক উৎসাহ উড়িয়া গেল। বিহারীর উপস্থিতি বিনোদিনীর পক্ষে সকল সময়েই অপ্রিয়, এই কথাটাই বন্ধুর মনে মুদ্রিত করিয়া দিবার জন্য মহেন্দ্র ব্যস্ত— কিন্তু অতঃপর বিহারীকে আটক করিয়া রাখা অসাধ্য হইবে।

মহেন্দ্র কহিল, "তা বেশ তো, ভালোই তো। কিন্তু বিহারী, তুমি যেখানে যাও, একটা হাঙ্গামা না করিয়া ছাড় না। হয়তো সেখানে পাড়া হইতে রাজ্যের ছেলে জোটাইয়া বসিবে, নয় তো কোন্ গোরার সঙ্গে মারামারিই বাধাইয়া দিবে— কিছু বলা যায় না।"

বিহারী মহেন্দ্রের আন্তরিক অনিচ্ছা বুঝিয়া মনে মনে হাসিল— কহিল, "সেই তো সংসারের মজা, কিসে কী হয়, কোথায় কী ফেসাদ ঘটে, আগে হইতে কিছুই বলিবার জো নাই। বিনোদ-বোঠান, ভোরের বেলায় ছাড়িতে হইবে, আমি ঠিক সময়ে আসিয়া হাজির হইব।"

রবিবার ভোরে জিনিসপত্র ও চাকরদের জন্য একখানি থার্ড ক্লাস ও মনিবদের জন্য একখানি সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ি ভাড়া করিয়া আনা হইয়াছে। বিহারী মস্ত-একটা প্যাকবাক্স সঙ্গে করিয়া যথাসময়ে আসিয়া উপস্থিত। মহেন্দ্র কহিল, "ওটা আবার কী আনিলে। চাকরদের গাড়িতে তো আর ধরিবে না।"

বিহারী কহিল, "ব্যস্ত হইয়ো না দাদা, সমস্ত ঠিক করিয়া দিতেছি।"

বিনোদিনী ও আশা গাড়িতে প্রবেশ করিল। বিহারীকে লইয়া কী করিবে, মহেন্দ্র তাই ভাবিয়া একটু ইতস্তত করিতে লাগিল। বিহারী বোঝাটা গাড়ির মাথায় তুলিয়া দিয়া চট করিয়া কোচবাক্সে চড়িয়া বসিল।

মহেন্দ্র হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। সে ভাবিতেছিল, "বিহারী ভিতরেই বসে কি কী করে, তাহার ঠিক নাই।" বিনোদিনী ব্যস্ত হইয়া বলিতে লাগিল, "বিহারীবাবু, পড়িয়া যাবেন না তো।"

বিহারী শুনিতে পাইয়া কহিল, "ভয় করিবেন না, পতন ও মূর্ছা— ওটা আমার পার্টের মধ্যে নাই।"

গাড়ি চলিতেই মহেন্দ্র কহিল, "আমিই না-হয় উপরে গিয়া বসি, বিহারীকে ভিতরে পাঠাইয়া দিই।"

আশা ব্যস্ত হইয়া তাহার চাদর চাপিয়া কহিল, "না, তুমি যাইতে পারিবে না।"

বিনোদিনী কহিল, "আপনার অভ্যাস নাই, কাজ কী যদি পড়িয়া যান।"

মহেন্দ্র উত্তেজিত হইয়া কহিল, "পড়িয়া যাব? কখনো না।" বলিয়া তখনই বাহির হইতে উদ্যত হইল।

বিনোদিনী কহিল, "আপনি বিহারীবাবুকে দোষ দেন, কিন্তু আপনিই তো হাঙ্গাম বাধাইতে অদ্বিতীয়।"

মহেন্দ্র মুখ ভার করিয়া কহিল, "আচ্ছা, এক কাজ করা যাক। আমি একটা আলাদা গাড়ি ভাড়া করিয়া যাই, বিহারী ভিতরে আসিয়া বসুক।"

আশা কহিল, "তা যদি হয়, তবে আমিও তোমার সঙ্গে যাইব।"

বিনোদিনী কহিল, "আর আমি বুঝি গাড়ি হইতে লাফাইয়া পড়িব।" এমনি গোলমাল করিয়া কথাটা থামিয়া গেল।

মহেন্দ্র সমস্ত পথ মুখ অত্যন্ত গম্ভীর করিয়া রহিল।

দমদমের বাগানে গাড়ি পৌঁছিল। চাকরদের গাড়ি অনেক আগে ছাড়িয়াছিল, কিন্তু এখনো তাহার খোঁজ নাই।

শরৎকালের প্রাতঃকাল অতি মধুর। রৌদ্র উঠিয়া শিশির মরিয়া গেছে, কিন্তু গাছপালা নির্মল আলোকে ঝলমল করিতেছে। প্রাচীরের গায়ে শেফালি-গাছের সারি রহিয়াছে, তলদেশ ফুলে আচ্ছন্ন এবং গন্ধে আমোদিত।

আশা কলিকাতার ইষ্টকবন্ধন হইতে বাগানের মধ্যে ছাড়া পাইয়া বন্যমৃগীর মতো উল্লসিত হইয়া উঠিল। সে বিনোদিনীকে লইয়া রাশীকৃত ফুল কুড়াইল, গাছ হইতে পাকা আতা পাড়িয়া আতাগাছের তলায় বসিয়া খাইল, দুই সখীতে দিঘির জলে পড়িয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া স্নান করিল। এই দুই নারীতে মিলিয়া একটি নিরর্থক আনন্দে—গাছের ছায়া এবং শাখাচ্যুত আলোক, দিঘির জল এবং নিকুঞ্জের পুষ্পপল্লবকে পুলকিত সচেতন করিয়া তুলিল।

স্নানের পর দুই সখী আসিয়া দেখিল, চাকরদের গাড়ি তখনো আসিয়া পৌঁছে নাই। মহেন্দ্র বাড়ির বারান্দায় চৌকি লইয়া অত্যন্ত শুষ্কমুখে একটা বিলাতি দোকানের বিজ্ঞাপন পড়িতেছে।

বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করিল, "বিহারীবাবু কোথায়!"

মহেন্দ্র সংক্ষেপে উত্তর করিল, "জানি না।"

বিনোদিনী। চলুন, তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিগে।

মহেন্দ্র। তাহাকে কেহ চুরি করিয়া লইবে, এমন আশঙ্কা নাই। না খুঁজিলেও পাওয়া যাইবে।

বিনোদিনী। কিন্তু তিনি হয়তো আপনার জন্য ভাবিয়া মরিতেছেন, পাছে দুর্লভ রত্ন খোওয়া যায়। তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া আসা যাক।

জলাশয়ের ধারে প্রকাণ্ড একটা বাঁধানো বটগাছ আছে, সেইখানে বিহারী তাহার প্যাকবাক্স খুলিয়া একটি কেরোসিন-চুলা বাহির করিয়া জল গরম করিতেছে। সকলে আসিবামাত্র আতিথ্য করিয়া বাঁধা বেদির উপর বসাইয়া এক-এক পেয়ালা গরম চা এবং ছোটো রেকাবিতে দুই একটি মিষ্টান্ন ধরিয়া দিল। বিনোদিনী বার বার বলিতে লাগিল, "ভাগ্যে বিহারীবাবু সমস্ত উদ্‌যোগ করিয়া আনিয়াছিলেন, তাই তো রক্ষা, নহিলে চা না পাইলে মহেন্দ্রবাবুর কী দশা হইত।"

চা পাইয়া মহেন্দ্র বাঁচিয়া গেল, তবু বলিল, "বিহারীর সমস্ত বাড়াবাড়ি। চড়িভাতি করিতে আসিয়াছি, এখানেও সমস্ত দস্তুরমতো আয়োজন করিয়া আসিয়াছে। ইহাতে মজা থাকে না।"

বিহারী কহিল, "তবে দাও ভাই তোমার চায়ের পেয়ালা, তুমি না খাইয়া মজা করোগে— বাধা দিব না।"

বেলা হয়, চাকররা আসিল না। বিহারীর বাক্স হইতে আহারাদির সর্বপ্রকার সরঞ্জাম বাহির হইতে লাগিল। চাল-ডাল, তরি-তরকারি এবং ছোটো ছোটো বোতলে পেষা মশলা আবিষ্কৃত হইল। বিনোদিনী আশ্চর্য হইয়া বলিতে লাগিল, "বিহারীবাবু, আপনি যে আমাদেরও ছাড়াইয়াছেন। ঘরে তো গৃহিণী নাই, তবে শিখিলেন কোথা হইতে।"

বিহারী কহিল, "প্রাণের দায়ে শিখিয়াছি, নিজের যত্ন নিজেকেই করিতে হয়।"

বিহারী নিতান্ত পরিহাস করিয়া কহিল, কিন্তু বিনোদিনী গম্ভীর হইয়া বিহারীর মুখে করুণচক্ষের কৃপা বর্ষণ করিল।

বিহারী ও বিনোদিনীতে মিলিয়া রাঁধাবাড়ায় প্রবৃত্ত হইল। আশা ক্ষীণ সংকুচিত ভাবে হস্তক্ষেপ করিতে আসিলে, বিহারী তাহাতে বাধা দিল। অপটু মহেন্দ্র সাহায্য করিবার কোনো চেষ্টাও করিল না। সে গুঁড়ির উপরে হেলান দিয়া একটা পায়ের উপরে আর-একটা পা তুলিয়া কম্পিত বটপত্রের উপরে রৌদ্রকিরণের নৃত্য দেখিতে লাগিল।

রন্ধন প্রায় শেষ হইলে পর বিনোদিনী কহিল, "মহিনবাবু, আপনি ঐ বটের পাতা গনিয়া শেষ করিতে পারিবেন না, এবারে স্নান করিতে যান।"

ভৃত্যের দল এতক্ষণে জিনিসপত্র লইয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের গাড়ি পথের মধ্যে ভাঙিয়া গিয়াছিল। তখন বেলা দুপুর হইয়া গেছে।

আহারান্তে সেই বটগাছের তলায় তাস খেলিবার প্রস্তাব হইল— মহেন্দ্র কোনোমতেই গা দিল না এবং দেখিতে দেখিতে ছায়াতলে ঘুমাইয়া পড়িল। আশা বাড়ির মধ্যে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া বিশ্রামের উদ্‌যোগ করিল।

বিনোদিনী মাথার উপরে একটুখানি কাপড় তুলিয়া দিয়া কহিল, "আমি তবে ঘরে যাই।"

বিহারী কহিল, "কোথায় যাইবেন, একটু গল্প করুন। আপনাদের দেশের কথা বলুন।"

ক্ষণে ক্ষণে উষ্ণ মধ্যাহ্নের বাতাস তরুপল্লব মর্মরিত করিয়া চলিয়া গেল, ক্ষণে ক্ষণে দিঘির পাড়ে জামগাছের ঘনপত্রের মধ্য হইতে কোকিল ডাকিয়া উঠিল। বিনোদিনী তাহার ছেলেবেলাকার কথা বলিতে লাগিল, তাহার বাপমায়ের কথা, তাহার বাল্যসাথির কথা। বলিতে বলিতে তাহার মাথা হইতে কাপড়টুকু খসিয়া পড়িল; বিনোদিনীর মুখে খরযৌবনের যে একটি দীপ্তি সর্বদাই বিরাজ করিত, বাল্যস্মৃতির ছায়া আসিয়া তাহাকে স্নিগ্ধ করিয়া দিল। বিনোদিনীর চক্ষে যে কৌতুকতীব্র কটাক্ষ দেখিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টি বিহারীর মনে এ-পর্যন্ত নানাপ্রকার সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, সেই উজ্জ্বলকৃষ্ণ জ্যোতি যখন একটি শান্তসজল রেখায় ম্লান হইয়া আসিল তখন বিহারী যেন আর-একটি মানুষ দেখিতে পাইল। এই দীপ্তিমণ্ডলের কেন্দ্রস্থলে কোমল হৃদয়টুকু এখনো সুধাধারায় সরস হইয়া আছে, অপরিতৃপ্ত রঙ্গরস কৌতুকবিলাসের দহনজ্বালায় এখনো নারীপ্রকৃতি শুষ্ক হইয়া যায় নাই। বিনোদিনী সলজ্জ সতীস্ত্রীভাবে একান্ত-ভক্তিভরে পতিসেবা করিতেছে, কল্যাণপরিপূর্ণা জননীর মতো সন্তানকে কোলে ধরিয়া আছে, এ ছবি ইতিপূর্বে মুহূর্তের জন্যও বিহারীর মনে উদিত হয় নাই— আজ যেন রঙ্গমঞ্চের পটখানা ক্ষণকালের জন্য উড়িয়া গিয়া ঘরের ভিতরকার একটি মঙ্গলদৃশ্য তাহার চোখে পড়িল। বিহারী ভাবিল, "বিনোদিনী বাহিরে বিলাসিনী যুবতী বটে, কিন্তু তাহার অন্তরে একটি পূজারতা নারী নিরশনে তপস্যা করিতেছে।"

বিহারী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে কহিল, "প্রকৃত-আপনাকে মানুষ আপনিও জানিতে পারে না, অন্তর্যামীই জানেন; অবস্থাবিপাকে যেটা বাহিরে গড়িয়া উঠে সংসারের কাছে সেইটেই সত্য।" বিহারী কথাটাকে থামিতে দিল না,— প্রশ্ন করিয়া

করিয়া জাগাইয়া রাখিতে লাগিল ; বিনোদিনী এ-সকল কথা এ-পর্যন্ত এমন করিয়া শোনাইবার লোক পায় নাই— বিশেষত, কোনো পুরুষের কাছে সে এমন আত্মবিস্মৃত স্বাভাবিক ভাবে কথা কহে নাই— আজ অজস্র কলকণ্ঠে নিতান্ত সহজ হৃদয়ের কথা বলিয়া তাহার সমস্ত প্রকৃতি যেন নববারিধারায় স্নাত, স্নিগ্ধ এবং পরিতৃপ্ত হইয়া গেল।

ভোরে উঠিবার উপদ্রবে ক্লান্ত মহেন্দ্রের পাঁচটার সময় ঘুম ভাঙিল। বিরক্ত হইয়া কহিল, "এবার ফিরিবার উদ্‌যোগ করা যাক।"

বিনোদিনী কহিল, "আর-একটু সন্ধ্যা করিয়া গেলে কি ক্ষতি আছে।"

মহেন্দ্র কহিল, "না, শেষকালে মাতাল গোরার হাতে পড়িতে হইবে?"

জিনিসপত্র গুছাইয়া তুলিতে অন্ধকার হইয়া আসিল। এমন সময় চাকর আসিয়া খবর দিল, "ঠিকা গাড়ি কোথায় গেছে, খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। গাড়ি বাগানের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল, দুই জন গোরা গাড়োয়ানের প্রতি বল প্রকাশ করিয়া স্টেশনে লইয়া গেছে।"

আর-একটা গাড়ি ভাড়া করিতে চাকরকে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। বিরক্ত মহেন্দ্র কেবলই মনে মনে কহিতে লাগিল, "আজ দিনটা মিথ্যা মাটি হইয়াছে।" অধৈর্য সে আর কিছুতেই গোপন করিতে পারে না, এমনি হইল।

শুক্লপক্ষের চাঁদ ক্রমে শাখাজালজড়িত দিক্‌প্রান্ত হইতে মুক্ত আকাশে আরোহণ করিল। নিস্তব্ধ নিষ্কম্প বাগান ছায়ালোকে খচিত হইয়া উঠিল। আজ এই মায়া-মণ্ডিত পৃথিবীর মধ্যে বিনোদিনী আপনাকে কী-একটা অপূর্বভাবে অনুভব করিল। আজ সে যখন তরুবীথিকার মধ্যে আশাকে জড়াইয়া ধরিল, তাহার মধ্যে প্রণয়ের কৃত্রিমতা কিছুই ছিল না। আশা দেখিল, বিনোদিনীর দুই চক্ষু দিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছে। আশা ব্যথিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কী ভাই চোখের বালি, তুমি কাঁদিতেছ কেন?"

বিনোদিনী কহিল, "কিছুই নয় ভাই, আমি বেশ আছি। আজ দিনটা আমার বড়ো ভালো লাগিল।"

আশা জিজ্ঞাসা করিল, "কিসে তোমার এত ভালো লাগিল, ভাই।"

বিনোদিনী কহিল, "আমার মনে হইতেছে, আমি যেন মরিয়া গেছি, যেন পরলোকে আসিয়াছি, এখানে যেন আমার সমস্তই মিলিতে পারে।"

বিস্মিত আশা এ-সব কথা কিছুই বুঝিতে পারিল না। সে মৃত্যুর কথা শুনিয়া দুঃখিত হইয়া কহিল, "ছি ভাই চোখের বালি, অমন কথা বলিতে নাই।"

গাড়ি পাওয়া গেল। বিহারী পুনরায় কোচবাক্সে চড়িয়া বসিল। বিনোদিনী কোনো কথা না বলিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল, জ্যোৎস্নায় স্তম্ভিত তরুশ্রেণী ধাবমান নিবিড় ছায়াস্রোতের মতো তাহার চোখের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। আশা গাড়ির কোণে ঘুমাইয়া পড়িল। মহেন্দ্র সুদীর্ঘ পথ নিতান্ত বিমর্ষ হইয়া বসিয়া থাকিল।

১৮

চড়িভাতির দুর্দিনের পরে মহেন্দ্র বিনোদিনীকে আর-এক বার ভালো করিয়া আয়ত্ত করিয়া লইতে উৎসুক ছিল। কিন্তু তাহার পরদিনেই রাজলক্ষ্মী ইনফ্লুয়েঞ্জা-জ্বরে পড়িলেন। রোগ গুরুতর নহে, তবু তাহার অসুখ ও দুর্বলতা যথেষ্ট। বিনোদিনী দিনরাত্রি তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইল।

মহেন্দ্র কহিল, “দিনরাত এমন করিয়া খাটিলে শেষকালে তুমিই যে অসুখে পড়িবে। মার সেবার জন্যে আমি লোক ঠিক করিয়া দিতেছি।”

বিহারী কহিল, “মহিনদা, তুমি অত ব্যস্ত হইয়ো না। উনি সেবা করিতেছেন, করিতে দাও। এমন করিয়া কি আর কেহ করিতে পারিবে।”

মহেন্দ্র রোগীর ঘরে ঘন ঘন যাতায়াত আরম্ভ করিল। একটা লোক কোনো কাজ করিতেছে না, অথচ কাজের সময় সর্বদাই সঙ্গে লাগিয়া আছে, ইহা কর্মিষ্ঠা বিনোদিনীর পক্ষে অসহ্য। সে বিরক্ত হইয়া দুই-তিন বার কহিল, “মহিনবাবু, আপনি এখানে বসিয়া থাকিয়া কী সুবিধা করিতেছেন। আপনি যান— অনর্থক কালেজ কামাই করিবেন না।”

মহেন্দ্র তাহাকে অনুসরণ করে, ইহাতে বিনোদিনীর গর্ব এবং সুখ ছিল, কিন্তু তাই বলিয়া এমনতরো কাঙালপনা, রুগ্ণা মাতার শয্যাপার্শ্বেও লুব্ধহৃদয়ে বসিয়া থাকা— ইহাতে তাহার ধৈর্য থাকিত না, ঘৃণাবোধ হইত। কোনো কাজ যখন বিনোদিনীর উপর নির্ভর করে, তখন সে আর-কিছুই মনে রাখে না। যতক্ষণ খাওয়ানো-দাওয়ানো, রোগীর সেবা, ঘরের কাজ প্রয়োজন, ততক্ষণ বিনোদিনীকে কেহ অনবধান দেখে নাই— সেও প্রয়োজনের সময় কোনোপ্রকার অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার দেখিতে পারে না।

বিহারী অল্পক্ষণের জন্য মাঝে-মাঝে রাজলক্ষ্মীর সংবাদ লইতে আসে। ঘরে ঢুকিয়াই কী দরকার, তাহা সে তখনই বুঝিতে পারে— কোথায় একটা-কিছুর অভাব আছে, তাহা তাহার চোখে পড়ে— মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত ঠিক করিয়া দিয়া সে বাহির

হইয়া যায়। বিনোদিনী মনে বুঝিতে পারিত, বিহারী তাহার শুশ্রূষাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেছে। সেইজন্য বিহারীর আগমনে সে যেন বিশেষ পুরস্কার লাভ করিত।

মহেন্দ্র নিতান্ত ধিক্‌কারবেগে অত্যন্ত কড়া নিয়মে কালেজে বাহির হইতে লাগিল। একে তাহার মেজাজ অত্যন্ত রুক্ষ হইয়া রহিল, তাহার পরে এ কী পরিবর্তন! খাবার ঠিক সময়ে হয় না, সইসটা নিরুদ্দেশ হয়, মোজাজোড়ার ছিদ্র ক্রমেই অগ্রসর হইতে থাকে। এখন এই সমস্ত বিশৃঙ্খলায় মহেন্দ্রের পূর্বের ন্যায় আমোদ বোধ হয় না। যখন যেটি দরকার, তখনি সেটি হাতের কাছে সুসজ্জিত পাইবার আরাম কাহাকে বলে, তাহা সে কয়দিন জানিতে পারিয়াছে। এক্ষণে তাহার অভাবে, আশার অশিক্ষিত অপটুতায় মহেন্দ্রের আর কৌতুকবোধ হয় না।—

"চুনি, আমি তোমাকে কতদিন বলিয়াছি, স্নানের আগেই আমার জামায় বোতাম পরাইয়া প্রস্তুত রাখিবে, আর আমার চাপকান-প্যাণ্টলুন ঠিক করিয়া রাখিয়া দিবে—একদিনও তাহা হয় না। স্নানের পর বোতাম পরাইতে আর কাপড় খুঁজিয়া বেড়াইতে আমার দু-ঘণ্টা যায়।"

অনুতপ্ত আশা লজ্জায় ম্লান হইয়া বলে, "আমি বেহারাকে বলিয়া দিয়াছিলাম।"

"বেহারাকে বলিয়া দিয়াছিলে! নিজের হাতে করিতে দোষ কী। তোমার দ্বারা যদি কোনো কাজ পাওয়া যায়!"

ইহা আশার পক্ষে বজ্রাঘাত। এমন ভর্ৎসনা সে কখনো পায় নাই। এ জবাব তাহার মুখে বা মনে আসিল না যে, "তুমিই তো আমার কর্মশিক্ষার ব্যাঘাত করিয়াছ।" এই ধারণাই তাহার ছিল না যে, গৃহকর্মশিক্ষা নিয়ত অভ্যাস-ও অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ। সে মনে করিত, "আমার স্বাভাবিক অক্ষমতা- ও নির্বুদ্ধিতা-বশতই কোনো কাজ ঠিকমতো করিয়া উঠিতে পারি না।" মহেন্দ্র যখন আত্মবিস্মৃত হইয়া বিনোদিনীর সহিত তুলনা দিয়া আশাকে ধিক্‌কার দিয়াছে, তখন সে তাহা বিনয়ে ও বিনা বিদ্বেষে গ্রহণ করিয়াছে।

আশা এক-একবার তাহার রুগ্না শাশুড়ীর ঘরের আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়ায়—এক-একবার লজ্জিতভাবে ঘরের দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। সে নিজেকে সংসারের পক্ষে আবশ্যক করিয়া তুলিতে ইচ্ছা করে, সে কাজ দেখাইতে চায়, কিন্তু কেহ তাহার কাজ চাহে না। সে জানে না কেমন করিয়া কাজের মধ্যে প্রবেশ করা যায়, কেমন করিয়া সংসারের মধ্যে স্থান করিয়া লইতে হয়। সে নিজের অক্ষমতার সংকোচে বাহিরে বাহিরে ফিরে। তাহার কী-একটা মনোবেদনার কথা অন্তরে প্রতিদিন বাড়িতেছে, কিন্তু তাহার সেই অপরিস্ফুট বেদনা, সেই অব্যক্ত আশঙ্কাকে সে স্পষ্ট

করিয়া বুঝিতে পারে না। সে অনুভব করে, তাহার চারিদিকের সমস্তই সে যেন নষ্ট করিতেছে— কিন্তু কেমন করিয়াই যে তাহা গড়িয়া উঠিয়াছিল, এবং কেমন করিয়াই যে তাহা নষ্ট হইতেছে, এবং কেমন করিলে যে তাহার প্রতিকার হইতে পারে, তাহা সে জানে না। থাকিয়া থাকিয়া কেবল গলা ছাড়িয়া কাঁদিয়া বলিতে ইচ্ছা করে, "আমি অত্যন্ত অযোগ্য, নিতান্ত অক্ষম, আমার মূঢ়তার কোথাও তুলনা নাই।"

পূর্বে তো আশা ও মহেন্দ্র সুদীর্ঘকাল দুই জনে এক গৃহকোণে বসিয়া কখনো কথা কহিয়া, কখনো কথা না কহিয়া, পরিপূর্ণ সুখে সময় কাটাইয়াছে। আজকাল বিনোদিনীর অভাবে আশার সঙ্গে একলা বসিয়া মহেন্দ্রের মুখে কিছুতেই যেন সহজে কথা জোগায় না— এবং কিছু না কহিয়া চুপ করিয়া থাকিতেও তাহার বাধো-বাধো ঠেকে।

মহেন্দ্র বেহারাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ও চিঠি কাহার।"

"বিহারীবাবুর।"

"কে দিল।"

"বহু-ঠাকুরানী।" (বিনোদিনী)

"দেখি" বলিয়া চিঠিখানা লইল। ইচ্ছা হইল ছিঁড়িয়া পড়ে। দু-চারিবার উল্টাপাল্টা করিয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া বেহারার হাতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। যদি চিঠি খুলিত, তবে দেখিত, তাহাতে লেখা আছে, "পিসিমা কোনোমতেই সাগু-বার্লি খাইতে চান না, আজ কি তাঁহাকে ডালের ঝোল খাইতে দেওয়া হইবে।" ঔষধ-পথ্য লইয়া বিনোদিনী মহেন্দ্রকে কখনো কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিত না, সে-সম্বন্ধে বিহারীর প্রতিই তাহার নির্ভর।

মহেন্দ্র বারান্দায় খানিকক্ষণ পায়চারি করিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, দেয়ালে টাঙানো একটা ছবির দড়ি ছিন্নপ্রায় হওয়াতে ছবিটা বাঁকা হইয়া আছে। আশাকে অত্যন্ত ধমক দিয়া কহিল, "তোমার চোখে কিছুই পড়ে না, এমনি করিয়া সমস্ত জিনিস নষ্ট হইয়া যায়।" দমদমের বাগান হইতে ফুল সংগ্রহ করিয়া যে-তোড়া বিনোদিনী পিতলের ফুলদানিতে সাজাইয়া রাখিয়াছিল, আজও তাহা শুষ্ক অবস্থায় তেমনিভাবে আছে; অন্যদিন মহেন্দ্র এ-সমস্ত লক্ষ্যই করে না— আজ তাহা চোখে পড়িল। কহিল, "বিনোদিনী আসিয়া না ফেলিয়া দিলে, ও আর ফেলাই হইবে না।" বলিয়া ফুলসুদ্ধ ফুলদানি বাহিরে ছুঁড়িয়া ফেলিল, তাহা ঠংঠং শব্দে সিঁড়ি দিয়া গড়াইয়া চলিল। "কেন আশা আমার মনের মতো হইতেছে না, কেন সে আমার মনের মতো কাজ করিতেছে না, কেন তাহার স্বভাবগত শৈথিল্য ও দুর্বলতায় সে আমাকে দাম্পত্যের পথে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রাখিতেছে না, সর্বদা আমাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিতেছে।" এই কথা মহেন্দ্র

মনে-মনে আন্দোলন করিতে করিতে হঠাৎ দেখিল, আশার মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেছে, সে খাটের থাম ধরিয়া আছে, তাহার ঠোঁট-দুটি কাঁপিতেছে— কাঁপিতে কাঁপিতে সে হঠাৎ বেগে পাশের ঘর দিয়া চলিয়া গেল।

মহেন্দ্র তখন ধীরে ধীরে গিয়া ফুলদানিটা কুড়াইয়া আনিয়া রাখিল। ঘরের কোণে তাহার পড়িবার টেবিল ছিল— চৌকিতে বসিয়া সেই টেবিলটার উপর হাতের মধ্যে মাথা রাখিয়া অনেকক্ষণ পড়িয়া রহিল।

সন্ধ্যার পর ঘরে আলো দিয়া গেল, কিন্তু আশা আসিল না। মহেন্দ্র দ্রুতপদে ছাদের উপর পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। রাত্রি নটা বাজিল, মহেন্দ্রদের লোকবিরল গৃহ রাত-দুপুরের মতো নিস্তব্ধ হইয়া গেল— তবু আশা আসিল না। মহেন্দ্র তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইল। আশা সংকুচিতপদে আসিয়া ছাদের প্রবেশদ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। মহেন্দ্র কাছে আসিয়া তাহাকে বুকে টানিয়া লইল— মুহূর্তের মধ্যে স্বামীর বুকের উপর আশার কান্না ফাটিয়া পড়িল— সে আর থামিতে পারে না, তাহার চোখের জল আর ফুরায় না, কান্নার শব্দ গলা ছাড়িয়া বাহির হইতে চায়, সে আর চাপা থাকে না। মহেন্দ্র তাহাকে বক্ষে বদ্ধ করিয়া কেশচুম্বন করিল— নিঃশব্দ আকাশে তারাগুলি নিস্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল।

রাত্রে বিছানায় বসিয়া মহেন্দ্র কহিল, "কালেজে আমাদের নাইট-ডিউটি অধিক পড়িয়াছে, অতএব এখন কিছুকাল আমাকে কালেজের কাছেই বাসা করিয়া থাকিতে হইবে।"

আশা ভাবিল, "এখনো কি রাগ আছে। আমার উপর বিরক্ত হইয়া চলিয়া যাইতেছেন? নিজের নির্গুণতায় আমি স্বামীকে ঘর হইতে বিদায় করিয়া দিলাম? আমার তো মরা ভালো ছিল।"

কিন্তু মহেন্দ্রের ব্যবহারে রাগের লক্ষণ কিছুই দেখা গেল না। সে অনেকক্ষণ কিছু না বলিয়া আশার মুখ বুকের উপর রাখিল এবং বারংবার অঙ্গুলি দিয়া তাহার চুল চিরিতে চিরিতে তাহার খোঁপা শিথিল করিয়া দিল। পূর্বে আদরের দিনে মহেন্দ্র এমন করিয়া আশার বাঁধা চুল খুলিয়া দিত— আশা তাহাতে আপত্তি করিত। আজ আর সে তাহাতে কোনো আপত্তি না করিয়া পুলকে বিহ্বল হইয়া চুপ করিয়া রহিল। হঠাৎ এক সময় তাহার ললাটের উপর অশ্রুবিন্দু পড়িল, এবং মহেন্দ্র তাহার মুখ তুলিয়া ধরিয়া স্নেহরুদ্ধ স্বরে ডাকিল, "চুনি।" আশা কথায় তাহার কোনো উত্তর না দিয়া দুই কোমল হস্তে মহেন্দ্রকে চাপিয়া ধরিল। মহেন্দ্র কহিল, "অপরাধ করিয়াছি, আমাকে মাপ করো।"

আশা তাহার কুসুম-সুকুমার করপল্লব মহেন্দ্রের মুখের উপর চাপা দিয়া কহিল, "না, না, অমন কথা বলিয়ো না। তুমি কোনো অপরাধ কর নাই। সকল দোষ আমার। আমাকে তোমার দাসীর মতো শাসন করো। আমাকে তোমার চরণাশ্রয়ের যোগ্য করিয়া লও।"

বিদায়ের প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিবার সময় মহেন্দ্র কহিল, "চুনি, আমার রত্ন, তোমাকে আমার হৃদয়ে সকলের উপরে ধারণ করিয়া রাখিব, সেখানে কেহ তোমাকে ছাড়াইয়া যাইতে পারিবে না।"

তখন আশা দৃঢ়চিত্তে সর্বপ্রকার ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত হইয়া স্বামীর নিকট নিজের একটিমাত্র ক্ষুদ্র দাবি দাখিল করিল। কহিল, "তুমি আমাকে রোজ একখানি করিয়া চিঠি দিবে?"

মহেন্দ্র কহিল, "তুমিও দিবে?"

আশা কহিল, "আমি কি লিখিতে জানি।"

মহেন্দ্র তাহার কানের কাছে অলকগুচ্ছ টানিয়া দিয়া কহিল, "তুমি অক্ষয়কুমার দত্তের চেয়ে ভালো লিখিতে পার— চারুপাঠ যাহাকে বলে।"

আশা কহিল, "যাও, আমাকে আর ঠাট্টা করিয়ো না।"

যাইবার পূর্বে আশা যথাসাধ্য নিজের হাতে মহেন্দ্রের পোর্টম্যান্টো সাজাইতে বসিল। মহেন্দ্রের মোটা মোটা শীতের কাপড় ঠিকমতো ভাঁজ করা কঠিন, বাক্সে ধরানো শক্ত— উভয়ে মিলিয়া কোনোমতে চাপাচাপি ঠাসাঠুসি করিয়া, যাহা এক বাক্সে ধরিত, তাহাতে দুই বাক্স বোঝাই করিয়া তুলিল। তবু যাহা ভুলক্রমে বাকি রহিল, তাহাতে আরো অনেকগুলি স্বতন্ত্র পুঁটুলির সৃষ্টি হইল। ইহা লইয়া আশা যদিও বার বার লজ্জাবোধ করিল, তবু তাহাদের কাড়াকাড়ি, কৌতুক ও পরস্পরের প্রতি সহাস্য দোষারোপে পূর্বেকার আনন্দের দিন ফিরিয়া আসিল। এ যে বিদায়ের আয়োজন হইতেছে, তাহা আশা ক্ষণকালের জন্য ভুলিয়া গেল। সহিস দশবার গাড়ি তৈয়ারির কথা মহেন্দ্রকে স্মরণ করাইয়া দিল, মহেন্দ্র কানে তুলিল না— অবশেষে বিরক্ত হইয়া বলিল, "ঘোড়া খুলিয়া দাও।"

সকাল ক্রমে বিকাল হইয়া গেল, বিকাল সন্ধ্যা হয়। তখন স্বাস্থ্যপালন করিতে পরস্পরকে সতর্ক করিয়া দিয়া এবং নিয়মিত চিঠিলেখা সম্বন্ধে বারংবার প্রতিশ্রুত করাইয়া লইয়া ভারাক্রান্ত হৃদয়ে পরস্পরের বিচ্ছেদ হইল।

রাজলক্ষ্মী আজ দুই দিন হইল উঠিয়া বসিয়াছেন। সন্ধ্যাবেলায় গায়ে মোটা কাপড় মুড়ি দিয়া বিনোদিনীর সঙ্গে তাস খেলিতেছেন। আজ তাঁহার শরীরে কোনো গ্লানি

নাই। মহেন্দ্র ঘরে প্রবেশ করিয়া বিনোদিনীর দিকে একেবারেই চাহিল না— মাকে কহিল, “মা, কালেজে আমার রাত্রের কাজ পড়িয়াছে, এখানে থাকিয়া সুবিধা হয় না— কালেজের কাছে বাসা লইয়াছি। সেখানে আজ হইতে থাকিব।”

রাজলক্ষ্মী মনে মনে অভিমান করিয়া কহিলেন, “তা যাও। পড়ার ক্ষতি হইলে কেমন করিয়া থাকিবে।”

যদিও তাঁহার রোগ সারিয়াছে, তবু মহেন্দ্র যাইবে শুনিয়া তখনি তিনি নিজেকে অত্যন্ত রুগ্ন ও দুর্বল বলিয়া কল্পনা করিলেন; বিনোদিনীকে বলিলেন, “দাও তো বাছা, বালিশটা আগাইয়া দাও।” বলিয়া বালিশ অবলম্বন করিয়া শুইলেন, বিনোদিনী আস্তে আস্তে তাঁহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

মহেন্দ্র একবার মার কপালে হাত দিয়া দেখিল, তাঁহার নাড়ী পরীক্ষা করিল। রাজলক্ষ্মী হাত ছাড়াইয়া লইয়া কহিলেন, “নাড়ী দেখিয়া তো ভারি বোঝা যায়। তোর আর ভাবিতে হইবে না, আমি বেশ আছি।” বলিয়া অত্যন্ত দুর্বলভাবে পাশ ফিরিয়া শুইলেন।

মহেন্দ্র বিনোদিনীকে কোনো প্রকার বিদায়সম্ভাষণ না করিয়া রাজলক্ষ্মীকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

১৯

বিনোদিনী মনে মনে ভাবিতে লাগিল, “ব্যাপারখানা কী। অভিমান, না রাগ, না ভয়? আমাকে দেখাইতে চান, আমাকে কেয়ার করেন না? বাসায় গিয়া থাকিবেন? দেখি কত দিন থাকিতে পারেন?”

কিন্তু বিনোদিনীরও মনে মনে একটা অশান্ত ভাব উপস্থিত হইল।

মহেন্দ্রকে সে প্রতিদিন নানা পাশে বদ্ধ ও নানা বাণে বিদ্ধ করিতেছিল, সে-কাজ গিয়া বিনোদিনী যেন এ-পাশ ও-পাশ করিতে লাগিল। বাড়ি হইতে তাহার সমস্ত নেশা চলিয়া গেল। মহেন্দ্রবর্জিত আশা তাহার কাছে নিতান্তই স্বাদহীন। আশার প্রতি মহেন্দ্রের সোহাগ-যত্ন বিনোদিনীর প্রণয়বঞ্চিত চিত্তকে সর্বদাই আলোড়িত করিয়া তুলিত— তাহাতে বিনোদিনীর বিরহিণী কল্পনাকে যে-বেদনায় জাগরূক করিয়া রাখিত তাহার মধ্যে উগ্র উত্তেজনা ছিল। যে-মহেন্দ্র তাহাকে তাহার সমস্ত জীবনের সার্থকতা হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছে, যে-মহেন্দ্র তাহার মতো স্ত্রীরত্নকে উপেক্ষা করিয়া আশার মতো ক্ষীণবুদ্ধি দীনপ্রকৃতি বালিকাকে বরণ করিয়াছে, তাহাকে বিনোদিনী ভালোবাসে কি বিদ্বেষ করে, তাহাকে কঠিন শাস্তি দিবে না তাহাকে হৃদয়সমর্পণ

করিবে, তাহা বিনোদিনী ঠিক করিয়া বুঝিতে পারে নাই। একটা জ্বালা মহেন্দ্র তাহার অন্তরে জ্বালাইয়াছে, তাহা হিংসার না প্রেমের, না দুয়েরই মিশ্রণ, বিনোদিনী তাহা ভাবিয়া পায় না; মনে মনে তীব্র হাসি হাসিয়া বলে, "কোনো নারীর কি আমার মতো এমন দশা হইয়াছে। আমি মরিতে চাই কি মারিতে চাই, তাহা বুঝিতেই পারিলাম না।" কিন্তু যে কারণেই বল, দগ্ধ হইতেই হউক বা দগ্ধ করিতেই হউক, মহেন্দ্রকে তাহার একান্ত প্রয়োজন। সে তাহার বিষদিগ্ধ অগ্নিবাণ জগতে কোথায় মোচন করিবে। ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বিনোদিনী কহিল, "সে যাইবে কোথায়। সে ফিরিবেই। সে আমার।"

অনতিকাল পরেই মহেন্দ্র তাহার ছাত্রাবাসে চেনা হাতের অক্ষরে একখানি চিঠি পাইল। দিনের বেলা গোলমালের মধ্যে খুলিল না— বুকের কাছে পকেটের মধ্যে পুরিয়া রাখিল। কালেজে লেকচার শুনিতে শুনিতে, হাসপাতাল ঘুরিতে ঘুরিতে, হঠাৎ এক-একবার মনে হইতে লাগিল, ভালোবাসার একটা পাখি তাহার বুকের নীড়ে বাসা করিয়া ঘুমাইয়া আছে। তাহাকে জাগাইয়া তুলিলেই তাহার সমস্ত কোমল কূজন কানে ধ্বনিত হইয়া উঠিবে।

সন্ধ্যায় এক সময় মহেন্দ্র নির্জন ঘরে ল্যাম্পের আলোকে চৌকিতে বেশ করিয়া হেলান দিয়া আরাম করিয়া বসিল। পকেট হইতে তাহার দেহতাপতপ্ত চিঠিখানি বাহির করিয়া লইল। অনেকক্ষণ চিঠি না খুলিয়া লেফাফার উপরকার শিরোনামা নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল। মহেন্দ্র জানিত, চিঠির মধ্যে বেশি কিছু কথা নাই। আশা নিজের মনের ভাব ঠিকমতো ব্যক্ত করিয়া লিখিতে পারিবে, এমন সম্ভাবনা ছিল না। কেবল তাহার কাঁচা অক্ষরে বাঁকা লাইনে তাহার মনের কোমল কথাগুলি কল্পনা করিয়া লইতে হইবে। আশার কাঁচা হাতে বহুযত্নে লেখা নিজের নামটি পড়িয়া মহেন্দ্র নিজের নামের সঙ্গে যেন একটা রাগিণী শুনিতে পাইল— তাহা সাধ্বী নারী-হৃদয়ের অতি নিভৃত বৈকুণ্ঠলোক হইতে একটি নির্মল প্রেমের সংগীত।

এই দুই-একদিনের বিচ্ছেদে মহেন্দ্রের মন হইতে দীর্ঘ মিলনের সমস্ত অবসাদ দূর হইয়া সরলা বধূর নবপ্রেমে উদ্ভাসিত সুখস্মৃতি আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। শেষাশেষি প্রাত্যহিক ঘরকন্নার খুঁটিনাটি অসুবিধা তাহাকে উত্ত্যক্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সে-সমস্ত অপসারিত হইয়া কেবলমাত্র কর্মহীন কারণহীন একটি বিশুদ্ধ প্রেমানন্দের আলোকে আশার মানসী মূর্তি তাহার মনের মধ্যে প্রাণ পাইয়া উঠিয়াছে।

মহেন্দ্র অতি ধীরে ধীরে লেফাফা ছিঁড়িয়া চিঠিখানা বাহির করিয়া নিজের ললাটে কপোলে বুলাইয়া লইল। এক দিন মহেন্দ্র যে-এসেন্স আশাকে উপহার দিয়াছিল,

সেই এসেন্সের গন্ধ চিঠির কাগজ হইতে উতলা দীর্ঘনিশ্বাসের মতো মহেন্দ্রের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিল।

ভাঁজ খুলিয়া মহেন্দ্র চিঠি পড়িল। কিন্তু এ কী। যেমন বাঁকাচোরা লাইন, তেমন সাদাসিধা ভাষা নয় তো। কাঁচা-কাঁচা অক্ষর, কিন্তু কথাগুলি তো তাহার সঙ্গে মিলিল না। লেখা আছে—

> প্রিয়তম, যাহাকে ভুলিবার জন্য চলিয়া গেছ, এ লেখায় তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিব কেন। যে লতাকে ছিঁড়িয়া মাটিতে ফেলিয়া দিলে, সে আবার কোন্ লজ্জায় জড়াইয়া উপরে উঠিতে চেষ্টা করে। সে কেন মাটির সঙ্গে মাটি হইয়া মিশিয়া গেল না।
>
> কিন্তু এটুকুতে তোমার কী ক্ষতি হইবে, নাথ। না হয় ক্ষণকালের জন্য মনে পড়িলই বা। মনে তাহাতে কতটুকুই বা বাজিবে। আর, তোমার অবহেলা যে কাঁটার মতো আমার পাঁজরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া রহিল। সকল দিন, সকল রাত, সকল কাজ, সকল চিন্তার মধ্যে যেদিকে ফিরি, সেই দিকেই যে আমাকে বিঁধিতে লাগিল। তুমি যেমন করিয়া ভুলিলে, আমাকে তেমনি করিয়া ভুলিবার একটা উপায় বলিয়া দাও।
>
> নাথ, তুমি যে আমাকে ভালোবাসিয়াছিলে, সে কি আমারই অপরাধ। আমি কি স্বপ্নেও এত সৌভাগ্য প্রত্যাশা করিয়াছিলাম। আমি কোথা হইতে আসিলাম, আমাকে কে জানিত। আমাকে যদি না চাহিয়া দেখিতে, আমাকে যদি তোমার ঘরে বিনা-বেতনের দাসী হইয়া থাকিতে হইত, আমি কি তোমাকে কোনো দোষ দিতে পারিতাম। তুমি নিজেই আমার কোন্ গুণে ভুলিলে প্রিয়তম, কী দেখিয়া আমার এত আদর বাড়াইলে। আর, আজ বিনা-মেঘে যদি বজ্রপাতই হইল, তবে সে বজ্র কেবল দগ্ধ করিল কেন। একেবারে দেহমন কেন ছাই করিয়া দিল না।
>
> এই দুটো দিনে অনেক সহ্য করিলাম, অনেক ভাবিলাম, কিন্তু, একটা কথা বুঝিতে পারিলাম না— ঘরে থাকিয়াও কি তুমি আমাকে ফেলিতে পারিতে না। আমার জন্যও কি তোমার ঘর ছাড়িয়া যাওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল। আমি কি তোমার এতখানি জুড়িয়া আছি। আমাকে তোমার ঘরের কোণে, তোমার দ্বারের বাহিরে ফেলিয়া রাখিলেও কি আমি তোমার চোখে পড়িতাম। তাই যদি হয়, তুমি কেন গেলে, আমার কি কোথাও যাইবার পথ ছিল না। ভাসিয়া আসিয়াছি, ভাসিয়া যাইতাম।—

এ কী চিঠি। এ ভাষা কাহার, তাহা মহেন্দ্রের বুঝিতে বাকি রহিল না। অকস্মাৎ আহত মূর্ছিতের মতো মহেন্দ্র সে-চিঠিখানি লইয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিল। যে-লাইনে রেলগাড়ির মতো তাহার মন পূর্ণবেগে ছুটিয়াছিল, সেই লাইনেই বিপরীত দিক হইতে একটা ধাক্কা খাইয়া লাইনের বাহিরে তাহার মনটা যেন উলটাপালটা স্তূপাকার বিকল হইয়া পড়িয়া থাকিল।

অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া আবার সে দুইবার তিনবার করিয়া পড়িল। কিছুকাল যাহা সুদূর আভাসের মতো ছিল, আজ তাহা যেন ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার জীবনাকাশের এক কোণে যে ধূমকেতুটা ছায়ার মতো দেখাইতেছিল, আজ তাহার উদ্যত বিশাল পুচ্ছ অগ্নিরেখায় দীপ্যমান হইয়া দেখা দিল।

এ চিঠি বিনোদিনীরই। সরলা আশা নিজের মনে করিয়া তাহা লিখিয়াছে। পূর্বে যে-কথা সে কখনো ভাবে নাই, বিনোদিনীর রচনামতো চিঠি লিখিতে গিয়া সেই সব কথা তাহার মনে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। নকল-করা কথা বাহির হইতে বদ্ধমূল হইয়া তাহার আন্তরিক হইয়া গেল; যে-নূতন বেদনার সৃষ্টি হইল, এমন সুন্দর করিয়া তাহা ব্যক্ত করিতে আশা কখনোই পারিত না। সে ভাবিতে লাগিল, “সখী আমার মনের কথা এমন ঠিকটি বুঝিল কী করিয়া। কেমন করিয়া এমন ঠিকটি প্রকাশ করিয়া বলিল।” অন্তরঙ্গ সখীকে আশা আরো যেন বেশি আগ্রহের সঙ্গে আশ্রয় করিয়া ধরিল, কারণ, যে-ব্যথাটা তাহার মনের মধ্যে, তাহার ভাষাটি তাহার সখীর কাছে— সে এতই নিরুপায়।

মহেন্দ্র চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বিনোদিনীর উপর রাগ করিতে অনেক চেষ্টা করিল, মাঝে থেকে রাগ হইল আশার উপর। “দেখো দেখি, আশার এ কী মূঢ়তা, স্বামীর প্রতি এ কী অত্যাচার।” বলিয়া চৌকিতে বসিয়া পড়িয়া প্রমাণস্বরূপ চিঠিখানা আবার পড়িল। পড়িয়া ভিতরে-ভিতরে একটা হর্ষসঞ্চার হইতে লাগিল। চিঠিখানাকে সে আশারই চিঠি মনে করিয়া পড়িবার অনেক চেষ্টা করিল। কিন্তু এ-ভাষায় কোনোমতেই সরলা আশাকে মনে করাইয়া দেয় না। দু-চার লাইন পড়িবামাত্র একটা সুখোন্মাদকর সন্দেহ ফেনিল মদের মতো মনকে চারিদিকে ছাপাইয়া উঠিতে থাকে। এই প্রচ্ছন্ন অথচ ব্যক্ত, নিষিদ্ধ অথচ নিকটাগত, বিষাক্ত অথচ মধুর, একই কালে উপহৃত অথচ প্রত্যাহৃত প্রেমের আভাস মহেন্দ্রকে মাতাল করিয়া তুলিল। তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল, নিজের হাতে-পায়ে কোথাও এক জায়গায় ছুরি বসাইয়া বা আর-কিছু করিয়া নেশা ছুটাইয়া মনটাকে আর-কোনো দিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়। টেবিলে সজোরে মুষ্টি বসাইয়া চৌকি হইতে লাফাইয়া উঠিয়া

কহিল, "দূর করো, চিঠিখানা পুড়াইয়া ফেলি।" বলিয়া চিঠিখানি ল্যাম্পের কাছাকাছি লইয়া গেল। পুড়াইল না, আর-একবার পড়িয়া ফেলিল। পরদিন ভৃত্য টেবিল হইতে কাগজপোড়া ছাই অনেক ঝাড়িয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু তাহা আশার চিঠির ছাই নহে, চিঠির উত্তর দিবার অনেকগুলা অসম্পূর্ণ চেষ্টাকে মহেন্দ্র পুড়াইয়া ছাই করিয়াছে।

২০

ইতিমধ্যে আরো এক চিঠি আসিয়া উপস্থিত হইল।

> তুমি আমার চিঠির উত্তর দিলে না? ভালোই করিয়াছ। ঠিক কথা তো লেখা যায় না; তোমার যা জবাব, সে আমি মনে মনে বুঝিয়া লইলাম। ভক্ত যখন তাহার দেবতাকে ডাকে, তিনি কি মুখের কথায় তাহার উত্তর দেন। দুখিনীর বিল্বপত্রখানি চরণতলে বোধ করি স্থান পাইয়াছে।
>
> কিন্তু ভক্তের পূজা লইতে গিয়া শিবের যদি তপোভঙ্গ হয়, তবে তাহাতে রাগ করিয়ো না, হৃদয়দেব। তুমি বর দাও বা না দাও, চোখ মেলিয়া চাও বা না চাও, জানিতে পার বা না পার, পূজা না দিয়া ভক্তের আর গতি নাই। তাই আজিও এই দু-ছত্র চিঠি লিখিলাম— হে আমার পাষাণ-ঠাকুর, তুমি অবিচলিত হইয়া থাকো।"—

মহেন্দ্র আবার চিঠির উত্তর লিখিতে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু আশাকে লিখিতে গিয়া বিনোদিনীর উত্তর কলমের মুখে আপনি আসিয়া পড়ে। ঢাকিয়া লুকাইয়া কৌশল করিয়া লিখিতে পারে না। অনেকগুলি ছিঁড়িয়া রাত্রের অনেক প্রহর কাটাইয়া একটা যদি বা লিখিল, সেটা লেফাফায় পুরিয়া উপরে আশার নাম লিখিবার সময় হঠাৎ তাহার পিঠে যেন কাহার চাবুক পড়িল— কে যেন বলিল, "পাষণ্ড, বিশ্বস্ত বালিকার প্রতি এমনি করিয়া প্রতারণা?" চিঠি মহেন্দ্র সহস্র টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল, এবং বাকি রাতটা টেবিলের উপর দুই হাতের মধ্যে মুখ ঢাকিয়া নিজেকে যেন নিজের দৃষ্টি হইতে লুকাইবার চেষ্টা করিল।

> তৃতীয় পত্র— যে একেবারেই অভিমান করিতে জানে না, সে কি ভালোবাসে। নিজের ভালোবাসাকে যদি অনাদর-অপমান হইতে বাঁচাইয়া রাখিতে না পারি, তবে সে ভালোবাসা তোমাকে দিব কেমন করিয়া।
>
> তোমার মন হয়তো ঠিক বুঝি নাই, তাই এত সাহস করিয়াছি। তাই যখন ত্যাগ করিয়া গেলে, তখনো নিজে অগ্রসর হইয়া চিঠি লিখিয়াছি,

যখন চুপ করিয়া ছিলে, তখনো মনের কথা বলিয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু তোমাকে যদি ভুল করিয়া থাকি, সে কি আমারই দোষ। একবার শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত সব কথা মনে করিয়া দেখো দেখি, যাহা বুঝিয়াছিলাম, সে কি তুমিই বোঝাও নাই।

সে যাই হোক, ভুল হোক সত্য হোক, যাহা লিখিয়াছি সে আর মুছিবে না, যাহা দিয়াছি সে আর ফিরাইতে পারিব না, এই আক্ষেপ। ছি ছি, এমন লজ্জাও নারীর ভাগ্যে ঘটে। কিন্তু তাই বলিয়া মনে করিয়ো না, ভালো যে বাসে সে নিজের ভালোবাসাকে বরাবর অপদস্থ করিতে পারে। যদি আমার চিঠি না চাও তো থাক্, যদি উত্তর না লিখিবে তবে এই পর্যন্ত—

ইহার পর মহেন্দ্র আর থাকিতে পারিল না। মনে করিল, "অত্যন্ত রাগ করিয়াই ঘরে ফিরিয়া যাইতেছি। বিনোদিনী মনে করে, তাহাকে ভুলিবার জন্যই ঘর ছাড়িয়া পালাইয়াছি!" বিনোদিনীর সেই স্পর্ধাকে হাতে-হাতে অপ্রমাণ করিবার জন্যই তখনি মহেন্দ্র ঘরে ফিরিবার সংকল্প করিল।

এমন সময় বিহারী ঘরে প্রবেশ করিল। বিহারীকে দেখিবামাত্র মহেন্দ্রের ভিতরের পুলক যেন দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। ইতিপূর্বে নানা সন্দেহে ভিতরে ভিতরে বিহারীর প্রতি তাহার ঈর্ষা জন্মিতেছিল, উভয়ের বন্ধুত্ব ক্লিষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। পত্রপাঠের পর আজ সমস্ত ঈর্ষাভার বিসর্জন দিয়া বিহারীকে সে অতিরিক্ত আবেগের সহিত আহ্বান করিয়া লইল। চৌকি হইতে উঠিয়া, বিহারীর পিঠে চাপড় মারিয়া, তাহার হাত ধরিয়া, তাহাকে একটা কেদারার উপরে টানিয়া বসাইয়া দিল।

কিন্তু বিহারীর মুখ আজ বিমর্ষ। মহেন্দ্র ভাবিল, বেচারা নিশ্চয় ইতিমধ্যে বিনোদিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছে এবং সেখান হইতে ধাক্কা খাইয়া আসিয়াছে। মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "বিহারী, এর মধ্যে আমাদের ওখানে গিয়াছিলে?"

বিহারী গম্ভীরমুখে কহিল, "এখনি সেখান হইতে আসিতেছি।"

মহেন্দ্র বিহারীর বেদনা কল্পনা করিয়া মনে মনে একটু কৌতুকবোধ করিল। মনে মনে কহিল, "হতভাগ্য বিহারী। স্ত্রীলোকের ভালোবাসা হইতে বেচারা একেবারে বঞ্চিত।" বলিয়া নিজের বুকের পকেটের কাছটায় এক বার হাত দিয়া চাপ দিল— ভিতর হইতে তিনটে চিঠি খড়খড় করিয়া উঠিল।

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "সবাইকে কেমন দেখিলে?"

বিহারী তাহার উত্তর না করিয়া কহিল, "বাড়ি ছাড়িয়া তুমি যে এখানে?"

মহেন্দ্র কহিল, "আজকাল প্রায় নাইট-ডিউটি পড়ে— বাড়িতে অসুবিধা হয়।"

বিহারী কহিল, "এর আগেও তো নাইট-ডিউটি পড়িয়াছে, কিন্তু তোমাকে তো বাড়ি ছাড়িতে দেখি নাই।"

মহেন্দ্র হাসিয়া কহিল, "মনে কোনো সন্দেহ জন্মিয়াছে না কি।"

বিহারী কহিল, "না, ঠাট্টা নয়, এখনি বাড়ি চলো।"

মহেন্দ্র বাড়ি ফিরিবার জন্য উদ্যত হইয়াই ছিল; বিহারীর অনুরোধ শুনিয়া সে হঠাৎ নিজেকে ভুলাইল, যেন বাড়ি যাইবার জন্য তাহার কিছুমাত্র আগ্রহ নাই। কহিল, "সে কি হয়, বিহারী। তাহলে আমার বৎসরটাই নষ্ট হইবে।"

বিহারী কহিল, "দেখো মহিনদা, তোমাকে আমি এতটুকু বয়স হইতে দেখিতেছি, আমাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিয়ো না। তুমি অন্যায় করিতেছ।"

মহেন্দ্র। কার 'পরে অন্যায় করিতেছি, জজসাহেব।

বিহারী রাগ করিয়া বলিল, "তুমি যে চিরকাল হৃদয়ের বড়াই করিয়া আসিয়াছ, তোমার হৃদয় গেল কোথায় মহিনদা।"

মহেন্দ্র। সম্প্রতি কালেজের হাসপাতালে।

বিহারী। থামো মহিনদা, থামো। তুমি এখানে আমার সঙ্গে হাসিয়া ঠাট্টা করিয়া কথা কহিতেছ, সেখানে আশা তোমার বাহিরের ঘরে, অন্দরের ঘরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতেছে।

আশার কান্নার কথা শুনিয়া হঠাৎ মহেন্দ্রের মন একটা প্রতিঘাত পাইল। জগতে আর যে কাহারো সুখদুঃখ আছে, সে-কথা তাহার নূতন নেশার কাছে স্থান পায় নাই। হঠাৎ চমক লাগিল, জিজ্ঞাসা করিল, "আশা কাঁদিতেছে কী জন্য।"

বিহারী বিরক্ত হইয়া কহিল, "সে-কথা তুমি জান না, আমি জানি?"

মহেন্দ্র। তোমার মহিনদা সর্বজ্ঞ নয় বলিয়া যদি রাগ করিতেই হয় তো মহিনদার সৃষ্টিকর্তার উপর রাগ করো।

তখন বিহারী যাহা দেখিয়াছিল, তাহা আগাগোড়া বলিল। বলিতে বলিতে বিনোদিনীর বক্ষোলগ্ন আশার সেই অশ্রুসিক্ত মুখখানি মনে পড়িয়া বিহারীর প্রায় কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল।

বিহারীর এই প্রবল আবেগ দেখিয়া মহেন্দ্র আশ্চর্য হইয়া গেল। মহেন্দ্র জানিত বিহারীর হৃদয়ের বালাই নাই— এ উপসর্গ কবে জুটিল। যেদিন কুমারী আশাকে দেখিতে গিয়াছিল, সেই দিন হইতে নাকি। বেচারা বিহারী। মহেন্দ্র মনে মনে তাহাকে বেচারা বলিল বটে, কিন্তু দুঃখবোধ না করিয়া বরঞ্চ একটু আমোদ পাইল। আশার মনটি একান্তভাবে যে কোন্ দিকে, তাহা মহেন্দ্র নিশ্চয় জানিত। "অন্য

লোকের কাছে যাহারা বাঞ্ছার ধন, কিন্তু আয়ত্তের অতীত, আমার কাছে তাহারা চিরদিনের জন্য আপনি ধরা দিয়াছে,"— ইহাতে মহেন্দ্র বক্ষের মধ্যে একটা গর্বের স্ফীতি অনুভব করিল।

মহেন্দ্র বিহারীকে কহিল, "আচ্ছা চলো, যাওয়া যাক। তবে একটা গাড়ি ডাকো।"

২১

মহেন্দ্র ঘরে ফিরিয়া আসিবামাত্র তাহার মুখ দেখিয়াই আশার মনের সমস্ত সংশয় ক্ষণকালের কুয়াশার মতো এক মুহূর্তেই কাটিয়া গেল। নিজের চিঠির কথা স্মরণ করিয়া লজ্জায় মহেন্দ্রের সামনে সে যেন মুখ তুলিতেই পারিল না। মহেন্দ্র তাহার উপরে ভৎর্সনা করিয়া কহিল, "এমন অপবাদ দিয়া চিঠিগুলা লিখিলে কী করিয়া।"

বলিয়া পকেট হইতে বহুবার পঠিত সেই চিঠি তিনখানি বাহির করিল। আশা ব্যাকুল হইয়া কহিল, "তোমার পায়ে পড়ি, ও চিঠিগুলো ছিঁড়িয়া ফেলো।" বলিয়া মহেন্দ্রের হাত হইতে চিঠিগুলা লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল। মহেন্দ্র তাহাকে নিরস্ত করিয়া সেগুলি পকেটে পুরিল। কহিল, "আমি কর্তব্যের অনুরোধে গেলাম, আর তুমি আমার অভিপ্রায় বুঝিলে না? আমাকে সন্দেহ করিলে?"

আশা ছল-ছল চোখে কহিল, "এবারকার মতো আমাকে মাপ করো। এমন আর কখনোই হইবে না।"

মহেন্দ্র কহিল, "কখনো না?"

আশা কহিল, "কখনো না।"

তখন মহেন্দ্র তাহাকে টানিয়া লইয়া চুম্বন করিল। আশা কহিল, "চিঠিগুলা দাও, ছিঁড়িয়া ফেলি।"

মহেন্দ্র কহিল, "না, ও থাক্।"

আশা সবিনয়ে মনে করিল, "আমার শাস্তিস্বরূপ এ চিঠিগুলি উনি রাখিলেন।"

এই চিঠির ব্যাপারে বিনোদিনীর উপর আশার মনটা একটু যেন বাঁকিয়া দাঁড়াইল। স্বামীর আগমনবার্তা লইয়া সে সখীর কাছে আনন্দ করিতে গেল না— বরঞ্চ বিনোদিনীকে একটু যেন এড়াইয়া গেল। বিনোদিনী সেটুকু লক্ষ্য করিল এবং কাজের ছল করিয়া একেবারে দূরে রহিল।

মহেন্দ্র ভাবিল, "এ তো বড়ো অদ্ভুত। আমি ভাবিয়াছিলাম, এবার বিনোদিনীকে বিশেষ করিয়াই দেখা যাইবে— উল্‌টা হইল? তবে সে চিঠিগুলার অর্থ কী।"

নারীহৃদয়ের রহস্য বুঝিবার কোনো চেষ্টা করিবে না বলিয়াই মহেন্দ্র মনকে

দৃঢ় করিয়াছিল— ভাবিয়াছিল, “বিনোদিনী যদি কাছে আসিবার চেষ্টা করে, তবু আমি দূরে থাকিব।” আজ সে মনে মনে কহিল, “না, এ তো ঠিক হইতেছে না। যেন আমাদের মধ্যে সত্যই কী একটা বিকার ঘটিয়াছে। বিনোদিনীর সঙ্গে সহজ স্বাভাবিক ভাবে কথাবার্তা আমোদপ্রমোদ করিয়া এই সংশয়াচ্ছন্ন গুমটের ভাবটা দূর করিয়া দেওয়া উচিত।”

আশাকে মহেন্দ্র কহিল, “দেখিতেছি, আমিই তোমার সখীর চোখের বালি হইলাম। আজকাল তাঁহার আর দেখাই পাওয়া যায় না।”

আশা উদাসীন ভাবে উত্তর করিল, “কে জানে, তাহার কী হইয়াছে।”

এদিকে রাজলক্ষ্মী আসিয়া কাঁদো-কাঁদো হইয়া কহিলেন, “বিপিনের বউকে আর তো ধরিয়া রাখা যায় না।”

মহেন্দ্র চকিত ভাব সামলাইয়া লইয়া কহিল, “কেন, মা।”

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “কী জানি বাছা, সে তো এবার বাড়ি যাইবার জন্য নিতান্তই ধরিয়া পড়িয়াছে। তুই তো কাহাকেও খাতির করিতে জানিস না। ভদ্রলোকের মেয়ে পরের বাড়িতে আছে, উহাকে আপনার লোকের মতো আদর-যত্ন না করিলে থাকিবে কেন।”

বিনোদিনী শোবার ঘরে বসিয়া বিছানার চাদর সেলাই করিতেছিল। মহেন্দ্র প্রবেশ করিয়া ডাকিল, “বালি।”

বিনোদিনী সংযত হইয়া বসিল। কহিল, “কী, মহেন্দ্রবাবু।”

মহেন্দ্র কহিল, “কী সর্বনাশ। মহেন্দ্র আবার বাবু হইলেন কবে।”

বিনোদিনী আবার চাদর-সেলাইয়ের দিকে নতচক্ষু নিবদ্ধ রাখিয়া কহিল, “তবে কী বলিয়া ডাকিব।”

মহেন্দ্র কহিল, “তোমার সখীকে যা বল— চোখের বালি।”

বিনোদিনী অন্যদিনের মতো ঠাট্টা করিয়া তাহার কোনো উত্তর দিল না— সেলাই করিয়া যাইতে লাগিল।

মহেন্দ্র কহিল, “ওটা বুঝি সত্যকার সম্বন্ধ হইল, তাই ওটা আর পাতানো চলিতেছে না!”

বিনোদিনী একটু থামিয়া দাঁত দিয়া সেলাইয়ের প্রান্ত হইতে খানিকটা বাড়তি সুতা কাটিয়া ফেলিয়া কহিল, “কী জানি, সে আপনি জানেন।”

বলিয়াই তাহার সর্বপ্রকার উত্তর চাপা দিয়া গম্ভীরমুখে কহিল, “কালেজ হইতে হঠাৎ ফেরা হইল যে।”

মহেন্দ্র কহিল, “কেবল মড়া কাটিয়া আর কত দিন চলিবে।”

আবার বিনোদিনী দন্ত দিয়া সুতা ছেদন করিল এবং মুখ না তুলিয়াই কহিল, "এখন বুঝি জিয়ন্তের আবশ্যক।"

মহেন্দ্র স্থির করিয়াছিল, আজ বিনোদিনীর সঙ্গে অত্যন্ত সহজ স্বাভাবিক ভাবে হাস্যপরিহাস উত্তরপ্রত্যুত্তর করিয়া আসর জমাইয়া তুলিবে। কিন্তু এমনি গাম্ভীর্যের ভার তাহার উপর চাপিয়া আসিল যে, লঘু জবাব প্রাণপণ চেষ্টাতেও মুখের কাছে জোগাইল না। বিনোদিনী আজ কেমন একরকম কঠিন দূরত্ব রক্ষা করিয়া চলিতেছে দেখিয়া, মহেন্দ্রের মনটা সবেগে তাহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল—ব্যবধানটাকে কোনো একটা নাড়া দিয়া ভূমিসাৎ করিতে ইচ্ছা হইল। বিনোদিনীর শেষ বাক্যঘাতের প্রতিঘাত না দিয়া, হঠাৎ তাহার কাছে আসিয়া বসিয়া কহিল, "তুমি আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছ কেন। কোনো অপরাধ করিয়াছি?"

বিনোদিনী তখন একটু সরিয়া সেলাই হইতে মুখ তুলিয়া দুই বিশাল উজ্জ্বল চক্ষু মহেন্দ্রের মুখের উপর স্থির রাখিয়া কহিল, "কর্তব্যকর্ম তো সকলেরই আছে। আপনি যে সকল ছাড়িয়া কালেজের বাসায় যান, সে কি কাহারও অপরাধে। আমারও যাইতে হইবে না? আমারও কর্তব্য নাই?"

মহেন্দ্র ভালো উত্তর অনেক ভাবিয়া খুঁজিয়া পাইল না কিছুক্ষণ থামিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার এমন কী কর্তব্য যে না গেলেই নয়।"

বিনোদিনী অত্যন্ত সাবধানে সূচিতে সুতা পরাইতে পরাইতে কহিল, "কর্তব্য আছে কি না, সে নিজের মনই জানে। আপনার কাছে তাহার আর কী তালিকা দিব।"

মহেন্দ্র গম্ভীর চিন্তিত মুখে জানালার বাহিরে একটা সুদূর নারিকেলগাছের মাথার দিকে চাহিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বিনোদিনী নিঃশব্দে সেলাই করিয়া যাইতে লাগিল। ঘরে ছুঁচটি পড়িলে শব্দ শুনা যায়, এমনি হইল। অনেকক্ষণ পরে মহেন্দ্র হঠাৎ কথা কহিল। অকস্মাৎ নিঃশব্দতাভঙ্গে বিনোদিনী চমকিয়া উঠিল—তাহার হাতে ছুঁচ ফুটিয়া গেল।

মহেন্দ্র কহিল, "তোমাকে কোনো অনুনয়-বিনয়েই রাখা যাইবে না?"

বিনোদিনী তাহার আহত অঙ্গুলি হইতে রক্তবিন্দু শুষিয়া লইয়া কহিল, "কিসের জন্য এত অনুনয়-বিনয়। আমি থাকিলেই কী, আর না থাকিলেই কী। আপনার তাহাতে কী আসে যায়।"

বলিতে বলিতে গলাটা যেন ভারি হইয়া আসিল; বিনোদিনী অত্যন্ত মাথা নিচু করিয়া সেলাইয়ের প্রতি একান্ত মনোনিবেশ করিল—মনে হইল, হয়তো বা তাহার

নতনেত্রের পল্লবপ্রান্তে একটুখানি জলের রেখা দেখা দিয়াছে। মাঘের অপরাহ্ণ তখন সন্ধ্যার অন্ধকারে মিলাইবার উপক্রম করিতেছিল।

মহেন্দ্র মুহূর্তের মধ্যে বিনোদিনীর হাত চাপিয়া ধরিয়া রুদ্ধ সজলস্বরে কহিল, "যদি তাহাতে আমার আসে যায়, তবে তুমি থাকিবে ?"

বিনোদিনী তাড়াতাড়ি হাত ছাড়াইয়া লইয়া সরিয়া বসিল। মহেন্দ্রের চমক ভাঙিয়া গেল। নিজের শেষ কথাটা ভীষণ ব্যঙ্গের মতো তাহার নিজের কানে বারংবার প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অপরাধী জিহ্বাকে মহেন্দ্র দন্ত দ্বারা দংশন করিল— তাহার পর হইতে রসনা নির্বাক হইয়া রহিল।

এমন সময় এই নৈঃশব্দ্যপরিপূর্ণ ঘরের মধ্যে আশা প্রবেশ করিল। বিনোদিনী তৎক্ষণাৎ যেন পূর্ব-কথোপকথনের অনুবৃত্তিস্বরূপে হাসিয়া মহেন্দ্রকে বলিয়া উঠিল, "আমার গুমর তোমরা যখন এত বাড়াইলে, তখন আমারও কর্তব্য, তোমাদের একটা কথা রাখা। যতক্ষণ না বিদায় দিবে ততক্ষণ রহিলাম।"

আশা স্বামীর কৃতকার্যতায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়া সখীকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল। কহিল, "তবে এই কথা রহিল। তাহা হইলে তিন-সত্য করো, যতক্ষণ না বিদায় দিব ততক্ষণ থাকিবে, থাকিবে, থাকিবে।"

বিনোদিনী তিনবার স্বীকার করিল। আশা কহিল, "ভাই চোখের বালি, সেই যদি রহিলেই তবে এত করিয়া সাধাইলে কেন। শেষকালে আমার স্বামীর কাছে তো হার মানিতে হইল।"

বিনোদিনী হাসিয়া কহিল, "ঠাকুরপো, আমি হার মানিয়াছি, না তোমাকে হার মানাইয়াছি ?"

মহেন্দ্র এতক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া ছিল ; মনে হইতেছিল, তাহার অপরাধে যেন সমস্ত ঘর ভরিয়া রহিয়াছে, লাঞ্ছনা যেন তাহার সর্বাঙ্গ পরিবেষ্টন করিয়া। আশার সঙ্গে কেমন করিয়া সে প্রসন্নমুখে স্বাভাবিকভাবে কথা কহিবে। এক মুহূর্তের মধ্যে কেমন করিয়া সে আপনার বীভৎস অসংযমকে সহাস্য চটুলতায় পরিণত করিবে। এই পৈশাচিক ইন্দ্রজাল তাহার আয়ত্তের বহির্ভূত ছিল। সে গম্ভীরমুখে কহিল, "আমারই তো হার হইয়াছে।" বলিয়াই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

অনতিকাল পরেই আবার মহেন্দ্র ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বিনোদিনীকে কহিল, "আমাকে মাপ করো।"

বিনোদিনী কহিল, "অপরাধ কী করিয়াছ, ঠাকুরপো।"

মহেন্দ্র কহিল, "তোমাকে জোর করিয়া এখানে ধরিয়া রাখিবার অধিকার আমাদের নাই।"

বিনোদিনী হাসিয়া কহিল, "জোর কই করিলে, তাহা তো দেখিলাম না। ভালোবাসিয়া ভালো মুখেই তো থাকিতে বলিলে। তাহাকে কি জোর বলে। বলো তো ভাই চোখের বালি, গায়ের জোর আর ভালোবাসা কি একই হইল।"

আশা তাহার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হইয়া কহিল, "কখনোই না।"

বিনোদিনী কহিল, "ঠাকুরপো, তোমার ইচ্ছা আমি থাকি, আমি গেলে তোমার কষ্ট হইবে, সে তো আমার সৌভাগ্য। কী বল ভাই চোখের বালি, সংসারে এমন সুহৃদ কয় জন পাওয়া যায়। তেমন ব্যথার ব্যথী, সুখের সুখী, অদৃষ্টগুণে যদিই পাওয়া যায়, তবে আমিই বা তাহাকে ছাড়িয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইব কেন।"

আশা তাহার স্বামীকে অপদস্থভাবে নিরুত্তর থাকিতে দেখিয়া ঈষৎ ব্যথিতচিত্তে কহিল, "তোমার সঙ্গে কথায় কে পারিবে ভাই। আমার স্বামী তো হার মানিয়াছেন, এখন তুমি একটু থামো।"

মহেন্দ্র আবার দ্রুত ঘর হইতে বাহির হইল। তখন রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করিয়া বিহারী মহেন্দ্রের সন্ধানে আসিতেছিল। মহেন্দ্র তাহাকে দ্বারের সম্মুখে দেখিতে পাইয়াই বলিয়া উঠিল, "ভাই বিহারী, আমার মতো পাষণ্ড আর জগতে নাই।" এমন বেগে কহিল, সে কথা ঘরের মধ্যে গিয়া পৌঁছিল।

ঘরের মধ্য হইতে তৎক্ষণাৎ আহ্বান আসিল, "বিহারী-ঠাকুরপো।"

বিহারী কহিল, "একটু বাদে আসছি, বিনোদ-বোঠান।"

বিনোদিনী কহিল, "একবার শুনেই যাও-না।"

বিহারী ঘরে ঢুকিয়াই মুহূর্তের মধ্যে একবার আশার দিকে চাহিল— ঘোমটার মধ্য হইতে আশার মুখ যতটুকু দেখিতে পাইল, সেখানে বিষাদ বা বেদনার কোনো চিহ্নই তো দেখা গেল না। আশা উঠিয়া যাইবার চেষ্টা করিল, বিনোদিনী তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিল— কহিল, "আচ্ছা, বিহারী-ঠাকুরপো, আমার চোখের বালির সঙ্গে কি তোমার সতিন-সম্পর্ক। তোমাকে দেখলেই ও পালাতে চায় কেন।"

আশা অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া বিনোদিনীকে তাড়না করিল।

বিহারী হাসিয়া উত্তর করিল, "বিধাতা আমাকে তেমন সুদৃশ্য করিয়া গড়েন নাই বলিয়া।"

বিনোদিনী। দেখছিস ভাই বালি, বিহারী-ঠাকুরপো বাঁচাইয়া কথা বলিতে জানেন— তোর রুচিকে দোষ না দিয়া বিধাতাকেই দোষ দিলেন। লক্ষ্মণটির মতো

এমন সুলক্ষণ দেবর পাইয়াও তাহাকে আদর করিতে শিখিলি না— তোরই কপাল মন্দ।

বিহারী। তোমার যদি তাহাতে দয়া হয় বিনোদ-বোঠান, তবে আর আমার আক্ষেপ কিসের।

বিনোদিনী। সমুদ্র তো পড়িয়া আছে, তবু মেঘের ধারা নইলে চাতকের তৃষ্ণা মেটে না কেন।

আশাকে ধরিয়া রাখা গেল না। সে জোর করিয়া বিনোদিনীর হাত ছাড়াইয়া বাহির হইয়া গেল। বিহারীও চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিল। বিনোদিনী কহিল, "ঠাকুরপো, মহেন্দ্রবাবুর কী হইয়াছে, বলিতে পার ?"

শুনিয়াই বিহারী থমকিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। কহিল, "তাহা তো জানি না। কিছু হইয়াছে নাকি।"

বিনোদিনী। কী জানি ঠাকুরপো, আমার তো ভালো বোধ হয় না।

বিহারী উদ্‌বিগ্ন মুখে চৌকির উপর বসিয়া পড়িল। কথাটা খোলসা শুনিবে বলিয়া বিনোদিনীর মুখের দিকে ব্যগ্রভাবে চাহিয়া অপেক্ষা করিয়া রহিল। বিনোদিনী কোনো কথা না বলিয়া মনোযোগ দিয়া চাদর সেলাই করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া বিহারী কহিল, "মহিনদার সম্বন্ধে তুমি কি বিশেষ কিছু লক্ষ্য করিয়াছ।"

বিনোদিনী অত্যন্ত সাধারণ ভাবে কহিল, "কী জানি ঠাকুরপো, আমার তো ভালো বোধ হয় না। আমার চোখের বালির জন্যে আমার কেবলি ভাবনা হয়।" বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সেলাই রাখিয়া উঠিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

বিহারী ব্যস্ত হইয়া কহিল, "বোঠান, একটু বসো।" বলিয়া একটা চৌকিতে বসিল।

বিনোদিনী ঘরের সমস্ত জানালা-দরজা সম্পূর্ণ খুলিয়া দিয়া কেরোসিনের বাতি উসকাইয়া সেলাই টানিয়া লইয়া বিছানার দূরপ্রান্তে গিয়া বসিল। কহিল, "ঠাকুরপো, আমি তো চিরদিন এখানে থাকিব না— কিন্তু আমি চলিয়া গেলে আমার চোখের বালির উপর একটু দৃষ্টি রাখিয়ো— সে যেন অসুখী না হয়।" বলিয়া যেন হৃদয়োচ্ছ্বাস সংবরণ করিয়া লইবার জন্য বিনোদিনী অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

বিহারী বলিয়া উঠিল, "বোঠান, তোমাকে থাকিতেই হইবে। তোমার নিজের বলিতে কেহ নাই— এই সরলা মেয়েটিকে সুখে দুঃখে রক্ষা করিবার ভার তুমি লও— তুমি তাহাকে ফেলিয়া গেলে আমি তো আর উপায় দেখি না।"

বিনোদিনী। ঠাকুরপো, তুমি তো সংসারের গতিক জান। এখানে বরাবর থাকিব কেমন করিয়া। লোকে কী বলিবে।

বিহারী। লোকে যা বলে বলুক, তুমি কান দিয়ো না। তুমি দেবী— অসহায় বালিকাকে সংসারের নিষ্ঠুর আঘাত হইতে রক্ষা করা তোমারই উপযুক্ত কাজ। বোঠান, আমি তোমাকে প্রথমে চিনি নাই, সেজন্য আমাকে ক্ষমা করো। আমিও সংকীর্ণ-হৃদয় সাধারণ ইতরলোকদের মতো মনে মনে তোমার সম্বন্ধে অন্যায় ধারণা স্থান দিয়াছিলাম; একবার এমনও মনে হইয়াছিল, যেন আশার সুখে তুমি ঈর্ষা করিতেছ— যেন— কিন্তু সে-সব কথা মুখে উচ্চারণ করিতেও পাপ আছে। তার পরে, তোমার দেবীহৃদয়ের পরিচয় আমি পাইয়াছি— তোমার উপর আমার গভীর ভক্তি জন্মিয়াছে বলিয়াই, আজ তোমার কাছে আমার সমস্ত অপরাধ স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

বিনোদিনীর সর্বশরীর পুলকিত হইয়া উঠিল। যদিও সে ছলনা করিতেছিল, তবু বিহারীর এই ভক্তি-উপহার সে মনে মনেও মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না। এমন জিনিস সে কখনো কাহারও কাছ হইতে পায় নাই। ক্ষণকালের জন্য মনে হইল, সে যেন যথার্থ ই পবিত্র উন্নত— আশার প্রতি একটা অনির্দেশ্য দয়ায় তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। সেই অশ্রুপাত সে বিহারীর কাছে গোপন করিল না, এবং সেই অশ্রুধারা বিনোদিনীর নিজের কাছে নিজেকে পূজনীয়া বলিয়া মোহ উৎপাদন করিল।

বিহারী বিনোদিনীকে অশ্রু ফেলিতে দেখিয়া নিজের অশ্রুবেগ সংবরণ করিয়া উঠিয়া বাহিরে মহেন্দ্রের ঘরে গেল। মহেন্দ্র যে হঠাৎ নিজেকে পাষণ্ড বলিয়া কেন ঘোষণা করিল, বিহারী তাহার কোনো তাৎপর্য খুঁজিয়া পাইল না। ঘরে গিয়া দেখিল, মহেন্দ্র নাই। খবর পাইল, মহেন্দ্র বেড়াইতে বাহির হইয়াছে। পূর্বে মহেন্দ্র অকারণে কখনোই ঘর ছাড়িয়া বাহির হইত না। সুপরিচিত লোকের এবং সুপরিচিত ঘরের বাহিরে মহেন্দ্রের অত্যন্ত ক্লান্তি ও পীড়া বোধ হইত। বিহারী ভাবিতে ভাবিতে ধীরে ধীরে বাড়ি চলিয়া গেল।

বিনোদিনী আশাকে নিজের শয়নঘরে আনিয়া বুকের কাছে টানিয়া দুই চক্ষু জলে ভরিয়া কহিল, "ভাই চোখের বালি, আমি বড়ো হতভাগিনী, আমি বড়ো অলক্ষণা।"

আশা ব্যথিত হইয়া তাহাকে বাহুপাশে বেষ্টন করিয়া স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলিল, "কেন ভাই, অমন কথা কেন বলিতেছ।"

বিনোদিনী রোদনোচ্ছ্বসিত শিশুর মতো আশার বক্ষে মুখ রাখিয়া কহিল, "আমি

যেখানে থাকিব, সেখানে কেবল মন্দই হইবে। দে ভাই, আমাকে ছাড়িয়া দে, আমি আমার জঙ্গলের মধ্যে চলিয়া যাই।"

আশা চিবুকে হাত দিয়া বিনোদিনীর মুখ তুলিয়া ধরিয়া কহিল, "লক্ষ্মীটি ভাই, অমন কথা বলিসনে— তোকে ছাড়িয়া আমি থাকিতে পারিব না— আমাকে ছাড়িয়া যাইবার কথা কেন আজ তোর মনে আসিল।"

মহেন্দ্রের দেখা না পাইয়া বিহারী কোনো একটা ছুতায় পুনর্বার বিনোদিনীর ঘরে আসিয়া মহেন্দ্র ও আশার মধ্যবর্তী আশঙ্কার কথাটা আর-একটু স্পষ্ট করিয়া শুনিবার জন্য উপস্থিত হইল।

মহেন্দ্রকে পরদিন সকালে তাহাদের বাড়ি খাইতে যাইতে বলিবার জন্য বিনোদিনীকে অনুরোধ করিবার উপলক্ষ্য লইয়া সে উপস্থিত হইল। "বিনোদ-বোঠান' বলিয়া ডাকিয়াই হঠাৎ কেরোসিনের উজ্জ্বল আলোকে বাহির হইতেই আলিঙ্গনবদ্ধ সাশ্রুনেত্র দুই সখীকে দেখিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইল। আশার হঠাৎ মনে হইল, নিশ্চয়ই বিহারী তাহার চোখের বালিকে কোনো অন্যায় নিন্দা করিয়া কিছু বলিয়াছে, তাই সে আজ এমন করিয়া চলিয়া যাইবার কথা তুলিয়াছে। বিহারীবাবুর ভারি অন্যায়। উঁহার মন ভালো নয়। আশা বিরক্ত হইয়া বাহির হইয়া আসিল। বিহারীও বিনোদিনীর প্রতি ভক্তির মাত্রা চড়াইয়া বিগলিতহৃদয়ে দ্রুত প্রস্থান করিল।

সেদিন রাত্রে মহেন্দ্র আশাকে কহিল, "চুনি, আমি কাল সকালের প্যাসেঞ্জারেই কাশী চলিয়া যাইব।"

আশার বক্ষঃস্থল ধক্ করিয়া উঠিল— কহিল, "কেন।"

মহেন্দ্র কহিল, "কাকীমাকে অনেক দিন দেখি নাই।"

শুনিয়া আশা বড়োই লজ্জাবোধ করিল ; এ-কথা পূর্বেই তাহার মনে উদয় হওয়া উচিত ছিল। নিজের সুখদুঃখের আকর্ষণে স্নেহময়ী মাসিমাকে সে যে ভুলিয়াছিল, অথচ মহেন্দ্র সেই প্রবাসী-তপস্বিনীকে মনে করিয়াছে, ইহাতে নিজেকে কঠিনহৃদয়া বলিয়া বড়োই ধিক্কার জন্মিল।

মহেন্দ্র কহিল, "তিনি আমারই হাতে তাঁহার সংসারের একমাত্র স্নেহের ধনকে সমর্পণ করিয়া দিয়া চলিয়া গেছেন— তাঁহাকে একবার না দেখিয়া আমি কিছুতেই সুস্থির হইতে পারিতেছি না।"

বলিতে বলিতে মহেন্দ্রের কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিল ; স্নেহপূর্ণ নীরব আশীর্বাদ ও অব্যক্ত মঙ্গলকামনার সহিত বারংবার সে আশার ললাট ও মস্তকের উপর দক্ষিণ করতল চালনা করিতে লাগিল। আশা এই অকস্মাৎ স্নেহাবেগের সম্পূর্ণ মর্ম বুঝিতে

পারিল না, কেবল তাহার হৃদয় বিগলিত হইয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। আজই সন্ধ্যাবেলায় বিনোদিনী তাহাকে অকারণ স্নেহাতিশয্যে যে-সব কথা বলিয়াছিল, তাহা মনে পড়িল। উভয়ের মধ্যে কোথাও কোনো যোগ আছে কি না, তাহা সে কিছুই বুঝিল না। কিন্তু মনে হইল, যেন ইহা তাহার জীবনে কিসের একটা সূচনা। ভালো কি মন্দ কে জানে।

ভয়ব্যাকুলচিত্তে সে মহেন্দ্রকে বাহুপাশে বদ্ধ করিল। মহেন্দ্র তাহার সেই অকারণ আশঙ্কার আবেগ অনুভব করিতে পারিল। কহিল, "চুনি, তোমার উপর তোমার পুণ্যবতী মাসিমার আশীর্বাদ আছে, তোমার কোনো ভয় নাই, কোনো ভয় নাই। তিনি তোমারই মঙ্গলের জন্য তাঁহার সমস্ত ত্যাগ করিয়া গেছেন, তোমার কখনো কোনো অকল্যাণ হইতে পারে না।"

আশা তখন দৃঢ়চিত্তে সমস্ত ভয় দূর করিয়া ফেলিল। স্বামীর এই আশীর্বাদ অক্ষয়কবচের মতো গ্রহণ করিল। সে মনে মনে বারংবার তাহার মাসিমার পবিত্র পদধূলি মাথায় তুলিয়া লইতে লাগিল, এবং একাগ্রমনে কহিল, "মা, তোমার আশীর্বাদ আমার স্বামীকে সর্বদা রক্ষা করুক।"

পরদিনে মহেন্দ্র চলিয়া গেল, বিনোদিনীকে কিছুই বলিয়া গেল না। বিনোদিনী মনে মনে কহিল, "নিজে অন্যায় করা হইল, আবার আমার উপরে রাগ! এমন সাধু তো দেখি নাই। কিন্তু এমন সাধুত্ব বেশিদিন টেঁকে না।"

২২

সংসারত্যাগিনী অন্নপূর্ণা বহুদিন পরে হঠাৎ মহেন্দ্রকে আসিতে দেখিয়া যেমন স্নেহে আনন্দে আপ্লুত হইয়া গেলেন, তেমনি তাঁহার হঠাৎ ভয় হইল, বুঝি আশাকে লইয়া মার সঙ্গে মহেন্দ্রের আবার কোনো বিরোধ ঘটিয়াছে এবং মহেন্দ্র তাঁহার কাছে নালিশ জানাইয়া সান্ত্বনালাভ করিতে আসিয়াছে। মহেন্দ্র শিশুকাল হইতেই সকল প্রকার সংকট ও সন্তাপের সময় তাহার কাকীর কাছে ছুটিয়া আসে। কাহারও উপর রাগ করিলে অন্নপূর্ণা তাহার রাগ থামাইয়া দিয়াছেন, দুঃখবোধ করিলে তাহা সহজে সহ্য করিতে উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু বিবাহের পর হইতে মহেন্দ্রের জীবনে সর্বাপেক্ষা যে সংকটের কারণ ঘটিয়াছে, তাহার প্রতিকারচেষ্টা দূরে থাক্‌, কোনো-প্রকার সান্ত্বনা পর্যন্ত তিনি দিতে অক্ষম। সে-সম্বন্ধে যে-ভাবে যেমন করিয়াই তিনি

হস্তক্ষেপ করিবেন, তাহাতেই মহেন্দ্রের সাংসারিক বিপ্লব আরো দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিবে ইহাই যখন নিশ্চয় বুঝিলেন, তখনই তিনি সংসার ত্যাগ করিলেন। রুগ্ন শিশু যখন জল চাহিয়া কাঁদে, এবং জল দেওয়া যখন কবিরাজের নিতান্ত নিষেধ, তখন পীড়িতচিত্তে মা যেমন অন্য ঘরে চলিয়া যান, অন্নপূর্ণা তেমনি করিয়া নিজেকে প্রবাসে লইয়া গেছেন। দূর তীর্থবাসে থাকিয়া ধর্মকর্মের নিয়মিত অনুষ্ঠানে এ-কয়দিন সংসার অনেকটা ভুলিয়াছিলেন, মহেন্দ্র আবার কি সেই সকল বিরোধের কথা তুলিয়া তাঁহার প্রচ্ছন্ন ক্ষতে আঘাত করিতে আসিয়াছে।

কিন্তু মহেন্দ্র আশাকে লইয়া তাহার মার সম্বন্ধে কোনো নালিশের কথা তুলিল না। তখন অন্নপূর্ণার আশঙ্কা অন্য পথে গেল। যে-মহেন্দ্র আশাকে ছাড়িয়া কালেজে যাইতে পারিত না, সে আজ কাকীর খোঁজ লইতে কাশী আসে কেন। তবে কি আশার প্রতি মহেন্দ্রের টান ক্রমে ঢিলা হইয়া আসিতেছে। মহেন্দ্রকে তিনি কিছু আশঙ্কার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ রে মহিন, আমার মাথা খা, ঠিক করিয়া বল্‌ দেখি, চুনি কেমন আছে।"

মহেন্দ্র কহিল, "সে তো বেশ ভালো আছে কাকীমা।"

"আজকাল সে কী করে, মহিন। তোরা কি এখনো তেমনি ছেলেমানুষ আছিস, না কাজকর্মে ঘরকন্নায় মন দিয়াছিস।"

মহেন্দ্র কহিল, "ছেলেমানুষি একেবারেই বন্ধ। সকল ঝঞ্ঝাটের মূল সেই চারুপাঠখানা যে কোথায় অদৃশ্য হইয়াছে, তাহার আর সন্ধান পাইবার জো নাই। তুমি থাকিলে দেখিয়া খুশি হইতে—লেখাপড়া শেখায় অবহেলা করা স্ত্রীলোকের পক্ষে যতদূর কর্তব্য, চুনি তাহা একান্ত মনে পালন করিতেছে।"

"মহিন, বিহারী কী করিতেছে।"

মহেন্দ্র কহিল, "নিজের কাজ ছাড়া আর-সমস্তই করিতেছে। নায়েব-গোমস্তায় তাহার বিষয়সম্পত্তি দেখে; কী চক্ষে দেখে, তাহা ঠিক বলিতে পারি না। বিহারীর চিরকাল ওই দশা। তাহার নিজের কাজ পরে দেখে, পরের কাজ সে নিজে দেখে।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "সে কি বিবাহ করিবে না, মহিন।"

মহেন্দ্র একটুখানি হাসিয়া কহিল, "কই, কিছুমাত্র উদ্‌যোগ তো দেখি না।"

শুনিয়া অন্নপূর্ণা হৃদয়ের গোপন স্থানে একটা আঘাত পাইলেন। তিনি নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার বোনঝিকে দেখিয়া, একবার বিহারী আগ্রহের সহিত বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহার সেই উন্মুখ আগ্রহ অন্যায় করিয়া অকস্মাৎ দলিত হইয়াছে। বিহারী বলিয়াছিল, "কাকীমা, আমাকে আর বিবাহ করিতে

কখনো অনুরোধ করিয়ো না!” সেই বড়ো অভিমানের কথা অন্নপূর্ণার কানে বাজিতেছিল। তাঁহার একান্ত অনুগত সেই স্নেহের বিহারীকে তিনি এমন মনভাঙা অবস্থায় ফেলিয়া আসিয়াছিলেন, তাহাকে কোনো সান্ত্বনা দিতে পারেন নাই। অন্নপূর্ণা অত্যন্ত বিমর্ষ ও ভীত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, “এখনো কি আশার প্রতি বিহারীর মন পড়িয়া আছে।”

মহেন্দ্র কখনো ঠাট্টার ছলে, কখনো গম্ভীরভাবে, তাহাদের ঘরকন্নার আধুনিক সমস্ত খবর-বার্তা জানাইল, কেবল বিনোদিনীর কথার উল্লেখমাত্র করিল না।

এখন কালেজ খোলা, কাশীতে মহেন্দ্রের বেশি দিন থাকিবার কথা নয়। কিন্তু কঠিন রোগের পর স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার মধ্যে গিয়া আরোগ্যলাভের যে সুখ, মহেন্দ্র কাশীতে অন্নপূর্ণার নিকটে থাকিয়া প্রতিদিন সেই সুখ অনুভব করিতেছিল— তাই একে একে দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল। নিজের সঙ্গে নিজের যে একটা বিরোধ জন্মিবার উপক্রম হইয়াছিল, সেটা দেখিতে দেখিতে দূর হইয়া গেল। কয়দিন সর্বদা ধর্মপরায়ণা অন্নপূর্ণার স্নেহমুখচ্ছবির সম্মুখে থাকিয়া, সংসারের কর্তব্যপালন এমনি সহজ ও সুখকর মনে হইতে লাগিল যে, তাহার পূর্বেকার আতঙ্ক হাস্যকর বোধ হইল। মনে হইল, বিনোদিনী কিছুই না। এমন কি, তাহার মুখের চেহারাই মহেন্দ্র স্পষ্ট করিয়া মনে আনিতে পারে না। অবশেষে মহেন্দ্র খুব জোর করিয়াই মনে মনে কহিল, “আশাকে আমার হৃদয় হইতে এক চুল সরাইয়া বসিতে পারে, এমন তো আমি কোথাও কাহাকেও দেখিতে পাই না।”

মহেন্দ্র অন্নপূর্ণাকে কহিল, “কাকীমা, আমার কালেজ কামাই যাইতেছে— এবারকার মতো তবে আসি। যদিও তুমি সংসারের মায়া কাটাইয়া একান্তে আসিয়া আছ—তবু অনুমতি করো মাঝে মাঝে আসিয়া তোমার পায়ের ধুলা লইয়া যাইব।”

মহেন্দ্র গৃহে ফিরিয়া আসিয়া যখন আশাকে তাহার মাসির স্নেহোপহার সিঁদুরের কৌটা ও একটি সাদা পাথরের চুমকি ঘটি দিল, তখন তাহার চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। মাসিমার সেই পরমস্নেহময় ধৈর্য ও মাসিমার প্রতি তাহাদের ও তাহার শাশুড়ীর নানাপ্রকার উপদ্রব স্মরণ করিয়া তাহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। স্বামীকে জানাইল, “আমার বড়ো ইচ্ছা করে, আমি একবার মাসিমার কাছে গিয়া তাঁহার ক্ষমা ও পায়ের ধুলা লইয়া আসি। সে কি কোনোমতেই ঘটিতে পারে না।”

মহেন্দ্র আশার বেদনা বুঝিল, এবং কিছুদিনের জন্য কাশীতে সে তাহার মাসিমার

কাছে যায়, ইহাতে তাহার সম্মতিও হইল। কিন্তু পুনর্বার কালেজ কামাই করিয়া আশাকে কাশী পৌঁছাইয়া দিতে তাহার দ্বিধা বোধ হইতে লাগিল।

আশা কহিল, “জেঠাইমা তো অল্পদিনের মধ্যেই কাশী যাইবেন, সেই সঙ্গে গেলে কি ক্ষতি আছে।”

মহেন্দ্র রাজলক্ষ্মীকে গিয়া কহিল, “মা, বউ একবার কাশীতে কাকীমাকে দেখিতে যাইতে চায়।”

রাজলক্ষ্মী শ্লেষবাক্যে কহিলেন, “বউ যাইতে চান তো অবশ্যই যাইবেন, যাও, তাঁহাকে লইয়া যাও।”

মহেন্দ্র যে আবার অন্নপূর্ণার কাছে যাতায়াত আরম্ভ করিল, ইহা রাজলক্ষ্মীর ভালো লাগে নাই। বধূর যাইবার প্রস্তাবে তিনি মনে মনে আরো বিরক্ত হইয়া উঠিলেন।

মহেন্দ্র কহিল, “আমার কালেজ আছে, আমি রাখিতে যাইতে পারিব না। তাহার জেঠামশায়ের সঙ্গে যাইবে।”

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “সে তো ভালো কথা। জেঠামশায়রা বড়োলোক, কখনো আমাদের মতো গরিবের ছায়া মাড়ান না, তাঁহাদের সঙ্গে যাইতে পারিলে কত গৌরব।”

মাতার উত্তরোত্তর শ্লেষবাক্যে মহেন্দ্রের মন একেবারে কঠিন হইয়া বাঁকিল। সে কোনো উত্তর না দিয়া আশাকে কাশী পাঠাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া চলিয়া গেল।

বিহারী যখন রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিল, রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “ও বিহারী, শুনিয়াছিস, আমাদের বউমা যে কাশী যাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন।”

বিহারী কহিল, “বল কী মা, মহিনদা আবার কালেজ কামাই করিয়া কাশী যাইবে?”

রাজলক্ষ্মী কহিলেন; “না না, মহিন কেন যাইবেন। তা হইলে আর বিবিয়ানা হইল কই। মহিন এখানে থাকিবেন, বউ তাঁহার জেঠামহারাজের সঙ্গে কাশী যাইবেন। সবাই সাহেব-বিবি হইয়া উঠিল।”

বিহারী মনে মনে উদ্‌বিগ্ন হইল, বর্তমান কালের সাহেবিয়ানা স্মরণ করিয়া নহে। বিহারী ভাবিতে লাগিল, “ব্যাপারখানা কী। মহেন্দ্র যখন কাশী গেল আশা এখানে রহিল ; আবার মহেন্দ্র যখন ফিরিল তখন আশা কাশী যাইতে চাহিতেছে! দু-জনের মাঝখানে একটা কী গুরুতর ব্যাপার ঘটিয়াছে। এমন করিয়া কতদিন চলিবে! বন্ধু হইয়াও আমরা ইহার কোনো প্রতিকার করিতে পারিব না— দূরে দাঁড়াইয়া থাকিব?”

মাতার ব্যবহারে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া মহেন্দ্র তাহার শয়নঘরে আসিয়া বসিয়া ছিল। বিনোদিনী ইতিমধ্যে মহেন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নাই— তাই আশা তাহাকে পাশের ঘর হইতে মহেন্দ্রের কাছে লইয়া আসিবার জন্য অনুরোধ করিতেছিল।

এমন সময় বিহারী আসিয়া মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল, "আশা-বোঠানের কি কাশী যাওয়া স্থির হইয়াছে।"

মহেন্দ্র কহিল, "না হইবে কেন। বাধাটা কী আছে।"

বিহারী কহিল, "বাধার কথা কে বলিতেছে। কিন্তু হঠাৎ এ খেয়াল তোমাদের মাথায় আসিল যে?"

মহেন্দ্র কহিল, "মাসিকে দেখিবার ইচ্ছা— প্রবাসী আত্মীয়ের জন্য ব্যাকুলতা, মানবচরিত্রে এমন মাঝে মাঝে ঘটিয়া থাকে।"

বিহারী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি সঙ্গে যাইতেছ?"

প্রশ্ন শুনিয়াই মহেন্দ্র ভাবিল, "জেঠার সঙ্গে আশাকে পাঠানো সংগত নহে, এই কথা লইয়া আলোচনা করিতে বিহারী আসিয়াছে।" পাছে অধিক কথা বলিতে গেলে ক্রোধ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তাই সংক্ষেপে বলিল, "না।"

বিহারী মহেন্দ্রকে চিনিত। সে যে রাগিয়াছে, তাহা বিহারীর অগোচর ছিল না। একবার জিদ ধরিলে তাহাকে টলানো যায় না, তাহাও সে জানিত। তাই মহেন্দ্রের যাওয়ার কথা আর তুলিল না। মনে মনে ভাবিল, "বেচারা আশা যদি কোনো বেদনা বহন করিয়াই চলিয়া যাইতেছে হয়, তবে সঙ্গে বিনোদিনী গেলে তাহার সান্ত্বনা হইবে।" তাই ধীরে ধীরে কহিল, "বিনোদ-বোঠান তাঁর সঙ্গে গেলে হয় না?"

মহেন্দ্র গর্জন করিয়া উঠিল, "বিহারী, তোমার মনের ভিতর যে-কথাটা আছে, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলো। আমার সঙ্গে অসরলতা করিবার কোনো দরকার দেখি না। আমি জানি, তুমি মনে মনে সন্দেহ করিয়াছ, আমি বিনোদিনীকে ভালোবাসি। মিথ্যা কথা। আমি বাসি না। আমাকে রক্ষা করিবার জন্য তোমাকে পাহারা দিয়া বেড়াইতে হইবে না। তুমি এখন নিজেকে রক্ষা করো। যদি সরল বন্ধুত্ব তোমার মনে থাকিত, তবে বহুদিন আগে তুমি আমার কাছে তোমার মনের কথা বলিতে এবং নিজেকে বন্ধুর অন্তঃপুর হইতে বহু দূরে লইয়া যাইতে। আমি তোমার মুখের সামনে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, তুমি আশাকে ভালোবাসিয়াছ।"

অত্যন্ত বেদনার স্থানে দুই পা দিয়া মাড়াইয়া দিলে, আহত ব্যক্তি মুহূর্তকাল বিচার না করিয়া আঘাতকারীকে যেমন সবলে ধাক্কা দিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে—

রুদ্ধকণ্ঠ বিহারী তেমনি পাংশুমুখে তাহার চৌকি হইতে উঠিয়া মহেন্দ্রের দিকে ধাবিত হইল— হঠাৎ থামিয়া বহুকষ্টে স্বর বাহির করিয়া কহিল, "ঈশ্বর তোমাকে ক্ষমা করুন, আমি বিদায় হই।" বলিয়া টলিতে টলিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

পাশের ঘর হইতে বিনোদিনী ছুটিয়া আসিয়া ডাকিল, "বিহারী-ঠাকুরপো।"

বিহারী দেয়ালে ভর করিয়া একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "কী, বিনোদ- বোঠান।"

বিনোদিনী কহিল, "ঠাকুরপো, চোখের বালির সঙ্গে আমিও কাশীতে যাইব।"

বিহারী কহিল, "না না, বোঠান, সে হইবে না, সে কিছুতেই হইবে না। তোমাকে মিনতি করিতেছি— আমার কথায় কিছুই করিয়ো না। আমি এখানকার কেহ নই, আমি এখানকার কিছুতেই হস্তক্ষেপ করিতে চাহি না, তাহাতে ভালো হইবে না। তুমি দেবী, তুমি যাহা ভালো বোধ কর, তাহাই করিয়ো। আমি চলিলাম।"

বলিয়া বিহারী বিনোদিনীকে বিনম্র নমস্কার করিয়া চলিল। বিনোদিনী কহিল, "আমি দেবী নই ঠাকুরপো, শুনিয়া যাও। তুমি চলিয়া গেলে কাহারও ভালো হইবে না। ইহার পরে আমাকে দোষ দিয়ো না।"

বিহারী চলিয়া গেল। মহেন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া ছিল। বিনোদিনী তাহার প্রতি জ্বলন্ত বজ্রের মতো একটা কঠোর কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল। সে-ঘরে আশা একান্ত লজ্জায় সংকোচে মরিয়া যাইতেছিল। বিহারী তাহাকে ভালোবাসে, এ-কথা মহেন্দ্রের মুখে শুনিয়া সে আর মুখ তুলিতে পারিতেছিল না। কিন্তু তাহার উপর বিনোদিনীর আর দয়া হইল না। আশা যদি তখন চোখ তুলিয়া চাহিত, তাহা হইলে সে ভয় পাইত। সমস্ত সংসারের উপর বিনোদিনীর যেন খুন চাপিয়া গেছে। মিথ্যা কথা বটে! বিনোদিনীকে কেহই ভালোবাসে না বটে! সকলেই ভালোবাসে এই লজ্জাবতী ননির পুতুলটিকে।

মহেন্দ্র সেই যে আবেগের মুখে বিহারীকে বলিয়াছিল, "আমি পাষণ্ড"— তাহার পর আবেগ-শান্তির পর হইতে সেই হঠাৎ আত্মপ্রকাশের জন্য সে বিহারীর কাছে কুণ্ঠিত হইয়া ছিল। সে মনে করিতেছিল, তাহার সব কথাই যেন ব্যক্ত হইয়া গেছে। সে বিনোদিনীকে ভালোবাসে না, অথচ বিহারী জানিয়াছে যে সে ভালোবাসে,— ইহাতে বিহারীর উপরে তাহার বড়ো একটা বিরক্তি জন্মিতেছিল। বিশেষত, তাহার পর হইতে যতবার বিহারী তাহার সম্মুখে আসিতেছিল তাহার মনে হইতেছিল, যেন বিহারী সকৌতুহলে তাহার একটা ভিতরকার কথা খুঁজিয়া

বেড়াইতেছে। সেই-সমস্ত বিরক্তি উত্তরোত্তর জমিতেছিল— আজ একটু আঘাতেই বাহির হইয়া পড়িল।

কিন্তু বিনোদিনী পাশের ঘর হইতে যেরূপ ব্যাকুলভাবে ছুটিয়া আসিল, যেরূপ আর্তকণ্ঠে বিহারীকে রাখিতে চেষ্টা করিল এবং বিহারীর আদেশপালনস্বরূপে আশার সহিত কাশী যাইতে প্রস্তুত হইল, ইহা মহেন্দ্রের পক্ষে অভাবিতপূর্ব। এই দৃশ্যটি মহেন্দ্রকে প্রবল আঘাতে অভিভূত করিয়া দিল। সে বলিয়াছিল, সে বিনোদিনীকে ভালোবাসে না; কিন্তু যাহা শুনিল, যাহা দেখিল, তাহা তাহাকে সুস্থির হইতে দিল না, তাহাকে চারিদিক হইতে বিচিত্র আকারে পীড়ন করিতে লাগিল। আর কেবলই নিষ্ফল পরিতাপের সহিত মনে হইতে লাগিল, "বিনোদিনী শুনিয়াছে— আমি বলিয়াছি 'আমি তাহাকে ভালোবাসি না'।"

২৩

মহেন্দ্র ভাবিতে লাগিল, "আমি বলিয়াছি, 'মিথ্যা কথা, আমি বিনোদিনীকে ভালোবাসি না।' অত্যন্ত কঠিন করিয়া বলিয়াছি। আমি যে তাহাকে ভালোবাসি তাহা না-ই হইল, কিন্তু ভালোবাসি না, এ-কথাটা বড়ো কঠোর। এ-কথায় আঘাত না পায়, এমন স্ত্রীলোক কে আছে। ইহার প্রতিবাদ করিবার অবসর কবে কোথায় পাইব। ভালোবাসি এ-কথা ঠিক বলা যায় না; কিন্তু ভালোবাসি না, এই কথাটাকে একটু ফিকা করিয়া, নরম করিয়া জানানো দরকার। বিনোদিনীর মনে এমন একটা নিষ্ঠুর অথচ ভুল সংস্কার থাকিতে দেওয়া অন্যায়।"

এই বলিয়া মহেন্দ্র তাহার বাক্সর মধ্য হইতে আর-একবার তাহার চিঠি তিনখানি পড়িল। মনে মনে কহিল, "বিনোদিনী আমাকে যে ভালোবাসে, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কাল সে বিহারীর কাছে অমন করিয়া আসিয়া পড়িল কেন। সে কেবল আমাকে দেখাইয়া। আমি যখন তাহাকে ভালোবাসি না স্পষ্ট করিয়া বলিলাম, তখন সে কোনো সুযোগে আমার কাছে তাহার ভালোবাসা প্রত্যাখ্যান না করিয়া কী করিবে। এমনি করিয়া আমার কাছে অবমানিত হইয়া হয়তো সে বিহারীকে ভালোবাসিতেও পারে।"

মহেন্দ্রের ক্ষোভ এতই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল যে, নিজের চাঞ্চল্যে সে নিজে আশ্চর্য এবং ভীত হইয়া উঠিল। না-হয় বিনোদিনী শুনিয়াছে, মহেন্দ্র তাহাকে ভালোবাসে না— তাহাতে দোষ কী। না-হয় এই কথায় অভিমানিনী বিনোদিনী তাহার

উপর হইতে মন সরাইয়া লইতে চেষ্টা করিবে— তাহাতেই বা ক্ষতি কী। ঝড়ের সময় নৌকার শিকল যেমন নোঙরকে টানিয়া ধরে, মহেন্দ্র তেমনি ব্যাকুলতার সঙ্গে আশাকে যেন অতিরিক্ত জোর করিয়া ধরিল।

রাত্রে মহেন্দ্র আশার মুখ বক্ষের কাছে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "চুনি, তুমি, আমাকে কতখানি ভালোবাস ঠিক করিয়া বলো।"

আশা ভাবিল, "এ কেমন প্রশ্ন। বিহারীকে লইয়া অত্যন্ত লজ্জাজনক যে-কথাটা উঠিয়াছে, তাহাতেই কি তাহার উপরে সংশয়ের ছায়া পড়িয়াছে।" সে লজ্জায় মরিয়া গিয়া কহিল, "ছি ছি, আজ তুমি এমন প্রশ্ন কেন করিলে। তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে খুলিয়া বলো— আমার ভালোবাসায় তুমি কবে কোথায় কী অভাব দেখিয়াছ।"

মহেন্দ্র আশাকে পীড়ন করিয়া তাহার মাধুর্য বাহির করিবার জন্য কহিল, "তবে তুমি কাশী যাইতে চাহিতেছ কেন।"

আশা কহিল, "আমি কাশী যাইতে চাই না, আমি কোথাও যাইব না।"

মহেন্দ্র। তখন তো চাহিয়াছিলে।

আশা অত্যন্ত পীড়িত হইয়া কহিল, "তুমি তো জান, কেন চাহিয়াছিলাম।"

মহেন্দ্র। আমাকে ছাড়িয়া তোমার মাসির কাছে বোধ হয় বেশ সুখে থাকিতে।

আশা কহিল, "কখনো না। আমি সুখের জন্য যাইতে চাহি নাই।"

মহেন্দ্র কহিল, "আমি সত্য বলিতেছি চুনি, তুমি আর কাহাকেও বিবাহ করিলে ঢের বেশি সুখী হইতে পারিতে।"

শুনিয়া আশা চকিতের মধ্যে মহেন্দ্রের বক্ষ হইতে সরিয়া গিয়া, বালিশে মুখ ঢাকিয়া, কাঠের মতো আড়ষ্ট হইয়া রহিল— মুহূর্তপরেই তাহার কান্না আর চাপা রহিল না। মহেন্দ্র তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বক্ষে তুলিয়া লইবার চেষ্টা করিল, আশা বালিশ ছাড়িল না। পতিব্রতার এই অভিমানে মহেন্দ্র সুখে গর্বে ধিক্‌কারে ক্ষুব্ধ হইতে লাগিল।

যে-সব কথা ভিতরে-ভিতরে আভাসে ছিল, সেইগুলা হঠাৎ স্পষ্ট কথায় পরিস্ফুট হইয়া সকলেরই মনে একটা গোলমাল বাধাইয়া দিল। বিনোদিনী মনে মনে ভাবিতে লাগিল— অমন স্পষ্ট অভিযোগের বিরুদ্ধে বিহারী কেন কোনো প্রতিবাদ করিল না। যদি সে মিথ্যা প্রতিবাদও করিত, তাহা হইলেও যেন বিনোদিনী একটু খুশি হইত। বেশ হইয়াছে, মহেন্দ্র বিহারীকে যে-আঘাত করিয়াছে, তাহা তাহার প্রাপ্যই ছিল। বিহারীর মতো অমন মহৎ লোক কেন আশাকে ভালোবাসিবে। এই

আঘাতে বিহারীকে যে দূরে লইয়া গেছে, সে যেন ভালোই হইয়াছে— বিনোদিনী যেন নিশ্চিন্ত হইল।

কিন্তু বিহারীর সেই মৃত্যুবাণাহত রক্তহীন পাংশু মুখ বিনোদিনীকে সকল কর্মের মধ্যে যেন অনুসরণ করিয়া ফিরিল। বিনোদিনীর অন্তরে যে সেবাপরায়ণা নারী-প্রকৃতি ছিল, সে সেই আর্ত মুখ দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল। রুগ্ন শিশুকে যেমন মাতা বুকের কাছে দোলাইয়া বেড়ায়, তেমনি সেই আতুর মূর্তিকে বিনোদিনী আপন হৃদয়ের মধ্যে রাখিয়া দোলাইতে লাগিল; তাহাকে সুস্থ করিয়া সেই মুখে আবার রক্তের রেখা, প্রাণের প্রবাহ, হাস্যের বিকাশ দেখিবার জন্য বিনোদিনীর একটা অধীর ঔৎসুক্য জন্মিল।

দুই-তিন দিন সকল কর্মের মধ্যে এইরূপ উন্মনা হইয়া ফিরিয়া বিনোদিনী আর থাকিতে পারিল না। বিনোদিনী একখানি সান্ত্বনার পত্র লিখিল, কহিল—

> ঠাকুরপো, আমি তোমার সেদিনকার সেই শুষ্ক মুখ দেখিয়া অবধি প্রাণমনে কামনা করিতেছি, তুমি সুস্থ হও, তুমি যেমন ছিলে তেমনিটি হও— সেই সহজ হাসি আবার কবে দেখিব, সেই উদার কথা আবার কবে শুনিব। তুমি কেমন আছ, আমাকে একটি ছত্র লিখিয়া জানাও।
>
> তোমার বিনোদ-বোঠান।

বিনোদিনী দরোয়ানের হাত দিয়া বিহারীর ঠিকানায় চিঠি পাঠাইয়া দিল।

আশাকে বিহারী ভালোবাসে, এ-কথা যে এমন রূঢ় করিয়া, এমন গর্হিতভাবে মহেন্দ্র মুখে উচ্চারণ করিতে পারিবে, তাহা বিহারী স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই। কারণ, সে নিজেও এমন কথা স্পষ্ট করিয়া কখনো মনে স্থান দেয় নাই। প্রথমটা বজ্রাহত হইল— তার পরে ক্রোধে ঘৃণায় ছটফট করিয়া বলিতে লাগিল, "অন্যায়, অসংগত, অমূলক।"

কিন্তু কথাটা যখন একবার উচ্চারিত হইয়াছে, তখন তাহাকে আর সম্পূর্ণ মারিয়া ফেলা যায় না। তাহার মধ্যে যেটুকু সত্যের বীজ ছিল, তাহা দেখিতে দেখিতে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতে লাগিল। কন্যা দেখিবার উপলক্ষে সেই যে একদিন সূর্যাস্তকালে বাগানের উচ্ছ্বসিত পুষ্পগন্ধপ্রবাহে লজ্জিতা বালিকার সুকুমার মুখখানিকে সে নিতান্তই আপনার মনে করিয়া বিগলিত অনুরাগের সহিত একবার চাহিয়া দেখিয়াছিল, তাহাই বার বার মনে পড়িতে লাগিল, এবং বুকের কাছে কী যেন চাপিয়া ধরিতে লাগিল, এবং একটা অত্যন্ত কঠিন বেদনা কণ্ঠের কাছ পর্যন্ত আলোড়িত হইয়া উঠিল। দীর্ঘরাত্রি ছাদের উপর শুইয়া শুইয়া বাড়ির সম্মুখের পথে দ্রুতপদে পায়চারি

করিতে করিতে, যাহা এতদিন অব্যক্ত ছিল তাহা বিহারীর মনে ব্যক্ত হইয়া উঠিল। যাহা সংযত ছিল তাহা উদ্দাম হইল; নিজের কাছেও যাহার কোনো প্রমাণ ছিল না, মহেন্দ্রের বাক্যে তাহা বিরাট প্রাণ পাইয়া বিহারীর অন্তর-বাহির ব্যাপ্ত করিয়া দিল।

তখন সে নিজেকে অপরাধী বলিয়া বুঝিল। মনে মনে কহিল, "আমার তো আর রাগ করা শোভা পায় না, মহেন্দ্রের কাছে তো ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বিদায় লইতে হইবে। সেদিন এমনভাবে চলিয়া আসিয়াছিলাম, যেন মহেন্দ্র দোষী, আমি বিচারক —সে-অন্যায় স্বীকার করিয়া আসিব।"

বিহারী জানিত, আশা কাশী চলিয়া গেছে। এক দিন সে সন্ধ্যার সময় ধীরে ধীরে মহেন্দ্রের দ্বারের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজলক্ষ্মীর দূরসম্পর্কের মামা সাধুচরণকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সাধ্‌দা, ক-দিন আসিতে পারি নাই— এখানকার সব খবর ভালো?" সাধুচরণ সকলের কুশল জানাইল। বিহারী জিজ্ঞাসা করিল, "বোঠান কাশীতে কবে গেলেন।" সাধুচরণ কহিল, "তিনি যান নাই। তাঁহার কাশী যাওয়া হইবে না।" শুনিয়া, কিছু না মানিয়া অন্তঃপুরে যাইবার জন্য বিহারীর মন ছুটিল। পূর্বে যেমন সহজে যেমন আনন্দে আত্মীয়ের মতো সে পরিচিত সিঁড়ি বাহিয়া ভিতরে যাইত, সকলের সঙ্গে স্নিগ্ধ কৌতুকের সহিত হাস্যালাপ করিয়া আসিত, কিছুই মনে হইত না, আজ তাহা অবিহিত, তাহা দুর্লভ, জানিয়াই তাহার চিত্ত যেন উন্মত্ত হইল। আর-একটিবার, কেবল শেষবার, তেমনি করিয়া ভিতরে গিয়া ঘরের ছেলের মতো রাজলক্ষ্মীর সহিত কথা সারিয়া, একবার ঘোমটাবৃত আশাকে বোঠান বলিয়া দুটো তুচ্ছ কথা কহিয়া আসা তাহার কাছে পরম আকাঙ্ক্ষার বিষয় হইয়া উঠিল। সাধুচরণ কহিল, "ভাই, অন্ধকারে দাঁড়াইয়া রহিলে যে, ভিতরে চলো।"

শুনিয়া বিহারী দ্রুতবেগে ভিতরের দিকে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াই ফিরিয়া সাধুকে কহিল, "যাই একটা কাজ আছে।" বলিয়া তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিল। সেই রাত্রেই বিহারী পশ্চিমে চলিয়া গেল।

দরোয়ান বিনোদিনীর চিঠি লইয়া বিহারীকে না পাইয়া চিঠি ফিরাইয়া লইয়া আসিল। মহেন্দ্র তখন দেউড়ির সম্মুখে ছোটো বাগানটিতে বেড়াইতেছিল। জিজ্ঞাসা করিল, "এ কাহার চিঠি।" দরোয়ান সমস্ত বলিল। মহেন্দ্র চিঠিখানি নিজে লইল।

একবার সে ভাবিল, চিঠিখানা লইয়া বিনোদিনীর হাতে দিবে—অপরাধিনী বিনোদিনীর লজ্জিত মুখ একবার সে দেখিয়া আসিবে—কোনো কথা বলিবে না।

এই চিঠির মধ্যে বিনোদিনীর লজ্জার কারণ যে আছেই, মহেন্দ্রের মনে তাহাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। মনে পড়িল, পূর্বেও আর-একদিন বিহারীর নামে এমনি একখানা চিঠি গিয়াছিল। চিঠিতে কী লেখা আছে, এ-কথা না জানিয়া মহেন্দ্র কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিল না। সে মনকে বুঝাইল— বিনোদিনী তাহার অভিভাবকতায় আছে, বিনোদিনীর ভালোমন্দের জন্য সে দায়ী। অতএব এরূপ সন্দেহজনক পত্র খুলিয়া দেখাই তাহার কর্তব্য। বিনোদিনীকে বিপথে যাইতে দেওয়া কোনোমতেই হইতে পারে না।

মহেন্দ্র ছোটো চিঠিখানা খুলিয়া পড়িল। তাহা সরল ভাষায় লেখা, সেইজন্য অকৃত্রিম উদ্‌বেগ তাহার মধ্য হইতে পরিষ্কার প্রকাশ পাইয়াছে। চিঠিখানা পুনঃপুন পাঠ করিয়া এবং অনেক চিন্তা করিয়া মহেন্দ্র ভাবিয়া উঠিতে পারিল না, বিনোদিনীর মনের গতি কোন্ দিকে। তাহার কেবলই আশঙ্কা হইতে লাগিল, "আমি যে তাহাকে ভালোবাসি না বলিয়া অপমান করিয়াছি, সেই অভিমানেই বিনোদিনী অন্য দিকে মন দিবার চেষ্টা করিতেছে। রাগ করিয়া আমার আশা সে একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছে।"

এই কথা মনে করিয়া মহেন্দ্রের ধৈর্যরক্ষা করা একেবারে অসম্ভব হইয়া উঠিল। যে-বিনোদিনী তাহার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে আসিয়াছিল, সে যে মুহূর্তকালের মূঢ়তায় সম্পূর্ণ তাহার অধিকারচ্যুত হইয়া যাইবে, সেই সম্ভাবনায় মহেন্দ্রকে স্থির থাকিতে দিল না। মহেন্দ্র ভাবিল, "বিনোদিনী আমাকে যদি মনে মনে ভালোবাসে, তাহা বিনোদিনীর পক্ষে মঙ্গলকর— এক জায়গায় সে বদ্ধ হইয়া থাকিবে। আমি নিজের মন জানি, আমি তো তাহার প্রতি কখনোই অন্যায় করিব না। সে আমাকে নিরাপদে ভালোবাসিতে পারে। আমি আশাকে ভালোবাসি, আমার দ্বারা তাহার কোনো ভয় নাই। কিন্তু সে যদি অন্য কোনো দিকে মন দেয়, তবে তাহার কী-সর্বনাশ হইতে পারে কে জানে।" মহেন্দ্র স্থির করিল, নিজেকে ধরা না দিয়া বিনোদিনীর মন কোনো অবকাশে আর-একবার ফিরাইতেই হইবে।

মহেন্দ্র অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেই দেখিল, বিনোদিনী পথের মধ্যেই যেন কাহার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছে। অমনি মহেন্দ্রের মনে চকিতের মধ্যে বিদ্বেষ জ্বলিয়া উঠিল। কহিল, "ওগো, মিথ্যা দাঁড়াইয়া আছ, দেখা পাইবে না। এই তোমার চিঠি ফিরিয়া আসিয়াছে।" বলিয়া চিঠিখানা ফেলিয়া দিল।

বিনোদিনী কহিল, "খোলা যে?"

মহেন্দ্র তাহার জবাব না দিয়াই চলিয়া গেল। বিহারী চিঠি খুলিয়া পড়িয়া

কোনো উত্তর না দিয়া চিঠি ফেরত পাঠাইয়াছে মনে করিয়া বিনোদিনীর সর্বাঙ্গের সমস্ত শিরা দব দব করিতে লাগিল। যে দরোয়ান চিঠি লইয়া গিয়াছিল, তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইল; সে অন্য কাজে অনুপস্থিত ছিল, তাহাকে পাওয়া গেল না। প্রদীপের মুখ হইতে যেমন জ্বলন্ত তৈলবিন্দু ক্ষরিয়া পড়ে, রুদ্ধ শয়নকক্ষের মধ্যে বিনোদিনীর দীপ্ত নেত্র হইতে তেমনি হৃদয়ের জালা অশ্রুজলে গলিয়া পড়িতে লাগিল। নিজের চিঠিখানা ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া কুটিকুটি করিয়া কিছুতেই তাহার সান্ত্বনা হইল না—সেই দুই-চারি লাইন কালির দাগকে অতীত হইতে বর্তমান হইতে একেবারেই মুছিয়া ফেলিবার, একেবারেই 'না' করিয়া দিবার কোনো উপায় নাই কেন। ক্রুদ্ধা মধুকরী যাহাকে সম্মুখে পায় তাহাকেই দংশন করে, ক্ষুব্ধা বিনোদিনী তেমনি তাহার চারিদিকের সমস্ত সংসারটাকে জ্বালাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। সে যাহা চায় তাহাতেই বাধা? কোনো কিছুতেই কি সে কৃতকার্য হইতে পারিবে না। সুখ যদি না পাইল, তবে যাহারা তাহার সকল সুখের অন্তরায়, যাহারা তাহাকে কৃতার্থতা হইতে ভ্রষ্ট, সমস্ত সম্ভবপর সম্পদ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, তাহাদিগকে পরাস্ত ধূলিলুণ্ঠিত করিলেই তাহার ব্যর্থ জীবনের কর্ম সমাধা হইবে।

২৪

সেদিন নূতন ফাল্গুনে প্রথম বসন্তের হাওয়া দিতেই আশা অনেক দিন পরে সন্ধ্যার আরম্ভে ছাদে মাদুর পাতিয়া বসিয়াছে। একখানি মাসিক কাগজ লইয়া খণ্ডশ প্রকাশিত একটা গল্প খুব মনোযোগ দিয়া সেই অল্প আলোকে পড়িতেছিল। গল্পের নায়ক তখন সংবৎসর পরে পূজার ছুটিতে বাড়ি আসিবার সময় ডাকাতের হাতে পড়িয়াছে, আশার হৃদয় উদ্‌বেগে কাঁপিতেছিল; এদিকে হতভাগিনী নায়িকা ঠিক সেই সময়েই বিপদের স্বপ্ন দেখিয়া কাঁদিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। আশা চোখের জল আর রাখিতে পারে না। আশা বাংলা গল্পের অত্যন্ত উদার সমালোচক ছিল। যাহা পড়িত, তাহাই মনে হইত চমৎকার। বিনোদিনীকে ডাকিয়া বলিত, ভাই চোখের বালি, মাথা খাও, এ-গল্পটা পড়িয়া দেখো। এমন সুন্দর। পড়িয়া আর কাঁদিয়া বাঁচি না।" বিনোদিনী ভালোমন্দ বিচার করিয়া আশার উচ্ছ্বসিত উৎসাহে বড়ো আঘাত করিত।

আজিকার এই গল্পটা আশা মহেন্দ্রকে পড়াইবে বলিয়া স্থির করিয়া যখন সজলচক্ষে কাগজখানা বন্ধ করিল, এমন সময় মহেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইল। মহেন্দ্রের মুখ

দেখিয়াই আশা উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। মহেন্দ্র জোর করিয়া প্রফুল্লতা আনিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "একলা ছাদের উপর কোন্ ভাগ্যবানের ভাবনায় আছ।"

আশা নায়ক-নায়িকার কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়া কহিল, "তোমার কি শরীর আজ ভালো নাই।"

মহেন্দ্র। শরীর বেশ আছে।

আশা। তবে তুমি মনে মনে কী একটা ভাবিতেছ, আমাকে খুলিয়া বলো।

মহেন্দ্র আশার বাটা হইতে একটা পান তুলিয়া লইয়া মুখে দিয়া কহিল, "আমি ভাবিতেছিলাম, তোমার মাসিমা বেচারা কত দিন তোমাকে দেখেন নাই। একবার হঠাৎ যদি তুমি তাঁহার কাছে গিয়া পড়িতে পার, তবে তিনি কত খুশিই হন।"

আশা কোনো উত্তর না করিয়া মহেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। হঠাৎ এ-কথা আবার নূতন করিয়া কেন মহেন্দ্রের মনে উদয় হইল, তাহা সে বুঝিতে পারিল না।

আশাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া মহেন্দ্র কহিল, "তোমার যাইতে ইচ্ছা করে না?"

এ-কথার উত্তর দেওয়া কঠিন। মাসিকে দেখিবার জন্য যাইতে ইচ্ছা করে, আবার মহেন্দ্রকে ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছাও করে না। আশা কহিল, "কালেজের ছুটি পাইলে তুমি যখন যাইতে পারিবে, আমিও সঙ্গে যাইব।"

মহেন্দ্র। ছুটি পাইলেও যাইবার জো নাই; পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

আশা। তবে থাক্, এখন না-ই গেলাম।

মহেন্দ্র। থাক্ কেন। যাইতে চাহিয়াছিলে, যাও-না।

আশা। না, আমার যাইবার ইচ্ছা নাই।

মহেন্দ্র। এই সেদিন এত ইচ্ছা ছিল, হঠাৎ ইচ্ছা চলিয়া গেল?

আশা এই কথায় চুপ করিয়া চোখ নিচু করিয়া বসিয়া রহিল। বিনোদিনীর সঙ্গে সন্ধি করিবার জন্য বাধাহীন অবসর চাহিয়া মহেন্দ্রের মন ভিতরে-ভিতরে অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। আশাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার একটা অকারণ রাগের সঞ্চার হইল। কহিল, "আমার উপর মনে মনে তোমার কোনো সন্দেহ জন্মিয়াছে নাকি। তাই আমাকে চোখে চোখে পাহারা দিয়া রাখিতে চাও?"

আশার স্বাভাবিক মৃদুতা নম্রতা ধৈর্য মহেন্দ্রের কাছে হঠাৎ অত্যন্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। মনে মনে কহিল, "মাসির কাছে যাইতে ইচ্ছা আছে, বলো যে, আমি

যাইবই, আমাকে যেমন করিয়া হোক পাঠাইয়া দাও— তা নয়, কখনো হাঁ, কখনো না, কখনো চুপচাপ— এ কী রকম।”

হঠাৎ মহেন্দ্রের এই উগ্রতা দেখিয়া আশা বিস্মিত ভীত হইয়া উঠিল। সে অনেক চেষ্টা করিয়া কোনো উত্তরই ভাবিয়া পাইল না। মহেন্দ্র কেন যে কখনো হঠাৎ এত আদর করে, কখনো হঠাৎ এমন নিষ্ঠুর হইয়া উঠে, তাহা সে কিছুই বুঝিতে পারে না। এইরূপে মহেন্দ্র যতই তাহার কাছে অধিক দুর্বোধ্য হইয়া উঠিতেছে, ততই আশার কম্পান্বিত চিত্ত ভয়ে ও ভালোবাসায় তাহাকে যেন অত্যন্ত অধিক করিয়া বেষ্টন করিয়া ধরিতেছে।

মহেন্দ্রকে আশা মনে মনে সন্দেহ করিয়া চোখে চোখে পাহারা দিতে চায়! ইহা কি কঠিন উপহাস, না নির্দয় সন্দেহ? শপথ করিয়া কি ইহার প্রতিবাদ আবশ্যক, না হাস্য করিয়া ইহা উড়াইয়া দিবার কথা?

হতবুদ্ধি আশাকে পুনশ্চ চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া অধীর মহেন্দ্র দ্রুতবেগে সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল। তখন কোথায় রহিল মাসিক পত্রের সেই গল্পের নায়ক, কোথায় রহিল গল্পের নায়িকা। সূর্যাস্তের আভা অন্ধকারে মিশাইয়া গেল, সন্ধ্যারম্ভের ক্ষণিক বসন্তের বাতাস গিয়া শীতের হাওয়া দিতে লাগিল— তখনো আশা সেই মাদুরের উপর লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া রহিল।

অনেক রাত্রে আশা শয়নঘরে গিয়া দেখিল, মহেন্দ্র তাহাকে না ডাকিয়াই শুইয়া পড়িয়াছে। তখনই আশার মনে হইল, স্নেহময়ী মাসীর প্রতি তাহার উদাসীনতা কল্পনা করিয়া মহেন্দ্র তাহাকে মনে মনে ঘৃণা করিতেছে। বিছানার মধ্যে ঢুকিয়াই আশা মহেন্দ্রের দুই পা জড়াইয়া তাহার পায়ের উপর মুখ রাখিয়া পড়িয়া রহিল। তখন মহেন্দ্র করুণায় বিচলিত হইয়া তাহাকে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিল। আশা কিছুতেই উঠিল না। সে কহিল, “আমি যদি কোনো দোষ করিয়া থাকি, আমাকে মাপ করো।”

মহেন্দ্র আর্দ্রচিত্তে কহিল, “তোমার কোনো দোষ নাই, চুনি। আমি নিতান্ত পাষণ্ড, তাই তোমাকে অকারণে আঘাত করিয়াছি।”

তখন মহেন্দ্রের দুই পা অভিষিক্ত করিয়া আশার অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। মহেন্দ্র উঠিয়া বসিয়া তাহাকে দুই বাহুতে তুলিয়া আপনার পাশে শোয়াইল। আশার রোদনবেগ থামিলে সে কহিল, “মাসিকে কি আমার দেখিতে যাইবার ইচ্ছা করে না। কিন্তু তোমাকে ফেলিয়া আমার যাইতে মন সরে না। তাই আমি যাইতে চাই নাই, তুমি রাগ করিয়ো না।”

মহেন্দ্র ধীরে ধীরে আশার আর্দ্র কপোল মুছাইতে মুছাইতে কহিল, "এ কি রাগ করিবার কথা, চুনি। আমাকে ছাড়িয়া যাইতে পার না, সে লইয়া আমি রাগ করিব? তোমাকে কোথাও যাইতে হইবে না।"

আশা কহিল, "না, আমি কাশী যাইব।"

মহেন্দ্র। কেন।

আশা। তোমাকে মনে মনে সন্দেহ করিয়া যাইতেছি না— এ-কথা যখন একবার তোমার মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে, তখন আমাকে কিছুদিনের জন্যও যাইতেই হইবে।

মহেন্দ্র। আমি পাপ করিলাম, তাহার প্রায়শ্চিত্ত তোমাকে করিতে হইবে?

আশা। তাহা আমি জানি না— কিন্তু পাপ আমার কোনোখানে হইয়াছেই, নহিলে এমন-সকল অসম্ভব কথা উঠিতেই পারিত না। যে-সব কথা আমি স্বপ্নেও ভাবিতে পারিতাম না, সে-সব কথা কেন শুনিতে হইতেছে।

মহেন্দ্র। তাহার কারণ, আমি যে কী মন্দ লোক তাহা তোমার স্বপ্নেরও অগোচর।

আশা ব্যস্ত হইয়া কহিল, "আবার! ও-কথা বলিয়ো না। কিন্তু এবার আমি কাশী যাইবই।"

মহেন্দ্র হাসিয়া কহিল, "আচ্ছা যাও, কিন্তু তোমার চোখের আড়ালে আমি যদি নষ্ট হইয়া যাই, তাহা হইলে কী হইবে।"

আশা কহিল, "তোমার আর অত ভয় দেখাইতে হইবে না, আমি কিনা ভাবিয়া অস্থির হইতেছি?"

মহেন্দ্র। কিন্তু ভাবা উচিত। তোমার এমন স্বামীটিকে যদি অসাবধানে বিগড়াইতে দাও, তবে এর পরে কাহাকে দোষ দিবে?

আশা। তোমাকে দোষ দিব না, সেজন্য তুমি ভাবিয়ো না।

মহেন্দ্র। তখন নিজের দোষ স্বীকার করিবে?

আশা। একশোবার।

মহেন্দ্র। আচ্ছা, তাহা হইলে কাল একবার তোমার জেঠামশায়ের সঙ্গে গিয়া কথাবার্তা ঠিক করিয়া আসিব।

এই বলিয়া মহেন্দ্র 'অনেক রাত হইয়াছে' বলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ পুনর্বার এপাশে ফিরিয়া কহিল, "চুনি, কাজ নাই, তুমি নাই-বা গেলে।"

আশা কাতর হইয়া কহিল, “আবার বারণ করিতেছ কেন। এবার একবার না গেলে তোমার সেই ভৎর্সনাটা আমার গায়ে লাগিয়ে থাকিবে। আমাকে দু-চার দিনের জন্যও পাঠাইয়া দাও।”

মহেন্দ্র কহিল, “আচ্ছা।” বলিয়া আবার পাশ ফিরিয়া শুইল।

কাশী যাইবার আগের দিন আশা বিনোদিনীর গলা জড়াইয়া কহিল, “ভাই বালি, আমার গা ছুঁইয়া একটা কথা বল্।”

বিনোদিনী আশার গাল টিপিয়া ধরিয়া কহিল, “কী কথা, ভাই। তোমার অনুরোধ আমি রাখিব না?”

আশা। কে জানে ভাই, আজকাল তুমি কী রকম হইয়া গেছ। কোনোমতেই যেন আমার স্বামীর কাছে বাহির হইতে চাও না।

বিনোদিনী। কেন চাই না, সে কি তুই জানিসনে, ভাই। সেদিন বিহারীবাবুকে মহেন্দ্রবাবু যে-কথা বলিলেন, সে কি তুই নিজের কানে শুনিস নাই। এ-সকল কথা যখন উঠিল তখন কি আর বাহির হওয়া উচিত— তুমিই বলো-না, ভাই বালি।

ঠিক উচিত যে নহে, তাহা আশা বুঝিত। এ-সকল কথার লজ্জাকরতা যে কতদূর, তাহাও সে নিজের মন হইতেই সম্প্রতি বুঝিয়াছে। তবু বলিল, “কথা অমন কত উঠিয়া থাকে, সে-সব যদি না সহিতে পারিস তবে আর ভালোবাসা কিসের, ভাই। ও-কথা ভুলিতে হইবে।”

বিনোদিনী। আচ্ছা ভাই, ভুলিব।

আশা। আমি তো ভাই, কাল কাশী যাইব, আমার স্বামীর যাহাতে কোনো অসুবিধা না হয় তোমাকে সেইটে বিশেষ করিয়া দেখিতে হইবে। এখনকার মতো পালাইয়া বেড়াইলে চলিবে না।

বিনোদিনী চুপ করিয়া রহিল। আশা বিনোদিনীর হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, “মাথা খা ভাই বালি, এই কথাটা আমাকে দিতেই হইবে।

বিনোদিনী কহিল, “আচ্ছা।”

২৫

একদিকে চন্দ্র অস্ত যায়, আর-এক দিকে সূর্য উঠে। আশা চলিয়া গেল, কিন্তু মহেন্দ্রের ভাগ্যে এখনো বিনোদিনীর দেখা নাই। মহেন্দ্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, মাঝে মাঝে ছুতা করিয়া সময়ে-অসময়ে তাহার গার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হয়, বিনোদিনী কেবলই ফাঁকি দিয়া পালায়, ধরা দেয় না।

রাজলক্ষ্মী মহেন্দ্রের এইরূপ অত্যন্ত শূন্যভাব দেখিয়া ভাবিলেন, "বউ গিয়াছে, তাই এ-বাড়িতে মহিনের কিছুই আর ভালো লাগিতেছে না।" আজকাল মহেন্দ্রের সুখদুঃখের পক্ষে মা যে বউয়ের তুলনায় একান্ত অনাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, তাহা মনে করিয়া তাঁহাকে বিঁধিল— তবু মহেন্দ্রের এই লক্ষ্মীছাড়া বিমর্ষ ভাব দেখিয়া তিনি বেদনা পাইলেন। বিনোদিনীকে ডাকিয়া বলিলেন, "সেই ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার পর হইতে আমার হাঁপানির মতো হইয়াছে ; আমি তো আজকাল সিঁড়ি ভাঙিয়া ঘন ঘন উপরে যাইতে পারি না। তোমাকে বাছা, নিজে থাকিয়া মহিনের খাওয়াদাওয়া সমস্তই দেখিতে হইবে। বরাবরকার অভ্যাস, একজন কেহ যত্ন না করিলে মহিন থাকিতে পারে না। দেখো-না, বউ যাওয়ার পর হইতে ও কেমন একরকম হইয়া গেছে। বউকেও ধন্য বলি, কেমন করিয়া গেল ?"

বিনোদিনী একটুখানি মুখ বাঁকাইয়া বিছানার চাদর খুঁটিতে লাগিল। রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "কী বউ, কী ভাবিতেছ। ইহাতে ভাবিবার কথা কিছু নাই। যে যাহা বলে বলুক, তুমি আমাদের পর নও।"

বিনোদিনী কহিল, "কাজ নাই, মা।"

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "আচ্ছা, তবে কাজ নাই। দেখি আমি নিজে যা পারি তাই করিব।"

বলিয়া তখনই তিনি মহেন্দ্রের তেতলার ঘর ঠিক করিবার জন্য উদ্যত হইলেন। বিনোদিনী ব্যস্ত হইয়া কহিল, "তোমার অসুখ-শরীর, তুমি যাইয়ো না, আমি যাইতেছি। আমাকে মাপ করো পিসিমা, তুমি যেমন আদেশ করিবে আমি তাহাই করিব।"

রাজলক্ষ্মী লোকের কথা একেবারেই তুচ্ছ করিতেন। স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে সংসারে এবং সমাজে তিনি মহেন্দ্র ছাড়া আর কিছুই জানিতেন না। মহেন্দ্র সম্বন্ধে বিনোদিনী সমাজনিন্দার আভাস দেওয়াতে তিনি বিরক্ত হইয়াছিলেন। আজন্মকাল তিনি মহিনকে দেখিয়া আসিতেছেন, তাহার মতো এমন ভালো ছেলে আছে কোথায়। সেই মহিনের সম্বন্ধেও নিন্দা! যদি কেহ করে, তবে তাহার জিহ্বা খসিয়া যাক। তাঁহার নিজের কাছে যেটা ভালো লাগে ও ভালো বোধ হয় সে-সম্বন্ধে বিশ্বের লোককে উপেক্ষা করিবার জন্য রাজলক্ষ্মীর একটা স্বাভাবিক জেদ ছিল।

আজ মহেন্দ্র কালেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া আপনার শয়নঘর দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল। দ্বার খুলিয়াই দেখিল, চন্দনগুঁড়া ও ধুনার গন্ধে ঘর আমোদিত হইয়া

আছে। মশারিতে গোলাপি রেশমের ঝালর লাগানো। নিচের বিছানায় শুভ্র জাজিম তকতক করিতেছে এবং তাহার উপরে পূর্বেকার পুরাতন তাকিয়ার পরিবর্তে রেশম ও পশমের ফুলকাটা বিলাতি চৌকা বালিশ সুসজ্জিত। তাহার কারুকার্য বিনোদিনীর বহুদিনের পরিশ্রমজাত। আশা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিত, "এগুলি তুই কার জন্যে তৈরি করিতেছিস, ভাই।" বিনোদিনী হাসিয়া বলিত, "আমার চিতাশয্যার জন্য। মরণ ছাড়া তো সোহাগের লোক আমার আর কেহই নাই।"

দেয়ালে মহেন্দ্রের যে বাঁধানো ফোটোগ্রাফখানি ছিল, তাহার ফ্রেমের চার কোণে রঙিন ফিতার দ্বারা সুনিপুণভাবে চারিটি গ্রন্থি বাঁধা, এবং সেই ছবির নিচে ভিত্তিগাত্রে একটি টিপাইয়ের দুই ধারে দুই ফুলদানিতে ফুলের তোড়া, যেন মহেন্দ্রের প্রতিমূর্তি কোনো অজ্ঞাত ভক্তের পূজা প্রাপ্ত হইয়াছে। সবসুদ্ধ সমস্ত ঘরের চেহারা অন্যরকম। খাট যেখানে ছিল, সেখান হইতে একটুখানি সরানো। ঘরটিকে দুই ভাগ করা হইয়াছে; খাটের সম্মুখে দুটি বড়ো আলনায় কাপড় ঝুলাইয়া দিয়া আড়ালের মতো প্রস্তুত হওয়ায় নিচে বসিবার বিছানা ও রাত্রে শুইবার খাট স্বতন্ত্র হইয়া গেছে। যে আলমারিতে আশার সমস্ত শখের জিনিস চীনের খেলনা প্রভৃতি সাজানো ছিল, সেই আলমারির কাঁচের দরজায় ভিতরের গায়ে লাল সালু কুঞ্চিত করিয়া মারিয়া দেওয়া হইয়াছে; এখন আর তাহার ভিতরের কোনো জিনিস দেখা যায় না। ঘরের মধ্যে তাহার পূর্ব-ইতিহাসের যে-কিছু চিহ্ন ছিল, তাহা নূতন হস্তের নব সজ্জায় সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হইয়া গেছে।

পরিশ্রান্ত মহেন্দ্র মেঝের উপরকার শুভ্র বিছানায় শুইয়া নূতন বালিশগুলির উপর মাথা রাখিবামাত্র একটি মৃদু সুগন্ধ অনুভব করিল— বালিশের ভিতরকার তুলার সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে নাগকেশর ফুলের রেণু ও কিছু আতর মিশ্রিত ছিল।

মহেন্দ্রের চোখ বুজিয়া আসিল, মনে হইতে লাগিল, এই বালিশের উপর যাহার নিপুণ হস্তের শিল্প, তাহারই কোমল চম্পক-অঙ্গুলির যেন গন্ধ পাওয়া যাইতেছে।

এমন সময় দাসী রুপার রেকাবিতে ফল ও মিষ্ট, এবং কাঁচের গ্লাসে বরফ-দেওয়া আনারসের শরবত আনিয়া দিল। এ-সমস্তই পূর্বপ্রথা হইতে কিছু বিভিন্ন এবং বহু যত্ন ও পরিপাট্যের সহিত রচিত। সমস্ত স্বাদে গন্ধে দৃশ্যে নূতনত্ব আসিয়া মহেন্দ্রের ইন্দ্রিয়সকল আবিষ্ট করিয়া তুলিল।

তৃপ্তিপূর্বক ভোজন সমাধা হইলে, রুপার বাটায় পান ও মশলা লইয়া বিনোদিনী ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করিল। হাসিতে হাসিতে কহিল, "এ-কয়দিন তোমার

খাবার সময় হাজির হইতে পারি নাই, মাপ করিয়ো, ঠাকুরপো। আর যাই কর, আমার মাথার দিব্য রহিল, তোমার অযত্ন হইতেছে, এ-খবরটা আমার চোখের বালিকে দিয়ো না। আমার যথাসাধ্য আমি করিতেছি— কিন্তু কী করিব ভাই, সংসারের সমস্ত কাজই আমার ঘাড়ে।”

এই বলিয়া বিনোদিনী পানের বাটা মহেন্দ্রের সম্মুখে অগ্রসর করিয়া দিল। আজিকার পানের মধ্যেও কেয়া-খয়েরের একটু বিশেষ নূতন গন্ধ পাওয়া গেল।

মহেন্দ্র কহিল, “যত্নের মাঝে-মাঝে এমন এক-একটা ত্রুটি থাকাই ভালো।”

বিনোদিনী কহিল, “ভালো কেন, শুনি।”

মহেন্দ্র উত্তর করিল, “তার পরে খোঁটা দিয়া সুদসুদ্ধ আদায় করা যায়।”

“মহাজন-মহাশয়, সুদ কত জমিল।”

মহেন্দ্র কহিল, “খাবার সময় হাজির ছিলে না, এখন খাবার পরে হাজরি পোষাইয়া আরো পাওনা বাকি থাকিবে।”

বিনোদিনী হাসিয়া কহিল, “তোমার হিসাব যে-রকম কড়াক্কড়, তোমার হাতে একবার পড়িলে আর উদ্ধার নাই দেখিতেছি।”

মহেন্দ্র কহিল, “হিসাবে যাই থাক্‌, আদায় কী করিতে পারিলাম।”

বিনোদিনী কহিল, “আদায় করিবার মতো আছে কী। তবু তো বন্দী করিয়া রাখিয়াছ।” বলিয়া ঠাট্টাকে হঠাৎ গাম্ভীর্যে পরিণত করিয়া ঈষৎ একটু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

মহেন্দ্রও একটু গম্ভীর হইয়া কহিল, “ভাই বালি, এটা কি তবে জেলখানা।”

এমন সময় বেহারা নিয়মমতো আলো আনিয়া টিপাইয়ের উপর রাখিয়া চলিয়া গেল।

হঠাৎ চোখে আলো লাগাতে মুখের সামনে একটু হাতের আড়াল করিয়া নতনেত্রে বিনোদিনী বলিল, “কী জানি ভাই। তোমার সঙ্গে কথায় কে পারিবে। এখন যাই, কাজ আছে।”

মহেন্দ্র হঠাৎ তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, “বন্ধন. যখন স্বীকার করিয়াছ তখন যাইবে কোথায় ?”

বিনোদিনী কহিল, “ছি ছি, ছাড়ো। যাহার পালাইবার রাস্তা নাই, তাহাকে আবার বাঁধিবার চেষ্টা কেন।”

বিনোদিনী জোর করিয়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া প্রস্থান করিল।

মহেন্দ্র সেই বিছানায় সুগন্ধ বালিশের উপর পড়িয়া রহিল, তাহার বুকের মধ্যে

রক্ত তোলপাড় করিতে লাগিল। নিস্তব্ধ সন্ধ্যা, নির্জন ঘর, নববসন্তের বাতাস দিতেছে, বিনোদিনীর মন যেন ধরা দিল-দিল— উন্মাদ মহেন্দ্র আপনাকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিবে না, এমনি বোধ হইল। তাড়াতাড়ি আলো নিবাইয়া ঘরের প্রবেশদ্বার বন্ধ করিল, তাহার উপরে শার্শি আঁটিয়া দিল, এবং সময় না হইতেই বিছানার মধ্যে গিয়া শুইয়া পড়িল।

এও তো সে পুরাতন বিছানা নহে। চার-পাঁচখানা তোশকে শয্যাতল পূর্বের চেয়ে অনেক নরম। আবার একটি গন্ধ— সে অগুরুর কি খসখসের, কি কিসের ঠিক বুঝা গেল না। মহেন্দ্র অনেকবার এপাশ-ওপাশ করিতে লাগিল— কোথাও যেন পুরাতনের কোনো একটা নিদর্শন খুঁজিয়া পাইয়া তাহা আঁকড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা। কিন্তু কিছুই হাতে ঠেকিল না।

রাত্রি নটার সময় রুদ্ধ দ্বারে ঘা পড়িল। বিনোদিনী বাহির হইতে কহিল, “ঠাকুরপো, তোমার খাবার আসিয়াছে, দুয়ার খোলো।”

তখনই দ্বার খুলিবার জন্য মহেন্দ্র ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া শার্শির অর্গলে হাত লাগাইল। কিন্তু খুলিল না— মেঝের উপর উপুড় হইয়া লুটাইয়া কহিল, “না না, আমার ক্ষুধা নাই, আমি খাইব না।”

বাহির হইতে উদ্‌বিগ্ন কণ্ঠের প্রশ্ন শোনা গেল, “অসুখ করেনি তো? জল আনিয়া দিব? কিছু চাই কি।”

মহেন্দ্র কহিল, “আমার কিছুই চাই না— কোনো প্রয়োজন নাই।”

বিনোদিনী কহিল, “মাথা খাও, আমার কাছে ভাঁড়াইয়ো না। আচ্ছা, অসুখ না থাকে তো একবার দরজা খোলো।”

মহেন্দ্র সবেগে বলিয়া উঠিল, “না খুলিব না, কিছুতেই না। তুমি যাও।”

বলিয়া মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি উঠিয়া পুনর্বার বিছানার মধ্যে গিয়া শুইয়া পড়িল এবং অন্তর্হিতা আশার স্মৃতিকে শূন্য শয্যা ও চঞ্চল হৃদয়ের মধ্যে অন্ধকারে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ঘুম যখন কিছুতেই আসিতে চায় না, তখন মহেন্দ্র বাতি জ্বালাইয়া দোয়াত-কলম লইয়া আশাকে চিঠি লিখিতে বসিল। লিখিল, “আশা, আর অধিক দিন আমাকে একা ফেলিয়া রাখিয়ো না। আমার জীবনের লক্ষ্মী তুমি— তুমি না থাকিলেই আমার সমস্ত প্রবৃত্তি শিকল ছিঁড়িয়া আমাকে কোন্ দিকে টানিয়া লইতে চায়, বুঝিতে পারি না। পথ দেখিয়া চলিব, তাহার আলো কোথায়— সে আলো তোমার বিশ্বাসপূর্ণ দুটি চোখের প্রেমস্নিগ্ধ দৃষ্টিপাতে। তুমি শীঘ্র এসো, আমার শুভ, আমার ধ্রুব, আমার

এক। আমাকে স্থির করো, রক্ষা করো, আমার হৃদয় পরিপূর্ণ করো। তোমার প্রতি লেশমাত্র অন্যায়ের মহাপাপ হইতে, তোমাকে মুহূর্তকাল বিস্মরণের বিভীষিকা হইতে আমাকে উদ্ধার করো।”

এমনি করিয়া মহেন্দ্র নিজেকে আশার অভিমুখে সবেগে তাড়না করিবার জন্য অনেক রাত ধরিয়া অনেক কথা লিখিল। দূর হইতে সুদূরে অনেকগুলি গির্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া তিনটা বাজিল। কলিকাতার পথে গাড়ির শব্দ আর প্রায় নাই, পাড়ার পরপ্রান্তে কোনো দোতলা হইতে নটীকণ্ঠে বেহাগ-রাগিণীর যে-গান উঠিতেছিল সেও বিশ্বব্যাপিনী শান্তি ও নিদ্রার মধ্যে একেবারে ডুবিয়া গেছে। মহেন্দ্র একান্তমনে আশাকে স্মরণ করিয়া এবং মনের উদ্‌বেগ দীর্ঘ পত্রে নানারূপে ব্যক্ত করিয়া অনেকটা সান্ত্বনা পাইল, এবং বিছানায় শুইবামাত্র ঘুম আসিতে তাহার কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না।

সকালে মহেন্দ্র যখন জাগিয়া উঠিল, তখন বেলা হইয়াছে, ঘরের মধ্যে রৌদ্র আসিয়াছে। মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল; নিদ্রার পর গতরাত্রির সমস্ত ব্যাপার মনের মধ্যে হালকা হইয়া আসিয়াছে। বিছানার বাহিরে আসিয়া মহেন্দ্র দেখিল— গতরাত্রে আশাকে সে যে-চিঠি লিখিয়াছিল, তাহা টিপাইয়ের উপর দোয়াত দিয়া চাপা রহিয়াছে। সেখানি পুনর্বার পড়িয়া মহেন্দ্র ভাবিল, “করেছি কী। এ যে নভেলি ব্যাপার। ভাগ্যে পাঠাই নাই। আশা পড়িলে কী মনে করিত। সে তো এর অর্ধেক কথা বুঝিতেই পারিত না।” রাত্রে ক্ষণিক কারণে হৃদয়াবেগ যে অসংগত বাড়িয়া উঠিয়াছিল, ইহাতে মহেন্দ্র লজ্জা পাইল; চিঠিখানা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল; সহজ ভাষায় আশাকে একখানি সংক্ষিপ্ত চিঠি লিখিল, “তুমি আর কত দেরি করিবে। তোমার জেঠামহাশয়ের যদি শীঘ্র ফিরিবার কথা না থাকে, তবে আমাকে লিখিয়ো, আমি নিজে গিয়া তোমাকে লইয়া আসিব। এখানে একলা আমার ভালো লাগিতেছে না।”

২৬

মহেন্দ্রের চলিয়া যাওয়ার কিছুদিন পরেই আশা যখন কাশীতে আসিল, তখন অন্নপূর্ণার মনে বড়োই আশঙ্কা জন্মিল। আশাকে তিনি নানাপ্রকারে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, “হাঁ রে চুনি, তুই যে তোর সেই চোখের বালির কথা বলিতেছিলি, তোর মতে, তার মতন এমন গুণবতী মেয়ে আর জগতে নাই?”

"সত্যই মাসি, আমি বাড়াইয়া বলিতেছি না। তার যেমন বুদ্ধি তেমনি রূপ, কাজকর্মে তার তেমনি হাত।"

"তোর সখী, তুই তো তাহাকে সর্বগুণবতী দেখিবি, বাড়ির আর-সকলে তাহাকে কে কী বলে শুনি।"

"মার মুখে তো তার প্রশংসা ধরে না। চোখের বালি দেশে যাইবার কথা বলিতেই তিনি অস্থির হইয়া ওঠেন। এমন সেবা করিতে কেহ জানে না। বাড়ির চাকর-দাসীরও যদি কারও ব্যামো হয় তাকে বোনের মতো, মার মতো যত্ন করে।"

"মহেন্দ্রের মত কী।"

"তাঁকে তো জানই মাসি, নিতান্ত ঘরের লোক ছাড়া আর-কাউকে তাঁর পছন্দই হয় না। আমার বালিকে সকলেই ভালোবাসে, কিন্তু তাঁর সঙ্গে তার আজ পর্যন্ত ভালো বনে নাই।"

"কী রকম।"

"আমি যদি বা অনেক করিয়া দেখাসাক্ষাৎ করাইয়া দিলাম, তাঁর সঙ্গে তার কথাবার্তাই প্রায় বন্ধ। তুমি তো জান, তিনি কী রকম কুনো,— লোকে মনে করে, তিনি অহংকারী, কিন্তু তা নয় মাসি, তিনি দুটি-একটি লোক ছাড়া কাহাকেও সহ্য করিতে পারেন না।"

শেষ কথাটা বলিয়া ফেলিয়া হঠাৎ আশার লজ্জাবোধ হইল, গাল-দুটি লাল হইয়া উঠিল। অন্নপূর্ণা খুশি হইয়া মনে-মনে হাসিলেন— কহিলেন, "তাই বটে, সেদিন মহিন যখন আসিয়াছিল, তোর বালির কথা একবার মুখেও আনে নাই।"

আশা দুঃখিত হইয়া কহিল, "ওই তাঁর দোষ। যাকে ভালোবাসেন না, সে যেন একেবারেই নাই। তাকে যেন একদিনও দেখেন নাই, জানেন নাই, এমনি তাঁর ভাব।"

অন্নপূর্ণা শান্ত স্নিগ্ধ হাস্যে কহিলেন, "আবার যাকে ভালোবাসেন মহিন যেন জন্মজন্মান্তর কেবল তাকেই দেখেন এবং জানেন, এ ভাবও তাঁর আছে। কী বলিস, চুনি।"

আশা তাহার কোনো উত্তর না করিয়া চোখ নিচু করিয়া হাসিল। অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "চুনি, বিহারীর কী খবর বল্ দেখি। সে কি বিবাহ করিবে না।"

মুহূর্তের মধ্যেই আশার মুখ গম্ভীর হইয়া গেল— সে কী উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না।

আশার নিরুত্তর ভাবে অত্যন্ত ভয় পাইয়া অন্নপূর্ণা বলিয়া উঠিলেন, "সত্য বল্ চুনি, বিহারীর অসুখ-বিসুখ কিছু হয়নি তো।"

বিহারী এই চিরপুত্রহীনা রমণীর স্নেহ-সিংহাসনে পুত্রের মানস-আদর্শরূপে বিরাজ করিত। বিহারীকে তিনি সংসারে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া আসিতে পারেন নাই, এ-দুঃখ প্রবাসে আসিয়া প্রতিদিন তাঁহার মনে জাগিত। তাঁহার ক্ষুদ্র সংসারের আর-সমস্তই এক প্রকার সম্পূর্ণ হইয়াছে, কেবল বিহারীর সেই গৃহহীন অবস্থা স্মরণ করিয়াই তাঁহার পরিপূর্ণ বৈরাগ্যচর্চার ব্যাঘাত ঘটে।

আশা কহিল, "মাসি, বিহারী-ঠাকুরপোর কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়ো না।"

অন্নপূর্ণা আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন বল্ দেখি।"

আশা কহিল, "সে আমি বলিতে পারিব না।" বলিয়া ঘর হইতে উঠিয়া গেল।

অন্নপূর্ণা চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "অমন সোনার ছেলে বেহারী, এরই মধ্যে তাহার কি এতই বদল হইয়াছে যে, চুনি আজ তাহার নাম শুনিয়া উঠিয়া যায়। অদৃষ্টেরই খেলা। কেন তাহার সহিত চুনির বিবাহের কথা হইল, কেনই বা মহেন্দ্র তাহার হাতের কাছ হইতে চুনিকে কাড়িয়া লইল।"

অনেক দিন পরে আজ আবার অন্নপূর্ণার চোখ দিয়া জল পড়িল,— মনে-মনে তিনি কহিলেন, "আহা, আমার বিহারী যদি এমন কিছু করিয়া থাকে যাহা আমার বেহারীর যোগ্য নহে, তবে সে তাহা অনেক দুঃখ পাইয়াই করিয়াছে, সহজে করে নাই।" বিহারীর সেই দুঃখের পরিমাণ কল্পনা করিয়া অন্নপূর্ণার বক্ষ ব্যথিত হইতে লাগিল।

সন্ধ্যার সময় যখন অন্নপূর্ণা আহ্নিকে বসিয়াছেন, তখন একটা গাড়ি আসিয়া দরজায় থামিল, এবং সহিস বাড়ির লোককে ডাকিয়া রুদ্ধ দ্বারে ঘা মারিতে লাগিল। অন্নপূর্ণা পূজাগৃহ হইতে বলিয়া উঠিলেন, "ওই যা, আমি একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলাম, আজ কুঞ্জর শাশুড়ীর এবং তার দুই বোনঝির এলাহাবাদ হইতে আসিবার কথা ছিল। ওই বুঝি তাহারা আসিল। চুনি, তুই একবার আলোটা লইয়া দরজা খুলিয়া দে।"

আশা লণ্ঠন-হাতে দরজা খুলিয়া দিতেই দেখিল, বিহারী দাঁড়াইয়া। বিহারী বলিয়া উঠিল, "এ কী বোঠান, তবে যে শুনিলাম, তুমি কাশী আসিবে না।"

আশার হাত হইতে লণ্ঠন পড়িয়া গেল। সে যেন প্রেতমূর্তি দেখিয়া এক নিশ্বাসে দোতলায় ছুটিয়া গিয়া আর্তস্বরে বলিয়া উঠিল, "মাসিমা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি; উহাকে এখনই যাইতে বলো।"

অন্নপূর্ণা পূজার আসন হইতে চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, "কাহাকে চুনি, কাহাকে।"

আশা কহিল, “বিহারী-ঠাকুরপো এখানেও আসিয়াছেন।” বলিয়া সে পাশের ঘরে গিয়া দ্বার রোধ করিল।

বিহারী নিচে হইতে সকল কথাই শুনিতে পাইল। সে তখনই ছুটিয়া যাইতে উদ্যত— কিন্তু অন্নপূর্ণা পূজাহ্নিক ফেলিয়া যখন নামিয়া আসিলেন, তখন দেখিলেন, বিহারী দ্বারের কাছে মাটিতে বসিয়া পড়িয়াছে, তাহার শরীর হইতে সমস্ত শক্তি চলিয়া গেছে।

অন্নপূর্ণা আলো আনেন নাই। অন্ধকারে তিনি বিহারীর মুখের ভাব দেখিতে পাইলেন না, বিহারীও তাঁহাকে দেখিতে পাইল না।

অন্নপূর্ণা কহিলেন, “বেহারী।”

হায়, সেই চিরদিনের স্নেহসুধাসিক্ত কণ্ঠস্বর কোথায়। এ কণ্ঠের মধ্যে যে কঠিন বিচারের বজ্রধ্বনি প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। জননী অন্নপূর্ণা, সংহার-খড়্গ তুলিলে কার ’পরে। ভাগ্যহীন বিহারী যে আজ অন্ধকারে তোমার মঙ্গলচরণাশ্রয়ে মাথা রাখিতে আসিয়াছিল।

বিহারীর অবশ শরীর আপাদমস্তক বিদ্যুতের আঘাতে চকিত হইয়া উঠিল— কহিল, “কাকীমা, আর নয়, আর একটি কথাও বলিয়ো না। আমি চলিলাম।”

বলিয়া বিহারী ভূমিতে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল, অন্নপূর্ণার পা-ও স্পর্শ করিল না। জননী যেমন গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন করে, অন্নপূর্ণা তেমনি করিয়া বিহারীকে সেই রাত্রের অন্ধকারে নীরবে বিসর্জন করিলেন, একবার ফিরিয়া ডাকিলেন না। গাড়ি বিহারীকে লইয়া দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইয়া গেল।

সেই রাত্রেই আশা মহেন্দ্রকে চিঠি লিখিল, “বিহারী-ঠাকুরপো হঠাৎ আজ সন্ধ্যাবেলায় এখানে আসিয়াছিলেন। জেঠামশায়রা কবে কলিকাতায় ফিরিবেন, ঠিক নাই— তুমি শীঘ্র আসিয়া আমাকে এখান হইতে লইয়া যাও।”

২৭

সেদিন রাত্রিজাগরণ ও প্রবল আবেগের পরে সকালবেলায় মহেন্দ্রের শরীর মনে একটা অবসাদ উপস্থিত হইয়াছিল। তখন ফাল্গুনের মাঝামাঝি, গরম পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। মহেন্দ্র অন্যদিন সকালে তাহার শয়নগৃহের কোণে টেবিলে বই লইয়া বসিত। আজ নিচের বিছানায় তাকিয়ায় হেলান দিয়া পড়িল। বেলা হইয়া যায়, স্নানে গেল না। রাস্তা দিয়া ফেরিওয়ালা হাঁকিয়া যাইতেছে। পথে আপিসের গাড়ির শব্দের বিরাম নাই। প্রতিবেশীর নূতন বাড়ি তৈরি হইতেছে, মিস্ত্রি-কন্যারা

তাহারই ছাদ পিটিবার তালে তালে সমস্বরে একঘেয়ে গান ধরিল। ঈষৎ তপ্ত দক্ষিণের হাওয়ায় মহেন্দ্রের পীড়িত স্নায়ুজাল শিথিল হইয়া আসিয়াছে; কোনো কঠিন পণ, দুরূহ চেষ্টা, মানস-সংগ্রাম আজিকার এই হালছাড়া গা-ঢালা বসন্তের দিনের উপযুক্ত নহে।

"ঠাকুরপো, তোমার আজ হল কী। স্নান করিবে না? এদিকে খাবার যে প্রস্তত। ও কী ভাই, শুইয়া যে। অসুখ করিয়াছে? মাথা ধরিয়াছে?" বলিয়া বিনোদিনী কাছে আসিয়া মহেন্দ্রের কপালে হাত দিল।

মহেন্দ্র অর্ধেক চোখ বুজিয়া জড়িতকণ্ঠে বলিল, "আজ শরীরটা তেমন ভালো নাই—আজ আর স্নান করিব না।"

বিনোদিনী কহিল, "স্নান না কর তো দুটিখানি খাইয়া লও।" বলিয়া পীড়াপীড়ি করিয়া সে মহেন্দ্রকে ভোজনস্থানে লইয়া গেল এবং উৎকণ্ঠিত যত্নের সহিত অনুরোধ করিয়া আহার করাইল।

আহারের পর মহেন্দ্র পুনরায় নিচের বিছানায় আসিয়া শুইলে, বিনোদিনী শিয়রে বসিয়া ধীরে ধীরে তাহার মাথা টিপিয়া দিতে লাগিল। মহেন্দ্র নিমীলিতচক্ষে বলিল, "ভাই বালি, এখনো তো তোমার খাওয়া হয় নাই, তুমি খাইতে যাও।"

বিনোদিনী কিছুতেই গেল না। অলস মধ্যাহ্নের উত্তপ্ত হাওয়ায় ঘরের পর্দা উড়িতে লাগিল এবং প্রাচীরের কাছে কম্পমান নারিকেলগাছের অর্থহীন মর্মরশব্দ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। মহেন্দ্রের হৃৎপিণ্ড ক্রমশই দ্রুততর তালে নাচিতে লাগিল এবং বিনোদিনীর ঘননিশ্বাস সেই তালে মহেন্দ্রের কপালের চুলগুলি কাঁপাইতে থাকিল। কাহারও কণ্ঠ দিয়া একটি কথা বাহির হইল না। মহেন্দ্র মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "অসীম বিশ্বসংসারের অনন্ত প্রবাহের মধ্যে ভাসিয়া চলিয়াছি, তরণী ক্ষণকালের জন্য কখন কোথায় ঠেকে, তাহাতে কাহার কী আসে যায় এবং কতদিনের জন্যই বা যায় আসে।"

শিয়রের কাছে বসিয়া কপালে হাত বুলাইতে বুলাইতে বিহ্বল যৌবনের গুরুভারে ধীরে ধীরে বিনোদিনীর মাথা নত হইয়া আসিতেছিল; অবশেষে তাহার কেশাগ্রভাগ মহেন্দ্রের কপোল স্পর্শ করিল। বাতাসে আন্দোলিত সেই কেশগুচ্ছের কম্পিত মৃদু স্পর্শে তাহার সমস্ত শরীর বারংবার কাঁপিয়া উঠিল, হঠাৎ যেন নিশ্বাস তাহার বুকের কাছে অবরুদ্ধ হইয়া বাহির হইবার পথ পাইল না। ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া মহেন্দ্র কহিল, "নাঃ, আমার কালেজ আছে, আমি যাই।" বলিয়া বিনোদিনীর মুখের দিকে না চাহিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল।

বিনোদিনী কহিল, "ব্যস্ত হইয়ো না, আমি তোমার কাপড় আনিয়া দিই।" বলিয়া মহেন্দ্রের কালেজের কাপড় বাহির করিয়া আনিল।

মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি কালেজে চলিয়া গেল, কিন্তু সেখানে কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিল না। পড়াশুনায় মন দিতে অনেকক্ষণ বৃথা চেষ্টা করিয়া সকাল সকাল বাড়ি ফিরিয়া আসিল।

ঘরে ঢুকিয়া দেখে, বিনোদিনী বুকের তলায় বালিশ টানিয়া লইয়া নিচের বিছানায় উপুড় হইয়া কী একটা বই পড়িতেছে— রাশীকৃত কালো চুল পিঠের উপর ছড়ানো। বোধ করি বা সে মহেন্দ্রের জুতার শব্দ শুনিতে পায় নাই। মহেন্দ্র আস্তে আস্তে পা টিপিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। শুনিতে পাইল, পড়িতে পড়িতে বিনোদিনী একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

মহেন্দ্র কহিল, "ওগো করুণাময়ী, কাল্পনিক লোকের জন্য হৃদয়ের বাজে খরচ করিয়ো না। কী পড়া হইতেছে।"

বিনোদিনী ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া বসিয়া তাড়াতাড়ি বইখানা অঞ্চলের মধ্যে লুকাইয়া ফেলিল। মহেন্দ্র কাড়িয়া দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ হাতাহাতি-কাড়াকাড়ির পর পরাভূত বিনোদিনীর অঞ্চল হইতে মহেন্দ্র বইখানি ছিনাইয়া লইয়া দেখিল— বিষবৃক্ষ। বিনোদিনী ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে রাগ করিয়া মুখ ফিরাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

মহেন্দ্রের বক্ষঃস্থল তোলপাড় করিতেছিল। অনেক চেষ্টায় সে হাসিয়া কহিল, "ছি ছি, বড়ো ফাঁকি দিলে। আমি ভাবিয়াছিলাম, খুব একটা গোপনীয় কিছু হইবে বা। এত কাড়াকাড়ি করিয়া শেষকালে কিনা বিষবৃক্ষ বাহির হইয়া পড়িল।"

বিনোদিনী কহিল, "আমার আবার গোপনীয় কী থাকিতে পারে, শুনি।"

মহেন্দ্র ফস্ করিয়া বলিয়া ফেলিল, "এই মনে করো, যদি বিহারীর কাছ হইতে কোনো চিঠি আসিত?"

নিমেষের মধ্যে বিনোদিনীর চোখে বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইল। এতক্ষণ ফুলশর ঘরের কোণে খেলা করিতেছিল, সে যেন দ্বিতীয় বার ভস্মসাৎ হইয়া গেল। মুহূর্তে-প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার মতো বিনোদিনী উঠিয়া দাঁড়াইল। মহেন্দ্র তাহার হাত ধরিয়া কহিল, "মাপ করো, আমার পরিহাস মাপ করো।"

বিনোদিনী সবেগে হাত ছিনাইয়া লইয়া কহিল, "পরিহাস করিতেছ কাহাকে। যদি তাঁহার সঙ্গে বন্ধুত্ব করিবার যোগ্য হইতে, তবে তাঁহাকে পরিহাস করিলে সহ করিতাম। তোমার ছোটো মন, বন্ধুত্ব করিবার শক্তি নাই, অথচ ঠাট্টা।"

বিনোদিনী চলিয়া যাইতে উদ্যত হইবামাত্র মহেন্দ্র দুই হাতে তাহার পা বেষ্টন করিয়া বাধা দিল।

এমন সময়ে সম্মুখে এক ছায়া পড়িল, মহেন্দ্র বিনোদিনীর পা ছাড়িয়া চমকিয়া মুখ তুলিয়া দেখিল, বিহারী।

বিহারী স্থির দৃষ্টিপাতে উভয়কে দগ্ধ করিয়া শান্ত ধীর স্বরে কহিল, "অত্যন্ত অসময়ে উপস্থিত হইয়াছি, কিন্তু বেশিক্ষণ থাকিব না। একটা কথা বলিতে আসিয়াছিলাম। আমি কাশী গিয়াছিলাম, জানিতাম না, সেখানে বউঠাকরুন আছেন। না জানিয়া তাঁহার কাছে অপরাধী হইয়াছি; তাঁহার কাছে ক্ষমা চাহিবার অবসর নাই, তাই তোমার কাছে ক্ষমা চাহিতে আসিয়াছি। আমার মনে জ্ঞানে অজ্ঞানে যদি কখনো কোনো পাপ স্পর্শ করিয়া থাকে, সেজন্য তাঁহাকে যেন কখনো কোনো দুঃখ সহ্য করিতে না হয়, তোমার কাছে আমার এই প্রার্থনা।"

বিহারীর কাছে দুর্বলতা হঠাৎ প্রকাশ পাইল বলিয়া মহেন্দ্রের মনটা যেন জ্বলিয়া উঠিল। এখন তাহার ঔদার্যের সময় নহে। সে একটু হাসিয়া কহিল, "ঠাকুরঘরে কলা খাইবার যে গল্প আছে, তোমার ঠিক তাই দেখিতেছি। তোমাকে দোষ স্বীকার করিতেও বলি নাই, অস্বীকার করিতেও বলি নাই; তবে ক্ষমা চাহিয়া সাধু হইতে আসিয়াছ কেন।"

বিহারী কাঠের পুতুলের মতো কিছুক্ষণ আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল— তার পরে যখন কথা বলিবার প্রবল চেষ্টায় তাহার ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল, তখন বিনোদিনী বলিয়া উঠিল, "বিহারী-ঠাকুরপো, তুমি কোনো উত্তর দিয়ো না। কিছুই বলিয়ো না। ওই লোকটি যাহা মুখে আনিল, তাহাতে উহারই মুখে কলঙ্ক লাগিয়া রহিল, সে কলঙ্ক তোমাকে স্পর্শ করে নাই।"

বিনোদিনীর কথা বিহারীর কানে প্রবেশ করিল কিনা সন্দেহ— সে যেন স্বপ্নচালিতের মতো মহেন্দ্রের ঘরের সম্মুখ হইতে ফিরিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া যাইতে লাগিল।

বিনোদিনী তাহার পশ্চাতে গিয়া কহিল, "বিহারী-ঠাকুরপো, আমাকে কি তোমার কোনো কথা বলিবার নাই। যদি তিরস্কারের কিছু থাকে, তবে তিরস্কার করো।"

বিহারী যখন কোনো উত্তর না করিয়া চলিতে লাগিল, বিনোদিনী সম্মুখে আসিয়া দুই হাতে তাহার দক্ষিণ হাত চাপিয়া ধরিল। বিহারী অপরিসীম ঘৃণার সহিত তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। সেই আঘাতে বিনোদিনী যে পড়িয়া গেল তাহা সে জানিতেও পারিল না।

পতনশব্দ শুনিয়া মহেন্দ্র ছুটিয়া আসিল। দেখিল, বিনোদিনীর বাম হাতের কনুয়ের কাছে কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে।

মহেন্দ্র কহিল, "ইস, এ যে অনেকটা কাটিয়াছে।" বলিয়া তৎক্ষণাৎ নিজের পাতলা জামা খানিকটা টানিয়া ছিঁড়িয়া ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে প্রস্তুত হইল।

বিনোদিনী তাড়াতাড়ি হাত সরাইয়া লইয়া কহিল, "না না, কিছুই করিয়ো না, রক্ত পড়িতে দাও।"

মহেন্দ্র কহিল, "বাঁধিয়া একটা ঔষধ দিতেছি, তা হইলে আর ব্যথা হইবে না, শীঘ্র সারিয়া যাইবে।"

বিনোদিনী সরিয়া গিয়া কহিল, "আমি ব্যথা সারাইতে চাই না, এ কাটা আমার থাক।"

মহেন্দ্র কহিল, "আজ অধীর হইয়া তোমাকে আমি লোকের সামনে অপদস্থ করিয়াছি, আমাকে মাপ করিতে পারিবে কি।"

বিনোদিনী কহিল, "মাপ কিসের জন্য। বেশ করিয়াছ। আমি কি লোককে ভয় করি। আমি কাহাকেও মানি না। যাহারা আঘাত করিয়া ফেলিয়া চলিয়া যায়, তাহারাই কি আমার সব, আর যাহারা আমাকে পায়ে ধরিয়া টানিয়া রাখিতে চায়, তাহারা আমার কেহই নহে?"

মহেন্দ্র উন্মত্ত হইয়া গদ্গদকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "বিনোদিনী, তবে আমার ভালোবাসা তুমি পায়ে ঠেলিবে না?"

বিনোদিনী কহিল, "মাথায় করিয়া রাখিব। ভালোবাসা আমি জন্মাবধি এত বেশি পাই নাই যে, 'চাই না' বলিয়া ফিরাইয়া দিতে পারি।"

মহেন্দ্র তখন দুই হাতে বিনোদিনীর দুই হাত ধরিয়া কহিল, "তবে এসো আমার ঘরে। তোমাকে আজ আমি ব্যথা দিয়াছি, তুমিও আমাকে ব্যথা দিয়া চলিয়া আসিয়াছ— যতক্ষণ তাহা একেবারে মুছিয়া না যাইবে, ততক্ষণ আমার খাইয়া শুইয়া কিছুতেই সুখ নাই।"

বিনোদিনী কহিল, "আজ নয়, আজ আমাকে ছাড়িয়া দাও। যদি তোমাকে দুঃখ দিয়া থাকি, মাপ করো।"

মহেন্দ্র কহিল, "তুমিও আমাকে মাপ করো, নহিলে আমি রাত্রে ঘুমাইতে পারিব না।"

বিনোদিনী কহিল, "মাপ করিলাম।"

মহেন্দ্র তখনই অধীর হইয়া বিনোদিনীর কাছে হাতে-হাতে ক্ষমা ও ভালোবাসার

একটা নিদর্শন পাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। কিন্তু বিনোদিনীর মুখের দিকে চাহিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। বিনোদিনী সিঁড়ি দিয়া নামিয়া চলিয়া গেল— মহেন্দ্রও ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া ছাদে বেড়াইতে লাগিল। বিহারীর কাছে হঠাৎ আজ মহেন্দ্র ধরা পড়িয়াছে, ইহাতে তাহার মনে একটা মুক্তির আনন্দ উপস্থিত হইল। লুকাচুরির যে-একটা ঘৃণ্যতা আছে, একজনের কাছে প্রকাশ হইয়াই যেন তাহা অনেকটা দূর হইল। মহেন্দ্র মনে মনে কহিল, "আমি নিজেকে ভালো বলিয়া মিথ্যা করিয়া আর চালাইতে চাহি না— কিন্তু আমি ভালোবাসি— আমি ভালোবাসি, সে-কথা মিথ্যা নহে।"—নিজের ভালোবাসার গৌরবে তাহার স্পর্ধা এতই বাড়িয়া উঠিল যে, নিজেকে মন্দ বলিয়া সে আপন মনে উদ্ধতভাবে গর্ব করিতে লাগিল। নিস্তব্ধ সন্ধ্যাকালে নীরব-জ্যোতিষ্কমণ্ডলী-অধিরাজিত অনন্ত জগতের প্রতি একটা অবজ্ঞা নিক্ষেপ করিয়া মনে মনে কহিল, "যে আমাকে যত মন্দই মনে করে করুক, কিন্তু আমি ভালোবাসি।" বলিয়া বিনোদিনীর মানসী মূর্তিকে দিয়া মহেন্দ্র সমস্ত আকাশ, সমস্ত সংসার, সমস্ত কর্তব্য আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। বিহারী হঠাৎ আসিয়া আজ যেন মহেন্দ্রের জীবনের ছিপি-আঁটা মসীপাত্র উলটাইয়া ভাঙিয়া ফেলিল— বিনোদিনীর কালো চোখ এবং কালো চুলের কালি দেখিতে দেখিতে বিস্তৃত হইয়া পূর্বেকার সমস্ত সাদা এবং সমস্ত লেখা লেপিয়া একাকার করিয়া দিল।

২৮

পরদিন ঘুম ভাঙিয়া বিছানা হইতে উঠিবামাত্রই একটি মধুর আবেগে মহেন্দ্রের হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। প্রভাতের সূর্যালোক যেন তাহার সমস্ত ভাবনায় বাসনায় সোনা মাখাইয়া দিল। কী সুন্দর পৃথিবী, কী মধুময় আকাশ, বাতাস যেন পুষ্পরেণুর মতো সমস্ত মনকে উড়াইয়া লইয়া যাইতেছে।

সকালবেলায় বৈষ্ণব ভিক্ষুক খোল-করতাল বাজাইয়া গান জুড়িয়া দিয়াছিল। দরোয়ান তাড়াইয়া দিতে উদ্যত হইলে, মহেন্দ্র দরোয়ানকে ভর্ৎসনা করিয়া তখনই তাহাদিগকে একটা টাকা দিয়া ফেলিল। বেহারা কেরোসিনের ল্যাম্প লইয়া যাইবার সময় অসাবধানে ফেলিয়া দিয়া চুরমার করিল,— মহেন্দ্রের মুখের দিকে তাকাইয়া ভয়ে তাহার প্রাণ শুকাইয়া গেল। মহেন্দ্র তিরস্কারমাত্র না করিয়া প্রসন্নমুখে কহিল, "ওরে, ওখানটা ভালো করিয়া ঝাঁট দিয়া ফেলিস— যেন কাহারও পায়ে কাঁচ না ফোটে।" আজ কোনো ক্ষতিকেই ক্ষতি বলিয়া মনে হইল না।

প্রেম এতদিন নেপথ্যের আড়ালে লুকাইয়া বসিয়া ছিল— আজ সে সম্মুখে আসিয়া পর্দা উঠাইয়া দিয়াছে। জগৎসংসারের উপর হইতে আবরণ উঠিয়া গেছে। প্রতিদিনের পৃথিবীর সমস্ত তুচ্ছতা আজ অন্তর্হিত হইল। গাছপালা, পশুপক্ষী, পথের জনতা, নগরের কোলাহল, সকলই আজ অপরূপ। এই বিশ্বব্যাপী নূতনতা এতকাল ছিল কোথায়।

মহেন্দ্রের মনে হইতে লাগিল, আজ যেন বিনোদিনীর সঙ্গে অন্যদিনের মতো সামান্যভাবে মিলন হইবে না। আজ যেন কবিতায় কথা বলিলে এবং সংগীতে ভাব প্রকাশ করিলে, তবে ঠিক উপযুক্ত হয়। আজিকার দিনকে ঐশ্বর্যে সৌন্দর্যে পূর্ণ করিয়া মহেন্দ্র সৃষ্টিছাড়া সমাজছাড়া একটা আরব্য উপন্যাসের অদ্ভুত দিনের মতো করিয়া তুলিতে চায়। তাহা সত্য হইবে, অথচ স্বপ্ন হইবে— তাহাতে সংসারের কোনো বিধিবিধান, কোনো দায়িত্ব, কোনো বাস্তবিকতা থাকিবে না।

আজ সকাল হইতে মহেন্দ্র চঞ্চল হইয়া বেড়াইতে লাগিল, কালেজে যাইতে পারিল না; কারণ, মিলনের লগ্নটি কখন অকস্মাৎ আবির্ভূত হইবে, তাহা তো কোনো পঞ্জিকায় লেখে না।

গৃহকার্যে রত বিনোদিনীর কণ্ঠস্বর মাঝে মাঝে ভাঁড়ার হইতে, রান্নাঘর হইতে মহেন্দ্রের কানে আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। আজ তাহা মহেন্দ্রের ভালো লাগিল না— আজ সে বিনোদিনীকে মনে মনে সংসার হইতে বহুদূরে স্থাপন করিয়াছে।

সময় কাটিতে চায় না। মহেন্দ্রের স্নানাহার হইয়া গেল— সমস্ত গৃহকর্মের বিরামে মধ্যাহ্ন নিস্তব্ধ হইয়া আসিল। তবু বিনোদিনীর দেখা নাই। দুঃখে এবং সুখে, অধৈর্যে এবং আশায় মহেন্দ্রের মনোযন্ত্রের সমস্ত তারগুলা ঝংকৃত হইতে লাগিল।

কালিকার কাড়াকাড়ি-করা সেই বিষবৃক্ষখানি নিচের বিছানায় পড়িয়া আছে। দেখিবামাত্র সেই কাড়াকাড়ির স্মৃতিতে মহেন্দ্রের মনে পুলকাবেশ জাগিয়া উঠিল। বিনোদিনী যে-বালিশ চাপিয়া শুইয়াছিল, সেই বালিশটা টানিয়া লইয়া মহেন্দ্র তাহাতে মাথা রাখিল; এবং বিষবৃক্ষখানি তুলিয়া লইয়া তাহার পাতা উলটাইতে লাগিল। ক্রমে কখন এক সময় পড়ায় মন লাগিয়া গেল, কখন পাঁচটা বাজিয়া গেল— হুঁশ হইল না।

এমন সময় একটি মোরাদাবাদি খুঞ্চের উপর থালায় ফল ও সন্দেশ এবং রেকাবে বরফচিনিসংযুক্ত সুগন্ধি দলিত খরমুজা লইয়া বিনোদিনী ঘরে প্রবেশ করিল এবং মহেন্দ্রের সম্মুখে রাখিয়া কহিল, "কী করিতেছ, ঠাকুরপো। তোমার হইল কী। পাঁচটা বাজিয়া গেছে, এখনো হাতমুখ-ধোয়া কাপড়-ছাড়া হইল না?"

মহেন্দ্রের মনে একটা ধাক্কা লাগিল। মহেন্দ্রের কী হইয়াছে, সে কি জিজ্ঞাসা করিবার বিষয়। বিনোদিনীর সে কি অগোচর থাকা উচিত। আজিকার দিন কি অন্য দিনেরই মতো। পাছে যাহা আশা করিয়াছিল, হঠাৎ তাহার উলটা কিছু দেখিতে পায়, এই ভয়ে মহেন্দ্র গতকল্যকার কথা স্মরণ করাইয়া কোনো দাবি উত্থাপন করিতে পারিল না।

মহেন্দ্র খাইতে বসিল। বিনোদিনী ছাদে-বিছানো রৌদ্রে-দেওয়া মহেন্দ্রের কাপড়গুলি দ্রুতপদে ঘরে বহিয়া আনিয়া নিপুণ হস্তে ভাঁজ করিয়া কাপড়ের আলমারির মধ্যে তুলিতে লাগিল।

মহেন্দ্র কহিল, "একটু রোসো, আমি খাইয়া উঠিয়া তোমার সাহায্য করিতেছি।"

বিনোদিনী জোড়হাত করিয়া কহিল, "দোহাই তোমার, আর যা কর সাহায্য করিয়ো না।"

মহেন্দ্র খাইয়া উঠিয়া কহিল, "বটে! আমাকে অকর্মণ্য ঠাওরাইয়াছ! আচ্ছা, আজ আমার পরীক্ষা হউক।" বলিয়া কাপড় ভাঁজ করিবার বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিল।

বিনোদিনী মহেন্দ্রের হাত হইতে কাপড় কাড়িয়া লইয়া কহিল, "ওগো মশায়, তুমি রাখো, আমার কাজ বাড়াইয়ো না।"

মহেন্দ্র কহিল, "তবে তুমি কাজ করিয়া যাও, আমি দেখিয়া শিক্ষালাভ করি।" বলিয়া আলমারির সম্মুখে বিনোদিনীর কাছে আসিয়া মাটিতে আসন করিয়া বসিল। বিনোদিনী কাপড় ঝাড়িবার ছলে একবার করিয়া মহেন্দ্রের পিঠের উপর আছড়াইয়া কাপড়গুলি পরিপাটিপূর্বক ভাঁজ করিয়া আলমারিতে তুলিতে লাগিল।

আজিকার মিলন এমনি করিয়া আরম্ভ হইল। মহেন্দ্র প্রত্যুষ হইতে যেরূপ কল্পনা করিতেছিল, সেই অপূর্বতার কোনো লক্ষণই নাই। এরূপ ভাবে মিলন কাব্যে লিখিবার, সংগীতে গাহিবার, উপন্যাসে রচিবার যোগ্য নহে। কিন্তু তবু মহেন্দ্র দুঃখিত হইল না, বরঞ্চ একটু আরাম পাইল। তাহার কাল্পনিক আদর্শকে কেমন করিয়া খাড়া করিয়া রাখিত, কিরূপ তাহার আয়োজন, কী কথা বলিত, কী ভাব প্রকাশ করিতে হইত, সকলপ্রকার সামান্যতাকে কী উপায়ে দূরে রাখিত, তাহা মহেন্দ্র ঠাওরাইতে পারিতেছিল না— এই কাপড় ঝাড়া ও ভাঁজ করার মধ্যে হাসি-তামাশা করিয়া সে যেন স্বরচিত একটা অসম্ভব দুরূহ আদর্শের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া বাঁচিল।

এমন সময় রাজলক্ষ্মী ঘরে প্রবেশ করিলেন। মহেন্দ্রকে কহিলেন, "মহিন, বউ কাপড় তুলিতেছে, তুই ওখানে বসিয়া কী করিতেছিস।"

বিনোদিনী কহিল, “দেখো তো পিসিমা, মিছামিছি কেবল আমার কাজে দেরি করাইয়া দিতেছেন।”

মহেন্দ্র কহিল, “বিলক্ষণ। আমি আরো ওঁর কাজে সাহায্য করিতেছিলাম।”

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “আমার কপাল! তুই আবার সাহায্য করিবি! জান বউ, মহিনের বরাবর ওইরকম। চিরকাল মা-খুড়ির আদর পাইয়া ও যদি কোনো কাজ নিজের হাতে করিতে পারে।”

এই বলিয়া মাতা পরমস্নেহে কর্মে-অপটু মহেন্দ্রের প্রতি নেত্রপাত করিলেন। কেমন করিয়া এই অকর্মণ্য একান্ত মাতৃস্নেহাপেক্ষী বয়স্ক সন্তানটিকে সর্বপ্রকার আরামে রাখিতে পারিবেন, বিনোদিনীর সহিত রাজলক্ষ্মীর সেই একমাত্র পরামর্শ। এই পুত্রসেবাব্যাপারে বিনোদিনীর প্রতি নির্ভর করিয়া তিনি নিতান্ত নিশ্চিন্ত, পরম সুখী। সম্প্রতি বিনোদিনীর মর্যাদা যে মহেন্দ্র বুঝিয়াছে এবং বিনোদিনীকে রাখিবার জন্য তাহার যত্ন হইয়াছে, ইহাতেও রাজলক্ষ্মী আনন্দিত। মহেন্দ্রকে শুনাইয়া শুনাইয়া তিনি কহিলেন, “বউ, আজ তো তুমি মহিনের গরম কাপড় রোদে দিয়া তুলিলে, কাল মহিনের নূতন রুমালগুলিতে উহার নামের অক্ষর সেলাই করিয়া দিতে হইবে। তোমাকে এখানে আনিয়া অবধি যত্ন-আদর করিতে পারিলাম না বাছা, কেবল খাটাইয়া মারিলাম।”

বিনোদিনী কহিল, “পিসিমা, অমন করিয়া যদি বল তবে বুঝিব, তুমি আমাকে পর ভাবিতেছ।”

রাজলক্ষ্মী আদর করিয়া কহিলেন, “আহা, মা, তোমার মতো আপন আমি পাব কোথায়।”

বিনোদিনীর কাপড়-তোলা শেষ হইলে রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “এখন কি তবে সেই চিনির রসটা চড়াইয়া দিব, না, এখন তোমার অন্য কাজ আছে?”

বিনোদিনী কহিল, “না, পিসিমা, অন্য কাজ আর কই। চলো, মিঠাইগুলি তৈরি করিয়া আসিগে।”

মহেন্দ্র কহিল, “মা, এইমাত্র অনুতাপ করিতেছিলে উহাকে খাটাইয়া মারিতেছ, আবার এখনই কাজে টানিয়া লইয়া চলিলে?”

রাজলক্ষ্মী বিনোদিনীর চিবুক স্পর্শ করিয়া কহিলেন, “আমাদের লক্ষ্মী মেয়ে যে কাজ করিতেই ভালোবাসে।”

মহেন্দ্র কহিল, “আজ সন্ধ্যাবেলায় আমার হাতে কোনো কাজ নাই, ভাবিয়াছিলাম বালিকে লইয়া একটা বই পড়িব।”

বিনোদিনী কহিল, "পিসিমা, বেশ তো, আজ সন্ধ্যাবেলা আমরা দু-জনেই ঠাকুরপোর বই-পড়া শুনিতে আসিব— কী বল।"

রাজলক্ষ্মী ভাবিলেন, "মহিন আমার নিতান্ত একলা পড়িয়াছে, এখন সকলে মিলিয়া তাহাকে ভুলাইয়া রাখা আবশ্যক।" কহিলেন, "তা বেশ তো, মহিনের খাবার-তৈরি শেষ করিয়া আমরা আজ সন্ধ্যাবেলা পড়া শুনিতে আসিব। কী বলিস, মহিন।"

বিনোদিনী মহেন্দ্রের মুখের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া একবার দেখিয়া লইল। মহেন্দ্র কহিল, "আচ্ছা।" কিন্তু তাহার আর উৎসাহ রহিল না। বিনোদিনী রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে-সঙ্গেই বাহির হইয়া গেল।

মহেন্দ্র রাগ করিয়া ভাবিল, "আমিও আজ বাহির হইয়া যাইব—দেরি করিয়া বাড়ি ফিরিব।" বলিয়া তখনই বাহিরে যাইবার কাপড় পরিল। কিন্তু সংকল্প কাজে পরিণত হইল না। মহেন্দ্র অনেকক্ষণ ধরিয়া ছাদে পায়চারি করিয়া বেড়াইল, সিঁড়ির দিকে অনেকবার চাহিল, শেষে ঘরের মধ্যে আসিয়া বসিয়া পড়িল। বিরক্ত হইয়া মনে মনে কহিল, "আমি আজ মিঠাই স্পর্শ না করিয়া মাকে জানাইয়া দিব, এত দীর্ঘকাল ধরিয়া চিনির রস জ্বাল দিলে তাহাতে মিষ্টত্ব থাকে না।"

আজ আহারের সময় বিনোদিনী রাজলক্ষ্মীকে সঙ্গে করিয়া আনিল। রাজলক্ষ্মী তাঁহার হাঁপানির ভয়ে প্রায় উপরে উঠিতে চান না, বিনোদিনী তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াই সঙ্গে আনিয়াছে। মহেন্দ্র অত্যন্ত গম্ভীর মুখে খাইতে বসিল।

বিনোদিনী কহিল, "ও কী ঠাকুরপো, আজ তুমি কিছুই খাইতেছ না যে।"

রাজলক্ষ্মী ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছু অসুখ করে নাই তো ?"

বিনোদিনী কহিল, "এত করিয়া মিঠাই করিলাম, কিছু মুখে দিতেই হইবে। ভালো হয়নি বুঝি ? তবে থাক্। না না, অনুরোধে পড়িয়া জোর করিয়া খাওয়া কিছু নয়। না না, কাজ নাই।"

মহেন্দ্র কহিল, "ভালো মুশকিলেই ফেলিলে। মিঠাইটাই সব চেয়ে খাইবার ইচ্ছা, লাগিতেছেও ভালো, তুমি বাধা দিলে শুনিব কেন।"

দুইটি মিঠাই মহেন্দ্র নিঃশেষপূর্বক খাইল— তাহার একটি দানা, একটু গুঁড়া পর্যন্ত ফেলিল না।

আহারান্তে তিন জনে মহেন্দ্রের শোবার ঘরে আসিয়া বসিলেন। পড়িবার প্রস্তাবটা মহেন্দ্র আর তুলিল না। রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "তুই যে কী বই পড়িবি বলিয়াছিলি, আরম্ভ কর্ না।"

বিনোদিনী কহিল, “দেখো তো পিসিমা, মিছামিছি কেবল আমার কাজে দেরি করাইয়া দিতেছেন।”

মহেন্দ্র কহিল, “বিলক্ষণ। আমি আরো ওঁর কাজে সাহায্য করিতেছিলাম।”

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “আমার কপাল! তুই আবার সাহায্য করিবি! জান বউ, মহিনের বরাবর ওইরকম। চিরকাল মা-খুড়ির আদর পাইয়া ও যদি কোনো কাজ নিজের হাতে করিতে পারে।”

এই বলিয়া মাতা পরমস্নেহে কর্মে-অপটু মহেন্দ্রের প্রতি নেত্রপাত করিলেন। কেমন করিয়া এই অকর্মণ্য একান্ত মাতৃস্নেহাপেক্ষী বয়স্ক সন্তানটিকে সর্বপ্রকার আরামে রাখিতে পারিবেন, বিনোদিনীর সহিত রাজলক্ষ্মীর সেই একমাত্র পরামর্শ। এই পুত্রসেবাব্যাপারে বিনোদিনীর প্রতি নির্ভর করিয়া তিনি নিতান্ত নিশ্চিন্ত, পরম সুখী। সম্প্রতি বিনোদিনীর মর্যাদা যে মহেন্দ্র বুঝিয়াছে এবং বিনোদিনীকে রাখিবার জন্য তাহার যত্ন হইয়াছে, ইহাতেও রাজলক্ষ্মী আনন্দিত। মহেন্দ্রকে শুনাইয়া শুনাইয়া তিনি কহিলেন, “বউ, আজ তো তুমি মহিনের গরম কাপড় রোদে দিয়া তুলিলে, কাল মহিনের নূতন রুমালগুলিতে উহার নামের অক্ষর সেলাই করিয়া দিতে হইবে। তোমাকে এখানে আনিয়া অবধি যত্ন-আদর করিতে পারিলাম না বাছা, কেবল খাটাইয়া মারিলাম।”

বিনোদিনী কহিল, “পিসিমা, অমন করিয়া যদি বল তবে বুঝিব, তুমি আমাকে পর ভাবিতেছ।”

রাজলক্ষ্মী আদর করিয়া কহিলেন, “আহা, মা, তোমার মতো আপন আমি পাব কোথায়।”

বিনোদিনীর কাপড়-তোলা শেষ হইলে রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “এখন কি তবে সেই চিনির রসটা চড়াইয়া দিব, না, এখন তোমার অন্য কাজ আছে?”

বিনোদিনী কহিল, “না, পিসিমা, অন্য কাজ আর কই। চলো, মিঠাইগুলি তৈরি করিয়া আসিগে।”

মহেন্দ্র কহিল, “মা, এইমাত্র অনুতাপ করিতেছিলে উহাকে খাটাইয়া মারিতেছ, আবার এখনই কাজে টানিয়া লইয়া চলিলে?”

রাজলক্ষ্মী বিনোদিনীর চিবুক স্পর্শ করিয়া কহিলেন, “আমাদের লক্ষ্মী মেয়ে যে কাজ করিতেই ভালোবাসে।”

মহেন্দ্র কহিল, “আজ সন্ধ্যাবেলায় আমার হাতে কোনো কাজ নাই, ভাবিয়াছিলাম বালিকে লইয়া একটা বই পড়িব।”

বিনোদিনী কহিল, “পিসিমা, বেশ তো, আজ সন্ধ্যাবেলা আমরা দু-জনেই ঠাকুরপোর বই-পড়া শুনিতে আসিব— কী বল।”

রাজলক্ষ্মী ভাবিলেন, “মহিন আমার নিতান্ত একলা পড়িয়াছে, এখন সকলে মিলিয়া তাহাকে ভুলাইয়া রাখা আবশ্যক।” কহিলেন, “তা বেশ তো, মহিনের খাবার-তৈরি শেষ করিয়া আমরা আজ সন্ধ্যাবেলা পড়া শুনিতে আসিব। কী বলিস, মহিন।”

বিনোদিনী মহেন্দ্রের মুখের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া একবার দেখিয়া লইল। মহেন্দ্র কহিল, “আচ্ছা।” কিন্তু তাহার আর উৎসাহ রহিল না। বিনোদিনী রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে-সঙ্গেই বাহির হইয়া গেল।

মহেন্দ্র রাগ করিয়া ভাবিল, “আমিও আজ বাহির হইয়া যাইব—দেরি করিয়া বাড়ি ফিরিব।” বলিয়া তখনই বাহিরে যাইবার কাপড় পরিল। কিন্তু সংকল্প কাজে পরিণত হইল না। মহেন্দ্র অনেকক্ষণ ধরিয়া ছাদে পায়চারি করিয়া বেড়াইল, সিঁড়ির দিকে অনেকবার চাহিল, শেষে ঘরের মধ্যে আসিয়া বসিয়া পড়িল। বিরক্ত হইয়া মনে মনে কহিল, “আমি আজ মিঠাই স্পর্শ না করিয়া মাকে জানাইয়া দিব, এত দীর্ঘকাল ধরিয়া চিনির রস জ্বাল দিলে তাহাতে মিষ্টত্ব থাকে না।”

আজ আহারের সময় বিনোদিনী রাজলক্ষ্মীকে সঙ্গে করিয়া আনিল। রাজলক্ষ্মী তাঁহার হাঁপানির ভয়ে প্রায় উপরে উঠিতে চান না, বিনোদিনী তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াই সঙ্গে আনিয়াছে। মহেন্দ্র অত্যন্ত গম্ভীর মুখে খাইতে বসিল।

বিনোদিনী কহিল, “ও কী ঠাকুরপো, আজ তুমি কিছুই খাইতেছ না যে।”

রাজলক্ষ্মী ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কিছু অসুখ করে নাই তো?”

বিনোদিনী কহিল, “এত করিয়া মিঠাই করিলাম, কিছু মুখে দিতেই হইবে। ভালো হয়নি বুঝি? তবে থাক্। না না, অনুরোধে পড়িয়া জোর করিয়া খাওয়া কিছু নয়। না না, কাজ নাই।”

মহেন্দ্র কহিল, “ভালো মুশকিলেই ফেলিলে। মিঠাইটাই সব চেয়ে খাইবার ইচ্ছা, লাগিতেছেও ভালো, তুমি বাধা দিলে শুনিব কেন।”

দুইটি মিঠাই মহেন্দ্র নিঃশেষপূর্বক খাইল— তাহার একটি দানা, একটু গুঁড়া পর্যন্ত ফেলিল না।

আহারান্তে তিন জনে মহেন্দ্রের শোবার ঘরে আসিয়া বসিলেন। পড়িবার প্রস্তাবটা মহেন্দ্র আর তুলিল না। রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “তুই যে কী বই পড়িবি বলিয়াছিলি, আরম্ভ কর্ না।”

মহেন্দ্র কহিল, "কিন্তু তাহাতে ঠাকুর-দেবতার কথা কিছুই নাই, তোমার শুনিতে ভালো লাগিবে না।"

ভালো লাগিবে না! যেমন করিয়া হোক, ভালো লাগিবার জন্য রাজলক্ষ্মী কৃতসংকল্প। মহেন্দ্র যদি তুর্কি ভাষাও পড়ে, তাঁহার ভালো লাগিতেই হইবে! আহা বেচারা মহিন, বউ কাশী গেছে, একলা পড়িয়া আছে— তাহার যা ভালো লাগিবে মাতার তাহা ভালো না লাগিলে চলিবে কেন।

বিনোদিনী কহিল, "এক কাজ করো-না ঠাকুরপো, পিসিমার ঘরে বাংলা শান্তিশতক আছে, অন্য বই রাখিয়া আজ সেইটে পড়িয়া শোনাও না। পিসিমারও ভালো লাগিবে, সন্ধ্যাটাও কাটিবে ভালো।"

মহেন্দ্র নিতান্ত করুণভাবে একবার বিনোদিনীর মুখের দিকে চাহিল। এমন সময় ঝি আসিয়া খবর দিল, "মা, কায়েত-ঠাকরুন আসিয়া তোমার ঘরে বসিয়া আছেন।"

কায়েত-ঠাকরুন রাজলক্ষ্মীর অন্তরঙ্গ বন্ধু। সন্ধ্যার পর তাঁহার সঙ্গে গল্প করিবার প্রলোভন সংবরণ করা রাজলক্ষ্মীর পক্ষে দুঃসাধ্য। তবু ঝিকে বলিলেন, "কায়েত-ঠাকরুনকে বল্, আজ মহিনের ঘরে আমার একটু কাজ আছে, কাল তিনি যেন অবশ্য-অবশ্য করিয়া আসেন।"

মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি কহিল, "কেন মা, তুমি তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়াই এসো-না।"

বিনোদিনী কহিল, "কাজ কী পিসিমা, তুমি এখানে থাকো, আমি বরঞ্চ কায়েত ঠাকরুনের কাছে গিয়া বসিগে।"

রাজলক্ষ্মী প্রলোভন সংবরণ করিতে না পারিয়া কহিলেন, "বউ, তুমি ততক্ষণ এখানে বোসো—দেখি, যদি কায়েত-ঠাকরুনকে বিদায় করিয়া আসিতে পারি। তোমরা পড়া আরম্ভ করিয়া দাও—আমার জন্য অপেক্ষা করিয়ো না।"

রাজলক্ষ্মী ঘরের বাহির হইবামাত্র মহেন্দ্র আর থাকিতে পারিল না— বলিয়া উঠিল, "কেন তুমি আমাকে ইচ্ছা করিয়া এমন করিয়া মিছামিছি পীড়ন কর।"

বিনোদিনী যেন আশ্চর্য হইয়া কহিল, "সে কী, ভাই! আমি তোমাকে পীড়ন কী করিলাম। তবে কি তোমার ঘরে আসা আমার দোষ হইয়াছে। কাজ নাই, আমি যাই।" বলিয়া বিমর্ষমুখে উঠিবার উপক্রম করিল।

মহেন্দ্র তাহার হাত ধরিয়া ফেলিয়া কহিল, "অমনি করিয়াই তো তুমি আমাকে দগ্ধ কর।"

বিনোদিনী কহিল, "ইস, আমার যে এত তেজ, তাহা তো আমি জানিতাম না।

তোমারও তো প্রাণ কঠিন কম নয়, অনেক সহ্য করিতে পার। খুব যে ঝলসিয়া-পুড়িয়া গেছ, চেহারা দেখিয়া তাহা কিছু বুঝিবার জো নাই।”

মহেন্দ্র কহিল, “চেহারায় কী বুঝিবে।” বলিয়া বিনোদিনীর হাত বলপূর্বক লইয়া নিজের বুকের উপর চাপিয়া ধরিল।

বিনোদিনী “উঃ” বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেই মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি হাত ছাড়িয়া দিয়া কহিল, “লাগিল কি।”

দেখিল, কাল বিনোদিনীর হাতের যেখানটা কাটিয়া গিয়াছিল, সেইখান দিয়া আবার রক্ত পড়িতে লাগিল। মহেন্দ্র অনুতপ্ত হইয়া কহিল, “আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম— ভারি অন্যায় করিয়াছি। আজ কিন্তু এখনই তোমার ও-জায়গাটা বাঁধিয়া ওষুধ লাগাইয়া দিব— কিছুতেই ছাড়িব না।”

বিনোদিনী কহিল, “না, ও কিছুই না। আমি ওষুধ দিব না।”

মহেন্দ্র কহিল, “কেন দিবে না।”

বিনোদিনী কহিল, “কেন আবার কী। তোমার আর ডাক্তারি করিতে হইবে না, ও যেমন আছে থাক্।”

মহেন্দ্র মুহূর্তের মধ্যে গম্ভীর হইয়া গেল— মনে মনে কহিল, “কিছুই বুঝিবার জো নাই। স্ত্রীলোকের মন।”

বিনোদিনী উঠিল। অভিমানী মহেন্দ্র বাধা না দিয়া কহিল, “কোথায় যাইতেছ।”

বিনোদিনী কহিল, “কাজ আছে।” বলিয়া ধীরপদে চলিয়া গেল।

মিনিটখানেক বসিয়াই মহেন্দ্র বিনোদিনীকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য দ্রুত উঠিয়া পড়িল; সিঁড়ির কাছ পর্যন্ত গিয়াই ফিরিয়া আসিয়া একলা ছাদে বেড়াইতে লাগিল।

বিনোদিনী অহরহ আকর্ষণও করে, অথচ বিনোদিনী এক মুহূর্ত কাছে আসিতেও দেয় না। অন্যে তাহাকে জিনিতে পারে না, এ গর্ব মহেন্দ্রের ছিল, তাহা সে সম্প্রতি বিসর্জন দিয়াছে,— কিন্তু চেষ্টা করিলেই অন্যকে সে জিনিতে পারে, এ গর্বটুকুও কি রাখিতে পারিবে না। আজ সে হার মানিল, অথচ হার মানাইতে পারিল না। হৃদয়ক্ষেত্রে মহেন্দ্রের মাথা বড়ো উচ্চেই ছিল— সে কাহাকেও আপনার সমকক্ষ বলিয়া জানিত না— আজ সেইখানেই তাহাকে ধুলায় মাথা লুটাইতে হইল। যে শ্রেষ্ঠতা হারাইল তাহার বদলে কিছু পাইলও না। ভিক্ষুকের মতো রুদ্ধ দ্বারের সম্মুখে সন্ধ্যার সময় রিক্তহস্তে পথে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল।

ফাল্গুন-চৈত্রমাসে বিহারীদের জমিদারি হইতে সরষে-ফুলের মধু আসিত, প্রতিবৎসরই সে তাহা রাজলক্ষ্মীকে পাঠাইয়া দিত— এবারও পাঠাইয়া দিল।

বিনোদিনী মধুভাণ্ড লইয়া স্বয়ং রাজলক্ষ্মীর কাছে গিয়া কহিল, "পিসিমা, বিহারী-ঠাকুরপো মধু পাঠাইয়াছেন।"

রাজলক্ষ্মী তাহা ভাঁড়ারে তুলিয়া রাখিতে উপদেশ দিলেন। বিনোদিনী মধু তুলিয়া আসিয়া রাজলক্ষ্মীর কাছে বসিল। কহিল, "বিহারী-ঠাকুরপো কখনো তোমাদের তত্ত্ব লইতে ভোলেন না। বেচারার নিজের মা নাই নাকি, তাই তোমাকেই মার মতো দেখেন।"

বিহারীকে রাজলক্ষ্মী এমনি মহেন্দ্রের ছায়া বলিয়া জানিতেন যে, তাহার কথা তিনি বিশেষ-কিছু ভাবিতেন না— সে তাঁহাদের বিনা-মূল্যের বিনা যত্নের বিনা-চিন্তার অনুগত লোক ছিল। বিনোদিনী যখন রাজলক্ষ্মীকে মাতৃহীন বিহারীর মাতৃস্থানীয়া বলিয়া উল্লেখ করিল, তখন রাজলক্ষ্মীর মাতৃহৃদয় অকস্মাৎ স্পর্শ করিল। হঠাৎ মনে হইল, "তা বটে, বিহারীর মা নাই এবং আমাকেই সে মার মতো দেখে।" মনে পড়িল, রোগে তাপে সংকটে বিহারী বরাবর বিনা-আহ্বানে, বিনা-আড়ম্বরে তাঁহাকে নিঃশব্দ নিষ্ঠার সহিত সেবা করিয়াছে; রাজলক্ষ্মী তাহা নিশ্বাসপ্রশ্বাসের মতো সহজে গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেজন্য কাহারও কাছে কৃতজ্ঞ হওয়ার কথা তাঁহার মনেও উদয় হয় নাই। কিন্তু বিহারীর খোঁজখবর কে রাখিয়াছে। যখন অন্নপূর্ণা ছিলেন তিনি রাখিতেন বটে— রাজলক্ষ্মী ভাবিতেন, "বিহারীকে বশে রাখিবার জন্য অন্নপূর্ণা স্নেহের আড়ম্বর করিতেছেন।"

রাজলক্ষ্মী আজ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "বিহারী আমার আপন ছেলের মতোই বটে।"

বলিয়াই মনে উদয় হইল, বিহারী তাঁহার আপন ছেলের চেয়ে ঢের বেশি করে— এবং কখনো বিশেষ কিছু প্রতিদান না পাইয়াও তাঁহাদের প্রতি সে ভক্তি স্থির রাখিয়াছে। ইহা ভাবিয়া তাঁহার অন্তরের মধ্য হইতে দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

বিনোদিনী কহিল, "বিহারী-ঠাকুরপো তোমার হাতের রান্না খাইতে বড়ো ভালোবাসেন।"

রাজলক্ষ্মী সস্নেহগর্বে কহিলেন, "আর-কারো মাছের ঝোল তাহার মুখে রোচে না।"

বলিতে বলিতে মনে পড়িল, অনেক দিন বিহারী আসে নাই। কহিলেন, "আচ্ছা বউ, বিহারীকে আজকাল দেখিতে পাই না কেন।"

বিনোদিনী কহিল, "আমিও তো তাই ভাবিতেছিলাম, পিসিমা। তা, তোমার

ছেলেটি বিবাহের পর হইতে নিজের বউকে লইয়াই এমনি মাতিয়া রহিয়াছে— বন্ধুবান্ধবরা আসিয়া আর কী করিবে বলো।”

কথাটা রাজলক্ষ্মীর অত্যন্ত সংগত বোধ হইল। স্ত্রীকে লইয়া মহেন্দ্র তাহার সমস্ত হিতৈষীদের দূর করিয়াছে। বিহারীর তো অভিমান হইতেই পারে— কেন সে আসিবে। বিহারীকে নিজের দলে পাইয়া তাহার প্রতি রাজলক্ষ্মীর সমবেদনা বাড়িয়া উঠিল। বিহারী যে ছেলেবেলা হইতে একান্ত নিঃস্বার্থভাবে মহেন্দ্রের কত উপকার করিয়াছে, তাহার জন্য কতবার কত কষ্ট সহ্য করিয়াছে, সে সমস্ত তিনি বিনোদিনীর কাছে বিবৃত করিয়া বলিতে লাগিলেন— ছেলের উপর তাঁহার নিজের যা নালিশ তা বিহারীর বিবরণ দ্বারা সমর্থন করিতে লাগিলেন। দু-দিন বউকে পাইয়া মহেন্দ্র যদি তাহার চিরকালের বন্ধুকে এমন অনাদর করে, তবে সংসারে ন্যায়ধর্ম আর রহিল কোথায়।

বিনোদিনী কহিল, “কাল রবিবার আছে, তুমি বিহারী-ঠাকুরপোকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াও, তিনি খুশি হইবেন।”

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “ঠিক বলিয়াছ বউ, তা হইলে মহিনকে ডাকাই, সে বিহারীকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইবে।”

বিনোদিনী। না পিসিমা, তুমি নিজে নিমন্ত্রণ করো।

রাজলক্ষ্মী। আমি কি তোমাদের মতো লিখিতে পড়িতে জানি।

বিনোদিনী। তা হোক, তোমার হইয়া না-হয় আমিই লিখিয়া দিতেছি।

বিনোদিনী রাজলক্ষ্মীর নাম দিয়া নিজেই নিমন্ত্রণ চিঠি লিখিয়া পাঠাইল।

রবিবার দিন মহেন্দ্রের অত্যন্ত আগ্রহের দিন। পূর্বরাত্রি হইতেই তাহার কল্পনা উদ্দাম হইয়া উঠিতে থাকে, যদিও এ-পর্যন্ত তাহার কল্পনার অনুরূপ কিছুই হয় নাই— তবু রবিবারের ভোরের আলো তাহার চক্ষে মধুবর্ষণ করিতে লাগিল। জাগ্রত নগরীর সমস্ত কোলাহল তাহার কানে অপরূপ সংগীতের মতো আসিয়া প্রবেশ করিল।

কিন্তু ব্যাপারখানা কী। মার আজ কোনো ব্রত আছে নাকি। অন্যদিনের মতো বিনোদিনীর প্রতি গৃহকর্মের ভার দিয়া তিনি তো বিশ্রাম করিতেছেন না। আজ তিনি নিজেই ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেছেন।

এই হাঙ্গামে দশটা বাজিয়া গেল— ইতিমধ্যে মহেন্দ্র কোনো ছুতায় বিনোদিনীর সঙ্গে এক মুহূর্ত বিরলে দেখা করিতে পারিল না। বই পড়িতে চেষ্টা করিল, পড়ায় কিছুতেই মন বসিল না— খবরের কাগজের একটা অনাবশ্যক বিজ্ঞাপনে পনেরো

মিনিট দৃষ্টি আবদ্ধ হইয়া রহিল। আর থাকিতে পারিল না। নিচে গিয়া দেখিল, মা তাঁহার ঘরের বারান্দায় একটা তোলা উনানে রাঁধিতেছেন এবং বিনোদিনী কটিদেশে দৃঢ় করিয়া আঁচল জড়াইয়া জোগান দিতে ব্যস্ত।

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, “আজ তোমাদের ব্যাপারটা কী। এত ধুমধাম যে।”

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “বউ তোমাকে বলে নাই? আজ যে বিহারীকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি।”

বিহারীকে নিমন্ত্রণ! মহেন্দ্রের সর্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ কহিল, “কিন্তু মা, আমি তো থাকিতে পারিব না।”

রাজলক্ষ্মী। কেন।

মহেন্দ্র। আমায় যে বাহিরে যাইতে হইবে।

রাজলক্ষ্মী। খাওয়াদাওয়া করিয়া যাস, বেশি দেরি হইবে না।

মহেন্দ্র। আমার যে বাহিরে নিমন্ত্রণ আছে।

বিনোদিনী মুহূর্তের জন্য মহেন্দ্রের মুখে কটাক্ষপাত করিয়া কহিল, “যদি নিমন্ত্রণ থাকে, তা হইলে উনি যান-না, পিসিমা। না-হয় আজ বিহারী-ঠাকুরপো একলাই খাইবেন।”

কিন্তু নিজের হাতের যত্নের রান্না মহিনকে খাওয়াইতে পারিবেন না, ইহা রাজলক্ষ্মীর সহিবে কেন। তিনি যতই পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, মহিন ততই বাঁকিয়া দাঁড়াইল। “অত্যন্ত জরুরি নিমন্ত্রণ, কিছুতেই কাটাইবার জো নাই— বিহারীকে নিমন্ত্রণ করিবার পূর্বে আমার সহিত পরামর্শ করা উচিত ছিল” ইত্যাদি।

রাগ করিয়া মহেন্দ্র এইরূপে মাকে শাস্তি দিবার ব্যবস্থা করিল। রাজলক্ষ্মীর সমস্ত উৎসাহ চলিয়া গেল। তাঁহার ইচ্ছা হইল, রান্না ফেলিয়া তিনি চলিয়া যান। বিনোদিনী কহিল, “পিসিমা, তুমি কিছু ভাবিয়ো না— ঠাকুরপো মুখে আস্ফালন করিতেছেন, কিন্তু আজ উঁহার বাহিরে নিমন্ত্রণে যাওয়া হইতেছে না।”

রাজলক্ষ্মী মাথা নাড়িয়া কহিলেন, “না বাছা, তুমি মহিনকে জান না, ও যা একবার ধরে তা কিছুতেই ছাড়ে না।”

কিন্তু বিনোদিনী মহেন্দ্রকে রাজলক্ষ্মীর চেয়ে কম জানে না, তাহাই প্রমাণ হইল। মহেন্দ্র বুঝিয়াছিল, বিহারীকে বিনোদিনীই নিমন্ত্রণ করাইয়াছে। ইহাতে তাহার হৃদয় ঈর্ষায় যতই পীড়িত হইতে লাগিল, ততই তাহার পক্ষে দূরে যাওয়া কঠিন হইল। বিহারী কী করে, বিনোদিনী কী করে, তাহা না দেখিয়া সে বাঁচিবে কী করিয়া। দেখিয়া জ্বলিতে হইবে, কিন্তু দেখাও চাই।

বিহারী আজ অনেক দিন পরে নিমন্ত্রিত-আত্মীয়ভাবে মহেন্দ্রের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। বাল্যকাল হইতে যে ঘর তাহার পরিচিত এবং যেখানে সে ঘরের ছেলের মতো অবারিতভাবে প্রবেশ করিয়া দৌরাত্ম্য করিয়াছে, তাহার দ্বারের কাছে আসিয়া মুহূর্তের জন্য সে থমকিয়া দাঁড়াইল— একটা অশ্রুতরঙ্গ পলকের মধ্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবার জন্য তাহার বক্ষকবাটে আঘাত করিল। সেই আঘাত সংবরণ করিয়া লইয়া সে স্মিতহাস্যে ঘরে প্রবেশ করিয়া সদ্যঃস্নাতা রাজলক্ষ্মীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পায়ের ধুলা লইল। বিহারী যখন সর্বদা যাতায়াত করিত, তখন এরূপ অভিবাদন তাহাদের প্রথা ছিল না। আজ যেন সে বহুদূরপ্রবাস হইতে পুনর্বার ঘরে ফিরিয়া আসিল। বিহারী প্রণাম করিয়া উঠিবার সময় রাজলক্ষ্মী সস্নেহে তাহার মাথায় হস্তস্পর্শ করিলেন।

রাজলক্ষ্মী আজ নিগূঢ় সহানুভূতিবশত বিহারীর প্রতি পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি আদর ও স্নেহ প্রকাশ করিলেন। কহিলেন, "ও বেহারি, তুই এতদিন আসিস নাই কেন। আমি রোজ মনে করিতাম, আজ নিশ্চয় বেহারি আসিবে, কিন্তু তোর আর দেখা নাই।"

বিহারী হাসিয়া কহিল, "রোজ আসিলে তো তোমার বিহারীকে রোজ মনে করিতে না, মা। মহিনদা কোথায়।"

রাজলক্ষ্মী বিমর্ষ হইয়া কহিলেন, "মহিনের আজ কোথায় নিমন্ত্রণ আছে, সে আজ কিছুতেই থাকিতে পারিল না।"

শুনিবামাত্র বিহারীর মনটা বিকল হইয়া গেল। আশৈশব প্রণয়ের শেষ এই পরিণাম? একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মন হইতে সমস্ত বিষাদবাষ্প উপস্থিতমতো তাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া বিহারী জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কী রান্না হইয়াছে শুনি।" বলিয়া তাহার নিজের প্রিয় ব্যঞ্জনগুলির কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। রাজলক্ষ্মীর রন্ধনের দিন বিহারী কিছু অতিরিক্ত আড়ম্বর করিয়া নিজেকে লুব্ধ বলিয়া পরিচয় দিত— আহারলোলুপতা দেখাইয়া বিহারী মাতৃহৃদয়শালিনী রাজলক্ষ্মীর স্নেহ কাড়িয়া লইত। আজও তাঁহার স্বরচিত ব্যঞ্জন সম্বন্ধে বিহারীর অতিমাত্রায় কৌতূহল দেখিয়া, রাজলক্ষ্মী হাসিতে হাসিতে তাঁহার লোভাতুর অতিথিকে আশ্বাস দিলেন।

এমন সময় মহেন্দ্র আসিয়া বিহারীকে শুষ্কস্বরে দস্তুরমতো জিজ্ঞাসা করিল, "কী বিহারী, কেমন আছ।"

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "কই মহিন, তুই তোর নিমন্ত্রণে গেলি না।"

মহেন্দ্র লজ্জা ঢাকিতে চেষ্টা করিয়া কহিল, "না, সেটা কাটাইয়া দেওয়া গেছে।"

স্নান করিয়া আসিয়া বিনোদিনী যখন দেখা দিল, তখন বিহারী প্রথমটা কিছুই বলিতে পারিল না। বিনোদিনী ও মহেন্দ্রের যে-দৃশ্য সে দেখিয়াছিল, তাহা তাহার মনে মুদ্রিত ছিল।

বিনোদিনী বিহারীর অনতিদূরে আসিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "কী ঠাকুরপো, একেবারে চিনিতেই পার না নাকি।"

বিহারী কহিল, "সকলকেই কি চেনা যায়।"

বিনোদিনী কহিল, "একটু বিবেচনা থাকিলেই যায়।" বলিয়া খবর দিল, "পিসিমা, খাবার প্রস্তুত হইয়াছে।"

মহেন্দ্র-বিহারী খাইতে বসিল; রাজলক্ষ্মী অদূরে বসিয়া দেখিতে লাগিলেন এবং বিনোদিনী পরিবেষণ করিতে লাগিল।

মহেন্দ্রের খাওয়ায় মনোযোগ ছিল না, সে কেবল পরিবেষণে পক্ষপাত লক্ষ্য করিতে লাগিল। মহেন্দ্রের মনে হইল, বিহারীকে পরিবেষণ করিয়া বিনোদিনী যেন একটা বিশেষ সুখ পাইতেছে। বিহারীর পাতেই যে বিশেষ করিয়া মাছের মুড়া ও দধির সর পড়িল, তাহার উত্তম কৈফিয়ত ছিল— মহেন্দ্র ঘরের ছেলে, বিহারী নিমন্ত্রিত। কিন্তু মুখ ফুটিয়া নালিশ করিবার ভালো হেতুবাদ ছিল না বলিয়াই মহেন্দ্র আরো বেশি করিয়া জ্বলিতে লাগিল। অসময়ে বিশেষ সন্ধানে তপসিমাছ পাওয়া গিয়াছিল, তাহার মধ্যে একটি ডিমওয়ালা ছিল; সেই মাছটি বিনোদিনী বিহারীর পাতে দিতে গেলে বিহারী কহিল, "না না, মহিনদাকে দাও, মহিনদা ভালোবাসে।" মহেন্দ্র তীব্র অভিমানে বলিয়া উঠিল, "না না, আমি চাই না।" শুনিয়া বিনোদিনী দ্বিতীয় বার অনুরোধ মাত্র না করিয়া সে-মাছ বিহারীর পাতে ফেলিয়া দিল।

আহারান্তে দুই বন্ধু উঠিয়া ঘরের বাহিরে আসিলে বিনোদিনী তাড়াতাড়ি আসিয়া কহিল, "বিহারী-ঠাকুরপো, এখনই যাইয়ো না, উপরের ঘরে একটু বসিবে চলো।"

বিহারী কহিল, "তুমি খাইতে যাইবে না?"

বিনোদিনী কহিল, "না, আজ একাদশী।"

নিষ্ঠুর বিদ্রূপের একটি সূক্ষ্ম হাস্যরেখা বিহারীর ওষ্ঠপ্রান্তে দেখা দিল— তাহার অর্থ এই যে, একাদশী-করাও আছে। অনুষ্ঠানের ত্রুটি নাই।

সেই হাস্যের আভাসটুকু বিনোদিনীর দৃষ্টি এড়ায় নাই— তবু সে যেমন তাহার

হাতের কাটা ঘা সহ্য করিয়াছিল, তেমনি করিয়া ইহাও সহ্য করিল। নিতান্ত মিনতির স্বরে কহিল, “আমার মাথা খাও, একবার বসিবে চলো।”

মহেন্দ্র হঠাৎ অসংগতভাবে উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল, “তোমাদের কিছুই তো বিবেচনা নাই— কাজ থাক্ কর্ম থাক্, ইচ্ছা থাক্ বা না থাক্, তবু বসিতেই হইবে। এত অধিক আদরের আমি তো কোনো মানে বুঝিতে পারি না।”

বিনোদিনী উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। কহিল, “বিহারী-ঠাকুরপো, শোনো একবার, তোমার মহিনদার কথা শোনো। আদরের মানে আদর, অভিধানে তাহার আর কোনো দ্বিতীয় মানে লেখে না।” (মহেন্দ্রের প্রতি) “যাই বল ঠাকুরপো, অধিক আদরের মানে শিশুকাল হইতে তুমি যত পরিষ্কার বোঝ, এমন আর কেহ বোঝে না।”

বিহারী কহিল, “মহিনদা, একটা কথা আছে, একবার শুনিয়া যাও।” বলিয়া বিহারী বিনোদিনীকে কোনো বিদায়সম্ভাষণ না করিয়া মহেন্দ্রকে লইয়া বাহিরে গেল। বিনোদিনী বারান্দার রেলিং ধরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া শূন্য উঠানের শূন্যতার দিকে তাকাইয়া রহিল।

বিহারী বাহিরে আসিয়া কহিল, “মহিনদা, আমি জানিতে চাই, এইখানেই কি আমাদের বন্ধুত্ব শেষ হইল।”

মহেন্দ্রের বুকের ভিতর তখন জ্বলিতেছিল, বিনোদিনীর পরিহাস-হাস্য বিদ্যুৎ-শিখার মতো তাহার মস্তিষ্কের এক প্রান্ত হইতে আর-এক প্রান্ত বারংবার ফিরিয়া ফিরিয়া বিঁধিতেছিল— সে কহিল, “মিটমাট হইলে তোমার তাহাতে বিশেষ সুবিধা হইতে পারে, কিন্তু আমার কাছে তাহা প্রার্থনীয় বোধ হয় না। আমার সংসারের মধ্যে আমি বাহিরের লোক ঢুকাইতে চাই না— অন্তঃপুরকে আমি অন্তঃপুর রাখিতে চাই।”

বিহারী কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল।

ঈর্ষাজর্জর মহেন্দ্র একবার প্রতিজ্ঞা করিল বিনোদিনীর সঙ্গে দেখা করিব না— তাহার পরে বিনোদিনীর সহিত সাক্ষাতের প্রত্যাশায় ঘরে-বাহিরে, উপরে-নিচে ছটফট করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

২৯

আশা একদিন অন্নপূর্ণাকে জিজ্ঞাসা করিল, “আচ্ছা মাসিমা, মেসোমশায়কে তোমার মনে পড়ে?”

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "আমি এগারো বৎসর বয়সে বিধবা হইয়াছি, স্বামীর মূর্তি ছায়ার মতো মনে হয়।"

আশা জিজ্ঞাসা করিল, "মাসি, তবে তুমি কাহার কথা ভাব।"

অন্নপূর্ণা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "আমার স্বামী এখন যাঁহার মধ্যে আছেন, সেই ভগবানের কথা ভাবি।"

আশা কহিল, "তাহাতে তুমি সুখ পাও?"

অন্নপূর্ণা সস্নেহে আশার মাথায় হাত বুলাইয়া কহিলেন, "আমার সে মনের কথা তুই কী বুঝিবি বাছা। সে আমার মন জানে, আর যাঁর কথা ভাবি তিনিই জানেন।"

আশা মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "আমি যাঁর কথা রাত্রিদিন ভাবি, তিনি কি আমার মনের কথা জানেন না। আমি ভালো করিয়া চিঠি লিখিতে পারি না বলিয়া তিনি কেন আমাকে চিঠি লেখা ছাড়িয়া দিয়াছেন।"

আশা কয়দিন মহেন্দ্রের চিঠি পায় নাই। নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে সে ভাবিল, "চোখের বালি যদি হাতের কাছে থাকিত, সে আমার মনের কথা ঠিকমতো করিয়া লিখিয়া দিতে পারিত।"

কুলিখিত তুচ্ছপত্র স্বামীর কাছে আদর পাইবে না মনে করিয়া চিঠি লিখিতে কিছুতে আশার হাত সরিত না। যতই যত্ন করিয়া লিখিতে চাহিত, ততই তাহার অক্ষর খারাপ হইয়া যাইত। মনের কথা যতই ভালো করিয়া গুছাইয়া লইবার চেষ্টা করিত ততই তাহার পদ কোনোমতেই সম্পূর্ণ হইত না। যদি একটিমাত্র "শ্রীচরণেষু" লিখিয়া নাম সহি করিলেই মহেন্দ্র অন্তর্যামী দেবতার মতো সকল কথা বুঝিতে পারিত, তাহা হইলেই আশার চিঠিলেখা সার্থক হইত। বিধাতা এতখানি ভালোবাসা দিয়াছিলেন, একটুখানি ভাষা দেন নাই কেন।

মন্দিরে সন্ধ্যারতির পরে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া আশা অন্নপূর্ণার পায়ের কাছে বসিয়া আস্তে আস্তে তাঁহার পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। অনেকক্ষণ নিঃশব্দের পর বলিল, "মাসি, তুমি যে বল, স্বামীকে দেবতার মতো করিয়া সেবা করা স্ত্রীর ধর্ম, কিন্তু যে স্ত্রী মূর্খ, যাহার বুদ্ধি নাই, কেমন করিয়া স্বামীর সেবা করিতে হয় যে জানে না, সে কী করিবে।"

অন্নপূর্ণা কিছুক্ষণ আশার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন— একটি চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "বাছা, আমিও তো মূর্খ, তবুও তো ভগবানের সেবা করিয়া থাকি।"

আশা কহিল, “তিনি যে তোমার মন জানেন, তাই খুশি হন। কিন্তু মনে করো, স্বামী যদি মূর্খের সেবায় খুশি না হন।”

অন্নপূর্ণা কহিলেন, “সকলকে খুশি করিবার শক্তি সকলের থাকে না, বাছা। স্ত্রী যদি আন্তরিক শ্রদ্ধাভক্তিযত্নের সঙ্গে স্বামীর সেবা ও সংসারের কাজ করে, তবে স্বামী তাহা তুচ্ছ করিয়া ফেলিয়া দিলেও স্বয়ং জগদীশ্বর তাহা কুড়াইয়া লন।”

আশা নিরুত্তরে চুপ করিয়া রহিল। মাসির এই কথা হইতে সান্ত্বনা গ্রহণের অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু স্বামী যাহাকে তুচ্ছ করিয়া ফেলিয়া দিবেন, জগদীশ্বরও যে তাহাকে সার্থকতা দিতে পারিবেন, এ-কথা কিছুতেই তাহার মনে লইল না। সে নতমুখে বসিয়া তাহার মাসির পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

অন্নপূর্ণা তখন আশার হাত ধরিয়া তাহাকে আরো কাছে টানিয়া লইলেন; তাহার মস্তকচুম্বন করিলেন; রুদ্ধকণ্ঠকে দৃঢ়চেষ্টায় বাধামুক্ত করিয়া কহিলেন, “চুনি, দুঃখে কষ্টে যে-শিক্ষালাভ হয় শুধু কানে শুনিয়া তাহা পাইবি না। তোর এই মাসিও একদিন তোর বয়সে তোরি মতো সংসারের সঙ্গে মস্ত করিয়া দেনাপাওনার সম্পর্ক পাতিয়া বসিয়াছিল। তখন আমিও তোরই মতো মনে করিতাম, যাহার সেবা করিব তাহার সন্তোষ না জন্মিবে কেন। যাহার পূজা করিব তাহার প্রসাদ না পাইব কেন। যাহার ভালোর চেষ্টা করিব, সে আমার চেষ্টাকে ভালো বলিয়া না বুঝিবে কেন। পদে পদে দেখিলাম, সেরূপ হয় না। অবশেষে একদিন অসহ্য হইয়া মনে হইল, পৃথিবীতে আমার সমস্তই ব্যর্থ হইয়াছে— সেইদিনই সংসার ত্যাগ করিয়া আসিলাম। আজ দেখিতেছি, আমার কিছুই নিষ্ফল হয় নাই। ওরে বাছা, যাঁর সঙ্গে আসল দেনাপাওনার সম্পর্ক, যিনি এই সংসার-হাটের মূল মহাজন, তিনিই আমার সমস্তই লইতেছিলেন, হৃদয়ে বসিয়া আজ সে-কথা স্বীকার করিয়াছেন। তখন যদি জানিতাম! যদি তাঁর কর্ম্ম বলিয়া সংসারের কর্ম করিতাম, তাঁকে দিলাম বলিয়াই সংসারকে হৃদয় দিতাম, তা হইলে কে আমাকে দুঃখ দিতে পারিত।”

আশা বিছানায় শুইয়া শুইয়া অনেক রাত্রি পর্যন্ত অনেক কথা ভাবিল, তবু ভালো করিয়া কিছুই বুঝিতে পারিল না। কিন্তু পুণ্যবতী মাসির প্রতি তাহার অসীম ভক্তি ছিল, সেই মাসির কথা সম্পূর্ণ না বুঝিলেও একপ্রকার শিরোধার্য করিয়া লইল। মাসি সকল সংসারের উপরে যাঁহাকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশে অন্ধকারে বিছানায় উঠিয়া বসিয়া গড় করিয়া প্রণাম করিল। বলিল, “আমি বালিকা, তোমাকে জানি না, আমি কেবল আমার স্বামীকে জানি, সেজন্য অপরাধ লইয়ো না। আমার স্বামীকে আমি যে পূজা দিই ভগবান, তুমি তাঁহাকে তাহা গ্রহণ করিতে বলিয়ো।

তিনি যদি তাহা পায়ে ঠেলিয়া দেন, তবে আমি আর বাঁচিব না। আমি আমার মাসিমার মতো পুণ্যবতী নই, তোমাকে আশ্রয় করিয়া আমি রক্ষা পাইব না।" এই বলিয়া আশা বার বার বিছানার উপর গড় করিয়া প্রণাম করিল।

আশার জেঠামশায়ের ফিরিবার সময় হইল। বিদায়ের পূর্বসন্ধ্যায় অন্নপূর্ণা, আশাকে আপনার কোলে বসাইয়া কহিলেন, "চুনি, মা আমার, সংসারের শোক-দুঃখ-অমঙ্গল হইতে তোকে সর্বদা রক্ষা করিবার শক্তি আমার নাই। আমার এই উপদেশ, যেখান থেকে যত কষ্টই পাস, তোর বিশ্বাস তোর ভক্তি স্থির রাখিস, তোর ধর্ম যেন অটল থাকে।"

আশা তাঁহার পায়ের ধুলা লইয়া কহিল, "আশীর্বাদ করো মাসিমা, তাই হইবে।"

৩০

আশা ফিরিয়া আসিল। বিনোদিনী তাহার 'পরে খুব অভিমান করিল—"বলি, এতদিন বিদেশে রহিলে, একখানা চিঠি লিখিতে নাই?"

আশা কহিল, "তুমিই কোন্ লিখিলে ভাই, বালি।"

বিনোদিনী। আমি কেন প্রথমে লিখিব। তোমারই তো লিখিবার কথা।

আশা বিনোদিনীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া নিজের অপরাধ স্বীকার করিয়া লইল। কহিল, "জান তো ভাই, আমি ভালো লিখিতে জানি না। বিশেষ, তোমার মতো পণ্ডিতের কাছে লিখিতে আমার লজ্জা করে।"

দেখিতে দেখিতে দুই জনের বিবাদ মিটিয়া গিয়া প্রণয় উদ্‌বেলিত হইয়া উঠিল।

বিনোদিনী কহিল, "দিনরাত্রি সঙ্গ দিয়া তোমার স্বামীটির অভ্যাস তুমি একেবারে খারাপ করিয়া দিয়াছ। একটি কেহ কাছে নহিলে থাকিতে পারে না।"

আশা। সেইজন্যই তো তোমার উপরে ভার দিয়া গিয়াছিলাম। কেমন করিয়া সঙ্গ দিতে হয়, আমার চেয়ে তুমি ভালো জান।

বিনোদিনী। দিনটা তো একরকম করিয়া কালেজে পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হইতাম, কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় কোনোমতেই ছাড়াছুড়ি নাই—গল্প করিতে হইবে, বই পড়িয়া শুনাইতে হইবে, আবদারের শেষ নাই।

আশা। কেমন জব্দ। লোকের মন ভুলাইতে যখন পার তখন লোকেই বা ছাড়িবে কেন।

বিনোদিনী। সাবধান থাকিস, ভাই। ঠাকুরপো যে-রকম বাড়াবাড়ি করেন, এক-একবার সন্দেহ হয়, বুঝি বশ করিবার বিদ্যা জানি বা।

আশা হাসিয়া কহিল, "তুমি জান না তো কে জানে। তোমার বিদ্যা আমি একটুখানি পাইলে বাঁচিয়া যাইতাম।"

বিনোদিনী। কেন, কার সর্বনাশ করিবার ইচ্ছা হইয়াছে। ঘরে যেটি আছে সেইটিকে রক্ষা কর্, পরকে ভোলাইবার চেষ্টা করিসনে ভাই বালি। বড়ো ন্যাঠা।

আশা বিনোদিনীকে হস্ত দ্বারা তর্জন করিয়া বলিল, "আঃ, কী বকিস, তার ঠিক নেই।"

কাশী হইতে ফিরিয়া আসার পর প্রথম সাক্ষাতেই মহেন্দ্র কহিল, "তোমার শরীর বেশ ভালো ছিল দেখিতেছি, দিব্য মোটা হইয়া আসিয়াছ।"

আশা অত্যন্ত লজ্জা বোধ করিল। কোনোমতেই তাহার শরীর ভালো থাকা উচিত ছিল না,— কিন্তু মূঢ় আশার কিছুই ঠিকমতো চলে না; তাহার মন যখন এত খারাপ ছিল, তখনো তাহার পোড়া শরীর মোটা হইয়া উঠিয়াছিল; একে তো মনের ভাব ব্যক্ত করিতে কথা জোটে না, তাহাতে আবার শরীরটাও উলটা বলিতে থাকে।

আশা মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কেমন ছিলে।"

আগে হইলে মহেন্দ্র কতক ঠাট্টা, কতক মনের সঙ্গে বলিত, "মরিয়া ছিলাম।" এখন আর ঠাট্টা করিতে পারিল না, গলার কাছে আসিয়া বাধিয়া গেল। কহিল, "বেশ ছিলাম, মন্দ ছিলাম না।"

আশা চাহিয়া দেখিল, মহেন্দ্র পূর্বের চেয়ে যেন রোগাই হইয়াছে,— তাহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ, চোখে একপ্রকার তীব্র দীপ্তি। একটা যেন আভ্যন্তরিক ক্ষুধায় তাহাকে অগ্নিজিহ্বা দিয়া লেহন করিয়া খাইতেছে। আশা মনে মনে ব্যথা অনুভব করিয়া ভাবিল, "আহা, আমার স্বামী ভালো ছিলেন না, কেন আমি উঁহাকে ফেলিয়া কাশী চলিয়া গেলাম।" স্বামী রোগা হইলেন, অথচ নিজে মোটা হইল, ইহাতেও নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি আশার অত্যন্ত ধিক্কার জন্মিল।

মহেন্দ্র আর কী কথা তুলিবে ভাবিতে ভাবিতে খানিক বাদে জিজ্ঞাসা করিল, "কাকীমা ভালো আছেন তো।"

সে-প্রশ্নের উত্তরে কুশল-সংবাদ পাইয়া তাহার আর দ্বিতীয় কথা মনে আনা দুঃসাধ্য হইল। কাছে একটা ছিন্ন পুরাতন খবরের কাগজ ছিল, সেইটে টানিয়া লইয়া মহেন্দ্র অন্যমনস্কভাবে পড়িতে লাগিল। আশা মুখ নিচু করিয়া ভাবিতে লাগিল, "এতদিন পরে দেখা হইল, কিন্তু উনি আমার সঙ্গে কেন ভালো করিয়া

কথা কহিলেন না, এমন কি, আমার মুখের দিকেও যেন চাহিতে পারিলেন না। আমি তিন-চারদিন চিঠি লিখিতে পারি নাই বলিয়া কি রাগ করিয়াছেন, আমি মাসির অনুরোধে বেশিদিন কাশীতে ছিলাম বলিয়া কি বিরক্ত হইয়াছেন।" অপরাধ কোন্ ছিদ্র দিয়া কেমন করিয়া প্রবেশ করিল, ইহাই সে নিতান্ত ক্লিষ্টহৃদয়ে সন্ধান করিতে লাগিল।

মহেন্দ্র কালেজ হইতে ফিরিয়া আসিল। অপরাহ্নে জলপানের সময় রাজলক্ষ্মী ছিলেন, আশাও ঘোমটা দিয়া অদূরে দুয়ার ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, কিন্তু আর কেহই ছিল না।

রাজলক্ষ্মী উদ্‌বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কি তোর অসুখ করিয়াছে, মহিন।"

মহেন্দ্র বিরক্তভাবে কহিল, "না মা, অসুখ কেন করবে।"

রাজলক্ষ্মী। তবে তুই যে কিছু খাইতেছিস না!

মহেন্দ্র পুনর্বার উত্ত্যক্তস্বরে কহিল, "এই তো, খাচ্ছি না তো কী।"

মহেন্দ্র গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় একখানা পাতলা চাদর গায়ে ছাদের এধারে ওধারে বেড়াইতে লাগিল। মনে বড়ো আশা ছিল, তাহাদের নিয়মিত পড়াটা আজ ক্ষান্ত থাকিবে না। আনন্দমঠ প্রায় শেষ হইয়াছে, আর গুটি-দুই-তিন অধ্যায় বাকি আছে মাত্র—বিনোদিনী যত নিষ্ঠুর হোক, সে-কয়টা অধ্যায় আজ তাহাকে নিশ্চয় শুনাইয়া যাইবে। কিন্তু সন্ধ্যা অতীত হইল, সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল, গুরুভার নৈরাশ্য বহিয়া মহেন্দ্রকে শুইতে যাইতে হইল।

সজ্জিত লজ্জান্বিত আশা ধীরে ধীরে শয়নগৃহে প্রবেশ করিল। দেখিল, বিছানায় মহেন্দ্র শুইয়া পড়িয়াছে। তখন, কেমন করিয়া অগ্রসর হইবে ভাবিয়া পাইল না।

বিচ্ছেদের পর কিছুক্ষণ একটা নূতন লজ্জা আসে— যেখানটিতে ছাড়িয়া যাওয়া যায় ঠিক সেইখানটিতে মিলিবার পূর্বে পরস্পর পরস্পরের নিকট হইতে নূতন সম্ভাষণের প্রত্যাশা করে। আশা তাহার সেই চিরপরিচিত আনন্দশয্যাটিতে আজ অনাহূত কেমন করিয়া প্রবেশ করিবে। দ্বারের কাছে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল— মহেন্দ্রের কোনো সাড়া পাইল না। অত্যন্ত ধীরে ধীরে এক পা এক পা করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। যদি অসতর্কে দৈবাৎ কোনো গহনা বাজিয়া উঠে তো সে লজ্জায় মরিয়া যায়। কম্পিতহৃদয়ে আশা মশারির কাছে আসিয়া অনুভব করিল, মহেন্দ্র ঘুমাইতেছে। তখন তাহার নিজের সাজসজ্জা তাহাকে সর্বাঙ্গে বেষ্টন করিয়া পরিহাস করিতে লাগিল। ইচ্ছা হইল, বিদ্যুদ্‌বেগে এ-ঘর হইতে বাহির হইয়া অন্য কোথাও গিয়া শোয়।

আশা যথাসাধ্য নিঃশব্দে সংকুচিত হইয়া খাটের উপর গিয়া উঠিল। তবু তাহাতে এতটুকু শব্দ ও নড়াচড়া হইল যে, মহেন্দ্র যদি সত্যই ঘুমাইত তাহা হইলে জাগিয়া উঠিত। কিন্তু আজ তাহার চক্ষু খুলিল না, কেননা, মহেন্দ্র ঘুমাইতেছিল না। মহেন্দ্র খাটের অপর প্রান্তে পাশ ফিরিয়া শুইয়া ছিল, সুতরাং আশা তাহার পশ্চাতে শুইয়া রহিল। আশা যে নিঃশব্দে অশ্রুপাত করিতেছিল, তাহা পিছন ফিরিয়াও মহেন্দ্র স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছিল। নিজের নিষ্ঠুরতায় তাহার হৃৎপিণ্ডটাকে যেন জাঁতার মতো পেষণ করিয়া ব্যথা দিতেছিল। কিন্তু কী কথা বলিবে, কেমন করিয়া আদর করিবে, মহেন্দ্র তাহা কোনোমতেই ভাবিয়া পাইল না; মনে মনে নিজেকে সুতীব্র কশাঘাত করিতে লাগিল, তাহাতে আঘাত পাইল, কিন্তু উপায় পাইল না। ভাবিল, "প্রাতঃকালে তো ঘুমের ভান করা যাইবে না, তখন মুখোমুখি হইলে আশাকে কী কথা বলিব।"

আশা নিজেই মহেন্দ্রের সে সংকট দূর করিয়া দিল। সে অতি প্রত্যুষেই অপমানিত সাজসজ্জা লইয়া বিছানা ছাড়িয়া চলিয়া গেল, সেও মহেন্দ্রকে মুখ দেখাইতে পারিল না।

৩১

আশা ভাবিতে লাগিল, "এমন কেন হইল। আমি কী করিয়াছি।" যে-জায়গায় যথার্থ বিপদ সে-জায়গায় তাহার চোখ পড়িল না। বিনোদিনীকে যে মহেন্দ্র ভালোবাসিতে পারে, এ সম্ভাবনাও তাহার মনে উদয় হয় নাই। সংসারের অভিজ্ঞতা তাহার কিছুই ছিল না। তা ছাড়া, বিবাহের অনতিকাল পর হইতেই সে মহেন্দ্রকে যাহা বলিয়া নিশ্চয় জানিয়াছিল, মহেন্দ্র যে তাহা ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে, ইহা কখনো তাহার কল্পনাতেও আসে নাই।

মহেন্দ্র আজ সকাল সকাল কালেজে গেল। কালেজযাত্রাকালে আশা বরাবর জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইত, এবং মহেন্দ্র গাড়ি হইতে একবার মুখ তুলিয়া দেখিত, ইহা তাহাদের চিরকালের নিত্যপ্রথা ছিল। সেই অভ্যাস অনুসারে গাড়ির শব্দ শুনিবামাত্র যন্ত্রচালিতের মতো আশা জানালার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। মহেন্দ্রও অভ্যাসের খাতিরে একবার চকিতের মতো উপরে চোখ তুলিল; দেখিল, আশা দাঁড়াইয়া আছে— তখনো তাহার স্নান হয় নাই, মলিন বস্ত্র, অসংযত কেশ, শুষ্ক মুখ— দেখিয়া নিমেষের মধ্যেই মহেন্দ্র চোখ নামাইয়া কোলের বই দেখিতে লাগিল। কোথায় চোখে চোখে সেই নীরব সম্ভাষণ, সেই ভাষাপূর্ণ হাসি।

গাড়ি চলিয়া গেল; আশা সেইখানেই মাটির উপর বসিয়া পড়িল। পৃথিবী,

সংসার সমস্ত বিস্বাদ হইয়া গেল। কলিকাতার কর্মপ্রবাহে তখন জোয়ার আসিবার সময়। সাড়ে দশটা বাজিয়াছে— আপিসের গাড়ির বিরাম নাই, ট্রামের পশ্চাতে ট্রাম ছুটিতেছে— সেই ব্যস্ততাবেগবান কর্মকল্লোলের অদূরে এই একটি বেদনাস্তম্ভিত মুহ্যমান হৃদয় অত্যন্ত বিসদৃশ।

হঠাৎ এক সময় আশার মনে হইল, "বুঝিয়াছি। ঠাকুরপো কাশী গিয়াছিলেন, সেই খবর পাইয়া উনি রাগ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া ইতিমধ্যে আর তো কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নাই। কিন্তু আমার তাহাতে কী দোষ ছিল।"

ভাবিতে ভাবিতে অকস্মাৎ এক মুহূর্তের জন্য যেন আশার হৃৎস্পন্দন বন্ধ হইয়া গেল। হঠাৎ তাহার আশঙ্কা হইল, মহেন্দ্র বুঝি সন্দেহ করিয়াছেন, বিহারীর কাশী যাওয়ার সঙ্গে আশারও কোনো যোগ আছে। দুই জনে পরামর্শ করিয়া এই কাজ। ছি ছি ছি। এমন সন্দেহ। কী লজ্জা। একে তো বিহারীর সঙ্গে তাহার নাম জড়িত হইয়া ধিক্‌কারের কারণ ঘটিয়াছে, তাহার উপরে মহেন্দ্র যদি এমন সন্দেহ করে তবে তো আর প্রাণ রাখা যায় না। কিন্তু যদি কোনো সন্দেহের কারণ হয়, যদি কোনো অপরাধ ঘটিয়া থাকে, মহেন্দ্র কেন স্পষ্ট করিয়া বলে না— বিচার করিয়া তাহার উপযুক্ত দণ্ড কেন না দেয়। মহেন্দ্র খোলসা কোনো কথা না বলিয়া কেবলই আশাকে যেন এড়াইয়া বেড়াইতেছে, তাই আশার বার বার মনে হইতে লাগিল, মহেন্দ্রের মনে এমন কোনো সন্দেহ আসিয়াছে, যাহা নিজেই সে অন্যায় বলিয়া জানে, যাহা সে আশার কাছে স্পষ্ট করিয়া স্বীকার করিতেও লজ্জা বোধ করিতেছে। নহিলে এমন অপরাধীর মতো তাহার চেহারা হইবে কেন। ক্রুদ্ধ বিচারকের তো এমন কুণ্ঠিত ভাব হইবার কথা নহে।

মহেন্দ্র গাড়ি হইতে চকিতের মতো সেই যে আশার ম্লান করুণ মুখ দেখিয়া গেল, তাহা সমস্ত দিনে সে মন হইতে মুছিতে পারিল না। কালেজের লেকচারের মধ্যে, শ্রেণীবদ্ধ ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে, সেই বাতায়ন, আশার সেই অস্নাত রুক্ষ কেশ, সেই মলিন বস্ত্র, সেই ব্যথিত-ব্যাকুল দৃষ্টিপাত সুস্পষ্টরেখায় বারংবার অঙ্কিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

কালেজের কাজ সারিয়া সে গোলদিঘির ধারে বেড়াইতে লাগিল। বেড়াইতে বেড়াইতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল; আশার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার কর্তব্য তাহা সে কিছুতেই ভাবিয়া পাইল না— সদয় ছলনা না অকপট নিষ্ঠুরতা, কোন্‌টা উচিত? বিনোদিনীকে পরিত্যাগ করিবে কি না, সে-তর্ক আর মনে উদয়ই হয় না। দয়া এবং প্রেম, মহেন্দ্র উভয়ের দাবি কেমন করিয়া রাখিবে।

মহেন্দ্র তখন মনকে এই বলিয়া বুঝাইল যে, আশার প্রতি এখনো তাহার যে ভালোবাসা আছে, তাহা অল্প স্ত্রীর ভাগ্যে জোটে। সেই স্নেহ, সেই ভালোবাসা পাইলে আশা কেন না সন্তুষ্ট থাকিবে। বিনোদিনী এবং আশা, উভয়কেই স্থান দিবার মতো প্রশস্ত হৃদয় মহেন্দ্রের আছে। বিনোদিনীর সহিত মহেন্দ্রের যে পবিত্র প্রেমের সম্বন্ধ তাহাতে দাম্পত্যনীতির কোনো ব্যাঘাত হইবে না।

এইরূপ বুঝাইয়া মহেন্দ্র মন হইতে একটা ভার নামাইয়া ফেলিল। বিনোদিনী এবং আশা, কাহাকেও ত্যাগ না করিয়া দুইচন্দ্রসেবিত গ্রহের মতো এই ভাবেই সে চিরকাল কাটাইয়া দিতে পারিবে, এই মনে করিয়া তাহার মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। আজ রাত্রে সে সকাল সকাল বিছানায় প্রবেশ করিয়া আদরে যত্নে স্নিগ্ধ আলাপে আশার মন হইতে সমস্ত বেদনা দূর করিয়া দিবে, ইহা নিশ্চয় করিয়া দ্রুতপদে বাড়ি চলিয়া আসিল।

আহারের সময় আশা উপস্থিত ছিল না, কিন্তু সে এক সময় শুইতে আসিবে তো, এই মনে করিয়া মহেন্দ্র বিছানার মধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু নিস্তব্ধ ঘরে সেই শূন্য শয্যার মধ্যে কোন্ স্মৃতি মহেন্দ্রের হৃদয়কে আবিষ্ট করিয়া তুলিল। আশার সহিত নবপরিণয়ের নিত্যনূতন লীলাখেলা? না। সূর্যালোকের কাছে জ্যোৎস্না যেমন মিলাইয়া যায়, সে-সকল স্মৃতি তেমনি ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে— একটি তীব্র-উজ্জ্বল তরুণীমূর্তি, সরলা বালিকার সলজ্জ স্নিগ্ধচ্ছবিকে কোথায় আবৃত আচ্ছন্ন করিয়া দীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে। বিনোদিনীর সঙ্গে বিষবৃক্ষ লইয়া সেই কাড়াকাড়ি মনে পড়িতে লাগিল; সন্ধ্যার পর বিনোদিনী কপালকুণ্ডলা পড়িয়া শুনাইতে শুনাইতে ক্রমে রাত্রি হইয়া আসিত, বাড়ির লোক ঘুমাইয়া পড়িত, রাত্রে নিভৃত কক্ষের সেই স্তব্ধ নির্জনতায় বিনোদিনীর কণ্ঠস্বর যেন আবেশে মৃদুতর ও রুদ্ধপ্রায় হইয়া আসিত, হঠাৎ সে আত্মসংবরণ করিয়া বই ফেলিয়া উঠিয়া পড়িত, মহেন্দ্র বলিত, "তোমাকে সিঁড়ির নিচে পর্যন্ত পৌছাইয়া দিয়া আসি।" সেই-সকল কথা বারংবার মনে পড়িয়া তাহার সর্বাঙ্গে পুলকসঞ্চার করিতে লাগিল। রাত্রি বাড়িয়া চলিল— মহেন্দ্রের মনে মনে ঈষৎ আশঙ্কা হইতে লাগিল, এখনই আশা আসিয়া পড়িবে— কিন্তু আশা আসিল না। মহেন্দ্র ভাবিল, "আমি তো কর্তব্যের জন্য প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু আশা যদি অন্যায় রাগ করিয়া না আসে তো আমি কী করিব।" এই বলিয়া নিশীথরাত্রে বিনোদিনীর ধ্যানকে ঘনীভূত করিয়া তুলিল।

ঘড়িতে যখন একটা বাজিল, তখন মহেন্দ্র আর থাকিতে পারিল না, মশারি খুলিয়া বাহির হইয়া পড়িল। ছাদে আসিয়া দেখিল, গ্রীষ্মের জ্যোৎস্নারাত্রি বড়ো

রমণীয় হইয়াছে। কলিকাতার প্রকাণ্ড নিঃশব্দতা এবং সুপ্তি যেন স্তব্ধ সমুদ্রের জলরাশির ন্যায় স্পর্শগম্য বলিয়া বোধ হইতেছে— অসংখ্য হর্ম্যশ্রেণীর উপর দিয়া মহানগরীর নিদ্রাকে নিবিড়তর করিয়া বাতাস মৃদুগমনে পদচারণ করিয়া আসিতেছে।

মহেন্দ্রের বহুদিনের রুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা আপনাকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিল না। আশা কাশী হইতে ফিরিয়া অবধি বিনোদিনী তাহাকে দেখা দেয় নাই। জ্যোৎস্নামদবিহ্বল নির্জন রাত্রি মহেন্দ্রকে মোহাবিষ্ট করিয়া বিনোদিনীর দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। মহেন্দ্র সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল। বিনোদিনীর ঘরের সম্মুখের বারান্দায় আসিয়া দেখিল, ঘর বন্ধ হয় নাই। ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, বিছানা তৈরি রহিয়াছে, কেহ শোয় নাই। ঘরের মধ্যে পদশব্দ শুনিতে পাইয়া ঘরের দক্ষিণ দিকের খোলা বারান্দা হইতে বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, "কে ও।"

মহেন্দ্র অভিভূত আর্দ্র কণ্ঠে উত্তর করিল, "বিনোদ, আমি।"

বলিয়া সে একেবারে বারান্দায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

গ্রীষ্মরাত্রিতে বারান্দায় মাদুর পাতিয়া বিনোদিনীর সঙ্গে রাজলক্ষ্মী শুইয়া ছিলেন, তিনি বলিয়া উঠিলেন, "মহিন, এত রাত্রে তুই এখানে যে।"

বিনোদিনী তাহার ঘনকৃষ্ণ ভ্রূযুগের নিচে হইতে মহেন্দ্রের প্রতি বজ্রাগ্নি নিক্ষেপ করিল। মহেন্দ্র কোনো উত্তর না দিয়া দ্রুতপদে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

৩২

পরদিন প্রত্যুষ হইতে ঘনঘটা করিয়া আছে। কিছুকাল অসহ্য উত্তাপের পর স্নিগ্ধশ্যামল মেঘে দগ্ধ আকাশ জুড়াইয়া গেল। আজ মহেন্দ্র সময় হইবার পূর্বেই কালেজে গেছে। তাহার ছাড়া-কাপড়গুলা মেঝের উপর পড়িয়া। আশা মহেন্দ্রের ময়লা কাপড় গনিয়া গনিয়া, তাহার হিসাব রাখিয়া ধোবাকে বুঝাইয়া দিতেছে।

মহেন্দ্র স্বভাবত ভোলামন অসাবধান লোক; এইজন্য আশার প্রতি তাহার অনুরোধ ছিল ধোবার বাড়ি দিবার পূর্বে তাহার ছাড়া-কাপড়ের পকেট তদন্ত করিয়া লওয়া হয় যেন। মহেন্দ্রের একটা ছাড়া-জামার পকেটে হাত দিতেই একখানা চিঠি আশার হাতে ঠেকিল।

সেই চিঠি যদি বিষধর সাপের মূর্তি ধরিয়া তখনই আশার অঙ্গুলি দংশন করিত তবে ভালো হইত; কারণ, উগ্র বিষ শরীরে প্রবেশ করিলে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তাহার চরম ফল ফলিয়া শেষ হইতে পারে, কিন্তু বিষ মনে প্রবেশ করিলে মৃত্যুযন্ত্রণা আনে— মৃত্যু আনে না।

খোলা চিঠি বাহির করিবামাত্র দেখিল, বিনোদিনীর হস্তাক্ষর। চকিতের মধ্যে আশার মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। চিঠি হাতে লইয়া সে পাশের ঘরে গিয়া পড়িল—

কাল রাত্রে তুমি যে-কাণ্ডটা করিলে, তাহাতেও কি তোমার তৃপ্তি হইল না। আজ আবার কেন খেমির হাত দিয়া আমাকে গোপনে চিঠি পাঠাইলে। ছি ছি, সে কী মনে করিল। আমাকে তুমি কি জগতে কাহারও কাছে মুখ দেখাইতে দিবে না।

আমার কাছে কী চাও তুমি। ভালোবাসা? তোমার এ ভিক্ষাবৃত্তি কেন। জন্মকাল হইতে তুমি কেবল ভালোবাসাই পাইয়া আসিতেছ, তবু তোমার লোভের অন্ত নাই!

জগতে আমার ভালোবাসিবার এবং ভালোবাসা পাইবার কোনো স্থান নাই। তাই আমি খেলা খেলিয়া ভালোবাসার খেদ মিটাইয়া থাকি। যখন তোমার অবসর ছিল তখন সেই মিথ্যা খেলায় তুমিও যোগ দিয়াছিলে। কিন্তু খেলার ছুটি কি ফুরায় না। ঘরের মধ্যে তোমার ডাক পড়িয়াছে, এখন আবার খেলার ঘরে উঁকিঝুঁকি কেন। এখন ধুলা ঝাড়িয়া ঘরে যাও। আমার তো ঘর নাই, আমি মনে মনে একলা বসিয়া খেলা করিব, তোমাকে ডাকিব না।

তুমি লিখিয়াছ, আমাকে ভালোবাস। খেলার বেলায় সে-কথা শোনা যাইতে পারে— কিন্তু যদি সত্য বলিতে হয়, ও-কথা বিশ্বাস করি না। এক সময় মনে করিতে, তুমি আশাকে ভালোবাসিতেছ, সেও মিথ্যা; —এখন মনে করিতেছ, তুমি আমাকে ভালোবাসিতেছ, এও মিথ্যা। তুমি কেবল নিজেকে ভালোবাস।

ভালোবাসার তৃষ্ণায় আমার হৃদয় হইতে বক্ষ পর্যন্ত শুকাইয়া উঠিয়াছে— সে তৃষ্ণা পূরণ করিবার সম্বল তোমার হাতে নাই, সে আমি বেশ ভালো করিয়াই দেখিয়াছি। আমি তোমাকে বারংবার বলিতেছি, তুমি আমাকে ত্যাগ করো, আমার পশ্চাতে ফিরিয়ো না; নির্লজ্জ হইয়া আমাকে লজ্জা দিয়ো না। আমার খেলার শখও মিটিয়াছে; এখন ডাক দিলে কিছুতেই আমার সাড়া পাইবে না। চিঠিতে তুমি আমাকে নিষ্ঠুর বলিয়াছ— সে-কথা সত্য হইতে পারে; কিন্তু আমার কিছু দয়াও আছে— তাই আজ তোমাকে আমি দয়া করিয়া ত্যাগ করিলাম। এ-চিঠির যদি উত্তর দাও তবে বুঝিব, না পালাইলে তোমার হাত হইতে আমার আর নিষ্কৃতি নাই।

চিঠিখানি পড়িবামাত্র মুহূর্তের মধ্যে চারিদিক হইতে আশার সমস্ত অবলম্বন যেন খসিয়া পড়িয়া গেল, শরীরের সমস্ত স্নায়ুপেশী যেন একেবারেই হাল ছাড়িয়া দিল— নিশ্বাস লইবার জন্য যেন বাতাসটুকু পর্যন্ত রহিল না, সূর্য তাহার চোখের উপর হইতে সমস্ত আলো যেন তুলিয়া লইল। আশা প্রথমে দেয়াল, তাহার পর আলমারি, তাহার পর চৌকি ধরিতে ধরিতে মাটিতে পড়িয়া গেল, ক্ষণকাল পরে সচেতন হইয়া চিঠিখানা আর-একবার পড়িতে চেষ্টা করিল, কিন্তু উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে কিছুতেই তাহার অর্থ গ্রহণ করিতে পারিল না— কালো কালো অক্ষরগুলা তাহার চোখের উপর নাচিতে লাগিল। এ কী। এ কী হইল। এ কেমন করিয়া হইল। এ কী সম্পূর্ণ সর্বনাশ। সে কী করিবে, কাহাকে ডাকিবে, কোথায় যাইবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। ডাঙার উপরে উঠিয়া মাছ যেমন খাবি খায়, তাহার বুকের ভিতরটা তেমনি করিতে লাগিল। মজ্জমান ব্যক্তি যেমন কোনো একটা আশ্রয় পাইবার জন্য জলের উপরে হস্ত প্রসারিত করিয়া আকাশ খুঁজিয়া বেড়ায়, তেমনি আশা মনের মধ্যে একটা যা-হয় কিছু প্রাণপণে আঁকড়িয়া ধরিবার জন্য একান্ত চেষ্টা করিল, অবশেষে বুক চাপিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে বলিয়া উঠিল, "মাসিমা।"

সেই স্নেহের সম্ভাষণ উচ্ছ্বসিত হইবামাত্র তাহার চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। মাটিতে বসিয়া কান্নার উপর কান্না— কান্নার উপর কান্না যখন ফিরিয়া ফিরিয়া শেষ হইল, তখন সে ভাবিতে লাগিল, "এ-চিঠি লইয়া আমি কী করিব।" স্বামী যদি জানিতে পারেন, এ-চিঠি আশার হাতে পড়িয়াছে, তবে সেই উপলক্ষ্যে তাঁহার নিদারুণ লজ্জা স্মরণ করিয়া আশা অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইতে লাগিল। স্থির করিল, চিঠিখানি সেই ছাড়া-জামার পকেটে পুনরায় রাখিয়া জামাটি আলনায় ঝুলাইয়া রাখিবে, ধোবার বাড়ি দিবে না।

এই ভাবিয়া চিঠি হাতে সে শয়নগৃহে আসিল। ধোবাটা ইতিমধ্যে ময়লা কাপড়ের গাঁঠরির উপর ঠেস দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। মহেন্দ্রের ছাড়া-জামাটা তুলিয়া লইয়া আশা তাহার পকেটে চিঠি পুড়িবার উদ্‌যোগ করিতেছে, এমন সময় সাড়া পাইল, "ভাই বালি।"

তাড়াতাড়ি চিঠি ও জামাটা খাটের উপর ফেলিয়া সে তাহা চাপিয়া বসিল। বিনোদিনী ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল, "ধোবা বড়ো কাপড় বদল করিতেছে। যে কাপড়গুলার মার্কা দেওয়া হয় নাই, সেগুলা আমি লইয়া যাই।"

আশা বিনোদিনীর মুখের দিকে চাহিতে পারিল না। পাছে মুখের ভাবে সকল কথা স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ পায়, এইজন্য সে জানালার দিকে মুখ ফিরাইয়া

আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল, ঠোঁটে ঠোঁট চাপিয়া রহিল, পাছে চোখ দিয়া জল বাহির হইয়া পড়ে।

বিনোদিনী থমকিয়া দাঁড়াইয়া একবার আশাকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল। মনে মনে কহিল, "ও, বুঝিয়াছি। কাল রাত্রের বিবরণ তবে জানিতে পারিয়াছ! আমার উপরেই সমস্ত রাগ! যেন অপরাধ আমারই।"

বিনোদিনী আশার সঙ্গে কথাবার্তা কহিবার কোনো চেষ্টাই করিল না। খানকয়েক কাপড় বাছিয়া লইয়া দ্রুতপদে ঘর হইতে চলিয়া গেল।

বিনোদিনীর সঙ্গে আশা যে এতদিন সরলচিত্তে বন্ধুত্ব করিয়া আসিতেছে, সেই লজ্জা নিদারুণ দুঃখের মধ্যেও তাহার হৃদয়ে পুঞ্জীকৃত হইয়া উঠিল। তাহার মনের মধ্যে সখীর যে-আদর্শ ছিল, সেই আদর্শের সঙ্গে নিষ্ঠুর চিঠিখানা আর-একবার মিলাইয়া দেখিবার ইচ্ছা হইল।

চিঠিখানা খুলিয়া দেখিতেছে, এমন সময় তাড়াতাড়ি মহেন্দ্র ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল। হঠাৎ কী মনে করিয়া কালেজের একটা লেকচারের মাঝখানে ভঙ্গ দিয়া সে ছুটিয়া বাড়ি চলিয়া আসিয়াছে।

আশা চিঠিখানা অঞ্চলের মধ্যে লুকাইয়া ফেলিল। মহেন্দ্রও ঘরে আশাকে দেখিয়া একটু থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর ব্যগ্রদৃষ্টিতে ঘরের এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিতে লাগিল। আশা বুঝিয়াছিল, মহেন্দ্র কী খুঁজিতেছে; কিন্তু কেমন করিয়া সে হাতের চিঠিখানা অলক্ষিতে যথাস্থানে রাখিয়া পালাইয়া যাইবে, ভাবিয়া পাইল না।

মহেন্দ্র তখন একটা একটা করিয়া ময়লা কাপড় তুলিয়া তুলিয়া দেখিতে লাগিল। মহেন্দ্রের সেই নিষ্ফল প্রয়াস দেখিয়া আশা আর থাকিতে পারিল না, চিঠিখানা ও জামাটা মেজের উপর ফেলিয়া দিয়া ডান হাতে খাটের থামটা ধরিয়া সেই হাতে মুখ লুকাইল। মহেন্দ্র বিদ্যুদ্‌বেগে চিঠিখানা তুলিয়া লইল। নিমেষের জন্য স্তব্ধ হইয়া আশার দিকে চাহিল। তাহার পরে আশা সিঁড়ি দিয়া মহেন্দ্রের দ্রুতধাবনের শব্দ শুনিতে পাইল। তখন ধোবা ডাকিতেছে, "মা-ঠাকরুন, কাপড় দিতে আর কত দেরি করিবে। বেলা অনেক হইল, আমার বাড়ি তো এখানে নয়।"

৩৩

রাজলক্ষ্মী আজ সকাল হইতে আর বিনোদিনীকে ডাকেন নাই। বিনোদিনী নিয়মমতো ভাঁড়ারে গেল, দেখিল, রাজলক্ষ্মী মুখ তুলিয়া চাহিলেন না।

সে তাহা লক্ষ্য করিয়াও বলিল, "পিসিমা, তোমার অসুখ করিয়াছে বুঝি।

করিবারই কথা। কাল রাত্রে ঠাকুরপো যে কীর্তি করিলেন। একেবারে পাগলের মতো আসিয়া উপস্থিত। আমার তো তার পরে ঘুম হইল না।"

রাজলক্ষ্মী মুখ ভার করিয়া রহিলেন, হাঁ-না কোনো উত্তরই করিলেন না।

বিনোদিনী বলিল, "হয়তো চোখের বালির সঙ্গে সামান্য কিছু খিটিমিটি হইয়া থাকিবে, আর দেখে কে। তখনই নালিশ কিংবা নিষ্পত্তির জন্যে আমাকে ধরিয়া লইয়া যাওয়া চাই, রাত পোহাইতে তর সয় না। যাই বল পিসিমা, তুমি রাগ করিয়ো না, তোমার ছেলের সহস্র গুণ থাকিতে পারে, কিন্তু ধৈর্যের লেশমাত্র নাই। ওই জন্যেই আমার সঙ্গে কেবলই ঝগড়া হয়।"

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "বউ, তুমি মিথ্যা বকিতেছ— আমার আজ আর কোনো কথা ভালো লাগিতেছে না।"

বিনোদিনী কহিল, "আমারও কিছু ভালো লাগিতেছে না, পিসিমা। তোমার মনে আঘাত লাগিবে, এই ভয়েই মিথ্যা কথা দিয়া তোমার ছেলের দোষ ঢাকিবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু এমন হইয়াছে যে, আর ঢাকা পড়ে না।"

রাজলক্ষ্মী। আমার ছেলের দোষ-গুণ আমি জানি— কিন্তু তুমি যে কেমন মায়াবিনী, তাহা আমি জানিতাম না।

বিনোদিনী কী একটা বলিবার জন্য উদ্যত হইয়া নিজেকে সংবরণ করিল— কহিল, "সে-কথা ঠিক পিসিমা, কেহ কাহাকেও জানে না। নিজের মনও কি সবাই জানে। তুমি কি কখনো তোমার বউয়ের উপর দ্বেষ করিয়া এই মায়াবিনীকে দিয়া তোমার ছেলের মন ভুলাইতে চাও নাই? একবার ঠাওর করিয়া দেখো দেখি।"

রাজলক্ষ্মী অগ্নির মতো উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন— কহিলেন, "হতভাগিনী, ছেলের সম্বন্ধে মার নামে তুই এমন অপবাদ দিতে পারিস? তোর জিব খসিয়া পড়িবে না!"

বিনোদিনী অবিচলিতভাবে কহিল, "পিসিমা, আমরা মায়াবিনীর জাত, আমার মধ্যে কী মায়া ছিল, তাহা আমি ঠিক জানি নাই, তুমি জানিয়াছ,— তোমার মধ্যেও কী মায়া ছিল, তাহা তুমি ঠিক জান নাই, আমি জানিয়াছি। কিন্তু মায়া ছিল, নহিলে এমন ঘটনা ঘটিত না। ফাঁদ আমিও কতকটা জানিয়া এবং কতকটা না জানিয়া পাতিয়াছি। ফাঁদ তুমিও কতকটা জানিয়া এবং কতকটা না জানিয়া পাতিয়াছ। আমাদের জাতের ধর্ম এইরূপ— আমরা মায়াবিনী।"

রোষে রাজলক্ষ্মীর যেন কণ্ঠরোধ হইয়া গেল— তিনি ঘর ছাড়িয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

বিনোদিনী একলা-ঘরে ক্ষণকালের জন্য স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল— তাহার দুই চক্ষে আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

সকালবেলাকার গৃহকার্য হইয়া গেলে রাজলক্ষ্মী মহেন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মহেন্দ্র বুঝিল, কাল রাত্রিকার ব্যাপার লইয়া আলোচনা হইবে। তখন বিনোদিনীর কাছ হইতে পত্রোত্তর পাইয়া তাহার মন বিকল হইয়া উঠিয়াছিল। সেই আঘাতের প্রতিঘাত-স্বরূপে তাহার সমস্ত তরঙ্গিত হৃদয় বিনোদিনীর দিকে সবেগে ধাবমান হইতেছিল। ইহার উপরে আবার মার সঙ্গে উত্তর-প্রত্যুত্তর করা তাহার পক্ষে অসাধ্য। মহেন্দ্র জানিত, মা তাহাকে বিনোদিনী সম্বন্ধে ভৎর্সনা করিলেই বিদ্রোহি-ভাবে সে যথার্থ মনের কথা বলিয়া ফেলিবে এবং বলিয়া ফেলিলেই নিদারুণ গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইবে। অতএব এ-সময়ে বাড়ি হইতে দূরে গিয়া সকল কথা পরিষ্কার করিয়া ভাবিয়া দেখা দরকার। মহেন্দ্র চাকরকে বলিল, "মাকে বলিস, আজ কালেজে আমার বিশেষ কাজ আছে, এখনই যাইতে হইবে, ফিরিয়া আসিয়া দেখা হইবে।" বলিয়া পলাতক বালকের মতো তখনি তাড়াতাড়ি কাপড় পরিয়া না খাইয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। বিনোদিনীর যে দারুণ চিঠিখানা আজ সকাল হইতে বার বার করিয়া সে পড়িয়াছে এবং পকেটে লইয়া ফিরিয়াছে, আজ নিতান্ত তাড়াতাড়িতে সেই চিঠিসুদ্ধ জামা ছাড়িয়াই সে চলিয়া গেল।

এক পসলা ঘন বৃষ্টি হইয়া তাহার পরে বাদলার মতো করিয়া রহিল। বিনোদিনীর মন আজ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া আছে। মনের কোনো অসুখ হইলে বিনোদিনী কাজের মাত্রা বাড়ায়। তাই সে আজ যত রাজ্যের কাপড় জড়ো করিয়া চিহ্ন দিতে আরম্ভ করিয়াছে। আশার নিকট হইতে কাপড় চাহিতে গিয়া আশার মুখের ভাব দেখিয়া তাহার মন আরো বিগড়াইয়া গেছে। সংসারে যদি অপরাধীই হইতে হয়, তবে অপরাধের যত লাঞ্ছনা তাহাই কেন ভোগ করিবে, অপরাধের যত সুখ তাহা হইতে কেন বঞ্চিত হইবে।

ঝুপ ঝুপ শব্দে চাপিয়া বৃষ্টি আসিল। বিনোদিনী তাহার ঘরে মেঝের উপর বসিয়া। সম্মুখে কাপড় স্তূপাকার। খেমি দাসী এক-একখানি কাপড় অগ্রসর করিয়া দিতেছে, আর বিনোদিনী মার্কা দিবার কালি দিয়া তাহাতে অক্ষর মুদ্রিত করিতেছে। মহেন্দ্র কোনো সাড়া না দিয়া দরজা খুলিয়া একেবারে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। খেমি দাসী কাজ ফেলিয়া মাথায় কাপড় দিয়া ঘর ছাড়িয়া ছুট দিল।

বিনোদিনী কোলের কাপড় মাটিতে ফেলিয়া দিয়া বিদ্যুদ্‌বেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "যাও, আমার এ-ঘর হইতে চলিয়া যাও।"

মহেন্দ্র কহিল, "কেন, কী করিয়াছি।"

বিনোদিনী। কী করিয়াছি! ভীরু কাপুরুষ! কী করিবার সাধ্য আছে তোমার। না জান ভালোবাসিতে, না জান কর্তব্য করিতে। মাঝে হইতে আমাকে কেন লোকের কাছে নষ্ট করিতেছ।

মহেন্দ্র। তোমাকে আমি ভালোবাসি নাই, এমন কথা বলিলে?

বিনোদিনী। আমি সেই কথাই বলিতেছি। লুকাচুরি ঢাকাঢাকি, একবার এদিক, একবার ওদিক— তোমার এই চোরের মতো প্রবৃত্তি দেখিয়া আমার ঘৃণা জন্মিয়া গেছে। আর ভালো লাগে না। তুমি যাও।

মহেন্দ্র একেবারে মুহ্যমান হইয়া কহিল, "তুমি আমাকে ঘৃণা কর, বিনোদ?"

বিনোদিনী। হাঁ, ঘৃণা করি।

মহেন্দ্র। এখনো প্রায়শ্চিত্ত করিবার সময় আছে, বিনোদ। আমি যদি আর দ্বিধা না করি, সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাই, তুমি আমার সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত আছ?

বলিয়া মহেন্দ্র বিনোদিনীর দুই হাত সবলে ধরিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া লইল। বিনোদিনী কহিল, "ছাড়ো, আমার লাগিতেছে।"

মহেন্দ্র। তা লাগুক। বলো, তুমি আমার সঙ্গে যাইবে।

বিনোদিনী। না, যাইব না। কোনোমতেই না।

মহেন্দ্র। কেন যাইবে না। তুমিই আমাকে সর্বনাশের মুখে টানিয়া আনিয়াছ, আজ তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। তোমাকে যাইতেই হইবে।

বলিয়া মহেন্দ্র সুদৃঢ়বলে বিনোদিনীকে বুকের উপর টানিয়া লইল, জোর করিয়া তাহাকে ধরিয়া রাখিয়া কহিল, "তোমার ঘৃণাও আমাকে ফিরাইতে পারিবে না, আমি তোমাকে লইয়া যাইবই, এবং যেমন করিয়াই হউক, তুমি আমাকে ভালোবাসিবেই।"

বিনোদিনী সবলে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইল।

মহেন্দ্র কহিল, "চারিদিকে আগুন জ্বালাইয়া তুলিয়াছ, এখন আর নিবাইতেও পারিবে না, পালাইতেও পারিবে না।"

বলিতে বলিতে মহেন্দ্রের গলা চড়িয়া উঠিল, উচ্চৈঃস্বরে সে কহিল, "এমন খেলা কেন খেলিলে, বিনোদ। এখন আর ইহাকে খেলা বলিয়া মুক্তি পাইবে না। এখন তোমার আমার একই মৃত্যু।"

রাজলক্ষ্মী ঘরে ঢুকিয়া কহিলেন, "মহিন, কী করছিস।"

মহেন্দ্রের উন্মত্ত দৃষ্টি একনিমেষমাত্র মাতার মুখের দিকে ঘুরিয়া আসিল; তাহার

পরে পুনরায় বিনোদিনীর দিকে চাহিয়া মহেন্দ্র কহিল, “আমি সব ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছি, বলো, তুমি আমার সঙ্গে যাইবে।”

বিনোদিনী ক্রুদ্ধা রাজলক্ষ্মীর মুখের দিকে একবার চাহিল। তাহার পর অগ্রসর হইয়া অবিচলিতভাবে মহেন্দ্রের হাত ধরিয়া কহিল, “যাইব।”

মহেন্দ্র কহিল, “তবে আজকের মতো অপেক্ষা করো, আমি চলিলাম, কাল হইতে তুমি ছাড়া আমার আর কেহ রহিবে না।”

বলিয়া মহেন্দ্র চলিয়া গেল।

এমন সময় ধোবা আসিয়া বিনোদিনীকে কহিল, “মাঠাকরুন, আর তো বসিতে পারি না। আজ যদি তোমাদের ফুরসৎ না থাকে তো আমি কাল আসিয়া কাপড় লইয়া যাইব।”

খেমি আসিয়া কহিল, “বউঠাকরুন, সহিস বলিতেছে দানা ফুরাইয়া গেছে।” বিনোদিনী সাত দিনের দানা ওজন করিয়া আস্তাবলে পাঠাইয়া দিত, এবং নিজে জানালায় দাঁড়াইয়া ঘোড়ার খাওয়া দেখিত।

গোপাল-চাকর আসিয়া কহিল, “বউঠাকরুন, ঝড়ু-বেহারা আজ দাদামশায়ের (সাধুচরণের) সঙ্গে ঝগড়া করিয়াছে। সে বলিতেছে, তাহার কেরোসিনের হিসাব বুঝিয়া লইলেই সে সরকার-বাবুর কাছ হইতে বেতন চুকাইয়া লইয়া কাজ ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইবে।”

সংসারের সমস্ত কর্ম্মই পূর্ববৎ চলিতেছে।

৩৪

বিহারী এতদিন মেডিকাল কালেজে পড়িতেছিল। ঠিক পরীক্ষা দিবার পূর্বেই সে ছাড়িয়া দিল। কেহ বিস্ময় প্রকাশ করিলে বলিত, “পরের স্বাস্থ্য পরে দেখিব, আপাতত নিজের স্বাস্থ্য রক্ষা করা চাই।”

আসল কথা, বিহারীর উদ্যম অশেষ; একটা-কিছু না করিয়া তাহার থাকিবার জো নাই, অথচ যশের তৃষ্ণা, টাকার লোভ এবং জীবিকার জন্য উপার্জনের প্রয়োজন তাহার কিছুমাত্র ছিল না। কালেজে ডিগ্রী লইয়া প্রথমে সে শিবপুরে এঞ্জিনিয়ারিং শিখিতে গিয়াছিল। যতটুকু জানিতে তাহার কৌতূহল ছিল, এবং হাতের কাজে যতটুকু দক্ষতালাভ সে আবশ্যক বোধ করিত, সেইটুকু সমাধা করিয়াই সে মেডিকাল কালেজে প্রবেশ করে। মহেন্দ্র এক বৎসর পূর্বে ডিগ্রী লইয়া মেডিকাল কালেজে ভর্তি হয়।

কালেজের বাঙালি ছাত্রদের নিকট তাহাদের দুই জনের বন্ধুত্ব বিখ্যাত ছিল। তাহারা ঠাট্টা করিয়া ইহাদের দু-জনকে শ্যামদেশীয় জোড়া-যমজ বলিয়া ডাকিত। গত বৎসর মহেন্দ্র পরীক্ষায় ফেল করাতে দুই বন্ধু এক শ্রেণীতে আসিয়া মিলিল। এমন সময়ে হঠাৎ জোড় কেন যে ভাঙিল, তাহা ছাত্রেরা বুঝিতে পারিল না। রোজ যেখানে মহেন্দ্রের সঙ্গে দেখা হইবেই, অথচ তেমন করিয়া দেখা হইবে না, সেখানে বিহারী কিছুতেই যাইতে পারিল না। সকলেই জানিত, বিহারী ভালোরকম পাস করিয়া নিশ্চয় সম্মান ও পুরস্কার পাইবে, কিন্তু তাহার আর পরীক্ষা দেওয়া হইল না।

তাহাদের বাড়ির পার্শ্বে এক কুটিরে রাজেন্দ্র চক্রবর্তী বলিয়া এক গরিব ব্রাহ্মণ বাস করিত, ছাপাখানায় বারো টাকা বেতনে কম্পোজিটারি করিয়া সে জীবিকা চালাইত। বিহারী তাহাকে বলিল, "তোমার ছেলেকে আমার কাছে রাখো, আমি উহাকে নিজে লেখাপড়া শিখাইব।"

ব্রাহ্মণ বাঁচিয়া গেল। খুশি হইয়া তাহার আট বছরের ছেলে বসন্তকে বিহারীর হাতে সমর্পণ করিল।

বিহারী তাহাকে নিজের প্রণালীমতে শিক্ষা দিতে লাগিল। বলিল, "দশ বৎসর ১ বয়সের পূর্বে আমি ইহাকে বই পড়াইব না, সব মুখে মুখে শিখাইব।" তাহাকে লইয়া খেলা করিয়া, তাহাকে লইয়া গড়ের মাঠে, মিউজিয়ামে, আলিপুর-পশুশালায় শিবপুরের বাগানে ঘুরিয়া বিহারী দিন কাটাইতে লাগিল। তাহাকে মুখে মুখে ইংরাজি শেখানো, ইতিহাস গল্প করিয়া শোনানো, নানাপ্রকারে বালকের চিত্তবৃত্তি পরীক্ষা ও তাহার পরিণতিসাধন, বিহারীর সমস্ত দিনের কাজ এই ছিল—সে নিজেকে মুহূর্তমাত্র অবসর দিত না।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় বাহির হইবার জো ছিল না। দুপুরবেলায় বৃষ্টি থামিয়া আবার বিকাল হইতে বর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে। বিহারী তাহার দোতলার বড়ো ঘরে আলো জ্বালিয়া বসিয়া বসন্তকে লইয়া নিজের নূতন প্রণালীর খেলা করিতেছিল।

"বসন্ত, এ-ঘরে ক-টা কড়ি আছে, চট্ করিয়া বলো। না, গুনিতে পাইবে না।"

বসন্ত। কুড়িটা।

বিহারী। হার হইল—আঠারোটা।

ফস করিয়া খড়খড়ি খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ খড়খড়িতে কটা পাল্লা আছে?" বলিয়া খড়খড়ি বন্ধ করিয়া দিল।

বসন্ত বলিল, "ছয়টা।"

"জিত।"—'এই বেঞ্চিটা লম্বায় কত হইবে। এই বইটার কত ওজন।" এমনি

করিয়া বিহারী বসন্তর ইন্দ্রিয়বোধের উৎকর্ষসাধন করিতেছিল, এমন সময় বেহারা আসিয়া কহিল, "বাবুজি, একঠো ঔরৎ—"

কথা শেষ করিতে না করিতে বিনোদিনী ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল।

বিহারী আশ্চর্য হইয়া কহিল, "এ কী কাণ্ড, বোঠান।"

বিনোদিনী কহিল, "তোমার এখানে তোমার আত্মীয় স্ত্রীলোক কেহ নাই?"

বিহারী। আত্মীয়ও নাই, পরও নাই। পিসি আছেন দেশের বাড়িতে।

বিনোদিনী। তবে তোমার দেশের বাড়িতে আমাকে লইয়া চলো।

বিহারী। কী বলিয়া লইয়া যাইব।

বিনোদিনী। দাসী বলিয়া। আমি সেখানে ঘরের কাজ করিব।

বিহারী। পিসি কিছু আশ্চর্য হইবেন, তিনি আমাকে দাসীর অভাব তো জানান নাই। আগে শুনি, এ সংকল্প কেন মনে উদয় হইল। বসন্ত, যাও, শুইতে যাও।

বসন্ত চলিয়া গেল। বিনোদিনী কহিল, "বাহিরের ঘটনা শুনিয়া তুমি ভিতরের কথা কিছুই বুঝিতে পারিবে না।"

বিহারী। না-ই বুঝিলাম, না হয় ভুলই বুঝিব, ক্ষতি কী।

বিনোদিনী। আচ্ছা, না হয় ভুলই বুঝিয়ো। মহেন্দ্র আমাকে ভালোবাসে।

বিহারী। সে-খবর তো নূতন নয়, এবং এমন খবর নয়, যাহা দ্বিতীয় বার শুনিতে ইচ্ছা করে।

বিনোদিনী। বারবার শুনাইবার ইচ্ছা আমারও নাই। সেইজন্যই তোমার কাছে আসিয়াছি, আমাকে আশ্রয় দাও।

বিহারী। ইচ্ছা তোমার নাই? এ বিপত্তি কে ঘটাইল। মহেন্দ্র যে-পথে চলিয়াছিল সে-পথ হইতে তাহাকে কে ভ্রষ্ট করিয়াছে।

বিনোদিনী। আমি করিয়াছি। তোমার কাছে লুকাইব না, এ-সমস্তই আমারই কাজ। আমি মন্দ হই যা হই, একবার আমার মতো হইয়া আমার অন্তরের কথা বুঝিবার চেষ্টা করো। আমার বুকের জ্বালা লইয়া আমি মহেন্দ্রের ঘর জ্বালাইয়াছি। একবার মনে হইয়াছিল, আমি মহেন্দ্রকে ভালোবাসি, কিন্তু তাহা ভুল।

বিহারী। ভালোবাসিলে কি কেহ এমন অগ্নিকাণ্ড করিতে পারে।

বিনোদিনী। ঠাকুরপো, এ তোমার শাস্ত্রের কথা। এখনো ও-সব কথা শুনিবার মতো মতি আমার হয় নাই। ঠাকুরপো, তোমার পুঁথি রাখিয়া একবার অন্তর্যামীর মতো আমার হৃদয়ের মধ্যে দৃষ্টিপাত করো। আমার ভালোমন্দ সব আজ আমি তোমার কাছে বলিতে চাই।

বিহারী। পুঁথি সাধে খুলিয়া রাখি, বোঠান। হৃদয়কে হৃদয়েরই নিয়মে বুঝিবার ভার অন্তর্যামীরই উপরে থাক্, আমরা পুঁথির বিধান মিলাইয়া না চলিলে শেষকালে যে ঠেকাইতে পারি না।

বিনোদিনী। শুন ঠাকুরপো, আমি নির্লজ্জ হইয়া বলিতেছি, তুমি আমাকে ফিরাইতে পারিতে। মহেন্দ্র আমাকে ভালোবাসে বটে, কিন্তু সে নিরেট অন্ধ, আমাকে কিছুই বোঝে না। একবার মনে হইয়াছিল, তুমি আমাকে যেন বুঝিয়াছ— একবার তুমি আমাকে শ্রদ্ধা করিয়াছিলে— সত্য করিয়া বলো, সে-কথা আজ চাপা দিতে চেষ্টা করিয়ো না।

বিহারী। সত্যই বলিতেছি, আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করিয়াছিলাম।

বিনোদিনী। ভুল কর নাই ঠাকুরপো, কিন্তু বুঝিলেই যদি, শ্রদ্ধা করিলেই যদি, তবে সেইখানেই থামিলে কেন। আমাকে ভালোবাসিতে তোমার কী বাধা ছিল। আমি আজ নির্লজ্জ হইয়া তোমার কাছে আসিয়াছি, এবং আমি আজ নির্লজ্জ হইয়াই তোমাকে বলিতেছি—তুমিও আমাকে ভালোবাসিলে না কেন। আমার পোড়াকপাল। তুমিও কি না আশার ভালোবাসায় মজিলে। না, তুমি রাগ করিতে পাইবে না। বসো ঠাকুরপো, আমি কোনো কথা ঢাকিয়া বলিব না। তুমি যে আশাকে ভালোবাস, সে-কথা তুমি যখন নিজে জানিতে না, তখনো আমি জানিতাম। কিন্তু আশার মধ্যে তোমরা কী দেখিতে পাইয়াছ, আমি কিছুই বুঝিতে পারি না। ভালোই বল আর মন্দই বল, তাহার আছে কী। বিধাতা কি পুরুষের দৃষ্টির সঙ্গে অন্তর্দৃষ্টি কিছুই দেন নাই। তোমরা কী দেখিয়া, কতটুকু দেখিয়া ভোল। নির্বোধ! অন্ধ!

বিহারী উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "আজ তুমি আমাকে যাহা শুনাইবে সমস্তই আমি শুনিব— কিন্তু যে-কথা বলিবার নহে, সে কথা বলিয়ো না, তোমার কাছে আমার এই একান্ত মিনতি।"

বিনোদিনী। ঠাকুরপো, কোথায় তোমার ব্যথা লাগিতেছে, তাহা আমি জানি— কিন্তু যাহার শ্রদ্ধা আমি পাইয়াছিলাম এবং যাহার ভালোবাসা পাইলে আমার জীবন সার্থক হইত, তাহার কাছে এই রাত্রে ভয়-লজ্জা সমস্ত বিসর্জন দিয়া ছুটিয়া আসিলাম, সে যে কতবড়ো বেদনায় তাহা মনে করিয়া একটু ধৈর্য ধরো। আমি সত্যই বলিতেছি, তুমি যদি আশাকে ভালো না বাসিতে, তবে আমার দ্বারা আশার আজ এমন সর্বনাশ হইত না।"

বিহারী বিবর্ণ হইয়া কহিল, "আশার কী হইয়াছে। তুমি তাহার কী করিয়াছ।"

বিনোদিনী। মহেন্দ্র তাহার সমস্ত সংসার পরিত্যাগ করিয়া কাল আমাকে লইয়া চলিয়া যাইতে প্রস্তুত হইয়াছে।

বিহারী হঠাৎ গর্জন করিয়া উঠিল, "এ কিছুতেই হইতে পারে না। কোনোমতেই না।"

বিনোদিনী। কোনোমতেই না? মহেন্দ্রকে আজ কে ঠেকাইতে পারে।

বিহারী। তুমি পার।

বিনোদিনী খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল— তাহার পরে বিহারীর মুখের দিকে দুই চক্ষু স্থির রাখিয়া কহিল, "ঠেকাইব কাহার জন্য। তোমার আশার জন্য? আমার নিজের সুখদুঃখ কিছুই নাই? তোমার আশার ভালো হউক, মহেন্দ্রের সংসারের ভালো হউক, এই বলিয়া ইহকালে আমার সকল দাবি মুছিয়া ফেলিব, এত ভালো আমি নই—ধর্মশাস্ত্রের পুঁথি এত করিয়া আমি পড়ি নাই। আমি যাহা ছাড়িব তাহার বদলে আমি কী পাইব।"

বিহারীর মুখের ভাব ক্রমশ অত্যন্ত কঠিন হইয়া আসিল— কহিল, "তুমি অনেক স্পষ্ট কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াছ, এবার আমিও একটা স্পষ্ট কথা বলি। তুমি আজ যে কাণ্ডটা করিলে, এবং যে কথাগুলা বলিতেছ, ইহার অধিকাংশই, তুমি যে-সাহিত্য পড়িয়াছ তাহা হইতে চুরি। ইহার বারো আনাই নাটক এবং নভেল।"

বিনোদিনী। নাটক! নভেল!

বিহারী। হাঁ, নাটক, নভেল। তাও খুব উঁচুদরের নয়। তুমি মনে করিতেছ, এ-সমস্ত তোমার নিজের— তাহা নহে। এ-সবই ছাপাখানার প্রতিধ্বনি। যদি তুমি নিতান্ত নির্বোধ মূর্খ সরলা বালিকা হইতে, তাহা হইলেও সংসারে ভালোবাসা হইতে বঞ্চিত হইতে না— কিন্তু নাটকের নায়িকা স্টেজের উপরেই শোভা পায়, ঘরে তাহাকে লইয়া চলে না।

কোথায় বিনোদিনীর সেই তীব্র তেজ, দুঃসহ দর্প। মন্ত্রাহত ফণিনীর মতো সে স্তব্ধ হইয়া নত হইয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে, বিহারীর মুখের দিকে না চাহিয়া শান্তনম্রস্বরে কহিল, "তুমি আমাকে কী করিতে বল।"

বিহারী কহিল, "অসাধারণ কিছু করিতে চাহিয়ো না। সাধারণ স্ত্রীলোকের শুভবুদ্ধি যাহা বলে, তাই করো। দেশে চলিয়া যাও।"

বিনোদিনী। কেমন করিয়া যাইব।

বিহারী। মেয়েদের গাড়িতে তুলিয়া দিয়া আমি তোমাকে তোমাদের স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিব।

বিনোদিনী। আজ রাত্রে তবে আমি এইখানেই থাকি।

বিহারী। না, এত বিশ্বাস আমার নিজের ’পরে নাই।

শুনিয়া তৎক্ষণাৎ বিনোদিনী চৌকি হইতে ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়া, বিহারীর দুই পা প্রাণপণ বলে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, “ওইটুকু দুর্বলতা রাখো, ঠাকুরপো। একেবারে পাথরের দেবতার মতো পবিত্র হইয়ো না। মন্দকে ভালোবাসিয়া একটুখানি মন্দ হও।”

বলিয়া বিনোদিনী বিহারীর পদযুগল বার বার চুম্বন করিল। বিহারী বিনোদিনীর এই আকস্মিক অভাবনীয় ব্যবহারে ক্ষণকালের জন্য যেন আত্মসংবরণ করিতে পারিল না। তাহার শরীর-মনের সমস্ত গ্রন্থি যেন শিথিল হইয়া আসিল। বিনোদিনী বিহারীর এই স্তব্ধ বিহ্বল ভাব অনুভব করিয়া তাহার পা ছাড়িয়া দিয়া নিজের দুই হাঁটুর ‘উপর উন্নত হইয়া উঠিল, এবং চৌকিতে আসীন বিহারীর গলদেশ বাহুতে বেষ্টন করিয়া বলিল, “জীবনসর্বস্ব, জানি তুমি আমার চিরকালের নও, কিন্তু আজ এক মুহূর্তের জন্য আমাকে ভালোবাসো। তারপরে আমি আমাদের সেই বনে-জঙ্গলে চলিয়া যাইব, কাহারও কাছে কিছুই চাহিব না। মরণ পর্যন্ত মনে রাখিবার মতো আমাকে একটা কিছু দাও।” বলিয়া বিনোদিনী চোখ বুজিয়া তাহার ওষ্ঠাধর বিহারীর কাছে অগ্রসর করিয়া দিল। মুহূর্তকালের জন্য দুইজনে নিশ্চল এবং সমস্ত ঘর নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার পর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বিহারী ধীরে ধীরে বিনোদিনীর হাত ছাড়াইয়া লইয়া অন্য চৌকিতে গিয়া বসিল এবং রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করিয়া লইয়া কহিল, “আজ রাত্রি একটার সময় একটা প্যাসেঞ্জার-ট্রেন আছে।”

বিনোদিনী একটুখানি স্তব্ধ হইয়া রহিল, তাহার পরে অস্ফুটকণ্ঠে কহিল, “সেই ট্রেনেই যাইব।”

এমন সময়, পায়ে জুতা নাই, গায়ে জামা নাই, বসন্ত তাহার পরিস্ফুট গৌরসুন্দর দেহ লইয়া বিহারীর চৌকির কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া গম্ভীরমুখে বিনোদিনীকে দেখিতে লাগিল।

বিহারী জিজ্ঞাসা করিল, “শুতে যাসনি যে।” বসন্ত কোনো উত্তর না দিয়া গম্ভীরমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

বিনোদিনী দুই হাত বাড়াইয়া দিল। বসন্ত প্রথমে একটু দ্বিধা করিয়া, ধীরে ধীরে বিনোদিনীর কাছে গেল। বিনোদিনী তাহাকে দুই হাতে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া ঝরঝর করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

৩৫

যাহা অসম্ভব তাহাও সম্ভব হয়, যাহা অসহ্য তাহাও সহ্য হয়, নহিলে মহেন্দ্রের সংসারে সে-রাত্রি সেদিন কাটিত না। বিনোদিনীকে প্রস্তুত হইয়া থাকিতে পরামর্শ দিয়া মহেন্দ্র রাত্রেই একটা পত্র লিখিয়াছিল, সেই পত্র ডাকযোগে সকালে মহেন্দ্রের বাড়িতে পৌঁছিল।

আশা তখন শয্যাগত। বেহারা চিঠি হাতে করিয়া আসিয়া কহিল, "মাজি, চিট্‌ঠি।"

আশার হৃৎপিণ্ডে রক্ত ধক্‌ করিয়া ঘা দিল। এক পলকের মধ্যে সহস্র আশ্বাস ও আশঙ্কা এক সঙ্গে তাহার বক্ষে বাজিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি মাথা তুলিয়া চিঠিখানা লইয়া দেখিল, মহেন্দ্রের হাতের অক্ষরে বিনোদিনীর নাম। তৎক্ষণাৎ তাহার মাথা বালিশের উপরে পড়িয়া গেল— কোনো কথা না বলিয়া আশা সে-চিঠি বেহারার হাতে ফিরাইয়া দিল। বেহারা জিজ্ঞাসা করিল, "চিঠি কাহাকে দিতে হইবে।"

আশা কহিল, "জানি না।"

রাত্রি তখন আটটা হইবে, মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি ঝড়ের মতো বিনোদিনীর ঘরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল, দেখিল— ঘরে আলো নাই, সমস্ত অন্ধকার। পকেট হইতে একটা দেশালাইয়ের বাক্স বাহির করিয়া দেশালাই ধরাইল— দেখিল, ঘর শূন্য। বিনোদিনী নাই, তাহার জিনিসপত্রও নাই। দক্ষিণের বারান্দায় গিয়া দেখিল, বারান্দা নির্জন। ডাকিল, "বিনোদ।" কোনো উত্তর আসিল না।

"নির্বোধ। আমি নির্বোধ। তখনই সঙ্গে করিয়া লইয়া যাওয়া উচিত ছিল। নিশ্চয়ই মা বিনোদিনীকে এমন গঞ্জনা দিয়াছেন যে, সে ঘরে টিকিতে পারে নাই।"

সেই কল্পনামাত্র মনে উদয় হইতেই, তাহা নিশ্চয় সত্য বলিয়া তাহার মনে বিশ্বাস হইল। মহেন্দ্র অধীর হইয়া তৎক্ষণাৎ মার ঘরে গেল। সে-ঘরেও আলো নাই,— কিন্তু রাজলক্ষ্মী বিছানায় শুইয়া আছেন; তাহা অন্ধকারেও লক্ষ্য হইল। মহেন্দ্র একেবারেই রুষ্ট স্বরে বলিয়া উঠিল, "মা, তোমরা বিনোদিনীকে কী বলিয়াছ।"

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "কিছুই বলি নাই।"

মহেন্দ্র। তবে সে কোথায় গেছে।

রাজলক্ষ্মী। আমি কী জানি।

মহেন্দ্র অবিশ্বাসের স্বরে কহিল, "তুমি জান না? আচ্ছা, আমি তাহার সন্ধানে চলিলাম— সে যেখানেই থাক্‌, আমি তাহাকে বাহির করিবই।"

বলিয়া মহেন্দ্র চলিয়া গেল। রাজলক্ষ্মী তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে উঠিয়া তাহার

পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে চলিতে বলিতে লাগিলেন, "মহিন, যাসনে মহিন, ফিরিয়া আয়, আমার একটা কথা শুনিয়া যা।"

মহেন্দ্র এক নিশ্বাসে ছুটিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেল। মুহূর্ত পরেই ফিরিয়া আসিয়া দরোয়ানকে জিজ্ঞাসা করিল, "বহুঠাকুরানী কোথায় গিয়াছেন।"

দরোয়ান কহিল, "আমাদের বলিয়া যান নাই, আমরা কিছুই জানি না।"

মহেন্দ্র গর্জিত ভর্ৎসনার স্বরে কহিল, "জান না!"

দরোয়ান করজোড়ে কহিল, "না মহারাজ, জানি না।"

মহেন্দ্র মনে মনে স্থির করিল, "মা ইহাদের শিখাইয়া দিয়াছেন।" কহিল, "আচ্ছা, তা হউক।"

মহানগরীর রাজপথে গ্যাসালোকবিদ্ধ সন্ধ্যান্ধকারে বরফওয়ালা তখন বরফ ও তপসিমাছওয়ালা তপসিমাছ হাঁকিতেছিল। কলরবক্ষুব্ধ জনতার মধ্যে মহেন্দ্র প্রবেশ করিল এবং অদৃশ্য হইয়া গেল।

৩৬

বিহারী একলা নিজেকে লইয়া অন্ধকার রাত্রে কখনো ধ্যান করিতে বসে না। কোনোকালেই বিহারী নিজের কাছে নিজেকে আলোচ্য বিষয় করে নাই। সে পড়াশুনা কাজকর্ম বন্ধুবান্ধব লোকজন লইয়াই থাকিত। চারিদিকের সংসারকেই সে নিজের চেয়ে প্রাধান্য দিয়া আনন্দে ছিল, কিন্তু হঠাৎ একদিন প্রবল আঘাতে তাহার চারিদিক যেন বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িয়া গেল; প্রলয়ের অন্ধকারে অভ্রভেদী বেদনার গিরিশৃঙ্গে নিজেকে একলা লইয়া দাঁড়াইতে হইল। সেই হইতে নিজের নির্জন সঙ্গকে সে ভয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে; জোর করিয়া নিজের ঘাড়ে কাজ চাপাইয়া এই সঙ্গীটিকে সে কোনোমতেই অবকাশ দিতে চায় না।

কিন্তু আজ নিজের সেই অন্তরবাসীকে বিহারী কোনোমতেই ঠেলিয়া রাখিতে পারিল না। কাল্‌ বিনোদিনীকে বিহারী দেশে পৌছাইয়া দিয়া আসিয়াছে, তাহার পর হইতে সে যে-কোনো কাজে যে-কোনো লোকের সঙ্গেই আছে, তাহার গুহাশায়ী বেদনাতুর হৃদয় তাহাকে নিজের নিগূঢ় নির্জনতার দিকে অবিশ্রাম আকর্ষণ করিতেছে।

শ্রান্তি ও অবসাদে আজ বিহারীকে পরাস্ত করিল। রাত্রি তখন নয়টা হইবে; বিহারীর গৃহের সম্মুখবর্তী দক্ষিণের ছাতের উপর দিনান্তরম্য গ্রীষ্মের বাতাস

উতলা হইয়া উঠিয়াছে। বিহারী চন্দ্রোদয়হীন অন্ধকারে ছাদে একখানি কেদারা লইয়া বসিয়া আছে।

বালক বসন্তকে আজ সন্ধ্যাবেলায় সে পড়ায় নাই— সকাল সকাল তাহাকে বিদায় করিয়া দিয়াছে। আজ সান্ত্বনার জন্য, সঙ্গের জন্য, তাহার চিরাভ্যস্ত প্রীতিসুধাস্নিগ্ধ পূর্বজীবনের জন্য তাহার হৃদয় যেন মাতৃপরিত্যক্ত শিশুর মতো বিশ্বের অন্ধকারের মধ্যে দুই বাহু তুলিয়া কাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। আজ তাহার দৃঢ়তা, তাহার কঠোর সংযমের বাঁধ কোথায় ভাঙিয়া গেছে। যাহাদের কথা ভাবিবে না পণ করিয়াছিল, সমস্ত হৃদয় তাহাদের দিকে ছুটিয়াছে, আজ আর পথরোধ করিবার লেশমাত্র বল নাই।

মহেন্দ্রের সহিত বাল্যকালের প্রণয় হইতে সেই প্রণয়ের অবসান পর্যন্ত সমস্ত কথা —যে সুদীর্ঘ কাহিনী নানাবর্ণে চিত্রিত, জলে-স্থলে পর্বতে নদীতে বিভক্ত মানচিত্রের মতো তাহার মনের মধ্যে গুটানো ছিল— বিহারী প্রসারিত করিয়া ধরিল। যে ক্ষুদ্র জগৎটুকুর উপর সে তাহার জীবনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, তাহা কোন্‌খানে কোন্‌ দুর্গ্রহের সহিত সংঘাত পাইল, তাহাই সে মনে করিয়া দেখিতে লাগিল। প্রথমে বাহির হইতে কে আসিল। সূর্যাস্তকালের করুণ রক্তিমচ্ছটায় আভাসিত আশার লজ্জামণ্ডিত তরুণ মুখখানি অন্ধকারে অঙ্কিত হইয়া উঠিল, তাহার সঙ্গে-সঙ্গে মঙ্গল-উৎসবের পুণ্যশঙ্খধ্বনি তাহার কানে বাজিতে লাগিল। এই শুভগ্রহ অদৃষ্টাকাশের অজ্ঞাত প্রান্ত হইতে আসিয়া দুই বন্ধুর মাঝখানে দাঁড়াইল— একটু যেন বিচ্ছেদ আনিল, কোথা হইতে এমন একটি গূঢ় বেদনা আনিয়া উপস্থিত করিল, যাহা মুখে বলিবার নহে, যাহা মনেও লালন করিতে নাই। কিন্তু তবু এই বিচ্ছেদ, এই বেদনা অপূর্ব স্নেহরঞ্জিত মাধুর্যরশ্মির দ্বারা আচ্ছন্ন পরিপূর্ণ হইয়া রহিল।

তাহার পরে যে শনিগ্রহের উদয় হইল—বন্ধুর প্রণয়, দম্পতির প্রেম, গৃহের শান্তি ও পবিত্রতা একেবারে ছারখার করিয়া দিল, বিহারী প্রবল ঘৃণায় সেই বিনোদিনীকে সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত সুদূরে ঠেলিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু এ কী আশ্চর্য। আঘাত যেন অত্যন্ত মৃদু হইয়া গেল, তাহাকে যেন স্পর্শ করিল না। সেই পরমা সুন্দরী প্রহেলিকা তাহার দুর্ভেদ্যরহস্যপূর্ণ ঘনকৃষ্ণ অনিমেষ দৃষ্টি লইয়া কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারে বিহারীর সম্মুখে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। গ্রীষ্মরাত্রির উচ্ছ্বসিত দক্ষিণ-বাতাস তাহারই ঘন নিশ্বাসের মতো বিহারীর গায়ে আসিয়া পড়িতে লাগিল। ধীরে ধীরে সেই পলকহীন চক্ষুর জ্বালাময়ী দীপ্তি ম্লান হইয়া আসিতে লাগিল; সেই তৃষাশুষ্ক খর দৃষ্টি অশ্রুজলে সিক্ত স্নিগ্ধ হইয়া গভীর ভাবরসে দেখিতে দেখিতে পরিপ্লুত হইয়া উঠিল; মুহূর্তের মধ্যে সেই মূর্তি বিহারীর পায়ের কাছে পড়িয়া তাহার দুই জানু প্রাণপণ বলে

বক্ষে চাপিয়া ধরিল—তাহার পরে সে একটি অপরূপ মায়ালতার মতো নিমেষের মধ্যেই বিহারীকে বেষ্টন করিয়া বাড়িয়া উঠিয়া সদ্যোবিকশিত সুগন্ধি পুষ্পমঞ্জরিতুল্য একখানি চুম্বনোন্মুখ মুখ বিহারীর ওষ্ঠের নিকট আনিয়া উপনীত করিল। বিহারী চক্ষু বুজিয়া সেই কল্পমূর্তিকে স্মৃতিলোক হইতে নির্বাসিত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু কোনোমতেই তাহাকে আঘাত করিতে যেন তাহার হাত উঠিল না—একটি অসম্পূর্ণ ব্যাকুল চুম্বন তাহার মুখের কাছে আসন্ন হইয়া রহিল, পুলকে তাহাকে আবিষ্ট করিয়া তুলিল।

বিহারী ছাতের নির্জন অন্ধকারে আর থাকিতে পারিল না। আর-কোনো দিকে মন দিবার জন্য সে তাড়াতাড়ি দীপালোকিত ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল।

কোণে টিপাইয়ের উপর রেশমের-ঢাকা-দেওয়া একখানি বাঁধানো ফোটোগ্রাফ ছিল। বিহারী ঢাকা খুলিয়া সেই ছবিটি ঘরের মাঝখানে আলোর নিচে লইয়া বসিল— কোলের উপর রাখিয়া দেখিতে লাগিল।

ছবিটি মহেন্দ্র ও আশার বিবাহের অনতিকাল পরের যুগলমূর্তি। ছবির পশ্চাতে মহেন্দ্র নিজের অক্ষরে "মহিনদা" এবং আশা স্বহস্তে "আশা" এই নামটুকু লিখিয়া দিয়াছিল। ছবির মধ্যে সেই নবপরিণয়ের মধুর দিনটি আর ঘুচিল না। মহেন্দ্র চৌকিতে বসিয়া আছে, তাহার মুখে নূতন বিবাহের একটি নবীন সরস ভাবাবেশ; পাশে আশা দাঁড়াইয়া— ছবিওয়ালা তাহাকে মাথায় ঘোমটা দিতে দেয় নাই, কিন্তু তাহার মুখ হইতে লজ্জাটুকু খসাইতে পারে নাই। আজ মহেন্দ্র তাহার পার্শ্বচরী আশাকে কাঁদাইয়া কত দূরে চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু জড় ছবি মহেন্দ্রের মুখ হইতে নবীন প্রেমের একটি রেখাও বদল হইতে দেয় নাই, কিছু না বুঝিয়া মূঢ়ভাবে অদৃষ্টের পরিহাসকে স্থায়ী করিয়া রাখিয়াছে।

এই ছবিখানি কোলে লইয়া বিহারী বিনোদিনীকে ধিক্‌কারের দ্বারা সুদূরে নির্বাসিত করিতে চাহিল। কিন্তু বিনোদিনীর সেই প্রেমে-কাতর যৌবনে-কোমল বাহুদুটি বিহারীর জানু চাপিয়া রহিল। বিহারী মনে মনে কহিল, "এমন সুন্দর প্রেমের সংসার ছারখার করিয়া দিলি।" কিন্তু বিনোদিনীর সেই ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত ব্যাকুল মুখের চুম্বন-নিবেদন তাহাকে নীরবে কহিতে লাগিল, "আমি তোমাকে ভালোবাসি। সমস্ত জগতের মধ্যে আমি তোমাকে বরণ করিয়াছি।"

কিন্তু এই কি জবাব হইল। এই কথাই কি একটি ভগ্ন সংসারের নিদারুণ আর্তস্বরকে ঢাকিতে পারে। পিশাচী!

পিশাচী! বিহারী এটা কি পুরা ভর্ৎসনা করিয়া বলিল; না, ইহার সঙ্গে

একটুখানি আদরের সুর আসিয়াও মিশিল? যে মুহূর্তে বিহারী তাহার সমস্ত জীবনের সমস্ত প্রেমের দাবি হইতে বঞ্চিত হইয়া একেবারে নিঃস্ব ভিখারির মতো পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, সেই মুহূর্তে বিহারী কি এমন অযাচিত অজস্র প্রেমের উপহার সমস্ত হৃদয়ের সহিত উপেক্ষা করিয়া ফেলিয়া দিতে পারে। ইহার তুলনায় বিহারী কী পাইয়াছে। এতদিন পর্যন্ত সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়া সে কেবল প্রেম-ভাণ্ডারের খুদকুঁড়া ভিক্ষা করিতেছিল। প্রেমের অন্নপূর্ণা সোনার থালা ভরিয়া আজ একা তাহারই জন্য যে ভোজ পাঠাইয়াছেন, হতভাগ্য কিসের দ্বিধায় তাহা হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিবে।

ছবি কোলে লইয়া এই রকম নানা কথা যখন সে একমনে আলোচনা করিতেছিল, এমন সময় পার্শ্বে শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়া দেখিল মহেন্দ্র আসিয়াছে। চকিত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিতেই কোল হইতে ছবিখানি নিচে কার্পেটের উপর পড়িয়া গেল— বিহারী তাহা লক্ষ্য করিল না।

মহেন্দ্র একেবারেই বলিয়া উঠিল, "বিনোদিনী কোথায়।"

বিহারী মহেন্দ্রের কাছে অগ্রসর হইয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিল, "মহিনদা, একটু বসো ভাই, সকল কথার আলোচনা করা যাইতেছে।"

মহেন্দ্র কহিল, "আমার বসিবার এবং আলোচনা করিবার সময় নাই। বলো, বিনোদিনী কোথায়।"

বিহারী কহিল, "তুমি যে-প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিতেছ, এক কথায় তাহার উত্তর দেওয়া চলে না। একটু তোমাকে স্থির হইয়া বসিতে হইবে।"

মহেন্দ্র কহিল, "উপদেশ দিবে? সে-সব উপদেশের কথা আমি শিশুকালেই পড়িয়াছি।"

বিহারী। না, উপদেশ দিবার অধিকার ও ক্ষমতা আমার নাই।

মহেন্দ্র। ভর্ৎসনা করিবে? আমি জানি আমি পাষণ্ড, আমি নরাধম, এবং তুমি যাহা বলিতে চাও, তাহা সবই। কিন্তু কথা এই, তুমি জান কি না, বিনোদিনী কোথায়।

বিহারী। জানি।

মহেন্দ্র। আমাকে বলিবে কি না।

বিহারী। না।

মহেন্দ্র। বলিতেই হইবে। তুমি তাহাকে চুরি করিয়া আনিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছ। সে আমার, তাহাকে ফিরাইয়া দাও।

বিহারী ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার পর দৃঢ়স্বরে বলিল, "সে তোমার নহে। আমি তাহাকে চুরি করিয়া আনি নাই, সে নিজে আমার কাছে আসিয়া ধরা দিয়াছে।"

মহেন্দ্র গর্জন করিয়া উঠিল, "মিথ্যা কথা।" এই বলিয়া পার্শ্ববর্তী ঘরের রুদ্ধ দ্বারে আঘাত দিতে দিতে উচ্চস্বরে ডাকিল, "বিনোদ, বিনোদ।"

ঘরের ভিতর হইতে কান্নার শব্দ শুনিতে পাইয়া বলিয়া উঠিল, "ভয় নাই বিনোদ। আমি মহেন্দ্র, আমি তোমাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাইব— কেহ তোমাকে বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিবে না।"

বলিয়া মহেন্দ্র সবলে দ্বারে ধাক্কা দিতেই দ্বার খুলিয়া গেল। ভিতরে ছুটিয়া গিয়া দেখিল, ঘরে অন্ধকার। অস্ফুট ছায়ার মতো দেখিতে পাইল, বিছানায় কে যেন ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া অব্যক্ত শব্দ করিয়া বালিশ চাপিয়া ধরিল। বিহারী তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বসন্তকে বিছানা হইতে কোলে তুলিয়া সান্ত্বনার স্বরে বলিতে লাগিল, "ভয় নাই বসন্ত, ভয় নাই, কোনো ভয় নাই।"

মহেন্দ্র তখন দ্রুতপদে বাহির হইয়া বাড়ির সমস্ত ঘর দেখিয়া আসিল। যখন ফিরিয়া আসিল, তখনো বসন্ত ভয়ের আবেগে থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল, বিহারী তাহার ঘরে আলো জ্বালিয়া তাহাকে বিছানায় শোয়াইয়া গায়ে হাত বুলাইয়া তাহাকে ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিতেছিল।

মহেন্দ্র আসিয়া কহিল, "বিনোদিনীকে কোথায় রাখিয়াছ।"

বিহারী কহিল, "মহিনদা, গোল করিয়ো না, তুমি অকারণে এই বালককে যেরূপ ভয় পাওয়াইয়া দিয়াছ, ইহার অসুখ করিতে পারে। আমি বলিতেছি, বিনোদিনীর খবরে তোমার কোনো প্রয়োজন নাই।"

মহেন্দ্র কহিল, "সাধু, মহাত্মা, ধর্মের আদর্শ খাড়া করিয়ো না। আমার স্ত্রীর এই ছবি কোলে করিয়া রাত্রে কোন্ দেবতার ধ্যানে কোন্ পুণ্যমন্ত্র জপ করিতেছিলে? ভণ্ড!"

বলিয়া, ছবিখানি মহেন্দ্র ভূমিতে ফেলিয়া জুতাসুদ্ধ পা দিয়া তাহার কাচ চূর্ণ চূর্ণ করিল এবং প্রতিমূর্তিটি লইয়া টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া বিহারীর গায়ের উপর ফেলিয়া দিল।

তাহার মত্ততা দেখিয়া বসন্ত আবার ভয়ে কাঁদিয়া উঠিল। বিহারীর কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায় হইয়া আসিল— দ্বারের দিকে হস্তনির্দেশ করিয়া কহিল, "যাও।"

মহেন্দ্র ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

৩৭

বিনোদিনী যখন যাত্রিশূন্য মেয়েদের গাড়িতে চড়িয়া বাতায়ন হইতে চষামাঠ ও ছায়াবেষ্টিত এক-একখানি গ্রাম দেখিতে পাইল, তখন তাহার মনে স্নিগ্ধনিভৃত পল্লীর জীবনযাত্রা জাগিয়া উঠিল। সেই তরুচ্ছায়াবেষ্টনের মধ্যে তাহার স্বরচিত কল্পনা-নীড়ে নিজের প্রিয় বইগুলি লইয়া কিছুকাল নগরবাসের সমস্ত ক্ষোভ, দাহ ও ক্ষত-বেদনা হইতে সে যে শান্তিলাভ করিতে পারিবে, এই কথা তাহার মনে হইতে লাগিল। গ্রীষ্মের শস্যশূন্য দিগন্তপ্রসারিত ধূসর মাঠের মধ্যে সূর্যাস্তদৃশ্য দেখিয়া বিনোদিনী ভাবিতে লাগিল, আর যেন কিছুর দরকার নাই— মন যেন এইরূপ স্বর্ণরঞ্জিত স্তব্ধ-বিস্তীর্ণ শান্তির মধ্যে সমস্ত ভুলিয়া দুই চক্ষু মুদ্রিত করিতে চায়, তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সুখদুঃখ-সাগর হইতে জীবনতরীটি তীরে ভিড়াইয়া নিঃশব্দ সন্ধ্যায় একটি নিষ্কম্প বটবৃক্ষের তলায় বাঁধিয়া রাখিতে চায়, আর কিছুতেই কোনো প্রয়োজন নাই। গাড়ি চলিতে চলিতে এক-এক জায়গায় আম্রকুঞ্জ হইতে মুকুলের গন্ধ আসিতেই পল্লীর স্নিগ্ধশান্তি তাহাকে নিবিড়ভাবে আবিষ্ট করিয়া তুলিল। মনে মনে সে কহিল, “বেশ হইয়াছে, ভালোই হইয়াছে, নিজেকে লইয়া আর টানাছেঁড়া করিতে পারি না— এবারে সমস্ত ভুলিব, ঘুমাইব— পাড়াগাঁয়ের মেয়ে হইয়া ঘরের ও পল্লীর কাজে-কর্মে সন্তোষের সঙ্গে, আরামের সঙ্গে জীবন কাটাইয়া দিব।”

তৃষিত বক্ষে এই শান্তির আশা বহন করিয়া বিনোদিনী আপনার কুটিরের মধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু হায়, শান্তি কোথায়। কেবল শূন্যতা এবং দারিদ্র্য। চারি দিকেই সমস্ত জীর্ণ, অপরিচ্ছন্ন, অনাদৃত, মলিন। বহুদিনের রুদ্ধ স্যাঁতসেঁতে ঘরের বাষ্পে তাহার যেন নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল। ঘরে অল্পস্বল্প যে-সমস্ত আসবাবপত্র ছিল, তাহা কীটের দংশনে, ইঁদুরের উৎপাতে ও ধুলার আক্রমণে ছারখার হইয়া আসিয়াছে। সন্ধ্যার সময় বিনোদিনী ঘরে গিয়া পৌঁছিল— ঘর নিরানন্দ অন্ধকার। কোনোমতে সরষের তেলে প্রদীপ জ্বালাইতেই তাহার ধোঁয়ায় ও ক্ষীণ আলোতে ঘরের দীনতা আরো পরিস্ফুট হইল। আগে যাহা তাহাকে পীড়ন করিত না, এখন তাহা অসহ্য বোধ হইতে লাগিল— তাহার সমস্ত বিদ্রোহী অন্তঃকরণ সবলে বলিয়া উঠিল, “এখানে তো এক মুহূর্তও কাটিবে না।” কুলুঙ্গিতে পূর্বেকার দুই-একটা ধুলায় আচ্ছন্ন বই ও মাসিক পত্র পড়িয়া আছে, কিন্তু তাহা ছুঁইতে ইচ্ছা হইল না। বাহিরে বায়ুসম্পর্কশূন্য আমবাগানে ঝিল্লী ও মশার গুঞ্জনস্বর অন্ধকারে ধ্বনিত হইতে লাগিল।

বিনোদিনীর যে বৃদ্ধা অভিভাবিকা ছিলেন, তিনি ঘরে তালা লাগাইয়া মেয়েকে

দেখিতে সুদূরে জামাইবাড়িতে গিয়াছেন। বিনোদিনী প্রতিবেশিনীদের বাড়িতে গেল। তাহারা তাহাকে দেখিয়া যেন চকিত হইয়া উঠিল। ও মা, বিনোদিনীর দিব্য রং সাফ হইয়া উঠিয়াছে, কাপড়চোপড় ফিটফাট, যেন মেমসাহেবের মতো। তাহারা পরস্পরে কী যেন ইশারায় কহিয়া বিনোদিনীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া মুখচাওয়াচায়ি করিল। যেন কী একটা জনরব শোনা গিয়াছিল, তাহার সহিত লক্ষণ মিলিল।

বিনোদিনী তাহার পল্লী হইতে সর্বতোভাবে বহু দূরে গিয়া পড়িয়াছে, তাহা পদে-পদে অনুভব করিতে লাগিল। স্বগৃহে তাহার নির্বাসন। কোথাও তাহার এক মুহূর্তের আরামের স্থান নাই।

ডাকঘরের বুড়া পেয়াদা বিনোদিনীর আবাল্যপরিচিত। পরদিন বিনোদিনী যখন পুষ্করিণীর ঘাটে স্নান করিতে উদ্যত হইয়াছে, এমন সময় চিঠির ব্যাগ লইয়া পেয়াদাকে পথ দিয়া যাইতে দেখিয়া বিনোদিনী আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না। গামছা ফেলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া তাহাকে ডাকিয়া কহিল, "পাঁচুদাদা, আমার চিঠি আছে?"

বুড়া কহিল, "না।"

বিনোদিনী ব্যগ্র হইয়া কহিল, "থাকিতেও পারে। একবার দেখি।"

বলিয়া পাড়ার অল্প খানপাঁচ-ছয় চিঠি লইয়া উলটাইয়া-পালটাইয়া দেখিল, কোনোটাই তাহার নহে। বিমর্ষমুখে যখন ঘাটে ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার কোনো সখী সকৌতুক কটাক্ষে কহিল, "কী লো বিন্দি, চিঠির জন্যে এত ব্যস্ত কেন।"

আর-একজন প্রগল্‌ভা কহিল, "ভালো ভালো, ডাকের চিঠি আসে এত ভাগ্য কয়জনের। আমাদের তো স্বামী, দেবর, ভাই বিদেশে কাজ করে কিন্তু ডাকের পেয়াদার দয়া হয় না।"

এইরূপে কথায় কথায় পরিহাস স্ফুটতর ও কটাক্ষ তীক্ষ্ণতর হইয়া উঠিতে লাগিল। বিনোদিনী বিহারীকে অনুনয় করিয়া আসিয়াছিল, প্রত্যহ যদি নিতান্ত না ঘটে, তবে অন্তত সপ্তাহে দুইবার তাহাকে কিছু না-হয় তো দুই ছত্রও যেন চিঠি লেখে। আজই বিহারীর চিঠি পাইবার সম্ভাবনা অত্যন্ত বিরল, কিন্তু আকাঙ্ক্ষা এত অধিক হইয়া উঠিল যে, দূর সম্ভাবনার আশাও বিনোদিনী ছাড়িতে পারিল না। তাহার মনে হইতে লাগিল, যেন কতকাল কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছে।

মহেন্দ্রের সহিত জড়িত করিয়া বিনোদিনীর নামে নিন্দা গ্রামের ঘরে-ঘরে কিরূপ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, শত্রু-মিত্রের কৃপায় বিনোদিনীর কাছে তাহা অগোচর রহিল না। শান্তি কোথায়।

গ্রামবাসী সকলের কাছ হইতে বিনোদিনী নিজেকে নির্লিপ্ত করিয়া লইতে চেষ্টা করিল। পল্লীর লোকেরা তাহাতে আরও রাগ করিল। পাতকিনীকে কাছে লইয়া ঘৃণা ও পীড়ন করিবার বিলাসসুখ হইতে তাহারা বঞ্চিত হইতে চায় না।

ক্ষুদ্র পল্লীর মধ্যে নিজেকে সকলের কাছ হইতে গোপনে রাখিবার চেষ্টা বৃথা। এখানে আহত হৃদয়টিকে কোণের অন্ধকারে লইয়া নির্জনে শুশ্রূষা করিবার অবকাশ নাই— যেখান-সেখান হইতে সকলের তীক্ষ্ণ কৌতূহলদৃষ্টি আসিয়া ক্ষতস্থানে পতিত হয়। বিনোদিনীর অন্তঃপ্রকৃতি চুপড়ির ভিতরকার সজীব মাছের মতো যতই আছড়াইতে লাগিল, ততই চারিদিকের সংকীর্ণতার মধ্যে নিজেকে বারংবার আহত করিতে লাগিল। এখানে স্বাধীনভাবে পরিপূর্ণরূপে বেদনাভোগ করিবারও স্থান নাই।

দ্বিতীয় দিনে চিঠি পাইবার সময় উত্তীর্ণ হইতেই বিনোদিনী ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া লিখিতে বসিল—

> ঠাকুরপো, ভয় করিয়া না, আমি তোমাকে প্রেমের চিঠি লিখিতে বসি নাই। তুমি আমার বিচারক, আমি তোমাকে প্রণাম করি। আমি যে পাপ করিয়াছি, তুমি তাহার কঠিন দণ্ড দিয়াছ; তোমার আদেশমাত্র সে দণ্ড আমি মাথায় করিয়া বহন করিয়াছি। দুঃখ এই, দণ্ডটি যে কত কঠিন, তাহা তুমি দেখিতে পাইলে না। যদি দেখিতে, যদি জানিতে পাইতে, তাহা হইলে তোমার মনে যে-দয়া হইত তাহা হইতেও বঞ্চিত হইলাম। তোমাকে স্মরণ করিয়া, মনে মনে তোমার দুইখানি পায়ের কাছে মাথা রাখিয়া, আমি ইহাও সহ্য করিব। কিন্তু প্রভু, জেলখানার কয়েদি কি আহারও পায় না। শৌখিন আহার নহে— যতটুকু না হইলে তাহার প্রাণ বাঁচে না, সেটুকুও তো বরাদ্দ আছে। তোমার দুই ছত্র চিঠি আমার এই নির্বাসনের আহার— তাহা যদি না পাই, তবে আমার কেবল নির্বাসনদণ্ড নহে, প্রাণদণ্ড। আমাকে এত অধিক পরীক্ষা করিয়ো না, দণ্ডদাতা। আমার পাপমনে অহংকারের সীমা ছিল না— কাহারও কাছে আমাকে এমন করিয়া মাথা নোয়াইতে হইবে, ইহা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না। তোমার জয় হইয়াছে, প্রভু; আমি বিদ্রোহ করিব না। কিন্তু আমাকে দয়া করো— আমাকে বাঁচিতে দাও। এই অরণ্যবাসের সম্বল আমাকে অল্প-একটু করিয়া দিয়ো। তাহা হইলে তোমার শাসন হইতে আমাকে কেহই কিছুতেই টলাইতে পারিবে না। এইটুকু দুঃখের

কথাই জানাইলাম। আর যে-সব কথা মনে আছে, বলিবার জন্য বুক ফাটিয়া যাইতেছে, তাহা তোমাকে জানাইব না প্রতিজ্ঞা করিয়াছি— সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলাম।

তোমার
বিনোদ-বোঠান।

বিনোদিনী চিঠি ডাকে দিল— পাড়ার লোকে ছি ছি করিতে লাগিল। ঘরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া থাকে, চিঠি লেখে, চিঠি পাইবার জন্য পেয়াদাকে গিয়া আক্রমণ করে— কলিকাতায় দু-দিন থাকিলেই লজ্জাধর্ম খোয়াইয়া কি এমনই মাটি হইতে হয়।

পরদিনেও চিঠি পাইল না। বিনোদিনী সমস্ত দিন স্তব্ধ হইয়া রহিল, তাহার মুখ কঠিন হইয়া উঠিল। অন্তরে-বাহিরে চারিদিকের আঘাত ও অপমানের মন্থনে তাহার হৃদয়ের অন্ধকার তলদেশ হইতে নিষ্ঠুর সংহারশক্তি মূর্তিপরিগ্রহ করিয়া বাহির হইয়া আসিতে চাহিল। সেই নিদারুণ নিষ্ঠুরতার আবির্ভাব বিনোদিনী সভয়ে উপলব্ধি করিয়া ঘরে দ্বার দিল।

তাহার কাছে বিহারীর কিছুই ছিল না, ছবি না, একছত্র চিঠি না, কিছুই না। সে শূন্যের মধ্যে কিছু যেন একটা খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে বিহারীর একটা কিছু চিহ্নকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া শুষ্ক চক্ষে জল আনিতে চায়। অশ্রুজলে অন্তরের সমস্ত কঠিনতাকে গলাইয়া বিদ্রোহবহ্নিকে নির্বাপিত করিয়া বিহারীর কঠোর আদেশকে হৃদয়ের কোমলতম প্রেমের সিংহাসনে বসাইয়া রাখিতে চায়। কিন্তু অনাবৃষ্টির মধ্যাহ্ন-আকাশের মতো তাহার হৃদয় কেবল জ্বলিতেই লাগিল, দিগ্‌দিগন্তে কোথাও সে এক ফোঁটাও অশ্রুর লক্ষণ দেখিতে পাইল না।

বিনোদিনী শুনিয়াছিল, একাগ্রমনে ধ্যান করিতে করিতে যাহাকে ডাকা যায়, সে না আসিয়া থাকিতে পারে না। তাই জোড় হাত করিয়া চোখ বুজিয়া সে বিহারীকে ডাকিতে লাগিল, "আমার জীবন শূন্য, আমার হৃদয় শূন্য, আমার চতুর্দিক শূন্য— এই শূন্যতার মাঝখানে একবার তুমি এসো, এক মুহূর্তের জন্য এসো, তোমাকে আসিতেই হইবে, আমি কিছুতেই তোমাকে ছাড়িব না।"

এই কথা প্রাণপণ বলে বলিতে বলিতে বিনোদিনী যেন যথার্থ বল পাইল। মনে হইল, যেন এই প্রেমের বল, এই আহ্বানের বল, বৃথা হইবে না। কেবল স্মরণমাত্র করিয়া, দুরাশার গোড়ায় হৃদয়ের রক্ত সেচন করিয়া হৃদয় কেবল অবসন্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু এইরূপ একমনে ধ্যান করিয়া প্রাণপণ শক্তিতে কামনা করিতে থাকিলে নিজেকে যেন সহায়বান্ মনে হয়। মনে হয়, যেন প্রবল ইচ্ছা জগতের আর-সমস্ত

ছাড়িয়া কেবল বাঞ্ছিতকে আকর্ষণ করিতে থাকাতে প্রতিমুহূর্তে ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে সে নিকটবর্তী হইতেছে।

বিহারীর ধ্যানে যখন সন্ধ্যার দীপশূন্য অন্ধকার ঘর নিবিড়ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে— যখন সমাজ-সংসার, গ্রাম-পল্লী, সমস্ত বিশ্বভুবন প্রলয়ে বিলীন হইয়া গিয়াছে— তখন বিনোদিনী হঠাৎ দ্বারে আঘাত শুনিয়া ভূমিতল হইতে দ্রুতবেগে দাঁড়াইয়া উঠিল, অসংশয় বিশ্বাসে ছুটিয়া দ্বার খুলিয়া কহিল, "প্রভু, আসিয়াছ?" তাহার দৃঢ় প্রত্যয় হইল, এই মুহূর্তে জগতের আর-কেহই তাহার দ্বারে আসিতে পারে না।

মহেন্দ্র কহিল, "আসিয়াছি, বিনোদ।"

বিনোদিনী অপরিসীম বিরাগ ও প্রচণ্ড ধিক্কারের সহিত বলিয়া উঠিল, "যাও, যাও, যাও এখান হইতে। এখনই যাও।"

মহেন্দ্র অকস্মাৎ স্তম্ভিত হইয়া গেল।

"হাঁলা বিন্দি, তোর দিদিশাশুড়ী যদি কাল"— এই কথা বলিতে বলিতে কোনো প্রৌঢ়া প্রতিবেশিনী, বিনোদিনীর দ্বারের কাছে আসিয়া "ও মা" বলিয়া মস্ত ঘোমটা টানিয়া সবেগে পলায়ন করিল।

৩৮

পাড়ায় ভারি একটা গোলমাল পড়িয়া গেল। পল্লীবৃদ্ধেরা চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া কহিল, "এ কখনোই সহ্য করা যাইতে পারে না। কলিকাতায় কী ঘটিতেছিল, তাহা কানে না তুলিলেও চলিত, কিন্তু এমন সাহস যে মহেন্দ্রকে চিঠির উপর চিঠি লিখিয়া পাড়ায় আনিয়া এমন প্রকাশ্য নির্লজ্জতা! এরূপ ভ্রষ্টাকে গ্রামে রাখিলে তো চলিবে না।"

বিনোদিনী আজ নিশ্চয় আশা করিয়াছিল, বিহারীর পত্রের উত্তর পাইবে, কিন্তু উত্তর আসিল না। বিনোদিনী মনে মনে বলিতে লাগিল, "আমার উপরে বিহারীর কিসের অধিকার। আমি কেন তাহার হুকুম শুনিতে গেলাম। আমি কেন তাহাকে বুঝিতে দিলাম যে, সে আমার প্রতি যেমন বিধান করিবে আমি তাহাই নতশিরে গ্রহণ করিব। তাহার ভালোবাসার আশাকে বাঁচাইবার জন্য যেটুকু দরকার, আমার সঙ্গে কেবলমাত্র তাহার সেইটুকু সম্পর্ক? আমার নিজের কোনো প্রাপ্য নাই, দাবি নাই, সামান্য দুই ছত্র চিঠিও না— আমি এত তুচ্ছ, এত ঘৃণার সামগ্রী?" তখন ঈর্ষার বিষে বিনোদিনীর সমস্ত বক্ষ পূর্ণ হইয়া উঠিল— সে

কহিল, "আর-কাহারও জন্য এত দুঃখ সহ্য করা যাইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া আশার জন্য নয়। এই দৈন্য, এই বনবাস, এই লোকনিন্দা, এই অবজ্ঞা, এই জীবনের সকলপ্রকার অপরিতৃপ্তি, কেবল আশারই জন্য আমাকে বহন করিতে হইবে— এতবড়ো ফাঁকি কেন আমি মাথায় করিয়া লইলাম। কেন আমার সর্বনাশের ব্রত সম্পূর্ণ করিয়া আসিলাম না। নির্বোধ, আমি নির্বোধ। আমি কেন বিহারীকে ভালোবাসিলাম।"

বিনোদিনী যখন কাঠের মূর্তির মতো ঘরের মধ্যে কঠিন হইয়া বসিয়া ছিল, এমন সময় তাহার দিদিশাশুড়ী জামাইবাড়ি হইতে ফিরিয়া আসিয়াই তাহাকে কহিল, "পোড়ারমুখী, কী সব কথা শুনিতেছি।"

বিনোদিনী কহিল, "যাহা শুনিতেছ সবই সত্য কথা।"

দিদিশাশুড়ী। তবে এ কলঙ্ক পাড়ায় বহিয়া আনিবার কী দরকার ছিল— এখানে কেন আসিলি।

রুদ্ধ ক্ষোভে বিনোদিনী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। দিদিশাশুড়ী কহিল, "বাছা, এখানে তোমার থাকা হইবে না, তাহা বলিতেছি। পোড়া অদৃষ্টে আমার সবাই মরিয়া-ঝরিয়া গেল, ইহাও সহ্য করিয়া বাঁচিয়া আছি, কিন্তু তাই বলিয়া এ-সকল ব্যাপার আমি সহিতে পারিব না। ছি ছি, আমাদের মাথা হেঁট করিলে। তুমি এখনই যাও।"

বিনোদিনী কহিল, "আমি এখনই যাইব।"

এমন সময় মহেন্দ্র, স্নান নাই, আহার নাই, উস্কখুস্ক চুল করিয়া হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইল। সমস্ত রাত্রির অনিদ্রায় তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ, মুখ শুষ্ক। অন্ধকার থাকিতেই ভোরে আসিয়া সে বিনোদিনীকে লইয়া যাইবার জন্য দ্বিতীয় বার চেষ্টা করিবে, এইরূপ তাহার সংকল্প ছিল। কিন্তু পূর্বদিনে বিনোদিনীর অভূতপূর্ব ঘৃণার অভিঘাত পাইয়া তাহার মনে নানাপ্রকার দ্বিধার উদয় হইতে লাগিল। ক্রমে যখন বেলা হইয়া গেল, রেলগাড়ির সময় আসন্ন হইয়া আসিল, তখন স্টেশনের যাত্রিশালা হইতে বাহির হইয়া, মন হইতে সর্বপ্রকার বিচার-বিতর্ক সবলে দূর করিয়া, গাড়ি চড়িয়া মহেন্দ্র একেবারে বিনোদিনীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। লজ্জা ত্যাগ করিয়া প্রকাশ্যে দুঃসাহসের কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইলে যে একটা স্পর্ধাপূর্ণ বল জন্মে, সেই বলের আবেগে মহেন্দ্র একটা উদ্‌ভ্রান্ত আনন্দ বোধ করিল— তাহার সমস্ত অবসাদ ও দ্বিধা চূর্ণ হইয়া গেল। গ্রামের কৌতূহলী লোকগুলি তাহার উন্মত্ত দৃষ্টিতে ধূলির নির্জীব পুত্তলিকার

মতো বোধ হইল। মহেন্দ্র কোনোদিকে দৃক্‌পাতমাত্র না করিয়া একেবারে বিনোদিনীর কাছে আসিয়া কহিল, "বিনোদ, লোকনিন্দার মুখে তোমাকে একলা ফেলিয়া যাইব, এমন কাপুরুষ আমি নহি। তোমাকে যেমন করিয়া হউক, এখান হইতে লইয়া যাইতেই হইবে। তাহার পরে তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিতে চাও, পরিত্যাগ করিয়ো, আমি তোমাকে কিছুমাত্র বাধা দিব না। আমি তোমাকে স্পর্শ করিয়া আজ শপথ করিয়া বলিতেছি, তুমি যখন যেমন ইচ্ছা কর তাহাই হইবে— দয়া যদি কর তবে বাঁচিব; না যদি কর তবে তোমার পথ হইতে দূরে চলিয়া যাইব। আমি সংসারে নানা অবিশ্বাসের কাজ করিয়াছি, কিন্তু আজ আমাকে অবিশ্বাস করিয়ো না। আমরা প্রলয়ের মুখে দাঁড়াইয়াছি, এখন ছলনা করিবার সময় নহে।"

বিনোদিনী অত্যন্ত সহজভাবে অবিচলিত-মুখে কহিল, "আমাকে সঙ্গে লইয়া চলো। তোমার গাড়ি আছে ?"

মহেন্দ্র কহিল "আছে।"

বিনোদিনীর দিদিশাশুড়ী ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কহিল, "মহেন্দ্র, তুমি আমাকে চেন না, কিন্তু তুমি আমার পর নও। তোমার মা রাজলক্ষ্মী আমাদের গ্রামেরই মেয়ে, গ্রামসম্পর্কে আমি তাহার মামী। জিজ্ঞাসা করি, এ তোমার কী রকম ব্যবহার। ঘরে তোমার স্ত্রী আছে, মা আছে, আর তুমি এমন বেহায়া হইয়া, উন্মত্ত হইয়া ফিরিতেছ। ভদ্রসমাজে তুমি মুখ দেখাইবে কী বলিয়া।"

মহেন্দ্র যে ভাবোন্মাদের রাজ্যে ছিল, সেখানে এই একটা আঘাত লাগিল। তাহার মা আছে, স্ত্রী আছে, ভদ্রসমাজ বলিয়া একটা ব্যাপার আছে। এই সহজ কথাটা নূতন করিয়া যেন মনে উঠিল। এই অজ্ঞাত সুদূর পল্লীর অপরিচিত গৃহদ্বারে মহেন্দ্রকে যে এমন কথা শুনিতে হইবে, ইহা তাহার এক সময়ে স্বপ্নেরও অতীত ছিল। দিনের বেলায় গ্রামের মাঝখানে দাঁড়াইয়া সে একটি ভদ্রঘরের বিধবা রমণীকে ঘর হইতে পথে বাহির করিতেছে, মহেন্দ্রের জীবনচরিতে এমনও একটা অদ্ভুত অধ্যায় লিখিত হইল। তবু তাহার মা আছে, স্ত্রী আছে, এবং ভদ্রসমাজ আছে।

মহেন্দ্র যখন নিরুত্তর হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তখন বৃদ্ধা কহিল, "যাইতে হয় তো এখনই যাও, এখনই যাও। আমার ঘরের দাওয়ায় দাঁড়াইয়া থাকিয়ো না— আর এক মুহূর্তও দেরি করিয়ো না।"

বলিয়া বৃদ্ধা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। অস্নাত অভুক্ত মলিনবস্ত্র বিনোদিনী শূন্যহস্তে গাড়িতে গিয়া উঠিল। মহেন্দ্র যখন গাড়িতে উঠিতে গেল, বিনোদিনী কহিল, "না, স্টেশন দূরে নয়, তুমি হাঁটিয়া যাও।"

মহেন্দ্র কহিল, "তাহা হইলে গ্রামের সকল লোক আমাকে দেখিতে পাইবে।"

বিনোদিনী কহিল, "এখনো তোমার লজ্জার বাকি আছে?" বলিয়া গাড়ির দরজা বন্ধ করিয়া বিনোদিনী গাড়োয়ানকে বলিল, "স্টেশনে চলো।"

গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু যাইবে না?"

মহেন্দ্র একটু ইতস্তত করিয়া আর যাইতে সাহস করিল না। গাড়ি চলিয়া গেল। মহেন্দ্র গ্রামের পথ পরিত্যাগ করিয়া মাঠের পথ দিয়া ঘুরিয়া নতশিরে স্টেশনের অভিমুখে চলিল।

তখন গ্রামবধূদের স্নানাহার হইয়া গেছে। কেবল যে-সকল কর্মনিষ্ঠা প্রৌঢ়া গৃহিণী বিলম্বে অবকাশ পাইয়াছে, তাহারাই গামছা ও তেলের বাটি লইয়া আম্রমুকুলে-আমোদিত ছায়াস্নিগ্ধ পুষ্করিণীর নিভৃত ঘাটে চলিয়াছে।

৩৯

মহেন্দ্র কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গেল, সেই আশঙ্কায় রাজলক্ষ্মীর আহারনিদ্রা বন্ধ। সাধুচরণ সম্ভব-অসম্ভব সকল স্থানেই তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে— এমন সময় মহেন্দ্র বিনোদিনীকে লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল। পটলডাঙার বাসায় তাহাকে রাখিয়া রাত্রে মহেন্দ্র তাহার বাড়িতে আসিয়া পৌঁছিল।

মাতার ঘরে মহেন্দ্র প্রবেশ করিয়া দেখিল, ঘর অন্ধকারপ্রায়, কেরোসিনের লণ্ঠন আড়াল করিয়া রাখা হইয়াছে। রাজলক্ষ্মী রোগীর ন্যায় বিছানায় শুইয়া আছেন এবং আশা পদতলে বসিয়া আস্তে আস্তে তাঁহার পায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছে। এতকাল পরে গৃহের বধূ শাশুড়ীর পদতলের অধিকার পাইয়াছে।

মহেন্দ্র আসিতেই আশা চকিত হইয়া উঠিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। মহেন্দ্র বলপূর্বক সর্বপ্রকার দ্বিধা পরিত্যাগ করিয়া কহিল, "মা, এখানে আমার পড়ার সুবিধা হয় না; আমি কালেজের কাছে একটা বাসা লইয়াছি; সেইখানেই থাকিব।"

রাজলক্ষ্মী বিছানার প্রান্তে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া মহেন্দ্রকে কহিলেন, "মহিন, একটু বোস্।"

মহেন্দ্র সংকোচের সহিত বিছানায় বসিল। রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "মহিন, তোর যেখানে ইচ্ছা তুই থাকিস, কিন্তু আমার বউমাকে তুই কষ্ট দিসনে।"

মহেন্দ্র চুপ করিয়া রহিল। রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "আমার মন্দ কপাল, তাই আমি আমার এমন লক্ষ্মী বউকে চিনিতে পারি নাই"— বলিতে বলিতে রাজলক্ষ্মীর গলা ভাঙিয়া আসিল,— "কিন্তু তুই তাহাকে এতদিন জানিয়া, এত ভালোবাসিয়া, শেষকালে এত দুঃখের মধ্যে ফেলিলি কী করিয়া।" রাজলক্ষ্মী আর থাকিতে পারিলেন না, কাঁদিতে লাগিলেন।

মহেন্দ্র সেখান হইতে কোনোমতে উঠিয়া পালাইতে পারিলে বাঁচে, কিন্তু হঠাৎ উঠিতে পারিল না। মার বিছানার প্রান্তে অন্ধকারে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পরে রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "আজ রাত্রে তো এখানেই আছিস ?"

মহেন্দ্র কহিল, "না।"

রাজলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কখন যাবি।"

মহেন্দ্র কহিল, "এখনই।"

রাজলক্ষ্মী কষ্টে উঠিয়া বসিয়া কহিলেন, "এখনই ? একবার বউমার সঙ্গে ভালো করিয়া দেখাও করিয়া যাবি না ?"

মহেন্দ্র নিরুত্তর হইয়া রহিল। রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "এ-কয়টা দিন বউমার কেমন করিয়া কাটিয়াছে, তাহা কি তুই একটু বুঝিতেও পারিলি না। ওরে নির্লজ্জ, তোর নিষ্ঠুরতায় আমার বুক ফাটিয়া গেল।" বলিয়া রাজলক্ষ্মী ছিন্ন শাখার মতো শুইয়া পড়িলেন।

মহেন্দ্র মার বিছানা ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল। অতি মৃদুপদে নিঃশব্দগমনে সে সিঁড়ি দিয়া তাহার উপরের শয়নঘরে চলিল। আশার সহিত দেখা হয়, এ তাহার ইচ্ছা ছিল না।

মহেন্দ্র উপরে উঠিয়াই দেখিল, তাহার শয়নগৃহের সম্মুখে যে ঢাকা ছাদ আছে, সেইখানে আশা মাটিতে পড়িয়া। সে মহেন্দ্রের পায়ের শব্দ পায় নাই, হঠাৎ তাহাকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া তাড়াতাড়ি কাপড় সারিয়া লইয়া উঠিয়া বসিল। এই সময়ে মহেন্দ্র যদি একটিবার ডাকিত "চুনি"— তবে তখনই সে মহেন্দ্রের সমস্ত অপরাধ যেন নিজেরই মাথায় তুলিয়া লইয়া ক্ষমাপ্রাপ্ত অপরাধিনীর মতো মহেন্দ্রের দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার জীবনের সমস্ত কান্নাটা কাঁদিয়া লইত। কিন্তু মহেন্দ্র সে প্রিয়-নাম ডাকিতে পারিল না। যতই সে চেষ্টা করিল, ইচ্ছা করিল, যতই সে বেদনা পাইল, এ-কথা ভুলিতে পারিল না যে, আজ আশাকে আদর করা শূন্যগর্ভ পরিহাস-

মাত্র। তাহাকে মুখে সান্ত্বনা দিয়া কী হইবে, যখন বিনোদিনীকে পরিত্যাগ করিবার পথ মহেন্দ্র নিজের হাতে একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

আশা সংকোচে মরিয়া গিয়া বসিয়া রহিল। উঠিয়া দাঁড়াইতে, চলিয়া যাইতে, কোনোপ্রকার গতির চেষ্টামাত্র করিতে তাহার লজ্জাবোধ হইল। মহেন্দ্র কোনো কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে ছাদে পায়চারি করিতে লাগিল। কৃষ্ণপক্ষের আকাশে তখনো চাঁদ ওঠে নাই— ছাদের কোণে একটা ছোটো গামলায় রজনীগন্ধার গাছে দুইটি ডাঁটায় ফুল ফুটিয়াছে। ছাদের উপরকার অন্ধকার-আকাশে ওই নক্ষত্রগুলি,— ওই সপ্তর্ষি, ওই কালপুরুষ, তাহাদের অনেক সন্ধ্যার অনেক নিভৃত প্রেমাভিনয়ের নীরব সাক্ষী ছিল, আজও তাহারা নিস্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল।

মহেন্দ্র ভাবিতে লাগিল, মাঝখানের কয়টিমাত্র দিনের বিপ্লবকাহিনী এই আকাশ-ভরা অন্ধকার দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া যদি আগেকার ঠিক সেই দিনের মতো এই খোলা ছাদে মাদুর পাতিয়া আশার পাশে আমার সেই চিরন্তন স্থানটিতে অতি অনায়াসে গিয়া বসিতে পারি! কোনো প্রশ্ন নাই, জবাবদিহি নাই, সেই বিশ্বাস, সেই প্রেম, সেই সহজ আনন্দ! কিন্তু হায়, জগৎসংসারে সেইটুকুমাত্র জায়গায় ফিরিবার পথ আর নাই। এই ছাদে আশার পাশে মাদুরের একটুখানি ভাগ মহেন্দ্র একেবারে হারাইয়াছে। এতদিন বিনোদিনীর সঙ্গে মহেন্দ্রের অনেকটা স্বাধীন সম্বন্ধ ছিল। ভালোবাসিবার উন্মত্ত সুখ ছিল, কিন্তু তাহার অবিচ্ছেদ্য বন্ধন ছিল না। এখন মহেন্দ্র বিনোদিনীকে সমাজ হইতে স্বহস্তে ছিন্ন করিয়া আনিয়াছে, এখন আর বিনোদিনীকে কোথাও রাখিবার, কোথাও ফিরাইয়া দিবার জায়গা নাই— মহেন্দ্রই তাহার একমাত্র নির্ভর। এখন ইচ্ছা থাক্ বা না থাক্, বিনোদিনীর সমস্ত ভার তাহাকে বহন করিতেই হইবে। এই কথা মনে করিয়া মহেন্দ্রের হৃদয় ভিতরে ভিতরে পীড়িত হইতে লাগিল। তাহাদের ছাদের উপরকার এই ঘরকন্না, এই শান্তি, এই বাধাবিহীন দাম্পত্যমিলনের নিভৃত রাত্রি, হঠাৎ মহেন্দ্রের কাছে বড়ো আরামের বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু এই সহজসুলভ আরাম, যাহাতে একমাত্র তাহারই অধিকার, তাহাই আজ মহেন্দ্রের পক্ষে দুরাশার সামগ্রী। চিরজীবনের মতো যে-বোঝা সে মাথায় তুলিয়া লইয়াছে, তাহা নামাইয়া মহেন্দ্র এক মুহূর্তও হাঁপ ছাড়িতে পারিবে না।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মহেন্দ্র একবার আশার দিকে চাহিয়া দেখিল। নিস্তব্ধ রোদনে বক্ষ পরিপূর্ণ করিয়া আশা তখনো নিশ্চল হইয়া বসিয়া আছে— রাত্রির অন্ধকার জননীর অঞ্চলের ন্যায় তাহার লজ্জা ও বেদনা আবৃত করিয়া রাখিয়াছে।

মহেন্দ্র পায়চারি ভঙ্গ করিয়া কী বলিবার জন্য হঠাৎ আশার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সমস্ত শরীরের রক্ত আশার কানের মধ্যে গিয়া শব্দ করিতে লাগিল, সে চক্ষু মুদ্রিত করিল। মহেন্দ্র কী বলিতে আসিয়াছিল, ভাবিয়া পাইল না, তাহার কীই বা বলিবার আছে। কিন্তু কিছু-একটা না বলিয়া আর ফিরিতে পারিল না। বলিল, "চাবির গোছাটা কোথায়।"

চাবির গোছা ছিল বিছানার গদিটার নিচে। আশা উঠিয়া ঘরের মধ্যে গেল—মহেন্দ্র তাহার অনুসরণ করিল। গদির নিচে হইতে চাবি বাহির করিয়া আশা গদির উপরে রাখিয়া দিল। মহেন্দ্র চাবির গোছা লইয়া নিজের কাপড়ের আলমারিতে এক-একটি চাবি লাগাইয়া দেখিতে লাগিল। আশা আর থাকিতে পারিল না, মৃদুস্বরে কহিল, "ও-আলমারির চাবি আমার কাছে ছিল না।"

কাহার কাছে চাবি ছিল সে-কথা আশার মুখ দিয়া বাহির হইল না, কিন্তু মহেন্দ্র তাহা বুঝিল। আশা তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, ভয় হইল, পাছে মহেন্দ্রের কাছে আর তাহার কান্না চাপা না থাকে। অন্ধকারে ছাদের প্রাচীরের এক কোণে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া উচ্ছ্বসিত রোদনকে প্রাণপণে রুদ্ধ করিয়া সে কাঁদিতে লাগিল।

কিন্তু অধিকক্ষণ কাঁদিবার সময় ছিল না। হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, মহেন্দ্রের আহারের সময় হইয়াছে। দ্রুতপদে আশা নিচে চলিয়া গেল।

রাজলক্ষ্মী আশাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহিন কোথায়, বউমা।"

আশা কহিল, "তিনি উপরে।"

রাজলক্ষ্মী। তুমি নামিয়া আসিলে যে।

আশা নতমুখে কহিল, "তাঁহার খাবার—"

রাজলক্ষ্মী। খাবারের আমি ব্যবস্থা করিতেছি, বউমা, তুমি একটু পরিষ্কার হইয়া লও। তোমার সেই নূতন ঢাকাই শাড়িখানা শীঘ্র পরিয়া আমার কাছে এসো, আমি তোমার চুল বাঁধিয়া দিই।

শাশুড়ীর আদর উপেক্ষা করিতে পারে না, কিন্তু এই সাজসজ্জার প্রস্তাবে আশা মরমে মরিয়া গেল। মৃত্যু ইচ্ছা করিয়া ভীষ্ম যেরূপ স্তব্ধ হইয়া শরবর্ষণ সহ্য করিয়াছিলেন, আশাও সেরূপ রাজলক্ষ্মীর কৃত সমস্ত প্রসাধন পরমধৈর্যে সর্বাঙ্গে গ্রহণ করিল।

সাজ করিয়া আশা অতি ধীরে ধীরে নিঃশব্দপদে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিল। উঁকি দিয়া দেখিল, মহেন্দ্র ছাদে নাই। আস্তে-আস্তে দ্বারের কাছে আসিয়া দেখিল, মহেন্দ্র ঘরেও নাই, তাহার খাবার অভুক্ত পড়িয়া আছে।

চাবির অভাবে কাপড়ের আলমারি জোর করিয়া খুলিয়া আবশ্যক কয়েকখান কাপড় ও ডাক্তারি বই লইয়া মহেন্দ্র চলিয়া গেছে।

পরদিন একাদশী ছিল। অসুস্থ ক্লিষ্টদেহ রাজলক্ষ্মী বিছানায় পড়িয়া ছিলেন। বাহিরে ঘন মেঘে ঝড়ের উপক্রম করিয়াছে। আশা ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। আস্তে-আস্তে রাজলক্ষ্মীর পায়ের কাছে বসিয়া তাঁহার পায়ে হাত দিয়া কহিল, "তোমার দুধ ও ফল আনিয়াছি মা, খাবে এসো।"

করুণমূর্তি বধূর এই অনভ্যস্ত সেবার চেষ্টা দেখিয়া রাজলক্ষ্মীর শুষ্ক চক্ষু প্লাবিত হইয়া গেল। তিনি উঠিয়া বসিয়া আশাকে কোলে লইয়া তাহার অশ্রুজলসিক্ত কপোল চুম্বন করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহিন, এখন কী করিতেছে বউমা"

আশা অত্যন্ত লজ্জিত হইল— মৃদুস্বরে কহিল, "তিনি চলিয়া গেছেন।"

রাজলক্ষ্মী। কখন চলিয়া গেল, আমি তো জানিতেও পারি নাই।

আশা নতশিরে কহিল, "তিনি কাল রাত্রেই গেছেন।"

শুনিবামাত্র রাজলক্ষ্মীর সমস্ত কোমলতা যেন দূর হইয়া গেল— বধূর প্রতি তাঁহার আদরস্পর্শের মধ্যে আর রসলেশমাত্র রহিল না। আশা একটা নীরব লাঞ্ছনা অনুভব করিয়া নতমুখে আস্তে-আস্তে চলিয়া গেল।

৪০

প্রথম রাত্রে বিনোদিনীকে পটলডাঙার বাসায় রাখিয়া মহেন্দ্র যখন তাহার কাপড় ও বই আনিতে বাড়ি গেল, বিনোদিনী তখন কলিকাতার বিশ্রামবিহীন জনতরঙ্গের কোলাহলে একলা বসিয়া নিজের কথা ভাবিতেছিল। পৃথিবীতে তাহার আশ্রয়স্থান কোনোকালেই যথেষ্ট বিস্তীর্ণ ছিল না, তবু তাহার এক পাশ তাতিয়া উঠিলে আর-একপাশে ফিরিয়া শুইবার একটুখানি জায়গা ছিল— আজ তাহার নির্ভরস্থল অত্যন্ত সংকীর্ণ। সে যে-নৌকায় চড়িয়া স্রোতে ভাসিয়াছে, তাহা দক্ষিণে বামে একটু কাত হইলেই একেবারে জলের মধ্যে গিয়া পড়িতে হইবে। অতএব বড়োই স্থির হইয়া হাল ধরা চাই, একটু ভুল, একটু নাড়াচাড়া সহিবে না। এ অবস্থায় কোন্ রমণীর হৃদয় না কম্পিত হয়। পরের মন সম্পূর্ণ বশে রাখিতে যেটুকু লীলা-খেলা চাই, যেটুকু অন্তরালের প্রয়োজন, এই সংকীর্ণতার মধ্যে তাহার অবকাশ কোথায়। একেবারে মহেন্দ্রের সহিত মুখোমুখি করিয়া তাহাকে সমস্ত জীবন যাপন করিতে প্রস্তুত হইতে হইবে। প্রভেদ এই যে, মহেন্দ্রের কূলে উঠিবার উপায় আছে, কিন্তু বিনোদিনীর তাহা নাই।

বিনোদিনী নিজের এই অসহায় অবস্থা যতই সুস্পষ্ট বুঝিল ততই সে মনের মধ্যে বলসঞ্চয় করিতে লাগিল। একটা উপায় তাহাকে করিতেই হইবে, এ-ভাবে তাহার চলিবে না।

যেদিন বিহারীর কাছে বিনোদিনী নিজের প্রেম নিবেদন করিয়াছে, সেদিন হইতে তাহার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙিয়া গেছে। যে উদ্যত চুম্বন বিহারীর মুখের কাছ হইতে সে ফিরাইয়া লইয়া আসিয়াছে, জগতে তাহা কোথাও আর নামাইয়া রাখিতে পারিতেছে না, পূজার অর্ঘ্যের ন্যায় দেবতার উদ্দেশে তাহা রাত্রিদিন বহন করিয়াই রাখিয়াছে। বিনোদিনীর হৃদয় কোনো অবস্থাতেই সম্পূর্ণ হাল ছাড়িয়া দিতে জানে না— নৈরাশ্যকে সে স্বীকার করে না। তাহার মন অহরহ প্রাণপণ বলে বলিতেছে, “আমার এ পূজা বিহারীকে গ্রহণ করিতেই হইবে।”

বিনোদিনীর এই দুর্দান্ত প্রেমের উপরে তাহার আত্মরক্ষার একান্ত আকাঙ্ক্ষা যোগ দিল। বিহারী ছাড়া তাহার আর উপায় নাই। মহেন্দ্রকে বিনোদিনী খুব ভালো করিয়াই জানিয়াছে, তাহার উপরে নির্ভর করিতে গেলে সে ভর সয় না— তাহাকে ছাড়িয়া দিলে তবেই তাহাকে পাওয়া যায়, তাহাকে ধরিয়া থাকিলে সে ছুটিতে চায়। কিন্তু নারীর পক্ষে যে নিশ্চিন্ত বিশ্বস্ত নিরাপদ নির্ভর একান্ত আবশ্যক, বিহারীই তাহা দিতে পারে। আজ আর বিহারীকে ছাড়িলে বিনোদিনীর একেবারেই চলিবে না।

গ্রাম ছাড়িয়া আসিবার দিন তাহার নামের সমস্ত চিঠিপত্র নূতন ঠিকানায় পাঠাইবার জন্য মহেন্দ্রকে দিয়া বিনোদিনী স্টেশনের সংলগ্ন পোস্ট আপিসে বিশেষ করিয়া বলিয়া আসিয়াছিল। বিহারী যে একেবারেই তাহার চিঠির কোনো উত্তর দিবে না, এ-কথা বিনোদিনী কোনোমতেই স্বীকার করিল না— সে বলিল, “আমি সাতটা দিন ধৈর্য ধরিয়া উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিব, তাহার পরে দেখা যাইবে।”

এই বলিয়া বিনোদিনী অন্ধকারে জানালা খুলিয়া গ্যাসালোকদীপ্ত কলিকাতার দিকে অন্যমনে চাহিয়া রহিল। এই সন্ধ্যাবেলায় বিহারী এই শহরের মধ্যেই আছে — ইহারই গোটাকতক রাস্তা ও গলি পার হইয়া গেলেই এখনই তাহার দরজার কাছে পৌঁছানো যাইতে পারে— তাহার পরে সেই জলের কলওয়ালা ছোটো আঙিনা, সেই সিঁড়ি, সেই সুসজ্জিত পরিপাটি আলোকিত নিভৃত ঘরটি— সেখানে নিস্তব্ধ শান্তির মধ্যে বিহারী একলা কেদারায় বসিয়া আছে— হয়তো কাছে সেই ব্রাহ্মণ-বালক, সেই সুগোল সুন্দর গৌরবর্ণ আয়তনেত্র সরলমূর্তি ছেলেটি নিজের মনে ছবির বই লইয়া পাতা উলটাইতেছে— একে-একে সমস্ত চিত্রটা মনে করিয়া স্নেহে

প্রেমে বিনোদিনীর সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণ পুলকিত হইয়া উঠিল। ইচ্ছা করিলে এখনই যাওয়া যায়, ইহাই মনে করিয়া বিনোদিনী ইচ্ছাকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া খেলা করিতে লাগিল। আগে হইলে হয়তো সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিতে সে অগ্রসর হইত; কিন্তু এখন অনেক কথা ভাবিতে হয়। এখন শুধু বাসনা চরিতার্থ করা নয়, উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইবে। বিনোদিনী কহিল, "আগে দেখি বিহারী কিরূপ উত্তর দেয়, তাহার পরে কোন্ পথে চলা আবশ্যক, স্থির করা যাইবে।" কিছু না বুঝিয়া বিহারীকে বিরক্ত করিতে যাইতে তাহার আর সাহস হইল না।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে যখন রাত্রি নয়টা-দশটা বাজিয়া গেল, তখন মহেন্দ্র ধীরে ধীরে আসিয়া উপস্থিত। কয়দিন অনিদ্রায় অনিয়মে অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায় সে কাটাইয়াছে; আজ কৃতকার্য হইয়া বিনোদিনীকে বাসায় আনিয়া একেবারে অবসাদ ও শ্রান্তিতে তাহাকে যেন অভিভূত করিয়া দিয়াছে। আজ আর সংসারের সঙ্গে নিজের অবস্থার সঙ্গে লড়াই করিবার বল যেন তাহার নাই। তাহার সমস্ত ভারাক্রান্ত ভাবী জীবনের ক্লান্তি যেন তাহাকে আজ আগে হইতে আক্রমণ করিল।

রুদ্ধ দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া ঘা দিতে মহেন্দ্রের অত্যন্ত লজ্জাবোধ হইতে লাগিল। যে উন্মত্ততায় সমস্ত পৃথিবীকে সে লক্ষ্য করে নাই, সে মত্ততা কোথায়। পথের অপরিচিত লোকদের দৃষ্টির সম্মুখেও তাহার সর্বাঙ্গ সংকুচিত হইতেছে কেন।

ভিতরে নূতন চাকরটা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে— দরজা খোলাইতে অনেক হাঙ্গাম করিতে হইল। অপরিচিত নূতন বাসার অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মহেন্দ্রের মন দমিয়া গেল। মাতার আদরের ধন মহেন্দ্র চিরদিন যে বিলাস-উপকরণে, যে-সকল টানাপাখা ও মূল্যবান চৌকি-সোফায় অভ্যস্ত, বাসার নূতন আয়োজনে তাহার অভাব সেই সন্ধ্যাবেলায় অত্যন্ত পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। এই সমস্ত আয়োজন মহেন্দ্রকে সম্পূর্ণ করিতে হইবে, বাসার সমস্ত ব্যবস্থার ভার তাহারই উপরে। মহেন্দ্র কখনো নিজের বা পরের আরামের জন্য চিন্তা করে নাই— আজ হইতে একটি নূতন-গঠিত অসম্পূর্ণ সংসারের সমস্ত খুঁটিনাটি তাহাকেই বহন করিতে হইবে। সিঁড়িতে একটা কেরোসিনের ডিবা অপর্যাপ্ত ধূমোদ্গার করিয়া মিটমিট করিতেছিল— তাহার পরিবর্তে একটা ভালো ল্যাম্প কিনিতে হইবে। বারান্দা বাহিয়া সিঁড়িতে উঠিবার রাস্তাটা কলের জলের প্রবাহে স্যাঁতস্যাঁত করিতেছে— মিস্ত্রি ডাকাইয়া বিলাতী মাটির দ্বারা সে জায়গা মেরামত করা আবশ্যক। রাস্তার দিকের দুটো ঘর যে জুতার দোকানদারদের হাতে ছিল, তাহারা সে দুটো ঘর এখনো ছাড়ে নাই, তাহা লইয়া বাড়িওয়ালার সহিত লড়াই করিতে হইবে। এই-সমস্ত কাজ

তাহার নিজে না করিলে নয়, ইহাই চকিতের মধ্যে মনে উদয় হইয়া তাহার শ্রান্তির বোঝায় আরও বোঝা চাপিল।

মহেন্দ্র সিঁড়ির কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া নিজেকে সামলাইয়া লইল— বিনোদিনীর প্রতি তাহার যে প্রেম ছিল, তাহাকে উত্তেজিত করিল। নিজেকে বুঝাইল যে, এতদিন সমস্ত পৃথিবীকে ভুলিয়া সে যাহাকে চাহিয়াছিল, আজ তাহাকে পাইয়াছে, আজ উভয়ের মাঝখানে কোনো বাধা নাই— আজ মহেন্দ্রের আনন্দের দিন। কিন্তু কোনো বাধা যে নাই, তাহাই সর্বাপেক্ষা বড়ো বাধা, আজ মহেন্দ্র নিজেই নিজের বাধা।

বিনোদিনী রাস্তা হইতে মহেন্দ্রকে দেখিয়া তাহার ধ্যানাসন হইতে উঠিয়া ঘরে আলো জ্বালিল, এবং একটা সেলাই কোলে লইয়া নতশিরে তাহাতে নিবিষ্ট হইল— এই সেলাই বিনোদিনীর আবরণ, ইহার অন্তরালে তাহার যেন একটা আশ্রয় আছে।

মহেন্দ্র ঘরে ঢুকিয়া কহিল, "বিনোদ, এখানে নিশ্চয় তোমার অনেক অসুবিধা ঘটিতেছে।"

বিনোদিনী সেলাই করিতে করিতে বলিল, "কিছুমাত্র না।"

মহেন্দ্র কহিল, "আমি আর দুই-তিন দিনের মধ্যেই সমস্ত আসবাব আনিয়া উপস্থিত করিব, এই কয়দিন তোমাকে একটু কষ্ট পাইতে হইবে।"

বিনোদিনী কহিল, "না, সে কিছুতেই হইতে পারিবে না— তুমি আর-একটিও আসবাব আনিয়ো না, এখানে যাহা আছে তাহা আমার আবশ্যকের চেয়ে ঢের বেশি।"

মহেন্দ্র কহিল, "আমি-হতভাগ্যও কি সেই ঢের বেশির মধ্যে।"

বিনোদিনী। নিজেকে অত 'বেশি' মনে করিতে নাই— একটু বিনয় থাকা ভালো।

সেই নির্জন দীপালোকে কর্মরত নতশির বিনোদিনীর আত্মসমাহিত মূর্তি দেখিয়া মুহূর্তের মধ্যে মহেন্দ্রের মনে আবার সেই মোহের সঞ্চার হইল।

বাড়িতে হইলে ছুটিয়া সে বিনোদিনীর পায়ের কাছে আসিয়া পড়িত— কিন্তু এ তো বাড়ি নহে, সেইজন্য মহেন্দ্র তাহা পারিল না। আজ বিনোদিনী অসহায়, একান্তই সে মহেন্দ্রের আয়ত্তের মধ্যে, আজ নিজেকে সংযত না রাখিলে বড়োই কাপুরুষতা হয়।

বিনোদিনী কহিল, "এখানে তুমি তোমার বই-কাপড়গুলা আনিলে কেন।"

মহেন্দ্র কহিল, "ওগুলাকে যে আমি আমার আবশ্যকের মধ্যেই গণ্য করি। ওগুলা 'ঢের বেশি'র দলে নয়।"

বিনোদিনী। জানি, কিন্তু এখানে ও-সব কেন।

মহেন্দ্র। সে ঠিক কথা, এখানে কোনো আবশ্যক জিনিস শোভা পায় না— বিনোদ, বইটইগুলো তুমি রাস্তায় টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়ো, আমি আপত্তিমাত্র করিব না, কেবল সেই-সঙ্গে আমাকেও ফেলিয়ো না।

বলিয়া এই উপলক্ষে মহেন্দ্র একটুখানি সরিয়া আসিয়া কাপড়ে-বাঁধা বইয়ের পুঁটুলি বিনোদিনীর পায়ের কাছে আনিয়া ফেলিল।

বিনোদিনী গম্ভীরমুখে সেলাই করিতে করিতে মাথা না তুলিয়া বলিল, "ঠাকুরপো, এখানে তোমার থাকা হইবে না।"

মহেন্দ্র তাহার সদ্যোজাগ্রত আগ্রহের মুখে প্রতিঘাত পাইয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিল — গদ্‌গদকণ্ঠে কহিল, "কেন বিনোদ, কেন তুমি আমাকে দূরে রাখিতে চাও। তোমার জন্য সমস্ত ত্যাগ করিয়া কি এই পাইলাম।"

বিনোদিনী। আমার জন্য তোমাকে সমস্ত ত্যাগ করিতে দিব না।

মহেন্দ্র বলিয়া উঠিল, "এখন সে আর তোমার হাতে নাই— সমস্ত সংসার আমার চারিদিক হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে— কেবল তুমি একলা আছ, বিনোদ। বিনোদ— বিনোদ— "

বলিতে বলিতে মহেন্দ্র শুইয়া পড়িয়া বিহ্বলভাবে বিনোদিনীর পা জোর করিয়া চাপিয়া ধরিল এবং তাহার পদপল্লব বারংবার চুম্বন করিতে লাগিল।

বিনোদিনী পা ছাড়াইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, "মহেন্দ্র, তুমি কী প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে মনে নাই?"

সমস্ত বলপ্রয়োগ করিয়া মহেন্দ্র আত্মসংবরণ করিয়া লইল— কহিল, "মনে আছে। শপথ করিয়াছিলাম, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে, আমি কখনো তাহার কোনো অন্যথা করিব না। সেই শপথই রক্ষা করিব। কী করিতে হইবে, বলো।"

বিনোদিনী। তুমি তোমার বাড়িতে গিয়া থাকিবে।

মহেন্দ্র। আমিই কি তোমার একমাত্র অনিচ্ছার সামগ্রী, বিনোদ। তাই যদি হইবে, তবে তুমি আমাকে টানিয়া আনিলে কেন। যে তোমার ভোগের সামগ্রী নয়, তাহাকে শিকার করিবার কী প্রয়োজন ছিল। সত্য করিয়া বলো, আমি কি ইচ্ছা করিয়া তোমার কাছে ধরা দিয়াছি, না তুমি ইচ্ছা করিয়া আমাকে ধরিয়াছ। আমাকে লইয়া তুমি এইরূপ খেলা করিবে, ইহাও কি আমি সহ্য করিব। তবু আমি আমার শপথ পালন করিব— যে-বাড়িতে আমি নিজের স্থান পদাঘাতে চূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি সেই বাড়িতে গিয়াই আমি থাকিব।

বিনোদিনী ভূমিতে বসিয়া পুনরায় নিরুত্তরে সেলাই করিতে লাগিল।

মহেন্দ্র কিছুক্ষণ স্থিরভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "নিষ্ঠুর, বিনোদ, তুমি নিষ্ঠুর। আমি অত্যন্ত হতভাগ্য যে, আমি তোমাকে ভালোবাসিয়াছি।"

বিনোদিনী সেলাইয়ে একটা ভুল করিয়া আলোর কাছে ধরিয়া তাহা বহুযত্নে পুনর্বার খুলিতে লাগিল। মহেন্দ্রের ইচ্ছা করিতে লাগিল, বিনোদিনীর ওই পাষাণ হৃদয়টাকে নিজের কঠিন মুষ্টির মধ্যে সবলে চাপিয়া ভাঙিয়া ফেলে। এই নীরব নির্দয়তা ও অবিচলিত উপেক্ষাকে প্রবল আঘাত করিয়া যেন বাহুবলের দ্বারা পরাস্ত করিতে ইচ্ছা করে।

মহেন্দ্র ঘর হইতে বাহির হইয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিল— কহিল, "আমি না থাকিলে এখানে একাকিনী তোমাকে কে রক্ষা করিবে।"

বিনোদিনী কহিল, "সেজন্য তুমি কিছুমাত্র ভয় করিয়ো না। পিসিমা খেমিকে ছাড়াইয়া দিয়াছেন, সে আজ আমার এখানে আসিয়া কাজ লইয়াছে। দ্বারে তালা দিয়া আমরা দুই স্ত্রীলোকে এখানে বেশ থাকিব।"

মনে মনে যতই রাগ হইতে লাগিল, বিনোদিনীর প্রতি মহেন্দ্রের আকর্ষণ ততই একান্ত প্রবল হইয়া উঠিল। ওই অটল মূর্তিকে বজ্রবলে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া ক্লিষ্ট পিষ্ট করিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। সেই দারুণ ইচ্ছার হাত এড়াইবার জন্য মহেন্দ্র ছুটিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেল।

রাস্তায় ঘুরিতে ঘুরিতে মহেন্দ্র প্রতিজ্ঞা করিতে লাগিল, বিনোদিনীকে সে উপেক্ষার পরিবর্তে উপেক্ষা দেখাইবে। যে-অবস্থায় বিশ্বজগতে বিনোদিনীর একমাত্র নির্ভর মহেন্দ্র সে-অবস্থাতেও মহেন্দ্রকে এমন নীরবে নির্ভয়ে, এমন সুদৃঢ় সুস্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান— এতবড়ো অপমান কি কোনো পুরুষের ভাগ্যে কখনো ঘটিয়াছে। মহেন্দ্রের গর্ব চূর্ণ হইয়াও কিছুতেই মরিতে চাহিল না, সে কেবলই পীড়িত দলিত হইতে লাগিল। মহেন্দ্র কহিল, "আমি কি এতই অপদার্থ। আমার সম্বন্ধে এতবড়ো স্পর্ধা কী করিয়া তাহার মনে হইল। আমি ছাড়া এখন তাহার আর কে আছে।"

ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ মনে পড়িল— বিহারী। হঠাৎ এক মুহূর্তের জন্য তাহার বক্ষের সমস্ত রক্তপ্রবাহ যেন স্তব্ধ হইয়া গেল। বিহারীর উপরেই বিনোদিনী নির্ভর স্থাপন করিয়া আছে— আমি তাহার উপলক্ষমাত্র, আমি তাহার সোপান, তাহার পা রাখিবার, পদে-পদে পদাঘাত করিবার স্থান। সেই সাহসেই আমার প্রতি এত

অবজ্ঞা। মহেন্দ্রের সন্দেহ হইল, বিহারীর সহিত বিনোদিনীর চিঠিপত্র চলিতেছে এবং বিনোদিনী তাহার কাছ হইতে কোনো আশ্বাস পাইয়াছে।

তখন মহেন্দ্র বিহারীর বাড়ির দিকে চলিল। যখন বিহারীর দ্বারে গিয়া ঘা দিল, তখন রাত্রি আর বড়ো অধিক নাই। অনেক ধাক্কার পর বেহারা ভিতর হইতে, দরজা খুলিয়া দিয়া কহিল, "বাবুজি বাড়ি নাই।"

মহেন্দ্র চমকিয়া উঠিল। ভাবিল, "আমি যখন নির্বোধের মতো রাস্তায় রাস্তায় ছুটিয়া বেড়াইতেছি, বিহারী সেই অবকাশে বিনোদিনীর কাছে গেছে। এইজন্যই বিনোদিনী আমাকে এই রাত্রে এমন নির্দয়ভাবে অপমান করিয়াছে, এবং আমিও তাড়িত গর্দভের মতো ছুটিয়া চলিয়া আসিয়াছি।"

মহেন্দ্র তাহার পুরাতন পরিচিত বেহারাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভজু, বাবু কখন বাহির হইয়া গেছেন।"

ভজু কহিল, "সে আজ চার-পাঁচ দিন হইয়া গেছে। তিনি পশ্চিমে কোথায় বেড়াইতে গেছেন।"

শুনিয়া মহেন্দ্র বাঁচিয়া গেল। তাহার মনে হইল, "এইবার একটু শুইয়া আরামে ঘুমাই, আর সমস্ত রাত ঘুরিয়া বেড়াইতে পারি না।" বলিয়া উপরে উঠিয়া বিহারীর ঘরে কৌচের উপর শুইয়া তৎক্ষণাৎ ঘুমাইয়া পড়িল।

মহেন্দ্র যে-রাত্রে বিহারীর ঘরে আসিয়া উপদ্রব করিয়াছিল, তাহার পরদিনই বিহারী কোথায় যাইতে হইবে, কিছুই স্থির না করিয়া পশ্চিমে চলিয়া গেছে। বিহারী ভাবিল, এখানে থাকিলে পূর্ববন্ধুর সহিত সংঘর্ষ কোন্‌-একদিন এমন বীভৎস হইয়া উঠিবে যে, তাহার পর চিরজীবন অনুতাপের কারণ থাকিয়া যাইবে।

পরদিন মহেন্দ্র যখন উঠিল তখন বেলা এগারোটা। উঠিয়াই সম্মুখের টিপাইয়ের উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল। দেখিল, বিনোদিনীর হস্তাক্ষরে বিহারীর নামে এক পত্র পাথরের কাগজচাপা দিয়া চাপা রহিয়াছে। তাড়াতাড়ি তাহা তুলিয়া লইয়া দেখিল, পত্র এখনো খোলা হয় নাই। প্রবাসী বিহারীর জন্য তাহা অপেক্ষা করিয়া আছে। কম্পিতহস্তে মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি তাহা খুলিয়া পড়িতে লাগিল। এই চিঠিই বিনোদিনী তাহাদের গ্রাম হইতে বিহারীকে লিখিয়াছিল এবং ইহার কোনো জবাব সে পায় নাই।

চিঠির প্রত্যেক অক্ষর মহেন্দ্রকে দংশন করিতে লাগিল। বাল্যকাল হইতে বরাবর বিহারী মহেন্দ্রের অন্তরালেই পড়িয়া ছিল। জগতে স্নেহপ্রেম সম্বন্ধে মহেন্দ্র-দেবতার শুষ্ক নির্মাল্যই তাহার ভাগ্যে জুটিত। আজ মহেন্দ্র স্বয়ং প্রার্থী এবং বিহারী

বিমুখ, তবু মহেন্দ্রকে ঠেলিয়া বিনোদিনী এই অরসিক বিহারীকেই বরণ করিল। মহেন্দ্রও বিনোদিনীর দুই-চারিখানা চিঠি পাইয়াছে, কিন্তু বিহারীর এ-চিঠির কাছে তাহা নিতান্ত কৃত্রিম, তাহা নির্বোধকে ভুলাইবার শূন্য ছলনা।

নূতন ঠিকানা জানাইবার জন্য গ্রামের ডাকঘরে মহেন্দ্রকে পাঠাইতে বিনোদিনীর ব্যগ্রতা মহেন্দ্রের মনে পড়িল এবং তাহার কারণ সে বুঝিতে পারিল। বিনোদিনী তাহার সমস্ত মন-প্রাণ দিয়া বিহারীর চিঠির উত্তর পাইবার জন্য পথ চাহিয়া বসিয়া আছে।

পূর্বপ্রথা-মতো মনিব না থাকিলেও ভজু বেহারা মহেন্দ্রকে চা এবং বাজার হইতে জলখাবার আনিয়া খাওয়াইল। মহেন্দ্র স্নান ভুলিয়া গেল। উত্তপ্ত বালুকার উপর দিয়া পথিক যেমন দ্রুতপদে চলে, মহেন্দ্র সেইরূপ ক্ষণে ক্ষণে বিনোদিনীর জ্বালাকর চিঠির উপর দ্রুত চোখ বুলাইতে লাগিল। মহেন্দ্র পণ করিতে লাগিল, বিনোদিনীর সঙ্গে আর কিছুতেই দেখা করিবে না। কিন্তু তাহার মনে হইল, আর দুই-একদিন চিঠির জবাব না পাইলে বিনোদিনী বিহারীর বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইবে এবং তখন সমস্ত অবস্থা জানিতে পারিয়া সান্ত্বনা লাভ করিবে। সে সম্ভাবনা তাহার কাছে অসহ্য বোধ হইল।

তখন চিঠিখানা পকেটে করিয়া মহেন্দ্র সন্ধ্যার কিছু পূর্বে পটলডাঙার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

মহেন্দ্রের ম্লান অবস্থায় বিনোদিনীর মনে দয়া হইল— সে বুঝিতে পারিল, মহেন্দ্র কাল রাত্রে হয়তো পথে-পথে অনিদ্রায় যাপন করিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল, “কাল রাত্রে বাড়ি যাও নাই?”

মহেন্দ্র কহিল, “না।”

বিনোদিনী ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, “আজ এখনো তোমার খাওয়া হয়নি নাকি।” বলিয়া সেবাপরায়ণা বিনোদিনী তৎক্ষণাৎ আহারের আয়োজন করিতে উদ্যত হইল।

মহেন্দ্র কহিল, “থাক্ থাক্, আমি খাইয়া আসিয়াছি।”

বিনোদিনী। কোথায় খাইয়াছ।

মহেন্দ্র। বিহারীদের বাড়িতে।

মুহূর্তের জন্য বিনোদিনীর মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। মুহূর্তকাল নিরুত্তর থাকিয়া আত্মসংবরণ করিয়া বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করিল, “বিহারী-ঠাকুরপো ভালো আছেন তো?”

মহেন্দ্র কহিল, "ভালোই আছে। বিহারী যে পশ্চিমে চলিয়া গেল।"— মহেন্দ্র এমন ভাবে বলিল, যেন বিহারী আজই রওনা হইয়াছে।

বিনোদিনীর মুখ আর-একবার পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। পুনর্বার আত্মসংবরণ করিয়া সে কহিল, "এমন চঞ্চল লোকও তো দেখি নাই। আমাদের সমস্ত খবর পাইয়াছেন বুঝি? ঠাকুরপো খুব কি রাগ করিয়াছেন।"

মহেন্দ্র। তা না হইলে এই অসহ্য গরমের সময় কি মানুষ শখ করিয়া পশ্চিমে বেড়াইতে যায়।

বিনোদিনী। আমার কথা কিছু বলিলেন না কি।

মহেন্দ্র। বলিবার আর কী আছে। এই লও বিহারীর চিঠি।

বলিয়া চিঠিখানা বিনোদিনীর হাতে দিয়া মহেন্দ্র তীব্রদৃষ্টিতে তাহার মুখের ভাব নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

বিনোদিনী তাড়াতাড়ি চিঠি লইয়া দেখিল, খোলা চিঠি— লেফাফার উপরে তাহারই হস্তাক্ষরে বিহারীর নাম লেখা। লেফাফা হইতে বাহির করিয়া দেখিল, তাহারই লেখা সেই চিঠি। উলটাইয়া-পালটাইয়া কোথাও বিহারীর লেখা জবাব কিছুই দেখিতে পাইল না।

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বিনোদিনী মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল, "চিঠিখানা তুমি পড়িয়াছ?"

বিনোদিনীর মুখের ভাব দেখিয়া মহেন্দ্রের মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। সে ফস্ করিয়া মিথ্যা কথা কহিল, "না।"

বিনোদিনী চিঠিখানা টুকরা-টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া, পুনরায় তাহা কুটিকুটি করিয়া, জানালার বাহিরে ফেলিয়া দিল।

মহেন্দ্র কহিল, "আমি বাড়ি যাইতেছি।"

বিনোদিনী তাহার কোনো উত্তর দিল না।

মহেন্দ্র। তুমি যেমন ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছ, আমি তাহাই করিব। সাত দিন আমি বাড়িতে থাকিব। কালেজে আসিবার সময় প্রত্যহ একবার এখানকার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া খেমির হাতে দিয়া যাইব। দেখা করিয়া তোমাকে বিরক্ত করিব না।

বিনোদিনী মহেন্দ্রের কোনো কথা শুনিতে পাইল কিনা কে জানে, কিন্তু কোনো উত্তর করিল না— খোলা জানালার বাহিরে অন্ধকার আকাশে চাহিয়া রহিল।

মহেন্দ্র তাহার জিনিসপত্র লইয়া বাহির হইয়া গেল।

বিনোদিনী শূন্যগৃহে অনেকক্ষণ আড়ষ্টের মতো বসিয়া থাকিয়া অবশেষে নিজেকে যেন প্রাণপণ বলে সচেতন করিবার জন্য বক্ষের কাপড় ছিঁড়িয়া আপনাকে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করিতে লাগিল।

খেমি শব্দ শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া আসিয়া কহিল, "বউঠাকরুন, করিতেছ কী।"

"তুই যা এখান থেকে" বলিয়া গর্জন করিয়া উঠিয়া বিনোদিনী খেমিকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিল। তাহার পরে সশব্দে দ্বার রুদ্ধ করিয়া, দুই হাত মুঠা করিয়া, মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া, বাণাহত জন্তুর মতো আর্তস্বরে কাঁদিতে লাগিল। এইরূপে বিনোদিনী নিজেকে বিক্ষত পরিশ্রান্ত করিয়া মূর্ছিতের মতো মুক্ত বাতায়নের তলে সমস্ত রাত্রি পড়িয়া রহিল।

প্রাতঃকালে সূর্যালোক গৃহে প্রবেশ করিতেই তাহার হঠাৎ সন্দেহ হইল, বিহারী যদি না গিয়া থাকে, মহেন্দ্র যদি বিনোদিনীকে ভুলাইবার জন্য মিথ্যা বলিয়া থাকে। তৎক্ষণাৎ খেমিকে ডাকিয়া কহিল, "খেমি, তুই এখনই যা— বিহারী-ঠাকুরপোর বাড়ি গিয়া তাঁহাদের খবর লইয়া আয়।"

খেমি ঘণ্টাখানেক পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "বিহারীবাবুর বাড়ির সমস্ত জানালা-দরজা বন্ধ। দরজায় ঘা দিতে ভিতর হইতে বেহারা বলিল, "বাবু বাড়িতে নাই, তিনি পশ্চিমে বেড়াইতে গিয়াছেন।"

বিনোদিনীর মনে আর সন্দেহের কোনোই কারণ রহিল না।

৪১

রাত্রেই মহেন্দ্র শয্যা ছাড়িয়া গেছে শুনিয়া রাজলক্ষ্মী বধূর প্রতি অত্যন্ত রাগ করিলেন। মনে করিলেন, আশার লাঞ্ছনাতেই মহেন্দ্র চলিয়া গেছে। রাজলক্ষ্মী আশাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহেন্দ্র কাল রাত্রে চলিয়া গেল কেন।"

আশা মুখ নিচু করিয়া বলিল, "জানি না, মা।"

রাজলক্ষ্মী ভাবিলেন, এটাও অভিমানের কথা। বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "তুমি জান না তো কে জানিবে। তাহাকে কিছু বলিয়াছিলে?"

আশা কেবলমাত্র বলিল, "না।"

রাজলক্ষ্মী বিশ্বাস করিলেন না। এ কি কখনো সম্ভব হয়।

জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল মহিন কখন গেল।"

আশা সংকুচিত হইয়া কহিল, "জানি না।"

রাজলক্ষ্মী অত্যন্ত রাগিয়া উঠিয়া কহিলেন, “তুমি কিছুই জান না! কচি খুকি! তোমার সব চালাকি।”

আশারই আচরণে ও স্বভাবদোষেই যে মহেন্দ্র গৃহত্যাগী হইয়াছে, এ-মতও রাজলক্ষ্মী তীব্রস্বরে ঘোষণা করিয়া দিলেন। আশা নতমস্তকে সেই ভর্ৎসনা বহন করিয়া নিজের ঘরে গিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে মনে মনে ভাবিল, “কেন যে আমাকে আমার স্বামী একদিন ভালোবাসিয়াছিলেন, তাহা আমি জানি না এবং কেমন করিয়া যে তাঁহার ভালোবাসা ফিরিয়া পাইব, তাহাও আমি বলিতে পারি না।” যে লোক ভালোবাসে, তাহাকে কেমন করিয়া খুশি করিতে হয়, তাহা হৃদয় আপনি বলিয়া দেয়; কিন্তু যে ভালোবাসে না, তাহার মন কী করিয়া পাইতে হয়, আশা তাহার কী জানে। যে লোক অন্যকে ভালোবাসে, তাহার নিকট হইতে সোহাগ লইতে যাওয়ার মতো এমন নিরতিশয় লজ্জাকর চেষ্টা সে কেমন করিয়া করিবে।

সন্ধ্যাকালে বাড়ির দৈবজ্ঞ-ঠাকুর এবং তাঁহার ভগিনী আচার্য-ঠাকরুন আসিয়াছেন। ছেলের গ্রহশান্তির জন্য রাজলক্ষ্মী ইঁহাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। রাজলক্ষ্মী একবার বউমার কোষ্ঠী এবং হাত দেখিবার জন্য দৈবজ্ঞকে অনুরোধ করিলেন এবং সেই উপলক্ষে আশাকে উপস্থিত করিলেন। পরের কাছে নিজের দুর্ভাগ্য-আলোচনার সংকোচে একান্ত কুণ্ঠিত হইয়া আশা কোনোমতে তাহার হাত বাহির করিয়া বসিয়াছে, এমন সময় রাজলক্ষ্মী তাঁহার ঘরের পার্শ্বস্থ দীপহীন বারান্দা দিয়া মৃদু জুতার শব্দ পাইলেন— কে যেন গোপনে চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে। রাজলক্ষ্মী ডাকিলেন, “কে ও।”

প্রথমে সাড়া পাইলেন না। তাহার পর আবার ডাকিলেন, “কে যায় গো।” তখন নিরুত্তরে মহেন্দ্র ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

আশা খুশি হইবে কি, মহেন্দ্রের লজ্জা দেখিয়া লজ্জায় তাহার হৃদয় ভরিয়া গেল। মহেন্দ্রকে এখন নিজের বাড়িতেও চোরের মতো প্রবেশ করিতে হয়। দৈবজ্ঞ এবং আচার্য-ঠাকরুন বসিয়া আছেন বলিয়া তাহার আরও লজ্জা হইল। সমস্ত পৃথিবীর কাছে নিজের স্বামীর জন্য যে লজ্জা, ইহাই আশার দুঃখের চেয়েও যেন বেশি হইয়া উঠিয়াছে। রাজলক্ষ্মী যখন মৃদুস্বরে বউকে বলিলেন, “বউমা, পার্বতীকে বলিয়া দাও, মহিনের খাবার গুছাইয়া আনে” তখন আশা কহিল, “মা, আমিই আনিতেছি।” বাড়ির দাসদাসীদের দৃষ্টি হইতেও সে মহেন্দ্রকে ঢাকিয়া রাখিতে চায়।

এদিকে আচার্য ও তাহার ভগিনীকে দেখিয়া মহেন্দ্র মনে মনে অত্যন্ত রাগ করিল। তাহার মাতা ও স্ত্রী দৈবসহায়ে তাহাকে বশ করিবার জন্য এই অশিক্ষিত

গুরুদের সহিত নির্লজ্জভাবে ষড়যন্ত্র করিতেছে, ইহা মহেন্দ্রের কাছে অসহ্য বোধ হইল। ইহার উপর যখন আচার্য-ঠাকরুন কণ্ঠস্বরে অতিরিক্ত মধুমাখা স্নেহরসের সঞ্চার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভালো আছ তো, বাবা"— তখন মহেন্দ্র আর বসিয়া থাকিতে পারিল না; কুশলপ্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়া কহিল, "মা, আমি একবার উপরে যাইতেছি।"

মা ভাবিলেন মহেন্দ্র বুঝি শয়নগৃহে বিরলে বধূর সঙ্গে কথাবার্তা কহিতে চায়। অত্যন্ত খুশি হইয়া তাড়াতাড়ি রন্ধনশালায় নিজে গিয়া আশাকে কহিলেন, "যাও, যাও, তুমি একবার শীঘ্র উপরে যাও, মহীনের কী বুঝি দরকার আছে।"

আশা দুরুদুরুবক্ষে সসংকোচ পদক্ষেপে উপরে গেল। শাশুড়ীর কথায় সে মনে করিয়াছিল, মহেন্দ্র বুঝি তাহাকে ডাকিয়াছে। কিন্তু ঘরের মধ্যে কোনোমতেই হঠাৎ ঢুকিতে পারিল না, ঢুকিবার পূর্বে আশা অন্ধকারে দ্বারের অন্তরালে মহেন্দ্রকে দেখিতে লাগিল।

মহেন্দ্র তখন অত্যন্ত শূন্যহৃদয়ে নিচের বিছানায় পড়িয়া তাকিয়ায় ঠেস দিয়া কড়িকাঠ পর্যালোচনা করিতেছিল। এই তো সেই মহেন্দ্র— সেই সবই, কিন্তু কী পরিবর্তন। এই ক্ষুদ্র শয়নঘরটিকে একদিন মহেন্দ্র স্বর্গ করিয়া তুলিয়াছিল,— আজ কেন সেই আনন্দস্মৃতিতে-পবিত্র ঘরটিকে মহেন্দ্র অপমান করিতেছে। এত কষ্ট, এত বিরক্তি, এত চাঞ্চল্য যদি, তবে ও-শয্যায় আর বসিয়ো না, মহেন্দ্র। এখানে আসিয়াও যদি মনে না পড়ে সেই-সমস্ত পরিপূর্ণ গভীর রাত্রি, সেই সমস্ত সুনিবিড় মধ্যাহ্ন, আত্মহারা কর্মবিস্মৃত ঘনবর্ষার দিন, দক্ষিণবায়ুকম্পিত বসন্তের বিহ্বল সন্ধ্যা, সেই অনন্ত অসীম অসংখ্য অনির্বচনীয় কথাগুলি, তবে এ-বাড়িতে অন্য অনেক ঘর আছে, কিন্তু এই ক্ষুদ্র ঘরটিতে আর এক মুহূর্তও নহে!

আশা অন্ধকারে দাঁড়াইয়া যতই মহেন্দ্রকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল ততই তাহার মনে হইতে লাগিল, মহেন্দ্র এইমাত্র সেই বিনোদিনীর কাছ হইতে আসিতেছে; তাহার অঙ্গে সেই বিনোদিনীর স্পর্শ, তাহার চোখে সেই বিনোদিনীর মূর্তি, কানে সেই বিনোদিনীর কণ্ঠস্বর, মনে সেই বিনোদিনীর বাসনা একেবারে লিপ্ত জড়িত হইয়া আছে। এই মহেন্দ্রকে আশা কেমন করিয়া পবিত্র ভক্তি দিবে, কেমন করিয়া একাগ্রমনে বলিবে, "এসো, আমার অনন্যপরায়ণ হৃদয়ের মধ্যে এসো, আমার অটলনিষ্ঠ সতীপ্রেমের শুভ্র শতদলের উপর তোমার চরণ-দুখানি রাখো।" সে তাহার মাসির উপদেশ, পুরাণের কথা, শাস্ত্রের অনুশাসন কিছুই মানিতে পারিল না— এই দাম্পত্যস্বর্গচ্যুত মহেন্দ্রকে সে আর মনের মধ্যে দেবতা বলিয়া

রাজলক্ষ্মী অত্যন্ত রাগিয়া উঠিয়া কহিলেন, "তুমি কিছুই জান না! কচি খুকি! তোমার সব চালাকি।"

আশারই আচরণে ও স্বভাবদোষেই যে মহেন্দ্র গৃহত্যাগী হইয়াছে, এ-মতও রাজলক্ষ্মী তীব্রস্বরে ঘোষণা করিয়া দিলেন। আশা নতমস্তকে সেই ভর্ৎসনা বহন করিয়া নিজের ঘরে গিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে মনে মনে ভাবিল, "কেন যে আমাকে আমার স্বামী একদিন ভালোবাসিয়াছিলেন, তাহা আমি জানি না এবং কেমন করিয়া যে তাঁহার ভালোবাসা ফিরিয়া পাইব, তাহাও আমি বলিতে পারি না।" যে লোক ভালোবাসে, তাহাকে কেমন করিয়া খুশি করিতে হয়, তাহা হৃদয় আপনি বলিয়া দেয়; কিন্তু যে ভালোবাসে না, তাহার মন কী করিয়া পাইতে হয়, আশা তাহার কী জানে। যে লোক অন্যকে ভালোবাসে, তাহার নিকট হইতে সোহাগ লইতে যাওয়ার মতো এমন নিরতিশয় লজ্জাকর চেষ্টা সে কেমন করিয়া করিবে।

সন্ধ্যাকালে বাড়ির দৈবজ্ঞ-ঠাকুর এবং তাঁহার ভগিনী আচার্য-ঠাকরুন আসিয়াছেন। ছেলের গ্রহশান্তির জন্য রাজলক্ষ্মী ইঁহাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। রাজলক্ষ্মী একবার বউমার কোষ্ঠী এবং হাত দেখিবার জন্য দৈবজ্ঞকে অনুরোধ করিলেন এবং সেই উপলক্ষে আশাকে উপস্থিত করিলেন। পরের কাছে নিজের দুর্ভাগ্য-আলোচনার সংকোচে একান্ত কুণ্ঠিত হইয়া আশা কোনোমতে তাহার হাত বাহির করিয়া বসিয়াছে, এমন সময় রাজলক্ষ্মী তাঁহার ঘরের পার্শ্বস্থ দীপহীন বারান্দা দিয়া মৃদু জুতার শব্দ পাইলেন— কে যেন গোপনে চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে। রাজলক্ষ্মী ডাকিলেন, "কে ও।"

প্রথমে সাড়া পাইলেন না। তাহার পর আবার ডাকিলেন, "কে যায় গো।" তখন নিরুত্তরে মহেন্দ্র ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

আশা খুশি হইবে কি, মহেন্দ্রের লজ্জা দেখিয়া লজ্জায় তাহার হৃদয় ভরিয়া গেল। মহেন্দ্রকে এখন নিজের বাড়িতেও চোরের মতো প্রবেশ করিতে হয়। দৈবজ্ঞ এবং আচার্য-ঠাকরুন বসিয়া আছেন বলিয়া তাহার আরও লজ্জা হইল। সমস্ত পৃথিবীর কাছে নিজের স্বামীর জন্য যে লজ্জা, ইহাই আশার দুঃখের চেয়েও যেন বেশি হইয়া উঠিয়াছে। রাজলক্ষ্মী যখন মৃদুস্বরে বউকে বলিলেন, "বউমা, পার্বতীকে বলিয়া দাও, মহিনের খাবার গুছাইয়া আনে" তখন আশা কহিল, "মা, আমিই আনিতেছি।" বাড়ির দাসদাসীদের দৃষ্টি হইতেও সে মহেন্দ্রকে ঢাকিয়া রাখিতে চায়।

এদিকে আচার্য ও তাহার ভগিনীকে দেখিয়া মহেন্দ্র মনে মনে অত্যন্ত রাগ করিল। তাহার মাতা ও স্ত্রী দৈবসহায়ে তাহাকে বশ করিবার জন্য এই অশিক্ষিত

সুহৃদের সহিত নির্লজ্জভাবে ষড়যন্ত্র করিতেছে, ইহা মহেন্দ্রের কাছে অসহ্য বোধ হইল। ইহার উপর যখন আচার্য-ঠাকরুন কণ্ঠস্বরে অতিরিক্ত মধুমাখা স্নেহরসের সঞ্চার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভালো আছ তো, বাবা"— তখন মহেন্দ্র আর বসিয়া থাকিতে পারিল না; কুশলপ্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়া কহিল, "মা, আমি একবার উপরে যাইতেছি।"

মা ভাবিলেন মহেন্দ্র বুঝি শয়নগৃহে বিরলে বধূর সঙ্গে কথাবার্তা কহিতে চায়। অত্যন্ত খুশি হইয়া তাড়াতাড়ি রন্ধনশালায় নিজে গিয়া আশাকে কহিলেন, "যাও, যাও, তুমি একবার শীঘ্র উপরে যাও, মহীনের কী বুঝি দরকার আছে।"

আশা দুরুদুরুবক্ষে সসংকোচ পদক্ষেপে উপরে গেল। শাশুড়ীর কথায় সে মনে করিয়াছিল, মহেন্দ্র বুঝি তাহাকে ডাকিয়াছে। কিন্তু ঘরের মধ্যে কোনোমতেই হঠাৎ ঢুকিতে পারিল না, ঢুকিবার পূর্বে আশা অন্ধকারে দ্বারের অন্তরালে মহেন্দ্রকে দেখিতে লাগিল।

মহেন্দ্র তখন অত্যন্ত শূন্যহৃদয়ে নিচের বিছানায় পড়িয়া তাকিয়ায় ঠেস দিয়া কড়িকাঠ পর্যালোচনা করিতেছিল। এই তো সেই মহেন্দ্র— সেই সবই, কিন্তু কী পরিবর্তন। এই ক্ষুদ্র শয়নঘরটিকে একদিন মহেন্দ্র স্বর্গ করিয়া তুলিয়াছিল,— আজ কেন সেই আনন্দস্মৃতিতে-পবিত্র ঘরটিকে মহেন্দ্র অপমান করিতেছে। এত কষ্ট, এত বিরক্তি, এত চাঞ্চল্য যদি, তবে ও-শয্যায় আর বসিয়ো না, মহেন্দ্র। এখানে আসিয়াও যদি মনে না পড়ে সেই-সমস্ত পরিপূর্ণ গভীর রাত্রি, সেই সমস্ত সুনিবিড় মধ্যাহ্ন, আত্মহারা কর্মবিস্মৃত ঘনবর্ষার দিন, দক্ষিণবায়ুকম্পিত বসন্তের বিহ্বল সন্ধ্যা, সেই অনন্ত অসীম অসংখ্য অনির্বচনীয় কথাগুলি, তবে এ-বাড়িতে অন্য অনেক ঘর আছে, কিন্তু এই ক্ষুদ্র ঘরটিতে আর এক মুহূর্তও নহে!

আশা অন্ধকারে দাঁড়াইয়া যতই মহেন্দ্রকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল ততই তাহার মনে হইতে লাগিল, মহেন্দ্র এইমাত্র সেই বিনোদিনীর কাছ হইতে আসিতেছে; তাহার অঙ্গে সেই বিনোদিনীর স্পর্শ, তাহার চোখে সেই বিনোদিনীর মূর্তি, কানে সেই বিনোদিনীর কণ্ঠস্বর, মনে সেই বিনোদিনীর বাসনা একেবারে লিপ্ত জড়িত হইয়া আছে। এই মহেন্দ্রকে আশা কেমন করিয়া পবিত্র ভক্তি দিবে, কেমন করিয়া একাগ্রমনে বলিবে, "এসো, আমার অনন্যপরায়ণ হৃদয়ের মধ্যে এসো, আমার অটলনিষ্ঠ সতীপ্রেমের শুভ্র শতদলের উপর তোমার চরণ-দুখানি রাখো।" সে তাহার মাসির উপদেশ, পুরাণের কথা, শাস্ত্রের অনুশাসন কিছুই মানিতে পারিল না— এই দাম্পত্যস্বর্গচ্যুত মহেন্দ্রকে সে আর মনের মধ্যে দেবতা বলিয়া

অনুভব করিল না। সে আজ বিনোদিনীর কলঙ্কপারাবারের মধ্যে তাহার হৃদয়দেবতাকে বিসর্জন দিল; সেই প্রেমশূন্য রাত্রির অন্ধকারে তাহার কানের মধ্যে, বুকের মধ্যে, মস্তিকের মধ্যে, তাহার সর্বাঙ্গে রক্তস্রোতের মধ্যে, তাহার চারিদিকের সমস্ত সংসারে, তাহার আকাশের নক্ষত্রে, তাহার প্রাচীরবেষ্টিত নিভৃত ছাদটিতে, তাহার শয়নগৃহের পরিত্যক্ত বিরহশয্যাতলে একটি ভয়ানক গম্ভীর ব্যাকুলতার সঙ্গে বিসর্জনের বাদ্য বাজিতে লাগিল।

বিনোদিনীর মহেন্দ্র যেন আশার পক্ষে পরপুরুষ, যেন পরপুরুষেরও অধিক— এমন লজ্জার বিষয় যেন অতি-বড়ো অপরিচিতও নহে। সে কোনোমতেই ঘরে প্রবেশ করিতে পারিল না।

একসময় কড়িকাঠ হইতে মহেন্দ্রের অন্যমনস্ক দৃষ্টি সম্মুখের দেওয়ালের দিকে নামিয়া আসিল। তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া আশা দেখিল, সম্মুখের দেয়ালে মহেন্দ্রের ছবির পার্শ্বেই আশার একখানি ফোটোগ্রাফ ঝুলানো রহিয়াছে। ইচ্ছা হইল, সেখানা আঁচল দিয়া ঝাঁপিয়া ফেলে, টানিয়া ছিঁড়িয়া লইয়া আসে। অভ্যাসবশত কেন যে সেটা চোখে পড়ে নাই, কেন সে যে এতদিন সেটা নামাইয়া ফেলিয়া দেয় নাই, তাহাই মনে করিয়া সে আপনাকে ধিক্‌কার দিতে লাগিল। তাহার মনে হইল, যেন মহেন্দ্র মনে মনে হাসিতেছে এবং তাহার হৃদয়ের আসনে যে বিনোদিনীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত, সে-ও যেন তাহার জোড়া-ভুরুর ভিতর হইতে ওই ফোটোগ্রাফটার প্রতি সহাস্য কটাক্ষপাত করিতেছে।

অবশেষে বিরক্তিপীড়িত মহেন্দ্রের দৃষ্টি দেওয়াল হইতে নামিয়া আসিল। আশা আপনার মূর্খতা ঘুচাইবার জন্য আজকাল সন্ধ্যার সময় কাজকর্ম ও শাশুড়ীর সেবা হইতে অবকাশ পাইলেই অনেকরাত্রি পর্যন্ত নির্জনে অধ্যয়ন করিত। তাহার সেই অধ্যয়নের খাতাপত্রবইগুলি ঘরের একধারে গোছানো ছিল। হঠাৎ মহেন্দ্র অলসভাবে তাহার একখানা খাতা টানিয়া লইয়া খুলিয়া দেখিতে লাগিল। আশার ইচ্ছা করিল, চীৎকার করিয়া ছুটিয়া সেখানা কাড়িয়া লইয়া আসে। তাহার কাঁচা-হাতের অক্ষরগুলির প্রতি মহেন্দ্রের হৃদয়হীন বিদ্রূপদৃষ্টি কল্পনা করিয়া সে আর এক মুহূর্তও দাঁড়াইতে পারিল না। দ্রুতপদে নিচে চলিয়া গেল— পদশব্দ গোপন করিবার চেষ্টাও রহিল না।

মহেন্দ্রের আহার সমস্তই প্রস্তুত হইয়াছিল। রাজলক্ষ্মী মনে করিতেছিলেন, মহেন্দ্র বউমার সঙ্গে রহস্যালাপে প্রবৃত্ত আছে; সেইজন্য খাবার লইয়া গিয়া মাঝখানে ভঙ্গ দিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইতেছিল না। আশাকে নিচে আসিতে দেখিয়া তিনি

ভোজনস্থলে আহার লইয়া মহেন্দ্রকে খবর দিলেন। মহেন্দ্র খাইতে উঠিবামাত্র আশা ঘরের মধ্যে ছুটিয়া গিয়া নিজের ছবিখানা ছিঁড়িয়া লইয়া ছাদের প্রাচীর ডিঙাইয়া ফেলিয়া দিল, এবং তাহার খাতাপত্রগুলা তাড়াতাড়ি তুলিয়া লইয়া গেল।

আহারান্তে মহেন্দ্র শয়নগৃহে আসিয়া বসিল। রাজলক্ষ্মী বধূকে কাছাকাছি কোথাও খুঁজিয়া পাইলেন না। অবশেষে একতলায় রন্ধনশালায় আসিয়া দেখিলেন, আশা তাঁহার জন্য দুধ জ্বাল দিতেছে। কোনো আবশ্যক ছিল না। কারণ, যে-দাসী রাজলক্ষ্মীর রাত্রের দুধ প্রতিদিন জ্বাল দিয়া থাকে, সে নিকটেই ছিল এবং আশার এই অকারণ উৎসাহে আপত্তি প্রকাশ করিতেছিল; বিশুদ্ধ জলের দ্বারা পূরণ করিয়া দুধের যে অংশটুকু সে হরণ করিত, সেটুকু আজ ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনায় সে মনে মনে ব্যাকুল হইতেছিল।

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "এ কী বউমা, এখানে কেন। যাও, উপরে যাও।"

আশা উপরে গিয়া তাহার শাশুড়ীর ঘর আশ্রয় করিল। রাজলক্ষ্মী বধূর ব্যবহারে বিরক্ত হইলেন। ভাবিলেন, "যদি বা মহেন্দ্র মায়াবিনীর মায়া কাটাইয়া ক্ষণকালের জন্য বাড়ি আসিল, বউ রাগারাগি মান-অভিমান করিয়া আবার তাহাকে বাড়িছাড়া করিবার চেষ্টায় আছে। বিনোদিনীর ফাঁদে মহেন্দ্র যে ধরা পড়িল, সে তো আশারই দোষ। পুরুষমানুষ তো স্বভাবতই বিপথে যাইবার জন্য প্রস্তুত, স্ত্রীর কর্তব্য তাহাকে ছলে বলে কৌশলে সিধা পথে রাখা।"

রাজলক্ষ্মী তীব্র ভর্ৎসনার স্বরে কহিলেন, "তোমার এ কী-রকম ব্যবহার, বউমা। তোমার ভাগ্যক্রমে স্বামী যদি ঘরে আসিলেন, তুমি মুখ হাঁড়িপানা করিয়া অমন কোণে-কোণে লুকাইয়া বেড়াইতেছ কেন।"

আশা নিজেকে অপরাধিনী জ্ঞান করিয়া অঙ্কুশাহতচিত্তে উপরে চলিয়া গেল, এবং মনকে দ্বিধা করিবার অবকাশমাত্র না দিয়া এক নিশ্বাসে ঘরের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইল। দশটা বাজিয়া গেছে। মহেন্দ্র ঠিক সেই সময় বিছানার সম্মুখে দাঁড়াইয়া অনাবশ্যক দীর্ঘকাল ধরিয়া চিন্তিতমুখে মশারি ঝাড়িতেছে। বিনোদিনীর উপরে তাহার মনে একটা তীব্র অভিমানের উদয় হইয়াছে। সে মনে মনে বলিতেছিল, "বিনোদিনী কি আমাকে তাহার এমনই ক্রীতদাস বলিয়া নিশ্চয় স্থির করিয়া রাখিয়াছে যে, আশার কাছে আমাকে পাঠাইতে তাহার মনে লেশমাত্র আশঙ্কা জন্মিল না। আজ হইতে যদি আমি আশার প্রতি আমার কর্তব্য পালন করি, তবে বিনোদিনী কাহাকে আশ্রয় করিয়া এই পৃথিবীতে দাঁড়াইবে। আমি কি এতই অপদার্থ যে, এই কর্তব্য-পালনের ইচ্ছা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। বিনোদিনীর কাছে কি শেষকালে

আমার এই পরিচয় হইল। শ্রদ্ধাও হারাইলাম, ভালোবাসাও পাইলাম না, আমাকে অপমান করিতে তাহার দ্বিধাও হইল না ?” মহেন্দ্র মশারির সম্মুখে দাঁড়াইয়া দৃঢ়চিত্তে প্রতিজ্ঞা করিতেছিল, বিনোদিনীর এই স্পর্ধার সে প্রতিবাদ করিবে, যেমন করিয়া হউক আশার প্রতি হৃদয়কে অনুকূল করিয়া বিনোদিনীকৃত অবমাননার প্রতিশোধ দিবে।

আশা যেই ঘরে প্রবেশ করিল, মহেন্দ্রের অন্যমনস্ক মশারি-ঝাড়া অমনি বন্ধ হইয়া গেল। কী বলিয়া আশার সঙ্গে সে কথা আরম্ভ করিবে, সেই এক অতিদুরূহ সমস্যা উপস্থিত হইল।

মহেন্দ্র কাষ্ঠহাসি হাসিয়া, হঠাৎ তাহার যে কথাটা মুখে আসিল তাহাই বলিল। কহিল, “তুমিও দেখিলাম আমার মতো পড়ায় মন দিয়াছ। খাতাপত্র এই যে এখানে দেখিয়াছিলাম, সেগুলি গেল কোথায়।”

কথাটা যে কেবল খাপছাড়া শুনাইল তাহা নহে, আশাকে যেন মারিল। মূঢ় আশা যে শিক্ষিতা হইবার চেষ্টা করিতেছে, সেটা তাহার বড়ো গোপন কথা—আশা স্থির করিয়াছিল, এ-কথাটা বড়োই হাস্যকর। তাহার এই শিক্ষালাভের সংকল্প যদি কাহারও হাস্যবিদ্রূপের লেশমাত্র আভাস হইতেও গোপন করিবার বিষয় হয়, তবে তাহা বিশেষরূপে মহেন্দ্রের। সেই মহেন্দ্র যখন এতদিন পরে প্রথম সম্ভাষণে হাসিয়া সেই কথাটারই অবতারণা করিল, তখন নিষ্ঠুরবেত্রাহত শিশুর কোমল দেহের মতো আশার সমস্ত মনটা সংকুচিত ব্যথিত হইতে লাগিল। সে আর কোনো উত্তর না দিয়া মুখ ফিরাইয়া টিপাইয়ের প্রান্ত ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মহেন্দ্রও উচ্চারণমাত্র বুঝিয়াছিল, কথাটা ঠিক সংগত, ঠিক সময়োপযোগী হয় নাই—কিন্তু বর্তমান অবস্থায় উপযোগী কথাটা যে কী হইতে পারে তাহা মহেন্দ্র কিছুতেই ভাবিয়া পাইল না। মাঝখানের এতবড়ো বিপ্লবের পরে পূর্বের ন্যায় কোনো সহজ কথা ঠিকমতো শুনায় না, হৃদয়ও একেবারে মূক, কোনো নূতন কথা বলিবার জন্য সে প্রস্তুত নহে। মহেন্দ্র ভাবিল, “বিছানার ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলে সেখানকার নিভৃত বেষ্টনের মধ্যে হয়তো কথা কওয়া সহজ হইবে।” এই ভাবিয়া মহেন্দ্র আবার মশারির বহির্ভাগ কোঁচা দিয়া ঝাড়িতে লাগিল। নূতন অভিনেতা রঙ্গভূমিতে প্রবেশের পূর্বে যেমন উৎকণ্ঠার সঙ্গে নেপথ্যদ্বারে দাঁড়াইয়া নিজের অভিনেতব্য বিষয় মনে মনে আবৃত্তি করিয়া দেখিতে থাকে, মহেন্দ্র সেইরূপ মশারির সম্মুখে দাঁড়াইয়া মনে মনে তাহার বক্তব্য ও কর্তব্য আলোচনা করিতে লাগিল। এমন সময় অত্যন্ত মৃদু একটা শব্দ শুনিয়া মহেন্দ্র মুখ ফিরাইয়া দেখিল, আশা ঘরের মধ্যে নাই।

৪২

পরদিন প্রাতে মহেন্দ্র মাকে বলিল, "মা, পড়াশুনার জন্য আমার একটি নিরিবিলি স্বতন্ত্র ঘর চাই। কাকীমা যে ঘরে থাকিতেন, সেই ঘরে আমি থাকিব।"

মা খুশি হইয়া উঠিলেন— "তবে তো মহিন বাড়িতেই থাকিবে। তবে তো বউ-মার সঙ্গে মিটমাট হইয়া গেছে। আমার এমন সোনার বউকে কি মহিন চিরদিন অনাদর করিতে পারে। এই লক্ষ্মীকে ছাড়িয়া কোথাকার সেই মায়াবিনী ডাইনীটাকে লইয়া কতদিনই বা মানুষ ভুলিয়া থাকিবে।"

মা তাড়াতাড়ি কহিলেন, "তা বেশ তো, মহিন।" বলিয়া তখনই চাবি বাহির করিয়া রুদ্ধ ঘর খুলিয়া ঝাড়াঝোড়ার ধুমধাম বাধাইয়া দিলেন। "বউ, ও বউ, বউ কোথায় গেল।" অনেক সন্ধানে বাড়ির এক কোণ হইতে সংকুচিতা বধূকে বাহির করিয়া আনা হইল। "একটা সাফ জাজিম বাহির করিয়া দাও; এ ঘরে টেবিল নাই, এখানে একটা টেবিল পাতিয়া দিতে হইবে; এ আলো তো এখানে চলিবে না, উপর হইতে ল্যাম্পটা পাঠাইয়া দাও।" এইরূপে উভয়ে মিলিয়া এই বাড়িটির রাজাধিরাজের জন্য অন্নপূর্ণার ঘরে বিস্তৃত রাজাসন প্রস্তুত করিয়া দিলেন। মহেন্দ্র সেবাকারিণীদের প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া গম্ভীরমুখে খাতাপত্র বহি লইয়া ঘরে বসিল এবং সময়ের লেশমাত্র অপব্যয় না করিয়া তৎক্ষণাৎ পড়িতে আরম্ভ করিল।

সন্ধ্যাবেলায় আহারের পর মহেন্দ্র পুনরায় পড়িতে বসিয়া গেল। সে উপরে তাহার শয়নঘরে শুইবে কি নিচে শুইবে তাহা কেহ বুঝিতে পারিল না। রাজলক্ষ্মী বহুযত্নে আশাকে আড়ষ্ট পুতুলটির মতো সাজাইয়া কহিলেন, "যাও তো বউমা, মহিনকে জিজ্ঞাসা করিয়া এসো, তাহার বিছানা কি উপরে হইবে।"

এ-প্রস্তাবে আশার পা কিছুতেই সরিল না, সে নীরবে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। রুষ্ট রাজলক্ষ্মী তাহাকে তীব্র ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। আশা বহুকষ্টে ধীরে ধীরে দ্বারের কাছে গেল, কিছুতেই আর অগ্রসর হইতে পারিল না। রাজলক্ষ্মী দূর হইতে বধূর এই ব্যবহার দেখিয়া বারান্দার প্রান্তে দাঁড়াইয়া ক্রুদ্ধ ইঙ্গিত করিতে লাগিলেন।

আশা মরিয়া হইয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। মহেন্দ্র পশ্চাতে পদশব্দ শুনিয়া বই হইতে মাথা না তুলিয়া কহিল, "এখনো আমার দেরি আছে— আবার কাল ভোরে উঠিয়া পড়িতে হইবে— আমি এইখানেই শুইব।"

কী লজ্জা। আশা কি মহেন্দ্রকে উপরের ঘরে শুইতে যাইবার জন্য সাধিতে আসিয়াছিল।

ঘর হইতে সে বাহির হইতেই রাজলক্ষ্মী বিরক্তির স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী, হইল কী।"

আশা কহিল, "তিনি এখন পড়িতেছেন, নিচেই শুইবেন।" বলিয়া সে নিজের অপমানিত শয়নগৃহে আসিয়া প্রবেশ করিল। কোথাও তাহার সুখ নাই— সমস্ত পৃথিবী সর্বত্রই যেন মধ্যাহ্নের মরু-ভূতলের মতো তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

খানিক রাত্রে আশার শয়নগৃহের রুদ্ধদ্বারে ঘা পড়িল, "বউ, বউ, দরজা খোলো।"

আশা তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিয়া দিল। রাজলক্ষ্মী তাঁহার হাঁপানি লইয়া সিঁড়িতে উঠিয়া কষ্টে নিশ্বাস লইতেছিলেন। ঘরে প্রবেশ করিয়াই তিনি বিছানায় বসিয়া পড়িলেন ও বাক্‌শক্তি ফিরিয়া আসিতেই ভাঙা গলায় কহিলেন, "বউ, তোমার রকম কী। উপরে আসিয়া দ্বার বন্ধ করিয়াছ যে। এখন কি এই রকম রাগারাগি করিবার সময়! এত দুঃখেও তোমার ঘটে বুদ্ধি আসিল না। যাও, নিচে যাও।"

আশা মৃদুস্বরে কহিল, "তিনি একলা থাকিবেন বলিয়াছেন।"

রাজলক্ষ্মী। একলা থাকিবে বলিলেই হইল। রাগের মুখে সে কী কথা বলিয়াছে, তাই শুনিয়া অমনি বাঁকিয়া বসিতে হইবে! এত অভিমানী হইলে চলে না। যাও, শীঘ্র যাও।

দুঃখের দিনে বধূর কাছে শাশুড়ীর আর লজ্জা নাই। তাঁহার হাতে যে-কিছু উপায় আছে, তাহাই দিয়া মহেন্দ্রকে কোনোমতে বাঁধিতেই হইবে।

আবেগের সহিত কথা কহিতে কহিতে রাজলক্ষ্মীর পুনরায় অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট হইল। কতকটা সংবরণ করিয়া তিনি উঠিলেন। আশাও দ্বিরুক্তি না করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া নিচে চলিল। রাজলক্ষ্মীকে আশা তাঁহার শয়নঘরে বিছানায় বসাইয়া, তাকিয়া-বালিশগুলি পিঠের কাছে ঠিক করিয়া দিতে লাগিল। রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "থাক্ বউমা, থাক্। সুধোকে ডাকিয়া দাও। তুমি যাও, আর দেরি করিয়ো না।"

আশা এবার আর দ্বিধামাত্র করিল না। শাশুড়ীর ঘর হইতে বাহির হইয়া একেবারে মহেন্দ্রের ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। মহেন্দ্রের সম্মুখে টেবিলের উপর খোলা বই পড়িয়া আছে— সে টেবিলের উপর দুই পা তুলিয়া দিয়া চৌকির উপর মাথা রাখিয়া একমনে কী ভাবিতেছিল। পশ্চাতে পদশব্দ শুনিয়া একেবারে চমকিয়া উঠিয়া ফিরিয়া তাকাইল। যেন কাহার ধ্যানে নিমগ্ন ছিল, হঠাৎ ভ্রম হইয়াছিল, সে-ই বুঝি আসিয়াছে। আশাকে দেখিয়া মহেন্দ্র সংযত হইয়া পা নামাইয়া খোলা বইটা কোলে টানিয়া লইল।

মহেন্দ্র আজ মনে মনে আশ্চর্য হইল। আজকাল তো আশা এমন অসংকোচে

তাহার সম্মুখে আসে না— দৈবাৎ তাহাদের উভয়ের সাক্ষাৎ হইলে সে তখনই চলিয়া যায়। আজ এত রাত্রে এমন সহজে সে যে তাহার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল, এ বড়ো বিস্ময়কর। মহেন্দ্র তাহার বই হইতে মুখ না তুলিয়াই বুঝিল, আশার আজ চলিয়া যাইবার লক্ষণ নহে। আশা মহেন্দ্রের সম্মুখে স্থিরভাবে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন মহেন্দ্র আর পড়িবার ভান করিতে পারিল না— মুখ তুলিয়া চাহিল। আশা সুস্পষ্ট স্বরে কহিল, "মার হাঁপানি বাড়িয়াছে, তুমি একবার তাঁহাকে দেখিলে ভালো হয়।"

মহেন্দ্র। তিনি কোথায় আছেন ?

আশা। তাঁহার শোবার ঘরেই আছেন, ঘুমাইতে পারিতেছেন না।

মহেন্দ্র। তবে চলো তাঁহাকে দেখিয়া আসিগে।

অনেক দিনের পরে আশার সঙ্গে এইটুকু কথা কহিয়া মহেন্দ্র যেন অনেকটা হালকা বোধ করিল। নীরবতা যেন দুর্ভেদ্য দুর্গপ্রাচীরের মতো স্ত্রীপুরুষের মাঝখানে কালো ছায়া ফেলিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, মহেন্দ্রের তরফ হইতে তাহা ভাঙিবার কোনো অস্ত্র ছিল না— এমন সময় আশা স্বহস্তে কেল্লার একটি ছোটো দ্বার খুলিয়া দিল।

রাজলক্ষ্মীর দ্বারের বাহিরে আশা দাঁড়াইয়া রহিল, মহেন্দ্র ঘরে প্রবেশ করিল। মহেন্দ্রকে অসময়ে ঘরে আসিতে দেখিয়া রাজলক্ষ্মী ভীত হইলেন, ভাবিলেন, বুঝি বা আশার সঙ্গে রাগারাগি করিয়া আবার সে বিদায় লইতে আসিয়াছে। কহিলেন, "মহিন, এখনো ঘুমাস নাই ?"

মহেন্দ্র কহিল, "মা, তোমার সেই হাঁপানি কি বাড়িয়াছে।"

এতদিন পরে এই প্রশ্ন শুনিয়া মার মনে বড়ো অভিমান জন্মিল। বুঝিলেন, বউ গিয়া বলাতেই আজ মহিন মার খবর লইতে আসিয়াছে। এই অভিমানের আবেগে তাঁহার বক্ষ আরো আন্দোলিত হইয়া উঠিল— কষ্টে বাক্য উচ্চারণ করিয়া বলিলেন, "যা, তুই শুতে যা। আমার ও কিছুই না।"

মহেন্দ্র। না মা, একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা ভালো, এ ব্যামো উপেক্ষা করিবার জিনিস নহে।

মহেন্দ্র জানিত, তাহার মাতার হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা আছে, এই কারণে এবং মাতার মুখশ্রীর লক্ষণ দেখিয়া সে উদ্‌বেগ অনুভব করিল।

মা কহিলেন, "পরীক্ষা করিবার দরকার নাই, আমার এ ব্যামো সারিবার নহে।"

মহেন্দ্র কহিল, "আচ্ছা, আজ রাত্রের মতো একটা ঘুমের ওষুধ আনাইয়া দিতেছি, কাল ভালো করিয়া দেখা যাইবে।"

রাজলক্ষ্মী। ঢের ওষুধ খাইয়াছি, ওষুধে আমার কিছু হয় না। যাও মহিন, অনেক রাত হইয়াছে, তুমি ঘুমাইতে যাও।

মহেন্দ্র। তুমি একটু সুস্থ হইলেই আমি যাইব।

তখন অভিমানিনী রাজলক্ষ্মী দ্বারের অন্তরালবর্তিনী বধূকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বউ, কেন তুমি এই রাত্রে মহেন্দ্রকে বিরক্ত করিবার জন্য এখানে আনিয়াছ।" বলিতে বলিতে তাঁহার শ্বাসকষ্ট আরো বাড়িয়া উঠিল।

তখন আশা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মৃদু অথচ দৃঢ়স্বরে মহেন্দ্রকে কহিল, "যাও, তুমি শুইতে যাও, আমি মার কাছে থাকিব।"

মহেন্দ্র আশাকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া কহিল, "আমি একটা ওষুধ আনাইতে পাঠাইলাম। শিশিতে দুই দাগ থাকিবে— এক দাগ খাওয়াইয়া যদি ঘুম না আসে, তবে এক ঘণ্টা পরে আর-এক দাগ খাওয়াইয়া দিয়ো। রাত্রে বাড়িলে আমাকে খবর দিতে ভুলিয়ো না।"

এই বলিয়া মহেন্দ্র নিজের ঘরে ফিরিয়া গেল। আশা আজ তাহার কাছে যে-মূর্তিতে দেখা দিল, এ যেন মহেন্দ্রের পক্ষে নূতন। এ-আশার মধ্যে সংকোচ নাই, দীনতা নাই, এই আশা নিজের অধিকারের মধ্যে নিজে অধিষ্ঠিত, সেটুকুর জন্য মহেন্দ্রের নিকট সে ভিক্ষাপ্রার্থিনী নহে। নিজের স্ত্রীকে মহেন্দ্র উপেক্ষা করিয়াছে, কিন্তু বাড়ির বধূর প্রতি তাহার সম্ভ্রম জন্মিল।

আশা তাঁহার প্রতি যত্নবশত মহেন্দ্রকে ডাকিয়া আনিয়াছে, ইহাতে রাজলক্ষ্মী মনে মনে খুশি হইলেন। মুখে বলিলেন, "বউমা, তোমাকে শুতে পাঠাইলাম, তুমি আবার মহেন্দ্রকে টানিয়া আনিলে কেন।"

আশা তাহার উত্তর না দিয়া পাখা-হাতে তাঁহার পশ্চাতে বসিয়া বাতাস করিতে লাগিল।

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "যাও বউমা, শুতে যাও।"

আশা মৃদুস্বরে কহিল, "আমাকে এইখানে বসিতে বলিয়া গেছেন।" আশা জানিত, মহেন্দ্র মাতার সেবায় তাহাকে নিয়োগ করিয়া গেছে, এ-খবরে রাজলক্ষ্মী খুশি হইবেন।

৪৩

রাজলক্ষ্মী যখন স্পষ্টই দেখিলেন, আশা মহেন্দ্রের মন বাঁধিতে পারিতেছে না, তখন তাঁহার মনে হইল, "অন্তত আমার ব্যামো উপলক্ষ করিয়াও যদি মহেন্দ্রকে

থাকিতে হয় সেও ভালো।” তাঁহার ভয় হইতে লাগিল, পাছে তাঁহার অসুখ একেবারে সারিয়া যায়। আশাকে ভাঁড়াইয়া ওষুধ তিনি ফেলিয়া দিতে আরম্ভ করিলেন।

অন্যমনস্ক মহেন্দ্র বড়ো-একটা খেয়াল করিত না। কিন্তু আশা দেখিতে পাইত, রাজলক্ষ্মীর রোগ কিছুই কমিতেছে না, বরঞ্চ যেন বাড়িতেছে। আশা ভাবিত, মহেন্দ্র যথেষ্ট যত্ন ও চিন্তা করিয়া ঔষধ নির্বাচন করিতেছে না— মহেন্দ্রের মন এতই উদ্‌ভ্রান্ত যে, মাতার পীড়াও তাহাকে চেতাইয়া তুলিতে পারিতেছে না। মহেন্দ্রের এতবড়ো দুর্গতিতে আশা তাহাকে মনে মনে ধিক্‌কার না দিয়া থাকিতে পারিল না। এক দিকে নষ্ট হইলে মানুষ কি সকল দিকেই এমনি করিয়া নষ্ট হয়।

একদিন সন্ধ্যাকালে রোগের কষ্টের সময় রাজলক্ষ্মীর বিহারীকে মনে পড়িয়া গেল। কতদিন বিহারী আসে নাই, তাহার ঠিক নাই। আশাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বউমা, বিহারী এখন কোথায় আছে জান?” আশা বুঝিতে পারিল, চিরকাল রোগতাপের সময় বিহারীই মার সেবা করিয়া আসিয়াছে। তাই কষ্টের সময় বিহারীকেই মাতার মনে পড়িতেছে। হায়, এই সংসারের অটল নির্ভর সেই চিরকালের বিহারীও দূর হইল। বিহারী-ঠাকুরপো থাকিলে এই দুঃসময়ে মার যত্ন হইত— ইহার মতো তিনি হৃদয়হীন নহেন। আশার হৃদয় হইতে দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

রাজলক্ষ্মী। বিহারীর সঙ্গে মহিন বুঝি ঝগড়া করিয়াছে? বড়ো অন্যায় করিয়াছে বউমা। তাহার মতো এমন হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু মহিনের আর কেহ নাই।

বলিতে বলিতে তাঁহার দুই চক্ষুর কোণে অশ্রুজল জড়ো হইল।

একে একে আশার অনেক কথা মনে পড়িল। অন্ধ মূঢ় আশাকে যথাসময়ে সতর্ক করিবার জন্য বিহারী কতরূপে কত চেষ্টা করিয়াছে এবং সেই চেষ্টার ফলে সে ক্রমশই আশার অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে, সেই কথা মনে করিয়া আজ আশা মনে মনে নিজেকে তীব্রভাবে অপমান করিতে লাগিল। একমাত্র সুহৃৎকে লাঞ্ছিত করিয়া একমাত্র শত্রুকে যে বক্ষে টানিয়া লয়, বিধাতা সেই কৃতঘ্ন মূর্খকে কেন না শাস্তি দিবেন। ভগ্নহৃদয় বিহারী যে নিশ্বাস ফেলিয়া এ-ঘর হইতে বিদায় হইয়া গেছে, সে-নিশ্বাস কি এ-ঘরকে লাগিবে না।

আবার অনেকক্ষণ চিন্তিতমুখে স্থির থাকিয়া রাজলক্ষ্মী হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, “বউমা, বিহারী যদি থাকিত, তবে এই দুর্দিনে সে আমাদের রক্ষা করিতে পারিত— এতদূর পর্যন্ত গড়াইতে পাইত না।”

আশা নিস্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিল। রাজলক্ষ্মী নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "সে যদি খবর পায় আমার ব্যামো হইয়াছে, তবে সে না আসিয়া থাকিতে পারিবে না।"

আশা বুঝিল, রাজলক্ষ্মীর ইচ্ছা বিহারী এই খবরটা পায়। বিহারীর অভাবে তিনি আজকাল একেবারে নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছেন।

ঘরের আলো নিবাইয়া দিয়া মহেন্দ্র জ্যোৎস্নায় জানলার কাছে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। পড়িতে আর ভালো লাগে না। গৃহে কোনো সুখ নাই। যাহারা পরমাত্মীয়, তাহাদের সঙ্গে সহজভাবের সম্বন্ধ দূর হইয়া গেলে, তাহাদিগকে পরের মতো অনায়াসে ফেলিয়া দেওয়া যায় না, আবার প্রিয়জনের মতো অনায়াসে তাহাদিগকে গ্রহণ করা যায় না—তাহাদের সেই অত্যাজ্য আত্মীয়তা অহরহ অসহ্য ভারের মতো বক্ষে চাপিয়া থাকে। মার সম্মুখে যাইতে মহেন্দ্রের ইচ্ছা হয় না—তিনি হঠাৎ মহেন্দ্রকে কাছে আসিতে দেখিলেই এমন একটা শঙ্কিত উদ্‌বেগের সহিত তাহার মুখের দিকে চান যে, মহেন্দ্রকে তাহা আঘাত করে। আশা কোনো উপলক্ষে কাছে আসিলে তাহার সঙ্গে কথা কহাও কঠিন হয়, চুপ করিয়া থাকাও কষ্টকর হইয়া উঠে। এমন করিয়া দিন আর কাটিতে চাহে না। মহেন্দ্র দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, অন্তত সাত দিন সে বিনোদিনীর সঙ্গে একেবারেই দেখা করিবে না। আরো দুই দিন বাকি আছে—কেমন করিয়া সে দুই দিন কাটিবে।

মহেন্দ্র পশ্চাতে পদশব্দ শুনিল। বুঝিল, আশা ঘরে প্রবেশ করিয়াছে। যেন শুনিতে পায় নাই, এই ভান করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আশা সে ভানটুকু বুঝিতে পারিল, তবু ঘর হইতে চলিয়া গেল না। পশ্চাতে দাঁড়াইয়া কহিল, "একটা কথা আছে, সেইটে বলিয়াই আমি যাইতেছি।"

মহেন্দ্র ফিরিয়া কহিল, "যাইতে হইবে কেন, একটু বসোই না।"

আশা এই ভদ্রতাটুকুতে কান না দিয়া স্থির দাঁড়াইয়া কহিল, "বিহারী-ঠাকুরপোকে মার অসুখের খবর দেওয়া উচিত।"

বিহারীর নাম শুনিয়াই মহেন্দ্রের গভীর হৃদয়ক্ষতে ঘা পড়িল। নিজেকে একটুখানি সামলাইয়া লইয়া কহিল, "কেন উচিত। আমার চিকিৎসায় বুঝি বিশ্বাস হয় না।"

মহেন্দ্র মাতার চিকিৎসায় যথোচিত যত্ন করিতেছে না, এই ভর্ৎসনায় আশার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া ছিল, তাই তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল, "কই, মার ব্যামো তো কিছুই ভালো হয় নাই, দিনে দিনে আরও যেন বাড়িয়া উঠিতেছে।"

এই সামান্য কথাটার ভিতরকার উত্তাপ মহেন্দ্র বুঝিতে পারিল। এমন গূঢ়

ভর্ৎসনা আশা আর কখনোই মহেন্দ্রকে করে নাই। মহেন্দ্র নিজের অহংকারে আহত হইয়া বিস্মিত বিদ্রূপের সহিত কহিল, "তোমার কাছে ডাক্তারি শিখিতে হইবে দেখিতেছি!"

আশা এই বিদ্রূপে তাহার পুঞ্জীভূত বেদনার উপরে হঠাৎ অপ্রত্যাশিত আঘাত পাইল; তাহার উপরে ঘর অন্ধকার ছিল, তাই সেই চিরকালের নিরুত্তর আশা আজ অসংকোচে উদ্দীপ্ত তেজের সহিত বলিয়া উঠিল, "ডাক্তারি না শেখ, মাকে যত্ন করা শিখিতে পার।"

আশার কাছে এমন জবাব পাইয়া মহেন্দ্রের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। এই অনভ্যস্ত তীব্র বাক্যে মহেন্দ্র নিষ্ঠুর হইয়া উঠিল। কহিল, "তোমার বিহারী-ঠাকুরপোকে কেন এই বাড়িতে আসিতে নিষেধ করিয়াছি, তাহা তো তুমি জান— আবার তাহাকে স্মরণ করিয়াছ বুঝি!"

আশা দ্রুতপদে ঘর হইতে চলিয়া গেল। লজ্জার ঝড়ে যেন তাহাকে ঠেলিয়া লইয়া গেল। লজ্জা তাহার নিজের জন্য নহে। অপরাধে যে-ব্যক্তি মগ্ন হইয়া আছে, সে এমন অন্যায় অপবাদ মুখে উচ্চারণ করিতে পারে! এতবড়ো নির্লজ্জতাকে পর্বত-প্রমাণ লজ্জা দিয়াও ঢাকা যায় না।

আশা চলিয়া গেলেই মহেন্দ্র নিজের সম্পূর্ণ পরাভব অনুভব করিতে পারিল। আশা যে কোনো কালে কোনো অবস্থাতেই মহেন্দ্রকে এমন ধিক্‌কার করিতে পারে, তাহা মহেন্দ্র কল্পনাও করিতে পারে নাই। মহেন্দ্র দেখিল, যেখানে তাহার সিংহাসন ছিল সেখানে সে ধুলায় লুটাইতেছে। এতদিন পরে তাহার আশঙ্কা হইল, পাছে আশার বেদনা ঘৃণায় পরিণত হয়।

ওদিকে বিহারীর কথা মনে আসিতেই বিনোদিনী সম্বন্ধে চিন্তা তাহাকে অধীর করিয়া তুলিল। বিহারী পশ্চিম হইতে ফিরিয়াছে কি না, কে জানে। ইতিমধ্যে বিনোদিনী তাহার ঠিকানা জানিতেও পারে, বিনোদিনীর সঙ্গে বিহারীর দেখা হওয়াও অসম্ভব নহে। মহেন্দ্রের আর প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয় না।

রাত্রে রাজলক্ষ্মীর বক্ষের কষ্ট বাড়িল, তিনি আর থাকিতে না পারিয়া নিজেই মহেন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কষ্টে বাক্য উচ্চারণ করিয়া কহিলেন, "মহিন, বিহারীকে আমার বড়ো দেখিতে ইচ্ছা হয়, অনেক দিন সে আসে নাই।"

আশা শাশুড়ীকে বাতাস করিতেছিল। সে মুখ নিচু করিয়া রহিল। মহেন্দ্র কহিল, "সে এখানে নাই, পশ্চিমে কোথায় চলিয়া গেছে।"

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "আমার মন বলিতেছে, সে এখানেই আছে, কেবল তোর

উপর অভিমান করিয়া আসিতেছে না। আমার মাথা খা, কাল একবার তুই তাহার বাড়িতে যাস।”

মহেন্দ্র কহিল, “আচ্ছা যাব।”

আজ সকলেই বিহারীকে ডাকিতেছে। মহেন্দ্র নিজেকে বিশ্বের পরিত্যক্ত বলিয়া বোধ করিল।

৪৪

পরদিন প্রত্যুষেই মহেন্দ্র বিহারীর বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, দ্বারের কাছে অনেকগুলা গোরুর গাড়িতে ভৃত্যগণ আসবাব বোঝাই করিতেছে। ভজুকে মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, “ব্যাপারখানা কী!” ভজু কহিল, “বাবু বালিতে গঙ্গার ধারে একটি বাগান লইয়াছেন, সেইখানে জিনিসপত্র চলিয়াছে।” মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, “বাবু বাড়িতে আছেন না কি।” ভজু কহিল, “তিনি দুই দিন মাত্র কলিকাতায় থাকিয়া কাল বাগানে চলিয়া গেছেন।”

শুনিয়া মহেন্দ্রের মন আশঙ্কায় পূর্ণ হইয়া গেল। সে অনুপস্থিত ছিল ইতিমধ্যে বিনোদিনী ও বিহারীতে যে দেখা হইয়াছে, ইহাতে তাহার মনে কোনো সংশয় রহিল না। সে কল্পনাচক্ষে দেখিল, বিনোদিনীর বাসার সম্মুখেও এতক্ষণে গোরুর গাড়ি বোঝাই হইতেছে। তাহার নিশ্চয় বোধ হইল, “এইজন্যই নির্বোধ আমাকে বিনোদিনী বাসা হইতে দূরে রাখিয়াছিল।”

মুহূর্তকাল বিলম্ব না করিয়া মহেন্দ্র তাহার গাড়িতে চড়িয়া কোচম্যানকে হাঁকাইতে কহিল। ঘোড়া যথেষ্ট দ্রুত চলিতেছে না বলিয়া মহেন্দ্র মাঝে মাঝে কোচম্যানকে গালি দিল। গলির মধ্যে সেই বাসার দ্বারের সম্মুখে পৌঁছিয়া দেখিল, সেখানে যাত্রার কোনো আয়োজন নাই। ভয় হইল, পাছে সে-কার্য পূর্বেই সমাধা হইয়া থাকে। বেগে দ্বারে আঘাত করিল। ভিতর হইতে বৃদ্ধ চাকর দরজা খুলিয়া দিবামাত্র মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, “সব খবর ভালো তো।” সে কহিল, “আজ্ঞা হাঁ ভালো বই কি।”

মহেন্দ্র উপরে গিয়া দেখিল, বিনোদিনী স্নানে গিয়াছে। তাহার নির্জন শয়নঘরে প্রবেশ করিয়া মহেন্দ্র বিনোদিনীর গতরাত্রে ব্যবহৃত শয্যার উপর লুটাইয়া পড়িল—সেই কোমল আস্তরণকে দুই প্রসারিত হস্তে বক্ষের কাছে আকর্ষণ করিল এবং তাহাকে ঘ্রাণ করিয়া তাহার উপরে মুখ রাখিয়া বলিতে লাগিল, “নিষ্ঠুর! নিষ্ঠুর!”

এইরূপে হৃদয়োচ্ছ্বাস উন্মুক্ত করিয়া দিয়া শয্যা হইতে উঠিয়া মহেন্দ্র অধীরভাবে

বিনোদিনীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে করিতে দেখিল, একখানা বাংলা খবরের কাগজ নিচের বিছানায় খোলা পড়িয়া আছে। সময় কাটাইবার জন্য কতকটা অন্যমনস্কভাবে সেখানা তুলিয়া লইল, যেখানে চোখ পড়িল, মহেন্দ্র সেখানেই বিহারীর নাম দেখিতে পাইল। এক মুহূর্তে তাহার সমস্ত মন খবরের কাগজের সেই জায়গাটাতেই ঝুঁকিয়া পড়িল। একজন পত্র-প্রেরক লিখিতেছে, অল্প বেতনের দরিদ্র কেরানিগণ রুগ্ন হইয়া পড়িলে তাহাদের বিনামূল্যে চিকিৎসা ও সেবার জন্য বিহারী বালিতে গঙ্গার ধারে একটি বাগান লইয়াছেন— সেখানে এক কালে পাঁচজনকে আশ্রয় দিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে, ইত্যাদি।

বিনোদিনী এই খবরটা পড়িয়াছে। পড়িয়া তাহার কিরূপ ভাব হইল। নিশ্চয় তাহার মনটা সেইদিকে পালাই-পালাই করিতেছে। শুধু সেজন্য নহে, মহেন্দ্রের মন এই কারণে আরো ছটফট করিতে লাগিল যে, বিহারীর এই সংকল্পে তাহার প্রতি বিনোদিনীর ভক্তি আরো বাড়িয়া উঠিবে। বিহারীকে মহেন্দ্র মনে মনে "হাম্বাগ" বলিল, বিহারীর এই কাজটাকে "হুজুগ" বলিয়া অভিহিত করিল— কহিল, "লোকের হিতকারী হইয়া উঠিবার হুজুগ বিহারীর ছেলেবেলা হইতেই আছে।" মহেন্দ্র নিজেকে বিহারীর তুলনায় একান্ত অকপট অকৃত্রিম বলিয়া বাহবা দিবার চেষ্টা করিল— কহিল, "ঔদার্য ও আত্মত্যাগের ভড়ঙে মূঢ়লোক ভুলাইবার চেষ্টাকে আমি ঘৃণা করি।" কিন্তু হায়, এই পরমনিশ্চেষ্ট অকৃত্রিমতার মাহাত্ম্য লোকে অর্থাৎ বিশেষ কোনো-একটি লোক হয়তো বুঝিবে না। মহেন্দ্রের মনে হইতে লাগিল, বিহারী যেন তাহার উপরে এও একটা চাল চালিয়াছে।

বিনোদিনীর পদশব্দ শুনিয়া মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি কাগজখানা মুড়িয়া তাহার উপরে চাপিয়া বসিল। স্নাত বিনোদিনী ঘরে প্রবেশ করিলে, মহেন্দ্র তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বিস্মিত হইয়া উঠিল। তাহার কী-এক অপরূপ পরিবর্তন হইয়াছে। সে যেন এই কয়দিন আগুন জ্বালিয়া তপস্যা করিতেছিল। তাহার শরীর কৃশ হইয়া গেছে, এবং সেই কৃশতা ভেদ করিয়া তাহার পাণ্ডুবর্ণ মুখে একটি দীপ্তি বাহির হইতেছে।

বিনোদিনী বিহারীর পত্রের আশা ত্যাগ করিয়াছে। নিজের প্রতি বিহারীর নিরতিশয় অবজ্ঞা কল্পনা করিয়া সে অহোরাত্রি নিঃশব্দে দগ্ধ হইতেছিল। এই দাহ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার কোনো পথ তাহার কাছে ছিল না। বিহারী যেন তাহাকেই তিরস্কার করিয়া পশ্চিমে চলিয়া গেছে— তাহার নাগাল পাইবার কোনো উপায়

বিনোদিনীর হাতে নাই। কর্মপরায়ণা নিরলসা বিনোদিনী কর্মের অভাবে এই ক্ষুদ্র বাসার মধ্যে যেন রুদ্ধশ্বাস হইয়া উঠিতেছিল— তাহার সমস্ত উদ্যম তাহার নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া আঘাত করিতেছিল। তাহার সমস্ত ভাবী জীবনকে এই প্রেমহীন কর্মহীন আনন্দহীন বাসার মধ্যে, এই রুদ্ধ গলির মধ্যে চিরকালের জন্য আবদ্ধ কল্পনা করিয়া তাহার বিদ্রোহী প্রকৃতি আয়ত্তাতীত অদৃষ্টের বিরুদ্ধে যেন আকাশে মাথা ঠুকিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছিল। যে মূঢ় মহেন্দ্র বিনোদিনীর সমস্ত মুক্তির পথ চারি দিক হইতে রুদ্ধ করিয়া তাহার জীবনকে এমন সংকীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে, তাহার প্রতি বিনোদিনীর ঘৃণা ও বিদ্বেষের সীমা ছিল না। বিনোদিনী বুঝিতে পারিয়াছিল, সেই মহেন্দ্রকে সে কিছুতেই আর দূরে ঠেলিয়া রাখিতে পারিবে না। এই ক্ষুদ্র বাসায় মহেন্দ্র তাহার কাছে ঘেঁষিয়া সম্মুখে আসিয়া বসিবে— প্রতিদিন অলক্ষ্য আকর্ষণে তিলে তিলে তাহার দিকে অধিকতর অগ্রসর হইতে থাকিবে,— এই অন্ধকূপে, এই সমাজভ্রষ্ট জীবনের পঙ্কশয্যায় ঘৃণা এবং আসক্তির মধ্যে যে প্রাত্যহিক লড়াই হইতে থাকিবে, তাহা অত্যন্ত বীভৎস। বিনোদিনী স্বহস্তে স্বচেষ্টায় মাটি খুঁড়িয়া মহেন্দ্রের হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে এই যে একটা লোলজিহ্বা লোলুপতার ক্লেদাক্ত সরীসৃপকে বাহির করিয়াছে, ইহার পুচ্ছপাশ হইতে সে নিজেকে কেমন করিয়া রক্ষা করিবে। একে বিনোদিনীর ব্যথিত হৃদয়, তাহাতে এই ক্ষুদ্র অবরুদ্ধ বাসা, তাহাতে মহেন্দ্রের বাসনা-তরঙ্গের অহরহ অভিঘাত— ইহা কল্পনা করিয়াও বিনোদিনীর সমস্ত চিত্ত আতঙ্কে পীড়িত হইয়া উঠে। জীবনে ইহার সমাপ্তি কোথায়। কবে সে এই-সমস্ত হইতে বাহির হইতে পারিবে।

বিনোদিনীর সেই কৃশপাণ্ডুর মুখ দেখিয়া মহেন্দ্রের মনে ঈর্ষানল জলিয়া উঠিল। তাহার কি এমন কোনো শক্তি নাই, যাহা দ্বারা সে বিহারীর চিন্তা হইতে এই তপস্বিনীকে বলপূর্বক উৎপাটিত করিয়া লইতে পারে। ইগল যেমন মেষশাবককে এক নিমেষে ছোঁ মারিয়া তাহার সুদুর্গম অভ্রভেদী পর্বতনীড়ে উত্তীর্ণ করে, তেমনি এমন কি কোনো মেঘপরিবৃত নিখিলবিস্মৃত স্থান নাই, যেখানে একাকী মহেন্দ্র তাহার এই কোমল-সুন্দর শিকারটিকে আপনার বুকের কাছে লুকাইয়া রাখিতে পারে। ঈর্ষার উত্তাপে তাহার ইচ্ছার আগ্রহ চতুর্গুণ বাড়িয়া উঠিল। আর কি সে একমুহূর্তও বিনোদিনীকে চোখের আড়াল করিতে পারিবে। বিহারীর বিভীষিকাকে অহরহ ঠেকাইয়া রাখিতে হইবে, তাহাকে সূচ্যগ্রমাত্র অবকাশ দিতে আর তো মহেন্দ্রের সাহস হইবে না।

বিরহতাপে রমণীর সৌন্দর্যকে সুকুমার করিয়া তোলে, মহেন্দ্র এ-কথা সংস্কৃত

কাব্যে পড়িয়াছিল, আজ বিনোদিনীকে দেখিয়া সে তাহা যতই অনুভব করিতে লাগিল, ততই সুখমিশ্রিত দুঃখের সুতীব্র আলোড়নে তাহার হৃদয় একান্ত মথিত হইয়া উঠিল।

বিনোদিনী ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি চা খাইয়া আসিয়াছ।"

মহেন্দ্র কহিল, "না-হয় খাইয়া আসিয়াছি, তাই বলিয়া স্বহস্তে আর-এক পেয়ালা দিতে কৃপণতা করিয়ো না— 'প্যালা মুঝ ভর দে রে'।"

বিনোদিনী বোধ হয় ইচ্ছা করিয়া নিতান্ত নিষ্ঠুরভাবে মহেন্দ্রের এই উচ্ছ্বাসে হঠাৎ আঘাত দিল— কহিল, "বিহারী-ঠাকুরপো এখন কোথায় আছেন খবর জান ?"

মহেন্দ্র নিমেষের মধ্যে বিবর্ণ হইয়া কহিল, "সে তো এখন কলিকাতায় নাই।"

বিনোদিনী। তাহার ঠিকানা কী।

মহেন্দ্র। সে তো কাহাকেও বলিতে চাহে না।

বিনোদিনী। সন্ধান করিয়া কি খবর লওয়া যায় না।

মহেন্দ্র। আমার তো তেমন জরুরি দরকার কিছু দেখি না।

বিনোদিনী। দরকারই কি সব। আশৈশব বন্ধুত্ব কি কিছুই নয়।

মহেন্দ্র। বিহারী আমার আশৈশব বন্ধু বটে, কিন্তু তোমার সঙ্গে তাহার বন্ধুত্ব দু-দিনের— তবু তাগিদটা তোমারই যেন অত্যন্ত বেশি বোধ হইতেছে।

বিনোদিনী। তাহাই দেখিয়া তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত। বন্ধুত্ব কেমন করিয়া করিতে হয়, তাহা তোমার অমন বন্ধুর কাছ হইতেও শিখিতে পারিলে না ?

মহেন্দ্র। সেজন্য তত দুঃখিত নহি, কিন্তু ফাঁকি দিয়া স্ত্রীলোকের মন হরণ কেমন করিয়া করিতে হয়, সে বিদ্যা তাহার কাছে শিখিলে আজ কাজে লাগিতে পারিত।

বিনোদিনী। সে বিদ্যা কেবল ইচ্ছা থাকিলেই শেখা যায় না, ক্ষমতা থাকা চাই।

মহেন্দ্র। গুরুদেবের ঠিকানা যদি তোমার জানা থাকে তো বলিয়া দাও, এ-বয়সে তাঁহার কাছে একবার মন্ত্র লইয়া আসি, তাহার পরে ক্ষমতার পরীক্ষা হইবে।

বিনোদিনী। বন্ধুর ঠিকানা যদি বাহির করিতে না পার, তবে প্রেমের কথা আমার কাছে উচ্চারণ করিয়ো না। বিহারী-ঠাকুরপোর সঙ্গে তুমি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছ, তোমাকে কে বিশ্বাস করিতে পারে।

মহেন্দ্র। আমাকে যদি সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করিতে, তবে আমাকে এত অপমান

করিতে না। আমার ভালোবাসা সম্বন্ধে যদি এত নিঃসংশয় না হইতে, তবে হয়তো আমার এত অসহ্য দুঃখ ঘটিত না। বিহারী পোষ না-মানিবার বিদ্যা জানে, সেই বিদ্যাটা যদি সে এই হতভাগ্যকে শিখাইত, তবে বন্ধুত্বের কাজ করিত।

"বিহারী যে মানুষ, তাই সে পোষ মানিতে পারে না" এই বলিয়া বিনোদিনী খোলা চুল পিঠে মেলিয়া যেমন জানালার কাছে দাঁড়াইয়া ছিল তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল। মহেন্দ্র হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া মুষ্টি বদ্ধ করিয়া রোষগর্জিতস্বরে কহিল, "কেন তুমি আমাকে বার বার অপমান করিতে সাহস কর। এত অপমানের কোনো প্রতিফল পাও না, সে কি তোমার ক্ষমতায় না আমার গুণে। আমাকে যদি পশু বলিয়াই স্থির করিয়া থাক, তবে হিংস্র পশু বলিয়াই জানিয়ো। আমি একেবারে আঘাত করিতে জানি না, এতবড়ো কাপুরুষ নই।" বলিয়া বিনোদিনীর মুখের দিকে চাহিয়া ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল— তাহার পর বলিয়া উঠিল, "বিনোদ, এখান হইতে কোথাও চলো। আমরা বাহির হইয়া পড়ি। পশ্চিমে হউক, পাহাড়ে হউক, যেখানে তোমার ইচ্ছা, চলো। এখানে বাঁচিবার স্থান নাই। আমি মরিয়া যাইতেছি।"

বিনোদিনী কহিল, "চলো, এখনই চলো— পশ্চিমে যাই।"

মহেন্দ্র। পশ্চিমে কোথায় যাইবে।

বিনোদিনী। কোথাও নহে। এক জায়গায় দু-দিন থাকিব না— ঘুরিয়া বেড়াইব।

মহেন্দ্র কহিল, "সেই ভালো, আজ রাত্রেই চলো।"

বিনোদিনী সম্মত হইয়া মহেন্দ্রের জন্য রন্ধনের উদ্‌যোগ করিতে গেল।

মহেন্দ্র বুঝিতে পারিল, বিহারীর খবর বিনোদিনীর চোখে পড়ে নাই। খবরের কাগজে মন দিবার মতো অবধানশক্তি বিনোদিনীর এখন আর নাই। পাছে দৈবাৎ সে-খবর বিনোদিনী জানিতে পারে, সেই উদ্‌বেগে মহেন্দ্র সমস্ত দিন সতর্ক হইয়া রহিল।

৪৫

বিহারীর খবর লইয়া মহেন্দ্র ফিরিয়া আসিবে, এই স্থির করিয়া বাড়িতে তাহার জন্য আহার প্রস্তুত হইয়াছিল। অনেক দেরি দেখিয়া পীড়িত রাজলক্ষ্মী উদ্বিগ্ন হইতে লাগিলেন। সারারাত ঘুম না হওয়াতে তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত ছিলেন, তাহার উপরে মহেন্দ্রের জন্য উৎকণ্ঠায় তাঁহাকে ক্লিষ্ট করিতেছে দেখিয়া আশা খবর লইয়া

জানিল, মহেন্দ্রের গাড়ি ফিরিয়া আসিয়াছে। কোঁচম্যানের কাছে সংবাদ পাওয়া গেল, মহেন্দ্র বিহারীর বাড়ি হইয়া পটলডাঙার বাসায় গিয়াছে। শুনিয়া রাজলক্ষ্মী দেয়ালের দিকে পাশ ফিরিয়া স্তব্ধ হইয়া শুইলেন। আশা তাঁহার শিয়রের কাছে চিত্রার্পিতের মতো স্থির হইয়া বসিয়া বাতাস করিতে লাগিল। অন্যদিন যথাসময়ে আশাকে খাইতে যাইবার জন্য রাজলক্ষ্মী আদেশ করিতেন— আজ আর কিছু বলিলেন না। কাল রাত্রে তাঁহার কঠিন পীড়া দেখিয়াও মহেন্দ্র যখন বিনোদিনীর মোহে ছুটিয়া গেল, তখন রাজলক্ষ্মীর পক্ষে এ-সংসারে প্রশ্ন করিবার, চেষ্টা করিবার, ইচ্ছা করিবার আর কিছুই রহিল না। তিনি বুঝিয়াছিলেন বটে যে, মহেন্দ্র তাঁহার পীড়াকে সামান্য জ্ঞান করিয়াছে ; অন্যান্যবার যেমন মাঝে মাঝে রোগ দেখা দিয়া সারিয়া গেছে, এবারেও সেইরূপ একটা ক্ষণিক উপসর্গ ঘটিয়াছে মনে করিয়া মহেন্দ্র নিশ্চিন্ত আছে ; কিন্তু এই আশঙ্কাশূন্য অনুদ্বেগই রাজলক্ষ্মীর কাছে বড়ো কঠিন বলিয়া মনে হইল। মহেন্দ্র প্রেমোন্মত্ততায় কোনো আশঙ্কাকে, কোনো কর্তব্যকে মনে স্থান দিতে চায় না, তাই সে মাতার কষ্টকে পীড়াকে এতই লঘু করিয়া দেখিয়াছে— পাছে জননীর রোগশয্যায় তাহাকে আবদ্ধ হইয়া পড়িতে হয়, তাই সে এমন নির্লজ্জের মতো একটু অবকাশ পাইতেই বিনোদিনীর কাছে পলায়ন করিয়াছে। রোগ-আরোগ্যের প্রতি রাজলক্ষ্মীর আর লেশমাত্র উৎসাহ রহিল না— মহেন্দ্রের অনুদ্বেগ যে অমূলক, দারুণ অভিমানে ইহাই তিনি প্রমাণ করিতে চাহিলেন।

বেলা দুটার সময় আশা কহিল, “মা, তোমার ওষুধ খাইবার সময় হইয়াছে।” রাজলক্ষ্মী উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। আশা ওষুধ আনিবার জন্য উঠিলে তিনি বলিলেন, “ওষুধ দিতে হইবে না বউমা, তুমি যাও।”

আশা মাতার অভিমান বুঝিতে পারিল—সেই অভিমান সংক্রামক হইয়া তাহার হৃদয়ের আন্দোলনে দ্বিগুণ দোলা দিতেই আশা আর থাকিতে পারিল না— কান্না চাপিতে চাপিতে গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। রাজলক্ষ্মী ধীরে ধীরে আশার দিকে পাশ ফিরিয়া তাহার হাতের উপরে সকরুণ স্নেহে আস্তে আস্তে হাত বুলাইতে লাগিলেন, কহিলেন, “বউমা, তোমার বয়স অল্প, এখনো তোমার সুখের মুখ দেখিবার সময় আছে। আমার জন্য তুমি আর চেষ্টা করিয়ো না, বাছা— আমি তো অনেক দিন বাঁচিয়াছি—আর কী হইবে।”

শুনিয়া আশার রোদন আরো উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল— সে মুখের উপর আঁচল চাপিয়া ধরিল।

এইরূপে রোগীর গৃহে নিরানন্দ দিন মন্দগতিতে কাটিয়া গেল। অভিমানের

নবীন-ডাক্তার রোগের সমস্ত বিবরণ জিজ্ঞাসা করিল। উত্তরে সমস্ত শুনিয়া গম্ভীরভাবে ঘরের মধ্যে পুনরায় প্রবেশ করিল। কহিল, "দেখুন, মহেন্দ্র আমার উপর বিশেষ করিয়া ভার দিয়া গেছে। আমাকে যদি আপনার চিকিৎসা করিতে না দেন, তবে সে মনে কষ্ট পাইবে।"

মহেন্দ্র কষ্ট পাইবে, একথাটা রাজলক্ষ্মীর কাছে উপহাসের মতো শুনাইল— তিনি কহিলেন, "মহিনের জন্য বেশি ভাবিয়ো না। কষ্ট সংসারে সকলকেই পাইতে হয়। এ-কষ্টে মহেন্দ্রকে অত্যন্ত বেশি কাতর করিবে না। তুমি এখন যাও ডাক্তার। আমাকে একটু ঘুমাইতে দাও।"

নবীন-ডাক্তার বুঝিল, রোগীকে উত্ত্যক্ত করিলে ভালো হইবে না। ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া যাহা যাহা কর্তব্য আশাকে উপদেশ দিয়া গেল।

আশা ঘরে ঢুকিতেই রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "যাও বাছা, তুমি একটু বিশ্রাম করো গে। সমস্ত দিন রোগীর কাছে বসিয়া আছ। হারুর মাকে পাঠাইয়া দাও— পাশের ঘরে বসিয়া থাক্।"

আশা রাজলক্ষ্মীকে বুঝিত। ইহা তাঁহার স্নেহের অনুরোধ নহে, ইহা তাঁহার আদেশ— পালন করা ছাড়া আর উপায় নাই। হারুর মাকে পাঠাইয়া দিয়া অন্ধকারে সে নিজের ঘরে গিয়া শীতল ভূমিশয্যায় শুইয়া পড়িল।

সমস্ত দিনের উপবাসে ও কষ্টে তাহার শরীর-মন শ্রান্ত ও অবসন্ন। পাড়ার বাড়িতে সেদিন থাকিয়া থাকিয়া বিবাহের বাদ্য বাজিতেছিল। এই সময়ে সানাইয়ে আবার সুর ধরিল। সেই রাগিণীর আঘাতে রাত্রির সমস্ত অন্ধকার যেন স্পন্দিত হইয়া আশাকে বারংবার যেন অভিঘাত করিতে লাগিল। তাহার বিবাহরাত্রির প্রত্যেক ক্ষুদ্র ঘটনাটিও সজীব হইয়া রাত্রির আকাশকে স্বপ্নচ্ছবিতে পূর্ণ করিয়া তুলিল; সেদিনকার আলোক, কোলাহল, জনতা; সেদিনকার মাল্যচন্দন, নববস্ত্র ও হোমধূমের গন্ধ; নববধূর শঙ্কিত লজ্জিত আনন্দিত হৃদয়ের নিগূঢ় কম্পন— সমস্তই স্মৃতির আকারে যতই তাহাকে চারিদিকে আবিষ্ট করিয়া ধরিল, ততই তাহার হৃদয়ের ব্যথা প্রাণ পাইয়া বল করিতে লাগিল। দারুণ দুর্ভিক্ষে ক্ষুধিত বালক যেমন খাদ্যের জন্য মাতাকে আঘাত করিতে থাকে, তেমনি জাগ্রত সুখের স্মৃতি আপনার খাদ্য চাহিয়া আশার বক্ষে বারংবার সরোদন করাঘাত করিতে লাগিল। অবসন্ন আশাকে আর পড়িয়া থাকিতে দিল না। দুই হাত জোড় করিয়া দেবতার কাছে প্রার্থনা করিতে গিয়া সংসারে তাহার একমাত্র প্রত্যক্ষ দেবতা মাসিমার পবিত্র স্নিগ্ধ মূর্তি আশার অশ্রুবাষ্পাচ্ছন্ন হৃদয়ের মধ্যে আবির্ভূত হইল। পুনরায় সংসারের

দুঃখ-ঝঞ্ঝাটে সেই তাপসীকে আহ্বান করিয়া আনিবে না, এতদিন ইহাই তাহার প্রতিজ্ঞা ছিল। কিন্তু আজ সে আর কোথাও কোনো উপায় দেখিতে পাইল না— আজ তাহার চতুর্দিকে ঘনায়িত নিবিড় দুঃখের মধ্যে আর রন্ধ্রমাত্র ছিল না। তাই আজ সে ঘরের মধ্যে আলো জ্বালিয়া কোলের উপর একখানা খাতায় চিঠির কাগজ রাখিয়া ঘনঘন চোখের জল মুছিতে মুছিতে চিঠি লিখিতে লাগিল—

শ্রীচরণকমলেষু—

মাসিমা, তুমি ছাড়া আজ আমার আর কেহ নাই; একবার আসিয়া তোমার কোলের মধ্যে এই দুঃখিনীকে টানিয়া লও— নহিলে আমি কেমন করিয়া বাঁচিব। আর কী লিখিব, জানি না। তোমার চরণে আমার শতসহস্রকোটি প্রণাম।

তোমার স্নেহের
চুনি।

৪৬

অন্নপূর্ণা কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়া অতি ধীরে ধীরে রাজলক্ষ্মীর ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রণামপূর্বক তাঁহার পায়ের ধুলা মাথায় তুলিয়া লইলেন। মাঝখানের বিরোধবিচ্ছেদ সত্ত্বেও অন্নপূর্ণাকে দেখিয়া রাজলক্ষ্মী যেন হারানো ধন ফিরিয়া পাইলেন। ভিতরে ভিতরে তিনি যে নিজের অলক্ষ্যে অগোচরে অন্নপূর্ণাকে চাহিতেছিলেন, অন্নপূর্ণাকে পাইয়া তাহা বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার এতদিনের অনেক শ্রান্তি অনেক ক্ষোভ যে কেবল অন্নপূর্ণার অভাবে, অনেক দিনের পরে আজ তাহা তাঁহার কাছে মুহূর্তের মধ্যে সুস্পষ্ট হইল— মুহূর্তের মধ্যে তাঁহার সমস্ত ব্যথিত হৃদয় তাহার চিরন্তন স্থানটি অধিকার করিল। মহেন্দ্রের জন্মের পূর্বেও এই দুটি জা যখন বধূভাবে এই পরিবারের সমস্ত সুখদুঃখকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন— পূজায় উৎসবে, শোকে মৃত্যুতে, উভয়ে এই সংসার-রথে একত্রে যাত্রা করিয়াছিলেন— তখনকার সেই ঘনিষ্ঠ সখিত্ব রাজলক্ষ্মীর হৃদয়কে আজ মুহূর্তের মধ্যে আচ্ছন্ন করিয়া দিল। যাহার সঙ্গে সুদূর অতীতকালে একত্রে জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন, নানা ব্যাঘাতের পর সেই বাল্যসহচরীই পরম দুঃখের দিনে তাঁহার পার্শ্ববর্তিনী হইলেন— তখনকার সমস্ত সুখদুঃখের, সমস্ত প্রিয় ঘটনার এই একটিমাত্র স্মরণাশ্রয় রহিয়াছে। যাহার জন্য রাজলক্ষ্মী ইহাকেও নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করিয়াছিলেন, সেই বা আজ কোথায়।

অন্নপূর্ণা রোগিণীর পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার দক্ষিণ হস্ত হস্তে লইয়া কহিলেন, "দিদি।"

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "মেজবউ।" বলিয়া আর তাঁহার কথা বাহির হইল না। তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। আশা এই দৃশ্য দেখিয়া আর থাকিতে পারিল না— পাশের ঘরে গিয়া মাটিতে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

রাজলক্ষ্মী বা আশার কাছে অন্নপূর্ণা মহেন্দ্রের সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন পাড়িতে সাহস করিলেন না। সাধুচরণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মামা, মহিন কোথায়।"

তখন সাধুচরণ বিনোদিনী ও মহেন্দ্রের সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া বলিলেন। অন্নপূর্ণা সাধুচরণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিহারীর কী খবর।"

সাধুচরণ কহিলেন, "অনেক দিন তিনি আসেন নাই— তাঁহার খবর ঠিক বলিতে পারি না।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "একবার বিহারীর বাড়িতে গিয়া তাহার সংবাদ জানিয়া আইস।"

সাধুচরণ ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, "তিনি বাড়িতে নাই, বালিতে গঙ্গার ধারে বাগানে গিয়াছেন।"

অন্নপূর্ণা নবীন-ডাক্তারকে ডাকিয়া রোগীর অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। ডাক্তার কহিল, "হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতার সঙ্গে উদরী দেখা দিয়াছে, মৃত্যু অকস্মাৎ কখন আসিবে কিছুই বলা যায় না।"

সন্ধ্যার সময় রাজলক্ষ্মীর রোগের কষ্ট যখন বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, তখন অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদি, একবার নবীন-ডাক্তারকে ডাকাই।"

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "না মেজবউ, নবীন-ডাক্তার আমার কিছুই করিতে পারিবে না।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "তবে কাহাকে তুমি ডাকিতে চাও, বলো।"

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "একবার বিহারীকে যদি খবর দাও তো ভালো হয়।"

অন্নপূর্ণার বক্ষের মধ্যে আঘাত লাগিল। সেদিন দূরপ্রবাসে সন্ধ্যাবেলায় তিনি দ্বারের বাহির হইতে অন্ধকারের মধ্যে বিহারীকে অপমানের সহিত বিদায় করিয়া দিয়াছিলেন, সেই বেদনা তিনি আজ পর্যন্ত ভুলিতে পারেন নাই। বিহারী আর কখনোই তাঁহার দ্বারে ফিরিয়া আসিবে না। ইহজীবনে আর যে কখনো সেই অনাদরের প্রতিকার করিতে অবসর পাইবেন, এ-আশা তাঁহার মনে ছিল না।

অন্নপূর্ণা একবার ছাদের উপর মহেন্দ্রের ঘরে গেলেন। বাড়ির মধ্যে এই ঘরটিই ছিল আনন্দনিকেতন। আজ সে-ঘরের কোনো শ্রী নাই— বিছানাপত্র

বিশৃঙ্খল, সাজসজ্জা অনাদৃত, ছাদের টবে কেহ জল দেয় না, গাছগুলি শুকাইয়া গেছে।”

মাসিমা ছাদে গিয়াছেন বুঝিয়া আশাও ধীরে ধীরে তাঁহার অনুসরণ করিল। অন্নপূর্ণা তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইয়া তাহার মস্তকচুম্বন করিলেন। আশা নত হইয়া দুই হাতে তাঁহার দুই পা ধরিয়া বার বার তাঁহার পায়ে মাথা ঠেকাইল। কহিল, “মাসিমা, আমাকে আশীর্বাদ করো, আমাকে বল দাও। মানুষ যে এত কষ্ট সহ্য করিতে পারে, তাহা আমি কোনাকালে ভাবিতেও পারিতাম না। মা গো, এমন আর কতদিন সহিবে।”

অন্নপূর্ণা সেইখানেই মাটিতে বসিলেন, আশা তাঁহার পায়ে মাথা দিয়া লুটাইয়া পড়িল। অন্নপূর্ণা আশার মাথা কোলের উপর তুলিয়া লইলেন, এবং কোনো কথা না কহিয়া নিস্তব্ধভাবে জোড়হাত করিয়া দেবতাকে স্মরণ করিলেন।

অন্নপূর্ণার স্নেহসিঞ্চিত নিঃশব্দ আশীর্বাদ আশার গভীর হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অনেক দিন পরে শান্তি আনয়ন করিল। তাহার মনে হইল, তাহার অভীষ্ট যেন সিদ্ধপ্রায় হইয়াছে। দেবতা তাহার মতো মূঢ়কে অবহেলা করিতে পারেন, কিন্তু মাসিমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারেন না।

হৃদয়ের মধ্যে আশ্বাস ও বল পাইয়া আশা অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া বসিল। কহিল, “মাসিমা, বিহারী-ঠাকুরপোকে একবার আসিতে চিঠি লিখিয়া দাও।”

অন্নপূর্ণা কহিলেন, “না, চিঠি লেখা হইবে না।”

আশা। তবে তাঁহাকে খবর দিবে কী করিয়া।

অন্নপূর্ণা কহিলেন, “কাল আমি বিহারীর সঙ্গে নিজে দেখা করিতে যাইব।”

৪৭

বিহারী যখন পশ্চিমে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, তখন তাহার মনে হইল, একটা-কোনো কাজে নিজেকে আবদ্ধ না করিলে তাহার আর শান্তি নাই। সেই মনে করিয়া কলিকাতার দরিদ্র কেরানিদের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ভার সে গ্রহণ করিয়াছে। গ্রীষ্মকালের ডোবার মাছ যেমন অল্পজল পাঁকের মধ্যে কোনোমতে শীর্ণ হইয়া খাবি খাইয়া থাকে, গলি-নিবাসী অল্পাশী পরিবারভারগ্রস্ত কেরানির বঞ্চিত জীবন সেইরূপ—সেই বিবর্ণ কৃশ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ভদ্রমণ্ডলীর প্রতি বিহারীর অনেক দিন

হইতে করুণাদৃষ্টি ছিল—তাহাদিগকে বিহারী বনের ছায়াটুকু ও গঙ্গার খোলা হাওয়া দান করিবার সংকল্প করিল।

বালিতে বাগান লইয়া চীনে মিস্ত্রির সাহায্যে সে সুন্দর করিয়া ছোটো ছোটো কুটির তৈরি করাইতে আরম্ভ করিয়া দিল। কিন্তু তাহার মন শান্ত হইল না। কাজে প্রবৃত্ত হইবার দিন তাহার যতই কাছে আসিতে লাগিল, ততই তাহার চিত্ত আপন সংকল্প হইতে বিমুখ হইয়া উঠিল। তাহার মন কেবলই বলিতে লাগিল, "এ-কাজে কোনো সুখ নাই, কোনো রস নাই, কোনো সৌন্দর্য নাই—ইহা কেবল শুষ্ক ভারমাত্র।" কাজের কল্পনা বিহারীকে কখনো ইতিপূর্বে এমন করিয়া ক্লিষ্ট করে নাই।

একদিন ছিল যখন বিহারীর বিশেষ কিছুই দরকার ছিল না; তাহার সম্মুখে যাহা-কিছু উপস্থিত হইত, তাহার প্রতিই অনায়াসে সে নিজেকে নিযুক্ত করিতে পারিত। এখন তাহার মনে একটা-কী ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে, আগে তাহাকে নিবৃত্ত না করিয়া অন্য কিছুতেই তাহার আসক্তি হয় না। পূর্বেকার অভ্যাসমতে সে এটা-ওটা নাড়িয়া দেখে, পরক্ষণেই সে-সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কৃতি পাইতে চায়।

বিহারীর মধ্যে যে যৌবন নিশ্চলভাবে সুপ্ত হইয়া ছিল, যাহার কথা সে কখনো চিন্তাও করে নাই, বিনোদিনীর সোনার কাঠিতে সে আজ জাগিয়া উঠিয়াছে। সদ্যোজাত গরুড়ের মতো সে আপন খোরাকের জন্য সমস্ত জগৎটাকে ঘাঁটিয়া বেড়াইতেছে। এই ক্ষুধিত প্রাণীর সহিত বিহারীর পূর্বপরিচয় ছিল না, ইহাকে লইয়া সে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে; এখন কলিকাতার ক্ষীণজীর্ণ স্বল্পায়ু কেরানিদের লইয়া সে কী করিবে।

আষাঢ়ের গঙ্গা সম্মুখে বহিয়া চলিয়াছে। থাকিয়া থাকিয়া পরপারে নীলমেঘ ঘনশ্রেণী গাছপালার উপরে ভারাবনত নিবিড়ভাবে আবিষ্ট হইয়া উঠে; সমস্ত নদীতল ইস্পাতের তরবারির মতো কোথাও বা উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে, কোথাও বা আগুনের মতো ঝকঝক করিতে থাকে। নববর্ষার এই সমারোহের মধ্যে যেমনি বিহারীর দৃষ্টি পড়ে, অমনি তাহার হৃদয়ের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া আকাশের এই নীলস্নিগ্ধ আলোকের মধ্যে কে একাকিনী বাহির হইয়া আসে, কে তাহার স্নানসিক্ত ঘনতরঙ্গায়িত কৃষ্ণকেশ উন্মুক্ত করিয়া দাঁড়ায়, বর্ষাকাশ হইতে বিদীর্ণমেঘচ্ছুরিত সমস্ত বিচ্ছিন্ন রশ্মিকে কুড়াইয়া লইয়া কে একমাত্র তাহারই মুখের উপরে অনিমেষ দৃষ্টির দীপ্ত কাতরতা প্রসারিত করে।

পূর্বের যে জীবনটা তাহার সুখে-সন্তোষে কাটিয়া গেছে, আজ বিহারী সেই জীবনটাকে পরম ক্ষতি বলিয়া মনে করিতেছে। এমন কত মেঘের সন্ধ্যা, এমন কত পূর্ণিমার রাত্রি আসিয়াছিল, তাহারা বিহারীর শূন্য হৃদয়ের দ্বারের কাছে আসিয়া সুধাপাত্রহস্তে নিঃশব্দে ফিরিয়া গেছে— সেই দুর্লভ শুভক্ষণে কত সংগীত অনারব্ধ, কত উৎসব অসম্পন্ন হইয়াছে, তাহার আর শেষ নাই। বিহারীর মনে যে-সকল পূর্বস্মৃতি ছিল, বিনোদিনী সেদিনকার উদ্যত চুম্বনের রক্তিম আভার দ্বারা সেগুলিকে আজ এমন বিবর্ণ অকিঞ্চিৎকর করিয়া দিয়া গেল। মহেন্দ্রের ছায়ার মতো হইয়া জীবনের অধিকাংশ দিন কেমন করিয়া কাটিয়াছিল। তাহার মধ্যে কী চরিতার্থতা ছিল। প্রেমের বেদনায় সমস্ত জল-স্থল-আকাশের কেন্দ্রকুহর হইতে যে এমন রাগিণীতে এমন বাঁশি বাজে, তাহা তো অচেতন বিহারী পূর্বে কখনো অনুমান করিতেও পারে নাই। যে-বিনোদিনী দুই বাহুতে বেষ্টন করিয়া এক মুহূর্তে অকস্মাৎ এই অপরূপ সৌন্দর্যলোকে বিহারীকে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে, তাহাকে সে আর কেমন করিয়া ভুলিবে। তাহার দৃষ্টি তাহার আকাঙ্ক্ষা আজ সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহার ব্যাকুল ঘননিশ্বাস বিহারীর রক্তস্রোতকে অহরহ তরঙ্গিত করিয়া তুলিতেছে এবং তাহার স্পর্শের সুকোমল উত্তাপ বিহারীকে বেষ্টন করিয়া পুলকাবিষ্ট হৃদয়কে ফুলের মতো ফুটাইয়া রাখিয়াছে।

কিন্তু তবু সেই বিনোদিনীর কাছ হইতে বিহারী আজ এমন দূরে রহিয়াছে কেন। তাহার কারণ এই, বিনোদিনী যে-সৌন্দর্যরসে বিহারীকে অভিষিক্ত করিয়া দিয়াছে, সংসারের মধ্যে বিনোদিনীর সহিত সেই সৌন্দর্যের উপযুক্ত কোনো সম্বন্ধ সে কল্পনা করিতে পারে না। পদ্মকে তুলিতে গেলে পঙ্ক উঠিয়া পড়ে। কী বলিয়া তাহাকে এমন-কোথায় স্থাপন করিতে পারে, যেখানে সুন্দর বীভৎস হইয়া না উঠে। তাহা ছাড়া মহেন্দ্রের সহিত যদি কাড়াকাড়ি বাধিয়া যায়, তবে সমস্ত ব্যাপারটা এতই কুৎসিত আকার ধারণ করিবে, যে, সে-সম্ভাবনা বিহারী মনের প্রান্তেও স্থান দিতে পারে না। তাই বিহারী নিভৃত গঙ্গাতীরে বিশ্বসংগীতের মাঝখানে তাহার মানসী প্রতিমাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আপনার হৃদয়কে ধূপের মতো দগ্ধ করিতেছে। পাছে এমন কোনো সংবাদ পায়, যাহাতে তাহার সুখস্বপ্নজাল ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তাই সে চিঠি লিখিয়া বিনোদিনীর কোনো খবরও লয় না।

তাহার বাগানের দক্ষিণ প্রান্তে ফলপূর্ণ জামগাছের তলায় মেঘাচ্ছন্ন প্রভাতে বিহারী চুপ করিয়া পড়িয়া ছিল, সম্মুখ দিয়া কুঠির পানসি যাতায়াত করিতেছিল, তা-ই সে অলসভাবে দেখিতেছিল; ক্রমে বেলা বাড়িয়া যাইতে লাগিল। চাকর

আসিয়া, আহারের আয়োজন করিবে কি না, জিজ্ঞাসা করিল,— বিহারী কহিল, “এখন থাক্‌।” মিস্ত্রির সর্দার আসিয়া বিশেষ পরামর্শের জন্য তাহাকে কাজ দেখিতে আহ্বান করিল— বিহারী কহিল, “আর-একটু পরে।”

এমন সময় বিহারী হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া দেখিল, সম্মুখে অন্নপূর্ণা। শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল— দুই হাতে তাঁহার পা চাপিয়া ধরিয়া ভূতলে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল। অন্নপূর্ণা তাঁহার দক্ষিণ হস্ত দিয়া পরমস্নেহে বিহারীর মাথা ও গা স্পর্শ করিলেন। অশ্রুজড়িতস্বরে কহিলেন, “বিহারী, তুই এত রোগা হইয়া গেছিস কেন।”

বিহারী কহিল, “কাকীমা, তোমার স্নেহ ফিরিয়া পাইবার জন্য।”

শুনিয়া অন্নপূর্ণার চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। বিহারী ব্যস্ত হইয়া কহিল, “কাকীমা, তোমার এখনো খাওয়া হয় নাই?”

অন্নপূর্ণা কহিলেন, “না, এখনো আমার সময় হয় নাই।”

বিহারী কহিল, “চলো, আমি রাঁধিবার জোগাড় করিয়া দিইগে। আজ অনেক দিন পরে তোমার হাতের রান্না এবং তোমার পাতের প্রসাদ খাইয়া বাঁচিব।”

মহেন্দ্র-আশার সম্বন্ধে বিহারী কোনো কথাই উত্থাপন করিল না। অন্নপূর্ণা একদিন স্বহস্তে বিহারীর নিকটে সেদিককার দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। অভিমানের সহিত সেই নিষ্ঠুর নিষেধ সে পালন করিল।

আহারান্তে অন্নপূর্ণা কহিলেন, “নৌকা ঘাটেই প্রস্তুত আছে, বিহারী, এখন একবার কলিকাতায় চল্‌।”

বিহারী কহিল, “কলিকাতায় আমার কোন্‌ প্রয়োজন।”

অন্নপূর্ণা কহিলেন, “দিদির বড়ো অসুখ, তিনি তোকে দেখিতে চাহিয়াছেন।”

শুনিয়া বিহারী চকিত হইয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল, “মহিনদা কোথায়।”

অন্নপূর্ণা কহিলেন, “সে কলিকাতায় নাই, পশ্চিমে চলিয়া গেছে।”

শুনিয়া মুহূর্তে বিহারীর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে চুপ করিয়া রহিল।

অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুই কি সকল কথা জানিসনে।”

বিহারী কহিল, “কতকটা জানি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জানি না।”

তখন অন্নপূর্ণা, বিনোদিনীকে লইয়া মহেন্দ্রের পশ্চিমে পলায়ন-বার্তা বলিলেন। বিহারীর চক্ষে তৎক্ষণাৎ জলস্থল-আকাশের সমস্ত রং বদলাইয়া গেল, তাহার কল্পনা-ভাণ্ডারের সমস্ত সঞ্চিত রস মুহূর্তে তিক্ত হইয়া উঠিল।— “মায়াবিনী বিনোদিনী কি সেদিনকার সন্ধ্যাবেলায় আমাকে লইয়া খেলা করিয়া গেল। তাহার ভালো-

বাসার আত্মসমর্পণ সমস্তই ছলনা! সে তাহার গ্রাম ত্যাগ করিয়া নির্লজ্জভাবে মহেন্দ্রের সঙ্গে একাকিনী পশ্চিমে চলিয়া গেল! ধিক তাহাকে, এবং ধিক আমাকে যে আমি-মূঢ় তাহাকে এক মুহূর্তের জন্যও বিশ্বাস করিয়াছিলাম।"

হায় মেঘাচ্ছন্ন আষাঢ়ের সন্ধ্যা, হায় গতবৃষ্টি পূর্ণিমার রাত্রি, তোমাদের ইন্দ্রজাল কোথায় গেল।

৪৮

বিহারী ভাবিতেছিল, দুঃখিনী আশার মুখের দিকে সে চাহিবে কী করিয়া। দেউড়ির মধ্যে যখন সে প্রবেশ করিল, তখন নাথহীন সমস্ত বাড়িটার ঘনীভূত বিষাদ তাহাকে এক মুহূর্তে আবৃত করিয়া ফেলিল। বাড়ির দরোয়ান ও চাকরদের মুখের দিকে চাহিয়া উন্মত্ত নিরুদ্দেশ মহেন্দ্রের জন্য লজ্জায় বিহারীর মাথা নত করিয়া দিল। পরিচিত ভৃত্যদিগকে সে স্নিগ্ধভাবে পূর্বের মতো কুশল জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে তাহার পা যেন সরিতে চাহিল না। বিশ্বজনের সম্মুখে প্রকাশ্যভাবে মহেন্দ্র অসহায় আশাকে যে দারুণ অপমানের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া গেছে, যে-অপমানে স্ত্রীলোকের চরমতম আবরণটুকু হরণ করিয়া তাহাকে সমস্ত সংসারের সকৌতূহল কৃপাদৃষ্টিবর্ষণের মাঝখানে দাঁড় করাইয়া দেয়, সেই অপমানের অনাবৃত প্রকাশ্যতার মধ্যে বিহারী কুণ্ঠিত ব্যথিত আশাকে দেখিবে কোন্ প্রাণে।

কিন্তু এ-সকল চিন্তার ও সংকোচের আর অবসর রহিল না। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেই আশা দ্রুতপদে আসিয়া বিহারীকে কহিল, "ঠাকুরপো, একবার শীঘ্র আসিয়া মাকে দেখিয়া যাও, তিনি বড়ো কষ্ট পাইতেছেন।"

বিহারীর সঙ্গে আশার প্রকাশ্যভাবে এই প্রথম আলাপ। দুঃখের দুর্দিনে একটি-মাত্র সামান্য ঝটকায় সমস্ত ব্যবধান উড়াইয়া লইয়া যায়; যাহারা দূরে বাস করিতেছিল তাহাদিগকে হঠাৎ-বন্যায় একটিমাত্র সংকীর্ণ ডাঙার উপরে একত্র করিয়া দেয়।

আশার এই সংকোচহীন ব্যাকুলতায় বিহারী আঘাত পাইল। মহেন্দ্র তাহার সংসারটিকে যে কী করিয়া দিয়া গেছে, এই ক্ষুদ্র ঘটনা হইতেই তাহা সে যেন অধিক বুঝিতে পারিল। দুর্দিনের তাড়নায় গৃহের যেমন সজ্জা-সৌন্দর্য উপেক্ষিত, গৃহলক্ষ্মীরও তেমনি লজ্জার শ্রীটুকু রাখিবারও অবসর ঘুচিয়াছে— ছোটোখাটো আবরণ-অন্তরাল বাছবিচার সমস্ত খসিয়া পড়িয়া গেছে— তাহাতে আর ভ্রূক্ষেপ করিবার সময় নাই।

বিহারী রাজলক্ষ্মীর ঘরে প্রবেশ করিল। রাজলক্ষ্মী একটা আকস্মিক শ্বাসকষ্ট

অনুভব করিয়া বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিলেন— সেটা বেশিক্ষণ স্থায়ী না হওয়াতে পুনর্বার কতকটা সুস্থ হইয়া উঠিয়াছেন।

বিহারী প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি লইতেই রাজলক্ষ্মী তাহাকে পাশে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন, এবং ধীরে ধীরে কহিলেন, “কেমন আছিস বেহারি। কতদিন তোকে দেখি নাই।”

বিহারী কহিল, “মা, তোমার অসুখ, এ খবর আমাকে কেন জানাইলে না। তাহা হইলে কি আমি এক মুহূর্ত বিলম্ব করিতাম।”

রাজলক্ষ্মী মৃদুস্বরে কহিলেন, “সে কি আর আমি জানি না, বাছা। তোকে পেটে ধরি নাই বটে, কিন্তু জগতে তোর চেয়ে আমার আপনার আর কি কেহ আছে।” বলিতে বলিতে তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

বিহারী তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘরের কুলুঙ্গিতে ওষুধপত্রের শিশি-কৌটাগুলি পরীক্ষা করিবার ছলে আত্মসংবরণের চেষ্টা করিল। ফিরিয়া আসিয়া সে যখন রাজলক্ষ্মীর নাড়ি দেখিতে উদ্যত হইল, রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “আমার নাড়ির খবর থাক্— জিজ্ঞাসা করি, তুই এমন রোগা হইয়া গেছিস কেন, বেহারি।” বলিয়া রাজলক্ষ্মী তাঁহার কৃশ হস্ত তুলিয়া বিহারীর কণ্ঠায় হাত বুলাইয়া দেখিলেন।

বিহারী কহিল, “তোমার হাতের মাছের ঝোল না খাইলে আমার এ হাড় কিছুতেই ঢাকিবে না। তুমি শীঘ্র-শীঘ্র সারিয়া ওঠো মা, আমি ততক্ষণ রান্নার আয়োজন করিয়া রাখি।”

রাজলক্ষ্মী ম্লান হাসি হাসিয়া কহিলেন, “সকাল সকাল আয়োজন কর্ বাছা— কিন্তু রান্নার নয়।” বলিয়া বিহারীর হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, “বেহারি, তুই বউ ঘরে নিয়ে আয়, তোকে দেখিবার লোক কেহ নাই। ও মেজবউ, তোমরা এবার বেহারির একটি বিয়ে দিয়ে দাও— দেখো না, বাছার চেহারা কেমন হইয়া গেছে।”

অন্নপূর্ণা কহিলেন, “তুমি সারিয়া ওঠো, দিদি। এ তো তোমারই কাজ, তুমি সম্পন্ন করিবে, আমরা সকলে যোগ দিয়া আমোদ করিব।”

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “আমার আর সময় হইবে না, মেজবউ, বেহারির ভার তোমাদেরই উপর রহিল— উহাকে সুখী করিয়ো, আমি উহার ঋণ শুধিয়া যাইতে পারিলাম না— কিন্তু ভগবান উহার ভালো করিবেন।” বলিয়া বিহারীর মাথায় তাঁহার দক্ষিণ হস্ত বুলাইয়া দিলেন।

আশা আর ঘরে থাকিতে পারিল না— কাঁদিবার জন্য বাহিরে চলিয়া গেল। অন্নপূর্ণা অশ্রুজলের ভিতর দিয়া বিহারীর মুখের প্রতি স্নেহদৃষ্টিপাত করিলেন।

রাজলক্ষ্মীর হঠাৎ কী মনে পড়িল— তিনি ডাকিলেন, "বউমা, ও বউমা।"

আশা ঘরে প্রবেশ করিতেই কহিলেন, "বেহারির খাবারের সব ব্যবস্থা করিয়াছ তো।"

বিহারী কহিল, "মা, তোমার এই পেটুক ছেলেটিকে সকলেই চিনিয়া লইয়াছে। দেউড়িতে ঢুকিতেই দেখি, ডিমওয়ালা বড়ো বড়ো কইমাছ চুপড়িতে লইয়া বামি হনহন করিয়া অন্দরের দিকে ছুটিয়াছে— বুঝিলাম, এ-বাড়িতে এখনো আমার খ্যাতি লুপ্ত হয় নাই।" বলিয়া বিহারী হাসিয়া একবার আশার মুখের দিকে চাহিল।

আশা আজ আর লজ্জা পাইল না। সে স্নেহের সহিত স্মিতহাস্যে বিহারীর পরিহাস গ্রহণ করিল। বিহারী যে এ-সংসারের কতখানি, আশা তাহা আগে সম্পূর্ণ জানিত না;— অনেক সময় তাহাকে অনাবশ্যক আগন্তুক মনে করিয়া অবজ্ঞা করিয়াছে, অনেক সময় বিহারীর প্রতি বিমুখভাব তাহার আচরণে সুস্পষ্ট পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে; সেই অনুতাপের ধিক্‌কারে আজ বিহারীর প্রতি তাহার শ্রদ্ধা এবং করুণা সবেগে ধাবিত হইয়াছে।

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "মেজবউ, বামুনঠাকুরের কর্ম নয়, রান্নাটা তোমায় নিজে দেখাইয়া দিতে হইবে— আমাদের এই বাঙাল ছেলে একরাশ ঝাল নহিলে খাইতে পারে না।

বিহারী। তোমার মা ছিলেন বিক্রমপুরের মেয়ে, তুমি নদীয়া জেলার ভদ্রসন্তানকে বাঙাল বল? এ তো আমার সহ্য হয় না।

ইহা লইয়া অনেক পরিহাস হইল, এবং অনেক দিন পরে মহেন্দ্রের বাড়ির বিষাদভার যেন লঘু হইয়া আসিল।

কিন্তু এত কথাবার্তার মধ্যে কোনো পক্ষ হইতে কেহ মহেন্দ্রের নাম উচ্চারণ করিল না। পূর্বে বিহারীর সঙ্গে মহেন্দ্রের কথা লইয়াই রাজলক্ষ্মীর একমাত্র কথা ছিল। তাহা লইয়া মহেন্দ্র নিজে তাহার মাতাকে অনেকবার পরিহাস করিয়াছে। আজ সেই রাজলক্ষ্মীর মুখে মহেন্দ্রের নাম একবারও না শুনিয়া বিহারী মনে মনে স্তম্ভিত হইল।

রাজলক্ষ্মীর একটু নিদ্রাবেশ হইতেই বিহারী বাহিরে আসিয়া অন্নপূর্ণাকে কহিল, "মার ব্যামো তো সহজ নহে।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "সে তো স্পষ্টই দেখা যাইতেছে।" বলিয়া তাঁহার ঘরের জানালার কাছে বসিয়া পড়িলেন।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "একবার মহিনকে ডাকিয়া আনিবি না, বেহারি? আর তো দেরি করা উচিত হয় না।"

বিহারী কিছুক্ষণ নিরুত্তরে থাকিয়া কহিল, "তুমি যেমন আদেশ করিবে আমি তাহাই করিব। তাহার ঠিকানা কেহ কি জানে।"

অন্নপূর্ণা। ঠিক জানে না, খুঁজিয়া লইতে হইবে। বিহারী, আর-একটা কথা তোর কাছে বলি। আশার মুখের দিকে চাস। বিনোদিনীর হাত হইতে মহেন্দ্রকে যদি উদ্ধার করিতে না পারিস তবে সে আর বাঁচিবে না। তাহার মুখ দেখিলেই বুঝিতে পারিবি, তার বুকে মৃত্যুবাণ বাজিয়াছে।

বিহারী মনে মনে তীব্র হাসি হাসিয়া ভাবিল, "পরকে উদ্ধার আমি করিতে যাইব— ভগবান, আমার উদ্ধার কে করিবে।" কহিল, "বিনোদিনীর আকর্ষণ হইতে চিরকালের জন্য মহেন্দ্রকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিব, এমন মন্ত্র আমি কি জানি, কাকীমা? মার ব্যামোতে সে দু-দিন শান্ত হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু আবার সে যে ফিরিবে না, তাহা কেমন করিয়া বলিব।"

এমন সময় মলিনবসনা আশা মাথায় আধখানা ঘোমটা দিয়া ধীরে ধীরে তাহার মাসিমার পায়ের কাছে আসিয়া বসিল। সে জানিত রাজলক্ষ্মীর পীড়া সম্বন্ধে বিহারীর সঙ্গে অন্নপূর্ণার আলোচনা চলিতেছে, তাই ঔৎসুক্যের সহিত শুনিতে আসিল। পতিব্রতা আশার মুখে নিস্তব্ধ দুঃখের নীরব মহিমা দেখিয়া বিহারীর মনে এক অপূর্ব ভক্তির সঞ্চার হইল। শোকের তপ্ত তীর্থজলে অভিষিক্ত হইয়া এই তরুণী রমণী প্রাচীন যুগের দেবীদের ন্যায় একটি অচঞ্চল মর্যাদা লাভ করিয়াছে— সে এখন আর সামান্য নারী নহে, সে যেন দারুণ দুঃখে পুরাণবর্ণিতা সাধ্বীদের সমান বয়স প্রাপ্ত হইয়াছে।

বিহারী আশার সহিত রাজলক্ষ্মীর পথ্য ও ঔষধ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া যখন আশাকে বিদায় করিল, তখন একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অন্নপূর্ণাকে কহিল, "মহেন্দ্রকে আমি উদ্ধার করিব।"

বিহারী মহেন্দ্রের ব্যাঙ্কে গিয়া খবর পাইল যে, তাহাদের এলাহাবাদ-শাখার সহিত মহেন্দ্র অল্পদিন হইতে লেনাদেনা আরম্ভ করিয়াছে।

৪৭

স্টেশনে আসিয়া বিনোদিনী একেবারে ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাসে মেয়েদের গাড়িতে চড়িয়া বসিল। মহেন্দ্র কহিল, "ও কী কর, আমি তোমার জন্যে সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট কিনিতেছি।"

বিনোদিনী কহিল, "দরকার কী, এখানে আমি বেশ থাকিব।"

মহেন্দ্র আশ্চর্য হইল। বিনোদিনী স্বভাবতই শৌখিন ছিল। পূর্বে দারিদ্র্যের কোনো লক্ষণ তাহার কাছে প্রীতিকর ছিল না; নিজের সাংসারিক দৈন্য সে নিজের পক্ষে অপমানকর বলিয়াই মনে করিত। মহেন্দ্র এটুকু বুঝিয়াছিল যে, মহেন্দ্রের ঘরের অজস্র সচ্ছলতা, বিলাস-উপকরণ এবং সাধারণের কাছে ধনী বলিয়া তাহাদের গৌরব, এক কালে বিনোদিনীর মনকে আকর্ষণ করিয়াছিল। সে অনায়াসেই এই ধনসম্পদ, এই-সকল আরাম ও গৌরবের ঈশ্বরী হইতে পারিত, সেই কল্পনায় তাহার মনকে একান্ত উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিল। আজ যখন মহেন্দ্রের উপর প্রভুত্বলাভ করিবার সময় হইল, না চাহিয়াও সে যখন মহেন্দ্রের সমস্ত ধনসম্পদ নিজের ভোগে আনিতে পারে, তখন কেন সে এমন অসহ্য উপেক্ষার সহিত একান্ত উদ্ধতভাবে কষ্টকর লজ্জাকর দীনতা স্বীকার করিয়া লইতেছে। মহেন্দ্রের প্রতি নিজের নির্ভরকে সে যথাসম্ভব সংকুচিত করিয়া রাখিতে চায়। যে উন্মত্ত মহেন্দ্র বিনোদিনীকে তাহার স্বাভাবিক আশ্রয় হইতে চিরজীবনের জন্য চ্যুত করিয়াছে, সেই মহেন্দ্রের হাত হইতে সে এমন কিছুই চাহে না, যাহা তাহার এই সর্বনাশের মূল্যস্বরূপ গণ্য হইতে পারে। মহেন্দ্রের ঘরে যখন বিনোদিনী ছিল, তখন তাহার আচরণে বৈধব্যব্রতের কাঠিন্য বড়ো একটা ছিল না, কিন্তু এতদিন পরে সে আপনাকে সর্বপ্রকার ভোগ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। এখন সে একবেলা খায়, মোটা কাপড় পরে, তাহার সেই অনর্গল-উৎসারিত হাস্যপরিহাসই বা গেল কোথায়। এখন সে এমন স্তব্ধ, এমন আবৃত, এমন সুদূর, এমন ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে যে, মহেন্দ্র তাহাকে সামান্য একটা কথাও জোর করিয়া বলিতে সাহস পায় না। মহেন্দ্র আশ্চর্য হইয়া, অধীর হইয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া কেবলই ভাবিতে লাগিল, “বিনোদিনী আমাকে এত চেষ্টায় দুর্লভ ফলের মতো এত উচ্চশাখা হইতে পাড়িয়া লইল, তাহার পরে ঘ্রাণমাত্র না করিয়া আজ মাটিতে ফেলিয়া দিতেছে কেন।”

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, “কোথাকার টিকিট করিব বলো।”

বিনোদিনী কহিল, “পশ্চিম দিকে যেখানে খুশি চলো— কাল সকালে যেখানে গাড়ি থামিবে, নামিয়া পড়িব।”

এমনতরো ভ্রমণ মহেন্দ্রের কাছে লোভনীয় নহে। আরামের ব্যাঘাত তাহার পক্ষে কষ্টকর। বড়ো শহরে গিয়া ভালোরূপ আশ্রয় না পাইলে মহেন্দ্রের বড়ো মুশকিল। সে খুঁজিয়া-পাতিয়া করিয়া-কর্মিয়া লইবার লোক নহে। তাই অত্যন্ত ক্ষুব্ধ-বিরক্ত মনে মহেন্দ্র গাড়িতে উঠিল। এদিকে মনে কেবলই ভয় হইতে লাগিল, পাছে বিনোদিনী তাহাকে না জানাইয়াই কোথাও নামিয়া পড়ে।

বিনোদিনী এইরূপ শনিগ্রহের মতো ঘুরিতে এবং মহেন্দ্রকে ঘুরাইতে লাগিল— কোথাও তাহাকে বিশ্রাম দিল না। বিনোদিনী অতি শীঘ্রই লোককে আপন করিয়া লইতে পারে; অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সে গাড়ির সহযাত্রিণীদের সহিত বন্ধুত্বস্থাপন করিয়া লইত। যেখানে যাইবার ইচ্ছা, সেখানকার সমস্ত খবর লইত— যাত্রিশালায় আশ্রয় লইত এবং যেখানে যাহা-কিছু দেখিবার আছে, ঘুরিয়া-ঘুরিয়া বন্ধুসহায়ে দেখিয়া লইত। মহেন্দ্র বিনোদিনীর কাছে নিজের অনাবশ্যকতায় প্রতিদিন আপনাকে হতমান বোধ করিতে লাগিল। টিকিট কিনিয়া দেওয়া ছাড়া তাহার কোনো কাজ ছিল না, বাকি সময়টা তাহার প্রবৃত্তি তাহাকে ও সে আপন প্রবৃত্তিকে দংশন করিতে থাকিত। প্রথম প্রথম কিছুদিন সে বিনোদিনীর সঙ্গে সঙ্গে পথে পথে ফিরিয়াছিল— কিন্তু ক্রমে তাহা অসহ্য হইয়া উঠিল; তখন মহেন্দ্র আহারাদি করিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিত, বিনোদিনী সমস্ত দিন ঘুরিয়া বেড়াইত। মাতৃস্নেহলালিত মহেন্দ্র যে এমন করিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িতে পারে, তাহা কেহ কল্পনাও করিতে পারিত না।

একদিন এলাহাবাদ স্টেশনে দুই জনে গাড়ির জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। কোনো আকস্মিক কারণে ট্রেন আসিতে বিলম্ব হইতেছে। ইতিমধ্যে অন্যান্য গাড়ি যত আসিতেছে ও যাইতেছে, বিনোদিনী তাহার যাত্রীদের ভালো করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছে। পশ্চিমে ঘুরিতে ঘুরিতে চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে সে হঠাৎ কাহারও দেখা পাইবে, এই বোধ করি তাহার আশা। অন্তত, রুদ্ধ গলির মধ্যে জনহীন গৃহে নিশ্চল উদ্যমে নিজেকে প্রত্যহ চাপিয়া মারার চেয়ে এই নিত্যসন্ধানপরতার মধ্যে, এই উন্মুক্ত পথের জনকোলাহলের মধ্যে শান্তি আছে।

হঠাৎ এক সময়ে স্টেশনে একটি কাচের বাক্সের উপর বিনোদিনীর দৃষ্টি পড়িতেই সে চমকিয়া উঠিল। এই পোস্ট আপিসের বাক্সের মধ্যে, যে-সকল লোকের উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই তাহাদের পত্র প্রদর্শিত হইয়া থাকে। সেই বাক্সে সজ্জিত একখানি পত্রের উপরে বিনোদিনী বিহারীর নাম দেখিতে পাইল। বিহারীলাল নামটি অসাধারণ নহে— পত্রের বিহারীই যে বিনোদিনীর অভীষ্ট বিহারী, এ-কথা মনে করিবার কোনো হেতু ছিল না— তবু বিহারীর পুরা নাম দেখিয়া সেই একটিমাত্র বিহারী ছাড়া আর-কোনো বিহারীর কথা তাহার মনে সন্দেহ হইল না। পত্রে লিখিত ঠিকানাটি সে মুখস্থ করিয়া লইল। অত্যন্ত অপ্রসন্নমুখে মহেন্দ্র একটা বেঞ্চের উপর বসিয়া ছিল, বিনোদিনী সেখানে আসিয়া কহিল, "কিছুদিন এলাহাবাদেই থাকিব।"

বিনোদিনী নিজের ইচ্ছামতো মহেন্দ্রকে চালাইতেছে, অথচ তাহার ক্ষুধিত অতৃপ্ত হৃদয়কে খোরাকমাত্র দিতেছে না, ইহাতে মহেন্দ্রের পৌরুষাভিমান প্রতিদিন আহত হইয়া তাহার হৃদয় বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছিল। এলাহাবাদে কিছুদিন থাকিয়া জিরাইতে পাইলে সে বাঁচিয়া যায়— কিন্তু ইচ্ছার অনুকূল হইলেও বিনোদিনীর খেয়ালমাত্রে সম্মতি দিতে তাহার মন হঠাৎ বাঁকিয়া দাঁড়াইল। সে রাগ করিয়া কহিল, "যখন বাহির হইয়াছি, তখন যাইবই। ফিরিতে পারিব না।"

বিনোদিনী কহিল, "আমি যাইব না।"

মহেন্দ্র কহিল, "তবে তুমি একলা থাকো, আমি চলিলাম।"

বিনোদিনী কহিল, "সেই ভালো।" বলিয়া দ্বিরুক্তিমাত্র না করিয়া ইঙ্গিতে মুটে ডাকিয়া স্টেশন ছাড়িয়া চলিল।

মহেন্দ্র পুরুষের কর্তৃত্ব-অধিকার লইয়া অন্ধকার মুখে বেঞ্চে বসিয়া রহিল। যতক্ষণ বিনোদিনীকে দেখা গেল, ততক্ষণ সে স্থির হইয়া থাকিল। যখন বিনোদিনী একবারও পশ্চাতে না ফিরিয়া বাহির হইয়া গেল, তখন সে তাড়াতাড়ি মুটের মাথায় বাক্স-বিছানা চাপাইয়া তাহার অনুসরণ করিল। বাহিরে আসিয়া দেখিল, বিনোদিনী একখানি গাড়ি অধিকার করিয়া বসিয়াছে। মহেন্দ্র কোনো কথা না বলিয়া গাড়ির মাথায় মাল চাপাইয়া কোচবাক্সে চড়িয়া বসিল। নিজের অহংকার খর্ব করিয়া গাড়ির ভিতরে বিনোদিনীর সম্মুখে বসিতে তাহার আর মুখ রহিল না।

কিন্তু গাড়ি তো চলিয়াছেই। এক ঘণ্টা হইয়া গেল, ক্রমে শহরের বাড়ি ছাড়াইয়া চষা মাঠে আসিয়া পড়িল। গাড়োয়ানকে প্রশ্ন করিতে মহেন্দ্রের লজ্জা করিতে লাগিল, কারণ, পাছে গাড়োয়ান মনে করে ভিতরকার স্ত্রীলোকটিই কর্তৃপক্ষ, কোথায় যাইতে হইবে তাও সে এই অনাবশ্যক পুরুষটার সঙ্গে পরামর্শও করে নাই। মহেন্দ্র রুষ্ট অভিমান মনে মনে পরিপাক করিয়া স্তব্ধভাবে কোচবাক্সে বসিয়া রহিল।

গাড়ি নির্জনে যমুনার ধারে একটি সযত্নরক্ষিত বাগানের মধ্যে আসিয়া থামিল। মহেন্দ্র আশ্চর্য হইয়া গেল। এ কাহার বাগান, এ-বাগানের ঠিকানা বিনোদিনী কেমন করিয়া জানিল।

বাড়ি বন্ধ ছিল। হাঁকাহাঁকি করিতে বৃদ্ধ রক্ষক বাহির হইয়া আসিল। সে কহিল, "বাড়িওয়ালা ধনী, অধিক দূরে থাকেন না— তাঁহার অনুমতি লইয়া আসিলেই এ-বাড়িতে বাস করিতে দিতে পারি।"

বিনোদিনী মহেন্দ্রের মুখের দিকে একবার চাহিল। মহেন্দ্র এই মনোরম বাড়িটি দেখিয়া লুব্ধ হইয়াছিল— দীর্ঘকাল পরে কিছুদিন স্থিতির সম্ভাবনায় সে প্রফুল্ল হইল, বিনোদিনীকে কহিল, "তবে চলো সেই ধনীর ওখানে যাই, তুমি বাহিরে গাড়িতে অপেক্ষা করিবে, আমি ভিতরে গিয়া ভাড়া ঠিক করিয়া আসিব।"

বিনোদিনী কহিল, "আমি আর ঘুরিতে পারিব না— তুমি যাও আমি ততক্ষণ এখানে বিশ্রাম করি। ভয়ের কোনো কারণ দেখি না।"

মহেন্দ্র গাড়ি লইয়া চলিয়া গেল। বিনোদিনী বুড়া ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া তাহার ছেলেপুলের কথা জিজ্ঞাসা করিল— তাহারা কে, কোথায় চাকরি করে, তাহার মেয়েদের কোথায় বিবাহ হইয়াছে। তাহার স্ত্রীর মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া করুণস্বরে কহিল, "আহা, তোমার তো বড়ো কষ্ট। এই বয়সে তুমি সংসারে একলা পড়িয়া গেছ। তোমাকে দেখিবার কেহ নাই!"

তাহার পরে কথায় কথায় বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করিল, "বিহারীবাবু এখানে ছিলেন না?"

বৃদ্ধ কহিল, "হাঁ, কিছুদিন ছিলেন তো বটে। মাজি কি তাঁহাকে চেনেন।"

বিনোদিনী কহিল, "তিনি আমাদের আত্মীয় হন।"

বিনোদিনী বৃদ্ধের কাছে বিহারীর বিবরণ ও বর্ণনা যাহা পাইল, তাহাতে আর মনে কোনো সন্দেহ রহিল না। বুড়াকে দিয়া ঘর খুলাইয়া কোন্ ঘরে বিহারী শুইত, কোন্ ঘর তাহার বসিবার ছিল, তাহা সমস্ত জানিয়া লইল। তাহার যাওয়ার পর হইতে ঘরগুলি যে বন্ধ ছিল, তাহাতে মনে হইল, যেন সেখানে অদৃশ্য বিহারীর সঞ্চার সমস্ত ঘর ভরিয়া জমা হইয়া আছে, হাওয়ায় যেন তাহা উড়াইয়া লইয়া যাইতে পারে নাই। বিনোদিনী তাহা ঘ্রাণের মধ্যে হৃদয় পূর্ণ করিয়া গ্রহণ করিল, শুদ্ধ বাতাসে সর্বাঙ্গে স্পর্শ করিল; কিন্তু বিহারী যে কোথায় গেছে, সে-সন্ধান পাওয়া গেল না। হয়তো সে ফিরিতেও পারে— স্পষ্ট কিছুই জানা নাই। বৃদ্ধ তাহার প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিয়া বলিবে, বিনোদিনীকে এরূপ আশ্বাস দিল।

আগাম ভাড়া দিয়া বাসের অনুমতি লইয়া মহেন্দ্র ফিরিয়া আসিল।

৫০

হিমালয়শিখর যে যমুনাকে তুষারদ্রুত অক্ষয় জলধারা দিতেছে, কতকালের কবিরা মিলিয়া সেই যমুনার মধ্যে যে-কবিত্বস্রোত ঢালিয়াছেন, তাহাও অক্ষয়।

ইহার কলধ্বনির মধ্যে কত বিচিত্র ছন্দ ধ্বনিত এবং ইহার তরঙ্গলীলায় কতকালের পুলকোচ্ছ্বসিত ভাবাবেগ উদ্‌বেলিত হইয়া উঠিতেছে।

প্রদোষে সেই যমুনাতীরে মহেন্দ্র আসিয়া যখন বসিল, তখন ঘনীভূত প্রেমের আবেশ তাহার দৃষ্টিতে, তাহার নিশ্বাসে, তাহার শিরায়, তাহার অস্থিগুলির মধ্যে প্রগাঢ় মোহরসপ্রবাহ সঞ্চার করিয়া দিল। আকাশে সূর্যাস্তকিরণের স্বর্ণবীণা বেদনার মূর্ছনায় অলোকশ্রুত সংগীতে ঝংকৃত হইয়া উঠিল।

বিস্তীর্ণ নির্জন বালুতটে বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় দিন ধীরে ধীরে অবসান হইয়া গেল। মহেন্দ্র চক্ষু অর্ধেক মুদ্রিত করিয়া কাব্যলোক হইতে গোখুর-ধূলিজালের মধ্যে বৃন্দাবনের ধেনুদের গোষ্ঠে প্রত্যাবর্তনের হাম্বারব শুনিতে পাইল।

বর্ষার মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। অপরিচিত স্থানের অন্ধকার কেবল কৃষ্ণবর্ণের আবরণ মাত্র নহে, তাহা বিচিত্র রহস্যে পরিপূর্ণ। তাহার মধ্য দিয়া যেটুকু আভা যেটুকু আকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অজ্ঞাত অনুচ্চারিত ভাষায় কথা কহে। পরপারবর্তী বালুকার অস্ফুট পাণ্ডুরতা, নিস্তরঙ্গ জলের মসীকৃষ্ণ কালিমা, বাগানে ঘনপল্লব বিপুল নিম্ববৃক্ষের পুঞ্জীভূত স্তব্ধতা, তরুহীন ম্লান ধূসর তটের বঙ্কিম রেখা, সমস্ত সেই আষাঢ়-সন্ধ্যার অন্ধকারে বিবিধ অনির্দিষ্ট অপরিস্ফুট আকারে মিলিত হইয়া মহেন্দ্রকে চারিদিকে বেষ্টন করিয়া ধরিল।

পদাবলীর বর্ষাভিসার মহেন্দ্রের মনে পড়িল। অভিসারিকা বাহির হইয়াছে। যমুনার ওই তটপ্রান্তে সে একাকিনী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। পার হইবে কেমন করিয়া। "ওগো, পার করো গো, পার করো"— মহেন্দ্রের বুকের মধ্যে এই ডাক আসিয়া পৌছিতেছে—"ওগো, পার করো।"

নদীর পরপারে অন্ধকারে সেই অভিসারিণী বহুদূরে— তবু মহেন্দ্র তাহাকে স্পষ্ট দেখিতে পাইল। তাহার কাল নাই, তাহার বয়স নাই, সে চিরন্তন গোপবালা— কিন্তু তবু মহেন্দ্র তাহাকে চিনিল— সে এই বিনোদিনী। সমস্ত বিরহ, সমস্ত বেদনা, সমস্ত যৌবনভার লইয়া তখনকার কাল হইতে সে অভিসারে যাত্রা করিয়া, কত গান কত ছন্দের মধ্য দিয়া এখনকার কালের তীরে আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে— আজিকার এই জনহীন যমুনাতটের উপরকার আকাশে তাহারই কণ্ঠস্বর শুনা যাইতেছে —"ওগো, পার করো গো"— খেয়া-নৌকার জন্য সে এই অন্ধকারে আর কতকাল এমন একলা দাঁড়াইয়া থাকিবে—"ওগো, পার করো।"

মেঘের এক প্রান্ত অপসারিত হইয়া কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়ার চাঁদ দেখা দিল। জ্যোৎস্নার মায়ামন্ত্রে সেই নদী ও নদীতীর, সেই আকাশ ও আকাশের সীমান্ত,

পৃথিবীর অনেক বাহিরে চলিয়া গেল। মর্ত্যের কোনো বন্ধন রহিল না। কালের সমস্ত ধারাবাহিকতা ছিঁড়িয়া গেল— অতীতকালের সমস্ত ইতিহাস লুপ্ত, ভবিষ্যৎ কালের সমস্ত ফলাফল অন্তর্হিত— শুধু এই রজতধারা-প্লাবিত বর্তমানটুকু যমুনা ও যমুনাতটের মধ্যে মহেন্দ্র ও বিনোদিনীকে লইয়া বিশ্ববিধানের বাহিরে চিরস্থায়ী।

মহেন্দ্র মাতাল হইয়া উঠিল। বিনোদিনী যে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবে, জ্যোৎস্নারাত্রির এই নির্জন স্বর্গখণ্ডকে লক্ষ্মীরূপে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিবে না, ইহা সে কল্পনা করিতে পারিল না। তৎক্ষণাৎ উঠিয়া সে বিনোদিনীকে খুঁজিতে বাড়ির দিকে চলিয়া গেল।

শয়নগৃহে আসিয়া দেখিল, ঘর ফুলের গন্ধে পূর্ণ। উন্মুক্ত জানালা-দরজা দিয়া জ্যোৎস্নার আলো শুভ্র বিছানার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। বিনোদিনী বাগান হইতে ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিয়া খোঁপায় পরিয়াছে, গলায় পরিয়াছে, কটিতে বাঁধিয়াছে— ফুলে ভূষিত হইয়া সে বসন্তকালের পুষ্পভারলুণ্ঠিত লতাটির ন্যায় জ্যোৎস্নায় বিছানার উপরে পড়িয়া আছে।

মহেন্দ্রের মোহ দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। সে অবরুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "বিনোদ, আমি যমুনার ধারে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া ছিলাম, তুমি যে এখানে অপেক্ষা করিয়া আছ, আকাশের চাঁদ আমাকে সেই সংবাদ দিল, তাই আমি চলিয়া আসিলাম।"

এই কথা বলিয়া মহেন্দ্র বিছানায় বসিবার জন্য অগ্রসর হইল।

বিনোদিনী তাড়াতাড়ি চকিত হইয়া উঠিয়া দক্ষিণবাহু প্রসারিত করিয়া কহিল, "যাও যাও, তুমি এ-বিছানায় বসিয়ো না।"

ভরাপালের নৌকা চড়ায় ঠেকিয়া গেল— মহেন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। অনেক ক্ষণ তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। পাছে মহেন্দ্র নিষেধ না মানে, এইজন্য বিনোদিনী শয্যা ছাড়িয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

মহেন্দ্র কহিল, "তবে তুমি কাহার জন্য সাজিয়াছ। কাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছ।"

বিনোদিনী আপনার বুক চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "যাহার জন্য সাজিয়াছি, সে আমার অন্তরের ভিতরে আছে।"

মহেন্দ্র কহিল, "সে কে। সে বিহারী?"

বিনোদিনী কহিল, "তাহার নাম তুমি মুখে উচ্চারণ করিয়ো না।"

মহেন্দ্র। তাহারই জন্য তুমি পশ্চিমে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ?

বিনোদিনী। তাহারই জন্য।

মহেন্দ্র। তাহারই জন্য তুমি এখানে অপেক্ষা করিয়া আছ?

বিনোদিনী। তাহারই জন্য।

মহেন্দ্র। তাহার ঠিকানা জানিয়াছ?

বিনোদিনী। জানি না, কিন্তু যেমন করিয়া হউক, জানিবই।

মহেন্দ্র। কোনোমতেই জানিতে দিব না।

বিনোদিনী। না যদি জানিতে দাও, আমার হৃদয় হইতে তাহাকে কোনোমতেই বাহির করিতে পারিবে না।

এই বলিয়া বিনোদিনী চোখ বুজিয়া আপনার হৃদয়ের মধ্যে বিহারীকে একবার অনুভব করিয়া লইল।

মহেন্দ্র সেই পুষ্পাভরণা বিরহবিধুরমূর্তি বিনোদিনীর দ্বারা একই কালে প্রবলবেগে আকৃষ্ট ও প্রত্যাখ্যাত হইয়া হঠাৎ ভীষণ হইয়া উঠিল— মুষ্টি বদ্ধ করিয়া কহিল, “ছুরি দিয়া কাটিয়া তোমার বুকের ভিতর হইতে তাহাকে বাহির করিব।”

বিনোদিনী অবিচলিতমুখে কহিল, “তোমার ভালোবাসার চেয়ে তোমার ছুরি আমার হৃদয়ে সহজে প্রবেশ করিবে।”

মহেন্দ্র। তুমি আমাকে ভয় কর না কেন, এখানে তোমার রক্ষক কে আছে।

বিনোদিনী। তুমি আমার রক্ষক আছ। তোমার নিজের কাছ হইতে তুমি আমাকে রক্ষা করিবে।

মহেন্দ্র। এইটুকু শ্রদ্ধা, এইটুকু বিশ্বাস, এখনো বাকি আছে!

বিনোদিনী। তা না হইলে আমি আত্মহত্যা করিয়া মরিতাম, তোমার সঙ্গে বাহির হইতাম না।

মহেন্দ্র। কেন মরিলে না— ওইটুকু বিশ্বাসের ফাঁসি আমার গলায় জড়াইয়া আমাকে দেশদেশান্তরে টানিয়া মারিতেছ কেন। তুমি মরিলে কত মঙ্গল হইত ভাবিয়া দেখো।

বিনোদিনী। তাহা জানি, কিন্তু যতদিন বিহারীর আশা আছে, ততদিন আমি মরিতে পারিব না।

মহেন্দ্র। যতদিন তুমি না মরিবে, ততদিন আমার প্রত্যাশাও মরিবে না— আমিও নিষ্কৃতি পাইব না। আমি আজ হইতে ভগবানের কাছে সর্বান্তঃকরণে তোমার মৃত্যু কামনা করি। তুমি আমারও হইয়ো না, তুমি বিহারীরও হইয়ো না। তুমি যাও। আমাকে ছুটি দাও। আমার মা কাঁদিতেছেন, আমার স্ত্রী কাঁদিতেছে— তাঁহাদের অশ্রু আমাকে দূর হইতে দগ্ধ করিতেছে। তুমি না মরিলে, তুমি আমার

এবং পৃথিবীর সকলের আশার অতীত না হইলে, আমি তাঁহাদের চোখের জল মুছাইবার অবসর পাইব না।

এই বলিয়া মহেন্দ্র ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। বিনোদিনী একলা পড়িয়া আপনার চারিদিকে যে মোহজাল রচনা করিতেছিল, তাহা সমস্ত ছিঁড়িয়া দিয়া গেল। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া বিনোদিনী বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল— আকাশভরা জ্যোৎস্না শূন্য করিয়া দিয়া তাহার সমস্ত সুধারস কোথায় উবিয়া গেছে। সেই কেয়ারি-করা বাগান, তাহার পরে বালুকাতীর, তাহার পরে নদীর কালো জল, তাহার পরে ওপারের অস্ফুটতা— সমস্তই যেন একখানা বড়ো সাদা কাগজের উপরে পেনসিলে-আঁকা একটি চিত্র মাত্র— সমস্তই নীরস এবং নিরর্থক।

মহেন্দ্রকে বিনোদিনী কিরূপ প্রবলবেগে আকর্ষণ করিয়াছে, প্রচণ্ড ঝড়ের মতো কিরূপ সমস্ত শিকড়-সুদ্ধ তাহাকে উৎপাটিত করিয়াছে, আজ তাহা অনুভব করিয়া তাহার হৃদয় আরো যেন অশান্ত হইয়া উঠিল। তাহার তো এই সমস্ত শক্তিই রহিয়াছে, তবে কেন বিহারী পূর্ণিমার রাত্রির উদ্‌বেলিত সমুদ্রের ন্যায় তাহার সম্মুখে আসিয়া ভাঙিয়া পড়ে না। কেন একটা অনাবশ্যক ভালোবাসার প্রবল অভিঘাত প্রত্যহ তাহার ধ্যানের মধ্যে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িতেছে। আর-একটা আগন্তুক রোদন বারংবার আসিয়া তাহার অন্তরের রোদনকে কেন পরিপূর্ণ অবকাশ দিতেছে না। এই যে একটা প্রকাণ্ড আন্দোলনকে সে জাগাইয়া তুলিয়াছে, ইহাকে লইয়া সমস্ত জীবন সে কী করিবে। এখন ইহাকে শান্ত করিবে কী উপায়ে।

আজ যে-সমস্ত ফুলের মালায় সে নিজেকে ভূষিত করিয়াছিল, তাহার উপরে মহেন্দ্রের মুগ্ধ দৃষ্টি পড়িয়াছিল জানিয়া সমস্ত টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। তাহার সমস্ত শক্তি বৃথা, চেষ্টা বৃথা, জীবন বৃথা— এই কানন, এই জ্যোৎস্না, এই যমুনাতট, এই অপূর্বসুন্দর পৃথিবী, সমস্তই বৃথা।

এত ব্যর্থতা, তবু যে যেখানে সে সেখানেই দাঁড়াইয়া আছে— জগতে কিছুরই লেশমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই। তবু কাল সূর্য উঠিবে এবং সংসার তাহার ক্ষুদ্রতম কাজটুকু পর্যন্ত ভুলিবে না— এবং অবিচলিত বিহারী যেমন দূরে ছিল, তেমনি দূরে থাকিয়া ব্রাহ্মণ-বালককে তাহার বোধোদয়ের নূতন পাঠ অভ্যাস করাইবে।

বিনোদিনীর চক্ষু ফাটিয়া অশ্রু বাহির হইয়া পড়িল। সে তাহার সমস্ত বল ও আকাঙ্ক্ষা লইয়া কোন্ পাথরকে ঠেলিতেছে। তাহার হৃদয় রক্তে ভাসিয়া গেল, কিন্তু তাহার অদৃষ্ট সূচ্যগ্রপরিমাণ সরিয়া বসিল না।

৫১

সমস্ত রাত্রি মহেন্দ্র ঘুমায় নাই— ক্লান্তশরীরে ভোরের দিকে তাহার ঘুম আসিল। বেলা আটটা-নয়টার সময় জাগিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। গতরাত্রির একটা কোনো অসমাপ্ত বেদনা ঘুমের ভিতরে ভিতরে যেন প্রবাহিত হইতেছিল। সচেতন হইবামাত্র মহেন্দ্র তাহার ব্যথা অনুভব করিতে আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণ পরেই রাত্রির সমস্ত ঘটনাটা মনে স্পষ্ট জাগিয়া উঠিল। সকালবেলাকার সেই রৌদ্রে, অতৃপ্ত নিদ্রার ক্লান্তিতে সমস্ত জগৎটা এবং জীবনটা অত্যন্ত বিরস বোধ হইল। সংসারত্যাগের গ্লানি, ধর্মত্যাগের গভীর পরিতাপ এবং এই উদ্‌ভ্রান্ত জীবনের সমস্ত অশান্তিভার মহেন্দ্র কিসের জন্য বহন করিতেছে। এই মোহাবেশশূন্য প্রভাতরৌদ্রে মহেন্দ্রের মনে হইল, সে বিনোদিনীকে ভালোবাসে না। রাস্তার দিকে সে চাহিয়া দেখিল, সমস্ত জাগ্রত পৃথিবী ব্যস্ত হইয়া কাজে ছুটিয়াছে। সমস্ত আত্মগৌরব পঙ্কের মধ্যে বিসর্জন দিয়া একটি বিমুখ স্ত্রীলোকের পদপ্রান্তে অকর্মণ্য জীবনকে প্রতিদিন আবদ্ধ করিয়া রাখিবার যে মূঢ়তা, তাহা মহেন্দ্রের কাছে সুস্পষ্ট হইল। একটা প্রবল আবেগের উচ্ছ্বাসের পর হৃদয়ে অবসাদ উপস্থিত হয়— ক্লান্ত হৃদয় তখন আপন অনুভূতির বিষয়কে কিছুকালের জন্য দূরে ঠেলিয়া রাখিতে চায়। সেই ভাবের ভাঁটার সময় তলের সমস্ত প্রচ্ছন্ন পঙ্ক বাহির হইয়া পড়ে— যাহা মোহ আনিয়াছিল তাহাতে বিতৃষ্ণা জন্মে। মহেন্দ্র যে কিসের জন্য নিজেকে এমন করিয়া অপমানিত করিতেছে, তাহা সে আজ বুঝিতে পারিল না। সে বলিল, "আমি সর্বাংশেই বিনোদিনীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তবু আজ আমি সর্বপ্রকার হীনতা ও লাঞ্ছনা স্বীকার করিয়া ঘৃণিত ভিক্ষুকের মতো তাহার পশ্চাতে অহোরাত্র ছুটিয়া বেড়াইতেছি, এমনতরো অদ্ভুত পাগলামি কোন্ শয়তান আমার মাথার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছে।" বিনোদিনী মহেন্দ্রের কাছে আজ একটি স্ত্রীলোকমাত্র, আর কিছুই নহে— তাহার চারিদিকে সমস্ত পৃথিবীর সৌন্দর্য হইতে, সমস্ত কাব্য হইতে কাহিনী হইতে যে একটি লাবণ্যজ্যোতি আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা আজ মায়ামরীচিকার মতো অন্তর্ধান করিতেই একটি সামান্য নারীমাত্র অবশিষ্ট রহিল— তাহার কোনো অপূর্বত্ব রহিল না।

তখন এই ধিক্কৃত মোহচক্র হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া বাড়ি ফিরিয়া যাইবার জন্য মহেন্দ্র ব্যগ্র হইল। যে শান্তি, প্রেম এবং স্নেহ তাহার ছিল, তাহাই তাহার কাছে দুর্লভতম অমৃত বলিয়া বোধ হইল। বিহারীর আশৈশব অটলনির্ভর বন্ধুত্ব তাহার কাছে মহামূল্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। মহেন্দ্র মনে মনে কহিল, "যাহা যথার্থ গভীর এবং স্থায়ী, তাহার মধ্যে বিনা চেষ্টায়, বিনা বাধায় আপনাকে সম্পূর্ণ

নিমগ্ন করিয়া রাখা যায় বলিয়া তাহার গৌরব আমরা বুঝিতে পারি না— যাহা চঞ্চল ছলনামাত্র, যাহার পরিতৃপ্তিতেও লেশমাত্র সুখ নাই, তাহা আমাদিগকে পশ্চাতে উর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়দৌড় করাইয়া বেড়ায় বলিয়াই তাহাকে চরম কামনার ধন মনে করি।”

মহেন্দ্র কহিল, “আজই বাড়ি ফিরিয়া যাইব— বিনোদিনী যেখানেই থাকিতে চাহে, সেইখানেই তাহাকে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আমি মুক্ত হইব।” “আমি মুক্ত হইব” এই কথা দৃঢ়স্বরে উচ্চারণ করিতেই তাহার মনে একটি আনন্দের আবির্ভাব হইল— এতদিন যে অবিশ্রাম দ্বিধার ভার সে বহন করিয়া আসিতেছিল, তাহা হালকা হইয়া আসিল। এতদিন, এই মুহূর্তে যাহা তাহার পরম অপ্রীতিকর ঠেকিতেছিল, পরমুহূর্তেই তাহা পালন করিতে বাধ্য হইতেছিল— জোর করিয়া “না” কি “হাঁ” সে বলিতে পারিতেছিল না— তাহার অন্তঃকরণের মধ্যে যে-আদেশ উত্থিত হইতেছিল, বরাবর জোর করিয়া তাহার মুখচাপা দিয়া সে অন্যপথে চলিতেছিল— এখন সে যেমনি সবেগে বলিল, “আমি মুক্তিলাভ করিব”, অমনি তাহার দোলা-পীড়িত হৃদয় আশ্রয় পাইয়া তাহাকে অভিনন্দন করিল।

মহেন্দ্র তখনই শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া মুখ ধুইয়া বিনোদিনীর সহিত দেখা করিতে গেল। গিয়া দেখিল, তাহার দ্বার বন্ধ। দ্বারে আঘাত দিয়া কহিল, “ঘুমাইতেছ কি।”

বিনোদিনী কহিল, “না। তুমি এখন যাও।”

মহেন্দ্র কহিল, “তোমার সঙ্গে বিশেষ কথা আছে— আমি বেশিক্ষণ থাকিব না।”

বিনোদিনী কহিল, “কথা আর আমি শুনিতে পারি না— তুমি যাও, আমাকে আর বিরক্ত করিয়ো না, আমাকে একলা থাকিতে দাও।”

অন্য কোনো সময় হইলে এই প্রত্যাখ্যানে মহেন্দ্রের আবেগ আরো বাড়িয়া উঠিত। কিন্তু আজ তাহার অত্যন্ত ঘৃণাবোধ হইল। সে ভাবিল, “এই সামান্য এক স্ত্রীলোকের কাছে আমি নিজেকে এতই হীন করিয়াছি যে, আমাকে যখন-তখন এমনতরো অবজ্ঞাভরে দূর করিয়া দিবার অধিকার ইহার জন্মিয়াছে। সে অধিকার ইহার স্বাভাবিক অধিকার নহে। আমিই তাহা ইহাকে দিয়া ইহার গর্ব এমন অন্যায়রূপে বাড়াইয়া দিয়াছি।” এই লাঞ্ছনার পরে মহেন্দ্র নিজের মধ্যে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করিবার চেষ্টা করিল। সে কহিল “আমি জয়ী হইব— ইহার বন্ধন আমি ছেদন করিয়া দিয়া চলিয়া যাইব।”

আহারান্তে মহেন্দ্র টাকা উঠাইয়া আনিবার জন্য ব্যাঙ্কে চলিয়া গেল। টাকা

উঠাইয়া আশার জন্য ও মার জন্য কিছু ভালো নতুন জিনিস কিনিবে বলিয়া সে এলাহাবাদের দোকানে ঘুরিতে লাগিল।

আবার একবার বিনোদিনীর দ্বারে আঘাত পড়িল। প্রথমে সে বিরক্ত হইয়া কোনো উত্তর করিল না— তাহার পরে আবার বার বার আঘাত করিতেই বিনোদিনী জ্বলন্ত রোষে সবলে দ্বার খুলিয়া কহিল, "কেন তুমি আমাকে বার বার বিরক্ত করিতে আসিতেছ।" কথা শেষ না হইতেই বিনোদিনী দেখিল, বিহারী দাঁড়াইয়া আছে।

ঘরের মধ্যে মহেন্দ্র আছে কি না, দেখিবার জন্য বিহারী একবার ভিতরে চাহিয়া দেখিল। দেখিল, শয়নঘরে শুষ্ক ফুল এবং ছিন্ন মালা ছড়ানো। তাহার মন নিমেষের মধ্যেই প্রবলবেগে বিমুখ হইয়া গেল। বিহারী যখন দূরে ছিল, তখন বিনোদিনীর জীবনযাত্রাসম্বন্ধে কোনো সন্দেহজনক চিত্র যে তাহার মনে উদয় হয় নাই, তাহা নহে, কিন্তু কল্পনার লীলা সে-চিত্রকে ঢাকিয়াও একটি উজ্জ্বল মোহিনীচ্ছবি দাঁড় করাইয়াছিল। বিহারী যখন বাগানে প্রবেশ করিতেছিল তখন তাহার হৃৎকম্প হইতেছিল— পাছে কল্পনাপ্রতিমায় অকস্মাৎ আঘাত লাগে, এইজন্য তাহার চিত্ত সংকুচিত হইতেছিল। বিহারী বিনোদিনীর শয়নগৃহের দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইবামাত্র সেই আঘাতটাই লাগিল।

দূরে থাকিয়া বিহারী একসময় মনে করিয়াছিল, সে আপনার প্রেমাভিষেকে বিনোদিনীর জীবনের সমস্ত পঙ্কিলতা অনায়াসে ধৌত করিয়া লইতে পারিবে। কাছে আসিয়া দেখিল, তাহা সহজ নহে— মনের মধ্যে করুণার বেদনা আসিল কই। হঠাৎ ঘৃণার তরঙ্গ উঠিয়া তাহাকে অভিভূত করিয়া দিল। বিনোদিনীকে বিহারী অত্যন্ত মলিন দেখিল।

এক মুহূর্তেই বিহারী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া "মহেন্দ্র" "মহেন্দ্র" করিয়া ডাকিল।

এই অপমান পাইয়া বিনোদিনী নম্রমৃদুস্বরে কহিল, "মহেন্দ্র নাই, মহেন্দ্র শহরে গেছে।"

বিহারী চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে বিনোদিনী কহিল, "বিহারী-ঠাকুরপো, তোমার পায়ে ধরি, একটুখানি তোমাকে বসিতে হইবে।"

বিহারী কোনো মিনতি শুনিবে না মনে করিয়াছিল, একেবারে এই ঘৃণার দৃশ্য হইতে এখনই নিজেকে দূরে লইয়া যাইবে স্থির করিয়াছিল, কিন্তু বিনোদিনীর করুণ অনুনয়স্বর শুনিবামাত্র ক্ষণকালের জন্য তাহার পা যেন আর উঠিল না।

বিনোদিনী কহিল, "আজ যদি তুমি বিমুখ হইয়া এমন করিয়া চলিয়া যাও, তবে আমি তোমারই শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি মরিব।"

বিহারী তখন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "বিনোদিনী, তোমার জীবনের সঙ্গে আমাকে তুমি জড়াইবার চেষ্টা করিতেছ কেন। আমি তোমার কী করিয়াছি। আমি তো কখনো তোমার পথে দাঁড়াই নাই, তোমার সুখদুঃখে হস্তক্ষেপ করি নাই।"

বিনোদিনী কহিল, "তুমি আমার কতখানি অধিকার করিয়াছ, তাহা একবার তোমাকে জানাইয়াছি— তুমি বিশ্বাস কর নাই। তবু আজ আবার তোমার বিরাগের মুখে সেই কথাই জানাইতেছি। তুমি তো আমাকে না বলিয়া জানাইবার, লজ্জা করিয়া জানাইবার, সময় দাও নাই। তুমি আমাকে ঠেলিয়া ফেলিয়াছ, তবু আমি তোমার পা ধরিয়া বলিতেছি, আমি তোমাকে—"

বিহারী বাধা দিয়া কহিল, "সে-কথা আর বলিয়ো না, মুখে আনিয়ো না। সে-কথা বিশ্বাস করিবার জো নাই।"

বিনোদিনী। সে-কথা ইতর লোকে বিশ্বাস করিতে পারে না, কিন্তু তুমি করিবে। সেইজন্য একবার আমি তোমাকে বসিতে বলিতেছি।

বিহারী। আমি বিশ্বাস করি বা না করি, তাহাতে কী আসে যায়। তোমার জীবন যেমন চলিতেছে, তেমনি চলিবে তো।

বিনোদিনী। আমি জানি তোমার ইহাতে কিছুই আসিবে-যাইবে না। আমার ভাগ্য এমন যে, তোমার সম্মানরক্ষা করিয়া তোমার পাশে দাঁড়াইবার আমার কোনো উপায় নাই। চিরকাল তোমা হইতে আমাকে দূরেই থাকিতে হইবে। আমার মন তোমার কাছে এই দাবিটুকু কেবল ছাড়িতে পারে না যে আমি যেখানে থাকি আমাকে তুমি একটুকু মাধুর্যের সঙ্গে ভাবিবে। আমি জানি, আমার উপরে তোমার অল্প একটু শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল, সেইটুকু আমার একমাত্র সম্বল করিয়া রাখিব। সেইজন্য আমার সব কথা তোমাকে শুনিতে হইবে। আমি হাতজোড় করিয়া বলিতেছি ঠাকুরপো, একটুখানি বসো।

"আচ্ছা চলো" বলিয়া বিহারী এখান হইতে অন্যত্র কোথাও যাইতে উদ্যত হইল।

বিনোদিনী কহিল, "ঠাকুরপো, যাহা মনে করিতেছ, তাহা নহে। এ-ঘরে কোনো কলঙ্ক স্পর্শ করে নাই। তুমি এই ঘরে এক দিন শয়ন করিয়াছিলে— এ-ঘর তোমার জন্য উৎসর্গ করিয়া রাখিয়াছি— ওই ফুলগুলা তোমারই পূজা করিয়া আজ শুকাইয়া পড়িয়া আছে। এই ঘরেই তোমাকে বসিতে হইবে।"

শুনিয়া বিহারীর চিত্তে পুলকের সঞ্চার হইল। ঘরের মধ্যে সে প্রবেশ করিল। বিনোদিনী দুই হাত দিয়া তাহাকে খাট দেখাইয়া দিল। বিহারী খাটে গিয়া বসিল— বিনোদিনী ভূমিতলে তাহার পায়ের কাছে উপবেশন করিল। বিহারী ব্যস্ত হইয়া

উঠিতেই বিনোদিনী কহিল, "ঠাকুরপো, তুমি বসো, আমার মাথা খাও উঠিয়ো না। আমি তোমার পায়ের কাছে বসিবারও যোগ্য নই, তুমি দয়া করিয়াই সেখানে স্থান দিয়াছ। দূরে থাকিলেও এই অধিকারটুকু আমি রাখিব।"

এই বলিয়া বিনোদিনী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পরে হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া কহিল, "তোমার খাওয়া হইয়াছে, ঠাকুরপো ?"

বিহারী কহিল, "স্টেশন হইতে খাইয়া আসিয়াছি।"

বিনোদিনী। আমি গ্রাম হইতে তোমাকে যে চিঠিখানি লিখিয়াছিলাম, তাহা খুলিয়া কোনো জবাব না দিয়া মহেন্দ্রের হাত দিয়া আমাকে ফিরাইয়া পাঠাইলে কেন।

বিহারী। সে চিঠি তো আমি পাই নাই।

বিনোদিনী। এবারে মহেন্দ্রের সঙ্গে কলিকাতায় কি তোমার দেখা হইয়াছিল।

বিহারী। তোমাকে গ্রামে পৌঁছাইয়া দিবার পরদিন মহেন্দ্রের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল, তাহার পরেই আমি পশ্চিমে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম, তাহার সঙ্গে আর দেখা হয় নাই।

বিনোদিনী। তাহার পূর্বে আর-এক দিন আমার চিঠি পড়িয়া উত্তর না দিয়া ফিরাইয়া পাঠাইয়াছিলে ?

বিহারী। না, এমন কখনোই হয় নাই।

বিনোদিনী স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার পরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "সমস্ত বুঝিলাম। এখন আমার সব কথা তোমাকে বলি। যদি বিশ্বাস কর তো ভাগ্য মানিব, যদি না কর তো তোমাকে দোষ দিব না, আমাকে বিশ্বাস করা কঠিন।"

বিহারীর হৃদয় তখন আর্দ্র হইয়া গেছে। এই ভক্তিভারনম্রা বিনোদিনীর পূজাকে সে কোনোমতেই অপমান করিতে পারিল না। সে কহিল, "বোঠান, তোমাকে কোনো কথাই বলিতে হইবে না; কিছু না শুনিয়া আমি তোমাকে বিশ্বাস করিতেছি। আমি তোমায় ঘৃণা করিতে পারি না। তুমি আর একটি কথাও বলিয়ো না।"

শুনিয়া বিনোদিনীর চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল, সে বিহারীর পায়ের ধুলা মাথায় তুলিয়া লইল। কহিল, "সব কথা না বলিলে আমি বাঁচিব না। একটু ধৈর্য ধরিয়া শুনিতে হইবে— তুমি আমাকে যে-আদেশ করিয়াছিলে, তাহাই আমি শিরোধার্য করিয়া লইলাম। যদিও তুমি আমাকে পত্রটুকুও লেখ নাই, তবু আমি আমার সেই গ্রামে লোকের উপহাস ও নিন্দা সহ্য করিয়া জীবন কাটাইয়া দিতাম, তোমার স্নেহের পরিবর্তে তোমার শাসনই আমি গ্রহণ করিতাম— কিন্তু বিধাতা তাহাতেও বিমুখ হইলেন। আমি যে-পাপ জাগাইয়া তুলিয়াছি, তাহা আমাকে

নির্বাসনেও টিকিতে দিল না। মহেন্দ্র গ্রামে আসিয়া, আমার ঘরের দ্বারে আসিয়া, আমাকে সকলের সম্মুখে লাঞ্ছিত করিল। সে-গ্রামে আর আমার স্থান হইল না। দ্বিতীয় বার তোমার আদেশের জন্য তোমাকে অনেক খুঁজিলাম, কোনোমতেই তোমাকে পাইলাম না, মহেন্দ্র আমার খোলা চিঠি তোমার ঘর হইতে ফিরাইয়া লইয়া আমাকে প্রতারণা করিল। বুঝিলাম, তুমি আমাকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছ। ইহার পরে আমি একেবারেই নষ্ট হইতে পারিতাম— কিন্তু তোমার কী গুণ আছে, তুমি দূরে থাকিয়াও রক্ষা করিতে পার— তোমাকে মনে স্থান দিয়াছি বলিয়াই আমি পবিত্র হইয়াছি— একদিন তুমি আমাকে দূর করিয়া দিয়া নিজের যে পরিচয় দিয়াছ, তোমার সেই কঠিন পরিচয়, কঠিন সোনার মতো, কঠিন মানিকের মতো আমার মনের মধ্যে রহিয়াছে, আমাকে মহামূল্য করিয়াছে। দেব, এই তোমার চরণ ছুঁইয়া বলিতেছি, সে-মূল্য নষ্ট হয় নাই।"

বিহারী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বিনোদিনীও আর কোনো কথা কহিল না। অপরাহ্নের আলোক প্রতিক্ষণে ম্লান হইয়া আসিতে লাগিল। এমন সময় মহেন্দ্র ঘরের দ্বারের কাছে আসিয়া বিহারীকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। বিনোদিনীর প্রতি তাহার যে একটা ঔদাসীন্য জন্মিতেছিল, ঈর্ষার তাড়নায় তাহা দূর হইবার উপক্রম হইল। বিনোদিনী বিহারীর পায়ের কাছে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে দেখিয়া, প্রত্যাখ্যাত মহেন্দ্রের গর্বে আঘাত লাগিল। বিনোদিনীর সহিত বিহারীর চিঠিপত্র দ্বারা এই মিলন ঘটিয়াছে, ইহাতে তাহার আর সন্দেহ রহিল না। এতদিন বিহারী বিমুখ হইয়াছিল, এখন সে যদি নিজে আসিয়া ধরা দেয়, তবে বিনোদিনীকে ঠেকাইবে কে। মহেন্দ্র বিনোদিনীকে ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু আর-কাহারও হাতে ত্যাগ করিতে পারে না, তাহা আজ বিহারীকে দেখিয়া বুঝিতে পারিল।

ব্যর্থরোষে তীব্র বিদ্রূপের স্বরে মহেন্দ্র বিনোদিনীকে কহিল, "এখন তবে রঙ্গভূমিতে মহেন্দ্রের প্রস্থান, বিহারীর প্রবেশ। দৃশ্যটি সুন্দর— হাততালি দিতে ইচ্ছা হইতেছে। কিন্তু আশা করি, এই শেষ অঙ্ক, ইহার পরে আর কিছুই ভালো লাগিবে না।"

বিনোদিনীর মুখ রক্তিম হইয়া উঠিল। মহেন্দ্রের আশ্রয় লইতে যখন তাহাকে বাধ্য হইতে হইয়াছে, তখন এ-অপমানের উত্তর তাহার আর কিছুই নাই— ব্যাকুল-দৃষ্টিতে সে কেবল একবার বিহারীর মুখের দিকে চাহিল।

বিহারী খাট হইতে উঠিল— অগ্রসর হইয়া কহিল, "মহেন্দ্র, তুমি বিনোদিনীকে কাপুরুষের মতো অপমান করিয়ো না— তোমার ভদ্রতা যদি তোমাকে নিষেধ না করে, তোমাকে নিষেধ করিবার অধিকার আমার আছে।"

মহেন্দ্র হাসিয়া কহিল, "ইহারই মধ্যে অধিকার সাব্যস্ত হইয়া গেছে? আজ তোমার নূতন নামকরণ করা যাক—বিনোদ-বিহারী।"

বিহারী অপমানের মাত্রা চড়িতে দেখিয়া মহেন্দ্রের হাত চাপিয়া ধরিল। কহিল, "মহেন্দ্র, বিনোদিনীকে আমি বিবাহ করিব, তোমাকে জানাইলাম, অতএব এখন হইতে সংযতভাবে কথা কও।"

শুনিয়া মহেন্দ্র বিস্ময়ে নিস্তব্ধ হইয়া গেল, এবং বিনোদিনী চমকিয়া উঠিল—বুকের মধ্যে তাহার সমস্ত রক্ত তোলপাড় করিতে লাগিল।

বিহারী কহিল, "তোমাকে আর-একটি খবর দিবার আছে—তোমার মাতা মৃত্যুশয্যায় শয়ান, তাহার বাঁচিবার কোনো আশা নাই। আমি আজ রাত্রের গাড়িতেই যাইব— বিনোদিনীও আমার সঙ্গে ফিরিবে।"

বিনোদিনী চমকিয়া উঠিল, কহিল, "পিসিমার অসুখ?"

বিহারী কহিল, "সারিবার অসুখ নহে। কখন কী হয়, বলা যায় না।"

মহেন্দ্র তখন আর-কোনো কথা না বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বিনোদিনী তখন বিহারীকে বলিল, "যে-কথা তুমি বলিলে, তাহা তোমার মুখ দিয়া কেমন করিয়া বাহির হইল। এ কি ঠাট্টা।"

বিহারী কহিল, "না, আমি সত্যই বলিয়াছি, তোমাকে আমি বিবাহ করিব।"

বিনোদিনী। এই পাপিষ্ঠাকে উদ্ধার করিবার জন্য!

বিহারী। না। আমি তোমাকে ভালোবাসি বলিয়া, শ্রদ্ধা করি বলিয়া।

বিনোদিনী। এই আমার শেষ পুরস্কার হইয়াছে। এই যেটুকু স্বীকার করিলে ইহার বেশি আর আমি কিছুই চাই না। পাইলেও তাহা থাকিবে না, ধর্ম কখনো তাহা সহ্য করিবেন না।

বিহারী। কেন করিবেন না।

বিনোদিনী। ছি ছি, এ-কথা মনে করিতে লজ্জা হয়। আমি বিধবা, আমি নিন্দিতা, সমস্ত সমাজের কাছে আমি তোমাকে লাঞ্ছিত করিব, এ কখনো হইতেই পারে না। ছিছি, এ-কথা তুমি মুখে আনিয়ো না।

বিহারী। তুমি আমাকে ত্যাগ করিবে?

বিনোদিনী। ত্যাগ করিবার অধিকার আমার নাই। তুমি গোপনে অনেকের অনেক ভালো কর—তোমার একটা কোনো ব্রতের একটা-কিছু ভার আমার উপর সমর্পণ করিয়ো, তাহাই বহন করিয়া আমি নিজেকে তোমার সেবিকা বলিয়া গণ্য করিব। কিন্তু ছিছি, বিধবাকে তুমি বিবাহ করিবে। তোমার ঔদার্যে সব সম্ভব

হইতে পারে, কিন্তু আমি যদি এ-কাজ করি, তোমাকে সমাজে নষ্ট করি, তবে ইহজীবনে আমি আর মাথা তুলিতে পারিব না।

বিহারী। কিন্তু বিনোদিনী, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

বিনোদিনী। সেই ভালোবাসার অধিকারে আমি আজ একটিমাত্র স্পর্ধা প্রকাশ করিব। বলিয়া বিনোদিনী ভূমিষ্ঠ হইয়া বিহারীর পদাঙ্গুলি চুম্বন করিল। পায়ের কাছে বসিয়া কহিল, "পরজন্মে তোমাকে পাইবার জন্য আমি তপস্যা করিব— এ-জন্মে আমার আর কিছু আশা নাই, প্রাপ্য নাই। আমি অনেক দুঃখ দিয়াছি, অনেক দুঃখ পাইয়াছি, আমার অনেক শিক্ষা হইয়াছে। সে-শিক্ষা যদি ভুলিতাম, তবে আমি তোমাকে হীন করিয়া আরো হীন হইতাম। কিন্তু তুমি উচ্চ আছ বলিয়াই আজ আমি আবার মাথা তুলিতে পারিয়াছি— এ আশ্রয় আমি ভূমিসাৎ করিব না।"

বিহারী গম্ভীরমুখে চুপ করিয়া রহিল।

বিনোদিনী হাতজোড় করিয়া কহিল, "ভুল করিয়ো না— আমাকে বিবাহ করিলে তুমি সুখী হইবে না, তোমার গৌরব যাইবে— আমিও সমস্ত গৌরব হারাইব। তুমি চিরদিন নির্লিপ্ত, প্রসন্ন। আজও তুমি তাই থাকো— আমি দূরে থাকিয়া তোমার কর্ম করি। তুমি প্রসন্ন হও, তুমি সুখী হও।"

৫২

মহেন্দ্র তাহার মাতার ঘরে প্রবেশ করিতে যাইতেছে, তখন আশা তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিয়া কহিল, "এখন ও-ঘরে যাইয়ো না।"

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "কেন।"

আশা কহিল, "ডাক্তার বলিয়াছেন হঠাৎ মার মনে, সুখের হউক, দুঃখের হউক, একটা কোনো আঘাত লাগিলে বিপদ হইতে পারে।"

মহেন্দ্র কহিল, "আমি একবার আস্তে আস্তে তাঁহার মাথার শিয়রের কাছে গিয়া দেখিয়া আসিগে— তিনি টের পাইবেন না।"

আশা কহিল, "তিনি অতি অল্প শব্দেই চমকিয়া উঠিতেছেন, তুমি ঘরে ঢুকিলেই তিনি টের পাইবেন।"

মহেন্দ্র। তবে, এখন তুমি কী করিতে চাও।

আশা। আগে বিহারী-ঠাকুরপো আসিয়া একবার দেখিয়া যান— তিনি যেরূপ পরামর্শ দিবেন, তাহাই করিব।

বলিতে বলিতে বিহারী আসিয়া পড়িল। আশা তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিল।

বিহারী। বোঠান, ডাকিয়াছ? মা ভালো আছেন তো?

আশা বিহারীকে দেখিয়া যেন নির্ভর পাইল।” কহিল, “তুমি যাওয়ার পর হইতে মা যেন আরো চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। প্রথম দিন তোমাকে না দেখিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘বিহারী কোথায় গেল।’ আমি বলিলাম, তিনি বিশেষ কাজে গেছেন, বৃহস্পতিবারের মধ্যে ফিরিবার কথা আছে।’ তাহার পর হইতে তিনি থাকিয়া থাকিয়া চমকিয়া উঠিতেছেন। মুখে কিছুই বলেন না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে যেন কাহার অপেক্ষা করিতেছেন। কাল তোমার টেলিগ্রাম পাইয়া জানাইলাম, আজ তুমি আসিবে। শুনিয়া তিনি আজ তোমার জন্য বিশেষ করিয়া খাবার আয়োজন করিতে বলিয়াছেন। তুমি যাহা যাহা ভালোবাস, সমস্ত আনিতে দিয়াছেন, সম্মুখের বারান্দায় রাঁধিবার আয়োজন করাইয়াছেন, তিনি ঘরে হইতে দেখাইয়া দিবেন। ডাক্তারের নিষেধ কিছুতেই শুনিলেন না। আমাকে এই খানিকক্ষণ হইল ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, ‘বউমা, তুমি নিজের হাতে সমস্ত রাঁধিবে, আমি আজ সামনে বসাইয়া বিহারীকে খাওয়াইব।’ ”

শুনিয়া বিহারীর চোখ ছলছল করিয়া আসিল। জিজ্ঞাসা করিল, “মা আছেন কেমন।”

আশা কহিল, “তুমি একবার নিজে দেখিবে এসো— আমার তো বোধ হয়, ব্যামো আরো বাড়িয়াছে।”

তখন বিহারী ঘরে প্রবেশ করিল। মহেন্দ্র বাহিরে দাঁড়াইয়া আশ্চর্য হইয়া গেল। আশা বাড়ির কর্তৃত্ব অনায়াসে গ্রহণ করিয়াছে— সে মহেন্দ্রকে কেমন সহজে ঘরে ঢুকিতে নিষেধ করিল। না করিল সংকোচ, না করিল অভিমান। মহেন্দ্রের বল আজ কতখানি কমিয়া গেছে। সে অপরাধী, সে বাহিরে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল — মার ঘরেও ঢুকিতে পারিল না।

তাহার পরে ইহাও আশ্চর্য— বিহারীর সঙ্গে আশা কেমন অকুণ্ঠিতভাবে কথাবার্তা কহিল। সমস্ত পরামর্শ তাহারই সঙ্গে। সেই আজ সংসারের একমাত্র রক্ষক, সকলের সুহৃৎ। তাহার গতিবিধি সর্বত্র, তাহার উপদেশেই সমস্ত চলিতেছে। মহেন্দ্র কিছুদিনের জন্য যে-জায়গাটি ছাড়িয়া চলিয়া গেছে, ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, সে-জায়গা ঠিক আর তেমনটি নাই।

বিহারী ঘরে ঢুকিতেই রাজলক্ষ্মী তাঁহার করুণ চক্ষু তাহার মুখের দিকে রাখিয়া কহিলেন, “বিহারী, ফিরিয়াছিস ?”

বিহারী কহিল, “হাঁ, মা, ফিরিয়া আসিলাম।”

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “তোর কাজ শেষ হইয়া গেছে ?” বলিয়া তাহার মুখের দিকে একাগ্রদৃষ্টিতে চাহিলেন।

বিহারী প্রফুল্লমুখে "হাঁ মা, কাজ সুসম্পন্ন হইয়াছে, এখন আমার আর-কোনো ভাবনা নাই" বলিয়া একবার বাহিরের দিকে চাহিল।

রাজলক্ষ্মী। আজ বউমা তোমার জন্য নিজের হাতে রাঁধিবেন, আমি এখান হইতে দেখাইয়া দিব। ডাক্তার বারণ করে— কিন্তু আর বারণ কিসের জন্য, বাছা। আমি কি একবার তোদের খাওয়া দেখিয়া যাইব না।

বিহারী কহিল, "ডাক্তারের বারণ করিবার তো কোনো হেতু দেখি না, মা— তুমি না দেখাইয়া দিলে চলিবে কেন। ছেলেবেলা হইতে তোমার হাতের রান্নাই আমরা ভালোবাসিতে শিখিয়াছি— মহিনদার তো পশ্চিমের ডালরুটি খাইয়া অরুচি ধরিয়া গেছে— আজ সে তোমার মাছের ঝোল পাইলে বাঁচিয়া যাইবে। আজ আমরা দুই ভাই ছেলেবেলাকার মতো রেষারেষি করিয়া খাইব, তোমার বউমা অন্নে কুলাইতে পারিলে হয়।"

যদিচ রাজলক্ষ্মী বুঝিয়াছিলেন, বিহারী মহেন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে, তবু তাহার নাম শুনিতেই তাঁহার হৃদয় স্পন্দিত হইয়া নিশ্বাস ক্ষণকালের জন্য কঠিন হইয়া উঠিল।

সে-ভাবটা কাটিয়া গেলে বিহারী কহিল, "পশ্চিমে গিয়া মহিনদার শরীর অনেকটা ভালো হইয়াছে। আজ পথের অনিয়মে সে একটু ম্লান আছে, স্নানাহার করিলেই শুধরাইয়া উঠিবে।"

রাজলক্ষ্মী তবু মহেন্দ্রের কথা কিছু বলিলেন না। তখন বিহারী কহিল, "মা, মহিনদা বাহিরেই দাঁড়াইয়া আছে, তুমি না ডাকিলে সে তো আসিতে পারিতেছে না।"

রাজলক্ষ্মী কিছু না বলিয়া দরজার দিকে চাহিলেন। চাহিতেই বিহারী ডাকিল, "মহিনদা, এসো।"

মহেন্দ্র ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করিল। পাছে হৃৎপিণ্ড হঠাৎ স্তব্ধ হইয়া যায়, এই ভয়ে রাজলক্ষ্মী মহেন্দ্রের মুখের দিকে তখনই চাহিতে পারিলেন না। চক্ষু অর্ধনিমীলিত করিলেন। মহেন্দ্র বিছানার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া চমকিয়া উঠিল, তাহাকে কে যেন মারিল।

মহেন্দ্র মাতার পায়ের কাছে মাথা রাখিয়া পা ধরিয়া পড়িয়া রহিল। বক্ষের স্পন্দনে রাজলক্ষ্মীর সমস্ত শরীর কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ পরে অন্নপূর্ণা ধীরে ধীরে কহিলেন, "দিদি, মহিনকে তুমি উঠিতে বলো, নহিলে ও উঠিবে না।"

রাজলক্ষ্মী কষ্টে বাক্যস্ফুরণ করিয়া কহিলেন, "মহিন, ওঠ্।"

মহিনের নাম উচ্চারণমাত্র অনেক দিন পরে তাঁহার চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সেই অশ্রু পড়িয়া তাঁহার হৃদয়ের বেদনা লঘু হইয়া আসিল। তখন মহেন্দ্র উঠিয়া মাটিতে হাঁটু গাড়িয়া খাটের উপর বুক দিয়া তাহার মার পাশে আসিয়া বসিল। রাজলক্ষ্মী কষ্টে পাশ ফিরিয়া দুই হাতে মহেন্দ্রের মাথা লইয়া তাহার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন, তাহার ললাট চুম্বন করিলেন।

মহেন্দ্র রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "মা, তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়াছি, আমাকে মাপ করো।"

বক্ষ শান্ত হইলে রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "ও-কথা বলিসনে মহিন, আমি তোকে মাপ না করিয়া কি বাঁচি। বউমা, বউমা কোথায় গেল।"

আশা পাশের ঘরে পথ্য তৈরি করিতেছিল— অন্নপূর্ণা তাহাকে ডাকিয়া আনিলেন। তখন রাজলক্ষ্মী মহেন্দ্রকে ভূতল হইতে উঠিয়া তাঁহার খাটে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। মহেন্দ্র খাটে বসিলে রাজলক্ষ্মী মহেন্দ্রের পার্শ্বে স্থান-নির্দেশ করিয়া আশাকে কহিলেন, "বউমা, এইখানে তুমি বসো— আজ আমি একবার তোমাদের দু-জনকে একত্রে বসাইয়া দেখিব, তাহা হইলে আমার সকল দুঃখ ঘুচিবে। বউমা, আমার কাছে আর লজ্জা করিয়ো না— আর মহিনের 'পরেও মনের মধ্যে কোনো অভিমান না রাখিয়া একবার এইখানে বসো— আমার চোখ জুড়াও, মা।"

তখন ঘোমটা-মাথায় আশা লজ্জায় ধীরে ধীরে আসিয়া কম্পিতবক্ষে মহেন্দ্রের পাশে গিয়া বসিল। রাজলক্ষ্মী স্বহস্তে আশার ডান হাত তুলিয়া লইয়া মহেন্দ্রের ডান হাতে রাখিয়া চাপিয়া ধরিলেন— কহিলেন, "আমার এই মাকে তোর হাতে দিয়া গেলাম, মহিন— আমার এই কথাটি মনে রাখিস, তুই এমন লক্ষ্মী আর কোথাও পাবিনে। মেজবউ, এসো, ইহাদের একবার আশীর্বাদ করো— তোমার পুণ্যে ইহাদের মঙ্গল হউক।"

অন্নপূর্ণা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই উভয়ে চোখের জলে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল। অন্নপূর্ণা উভয়ের মস্তকচুম্বন করিয়া কহিলেন, "ভগবান তোমাদের কল্যাণ করুন।"

রাজলক্ষ্মী। বিহারী, এসো বাবা, মহিনকে তুমি একবার ক্ষমা করো।

বিহারী তখনই মহেন্দ্রের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই মহেন্দ্র উঠিয়া দৃঢ়বাহু দ্বারা বিহারীকে বক্ষে টানিয়া লইয়া কোলাকুলি করিল।

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "মহিন, আমি তোকে এই আশীর্বাদ করি— শিশুকাল হইতে বিহারী তোর যেমন বন্ধু ছিল, চিরকাল তেমনি বন্ধু থাক্— ইহার চেয়ে তোর সৌভাগ্য আর-কিছু হইতে পারে না।"

এই বলিয়া রাজলক্ষ্মী অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া নিস্তব্ধ হইলেন। বিহারী একটা উত্তেজক ঔষধ তাঁহার মুখের কাছে আনিয়া ধরিতেই রাজলক্ষ্মী হাত সরাইয়া দিয়া কহিলেন, "আর ওষুধ না, বাবা! এখন আমি ভগবানকে স্মরণ করি— তিনি আমাকে আমার সমস্ত সংসারদাহের শেষ ওষুধ দিবেন। মহিন, তোরা একটুখানি বিশ্রাম করগে। বউমা, এইবার রান্না চড়াইয়া দাও।"

সন্ধ্যাবেলায় বিহারী এবং মহেন্দ্র রাজলক্ষ্মীর বিছানার সম্মুখে নিচে পাত পাড়িয়া খাইতে বসিল। আশার উপর রাজলক্ষ্মী পরিবেষণের ভার দিয়াছিলেন, সে পরিবেষণ করিতে লাগিল।

মহেন্দ্রের বক্ষের মধ্যে অশ্রু উদ্‌বেলিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহার মুখে অন্ন উঠিতেছিল না। রাজলক্ষ্মী তাহাকে বার বার বলিতে লাগিলেন, "মহিন, তুই কিছুই খাইতেছিস না কেন? ভালো করিয়া খা, আমি দেখি।"

বিহারী কহিল, "জানই তো মা, মহিনদা চিরকাল ওই রকম, কিছুই খাইতে পারে না। বোঠান, ঐ ঘণ্টটা আমাকে আর-একটু দিতে হইবে, বড়ো চমৎকার হইয়াছে।"

রাজলক্ষ্মী খুশি হইয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "আমি জানি, বিহারী ওই ঘণ্টটা ভালোবাসে। বউমা, ওটুকুতে কী হইবে, আর-একটু বেশি করিয়া দাও।"

বিহারী কহিল, "তোমার এই বউটি বড়ো কৃপণ, হাত দিয়া কিছু গলে না।"

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া কহিলেন, "দেখো তো বউমা, বিহারী তোমারই নুন খাইয়া তোমারই নিন্দা করিতেছে।"

আশা বিহারীর পাতে একরাশ ঘণ্ট দিয়া গেল।

বিহারী কহিল, "হায় হায়! ঘণ্ট দিয়াই আমার পেট ভরাইবে দেখিতেছি, আর ভালো ভালো জিনিস সমস্তই মহিনদার পাতে পড়িবে।"

আশা ফিসফিস করিয়া বলিয়া গেল, "নিন্দুকের মুখ কিছুতেই বন্ধ হয় না।"

বিহারী মৃদুস্বরে কহিল, "মিষ্টান্ন দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখো, বন্ধ হয় কি না।"

দুই বন্ধুর আহার হইয়া গেলে, রাজলক্ষ্মী অত্যন্ত তৃপ্তিবোধ করিলেন। কহিলেন, "বউমা, তুমি শীঘ্র খাইয়া এসো।"

রাজলক্ষ্মীর আদেশে আশা খাইতে গেলে তিনি মহেন্দ্রকে কহিলেন, "মহিন, তুই শুইতে যা।"

মহেন্দ্র কহিল, "এখনই শুইতে যাইব কেন?"

মহেন্দ্র রাত্রে মাতার সেবা করিবে স্থির করিয়াছিল। রাজলক্ষ্মী কোনোমতেই তাহা ঘটিতে দিলেন না। কহিলেন, "তুই শ্রান্ত আছিস মহিন, তুই শুইতে যা।"

আশা আহার শেষ করিয়া পাখা লইয়া রাজলক্ষ্মীর শিয়রের কাছে আসিয়া বসিবার উপক্রম করিলে, তিনি চুপি চুপি তাহাকে কহিলেন, "বউমা, মহেন্দ্রের বিছানা ঠিক হইয়াছে কি না দেখো গে, সে একলা আছে।"

আশা লজ্জায় মরিয়া গিয়া কোনোমতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। ঘরে কেবল বিহারী এবং অন্নপূর্ণা রহিলেন।

তখন রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "বিহারী, তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। বিনোদিনীর কী হইল বলিতে পারিস? সে এখন কোথায়?"

বিহারী কহিল, "বিনোদিনী কলিকাতায় আছে।"

রাজলক্ষ্মী নীরব দৃষ্টিতে বিহারীকে প্রশ্ন করিলেন। বিহারী তাহা বুঝিল। কহিল, "বিনোদিনীর জন্য তুমি আর কিছুমাত্র ভয় করিয়ো না, মা।"

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "সে আমাকে অনেক দুঃখ দিয়াছে, বিহারী, তবু তাহাকে আমি মনে মনে ভালোবাসি।"

বিহারী কহিল, "সে-ও তোমাকে মনে মনে ভালোবাসে, মা।"

রাজলক্ষ্মী। আমারও তাই বোধ হয় বিহারী। দোষগুণ সকলেরই আছে, কিন্তু সে আমাকে ভালোবাসিত। তেমন সেবা কেহ ছল করিয়া করিতে পারিত না।

বিহারী কহিল, "তোমার সেবা করিবার জন্য সে ব্যাকুল হইয়া আছে।"

রাজলক্ষ্মী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "মহিনরা তো এখন শুইতে গেছে, রাত্রে তাহাকে একবার আনিলে কি ক্ষতি আছে?"

বিহারী কহিল, "মা, সে তো এই বাড়িরই বাহির-ঘরে লুকাইয়া বসিয়া আছে। তাহাকে আজ সমস্তদিন জলবিন্দু পর্যন্ত মুখে দেওয়াইতে পারি নাই। সে পণ করিয়াছে, যতক্ষণ তুমি তাহাকে ডাকিয়া না মাপ করিবে ততক্ষণ সে জলস্পর্শ করিবে না।"

রাজলক্ষ্মী ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "সমস্ত দিন উপবাস করিয়া আছে! আহা, তাহাকে ডাক্, ডাক্!"

বিনোদিনী ধীরে ধীরে রাজলক্ষ্মীর ঘরে প্রবেশ করিতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ছি ছি বউ, তুমি করিয়াছ কী? আজ সমস্ত দিন উপোস করিয়া আছ? যাও যাও, আগে খাইয়া লও, তাহার পরে কথা হইবে।"

বিনোদিনী রাজলক্ষ্মীর পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, "আগে তুমি পাপিষ্ঠাকে মাপ করো, পিসিমা, তবে আমি খাইব।"

রাজলক্ষ্মী। মাপ করিয়াছি বাছা, মাপ করিয়াছি, আমার এখন কাহারও উপর

আর রাগ নাই।— বিনোদিনীর ডান হাত ধরিয়া তিনি কহিলেন, "বউ, তোমা হইতে কাহারও মন্দ না হউক, তুমিও ভাল থাকো।"

বিনোদিনী। তোমার আশীর্বাদ মিথ্যা হইবে না, পিসিমা। আমি তোমার পা ছুঁইয়া বলিতেছি আমা হইতে এ-সংসারের মন্দ হইবে না।

অন্নপূর্ণাকে বিনোদিনী ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া খাইতে গেল। খাইয়া আসিলে পর রাজলক্ষ্মী তাহার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "বউ, এখন তবে তুমি চলিলে?"

বিনোদিনী। পিসিমা, আমি তোমার সেবা করিব। ঈশ্বর সাক্ষী, আমা হইতে তুমি কোনো অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়ো না।

রাজলক্ষ্মী বিহারীর মুখের দিকে চাহিলেন। বিহারী একটু চিন্তা করিয়া কহিল, "বোঠান থাকুন মা, তাহাতে ক্ষতি হইবে না।"

রাত্রে বিহারী, বিনোদিনী এবং অন্নপূর্ণা তিন জনে মিলিয়া রাজলক্ষ্মীর শুশ্রূষা করিলেন।

এদিকে আশা সমস্তরাত্রি রাজলক্ষ্মীর ঘরে আসে নাই বলিয়া লজ্জায় অত্যন্ত প্রত্যুষে উঠিয়াছে। মহেন্দ্রকে বিছানায় সুপ্ত অবস্থায় রাখিয়া তাড়াতাড়ি মুখ ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া প্রস্তুত হইয়া আসিল। তখনো অন্ধকার একেবারে যায় নাই। রাজলক্ষ্মীর দ্বারের কাছে আসিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে আশা অবাক হইয়া গেল। ভাবিল, "এ কি স্বপ্ন?"

বিনোদিনী একটি স্পিরিট ল্যাম্প জ্বালিয়া জল গরম করিতেছে। বিহারী রাত্রে ঘুমাইতে পায় নাই তাহার জন্য চা তৈরি হইবে।

আশাকে দেখিয়া বিনোদিনী উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, "আজ আমি আমার সমস্ত অপরাধ লইয়া তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম— আর কেহ আমাকে দূর করিতে পারিবে না— কিন্তু তুমি যদি বল 'যাও' তো আমাকে এখনই যাইতে হইবে।"

আশা কোনো উত্তর করিতে পারিল না— তাহার মন কী বলিতেছে, তাও সে যেন ভালো করিয়া বুঝিতে পারিল না, অভিভূত হইয়া রহিল।

বিনোদিনী কহিল, "আমাকে কোনোদিন তুমি মাপ করিতে পারিবে না— সে-চেষ্টাও করিয়ো না। কিন্তু আমাকে আর ভয় করিয়ো না। যে-কয়দিন পিসিমার দরকার হইবে, সেই কটা দিন আমাকে একটুখানি কাজ করিতে দাও, তার পরে আমি চলিয়া যাইব।"

কাল রাজলক্ষ্মী যখন আশার হাত লইয়া মহেন্দ্রের হাতে দিলেন, তখন আশা তাহার মন হইতে সমস্ত অভিমান মুছিয়া ফেলিয়া সম্পূর্ণভাবে মহেন্দ্রের কাছে

আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। আজ বিনোদিনীকে সম্মুখে দেখিয়া তাহার খণ্ডিত প্রেমের দাহ শান্তি মানিল না। ইহাকে মহেন্দ্র একদিন ভালোবাসিয়াছিল, ইহাকে এখনো হয়তো মনে মনে ভালোবাসে— এ-কথা তাহার বুকের ভিতরে ঢেউয়ের মতো ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরেই মহেন্দ্র জাগিয়া উঠিবে, বিনোদিনীকে দেখিবে— কী জানি কী চক্ষে দেখিবে! কাল রাত্রে আশা তাহার সমস্ত সংসারকে নিষ্কণ্টক দেখিয়াছিল— আজ প্রত্যুষে উঠিয়াই দেখিল, কাঁটাগাছ তাহার ঘরের প্রাঙ্গণেই। সংসারে সুখের স্থানই সব চেয়ে সংকীর্ণ—কোথাও তাহাকে সম্পূর্ণ নির্বিঘ্নে রাখিবার অবকাশ নাই।

হৃদয়ের ভার লইয়া আশা রাজলক্ষ্মীর ঘরে প্রবেশ করিল, এবং অত্যন্ত লজ্জার সঙ্গে কহিল, “মাসিমা, তুমি সমস্ত রাত বসিয়া আছ— যাও, শুতে যাও!” অন্নপূর্ণা আশার মুখের দিকে একবার ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিলেন। তাহার পরে শুইতে না গিয়া আশাকে নিজের ঘরে লইয়া গেলেন। কহিলেন, “চুনি, যদি সুখী হইতে চাস, তবে সব কথা মনে রাখিসনে। অন্যকে দোষী করিয়া যেটুকু সুখ, দোষ মনে রাখিবার দুঃখ তাহার চেয়ে ঢের বেশি।”

আশা কহিল, “মাসিমা, আমি মনে কিছু পুষিয়া রাখিতে চাই না, আমি ভুলিতেই চাই, কিন্তু ভুলিতে দেয় না যে।”

অন্নপূর্ণা। বাছা, তুই ঠিক বলিয়াছিস— উপদেশ দেওয়া সহজ, উপায় বলিয়া দেওয়াই শক্ত। তবু আমি তোকে একটা উপায় বলিয়া দিতেছি। যেন ভুলিয়াছিস এই ভাবটি অন্তত বাহিরে প্রাণপণে রক্ষা করিতে হইবে— আগে বাহিরে ভুলিতে আরম্ভ করিস, তাহা হইলে ভিতরেও ভুলিবি। এ-কথা মনে রাখিস চুনি, তুই যদি না ভুলিস, তবে অন্যকেও স্মরণ করাইয়া রাখিবি! তুই নিজের ইচ্ছায় না পারিস, আমি তোকে আজ্ঞা করিতেছি, তুই বিনোদিনীর সঙ্গে এমন ব্যবহার কর্‌, যেন সে কখনো তোর কোনো অনিষ্ট করে নাই এবং তাহার দ্বারা তোর অনিষ্টের কোনো আশঙ্কা নাই।

আশা নম্রমুখে কহিল, “কী করিতে হইবে, বলো।”

অন্নপূর্ণা কহিলেন, “বিনোদিনী এখন বিহারীর জন্যে চা তৈরি করিতেছে। তুই দুধ-চিনি-পেয়ালা সমস্ত লইয়া যা— দুই জনে মিলিয়া কাজ কর্‌।”

আশা আদেশপালনের জন্য উঠিল। অন্নপূর্ণা কহিলেন, “এটা সহজ—কিন্তু আমার আর-একটি কথা আছে, সেটা আরো শক্ত— সেইটে তোকে পালন করিতেই হইবে! মাঝে মাঝে মহেন্দ্রের সঙ্গে বিনোদিনীর দেখা হইবেই, তখন তোর মনে কী হইবে,

তাহা আমি জানি— সে-সময়ে তুই গোপন কটাক্ষেও মহেন্দ্রের ভাব কিংবা বিনোদিনীর ভাব দেখিবার চেষ্টামাত্রও করিসনে। বুক ফাটিয়া গেলেও তোকে অবিচলিত থাকিতে হইবে। মহেন্দ্র ইহা জানিবে যে, তুই সন্দেহ করিস না, শোক করিস না, তোর মনে ভয় নাই, চিন্তা নাই— জোড় ভাঙিবার পূর্বে যেমন ছিল, জোড় লাগিয়া আবার ঠিক তেমনই হইয়াছে— ভাঙনের দাগটুকুও মিলাইয়া গেছে। মহেন্দ্র কি আর-কেহ তোর মুখ দেখিয়া নিজেকে অপরাধী বলিয়া মনে করিবে না। চুনি, ইহা আমার অনুরোধ বা উপদেশ নহে, ইহা তোর মাসিমার আদেশ। আমি যখন কাশী চলিয়া যাইব, আমার এই কথাটি একদিনের জন্যও ভুলিসনে।"

আশা চায়ের পেয়ালা প্রভৃতি লইয়া বিনোদিনীর কাছে উপস্থিত হইল। কহিল, "জল কি গরম হইয়াছে? আমি চায়ের দুধ আনিয়াছি।"

বিনোদিনী আশ্চর্য হইয়া আশার মুখের দিকে চাহিল। কহিল, "বিহারী-ঠাকুরপো বারান্দায় বসিয়া আছেন, চা তুমি তাঁহার কাছে পাঠাইয়া দাও, আমি ততক্ষণ পিসিমার জন্য মুখ ধুইবার বন্দোবস্ত করিয়া রাখি। তিনি বোধ হয় এখনই উঠিবেন।"

বিনোদিনী চা লইয়া বিহারীর কাছে গেল না। বিহারী ভালোবাসা স্বীকার করিয়া তাহাকে যে-অধিকার দিয়াছে, সেই অধিকার স্বেচ্ছামতে খাটাইতে তাহার সংকোচ বোধ হইতে লাগিল। অধিকারলাভের যে মর্যাদা আছে, সেই মর্যাদা রক্ষা করিতে হইলে অধিকারপ্রয়োগকে সংযত করিতে হয়। যতটা পাওয়া যায় ততটা লইয়া টানাটানি করা কাঙালকেই শোভা পায়— ভোগকে খর্ব করিলেই সম্পদের যথার্থ গৌরব। এখন, বিহারী তাহাকে নিজে না ডাকিলে, কোনো-একটা উপলক্ষ্য করিয়া বিনোদিনী তাহার কাছে আর যাইতে পারে না।

বলিতে-বলিতেই মহেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইল। আশার বুকের ভিতরটা যদিও ধড়াস করিয়া উঠিল, তবু সে আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়া স্বাভাবিক স্বরে মহেন্দ্রকে কহিল, "তুমি এত ভোরে উঠিলে যে? পাছে আলো লাগিয়া তোমার ঘুম ভাঙে, তাই আমি জানলা-দরজা সব বন্ধ করিয়া আসিয়াছি।"

বিনোদিনীর সম্মুখেই আশাকে এইরূপ সহজভাবে কথা কহিতে শুনিয়া মহেন্দ্রের বুকের একটা পাথর যেন নামিয়া গেল। সে আনন্দিতচিত্তে কহিল, "মা কেমন আছেন, তাই দেখিতে আসিয়াছি— মা কি এখনো ঘুমাইতেছেন।"

আশা কহিল, "হাঁ, তিনি ঘুমাইতেছেন, এখন তুমি যাইয়ো না। বিহারী-ঠাকুরপো বলিয়াছেন, তিনি আজ অনেকটা ভালো আছেন। অনেক দিন পরে কাল তিনি সমস্ত রাত ভালো করিয়া ঘুমাইয়াছেন।"

মহেন্দ্র নিশ্চিন্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কাকীমা কোথায়।”

আশা তাঁহার ঘর দেখাইয়া দিল।

আশার এই দৃঢ়তা ও সংযম দেখিয়া বিনোদিনীও আশ্চর্য হইয়া গেল।

মহেন্দ্র ডাকিল, “কাকীমা।”

অন্নপূর্ণা যদিও ভোরে স্নান করিয়া লইয়া এখন পূজায় বসিবেন স্থির করিয়াছিলেন, তবুও তিনি কহিলেন, “আয় মহিন, আয়।”

মহেন্দ্র তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিল, “কাকীমা, আমি পাপিষ্ঠ, তোমাদের কাছে আসিতে আমার লজ্জা করে!”

অন্নপূর্ণা কহিলেন, “ছি ছি, ও-কথা বলিসনে মহিন— ছেলে ধুলা লইয়াও মার কোলে আসিয়া বসে।”

মহেন্দ্র। কিন্তু আমার এ-ধুলা কিছুতেই মুছিবে না কাকীমা।

অন্নপূর্ণা। তুই-একবার ঝাড়িলেই ঝরিয়া যাইবে। মহিন, ভালোই হইয়াছে। নিজেকে ভালো বলিয়া তোর অহংকার ছিল, নিজের ’পরে বিশ্বাস তোর বড়ো বেশি ছিল, পাপের ঝড়ে তোর সেই গর্বটুকুই ভাঙিয়া দিয়াছে, আর কোনো অনিষ্ট করে নাই।

মহেন্দ্র। কাকীমা এবার তোমাকে আর ছাড়িয়া দিব না, তুমি গিয়াই আমার এই দুর্গতি হইয়াছে।

অন্নপূর্ণা। আমি থাকিয়া যে-দুর্গতি ঠেকাইয়া রাখিতাম, সে-দুর্গতি একবার ঘটিয়া যাওয়াই ভালো। এখন আর তোর আমাকে কোনো দরকার হইবে না।

দরজার কাছে আবার ডাক পড়িল, “কাকীমা, আহ্নিকে বসিয়াছ নাকি।”

অন্নপূর্ণা কহিলেন, “না, তুই আয়।”

বিহারী ঘরে প্রবেশ করিল। এত সকালে মহেন্দ্রকে জাগ্রত দেখিয়া কহিল, “মহিনদা, আজ তোমার জীবনে এই বোধ হয় প্রথম সূর্যোদয় দেখিলে!”

মহেন্দ্র কহিল, “হাঁ বিহারী, আজ আমার জীবনে প্রথম সূর্যোদয়। বিহারীর বোধ হয় কাকীমার সঙ্গে কোনো পরামর্শ আছে— আমি যাই।”

বিহারী হাসিয়া কহিল, “তোমাকেও না হয় ক্যাবিনেটের মিনিস্টার করিয়া লওয়া গেল। তোমার কাছে আমি তো কখনো কিছু গোপন করি নাই— যদি আপত্তি না কর, আজও গোপন করিব না।”

মহেন্দ্র। আমি আপত্তি করিব! তবে আর দাবি করিতে পারি না বটে। তুমি যদি আমার কাছে কিছু গোপন না কর, তবে আমিও আমার প্রতি আবার শ্রদ্ধা করিতে পারিব।

আজকাল মহেন্দ্রের সম্মুখে সকল কথা অসংকোচে বলা কঠিন। বিহারীর মুখে বাধিয়া আসিল, তবু সে জোর করিয়া বলিল, "বিনোদিনীকে বিবাহ করিব, এমন-একটা কথা উঠিয়াছিল, কাকীমার সঙ্গে সেই সম্বন্ধে আমি কথাবার্তা শেষ করিতে আসিয়াছি।"

মহেন্দ্র একান্ত সংকুচিত হইয়া উঠিল। অন্নপূর্ণা চকিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "এ আবার কী কথা, বিহারী।"

মহেন্দ্র প্রবল শক্তি প্রয়োগ করিয়া সংকোচ দূর করিল। কহিল, "বিহারী, এ বিবাহের কোনো প্রয়োজন নাই।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "এ বিবাহের প্রস্তাবে কি বিনোদিনীর কোনো যোগ আছে।"

বিহারী কহিল, "কিছুমাত্র না।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "সে কি ইহাতে রাজি হইবে।"

মহেন্দ্র বলিয়া উঠিল, "বিনোদিনী কেন রাজি হইবে না, কাকীমা? আমি জানি, সে একমনে বিহারীকে ভক্তি করে— এমন আশ্রয় সে কি ইচ্ছা করিয়া ছাড়িয়া দিতে পারে।"

বিহারী কহিল, "মহিনদা, আমি বিনোদিনীকে বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছি— সে লজ্জার সঙ্গে তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।"

শুনিয়া মহেন্দ্র চুপ করিয়া রহিল।

৫৩

ভালোয়-মন্দয় দুই-তিনদিন রাজলক্ষ্মীর কাটিয়া গেল। একদিন প্রাতে তাঁহার মুখ বেশ প্রসন্ন ও বেদনা সমস্ত হ্রাস হইল। সেই দিন তিনি মহেন্দ্রকে ডাকিয়া কহিলেন, "আর আমার বেশিক্ষণ সময় নাই— কিন্তু আমি বড়ো সুখে মরিলাম মহিন, আমার কোনো দুঃখ নাই। তুই যখন ছোটো ছিলি, তখন তোকে লইয়া আমার যে আনন্দ ছিল, আজ সেই আনন্দে আমার বুক ভরিয়া উঠিয়াছে— তুই আমার কোলের ছেলে, আমার বুকের ধন— তোর সমস্ত বালাই লইয়া আমি চলিয়া যাইতেছি, এই আমার বড়ো সুখ।" বলিয়া রাজলক্ষ্মী মহেন্দ্রের মুখে গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। মহেন্দ্রের রোদন বাধা না মানিয়া উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল।

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "কাঁদিসনে, মহিন। লক্ষ্মী ঘরে রহিল। বউমাকে আমার চাবিটা দিস। সমস্তই আমি গুছাইয়া রাখিয়াছি, তোদের ঘরকন্নার জিনিসের কোনো

অভাব হইবে না। আর-একটি কথা আমি বলি মহিন, আমার মৃত্যুর পূর্বে কাহাকেও জানাসনে— আমার বাক্সে দু-হাজার টাকার নোট আছে, তাহা আমি বিনোদিনীকে দিলাম। সে বিধবা, একাকিনী, ইহার সুদ হইতে তাহার বেশ চলিয়া যাইবে— কিন্তু মহিন, তাহাকে তোদের সংসারের ভিতরে রাখিসনে, তোর প্রতি আমার এই অনুরোধ রহিল!"

বিহারীকে ডাকিয়া রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "বাবা বিহারী, কাল মহিন বলিতেছিল, তুই গরিব ভদ্রলোকদের চিকিৎসার জন্য একটি বাগান করিয়াছিস— ভগবান তোকে দীর্ঘজীবী করিয়া গরিবের হিত করুন। আমার বিবাহের সময় আমার শ্বশুর আমাকে একখানি গ্রাম যৌতুক করিয়াছিলেন, সেই গ্রামখানি আমি তোকে দিলাম, তোর গরিবদের কাজে লাগাস, তাহাতে আমার শ্বশুরের পুণ্য হইবে।"

৫৪

রাজলক্ষ্মীর মৃত্যু হইলে পর শ্রাদ্ধশেষে মহেন্দ্র কহিল, "ভাই বিহারী, আমি ডাক্তারি জানি—তুমি যে-কাজ আরম্ভ করিয়াছ, আমাকেও তাহার মধ্যে নাও। চুনি যেরূপ গৃহিণী হইয়াছে সেও তোমার অনেক সহায়তা করিতে পারিবে। আমরা সকলে সেইখানেই থাকিব।"

বিহারী কহিল, "মহিনদা, ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখো— এ-কাজ কি বরাবর তোমার ভালো লাগিবে? বৈরাগ্যের ক্ষণিক উচ্ছ্বাসের মুখে একটা স্থায়ী ভার গ্রহণ করিয়া বসিয়ো না।"

মহেন্দ্র কহিল, "বিহারী, তুমিও ভাবিয়া দেখো, যে-জীবন আমি গঠন করিয়াছি, তাহাকে লইয়া আলস্যভরে আর উপভোগ করিবার জো নাই— কর্মের দ্বারা তাহাকে যদি টানিয়া লইয়া না চলি, তবে কোন্ দিন সে আমাকে টানিয়া অবসাদের মধ্যে ফেলিবে। তোমার কর্মের মধ্যে আমাকে স্থান দিতেই হইবে।"

সেই কথাই স্থির হইয়া গেল।

অন্নপূর্ণা ও বিহারী বসিয়া শান্ত বিষাদের সহিত সেকালের কথা আলোচনা করিতেছিলেন। তাঁহাদের পরস্পরের বিদায়ের সময় কাছে আসিয়াছে। বিনোদিনী দ্বারের কাছে আসিয়া কহিল, "কাকীমা, আমি কি এখানে একটু বসিতে পারি?"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "এসো এসো বাছা, বসো।"

বিনোদিনী আসিয়া বসিলে তাহার সহিত দুই-চারিটা কথা কহিয়া বিছানা তুলিবার উপলক্ষ্য করিয়া অন্নপূর্ণা বারান্দায় গেলেন।

বিনোদিনী বিহারীকে কহিল, "এখন আমার প্রতি তোমার যাহা আদেশ, তাহা বলো।"

বিহারী কহিল, "বোঠান, তুমিই বলো, তুমি কী করিতে চাও।"

বিনোদিনী কহিল, "শুনিলাম, গরিবদের চিকিৎসার জন্য গঙ্গার ধারে তুমি একখানি বাগান লইয়াছ— আমি সেখানে তোমার কোনো একটা কাজ করিব। কিছু না হয় তো আমি রাঁধিয়া দিতে পারি।"

বিহারী কহিল, "বোঠান, আমি অনেক ভাবিয়াছি। নানান হাঙ্গামে আমাদের জীবনের জালে অনেক জট পড়িয়া গেছে। এখন নিভৃতে বসিয়া বসিয়া তাহারই একটি একটি গ্রন্থি মোচন করিবার দিন আসিয়াছে। পূর্বে সমস্ত পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে। এখন হৃদয় যাহা চায়, তাহাকে আর প্রশ্রয় দিতে সাহস হয় না। এ পর্যন্ত যাহা কিছু ঘটিয়াছে, যাহা কিছু সহ্য করিয়াছি, তাহার সমস্ত আবর্তন, সমস্ত আন্দোলন শান্ত করিতে না পারিলে, জীবনের সমাপ্তির জন্য প্রস্তুত হইতে পারিব না। যদি সমস্ত অতীতকাল অনুকূল হইত, তবে সংসারে একমাত্র তোমার দ্বারাই আমার জীবন সম্পূর্ণ হইতে পারিত,— এখন তোমা হইতে আমাকে বঞ্চিত হইতেই হইবে। এখন আর সুখের জন্য চেষ্টা বৃথা, এখন কেবল আস্তে আস্তে সমস্ত ভাঙচুর সারিয়া লইতে হইবে!"

এই সময় অন্নপূর্ণা ঘরে ঢুকিতেই বিনোদিনী কহিল, "মা, আমাকে তোমার পায়ে স্থান দিতে হইবে। পাপিষ্ঠা বলিয়া আমাকে তুমি ঠেলিয়ো না।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "মা, চলো, আমার সঙ্গেই চলো।"

অন্নপূর্ণা ও বিনোদিনীর কাশীতে যাইবার দিন কোনো সুযোগে বিহারী বিরলে বিনোদিনীর সহিত দেখা করিল। কহিল, "বোঠান, তোমার একটা-কিছু চিহ্ন আমি কাছে রাখিতে চাই।"

বিনোদিনী কহিল, "আমার এমন কী আছে, যাহা চিহ্নের মতো কাছে রাখিতে পার?"

বিহারী লজ্জা ও সংকোচের সহিত কহিল, "ইংরেজের একটা প্রথা আছে, প্রিয়জনের একগুচ্ছ চুল স্মরণের জন্য রাখিয়া দেয়— যদি তুমি— ।"

বিনোদিনী। ছি ছি, কী ঘৃণা! আমার চুল লইয়া কী করিবে! সেই অশুচি মৃতবস্তু আমার এমন কিছুই নহে, যাহা আমি তোমাকে দিতে পারি। আমি হতভাগিনী তোমার কাজে থাকিতে পারিব না— আমি এমন একটা-কিছু দিতে চাই, যাহা আমার হইয়া তোমার কাজ করিবে— বলো, তুমি লইবে?

বিহারী কহিল, "লইব।"

তখন বিনোদিনী তাহার অঞ্চলের প্রান্ত খুলিয়া হাজার টাকার দুইখানি নোট বিহারীর হাতে দিল।

বিহারী সুগভীর আবেগের সহিত স্থিরদৃষ্টিতে বিনোদিনীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। খানিক বাদে বিহারী কহিল, "আমি কি তোমাকে কিছু দিতে পারিব না।"

বিনোদিনী কহিল, "তোমার চিহ্ন আমার কাছে আছে, তাহা আমার অঙ্গের ভূষণ— তাহা কেহ কাড়িতে পারিবে না। আমার আর কিছু দরকার নাই।" বলিয়া সে নিজের হাতের সেই কাটা দাগ দেখাইল।

বিহারী আশ্চর্য হইয়া রহিল। বিনোদিনী কহিল, "তুমি জান না—এ তোমারই আঘাত—এবং এ আঘাত তোমারই উপযুক্ত। ইহা এখন তুমিও ফিরাইতে পার না।"

মাসিমার উপদেশসত্ত্বেও আশা বিনোদিনী সম্বন্ধে মনকে নিষ্কণ্টক করিতে পারে নাই। রাজলক্ষ্মীর সেবায় দুই জনে একত্রে কাজ করিয়াছে, কিন্তু আশা যখনই বিনোদিনীকে দেখিয়াছে তখনই তাহার বুকের মধ্যে ব্যথা লাগিয়াছে— মুখ দিয়া সহজে কথা বাহির হয় নাই, এবং হাসিবার চেষ্টা তাহাকে পীড়ন করিয়াছে। বিনোদিনীর নিকট হইতে সামান্য কোনো সেবা গ্রহণ করিতেও তাহার সমস্ত চিত্ত বিমুখ হইয়াছে। বিনোদিনীর সাজা পান অনেক সময়ে শিষ্টতার খাতিরে তাহাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে, কিন্তু আড়ালে তাহা ফেলিয়া দিয়াছে। কিন্তু আজ যখন বিদায়কাল উপস্থিত হইল— মাসিমা সংসার হইতে দ্বিতীয়বার চলিয়া যাইতেছেন বলিয়া আশার হৃদয় যখন অশ্রুজলে আর্দ্র হইয়া গেল, তখন সেই সঙ্গে বিনোদিনীর প্রতি তাহার করুণার উদয় হইল। যে একেবারে চলিয়া যাইতেছে তাহাকে মাপ করিতে পারে না, এমন কঠিন মন অল্পই আছে। আশা জানিত, বিনোদিনী মহেন্দ্রকে ভালোবাসে; মহেন্দ্রকে ভালো না বাসিবেই বা কেন। মহেন্দ্রকে ভালোবাসা যে কিরূপ অনিবার্য, আশা তাহা নিজের হৃদয়ের ভিতর হইতেই জানে। নিজের ভালোবাসার সেই বেদনায় বিনোদিনীর প্রতি আজ তাহার বড়ো দয়া হইল। বিনোদিনী মহেন্দ্রকে চিরদিনের জন্য ছাড়িয়া যাইতেছে, তাহার যে দুর্বিষহ দুঃখ, তাহা আশা অতিবড়ো শত্রুর জন্যও কামনা করিতে পারে না— মনে করিয়া তাহার চক্ষে জল আসিল; এককালে সে বিনোদিনীকে ভালোবাসিয়াছিল— সেই ভালোবাসা তাহাকে স্পর্শ করিল। সে ধীরে ধীরে বিনোদিনীর কাছে আসিয়া অত্যন্ত করুণার সঙ্গে, স্নেহের সঙ্গে, বিষাদের সঙ্গে মৃদুস্বরে কহিল, "দিদি, তুমি চলিলে?"

বিনোদিনী আশার চিবুক ধরিয়া কহিল, "হাঁ বোন, আমার যাইবার সময়

আসিয়াছে। একসময় তুমি আমাকে ভালোবাসিয়াছিলে— এখন সুখের দিনে সেই ভালোবাসার একটুখানি আমার জন্যে রাখিয়ো, ভাই— আর সব ভুলিয়া যেয়ো!"

মহেন্দ্র আসিয়া প্রণাম করিয়া কহিল, "বোঠান, মাপ করিয়ো।" তাহার চোখের প্রান্তে দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

বিনোদিনী কহিল, "তুমিও মাপ করিয়ো ঠাকুরপো, ভগবান তোমাদের চিরসুখী করুন।"

প্রবন্ধ

আত্মশক্তি

আত্মশক্তি

নেশন কী

নেশন ব্যাপারটা কী, সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী ভাবুক রেনাঁ এই প্রশ্নের আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে তাঁহার মত ব্যাখ্যা করিতে হইলে, প্রথমে দুই একটা শব্দার্থ স্থির করিয়া লইতে হইবে।

স্বীকার করিতে হইবে, বাংলায় 'নেশন' কথার প্রতিশব্দ নাই। চলিত ভাষায় সাধারণত জাতি বলিতে বর্ণ বুঝায়; এবং জাতি বলিতে ইংরেজিতে যাহাকে race বলে, তাহাও বুঝাইয়া থাকে। আমরা 'জাতি' শব্দ ইংরেজি 'রেস' শব্দের প্রতিশব্দরূপেই ব্যবহার করিব, এবং নেশনকে নেশনই বলিব। নেশন ও ন্যাশনাল শব্দ বাংলায় চলিয়া গেলে অনেক অর্থদ্বৈধ-ভাবদ্বৈধের হাত এড়ানো যায়।

'ন্যাশনাল কনগ্রেস' শব্দের তর্জমা করিতে আমরা 'জাতীয় মহাসভা' ব্যবহার করিয়া থাকি— কিন্তু 'জাতীয়' বলিলে বাঙালী-জাতীয়, মারাঠি-জাতীয়, শিখ-জাতীয়, যে-কোনো জাতীয় বুঝাইতে পারে— ভারতবর্ষের সর্বজাতীয় বুঝায় না। মান্দ্রাজ ও বম্বাই 'ন্যাশনাল' শব্দের অনুবাদ চেষ্টায় 'জাতি' শব্দ ব্যবহার করেন নাই। তাঁহারা স্থানীয় ন্যাশনাল সভাকে মহাজনসভা ও সার্বজনিক সভা নাম দিয়াছেন— বাঙালি কোনো-প্রকার চেষ্টা না করিয়া 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' নাম দিয়া নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছে। ইহাতে মারাঠি প্রভৃতি জাতির সহিত বাঙালির যেন একটা প্রভেদ লক্ষিত হয়— সেই প্রভেদে বাঙালির আন্তরিক ন্যাশনালত্বের দুর্বলতাই প্রমাণ করে।

'মহাজন' শব্দ বাংলায় একমাত্র অর্থে ব্যবহৃত হয়, অন্য অর্থে চলিবে না। 'সার্বজনিক' শব্দকে বিশেষ্য আকারে নেশন শব্দের প্রতিশব্দ করা যায় না। 'ফরাসি সর্বজন' শব্দ 'ফরাসি নেশন' শব্দের পরিবর্তে সংগত শুনিতে হয় না।

'মহাজন' শব্দ ত্যাগ করিয়া 'মহাজাতি' শব্দ গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু 'মহৎ' শব্দ মহত্ত্বসূচক বিশেষণরূপে অনেকস্থলেই নেশন শব্দের পূর্বে আবশ্যক হইতে পারে। সেরূপ স্থলে 'গ্রেট নেশন' বলিতে গেলে 'মহতী মহাজাতি' বলিতে হয় এবং

তাহার বিপরীত বুঝাইবার প্রয়োজন হইলে ‘ক্ষুদ্র মহাজাতি’ বলিয়া হাস্যভাজন হইবার সম্ভাবনা আছে।

কিন্তু নেশন শব্দটা অবিকৃত আকারে গ্রহণ করিতে আমি কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করি না। ভাবটা আমরা ইংরেজের কাছ হইতে পাইয়াছি, ভাষাটাও ইংরেজি রাখিয়া ঋণ স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। উপনিষদের ব্রহ্ম, শংকরের মায়া ও বুদ্ধের নির্বাণ শব্দ ইংরেজি রচনায় প্রায় ভাষান্তরিত হয় না, এবং না হওয়াই উচিত।

রেনাঁ বলেন, প্রাচীনকালে ‘নেশন’ ছিল না। ইজিপ্ট, চীন, প্রাচীন কালডিয়া, ‘নেশন’ জানিত না। আসিরীয়, পারসিক ও আলেকজাণ্ডারের সাম্রাজ্যকে কোনো নেশনের সাম্রাজ্য বলা যায় না।

রোম-সাম্রাজ্য নেশনের কাছাকাছি গিয়াছিল। কিন্তু সম্পূর্ণ নেশন বাঁধিতে না-বাঁধিতে বর্বর জাতির অভিঘাতে তাহা ভাঙিয়া টুকরা হইয়া গেল। এই সকল টুকরা বহু শতাব্দী ধরিয়া নানাপ্রকার সংঘাতে ক্রমে দানা বাঁধিয়া নেশন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং ফ্রান্স, ইংলণ্ড, জর্মানি ও রাশিয়া সকল নেশনের শীর্ষস্থানে মাথা তুলিয়াছে।

কিন্তু ইহারা নেশন কেন? সুইজারলাণ্ড তাহার বিবিধ জাতি ও ভাষাকে লইয়া কেন নেশন হইল। অষ্ট্রিয়া কেন কেবলমাত্র রাজ্য হইল, নেশন হইল না।

কোনো কোনো রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ্ বলেন, নেশনের মূল রাজা। কোনো বিজয়ী বীর প্রাচীনকালে লড়াই করিয়া দেশ জয় করেন, এবং দেশের লোক কালক্রমে তাহা ভুলিয়া যায়; সেই রাজবংশ কেন্দ্ররূপী হইয়া নেশন পাকাইয়া তোলে। ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, আয়ার্লাণ্ড পূর্বে এক ছিল না, তাহাদের এক হইবার কারণও ছিল না, রাজার প্রতাপে ক্রমে তাহারা এক হইয়া আসিয়াছে। নেশন হইতে ইটালির এত বিলম্ব করিবার কারণ এই যে, তাহার বিস্তর ছোটো ছোটো রাজার মধ্যে কেহ একজন মধ্যবর্তী হইয়া সমস্ত দেশে ঐক্যবিস্তার করিতে পারেন নাই।

কিন্তু এ নিয়ম সকল জায়গায় খাটে নাই। যে সুইজরলাণ্ড ও আমেরিকার ইউনাইটেড স্টেট্‌স ক্রমে ক্রমে সংযোগ সাধন করিতে করিতে বড়ো হইয়া উঠিয়াছে, তাহারা তো রাজবংশের সাহায্য পায় নাই।

রাজশক্তি নাই নেশন আছে, রাজশক্তি ধ্বংস হইয়া গেছে নেশন টিকিয়া আছে, এ দৃষ্টান্ত কাহারও অগোচর নাই। রাজার অধিকার সকল অধিকারের উচ্চে, এ-কথা এখন আর প্রচলিত নহে; এখন স্থির হইয়াছে ন্যাশনাল অধিকার রাজকীয় অধিকারের উপরে। এই ন্যাশনাল অধিকারের ভিত্তি কী, কোন্ লক্ষণের দ্বারা তাহাকে চেনা যাইবে?

অনেকে বলেন, জাতির অর্থাৎ raceএর ঐক্যই তাহার লক্ষণ। রাজা, উপরাজ ও রাষ্ট্রসভা কৃত্রিম এবং অধ্রুব, জাতি চিরদিন থাকিয়া যায়, তাহারই অধিকার খাটি।

কিন্তু, জাতিমিশ্রণ হয় নাই য়ুরোপে এমন দেশ নাই। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্মানি, ইটালি কোথাও বিশুদ্ধ জাতি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, এ-কথা সকলেই জানেন। কে টিউটন, কে কেল্ট, এখন তাহার মীমাংসা করা অসম্ভব। রাষ্ট্রনীতিতন্ত্রে জাতি-বিশুদ্ধির কোনো খোঁজ রাখে না। রাষ্ট্রতন্ত্রের বিধানে যে-জাতি এক ছিল, তাহারা ভিন্ন হইয়াছে, যাহারা ভিন্ন ছিল, তাহারা এক হইয়াছে।

ভাষাসম্বন্ধেও ওই কথা খাটে। ভাষার ঐক্যে ন্যাশনাল ঐক্যবন্ধনের সহায়তা করে, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহাতে এক করিবেই, এমন কোনো জবরদস্তি নাই। য়ুনাইটেড স্টেট্স ও ইংলণ্ডের ভাষা এক, স্পেন ও স্পানীয় আমেরিকার ভাষা এক, কিন্তু তাহারা এক নেশন নহে। অপর পক্ষে সুইজরলাণ্ডে তিনটা-চারিটা ভাষা আছে, তবু সেখানে এক নেশন। ভাষা অপেক্ষা মানুষের ইচ্ছাশক্তি বড়ো;—ভাষাবৈচিত্র্যসত্ত্বেও সমস্ত সুইজরলাণ্ডের ইচ্ছাশক্তি তাহাকে এক করিয়াছে।

তাহা ছাড়া, ভাষায় জাতির পরিচয় পাওয়া যায়, এ-কথাও ঠিক নয়। প্রুসিয়া আজ জর্মন বলে, কয়েক শতাব্দী পূর্বে স্লাভোনিক বলিত, ওয়েল্‌স ইংরেজি ব্যবহার করে, ইজিপ্ট আরবি ভাষায় কথা কহিয়া থাকে।

নেশন ধর্মমতের ঐক্যও মানে না। ব্যক্তিবিশেষ ক্যাথলিক, প্রটেস্টান্ট, য়িহুদি অথবা নাস্তিক, যাহাই হউক না কেন, তাহার ইংরেজ, ফরাসি বা জর্মন হইবার কোনো বাধা নাই।

বৈষয়িক স্বার্থের বন্ধন দৃঢ় বন্ধন, সন্দেহ নাই। কিন্তু রেনাঁর মতে সে-বন্ধন নেশন বাঁধিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। বৈষয়িক স্বার্থে মহাজনের পঞ্চায়েত-মণ্ডলী গড়িয়া তুলিতে পারে বটে; কিন্তু ন্যাশনালত্বের মধ্যে একটা ভাবের স্থান আছে— তাহার যেমন দেহ আছে, তেমনি অন্তঃকরণেরও অভাব নাই। মহাজন-পটিকে ঠিক মাতৃভূমি কেহ মনে করে না।

ভৌগোলিক অর্থাৎ প্রাকৃতিক সীমাবিভাগ নেশনের ভিন্নতাসাধনের একটা প্রধান হেতু, সে-কথা স্বীকার করিতেই হইবে। নদীস্রোতে জাতিকে বহন করিয়া লইয়া গেছে, পর্বতে তাহাকে বাধা দিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া কি কেহ ম্যাপে আঁকিয়া দেখাইয়া দিতে পারে, ঠিক কোন্ পর্যন্ত কোন্ নেশনের অধিকার নির্দিষ্ট হওয়া উচিত। মানবের ইতিহাসে প্রাকৃতিক সীমাই চূড়ান্ত নহে। ভূখণ্ডে, জাতিতে,

ভাষায় নেশন গঠন করে না। ভূখণ্ডের উপর যুদ্ধক্ষেত্র ও কর্মক্ষেত্রের পত্তন হইতে পারে, কিন্তু নেশনের অন্তঃকরণটুকু ভূখণ্ডে গড়ে না। জনসম্প্রদায় বলিতে যে পবিত্র পদার্থকে বুঝি, মনুষ্যই তাহার শ্রেষ্ঠ উপকরণ। সুগভীর ঐতিহাসিক মন্থনজাত নেশন একটি মানসিক পদার্থ, তাহা একটি মানসিক পরিবার, তাহা ভূখণ্ডের আকৃতির দ্বারা আবদ্ধ নহে।

দেখা গেল, জাতি, ভাষা, বৈষয়িক স্বার্থ, ধর্মের ঐক্য ও ভৌগোলিক সংস্থান, নেশন-নামক মানস পদার্থ সৃজনের মূল উপাদান নহে। তবে তাহার মূল উপাদান কী?

নেশন একটি সজীব সত্তা, একটি মানস পদার্থ। দুইটি জিনিস এই পদার্থের অন্তঃপ্রকৃতি গঠিত করিয়াছে। সেই দুটি জিনিস বস্তুত একই। তাহার মধ্যে একটি অতীতে অবস্থিত, আর একটি বর্তমানে। একটি হইতেছে সর্বসাধারণের প্রাচীন স্মৃতিসম্পদ; আর-একটি পরস্পর সম্মতি, একত্রে বাস করিবার ইচ্ছা,—যে অখণ্ড উত্তরাধিকার হস্তগত হইয়াছে তাহাকে উপযুক্ত ভাবে রক্ষা করিবার ইচ্ছা। মানুষ উপস্থিতমতো নিজেকে হাতে হাতে তৈরি করে না। নেশনও সেইরূপ সুদীর্ঘ অতীত কালের প্রয়াস, ত্যাগস্বীকার এবং নিষ্ঠা হইতে অভিব্যক্ত হইতে থাকে। আমরা অনেকটা পরিমাণে আমাদের পূর্বপুরুষের দ্বারা পূর্বেই গঠিত হইয়া আছি। অতীতের বীর্য, মহত্ত্ব, কীর্তি, ইহার উপরেই ন্যাশনাল ভাবের মূলপত্তন। অতীত কালে সর্বসাধারণের এক গৌরব, এবং বর্তমান কালে সর্বসাধারণের এক ইচ্ছা; পূর্বে একত্রে বড়ো কাজ করা, এবং পুনরায় একত্রে সেইরূপ কাজ করিবার সংকল্প; ইহাই জনসম্প্রদায়-গঠনের ঐকান্তিক মূল। আমরা যে-পরিমাণে ত্যাগস্বীকার করিতে সম্মত হইয়াছি এবং যে-পরিমাণে কষ্ট সহ্য করিয়াছি, আমাদের ভালোবাসা সেই পরিমাণে প্রবল হইবে। আমরা যে-বাড়ি নিজেরা গড়িয়া তুলিয়াছি এবং উত্তরবংশীয়দের হস্তে সমর্পণ করিব, সে-বাড়িকে আমরা ভালোবাসি। প্রাচীন স্পার্টার গানে আছে, "তোমরা যাহা ছিলে, আমরা তাহাই; তোমরা যাহা, আমরা তাহাই হইব।" এই অতি সরল কথাটি সর্বদেশের ন্যাশনাল গাথাস্বরূপ।

অতীতের গৌরবময় স্মৃতি ও সেই স্মৃতির অনুরূপ ভবিষ্যতের আদর্শ; একত্রে দুঃখ পাওয়া, আনন্দ করা, আশা করা; এইগুলিই আসল জিনিস, জাতি ও ভাষার বৈচিত্র্যসত্ত্বেও এগুলির মাহাত্ম্য বোঝা যায়— একত্রে মাসুলখানা-স্থাপন বা সীমান্তনির্ণয়ের অপেক্ষা ইহার মূল্য অনেক বেশি। একত্রে দুঃখ পাওয়ার কথা এইজন্য বলা হইয়াছে যে, আনন্দের চেয়ে দুঃখের বন্ধন দৃঢ়তর।

অতীতে সকলে মিলিয়া ত্যাগদুঃখ-স্বীকার এবং পুনর্বার সেইজন্য সকলে মিলিয়া

প্রস্তুত থাকিবার ভাব হইতে জনসাধারণকে যে একটি একীভূত নিবিড় অভিব্যক্তি দান করে, তাহাই নেশন। ইহার পশ্চাতে একটি অতীত আছে বটে, কিন্তু তাহার প্রত্যক্ষগম্য লক্ষণটি বর্তমানে পাওয়া যায়। তাহা আর কিছু নহে— সাধারণ সম্মতি, সকলে মিলিয়া একত্রে এক জীবন বহন করিবার সুস্পষ্টপরিব্যক্ত ইচ্ছা।

রেনাঁ বলিতেছেন, আমরা রাষ্ট্রতন্ত্র হইতে রাজার অধিকার ও ধর্মের আধিপত্য নির্বাসিত করিয়াছি, এখন বাকি কী রহিল? মানুষ, মানুষের ইচ্ছা, মানুষের প্রয়োজনসকল। অনেকে বলিবেন, ইচ্ছা জিনিসটা পরিবর্তনশীল, অনেক সময় তাহা অনিয়ন্ত্রিত, অশিক্ষিত,— তাহার হস্তে নেশনের ন্যাশনালিটির মতো প্রাচীন মহৎ সম্পদ রক্ষার ভার দিলে, ক্রমে যে সমস্ত বিশ্লিষ্ট হইয়া নষ্ট হইয়া যাইবে।

মানুষের ইচ্ছার পরিবর্তন আছে— কিন্তু পৃথিবীতে এমন কিছু আছে, যাহার পরিবর্তন নাই? নেশনরা অমর নহে। তাহাদের আদি ছিল, তাহাদের অন্তও ঘটিবে। হয়ত এই নেশনদের পরিবর্তে কালে এক য়ুরোপীয় সম্প্রদায় সংঘটিত হইতেও পারে। কিন্তু এখনো তাহার লক্ষণ দেখি না। এখনকার পক্ষে এই নেশনসকলের ভিন্নতাই ভালো, তাহাই আবশ্যক। তাহারাই সকলের স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছে— এক আইন, এক প্রভু হইলে, স্বাধীনতার পক্ষে সংকট।

বৈচিত্র্য এবং অনেক সময় বিরোধী প্রবৃত্তি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন নেশন সভ্যতাবিস্তার-কার্যে সহায়তা করিতেছে। মনুষ্যত্বের মহাসংগীতে প্রত্যেকে এক-একটি সুর যোগ করিয়া দিতেছে, সবটা একত্রে মিলিয়া বাস্তবলোকে যে একটি কল্পনাগম্য মহিমার সৃষ্টি করিতেছে, তাহা কাহারও একক চেষ্টার অতীত।

যাহাই হউক, রেনাঁ বলেন,— মানুষ জাতির, ভাষার, ধর্মমতের বা নদীপর্বতের দাস নহে। অনেকগুলি সংযতমনা ও ভাবোত্তপ্তহৃদয় মনুষ্যের মহাসংঘ যে একটি সচেতন চারিত্র সৃজন করে, তাহাই নেশন। সাধারণের মঙ্গলের জন্য ব্যক্তিবিশেষের ত্যাগস্বীকারের দ্বারা এই চারিত্র-চিত্র যতক্ষণ নিজের বল সপ্রমাণ করে, ততক্ষণ তাহাকে সাঁচ্চা বলিয়া জানা যায় এবং ততক্ষণ তাহার টিকিয়া থাকিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

রেনাঁর উক্তি শেষ করিলাম। এক্ষণে রেনাঁর সারগর্ভ বাক্যগুলি আমাদের দেশের প্রতি প্রয়োগ করিয়া আলোচনার জন্য প্রস্তুত হওয়া যাক।

ভারতবর্ষীয় সমাজ

তুরস্ক যে যে জায়গা দখল করিয়াছে, সেখানে রাজশাসন এক কিন্তু আর-কোনো ঐক্য নাই। সেখানে তুর্কি, গ্রীক, আর্মানি, শ্লাভ, কুর্দ, কেহ কাহারও সঙ্গে না মিশিয়া, এমন কি পরস্পরের সহিত ঝগড়া করিয়া কোনো মতে একত্রে আছে। যে-শক্তিতে এক করে, সেই শক্তিই সভ্যতার জননী— সেই শক্তি তুরস্করাজ্যের রাজলক্ষ্মীর মতো হইয়া এখনো আবির্ভূত হয় নাই।

প্রাচীন য়ুরোপে বর্বর জাতেরা রোমের প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যটাকে বাটোয়ারা করিয়া লইল। কিন্তু তাহারা আপন আপন রাজ্যের মধ্যে মিশিয়া গেল— কোথাও জোড়ের চিহ্ন রাখিল না। জেতা ও বিজিত ভাষায় ধর্মে সমাজে একাঙ্গ হইয়া এক-একটি নেশন কলেবর ধরিল। সেই যে মিলনশক্তির উদ্ভব হইল, সেটা নানাপ্রকার বিরোধের আঘাতে শক্ত হইয়া সুনির্দিষ্ট আকার ধরিয়া সুদীর্ঘকালে এক-একটি নেশনকে এক-একটি সভ্যতার আশ্রয় করিয়া তুলিয়াছে।

যে কোনো উপলক্ষ্যে হউক অনেক লোকের চিত্ত এক হইতে পারিলে তাহাতে মহৎ ফল ফলে। যে জনসম্প্রদায়ের মধ্যে সেই এক হইবার শক্তি স্বভাবতই কাজ করে, তাহাদের মধ্য হইতেই কোনো না কোনো প্রকার মহত্ত্ব অঙ্গধারণ করিয়া দেখা দেয়, তাহারাই সভ্যতাকে জন্ম দেয়, সভ্যতাকে পোষণ করে। বিচিত্রকে মিলিত করিবার শক্তিই সভ্যতার লক্ষণ। সভ্য য়ুরোপ জগতে সদ্ভাব বিস্তার করিয়া ঐক্যসেতু বাঁধিতেছে— বর্বর য়ুরোপ বিচ্ছেদ, বিনাশ, ব্যবধান সৃজন করিতেছে, সম্প্রতি চীনে তাহার প্রমাণ পাওয়া গেছে। চীনে কেন, আমরা ভারতবর্ষে য়ুরোপের সভ্যতা ও বর্বরতা উভয়েরই কাজ প্রত্যক্ষ করিতে পাই। সকল সভ্যতার মর্মস্থলে মিলনের উচ্চ আদর্শ বিরাজ করিতেছে বলিয়াই, সেই আদর্শমূলে বিচার করিয়া বর্বরতার বিচ্ছেদ-অভিঘাতগুলা দ্বিগুণ বেদনা ও অপমানের সহিত প্রত্যহ অনুভব করিয়া থাকি।

এই লোকচিত্তের একতা সব দেশে এক ভাবে সাধিত হয় না। এইজন্য য়ুরোপীয়ের ঐক্য ও হিন্দুর ঐক্য এক প্রকারের নহে, কিন্তু তাই বলিয়া হিন্দুর মধ্যে যে একটা ঐক্য নাই, সে-কথা বলা যায় না। সে-ঐক্যকে ন্যাশনাল ঐক্য না বলিতে পার,— কারণ নেশন ও ন্যাশনাল কথাটা আমাদের নহে, য়ুরোপীর ভাবের দ্বারা তাহার অর্থ সীমাবদ্ধ হইয়াছে।

প্রত্যেক জাতি নিজের বিশেষ ঐক্যকেই স্বভাবত সব চেয়ে বড়ো মনে করে।

যাহাতে তাহাকে আশ্রয় দিয়াছে ও বিরাট করিয়া তুলিয়াছে, তাহাকে সে মর্মে মর্মে বড়ো বলিয়া চিনিয়াছে, আর কোনো আশ্রয়কে সে আশ্রয় বলিয়া অনুভব করে না। এইজন্য য়ুরোপের কাছে ন্যাশনাল ঐক্য অর্থৎ রাষ্ট্রতন্ত্রমূলক ঐক্যই শ্রেষ্ঠ ; আমরাও য়ুরোপীয় গুরুর নিকট হইতে সেই কথা গ্রহণ করিয়া পূর্বপুরুষদিগের ন্যাশনাল ভাবের অভাবে লজ্জা বোধ করিতেছি।

সভ্যতার যে মহৎ গঠনকার্য— বিচিত্রকে এক করিয়া তোলা— হিন্দু তাহার কী করিয়াছে দেখিতে হইবে। এই এক করিবার শক্তি ও কার্যকে ন্যাশনাল নাম দাও বা যে-কোনো নাম দাও, তাহাতে কিছু আসে যায় না, মানুষ-বাঁধা লইয়াই বিষয়।

নানা যুদ্ধবিগ্রহ-রক্তপাতের পর য়ুরোপের সভ্যতা যাহাদিগকে এক নেশনে বাঁধিয়াছে, তাহারা সবর্ণ। ভাষা ও কাপড় এক হইয়া গেলেই তাহাদের আর কোনো প্রভেদ চোখে পড়িবার ছিল না। তাহাদের কে জেতা, কে জিত, সে-কথা ভুলিয়া যাওয়া কঠিন ছিল না। নেশন গড়িতে যেমন স্মৃতির দরকার, তেমনি বিস্মৃতির দরকার— নেশনকে বিচ্ছেদবিরোধের কথা যত শীঘ্র সম্ভব ভুলিতে হইবে। যেখানে দুই পক্ষের চেহারা এক, বর্ণ এক, সেখানে সকলপ্রকার বিচ্ছেদের কথা ভোলা সহজ— সেখানে একত্রে থাকিলে মিলিয়া যাওয়াই স্বাভাবিক।

অনেক যুদ্ধবিরোধের পরে হিন্দুসভ্যতা যাহাদিগকে এক করিয়া লইয়াছিল, তাহারা অসবর্ণ। তাহারা স্বভাবতই এক নহে। তাহাদের সঙ্গে আর্যজাতির বিচ্ছেদ শীঘ্র ভুলিবার উপায় ছিল না।

আমেরিকা-অস্ট্রেলিয়ায় কী ঘটিয়াছে ? য়ুরোপীয়গণ যখন সেখানে পদার্পণ করিল, তখন তাহারা খ্রীস্টান, শত্রুর প্রতি প্রীতি করিবার মন্ত্রে দীক্ষিত। কিন্তু আমেরিকা-অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদিগকে দেশ হইতে একেবারে উন্মূলিত না করিয়া তাহারা ছাড়ে নাই,—তাহাদিগকে পশুর মতো হত্যা করিয়াছে। আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় যে নেশন বাঁধিয়াছে, তাহার মধ্যে আদিম অধিবাসীরা মিশিয়া যাইতে পারে নাই।

হিন্দুসভ্যতা যে এক অত্যাশ্চর্য প্রকাণ্ড সমাজ বাঁধিয়াছে, তাহার মধ্যে স্থান পায় নাই এমন জাত নাই। প্রাচীন শকজাতীয় জাঠ ও রাজপুত ; মিশ্রজাতীয় নেপালী, আসামী, রাজবংশী ; দ্রাবিড়ী, তৈলঙ্গী, নায়ার,— সকলে আপন ভাষা, বর্ণ, ধর্ম ও আচারের নানা প্রভেদ সত্ত্বেও সুবিশাল হিন্দুসমাজের মধ্যে একটি বৃহৎ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া একত্রে বাস করিতেছে। হিন্দুসভ্যতা এত বিচিত্র লোককে আশ্রয় দিতে গিয়া নিজেকে নানাপ্রকারে বঞ্চিত করিয়াছে, কিন্তু তবু কাহাকেও পরিত্যাগ করে নাই— উচ্চ-নীচ, সবর্ণ-অসবর্ণ, সকলকেই ঘনিষ্ঠ করিয়া বাঁধিয়াছে, সকলকে ধর্মের আশ্রয়

দিয়াছে, সকলকে কর্তব্যপথে সংযত করিয়া শৈথিল্য ও অধঃপতন হইতে টানিয়া রাখিয়াছে।

রেনাঁ দেখাইয়াছেন, নেশনের মূল লক্ষণ কী, তাহা বাহির করা শক্ত। জাতির ঐক্য, ভাষার ঐক্য, ধর্মের ঐক্য, দেশের ভূসংস্থান, এ-সকলের উপরে ন্যাশনালত্বের একান্ত নির্ভর নহে। তেমনি হিন্দুত্বের মূল কোথায়, তাহা নির্ণয় করিয়া বলা শক্ত। নানা জাতি, নানা ভাষা, নানা ধর্ম, নানাপ্রকার বিরুদ্ধ আচার-বিচার হিন্দুসমাজের মধ্যে স্থান পাইয়াছে।

পরিধি যত বৃহৎ, তাহার কেন্দ্র খুঁজিয়া পাওয়া ততই শক্ত। হিন্দুসমাজের ঐক্যের ক্ষেত্র নিরতিশয় বৃহৎ, সেইজন্য এত বিশালত্ব ও বৈচিত্র্যের মধ্যে তাহার মূল আশ্রয়টি বাহির করা সহজ নহে।

এ-স্থলে আমাদের প্রশ্ন এই, আমরা প্রধানত কোন্ দিকে মন দিব? ঐক্যের কোন্ আদর্শকে প্রাধান্য দিব।

রাষ্ট্রনীতিক ঐক্যচেষ্টাকে উপেক্ষা করিতে পারি না। কারণ, মিলন যত প্রকারে হয় ততই ভালো। কন্‌গ্রেসের সভায় যাঁহারা উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারা ইহা অনুভব করিয়াছেন যে, সমস্তই যদি ব্যর্থ হয়, তথাপি মিলনই কন্‌গ্রেসের চরম ফল। এই মিলনকে যদি রক্ষা করিয়া চলি, তবে মিলনের উপলক্ষ্য বিফল হইলেও, ইহা নিজেকে কোনো না কোনো দিকে সার্থক করিবেই, দেশের পক্ষে কোন্‌টা মুখ্য ব্যাপার, তাহা আবিষ্কার করিবেই— যাহা বৃথা এবং ক্ষণিক, তাহা আপনি পরিহার করিবে।

কিন্তু এ-কথা আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, আমাদের দেশে সমাজ সকলের বড়ো। অন্য দেশে নেশন্ নানা বিপ্লবের মধ্যে আত্মরক্ষা করিয়া জয়ী হইয়াছে— আমাদের দেশে তদপেক্ষা দীর্ঘকাল সমাজ নিজেকে সকলপ্রকার সংকটের মধ্যে রক্ষা করিয়াছে। আমরা যে হাজার বৎসরের বিপ্লবে, উৎপীড়নে, পরাধীনতায়, অধঃপতনের শেষ সীমায় তলাইয়া যাই নাই, এখনো যে আমাদের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে সাধুতা ও ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে মনুষ্যত্বের উপকরণ রহিয়াছে, আমাদের আহারে সংযম এবং ব্যবহারে শীলতা প্রকাশ পাইতেছে, এখনো যে আমরা পদে পদে ত্যাগ স্বীকার করিতেছি, বহুদুঃখের ধনকে সকলের সঙ্গে ভাগ করিয়া ভোগ করাই শ্রেয় বলিয়া জানিতেছি, সাহেবের বেহারা সাত টাকা বেতনের তিন টাকা পেটে খাইয়া চার টাকা বাড়ি পাঠাইতেছে, পনেরো টাকা বেতনের মুহুরি নিজে আধমরা হইয়া ছোটো ভাইকে কলেজে পড়াইতেছে —সে কেবল আমাদের প্রাচীন সমাজের জোরে। এ সমাজ আমাদিগকে সুখকে

বড়ো করিয়া জানায় নাই— সকল কথাতেই, সকল কাজেই, সকল সম্পর্কেই, কেবল কল্যাণ, কেবল পুণ্য এবং ধর্মের মন্ত্র কানে দিয়াছে। সেই সমাজকেই আমাদের সর্বোচ্চ আশ্রয় বলিয়া তাহার প্রতিই আমাদের বিশেষ করিয়া দৃষ্টিক্ষেপ করা আবশ্যক।

কেহ কেহ বলিবেন, সমাজ তো আছেই, সে তো আমাদের পূর্বপুরুষ গড়িয়া রাখিয়াছেন, আমাদের কিছুই করিবার নাই।

এইখানেই আমাদের অধঃপতন হইয়াছে। এইখানেই বর্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতা বর্তমান হিন্দুসভ্যতাকে জিতিয়াছে।

য়ুরোপের নেশন একটি সজীব সত্তা। অতীতের সহিত নেশনের বর্তমানের যে কেবল জড় সম্বন্ধ, তাহা নহে— পূর্বপুরুষ প্রাণপাত করিয়া কাজ করিয়াছে এবং বর্তমান পুরুষ চোখ বুজিয়া ফলভোগ করিতেছে, তাহা নহে। অতীত-বর্তমানের মধ্যে নিরন্তর চিত্তের সম্বন্ধ আছে— অখণ্ড কর্মপ্রবাহ চলিয়া আসিতেছে। এক অংশ প্রবাহিত, আর-এক অংশ বদ্ধ, এক অংশ প্রজ্বলিত, অপরাংশ নির্বাপিত, এরূপ নহে। সে হইলে তো সম্বন্ধবিচ্ছেদ হইয়া গেল— জীবনের সহিত মৃত্যুর কী সম্পর্ক।

কেবলমাত্র অলস ভক্তিতে যোগসাধন করে না— বরং তাহাতে দূরে লইয়া যায়। ইংরেজ যাহা পরে, যাহা খায়, যাহা বলে, যাহা করে, সবই ভালো, এই ভক্তিতে আমাদিগকে অন্ধ অনুকরণে প্রবৃত্ত করে— তাহাতে আসল ইংরেজত্ব হইতে আমাদিগকে দূরে লইয়া যায়। কারণ ইংরেজ এরূপ নিরুদ্যম অনুকরণকারী নহে। ইংরেজ স্বাধীন চিন্তা ও চেষ্টার জোরেই বড়ো হইয়াছে— পরের গড়া জিনিস অলসভাবে ভোগ করিয়া তাহারা ইংরেজ হইয়া উঠে নাই। সুতরাং ইংরেজ সাজিতে গেলেই প্রকৃত ইংরেজত্ব আমাদের পক্ষে দুর্লভ হইবে।

তেমনি আমাদের পিতামহেরা যে বড়ো হইয়াছিলেন সে কেবল আমাদের প্রপিতামহদের কোলের উপরে নিশ্চলভাবে শয়ন করিয়া নহে। তাঁহারা ধ্যান করিয়াছেন, বিচার করিয়াছেন, পরীক্ষা করিয়াছেন, পরিবর্তন করিয়াছেন, তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি সচেষ্ট ছিল, সেইজন্যই তাঁহারা বড়ো হইতে পারিয়াছেন। আমাদের চিত্ত যদি তাঁহাদের সেই চিত্তের সহিত যোগযুক্ত না হয়, কেবল তাঁহাদের কৃতকর্মের সহিত আমাদের জড় সম্বন্ধ থাকে, তবে আমাদের আর ঐক্য নাই। পিতামাতার সহিত পুত্রের জীবনের যোগ আছে— তাঁহাদের মৃত্যু হইলেও জীবনক্রিয়া পুত্রের দেহে একই রকমে কাজ করে। কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষের মানসী শক্তি যেভাবে কাজ করিয়াছে,

আমাদের মনে যদি তাহার কোনো নিদর্শন না পাই— আমরা যদি কেবল তাঁহাদের অবিকল অনুকরণ করিয়া চলি, তবে বুঝিব আমাদের মধ্যে আমাদের পূর্বপুরুষ আর সজীব নাই। শণের দাড়ি-পরা যাত্রার নারদ যেমন দেবর্ষি নারদ, আমরাও তেমনি আর্য। আমরা একটা বড়ো রকমের যাত্রার দল— গ্রাম্যভাষায় এবং কৃত্রিম সাজ-সরঞ্জামে পূর্বপুরুষ সাজিয়া অভিনয় করিতেছি।

পূর্বপুরুষদের সেই চিত্তকে আমাদের জড় সমাজের উপর জাগাইয়া তুলিলে তবেই আমরা বড়ো হইব। আমাদের সমস্ত সমাজ যদি প্রাচীন মহৎ স্মৃতি ও বৃহৎ ভাবের দ্বারা আদ্যোপান্ত সজীব সচেষ্ট হইয়া উঠে, নিজের সমস্ত অঙ্গে প্রত্যঙ্গে বহুশতাব্দীর জীবনপ্রবাহ অনুভব করিয়া আপনাকে সবল ও সচল করিয়া তোলে, তবে রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা ও অন্য সকল দুর্গতি তুচ্ছ হইয়া যাইবে। সমাজের সচেষ্ট স্বাধীনতা অন্য সকল স্বাধীনতা হইতেই বড়ো।

জীবনের পরিবর্তন বিকাশ, মৃত্যুর পরিবর্তন বিকার। আমাদের সমাজেও দ্রুতবেগে পরিবর্তন চলিতেছে, কিন্তু সমাজের অভ্যন্তরে সচেতন অন্তঃকরণ নাই বলিয়া সে-পরিবর্তন বিকার ও বিশ্লেষণের দিকে যাইতেছে— কেহ তাহা ঠেকাইতে পারিতেছে না।

সজীব পদার্থ সচেষ্টভাবে বাহিরের অবস্থাকে নিজের অনুকূল করিয়া আনে— আর নির্জীব পদার্থকে বাহিরের অবস্থাই সবলে আঘাত করিয়া নিজের আয়ত্ত করিয়া লয়। আমাদের সমাজে যাহা কিছু পরিবর্তন হইতেছে, তাহাতে চেতনার কার্য নাই; তাহাতে বাহিরের সঙ্গে ভিতরের সঙ্গে কোনো সামঞ্জস্যচেষ্টা নাই— বাহির হইতে পরিবর্তন ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িতেছে এবং সমাজের সমস্ত সন্ধি শিথিল করিয়া দিতেছে।

নূতন অবস্থা, নূতন শিক্ষা, নূতন জাতির সহিত সংঘর্ষ— ইহাকে অস্বীকার করা যায় না। আমরা যদি এমনভাবে চলিতে ইচ্ছা করি, যেন ইহারা নাই, যেন আমরা তিন সহস্র বৎসর পূর্বে বসিয়া আছি, তবে সেই তিন সহস্র বৎসর পূর্বকার অবস্থা আমাদিগকে কিছুমাত্র সাহায্য করিবে না এবং বর্তমান পরিবর্তনের বন্যা আমাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। আমরা বর্তমানকে স্বীকারমাত্র না করিয়া পূর্বপুরুষের দোহাই মানিলে তো পূর্বপুরুষ সাড়া দিবেন না। আমাদের পূর্বপুরুষ আমাদের দোহাই পাড়িয়া বলিতেছেন, "বর্তমানের সহিত সন্ধি করিয়া আমাদের কীর্তিকে রক্ষা করো, তাহার প্রতি অন্ধ হইয়া ইহাকে সমূলে ধ্বংস হইতে দিয়ো না। আমাদের ভাবসূত্রটিকে রক্ষা করিয়া সচেতনভাবে এক কালের সহিত আর-এক কালকে মিলাইয়া লও, নহিলে সূত্র আপনি ছিন্ন হইয়া যাইবে।"

কী করিতে হইবে ? নেশনের প্রত্যেকে ন্যাশনাল স্বার্থ রক্ষার জন্য নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়া থাকে। যে-সময় হিন্দুসমাজ সজীব ছিল, তখন সমাজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমস্ত সমাজ-কলেবরের স্বার্থকেই নিজের একমাত্র স্বার্থ জ্ঞান করিত। রাজা সমাজেরই অঙ্গ ছিলেন, সমাজ সংরক্ষণ ও চালনার ভার ছিল তাঁহার উপর— ব্রাহ্মণ সমাজের মধ্যে সমাজধর্মের বিশুদ্ধ আদর্শকে উজ্জ্বল ও চিরস্থায়ী করিয়া রাখিবার জন্য নিযুক্ত ছিলেন— তাঁহাদের ধ্যানজ্ঞান শিক্ষাসাধনা সমস্তই সমাজের সম্পত্তি ছিল। গৃহস্থই সমাজের স্তম্ভ বলিয়া গৃহাশ্রম এমন গৌরবের বলিয়া গণ্য হইত। সেই গৃহকে জ্ঞানে, ধর্মে, ভাবে, কর্মে সমুন্নত রাখিবার জন্য সমাজের বিচিত্র শক্তি বিচিত্র দিকে সচেষ্টভাবে কাজ করিত। তখনকার নিয়ম তখনকার অনুষ্ঠান তখনকার কালের হিসাবে নিরর্থক ছিল না।'

এখন সেই নিয়ম আছে, সেই চেতনা নাই। সমস্ত সমাজের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সচেষ্টতা নাই। আমাদের পূর্বপুরুষের সেই নিয়ত-জাগ্রত মঙ্গলের ভাবটিকে হৃদয়ের মধ্যে প্রাণবৎরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সমাজের সর্বত্র তাহাকে প্রয়োগ করি, তবেই বিপুল হিন্দুসভ্যতাকে পুনর্বার প্রাপ্ত হইব। সমাজকে শিক্ষাদান, স্বাস্থ্যদান, অন্নদান, ধনসম্পদ-দান, ইহা আমাদের নিজের কর্ম; ইহাতেই আমাদের মঙ্গল,—ইহাকে বাণিজ্যহিসাবে দেখা নহে, ইহার বিনিময়ে পুণ্য ও কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই আশা না করা, ইহাই যজ্ঞ, ইহাই ব্রহ্মের সহিত কর্মযোগ, এই কথা নিয়ত স্মরণ করা, ইহাই হিন্দুত্ব। স্বার্থের আদর্শকেই মানবসমাজের কেন্দ্রস্থলে না স্থাপন করিয়া, ব্রহ্মের মধ্যে মানবসমাজকে নিরীক্ষণ করা, ইহাই হিন্দুত্ব। ইহাতে পশু হইতে মনুষ্য পর্যন্ত সকলেরই প্রতি কল্যাণভাব পরিব্যাপ্ত হইয়া যায় এবং নিয়ত অভ্যাসে স্বার্থ পরিহার করা নিশ্বাসত্যাগের ন্যায় সহজ হইয়া আসে। সমাজের নিচে হইতে উপর পর্যন্ত সকলকে একটি বৃহৎ নিঃস্বার্থ কল্যাণবন্ধনে বাঁধা, ইহাই আমাদের সকল চেষ্টার অপেক্ষা বড়ো চেষ্টার বিষয়। এই ঐক্যসূত্রেই হিন্দুসম্প্রদায়ের একের সহিত অন্যের এবং বর্তমানের সহিত অতীতের ধর্মযোগ সাধন করিতে হইবে। আমাদের মনুষ্যত্বলাভের এই একমাত্র উপায়। রাষ্ট্রনীতিক চেষ্টায় যে কোনো ফল নাই, তাহা নহে; কিন্তু সে-চেষ্টা আমাদের সামাজিক ঐক্যসাধনে কিয়দ্দূর সহায়তা করিতে পারে, এই তাহার প্রধান গৌরব।

স্বদেশী সমাজ

বাংলাদেশের জলকষ্ট নিবারণ সম্বন্ধে গবর্মেন্টের মন্তব্য প্রকাশিত হইলে পর এই প্রবন্ধ লিখিত হয়।

“সুজলা সুফলা” বঙ্গভূমি তৃষিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সে চাতক পক্ষীর মতো ঊর্ধ্বের দিকে তাকাইয়া আছে— কর্তৃপক্ষীয়েরা জলবর্ষণের ব্যবস্থা না করিলে তাহার আর গতি নাই।

গুরুগুরু মেঘগর্জন শুরু হইয়াছে— গবর্মেণ্ট সাড়া দিয়াছেন— তৃষ্ণানিবারণের যা-হয়-একটা উপায় হয়তো হইবে— অতএব আপাতত আমরা সেজন্য উদ্‌বেগ প্রকাশ করিতে বসি নাই।

আমাদের চিন্তার বিষয় এই যে, পূর্বে আমাদের যে একটি ব্যবস্থা ছিল, যাহাতে সমাজ অত্যন্ত সহজ নিয়মে আপনার সমস্ত অভাব আপনিই মিটাইয়া লইত— দেশে তাহার কি লেশমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে না।

আমাদের যে-সকল অভাব বিদেশীরা গড়িয়া তুলিয়াছে ও তুলিতেছে, সেইগুলাই না হয় বিদেশী পূরণ করুক। অন্নক্লিষ্ট ভারতবর্ষের চায়ের তৃষ্ণা জন্মাইয়া দিবার জন্য কর্জনসাহেব উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, আচ্ছা, না হয় অ্যাণ্ড্রয়ুল্‌-সম্প্রদায় আমাদের চায়ের বাটি ভর্তি করিতে থাকুন; এবং এই চায়ের চেয়েও যে জ্বালাময় তরলরসের তৃষ্ণা— যাহা প্রলয়কালের সূর্যাস্তচ্ছটার ন্যায় বিচিত্র উজ্জ্বল দীপ্তিতে উত্তরোত্তর আমাদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া তুলিতেছে— তাহা পশ্চিমের সামগ্রী এবং পশ্চিমদিগদেবী তাহার পরিবেষণের ভার লইলে অসংগত হয় না— কিন্তু জলের তৃষ্ণা তো স্বদেশের খাঁটি সনাতন জিনিস! ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট আসিবার পূর্বে আমাদের জলপিপাসা ছিল এবং এতকাল তাহার নিবৃত্তির উপায় বেশ ভালোরূপেই হইয়া আসিয়াছে— এজন্য শাসনকর্তাদের রাজদণ্ডকে কোনোদিন তো চঞ্চল হইয়া উঠিতে হয় নাই।

আমাদের দেশে যুদ্ধবিগ্রহ, রাজ্যরক্ষা এবং বিচারকার্য রাজা করিয়াছেন, কিন্তু বিদ্যাদান হইতে জলদান পর্যন্ত সমস্তই সমাজ এমন সহজভাবে সম্পন্ন করিয়াছে যে, এত নব নব শতাব্দীতে এত নব নব রাজার রাজত্ব আমাদের দেশের উপর দিয়া বন্যার মতো বহিয়া গেল, তবু আমাদের ধর্ম নষ্ট করিয়া আমাদিগকে পশুর মতো করিতে পারে নাই, সমাজ নষ্ট করিয়া আমাদিগকে একেবারে লক্ষ্মীছাড়া করিয়া দেয় নাই। রাজায় রাজায় লড়াইয়ের অন্ত নাই— কিন্তু আমাদের মর্মরায়মাণ বেণুকুঞ্জে, আমাদের

আমকাঁঠালের বনচ্ছায়ায় দেবায়তন উঠিতেছে, অতিথিশালা স্থাপিত হইতেছে, পুষ্করিণী-খনন চলিতেছে, গুরুমহাশয় শুভংকরী কষাইতেছেন, টোলে শাস্ত্র-অধ্যাপনা বন্ধ নাই, চণ্ডীমণ্ডপে রামায়ণপাঠ হইতেছে এবং কীর্তনের আরাবে পল্লীর প্রাঙ্গণ মুখরিত। সমাজ বাহিরের সাহায্যের অপেক্ষা রাখে নাই এবং বাহিরের উপদ্রবে শ্রীভ্রষ্ট হয় নাই।

দেশে এই যে সমস্ত লোকহিতকর মঙ্গলকর্ম ও আনন্দ-উৎসব এতকাল অব্যাহত ভাবে সমস্ত ধনিদরিদ্রকে ধন্য করিয়া আসিয়াছে, এজন্য কি চাঁদার খাতা কুক্ষিগত করিয়া উৎসাহী লোকদিগকে দ্বারে দ্বারে মাথা খুঁড়িয়া মরিতে হইয়াছে, না, রাজপুরুষদিগকে সুদীর্ঘ মন্তব্যসহ পরোয়ানা বাহির করিতে হইয়াছে! নিশ্বাস লইতে যেমন আমাদের কাহাকেও হাতে-পায়ে ধরিতে হয় না, রক্তচলাচলের জন্য যেমন টৌনহল-মীটিং অনাবশ্যক— সমাজের সমস্ত অত্যাবশ্যক হিতকর ব্যাপার সমাজে তেমনি অত্যন্ত স্বাভাবিক নিয়মে ঘটিয়া আসিয়াছে।

আজ আমাদের দেশে জল নাই বলিয়া যে আমরা আক্ষেপ করিতেছি, সেটা সামান্য কথা। সকলের চেয়ে গুরুতর শোকের বিষয় হইয়াছে, তাহার মূল কারণটা। আজ সমাজের মনটা সমাজের মধ্যে নাই। আমাদের সমস্ত মনোযোগ বাহিরের দিকে গিয়াছে।

কোনো নদী যে-গ্রামের পার্শ্ব দিয়া বরাবর বহিয়া আসিয়াছে, সে যদি একদিন সে-গ্রামকে ছাড়িয়া অন্যত্র তাহার স্রোতের পথ লইয়া যায়, তবে সে-গ্রামের জল নষ্ট হয়, ফল নষ্ট হয়, স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, বাণিজ্য নষ্ট হয়, তাহার বাগান জঙ্গল হইয়া পড়ে, তাহার পূর্বসমৃদ্ধির ভগ্নাবশেষ আপন দীর্ণ ভিত্তির ফাটলে ফাটলে বট-অশ্বত্থকে প্রশ্রয় দিয়া পেচক-বাদুড়ের বিহারস্থল হইয়া উঠে।

মানুষের চিত্তস্রোত নদীর চেয়ে সামান্য জিনিস নহে। সেই চিত্তপ্রবাহ চিরকাল বাংলার ছায়াশীতল গ্রামগুলিকে অনাময় ও আনন্দিত করিয়া রাখিয়াছিল— এখন বাংলার সেই পল্লীক্রোড় হইতে বাঙালির চিত্তধারা বিক্ষিপ্ত হইয়া গেছে। তাই তাহার দেবালয় জীর্ণপ্রায়— সংস্কার করিয়া দিবার কেহ নাই, তাহার জলাশয়গুলি দূষিত— পঙ্কোদ্ধার করিবার কেহ নাই, সমৃদ্ধ ঘরের অট্টালিকাগুলি পরিত্যক্ত— সেখানে উৎসবের আনন্দধ্বনি উঠে না। কাজেই এখন জলদানের কর্তা সরকার বাহাদুর, স্বাস্থ্যদানের কর্তা সরকার বাহাদুর, বিদ্যাদানের ব্যবস্থার জন্যও সরকার বাহাদুরের দ্বারে গলবস্ত্র হইয়া ফিরিতে হয়। যে-গাছ আপনার ফুল আপনি ফুটাইত, সে আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টির জন্য তাহার সমস্ত শীর্ণ শাখাপ্রশাখা উপরে তুলিয়া

দরখাস্ত জারি করিতেছে। না হয় তাহার দরখাস্ত মঞ্জুর হইল, কিন্তু এই-সমস্ত আকাশকুসুম লইয়া তাহার সার্থকতা কী?

ইংরেজিতে যাহাকে স্টেট বলে, আমাদের দেশে আধুনিক ভাষায় তাহাকে বলে সরকার। এই সরকার প্রাচীন ভারতবর্ষে রাজশক্তি আকারে ছিল। কিন্তু বিলাতের স্টেটের সঙ্গে আমাদের রাজশক্তির প্রভেদ আছে। বিলাত, দেশের সমস্ত কল্যাণকর্মের ভার স্টেটের হাতে সমর্পণ করিয়াছে— ভারতবর্ষ তাহা আংশিকভাবে মাত্র করিয়াছিল।

দেশের যাঁহারা গুরুস্থানীয় ছিলেন, যাঁহারা সমস্ত দেশকে বিনা বেতনে বিদ্যাশিক্ষা ধর্মশিক্ষা দিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদিগকে পালন করা পুরস্কৃত করা যে রাজার কর্তব্য ছিল না তাহা নহে— কিন্তু কেবল আংশিক ভাবে; বস্তুত সাধারণত সে কর্তব্য প্রত্যেক গৃহীর। রাজা যদি সাহায্য বন্ধ করেন, হঠাৎ যদি দেশ অরাজক হইয়া আসে, তথাপি সমাজের বিদ্যাশিক্ষা ধর্মশিক্ষা একান্ত ব্যাঘাতপ্রাপ্ত হয় না। রাজা যে প্রজাদের জন্য দীঘিকা খনন করিয়া দিতেন না, তাহা নহে— কিন্তু সমাজের সম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই যেমন দিত, তিনিও তেমনি দিতেন। রাজা অমনোযোগী হইলেই দেশের জলপাত্র রিক্ত হইয়া যাইত না।

বিলাতে প্রত্যেকে আপন আরাম-আমোদ ও স্বার্থসাধনে স্বাধীন— তাহারা কর্তব্যভারে আক্রান্ত নহে— তাহাদের সমস্ত বড়ো বড়ো কর্তব্যভার রাজশক্তির উপর স্থাপিত। আমাদের দেশে রাজশক্তি অপেক্ষাকৃত স্বাধীন— প্রজাসাধারণ সামাজিক কর্তব্যদ্বারা আবদ্ধ। রাজা যুদ্ধ করিতে যান, শিকার করিতে যান, রাজকার্য করুন বা আমোদ করিয়া দিন কাটান, সেজন্য ধর্মের বিচারে তিনি দায়ী হইবেন— কিন্তু জনসাধারণ নিজের মঙ্গলের জন্য তাঁহার উপরে নিতান্ত নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকে না— সমাজের কাজ সমাজের প্রত্যেকের উপরেই আশ্চর্যরূপে বিচিত্ররূপে ভাগ করা রহিয়াছে।

এইরূপ থাকাতে আমরা ধর্ম বলিতে যাহা বুঝি, তাহা সমাজের সর্বত্র সঞ্চারিত হইয়া আছে। আমাদের প্রত্যেককেই স্বার্থসংযম ও আত্মত্যাগচর্চা করিতে হইয়াছে। আমরা প্রত্যেকেই ধর্মপালন করিতে বাধ্য।

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে, ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার প্রাণশক্তি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত। সাধারণের কল্যাণভার যেখানেই পুঞ্জিত হয়, সেইখানেই দেশের মর্মস্থান। সেইখানে আঘাত করিলেই সমস্ত দেশ সাংঘাতিকরূপে আহত হয়। বিলাতে রাজশক্তি যদি বিপর্যস্ত হয়, তবে সমস্ত দেশের বিনাশ উপস্থিত হয়।

এইজন্যই য়ুরোপে পলিটিক্স এত অধিক গুরুতর ব্যাপার। আমাদের দেশে সমাজ যদি পঙ্গু হয়, তবেই যথার্থভাবে দেশের সংকটাবস্থা উপস্থিত হয়। এইজন্য আমরা এতকাল রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ করি নাই কিন্তু সামাজিক স্বাধীনতা সর্বতোভাবে বাঁচাইয়া আসিয়াছি। নিঃস্বকে ভিক্ষাদান হইতে সাধারণকে ধর্মশিক্ষাদান এ সমস্ত বিষয়েই বিলাতে স্টেটের উপর নির্ভর— আমাদের দেশে ইহা জনসাধারণের ধর্মব্যবস্থার উপরে প্রতিষ্ঠিত— এইজন্য ইংরেজ স্টেটকে বাঁচাইলেই বাঁচে, আমরা ধর্মব্যবস্থাকে বাঁচাইলেই বাঁচিয়া যাই।

ইংলণ্ডে স্বভাবতই স্টেটকে জাগ্রত রাখিতে সচেষ্ট রাখিতে জনসাধারণ সর্বদাই নিযুক্ত। সম্প্রতি আমরা ইংরেজের পাঠশালায় পড়িয়া স্থির করিয়াছি, অবস্থানির্বিচারে গভর্মেণ্টকে খোঁচা মারিয়া মনোযোগী করাই জনসাধারণের সর্বপ্রধান কর্তব্য। ইহা বুঝিলাম না যে, পরের শরীরে নিয়তই বেলেস্ত্রা লাগাইতে থাকিলে নিজের ব্যাধির চিকিৎসা করা হয় না।

আমরা তর্ক করিতে ভালোবাসি, অতএব এ তর্ক এখানে ওঠা অসম্ভব নহে যে, সাধারণের কর্মভার সাধারণের সর্বাঙ্গেই সঞ্চারিত হইয়া থাকা ভালো, না, তাহা বিশেষভাবে সরকারনামক একটা জায়গায় নির্দিষ্ট হওয়া ভালো। আমার বক্তব্য এই যে, এ তর্ক বিদ্যালয়ের ডিবেটিং ক্লাবে করা যাইতে পারে, কিন্তু আপাতত এ তর্ক আমাদের কোনো কাজে লাগিবে না।

কারণ, এ-কথা আমাদিগকে বুঝিতেই হইবে, বিলাতরাজ্যের স্টেট সমস্ত সমাজের সম্মতির উপরে অবিচ্ছিন্নরূপে প্রতিষ্ঠিত— তাহা সেখানকার স্বাভাবিক নিয়মেই অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। শুদ্ধমাত্র তর্কের দ্বারা আমরা তাহা লাভ করিতে পারিব না— অত্যন্ত ভালো হইলেও তাহা আমাদের অনধিগম্য।

আমাদের দেশে সরকারবাহাদুর সমাজের কেহই নন, সরকার সমাজের বাহিরে। অতএব যে-কোনো বিষয় তাঁহার কাছ হইতে প্রত্যাশা করিব, তাহা স্বাধীনতার মূল্য দিয়া লাভ করিতে হইবে। যে-কর্ম সমাজ সরকারের দ্বারা করাইয়া লইবে, সেই কর্মসম্বন্ধে সমাজ নিজেকে অকর্মণ্য করিয়া তুলিবে। অথচ এই অকর্মণ্যতা আমাদের দেশের স্বভাবসিদ্ধ ছিল না। আমরা নানা জাতির, নানা রাজার অধীনতাপাশ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু সমাজ চিরদিন আপনার সমস্ত কাজ আপনি নির্বাহ করিয়া আসিয়াছে, ক্ষুদ্রবৃহৎ কোনো বিষয়েই বাহিরের অন্য কাহাকেও হস্তক্ষেপ করিতে দেয় নাই। সেইজন্য রাজশ্রী যখন দেশ হইতে নির্বাসিত, সমাজলক্ষ্মী তখনো বিদায় গ্রহণ করেন নাই।

আজ আমরা সমাজের সমস্ত কর্তব্য নিজের চেষ্টায় একে একে সমাজবহির্ভূক্ত স্টেটের হাতে তুলিয়া দিবার জন্য উদ্যত হইয়াছি। এমন কি, আমাদের সামাজিক প্রথাকেও ইংরেজের আইনের দ্বারাই আমরা অপরিবর্তনীয়রূপে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিতে দিয়াছি— কোনো আপত্তি করি নাই। এ-পর্যন্ত হিন্দুসমাজের ভিতরে থাকিয়া নব নব সম্প্রদায় আপনাদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ আচারবিচারের প্রবর্তন করিয়াছে, হিন্দুসমাজ তাহাদিগকে তিরস্কৃত করে নাই। আজ হইতে সমস্তই ইংরেজের আইনে বাঁধিয়া গেছে— পরিবর্তনমাত্রেই আজ নিজেকে অহিন্দু বলিয়া ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, যেখানে আমাদের মর্মস্থান— যে মর্মস্থানকে আমরা নিজের অন্তরের মধ্যে সযত্নে রক্ষা করিয়া এতদিন বাঁচিয়া আসিয়াছি, সেই আমাদের অন্তরতম মর্মস্থান— আজ অনাবৃত অবারিত হইয়া পড়িয়াছে, সেখানে আজ বিকলতা আক্রমণ করিয়াছে। ইহাই বিপদ, জলকষ্ট বিপদ নহে।

পূর্বে যাঁহারা বাদশাহের দরবারে রায়রায়াঁ হইয়াছেন, নবাবরা যাঁহাদের মন্ত্রণা ও সহায়তার জন্য অপেক্ষা করিতেন, তাঁহারা এই রাজপ্রসাদকে যথেষ্ট জ্ঞান করিতেন না— সমাজের প্রসাদ রাজপ্রসাদের চেয়ে তাঁহাদের কাছে উচ্চে ছিল। তাঁহারা প্রতিপত্তিলাভের জন্য নিজের সমাজের দিকে তাকাইতেন। রাজরাজেশ্বরের রাজধানী দিল্লি তাঁহাদিগকে যে-সম্মান দিতে পারে নাই, সেই চরম সম্মানের জন্য তাঁহাদিগকে অখ্যাত জন্মপল্লীর কুটিরদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইতে হইত। দেশের সামান্য লোকেও বলিবে মহদাশয় ব্যক্তি, ইহা সরকারদত্ত রাজা মহারাজা উপাধির চেয়ে তাঁহাদের কাছে বড়ো ছিল। জন্মভূমির সম্মান ইঁহারা অন্তরের সহিত বুঝিয়াছিলেন— রাজধানীর মাহাত্ম্য, রাজসভার গৌরব ইঁহাদের চিত্তকে নিজের পল্লী হইতে বিক্ষিপ্ত করিতে পারে নাই। এইজন্য দেশের অখ্যাত গ্রামেও কোনোদিন জলের কষ্ট হয় নাই, এবং মনুষ্যত্বচর্চার সমস্ত ব্যবস্থা পল্লীতে পল্লীতে সর্বত্রই রক্ষিত হইত।

দেশের লোক ধন্য বলিবে, ইহাতে আজ আমাদের সুখ নাই; কাজেই দেশের দিকে আমাদের চেষ্টার স্বাভাবিক গতি নহে।

এখন সরকারের নিকট হইতে হয় ভিক্ষা, নয় তাগিদ দরকার হইয়া পড়িয়াছে। এখন দেশের জলকষ্ট-নিবারণের জন্য গবর্মেণ্ট দেশের লোককে তাগিদ দিতেছেন— স্বাভাবিক তাগিদগুলা সব বন্ধ হইয়া গেছে। দেশের লোকের নিকটে খ্যাতি, তাহাও রোচে না। আমাদের হৃদয় যে গোরার কাছে দাসখত লিখিয়া দিয়াছে, আমাদের রুচি যে সাহেবের দোকানে বিকাইয়া গেল!

আমাকে ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা আছে। আমি এ-কথা বলিতেছি না যে,

সকলেই আপন আপন পল্লীর মাটি আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাক্, বিদ্যা ও ধনমান অর্জনের জন্য বাহিরে যাইবার জন্য কোনো প্রয়োজন নাই। যে আকর্ষণে বাঙালিজাতটাকে বাহিরে টানিতেছে, তাহার কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেই হইবে— তাহাতে বাঙালির সমস্ত শক্তিকে উদ্‌বোধিত করিয়া তুলিতেছে এবং বাঙালির কর্মক্ষেত্রকে ব্যাপক করিয়া তাহার চিত্তকে বিস্তীর্ণ করিতেছে।

কিন্তু এই সময়েই বাঙালিকে নিয়ত স্মরণ করাইয়া দেওয়া দরকার যে, ঘর ও বাহিরের যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ, তাহা যেন একেবারে উল্‌টাপাল্‌টা হইয়া না যায়। বাহিরে অর্জন করিতে হইবে, ঘরে সঞ্চয় করিবার জন্যই। বাহিরে শক্তি খাটাইতে হইলেও হৃদয়কে আপনার ঘরে রাখিতে হইবে। শিক্ষা করিব বাহিরে, প্রয়োগ করিব ঘরে। কিন্তু আমরা আজকাল—

ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর,
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর।

এইজন্য কবিকথিত "স্রোতের সেঁওলি"র মতো ভাসিয়াই চলিয়াছি।

কিন্তু বাঙালির চিত্ত ঘরের মুখ লইয়াছে,— নানা দিক হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কেবল যে স্বদেশের শাস্ত্র আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছে এবং স্বদেশী ভাষা স্বদেশী সাহিত্যের দ্বারা অলংকৃত হইয়া উঠিতেছে, তাহা নহে,— স্বদেশের শিল্পদ্রব্য আমাদের কাছে আদর পাইতেছে, স্বদেশের ইতিহাস আমাদের গবেষণাবৃত্তিকে জাগ্রত করিতেছে, রাজদ্বারে ভিক্ষাযাত্রার জন্য যে পাথেয় সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহা প্রত্যহই একটু একটু করিয়া আমাদিগকে গৃহদ্বারে পৌঁছাইয়া দিবারই সহায়তা করিতেছে।

এমন অবস্থায় দেশের কাজ প্রকৃতভাবে আরম্ভ হইয়াছে, বলিতে হইবে। এখন কতকগুলি অদ্ভুত অসংগতি আমাদের চোখে ঠেকিবে এবং তাহা সংশোধন করিয়া লইতে হইবে। প্রোভিন্‌শাল কন্‌ফারেন্সই তাহার একটি উৎকট দৃষ্টান্ত। এ কনফারেন্স দেশকে মন্ত্রণা দিবার জন্য সমবেত, অথচ ইহার ভাষা বিদেশী। আমরা ইংরেজি-শিক্ষিতকেই আমাদের নিকটের লোক বলিয়া জানি— আপামর সাধারণকে আমাদের সঙ্গে অন্তরে অন্তরে এক করিতে না পারিলে যে আমরা কেহই নহি, এ-কথা কিছুতেই আমাদের মনে হয় না। সাধারণের সঙ্গে আমরা একটা দুর্ভেদ্য পার্থক্য তৈরি করিয়া তুলিতেছি। বরাবর তাহাদিগকে আমাদের সমস্ত আলাপ-আলোচনার বাহিরে খাড়া করিয়া রাখিয়াছি। আমরা গোড়াগুড়ি বিলাতের

হৃদয়হরণের জন্য ছলবলকৌশল সাজসরঞ্জামের বাকি কিছুই রাখি নাই— কিন্তু দেশের হৃদয় যে তদপেক্ষা মহামূল্য এবং তাহার জন্যও যে বহুতর সাধনার আবশ্যক, এ-কথা আমরা মনেও করি নাই।

পোলিটিক্যাল সাধনার চরম উদ্দেশ্য একমাত্র দেশের হৃদয়কে এক করা। কিন্তু দেশের ভাষা ছাড়িয়া, দেশের প্রথা ছাড়িয়া, কেবলমাত্র বিদেশীয় হৃদয় আকর্ষণের জন্য বহুবিধ আয়োজনকেই মহোপকারী পোলিটিক্যাল শিক্ষা বলিয়া গণ্য করা আমাদেরই হতভাগ্য দেশে প্রচলিত হইয়াছে।

দেশের হৃদয়লাভকেই যদি চরম লাভ বলিয়া স্বীকার করি, তবে সাধারণ কার্যকলাপে যে-সমস্ত চালচলনকে আমরা অত্যাবশ্যক বলিয়া অভ্যাস করিয়া ফেলিয়াছি, সে-সমস্তকে দূরে রাখিয়া দেশের যথার্থ কাছে যাইবার কোন্ কোন্ পথ চিরদিন খোলা আছে, সেইগুলিকে দৃষ্টির সম্মুখে আনিতে হইবে। মনে করো, প্রোভিন্‌শ্যাল কনফারেন্সকে যদি আমরা যথার্থই দেশের মন্ত্রণার কার্যে নিযুক্ত করিতাম, তবে আমরা কী করিতাম? তাহা হইলে আমরা বিলাতি ধাঁচের একটা সভা না বানাইয়া দেশী ধরনের একটা বৃহৎ মেলা করিতাম। সেখানে যাত্রা-গান-আমোদ-আহ্লাদে দেশের লোক দূরদূরান্তর হইতে একত্র হইত। সেখানে দেশী পণ্য ও কৃষিদ্রব্যের প্রদর্শনী হইত। সেখানে ভালো কথক, কীর্তন-গায়ক ও যাত্রার দলকে পুরস্কার দেওয়া হইত। সেখানে ম্যাজিক লণ্ঠন প্রভৃতির সাহায্যে সাধারণ লোকদিগকে স্বাস্থ্যতত্ত্বের উপদেশ সুস্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইত এবং আমাদের যাহা-কিছু বলিবার কথা আছে, যাহা-কিছু সুখদুঃখের পরামর্শ আছে, তাহা ভদ্রাভদ্রে একত্রে মিলিয়া সহজ বাংলা ভাষায় আলোচনা করা যাইত।

আমাদের দেশ প্রধানত পল্লীবাসী। এই পল্লী মাঝে মাঝে যখন আপনার নাড়ীর মধ্যে বাহিরের বৃহৎ জগতের রক্তচলাচল অনুভব করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠে, তখন মেলাই তাহার প্রধান উপায়। এই মেলাই আমাদের দেশে বাহিরকে ঘরের মধ্যে আহ্বান। এই উৎসবে পল্লী আপনার সমস্ত সংকীর্ণতা বিস্মৃত হয়— তাহার হৃদয় খুলিয়া দান করিবার ও গ্রহণ করিবার এই প্রধান উপলক্ষ্য। যেমন আকাশের জলে জলাশয় পূর্ণ করিবার সময় বর্ষাগম, তেমনি বিশ্বের ভাবে পল্লীর হৃদয়কে ভরিয়া দিবার উপযুক্ত অবসর মেলা।

এই মেলা আমাদের দেশে অত্যন্ত স্বাভাবিক। একটা সভা উপলক্ষ্যে যদি দেশের লোককে ডাক দাও, তবে তাহারা সংশয় লইয়া আসিবে, তাহাদের মন খুলিতে অনেক দেরি হইবে—কিন্তু মেলা উপলক্ষ্যে যাহারা একত্র হয় তাহারা সহজেই

হৃদয় খুলিয়াই আসে— সুতরাং এইখানেই দেশের মন পাইবার প্রকৃত অবকাশ ঘটে। পল্লীগুলি যেদিন হাল-লাঙল বন্ধ করিয়া ছুটি লইয়াছে, সেইদিনই তাহাদের কাছে আসিয়া বসিবার দিন।

বাংলাদেশে এমন জেলা নাই যেখানে নানা স্থানে বৎসরের নানা সময়ে মেলা না হইয়া থাকে— প্রথমত এই মেলাগুলির তালিকা ও বিবরণ সংগ্রহ করা আমাদের কর্তব্য। তাহার পরে এই মেলাগুলির সূত্রে দেশের লোকের সঙ্গে যথার্থভাবে পরিচিত হইবার উপলক্ষ্য আমরা যেন অবলম্বন করি।

প্রত্যেক জেলার ভদ্র শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহাদের জেলার মেলাগুলিকে যদি নবভাবে জাগ্রত, নবপ্রাণে সজীব করিয়া তুলিতে পারেন, ইহার মধ্যে দেশের শিক্ষিতগণ যদি তাঁহাদের হৃদয় সঞ্চার করিয়া দেন, এই-সকল মেলায় যদি তাঁহারা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করেন— কোনোপ্রকার নিষ্ফল পলিটিক্সের সংস্রব না রাখিয়া বিদ্যালয়, পথঘাট, জলাশয়, গোচর-জমি প্রভৃতি সম্বন্ধে জেলার যে-সমস্ত অভাব আছে, তাহার প্রতিকারের পরামর্শ করেন, তবে অতি অল্পকালের মধ্যে স্বদেশকে যথার্থই সচেষ্ট করিয়া তুলিতে পারেন।

আমার বিশ্বাস, যদি ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাংলাদেশে নানা স্থানে মেলা করিবার জন্য এক দল লোক প্রস্তুত হন,— তাঁহারা নূতন নূতন যাত্রা, কীর্তন, কথকতা রচনা করিয়া সঙ্গে বায়োস্কোপ, ম্যাজিকলণ্ঠন, ব্যায়াম ও ভোজবাজির আয়োজন লইয়া ফিরিতে থাকেন, তবে ব্যয়নির্বাহের জন্য তাঁহাদিগকে কিছুমাত্র ভাবিতে হয় না। তাঁহারা যদি মোটের উপরে প্রত্যেক মেলার জন্য জমিদারকে একটা বিশেষ খাজনা ধরিয়া দেন এবং দোকানদারের নিকট হইতে যথানিয়মে বিক্রয়ের লভ্যাংশ আদায় করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন— তবে উপযুক্ত সুব্যবস্থা দ্বারা সমস্ত ব্যাপারটাকে বিশেষ লাভকর করিয়া তুলিতে পারেন। এই লাভের টাকা হইতে পারিশ্রমিক ও অন্যান্য খরচ বাদে যাহা উদ্‌বৃত্ত হইবে, তাহা যদি দেশের কার্যেই লাগাইতে পারেন, তবে সেই মেলার দলের সহিত সমস্ত দেশের হৃদয়ের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিবে— ইহারা সমস্ত দেশকে তন্ন তন্ন করিয়া জানিবেন এবং ইহাদের দ্বারা যে কত কাজ হইতে পারিবে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

আমাদের দেশে চিরকাল আনন্দ-উৎসবের সূত্রে লোককে সাহিত্যরস ও ধর্মশিক্ষা দান করা হইয়াছে। সম্প্রতি নানা কারণবশতই অধিকাংশ জমিদার শহরে আকৃষ্ট হইয়াছেন। তাঁহাদের পুত্রকন্যার বিবাহাদি ব্যাপারে যাহা-কিছু আমোদ-আহ্লাদ, সমস্তই কেবল শহরের ধনী বন্ধুদিগকে থিয়েটার ও নাচগান দেখাইয়াই সম্পন্ন হয়।

অনেক জমিদার ক্রিয়াকর্মে প্রজাদের নিকট হইতে চাঁদা আদায় করিতে কুণ্ঠিত হন না— সে-স্থলে "ইতরে জনাঃ" মিষ্টান্নের উপায় জোগাইতে থাকে, কিন্তু "মিষ্টান্নম্" "ইতরে জনাঃ" কণামাত্র ভোগ করিতে পায় না— ভোগ করেন "বান্ধবাঃ" এবং "সাহেবাঃ"। ইহাতে বাংলার গ্রামসকল দিনে দিনে নিরানন্দ হইয়া পড়িতেছে এবং যে-সাহিত্যে দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার মনকে সরস ও শোভন করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা প্রত্যহই সাধারণ লোকের আয়ত্তাতীত হইয়া উঠিতেছে। আমাদের এই কল্পিত মেলা-সম্প্রদায় যদি সাহিত্যের ধারা, আনন্দের স্রোত বাংলার পল্লীদ্বারে আর-একবার প্রবাহিত করিতে পারেন, তবে এই শস্যশ্যামলা বাংলার অন্তঃকরণ দিনে দিনে শুষ্ক মরুভূমি হইয়া যাইবে না।

আমাদিগকে এ-কথা মনে রাখিতে হইবে যে, যে-সকল বড়ো বড়ো জলাশয় আমাদিগকে জলদান স্বাস্থ্যদান করিত, তাহারা দূষিত হইয়া কেবল যে আমাদের জলকষ্ট ঘটাইয়াছে তাহা নহে, তাহারা আমাদিগকে রোগ ও মৃত্যু বিতরণ করিতেছে— তেমনি আমাদের দেশে যে-সকল মেলা ধর্মের নামে প্রচলিত আছে, তাহাদেরও অধিকাংশ আজকাল ক্রমশ দূষিত হইয়া কেবল যে লোকশিক্ষার অযোগ্য হইয়াছে তাহা নহে, কুশিক্ষারও আকর হইয়া উঠিয়াছে। উপেক্ষিত শস্যক্ষেত্রে শস্যও হইতেছে না, কাঁটাগাছও জন্মিতেছে। এমন অবস্থায় কুৎসিত আমোদের উপলক্ষ্য এই মেলাগুলিকে যদি আমরা উদ্ধার না করি, তবে স্বদেশের কাছে ধর্মের কাছে অপরাধী হইব।

এ-কথা শুনিবামাত্র যেন আমাদের মধ্যে হঠাৎ একদল লোক অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া না ওঠেন— এ-কথা না বলিয়া বসেন যে, এই মেলাগুলির প্রতি গবর্মেণ্টের অত্যন্ত ঔদাসীন্য দেখা যাইতেছে— অতএব আমরা সভা করিয়া কাগজে লিখিয়া প্রবলবেগে গবর্মেণ্টের সাঁকো নাড়াইতে শুরু করিয়া দিই— মেলাগুলির মাথার উপরে দলবল-আইনকানুন-সমেত পুলিস কমিশনার ভাঙিয়া পড়ুক— সমস্ত একদমে পরিষ্কার হইয়া যাক। ধৈর্য ধরিতে হইবে,— বিলম্ব হয়, বাধা পাই, সেও স্বীকার, কিন্তু এ সমস্ত আমাদের নিজের কাজ। চিরকাল ঘরের লক্ষ্মী আমাদের ঘর নিকাইয়া আসিয়াছেন,— ম্যুনিসিপালিটির মজুর নয়। ম্যুনিসিপালিটির সরকারি ঝাঁটায় পরিষ্কার করিয়া দিতে পারে বটে, কিন্তু লক্ষ্মীর সম্মার্জনীতে পবিত্র করিয়া তোলে, এ-কথা যেন আমরা না ভুলি।

আমাদের দিশি লোকের সঙ্গে দিশি ধারায় মিলিবার যে কী উপলক্ষ্য হইতে পারে, আমি তাহারই একটি দৃষ্টান্ত দিলাম মাত্র, এবং এই উপলক্ষ্যটিকে নিয়মে বাঁধিয়া

আয়ত্তে আনিয়া কী করিয়া যে একটা দেশব্যাপী মঙ্গলব্যাপারে পরিণত করা যাইতে পারে, তাহারই আভাস দেওয়া গেল।

যাঁহারা রাজদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তিকে দেশের মঙ্গল-ব্যাপার বলিয়া গণ্যই করেন না তাঁহাদিগকে অন্য পক্ষে "পেসিমিস্ট্" অর্থাৎ আশাহীনের দল নাম দিয়াছেন। অর্থাৎ রাজার কাছে কোনো আশা নাই বলিয়া আমরা যতটা হতাশ্বাস হইয়া পড়িয়াছি, ততটা নৈরাশ্যকে তাঁহারা অমূলক বলিয়া জ্ঞান করেন।

আমি স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, রাজা আমাদিগকে মাঝে মাঝে লগুড়াঘাতে তাঁহার সিংহদ্বার হইতে খেদাইতেছেন বলিয়াই যে অগত্যা আত্মনির্ভরকে শ্রেয়োজ্ঞান করিতেছি, কোনোদিনই আমি এরূপ দুর্লভদ্রাক্ষাগুচ্ছলুব্ধ হতভাগ্য শৃগালের সান্ত্বনাকে আশ্রয় করি নাই। আমি এইকথাই বলি, পরের প্রসাদভিক্ষাই যথার্থ "পেসিমিস্ট" আশাহীন দীনের লক্ষণ। গলায় কাছা না লইলে আমাদের গতি নাই, এ-কথা আমি কোনোমতেই বলিব না— আমি স্বদেশকে বিশ্বাস করি, আমি আত্মশক্তিকে সম্মান করি। আমি নিশ্চয় জানি যে, যে উপায়েই হউক, আমরা নিজের মধ্যে একটা স্বদেশীয় স্বজাতীয় ঐক্য উপলব্ধি করিয়া আজ যে সার্থকতালাভের জন্য উৎসুক হইয়াছি, তাহার ভিত্তি যদি পরের পরিবর্তনশীল প্রসন্নতার উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়, যদি তাহা বিশেষভাবে ভারতবর্ষের স্বকীয় না হয়, তবে তাহা পুনঃপুনই ব্যর্থ হইতে থাকিবে। অতএব ভারতবর্ষের যথার্থ পথটি যে কী, আমাদিগকে চারিদিক হইতেই তাহার সন্ধান করিতে হইবে।

মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয়সম্বন্ধস্থাপনই চিরকাল ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান চেষ্টা ছিল। দূর আত্মীয়ের সঙ্গেও সম্বন্ধ রাখিতে হইবে, সন্তানেরা বয়স্ক হইলেও সম্বন্ধ শিথিল হইবে না, গ্রামস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গেও বর্ণ ও অবস্থা নির্বিচারে যথাযোগ্য আত্মীয়সম্বন্ধ রক্ষা করিতে হইবে; গুরু-পুরোহিত, অতিথি-ভিক্ষুক, ভূস্বামী-প্রজাভৃত্য সকলের সঙ্গেই যথোচিত সম্বন্ধ বাঁধা রহিয়াছে। এগুলি কেবলমাত্র শাস্ত্রবিহিত নৈতিক সম্বন্ধ নহে— এগুলি হৃদয়ের সম্বন্ধ। ইহারা কেহ বা পিতৃস্থানীয়, কেহ বা পুত্রস্থানীয়, কেহ বা ভাই, কেহ বা বয়স্য। আমরা যে-কোনো মানুষের যথার্থ সংস্রবে আসি, তাহার সঙ্গে একটা সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া বসি। এইজন্য কোনো অবস্থায় মানুষকে আমরা আমাদের কার্যসাধনের কল বা কলের অঙ্গ বলিয়া মনে করিতে পারি না। ইহার ভালোমন্দ দুই দিকই থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা আমাদের দেশীয়, এমন কি তদপেক্ষাও বড়ো, ইহা প্রাচ্য।

জাপান-যুদ্ধব্যাপার হইতে আমার এই কথার দৃষ্টান্ত উজ্জ্বল হইবে। যুদ্ধব্যাপারটি

একটা কলের জিনিস সন্দেহ নাই— সৈন্যদিগকে কলের মতো হইয়া উঠিতে হয় এবং কলের মতোই চলিতে হয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও জাপানের প্রত্যেক সৈন্য সেই কলকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে, তাহারা অন্ধ জড়বৎ নহে, রক্তোন্মাদগ্রস্ত পশুবৎও নহে; তাহারা প্রত্যেকে মিকাডোর সহিত এবং সেই সূত্রে স্বদেশের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট—সেই সম্বন্ধের নিকট তাহারা প্রত্যেকে আপনাকে উৎসর্গ করিতেছে। এইরূপে আমাদের পুরাকালে প্রত্যেক ক্ষত্রসৈন্য আপন রাজাকে বা প্রভুকে অবলম্বন করিয়া ক্ষাত্রধর্মের কাছে আপনাকে নিবেদন করিত— রণক্ষেত্রে তাহারা শতরঞ্জখেলার দাবাবোড়ের মতো মরিত না— মানুষের মতো হৃদয়ের সম্বন্ধ লইয়া ধর্মের গৌরব লইয়া মরিত। ইহাতে যুদ্ধব্যাপার অনেক সময়েই বিরাট আত্মহত্যার মতো হইয়া দাঁড়াইত— এবং এইরূপ কাণ্ডকে পাশ্চাত্ত্য সমালোচকেরা বলিয়া থাকেন, "ইহা চমৎকার— কিন্তু ইহা যুদ্ধ নহে।" জাপান এই চমৎকারিত্বের সঙ্গে যুদ্ধকে মিশাইয়া প্রাচ্য-প্রতীচ্য উভয়েরই কাছে ধন্য হইয়াছেন।

যাহা হউক, এইরূপই আমাদের প্রকৃতি। প্রয়োজনের সম্বন্ধকে আমরা হৃদয়ের সম্বন্ধ দ্বারা শোধন করিয়া লইয়া তবেই ব্যবহার করিতে পারি। সুতরাং অনাবশ্যক দায়িত্বও আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হয়। প্রয়োজনের সম্বন্ধ সংকীর্ণ—আপিসের মধ্যেই তাহার শেষ। প্রভুভৃত্যের মধ্যে যদি কেবল প্রভুভৃত্যের সম্বন্ধটুকুই থাকে, তবে কাজ আদায় এবং বেতনদানের মধ্যেই সমস্ত চুকিয়া যায়, কিন্তু তাহার মধ্যে কোনো-প্রকার আত্মীয়সম্বন্ধ স্বীকার করিলেই দায়িত্বকে পুত্রকন্যার বিবাহ এবং শ্রাদ্ধশান্তি পর্যন্ত টানিয়া লইয়া যাইতে হয়।

আমার কথার আর-একটা আধুনিক দৃষ্টান্ত দেখুন। আমি রাজসাহি ও ঢাকার প্রোভিন্শ্যাল কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলাম। এই কনফারেন্স-ব্যাপারকে আমরা একটা গুরুতর কাজের জিনিস বলিয়া মনে করি, সন্দেহ নাই— কিন্তু আশ্চর্য এই দেখিলাম, ইহার মধ্যে কাজের গরজের চেয়ে অতিথিসৎকারের ভাবটাই সুপরিস্ফুট। যেন বরযাত্রিদল গিয়াছি— আহার-বিহার আরাম-আমোদের জন্য দাবি ও উপদ্রব এতই অতিরিক্ত যে, তাহা আহ্বানকর্তাদের পক্ষে প্রায় প্রাণান্তকর। যদি তাঁহারা বলিতেন, তোমরা নিজের দেশের কাজ করিতে আসিয়াছ, আমাদের মাথা কিনিতে আস নাই— এত চর্ব্যচুষ্যলেহ্যপেয়, এত শয়নাসন, এত লেমনেড-সোডাওয়াটার-গাড়িঘোড়া, এত রসদের দায় আমাদের 'পরে কেন— তবে কথাটা অন্যায় হইত না। কিন্তু কাজের দোহাই দিয়া ফাঁকায় থাকাটা আমাদের জাতের লোকের কর্ম নয়। আমরা শিক্ষার চোটে যত ভয়ংকর কেজো হইয়া উঠি না কেন,

তবু আহ্বানকারীকে কাজের উপরে উঠিতে হইবে। কাজকেও আমরা হৃদয়ের সম্পর্ক হইতে বঞ্চিত করিতে চাই না। বস্তুত কন্‌ফারেন্সে কেজো অংশ আমাদের চিত্তকে তেমন করিয়া আকর্ষণ করে নাই, আতিথ্য যেমন করিয়াছিল। কন্‌ফারেন্স তাহার বিলাতি অঙ্গ হইতে এই দেশী হৃদয়টুকুকে একেবারে বাদ দিতে পারে নাই। আহ্বানকারিগণ আহুতবর্গকে অতিথিভাবে আত্মীয়ভাবে সংবর্ধনা করাকে আপনাদের দায় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পরিশ্রম, কষ্ট, অর্থব্যয় যে কী পরিমাণে বাড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিবেন। কন্‌গ্রেসের মধ্যেও যে অংশ আতিথ্য, সেই অংশই ভারতবর্ষীয় এবং সেই অংশই দেশের মধ্যে পুরা কাজ করে— যে অংশ কেজো, তিন দিন মাত্র তাহার কাজ, বাকি বৎসরটা তাহার সাড়াই পাওয়া যায় না। অতিথির প্রতি যে সেবার সম্বন্ধ বিশেষরূপে ভারতবর্ষের প্রকৃতিগত, তাহাকে বৃহৎভাবে অনুশীলনের উপলক্ষ্য ঘটিলে ভারতবর্ষের একটা বৃহৎ আনন্দের কারণ হয়। যে আতিথ্য গৃহে গৃহে আচরিত হয়, তাহাকে বৃহৎ পরিতৃপ্তি দিবার জন্য পুরাকালে বড়ো বড়ো যজ্ঞানুষ্ঠান হইত— এখন বহুদিন হইতে সে-সমস্ত লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষ তাহা ভোলে নাই বলিয়া যেই দেশের কাজের একটা উপলক্ষ্য অবলম্বন করিয়া জনসমাগম হইল, অমনি ভারতলক্ষ্মী তাঁহার বহুদিনের অব্যবহৃত পুরাতন সাধারণ-অতিথিশালার দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দিলেন, তাঁহার যজ্ঞভাণ্ডারের মাঝখানে তাঁহার চিরদিনের আসনটি গ্রহণ করিলেন। এমনি করিয়া কনগ্রেস-কন্‌ফারেন্সের মাঝখানে খুব যখন বিলাতি বক্তৃতার ধুম ও চটপটা করতালি— সেখানেও, সেই ঘোরতর সভাস্থলেও, আমাদের যিনি মাতা, তিনি স্মিতমুখে তাঁহার একটুখানি ঘরের সামগ্রী, তাঁহার স্বহস্তরচিত একটুখানি মিষ্টান্ন, সকলকে ভাগিয়া বাঁটিয়া খাওয়াইয়া চলিয়া যান, আর যে কী করা হইতেছে তাহা তিনি ভালো বুঝিতেই পারেন না। মার মুখের হাসি আরো একটুখানি ফুটিত, যদি তিনি দেখিতেন, পুরাতন যজ্ঞের ন্যায় এই সকল আধুনিক যজ্ঞে কেবল বইপড়া লোক নয়, কেবল ঘড়িচেনধারী লোক নয়— আহুত-অনাহুত আপামর সাধারণ সকলেই অবাধে এক হইয়াছে। সে-অবস্থায় সংখ্যায় ভোজ্য কম হইত, আড়ম্বরেও কম পড়িত— কিন্তু আনন্দে মঙ্গলে ও মাতার আশীর্বাদে সমস্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত।

যাহা হউক, ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, ভারতবর্ষ কাজ করিতে বসিয়াও মানবসম্বন্ধের মাধুর্যটুকু ভুলিতে পারে না। সেই সম্বন্ধের সমস্ত দায় সে স্বীকার করিয়া বসে।

আমরা এই-সমস্ত বহুতর অনাবশ্যক দায় সহজে স্বীকার করাতেই ভারতবর্ষে ঘরে পরে, উচ্চে নীচে, গৃহস্থে ও আগন্তুকে একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের ব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছে। এইজন্যই এ-দেশে টোল পাঠশালা জলাশয় অতিথিশালা দেবালয় অন্ধ-খঞ্জ-আতুরদের প্রতিপালন প্রভৃতি সম্বন্ধে কোনোদিন কাহাকেও ভাবিতে হয় নাই।

আজ যদি এই সামাজিক সম্বন্ধ বিশ্লিষ্ট হইয়া থাকে, যদি অন্নদান জলদান আশ্রয়দান স্বাস্থ্যদান বিদ্যাদান প্রভৃতি সামাজিক কর্তব্য সমাজ হইতে স্খলিত হইয়া বাহিরে পড়িয়া থাকে, তবে আমরা একেবারেই অন্ধকার দেখিব না।

গৃহের এবং পল্লীর ক্ষুদ্র সম্বন্ধ অতিক্রম করিয়া প্রত্যেককে বিশ্বের সহিত যোগযুক্ত করিয়া অনুভব করিবার জন্য হিন্দুধর্ম পন্থা নির্দেশ করিয়াছে। হিন্দুধর্ম সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রতিদিন পঞ্চযজ্ঞের দ্বারা দেবতা, ঋষি, পিতৃপুরুষ, সমস্ত মনুষ্য ও পশুপক্ষীর সহিত আপনার মঙ্গলসম্বন্ধ স্মরণ করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছে। ইহা যথার্থরূপে পালিত হইলে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের পক্ষে ও সাধারণভাবে বিশ্বের পক্ষে মঙ্গলকর হইয়া উঠে।

এই উচ্চভাব হইতেই আমাদের সমাজে প্রত্যেকের সহিত সমস্ত দেশের একটা প্রাত্যহিক সম্বন্ধ কি বাঁধিয়া দেওয়া অসম্ভব। প্রতিদিন প্রত্যেকে স্বদেশকে স্মরণ করিয়া এক পয়সা বা তদপেক্ষা অল্প— একমুষ্টি বা অর্ধমুষ্টি তণ্ডুলও স্বদেশবলিস্বরূপে উৎসর্গ করিতে পারিবেন না? হিন্দুধর্ম কি আমাদের প্রত্যেককে প্রতিদিনই, এই আমাদের দেবতার বিহারস্থল, প্রাচীন ঋষিদিগের তপস্যার আশ্রম, পিতৃপিতামহদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষের সহিত প্রত্যক্ষসম্বন্ধে ভক্তির বন্ধনে বাঁধিয়া দিতে পারিবে না। স্বদেশের সহিত আমাদের মঙ্গলসম্বন্ধ— সে কি আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত হইবে না। আমরা কি স্বদেশকে জলদান বিদ্যাদান প্রভৃতি মঙ্গলকর্মগুলিকে পরের হাতে বিদায় দান করিয়া দেশ হইতে আমাদের চেষ্টা, চিন্তা ও হৃদয়কে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিব। গবর্মেণ্ট আজ বাংলাদেশের জলকষ্ট নিবারণের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতেছেন— মনে করুন, আমাদের আন্দোলনের প্রচণ্ড তাগিদে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দিলেন এবং দেশে জলের কষ্ট একেবারেই রহিল না— তাহার ফল কী হইল। তাহার ফল এই হইল যে, সহায়তালাভ-কল্যাণলাভের সূত্রে দেশের যে-হৃদয় এতদিন সমাজের মধ্যেই কাজ করিয়াছে ও তৃপ্তি পাইয়াছে তাহাকে বিদেশীর হাতে সমর্পণ করা হইল। যেখান হইতে দেশ সমস্ত উপকারই পাইবে সেইখানেই সে তাহার সমস্ত হৃদয় স্বভাবতই দিবে। দেশের টাকা নানা পথ দিয়া নানা আকারে বিদেশের

দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে বলিয়া আমরা আক্ষেপ করি— কিন্তু দেশের হৃদয় যদি যায়, দেশের সহিত যতকিছু কল্যাণসম্বন্ধ একে একে সমস্তই যদি বিদেশী গবর্মেণ্টেরই করায়ত্ত হয়, আমাদের আর কিছুই অবশিষ্ট না থাকে, তবে সেটা কি বিদেশগামী টাকার স্রোতের চেয়ে অল্প আক্ষেপের বিষয় হইবে। এইজন্যই কি আমরা সভা করি, দরখাস্ত করি, ও এইরূপে দেশকে অন্তরে বাহিরে সম্পূর্ণভাবে পরের হাতে তুলিয়া দিবার চেষ্টাকেই বলে দেশহিতৈষিতা? ইহা কদাচই হইতে পারে না। ইহা কখনোই চিরদিন এ-দেশে প্রশ্রয় পাইবে না— কারণ, ইহা ভারতবর্ষের ধর্ম নহে। আমরা আমাদের অতিদূরসম্পর্কীয় নিঃস্ব আত্মীয়দিগকেও পরের ভিক্ষার প্রত্যাশী করিয়া দূরে রাখি নাই— তাহাদিগকেও নিজের সন্তানদের সহিত সমান স্থান দিয়াছি; আমাদের বহুকষ্ট-অর্জিত অন্নও বহুদূর-কুটুম্বদের সহিত ভাগ করিয়া খাওয়াকে আমরা এক দিনের জন্যও অসামান্য ব্যাপার বলিয়া কল্পনা করি নাই— আর আমরা বলিব, আমাদের জননী জন্মভূমির ভার আমরা বহন করিতে পারিব না? বিদেশী চিরদিন আমাদের স্বদেশকে অন্নজল ও বিদ্যা ভিক্ষা দিবে, আমাদের কর্তব্য কেবল এই যে, ভিক্ষার অংশ মনের মতো না হইলেই আমরা চীৎকার করিতে থাকিব? কদাচ নহে, কদাচ নহে! স্বদেশের ভার আমরা প্রত্যেকেই এবং প্রতিদিনই গ্রহণ করিব— তাহাতে আমাদের গৌরব, আমাদের ধর্ম। এইবার সময় আসিয়াছে যখন আমাদের সমাজ একটি সুবৃহৎ স্বদেশী সমাজ হইয়া উঠিবে। সময় আসিয়াছে যখন প্রত্যেকে জানিবে আমি একক নহি— আমি ক্ষুদ্র হইলেও আমাকে কেহ ত্যাগ করিতে পারিবে না এবং ক্ষুদ্রতমকেও আমি ত্যাগ করিতে পারিব না।

তর্ক এই উঠিতে পারে যে, ব্যক্তিগত হৃদয়ের সম্বন্ধ দ্বারা খুব বড়ো জায়গা ব্যাপ্ত করা সম্ভবপর হইতে পারে না। একটা ছোটো পল্লীকেই আমরা প্রত্যক্ষভাবে আপনার করিয়া লইয়া তাহার সমস্ত দায়িত্ব স্বীকার করিতে পারি— কিন্তু পরিধি বিস্তীর্ণ করিলেই কলের দরকার হয়— দেশকে আমরা কখনোই পল্লীর মতো করিয়া দেখিতে পারি না—এইজন্য অব্যবহিত ভাবে দেশের কাজ করা যায় না, কলের সাহায্যে করিতে হয়। এই কল-জিনিসটা আমাদের ছিল না, সুতরাং ইহা বিদেশ হইতে আনাইতে হইবে এবং কারখানা-ঘরের সমস্ত সাজসরঞ্জাম-আইনকানুন গ্রহণ না করিলে কল চলিবে না।

কথাটা অসংগত নহে। কল পাতিতেই হইবে। এবং কলের নিয়ম যে-দেশী হউক না কেন, তাহা মানিয়া না লইলে সমস্তই ব্যর্থ হইবে। এ-কথা সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়াও বলিতে হইবে, শুধু কলে ভারতবর্ষ চলিবে না— যেখানে আমাদের ব্যক্তিগত

হৃদয়ের সম্বন্ধ আমরা প্রত্যক্ষভাবে অনুভব না করিব, সেখানে আমাদের সমস্ত প্রকৃতিকে আকর্ষণ করিতে পারিবে না। ইহাকে ভালোই বল আর মন্দই বল, গালিই দাও আর প্রশংসাই কর, ইহা সত্য। অতএব আমরা যে-কোনো কাজে সফলতা লাভ করিতে চাই, এই কথাটি আমাদিগকে স্মরণ করিতে হইবে।

স্বদেশকে একটি বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে আমরা উপলব্ধি করিতে চাই। এমন একটি লোক চাই, যিনি আমাদের সমস্ত সমাজের প্রতিমাস্বরূপ হইবেন। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই আমরা আমাদের বৃহৎ স্বদেশীয় সমাজকে ভক্তি করিব, সেবা করিব। তাঁহার সঙ্গে যোগ রাখিলেই সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের যোগ রক্ষিত হইবে।

পূর্বে যখন রাষ্ট্র সমাজের সহিত অবিচ্ছিন্ন ছিল, তখন রাজারই এই পদ ছিল। এখন রাজা সমাজের বাহিরে যাওয়াতে সমাজ শীর্ষহীন হইয়াছে। সুতরাং দীর্ঘকাল হইতে বাধ্য হইয়া পল্লীসমাজই খণ্ড খণ্ড ভাবে আপনার কাজ আপনি সম্পন্ন করিয়াছে—স্বদেশী সমাজ তেমন ঘনিষ্ঠভাবে গড়িয়া বাড়িয়া উঠিতে পারে নাই। আমাদের কর্তব্য পালিত হইয়াছে বটে এবং হইয়াছে বলিয়াই আজও আমাদের মনুষ্যত্ব আছে— কিন্তু আমাদের কর্তব্য ক্ষুদ্র হইয়াছে এবং ক্ষুদ্র হওয়াতে আমাদের চরিত্রে সংকীর্ণতা প্রবেশ করিয়াছে। সংকীর্ণ সম্পূর্ণতার মধ্যে চিরদিন বদ্ধ হইয়া থাকা স্বাস্থ্যকর নহে, এইজন্য যাহা ভাঙিয়াছে তাহার জন্য আমরা শোক করিব না— যাহা গড়িতে হইবে তাহার প্রতি আমাদের সমস্ত চিত্তকে প্রয়োগ করিব। আজকাল জড়ভাবে, যথেচ্ছাক্রমে, দায়ে পড়িয়া, যাহা ঘটিয়া উঠিতেছে তাহাই ঘটিতে দেওয়া কখনোই আমাদের শ্রেয়স্কর হইতে পারে না।

এক্ষণে আমাদের সমাজপতি চাই। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার পার্ষদসভা থাকিবে, কিন্তু তিনি প্রত্যক্ষভাবে আমাদের সমাজের অধিপতি হইবেন।

আমাদের প্রত্যেকের নিকটে তাঁহারই মধ্যে সমাজের একতা সপ্রমাণ হইবে। আজ যদি কাহাকেও বলি সমাজের কাজ করো, তবে কেমন করিয়া করিব, কোথায় করিব, কাহার কাছে কী করিতে হইবে, তাহা ভাবিয়া তাহার মাথা ঘুরিয়া যাইবে। অধিকাংশ লোকই আপনার কর্তব্য উদ্ভাবন করিয়া চলে না বলিয়াই রক্ষা। এমন স্থলে ব্যক্তিগত চেষ্টাগুলিকে নির্দিষ্ট পথে আকর্ষণ করিয়া লইবার জন্য একটি কেন্দ্র থাকা চাই। আমাদের সমাজের কোনো দল সেই কেন্দ্রের স্থল অধিকার করিতে পারিবে না। আমাদের দেশে অনেক দলকেই দেখি, প্রথম উৎসাহের ধাক্কায় তাহারা যদি বা অনেকগুলি ফুল ফুটাইয়া তোলে, কিন্তু শেষকালে ফল ধরাইতে পারে না।

তাহার বিবিধ কারণ থাকিতে পারে, কিন্তু একটা প্রধান কারণ— আমাদের দলের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের মধ্যে দলের ঐক্যটিকে দৃঢ়ভাবে অনুভব ও রক্ষা করিতে পারে না—শিথিল দায়িত্ব প্রত্যেকের স্কন্ধ হইতে স্খলিত হইয়া শেষকালে কোথায় যে আশ্রয় লইবে, তাহার স্থান পায় না।

আমাদের সমাজ এখন আর এরূপ ভাবে চলিবে না। কারণ, বাহির হইতে যে উদ্যত শক্তি প্রত্যহ সমাজকে আত্মসাৎ করিতেছে, তাহা ঐক্যবদ্ধ, তাহা দৃঢ়— তাহা আমাদের বিদ্যালয় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিদিনের দোকানবাজার পর্যন্ত অধিকার করিয়া সর্বত্রই নিজের একাধিপত্য স্থূলসূক্ষ্ম সর্ব আকারেই প্রত্যক্ষগম্য করিয়াছে। এখন সমাজকে ইহার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে হইলে অত্যন্ত নিশ্চিতরূপে তাহার আপনাকে দাঁড় করাইতে হইবে। তাহা করাইবার একমাত্র উপায়— এক জন ব্যক্তিকে অধিপতিত্বে বরণ করা, সমাজের প্রত্যেককে সেই একের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করা, তাঁহার সম্পূর্ণ শাসন বহন করাকে অপমান জ্ঞান না করিয়া আমাদের স্বাধীনতারই অঙ্গ বলিয়া অনুভব করা।

এই সমাজপতি কখনো ভালো, কখনো মন্দ হইতে পারেন, কিন্তু সমাজ যদি জাগ্রত থাকে, তবে মোটের উপরে কোনো ব্যক্তি সমাজের স্থায়ী অনিষ্ট করিতে পারে না। আবার, এইরূপ অধিপতির অভিষেকেই সমাজকে জাগ্রত রাখিবার একটি প্রকৃষ্ট উপায়। সমাজ একটি বিশেষ স্থলে আপনার ঐক্যটি প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিলে তাহার শক্তি অজেয় হইয়া উঠিবে।

ইহার অধীনে দেশের ভিন্ন ভিন্ন নির্দিষ্ট অংশে ভিন্ন ভিন্ন নায়ক নিযুক্ত হইবেন। সমাজের সমস্ত অভাবমোচন, মঙ্গলকর্মচালনা ও ব্যবস্থারক্ষা ইহারা করিবেন এবং সমাজপতির নিকট দায়ী থাকিবেন।

পূর্বেই বলিয়াছি সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যহ অতি অল্পপরিমাণেও কিছু স্বদেশের জন্য উৎসর্গ করিবে। তা ছাড়া, প্রত্যেক গৃহে বিবাহাদি শুভকর্মে গ্রামভাটি প্রভৃতির ন্যায় এই স্বদেশী সমাজের একটি প্রাপ্য আদায় দুরূহ বলিয়া মনে করি না। ইহা যথাস্থানে সংগৃহীত হইলে অর্থাভাব ঘটিবে না। আমাদের দেশে স্বেচ্ছাদত্ত দানে বড়ো বড়ো মঠমন্দির চলিতেছে, এ-দেশে কি সমাজ ইচ্ছাপূর্বক আপনার আশ্রয়স্থান আপনি রচনা করিবে না? বিশেষত যখন অন্নে জলে স্বাস্থ্যে বিদ্যায় দেশ সৌভাগ্যলাভ করিবে, তখন কৃতজ্ঞতা কখনোই নিশ্চেষ্ট থাকিবে না।

অবশ্য, এখন আমি কেবল বাংলাদেশকেই আমার চোখের সামনে রাখিয়াছি। এখানে সমাজের অধিনায়ক স্থির করিয়া আমাদের সামাজিক স্বাধীনতাকে যদি আমরা

উজ্জ্বল ও স্থায়ী করিয়া তুলিতে পারি, তবে ভারতবর্ষের অন্যান্য বিভাগও আমাদের অনুবর্তী হইবে। এবং এইরূপে ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশ যদি নিজের মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট ঐক্য লাভ করিতে পারে, তবে পরস্পরের সহযোগিতা করা প্রত্যেকের পক্ষে অত্যন্ত সহজ হয়। একবার ঐক্যের নিয়ম এক স্থানে প্রবেশ করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহা ব্যাপ্ত হইতে থাকে— কিন্তু রাশীকৃত বিচ্ছিন্নতাকে কেবলমাত্র স্তূপাকার করিতে থাকিলেই তাহা এক হয় না।

কী করিয়া কালের সহিত হৃদয়ের সামঞ্জস্যবিধান করিতে হয়, কী করিয়া রাজার সহিত স্বদেশের সংযোগসাধন করিতে হয়, জাপান তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছে। সেই দৃষ্টান্ত মনে রাখিলে আমাদের স্বদেশী সমাজের গঠন ও চালনের জন্য একই কালে আমরা সমাজপতি ও সমাজতন্ত্রের কর্তৃত্বসমন্বয় করিতে পারিব— আমরা স্বদেশকে একটি মানুষের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিতে পারিব এবং তাঁহার শাসন স্বীকার করিয়া স্বদেশী সমাজের যথার্থ সেবা করিতে পারিব।

আত্মশক্তি একটি বিশেষ স্থানে সঞ্চয় করা, সেই বিশেষ স্থানে উপলব্ধি করা, সেই বিশেষ স্থান হইতে সর্বত্র প্রয়োগ করিবার একটি ব্যবস্থা থাকা, আমাদের পক্ষে কিরূপ প্রয়োজনীয় হইয়াছে একটু আলোচনা করিলেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। গবর্মেণ্ট নিজের কাজের সুবিধা অথবা যে কারণেই হোক, বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন— আমরা ভয় করিতেছি, ইহাতে বাংলাদেশ দুর্বল হইয়া পড়িবে। সেই ভয় প্রকাশ করিয়া আমরা কান্নাকাটি যথেষ্ট করিয়াছি। কিন্তু যদি এই কান্নাকাটি বৃথা হয়, তবে কি সমস্ত চুকিয়া গেল। দেশকে খণ্ডিত করিলে যে-সমস্ত অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহার প্রতিকার করিবার জন্য দেশের মধ্যে কোথাও কোনো ব্যবস্থা থাকিবে না? ব্যাধির বীজ বাহির হইতে শরীরের মধ্যে না প্রবেশ করিলেই ভালো— কিন্তু তবু যদি প্রবেশ করিয়া বসে, তবে শরীরের অভ্যন্তরে রোগকে ঠেকাইবার স্বাস্থ্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার কোনো কর্তৃশক্তি কি থাকিবে না। সেই কর্তৃশক্তি যদি আমরা সমাজের মধ্যে সুদৃঢ় সুস্পষ্ট করিয়া রাখি, তবে বাহির হইতে বাংলাকে নির্জীব করিতে পারিবে না। সমস্ত ক্ষতকে আরোগ্য করা, ঐক্যকে আকর্ষণ করিয়া রাখা, মূর্ছিতকে সচেতন করিয়া তোলা ইহারই কর্ম হইবে। আজকাল বিদেশী রাজপুরুষ সৎকর্মের পুরস্কারস্বরূপ আমাদিগকে উপাধি বিতরণ করিয়া থাকেন— কিন্তু সৎকর্মের সাধুবাদ ও আশীর্বাদ আমরা স্বদেশের কাছ হইতে পাইলেই যথার্থভাবে ধন্য হইতে পারি। স্বদেশের হইয়া পুরস্কৃত করিবার শক্তি আমরা নিজের সমাজের মধ্যে যদি বিশেষভাবে স্থাপিত না করি, তবে চিরদিনের

মতো আপনাদিগকে এই একটি বিশেষ সার্থকতাদান হইতে বঞ্চিত করিব। আমাদের দেশে মধ্যে মধ্যে সামান্য উপলক্ষ্যে হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ বাধিয়া উঠে, সেই বিরোধ মিটাইয়া দিয়া উভয় পক্ষের মধ্যে প্রীতিশান্তিস্থাপন, উভয় পক্ষের স্ব স্ব অধিকার নিয়মিত করিয়া দিবার বিশেষ কর্তৃত্ব সমাজের কোনো স্থানে যদি না থাকে, তবে সমাজকে বারে বারে ক্ষতবিক্ষত হইয়া উত্তরোত্তর দুর্বল হইতে হয়।

অতএব একটি লোককে আশ্রয় করিয়া আমাদের সমাজকে এক জায়গায় আপন হৃদয়স্থাপন, আপন ঐক্যপ্রতিষ্ঠা করিতেই হইবে, নহিলে শৈথিল্য ও বিনাশের হাত হইতে আত্মরক্ষার কোনো উপায় দেখি না।

অনেকে হয়তো সাধারণভাবে আমার এ-কথা স্বীকার করিবেন, কিন্তু ব্যাপারখানা ঘটাইয়া তোলা তাঁহারা অসাধ্য বলিয়া মনে করিতে পারেন। তাঁহারা বলিবেন,— নির্বাচন করিব কী করিয়া, সবাই নির্বাচিতকে মানিবে কেন, আগে সমস্ত ব্যবস্থাতন্ত্র স্থাপন করিয়া তবে তো সমাজপতির প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইবে, ইত্যাদি।

আমার বক্তব্য এই যে, এই সমস্ত তর্ক লইয়া আমরা যদি একেবারে নিঃশেষপূর্বক বিচার বিবেচনা করিয়া লইতে বসি, তবে কোনো কালে কাজে নামা সম্ভব হইবে না। এমন লোকের নাম করাই শক্ত, দেশের কোনো লোক বা কোনো দল যাঁহার সম্বন্ধে কোনো আপত্তি না করিবেন। দেশের সমস্ত লোকের সঙ্গে পরামর্শ মিটাইয়া লইয়া লোককে নির্বাচন করা সাধ্য হইবে না।

আমাদের প্রথম কাজ হইবে— যেমন করিয়া হউক, একটি লোক স্থির করা এবং তাঁহার নিকটে বাধ্যতা স্বীকার করিয়া ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে তাঁহার চারিদিকে একটি ব্যবস্থাতন্ত্র গড়িয়া তোলা। যদি সমাজপতি-নিয়োগের প্রস্তাব সময়োচিত হয়, যদি রাজা সমাজের অন্তর্গত না হওয়াতে সমাজে অধিনায়কের যথার্থ অভাব ঘটিয়া থাকে, যদি পরজাতির সংঘর্ষে আমরা প্রত্যহ অধিকারচ্যুত হইতেছি বলিয়া সমাজ নিজেকে বাঁধিয়া তুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবার জন্য ইচ্ছুক হয়, তবে কোনো একটি যোগ্য লোককে দাঁড় করাইয়া তাঁহার অধীনে এক দল লোক যথার্থভাবে কাজে প্রবৃত্ত হইলে এই সমাজ-রাজতন্ত্র দেখিতে দেখিতে প্রস্তুত হইয়া উঠিবে— পূর্ব হইতে হিসাব করিয়া কল্পনা করিয়া আমরা যাহা আশা করিতে না পারিব, তাহাও লাভ করিব— সমাজের অন্তর্নিহিত বুদ্ধি এই ব্যাপারের চালনাভার আপনিই গ্রহণ করিবে।

সমাজে অবিচ্ছিন্নভাবে সকল সময়েই শক্তিমান ব্যক্তি থাকেন না, কিন্তু দেশের

শক্তি বিশেষ-বিশেষ স্থানে পুঞ্জীভূত হইয়া তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করে। যে-শক্তি আপাতত যোগ্য লোকের অভাবে কাজে লাগিল না, সে-শক্তি যদি সমাজে কোথাও রক্ষিত হইবার স্থানও না পায়, তবে সে সমাজ ফুটা কলসের মতো শূন্য হইয়া যায়। আমি যে সমাজপতির কথা বলিতেছি, তিনি সকল সময়ে যোগ্য লোক না হইলেও সমাজের শক্তি সমাজের আত্মচেতনা তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া বিধৃত হইয়া থাকিবে। অবশেষে বিধাতার আশীর্বাদে এই শক্তিসঞ্চয়ের সহিত যখন যোগ্যতার যোগ হইবে, তখন দেশের মঙ্গল দেখিতে দেখিতে আশ্চর্যবলে আপনাকে সর্বত্র বিস্তীর্ণ করিবে। আমরা ক্ষুদ্র দোকানির মতো সমস্ত লাভলোকসানের হিসাব হাতে হাতে দেখিতে চাই— কিন্তু বড়ো ব্যাপারের হিসাব তেমন করিয়া মেলে না। দেশে এক-একটা বড়ো দিন আসে, সেই দিন বড়ো লোকের তলবে দেশের সমস্ত সাল-তামামি নিকাশ বড়ো খাতায় প্রস্তুত হইয়া দেখা দেয়। রাজচক্রবর্তী অশোকের সময়ে একবার বৌদ্ধসমাজের হিসাব তৈরি হইয়াছিল। আপাতত আমাদের কাজ—দপ্তর তৈরি রাখা, কাজ চালাইতে থাকা; যেদিন মহাপুরুষ হিসাব তলব করিবেন, সেদিন অপ্রস্তুত হইয়া শির নত করিব না— দেখাইতে পারিব, জমার ঘরে একেবারে শূন্য নাই।

সমাজের সকলের চেয়ে যাঁহাকে বড়ো করিব, এতবড়ো লোক চাহিলেই পাওয়া যায় না। বস্তুত রাজা তাঁহার সকল প্রজারই চেয়ে যে স্বভাবত বড়ো, তাহা নহে। কিন্তু রাজ্যই রাজাকে বড়ো করে। জাপানের মিকাডো জাপানের সমস্ত সুধী, সমস্ত সাধক, সমস্ত শূরবীরদের দ্বারাই বড়ো। আমাদের সমাজপতিও সমাজের মহত্ত্বেই মহৎ হইতে থাকিবেন। সমাজের সমস্ত বড়ো লোকই তাঁহাকে বড়ো করিয়া তুলিবে। মন্দিরের মাথায় যে স্বর্ণকলস থাকে, তাহা নিজে উচ্চ নহে— মন্দিরের উচ্চতাই তাহাকে উচ্চ করে।

আমি ইহা বেশ বুঝিতেছি, আমার এই প্রস্তাব যদি বা অনেকে অনুকূলভাবেও গ্রহণ করেন, তথাপি ইহা অবাধে কার্যে পরিণত হইতে পারিবে না। এমন কি, প্রস্তাবকারীর অযোগ্যতা ও অন্যান্য বহুবিধ প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক দোষত্রুটি ও স্খলন সম্বন্ধে অনেক স্পষ্ট স্পষ্ট কথা এবং অনেক অস্পষ্ট আভাস আজ হইতে প্রচার হইতে থাকা আশ্চর্য নহে। আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আমাকে আপনারা ক্ষমা করিবেন। অদ্যকার সভামধ্যে আমি আত্মপ্রচার করিতে আসি নাই, এ-কথা বলিলেও পাছে অহংকার প্রকাশ করা হয়, এ-জন্য আমি কুণ্ঠিত আছি। আমি অদ্য যাহা বলিতেছি, আমার সমস্ত দেশ আমাকে তাহা বলাইতে উদ্যত

করিয়াছে। তাহা আমার কথা নহে, তাহা আমার সৃষ্টি নহে; তাহা আমাকর্তৃক উচ্চারিত মাত্র। আপনারা এ শঙ্কামাত্র করিবেন না, আমি আমার অধিকার ও যোগ্যতার সীমা বিস্মৃত হইয়া স্বদেশী সমাজ গঠনকার্যে নিজেকে অত্যুগ্রভাবে খাড়া করিয়া তুলিব। আমি কেবল এইটুকুমাত্র বলিব, আসুন, আমরা মনকে প্রস্তুত করি— ক্ষুদ্র দলাদলি, কুতর্ক, পরনিন্দা, সংশয় ও অতিবুদ্ধি হইতে হৃদয়কে সম্পূর্ণভাবে ক্ষালন করিয়া অদ্য মাতৃভূমির বিশেষ প্রয়োজনের দিনে, জননীর বিশেষ আহ্বানের দিনে চিত্তকে উদার করিয়া কর্মের প্রতি অনুকূল করিয়া, সর্বপ্রকার লক্ষ্যবিহীন অতি সূক্ষ্ম যুক্তিবাদের ভণ্ডুলতাকে সবেগে আবর্জনাস্তূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া, এবং নিগূঢ় আত্মাভিমানকে তাহার শতসহস্র রক্ততৃষার্ত শিকড় সমেত হৃদয়ের অন্ধকার গুহাতল হইতে সবলে উৎপাটিত করিয়া সমাজের শূন্য আসনে বিনম্র-বিনীতভাবে আমাদের সমাজপতির অভিষেক করি, আশ্রয়চ্যুত সমাজকে সনাথ করি— শুভক্ষণে আমাদের দেশের মাতৃগৃহকক্ষে মঙ্গলপ্রদীপটিকে উজ্জ্বল করিয়া তুলি— শঙ্খ বাজিয়া উঠুক, ধূপের পবিত্র গন্ধ উদ্‌গত হইতে থাক্— দেবতার অনিমেষ কল্যাণদৃষ্টির দ্বারা সমস্ত দেশ আপনাকে সর্বতোভাবে সার্থক বলিয়া একবার অনুভব করুক।

এই অভিষেকের পরে সমাজপতি কাহাকে তাঁহার চারিদিকে আকর্ষণ করিয়া লইবেন, কী ভাবে সমাজের কার্যে সমাজকে প্রবৃত্ত করিবেন, তাহা আমার বলিবার বিষয় নহে। নিঃসন্দেহ, যেরূপ ব্যবস্থা আমাদের চিরন্তন সমাজপ্রকৃতির অনুগত, তাহাই তাঁহাকে অবলম্বন করিতে হইবে— স্বদেশের পুরাতন প্রকৃতিকেই আশ্রয় করিয়া তিনি নূতনকে যথাস্থানে যথাযোগ্য আসনদান করিবেন। আমাদের দেশে তিনি লোকবিশেষ ও দলবিশেষের হাত হইতে সর্বদাই বিরুদ্ধবাদ ও অপবাদ সহ্য করিবেন, ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই। কিন্তু মহৎ পদ আরামের স্থান নহে— সমস্ত কলরব-কোলাহলের মধ্যে আপনার গৌরবে তাঁহাকে দৃঢ়গম্ভীরভাবে অবিচলিত থাকিতে হইবে।

অতএব যাঁহাকে আমরা সমাজের সর্বোচ্চ সম্মানের দ্বারা বরণ করিব, তাঁহাকে এক দিনের জন্যও আমরা সুখস্বচ্ছন্দতার আশা দিতে পারিব না। আমাদের যে উদ্ধত নব্যসমাজ কাহাকেও হৃদয়ের সহিত শ্রদ্ধা করিতে সম্মত না হইয়া নিজেকে প্রতিদিন অশ্রদ্ধেয় করিয়া তুলিতেছে, সেই সমাজের সূচিমুখ-কণ্টকখচিত ঈর্ষাসন্তপ্ত আসনে যাঁহাকে আসীন হইতে হইবে, বিধাতা যেন তাঁহাকে প্রচুর পরিমাণে বল ও সহিষ্ণুতা প্রদান করেন— তিনি যেন নিজের অন্তঃকরণের মধ্যেই শান্তি ও কর্মের মধ্যেই পুরস্কার লাভ করিতে পারেন।

নিজের শক্তিকে আপনারা অবিশ্বাস করিবেন না, আপনারা নিশ্চয় জানিবেন— সময় উপস্থিত হইয়াছে। নিশ্চয় জানিবেন, ভারতবর্ষের মধ্যে একটি বাঁধিয়া তুলিবার ধর্ম চিরদিন বিরাজ করিয়াছে। নানা প্রতিকূল ব্যাপারের মধ্যে পড়িয়াও ভারতবর্ষ বরাবর একটা ব্যবস্থা করিয়া তুলিয়াছে, তাই আজও রক্ষা পাইয়াছে। এই ভারতবর্ষের উপরে আমি বিশ্বাসস্থাপন করি। এই ভারতবর্ষ এখনই এই মুহূর্তেই ধীরে ধীরে নূতন কালের সহিত আপনার পুরাতনের আশ্চর্য একটি সামঞ্জস্য গড়িয়া তুলিতেছে। আমরা প্রত্যেকে যেন সজ্ঞানভাবে ইহাতে যোগ দিতে পারি,— জড়ত্বের বশে বা বিদ্রোহের তাড়নায় প্রতিক্ষণে ইহার প্রতিকূলতা না করি।

বাহিরের সহিত হিন্দুসমাজের সংঘাত এই নূতন নহে। ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াই আর্যগণের সহিত এখানকার আদিম অধিবাসীদের তুমুল বিরোধ বাধিয়াছিল। এই বিরোধে আর্যগণ জয়ী হইলেন, কিন্তু অনার্যেরা আদিম অস্ট্রেলিয়ান বা আমেরিকগণের মতো উৎসাদিত হইল না; তাহারা আর্য উপনিবেশ হইতে বহিষ্কৃত হইল না; তাহারা আপনাদের আচারবিচারের সমস্ত পার্থক্যসত্ত্বেও একটি সমাজতন্ত্রের মধ্যে স্থান পাইল। তাহাদিগকে লইয়া আর্যসমাজ বিচিত্র হইল।

এই সমাজ আর-একবার সুদীর্ঘকাল বিশ্লিষ্ট হইয়া গিয়াছিল। বৌদ্ধ-প্রভাবের সময় বৌদ্ধধর্মের আকর্ষণে ভারতবর্ষীয়ের সহিত বহুতর পরদেশীয়ের ঘনিষ্ঠ সংস্রব ঘটিয়াছিল। বিরোধের সংস্রবের চেয়ে এই মিলনের সংস্রব আরো গুরুতর। বিরোধে আত্মরক্ষার চেষ্টা বরাবর জাগ্রত থাকে— মিলনের অসতর্ক অবস্থায় অতি সহজেই সমস্ত একাকার হইয়া যায়। বৌদ্ধ-ভারতবর্ষে তাহাই ঘটিয়াছিল। সেই এশিয়াব্যাপী ধর্মপ্লাবনের সময় নানা জাতির আচারব্যবহার ক্রিয়াকর্ম ভাসিয়া আসিয়াছিল, কেহ ঠেকায় নাই।

কিন্তু এই অতিবৃহৎ উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যেও ব্যবস্থাস্থাপনের প্রতিভা ভারতবর্ষকে ত্যাগ করিল না। যাহা-কিছু ঘরের এবং যাহা-কিছু অভ্যাগত, সমস্তকে একত্র করিয়া লইয়া পুনর্বার ভারতবর্ষ আপনার সমাজ সুবিহিত করিয়া গড়িয়া তুলিল; পূর্বাপেক্ষা আরো বিচিত্র হইয়া উঠিল। কিন্তু এই বিপুল বৈচিত্র্যের মধ্যে আপনার একটি ঐক্য সর্বত্রই সে গ্রথিত করিয়া দিয়াছে। আজ অনেকেই জিজ্ঞাসা করেন, নানা স্বতোবিরোধ আত্মখণ্ডন-সংকুল এই হিন্দুধর্মের এই হিন্দুসমাজের ঐক্যটা কোন্‌খানে। সুস্পষ্ট উত্তর দেওয়া কঠিন। সুবৃহৎ পরিধির কেন্দ্র খুঁজিয়া পাওয়াও তেমনি কঠিন,— কিন্তু কেন্দ্র তাহার আছেই। ছোটো গোলকের গোলত্ব বুঝিতে

কষ্ট হয় না, কিন্তু গোল পৃথিবীকে যাহারা খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখে, তাহারা ইহাকে চ্যাপটা বলিয়াই অনুভব করে। তেমনি হিন্দুসমাজ নানা পরস্পর-অসংগত বৈচিত্র্যকে এক করিয়া লওয়াতে তাহার ঐক্যসূত্র নিগূঢ় হইয়া পড়িয়াছে। এই ঐক্য অঙ্গুলির দ্বারা নির্দেশ করিয়া দেওয়া কঠিন, কিন্তু ইহা সমস্ত আপাত-প্রতীয়মান বিরোধের মধ্যেও দৃঢ়ভাবে যে আছে, তাহা আমরা স্পষ্টই উপলব্ধি করিতে পারি।

ইহার পরে এই ভারতবর্ষেই মুসলমানের সংঘাত আসিয়া উপস্থিত হইল। এই সংঘাত সমাজকে যে কিছুমাত্র আক্রমণ করে নাই, তাহা বলিতে পারি না। তখন হিন্দুসমাজে এই পরসংঘাতের সহিত সামঞ্জস্যসাধনের প্রক্রিয়া সর্বত্রই আরম্ভ হইয়াছিল। হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মাঝখানে এমন একটি সংযোগস্থল সৃষ্ট হইতেছিল, যেখানে উভয় সমাজের সীমারেখা মিলিয়া আসিতেছিল; নানকপন্থী কবীরপন্থী ও নিম্নশ্রেণীর বৈষ্ণবসমাজ ইহার দৃষ্টান্তস্থল। আমাদের দেশে সাধারণের মধ্যে নানা স্থানে ধর্ম ও আচার লইয়া যে-সকল ভাঙাগড়া চলিতেছে, শিক্ষিত-সম্প্রদায় তাহার কোনো খবর রাখেন না। যদি রাখিতেন তো দেখিতেন, এখনো ভিতরে ভিতরে এই সামঞ্জস্যসাধনের সজীব প্রক্রিয়া বন্ধ নাই।

সম্প্রতি আর-এক প্রবল বিদেশী আর-এক ধর্ম, আচারব্যবহার ও শিক্ষাদীক্ষা লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এইরূপে পৃথিবীতে যে চারি প্রধান ধর্মকে আশ্রয় করিয়া চার বৃহৎ সমাজ আছে— হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রীস্টান— তাহারা সকলেই ভারতবর্ষে আসিয়া মিলিয়াছে। বিধাতা যেন একটা বৃহৎ সামাজিক সম্মিলনের জন্য ভারতবর্ষেই একটা বড়ো রাসায়নিক কারখানাঘর খুলিয়াছেন।

এখানে একটা কথা আমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, বৌদ্ধ-প্রাদুর্ভাবের সময় সমাজে যে একটা মিশ্রণ ও বিপর্যস্ততা ঘটিয়াছিল, তাহাতে পরবর্তী হিন্দুসমাজের মধ্যে একটা ভয়ের লক্ষণ রহিয়া গেছে। নূতনত্ব ও পরিবর্তন মাত্রেরই প্রতি সমাজের একটা নিরতিশয় সন্দেহ একেবারে মজ্জার মধ্যে নিহিত হইয়া রহিয়াছে। এরূপ চিরস্থায়ী আতঙ্কের অবস্থায় সমাজ অগ্রসর হইতে পারে না। বাহিরের সহিত প্রতিযোগিতায় জয়ী হওয়া তাহার পক্ষে অসাধ্য হইয়া পড়ে। যে-সমাজ কেবলমাত্র আত্মরক্ষার দিকেই তাহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে, সহজে চলাফেরার ব্যবস্থা সে আর করিতে পারে না। মাঝে মাঝে বিপদের আশঙ্কা, আঘাতের আশঙ্কা স্বীকার করিয়াও প্রত্যেক সমাজকে স্থিতির সঙ্গে সঙ্গে গতির বন্দোবস্তও রাখিতে হয়। নহিলে তাহাকে পঙ্গু হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে হয়, সংকীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ হইতে হয়— তাহা একপ্রকার জীবন্মৃত্যু।

বৌদ্ধপরবর্তী হিন্দুসমাজ আপনার যাহা-কিছু আছে ও ছিল, তাহাই আটেঘাটে রক্ষা করিবার জন্য, পরসংস্রব হইতে নিজেকে সর্বতোভাবে অবরুদ্ধ রাখিবার জন্য নিজেকে জাল দিয়া বেড়িয়াছে। ইহাতে ভারতবর্ষকে আপনার একটি মহৎ পদ হারাইতে হইয়াছে। এক সময়ে ভারতবর্ষ পৃথিবীতে গুরুর আসন লাভ করিয়াছিল; ধর্মে, বিজ্ঞানে, দর্শনে ভারতবর্ষীয় চিত্তের সাহসের সীমা ছিল না; সেই চিত্ত সকল দিকে সুদুর্গম সুদূর প্রদেশসকল অধিকার করিবার জন্য আপনার শক্তি অবাধে প্রেরণ করিত। এইরূপে ভারতবর্ষ যে গুরুর সিংহাসন জয় করিয়াছিল, তাহা হইতে আজ সে ভ্রষ্ট হইয়াছে— আজ তাহাকে ছাত্রত্ব স্বীকার করিতে হইতেছে। ইহার কারণ, আমাদের মনের মধ্যে ভয় ঢুকিয়াছে। সমুদ্রযাত্রা আমরা সকল দিক দিয়াই ভয়ে ভয়ে বন্ধ করিয়া দিয়াছি— কি জলময় সমুদ্র, কি জ্ঞানময় সমুদ্র। আমরা ছিলাম বিশ্বের, দাঁড়াইলাম পল্লীতে। সঞ্চয় ও রক্ষা করিবার জন্য সমাজে যে ভীরু স্ত্রীশক্তি আছে, সেই শক্তিই কৌতূহলপর পরীক্ষাপ্রিয় সাধনশীল পুরুষশক্তিকে পরাভূত করিয়া একাধিপত্য লাভ করিল। তাই আমরা জ্ঞানরাজ্যেও দৃঢ়সংস্কারবদ্ধ স্ত্রৈণপ্রকৃতিসম্পন্ন হইয়া পড়িয়াছি। জ্ঞানের বাণিজ্য ভারতবর্ষ যাহা-কিছু আরম্ভ করিয়াছিল, যাহা প্রত্যহ বাড়িয়া উঠিয়া জগতের ঐশ্বর্যবিস্তার করিতেছিল, তাহা আজ অন্তঃপুরের অলংকারের বাক্সে প্রবেশ করিয়া আপনাকে অত্যন্ত নিরাপদ জ্ঞান করিতেছে; তাহা আর বাড়িতেছে না, যাহা খোওয়া যাইতেছে তাহা খোওয়াই যাইতেছে।

বস্তুত, এই গুরুর পদই আমরা হারাইয়াছি। রাজ্যেশ্বরত্ব কোনোকালে আমাদের দেশে চরমসম্পদরূপে ছিল না— তাহা কোনোদিন আমাদের দেশের সমস্ত লোকের হৃদয় অধিকার করিতে পারে নাই— তাহার অভাব আমাদের দেশের প্রাণান্তকর অভাব নহে। ব্রাহ্মণত্বের অধিকার, অর্থাৎ জ্ঞানের অধিকার, ধর্মের অধিকার, তপস্যার অধিকার আমাদের সমাজের যথার্থ প্রাণের আধার ছিল। যখন হইতে আচারপালনমাত্রই তপস্যার স্থান গ্রহণ করিল, যখন হইতে আপন ঐতিহাসিক মর্যাদা বিস্মৃত হইয়া আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর-সকলেই আপনাদিগকে শূদ্র অর্থাৎ অনার্য বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইল না— সমাজকে নব নব তপস্যার ফল, নব নব ঐশ্বর্য বিতরণের ভার যে-ব্রাহ্মণের ছিল সেই ব্রাহ্মণ যখন আপন যথার্থ মাহাত্ম্য বিসর্জন দিয়া সমাজের দ্বারদেশে নামিয়া আসিয়া কেবলমাত্র পাহারা দিবার ভার গ্রহণ করিল,— তখন হইতে আমরা অন্যকেও কিছু দিতেছি না, আপনার যাহা ছিল তাহাকেও অকর্মণ্য ও বিকৃত করিতেছি।

ইহা নিশ্চয় জানা চাই, প্রত্যেক জাতিই বিশ্বমানবের অঙ্গ। বিশ্বমানবকে দান করিবার, সহায়তা করিবার সামগ্রী কী উদ্ভাবন করিতেছে, ইহারই সদুত্তর দিয়া প্রত্যেক জাতি প্রতিষ্ঠালাভ করে। যখন হইতে সেই উদ্ভাবনের প্রাণশক্তি কোনো জাতি হারায়, তখন হইতেই সেই বিরাট্‌মানবের কলেবরে পক্ষাঘাতগ্রস্ত অঙ্গের ন্যায় সে কেবল ভারস্বরূপে বিরাজ করে। বস্তুত, কেবল টিঁকিয়া থাকাই গৌরব নহে।

ভারতবর্ষ রাজ্য লইয়া মারামারি, বাণিজ্য লইয়া কাড়াকাড়ি করে নাই। আজ যে তিব্বত-চীন-জাপান অভ্যাগত য়ুরোপের ভয়ে সমস্ত দ্বার-বাতায়ন রুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক, সেই তিব্বত-চীন-জাপান ভারতবর্ষকে গুরু বলিয়া সমাদরে নিরুৎকণ্ঠিতচিত্তে গৃহের মধ্যে ডাকিয়া লইয়াছেন। ভারতবর্ষ সৈন্য এবং পণ্য লইয়া সমস্ত পৃথিবীকে অস্থিমজ্জায় উদ্‌বেজিত করিয়া ফিরে নাই— সর্বত্র শান্তি, সান্ত্বনা ও ধর্মব্যবস্থা স্থাপন করিয়া মানবের ভক্তি অধিকার করিয়াছে। এইরূপে যে-গৌরব সে লাভ করিয়াছে তাহা তপস্যার দ্বারা করিয়াছে এবং সে গৌরব রাজচক্রবর্তিত্বের চেয়ে বড়ো।

সেই গৌরব হারাইয়া আমরা যখন আপনার সমস্ত পুঁটলিপাটলা লইয়া ভীতচিত্তে কোণে বসিয়া আছি, এমন সময়েই ইংরেজ আসিবার প্রয়োজন ছিল। ইংরেজের প্রবল আঘাতে এই ভীরু পলাতক সমাজের ক্ষুদ্র বেড়া অনেক স্থানে ভাঙিয়াছে। বাহিরকে ভয় করিয়া যেমন দূরে ছিলাম, বাহির তেমনি হুড়মুড় করিয়া একেবারে ঘাড়ের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে— এখন ইহাকে ঠেকায় কাহার সাধ্য। এই উৎপাতে আমাদের যে প্রাচীর ভাঙিয়া গেল, তাহাতে দুইটা জিনিস আমরা আবিষ্কার করিলাম। আমাদের কী আশ্চর্য শক্তি ছিল, তাহা চোখে পড়িল এবং আমরা কী আশ্চর্য অশক্ত হইয়া পড়িয়াছি, তাহাও ধরা পড়িতে বিলম্ব হইল না।

আজ আমরা ইহা উত্তমরূপেই বুঝিয়াছি যে, তফাতে গা-ঢাকা দিয়া বসিয়া থাকাকেই আত্মরক্ষা বলে না। নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিকে সর্বতোভাবে জাগ্রত করা চালনা করাই আত্মরক্ষার প্রকৃত উপায়। ইহা বিধাতার নিয়ম। ইংরেজ ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের চিত্তকে অভিভূত করিবেই, যতক্ষণ আমাদের চিত্ত জড়ত্ব ত্যাগ করিয়া তাহার নিজের উদ্যমকে কাজে না লাগাইবে। কোণে বসিয়া কেবল "গেল গেল" বলিয়া হাহাকার করিয়া মরিলে কোনো ফল নাই। সকল বিষয়ে ইংরেজের অনুকরণ করিয়া ছদ্মবেশ পরিয়া বাঁচিবার যে-চেষ্টা তাহাও নিজেকে

ভোলানো মাত্র। আমরা প্রকৃত ইংরেজ হইতে পারিব না, নকল ইংরেজ হইয়াও আমরা ইংরেজকে ঠেকাইতে পারিব না।

আমাদের বুদ্ধি, আমাদের হৃদয়, আমাদের রুচি যে প্রতিদিন জলের দরে বিকাইয়া যাইতেছে, তাহা প্রতিরোধ করিবার একমাত্র উপায়— আমরা নিজে যাহা তাহাই সজ্ঞানভাবে, সবলভাবে, সচলভাবে সম্পূর্ণভাবে হইয়া উঠা।

আমাদের যে শক্তি আবদ্ধ আছে, তাহা বিদেশ হইতে বিরোধের আঘাত পাইয়াই মুক্ত হইবে— কারণ, আজ পৃথিবীতে তাহার কাজ আসিয়াছে। আমাদের দেশের তাপসেরা তপস্যার দ্বারা যে-শক্তি সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন তাহা মহামূল্য, বিধাতা তাহাকে নিষ্ফল করিবেন না। সেইজন্য উপযুক্ত সময়েই তিনি নিশ্চেষ্ট ভারতকে সুকঠিন পীড়নের দ্বারা জাগ্রত করিয়াছেন।

বহুর মধ্যে ঐক্য-উপলব্ধি, বিচিত্রের মধ্যে ঐক্যস্থাপন— ইহাই ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম। ভারতবর্ষ পার্থক্যকে বিরোধ বলিয়া জানে না— সে পরকে শত্রু বলিয়া কল্পনা করে না। এইজন্যই ত্যাগ না করিয়া, বিনাশ না করিয়া, একটি বৃহৎ ব্যবস্থার মধ্যে সকলকেই সে স্থান দিতে চায়। এইজন্য সকল পন্থাকেই সে স্বীকার করে,— স্বস্থানে সকলেরই মাহাত্ম্য সে দেখিতে পায়।

ভারতবর্ষের এই গুণ থাকাতে, কোনো সমাজকে আমাদের বিরোধী কল্পনা করিয়া আমরা ভীত হইব না। প্রত্যেক নব নব সংঘাতে অবশেষে আমরা আমাদের বিস্তারেরই প্রত্যাশা করিব। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রীস্টান ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে পরস্পর লড়াই করিয়া মরিবে না— এইখানে তাহারা একটা সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইবে। সেই সামঞ্জস্য অহিন্দু হইবে না, তাহা বিশেষভাবে হিন্দু। তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যতই দেশবিদেশের হউক, তাহার প্রাণ, তাহার আত্মা ভারতবর্ষের।

আমরা ভারতবর্ষের বিধাতৃনির্দিষ্ট এই নিয়োগটি যদি স্মরণ করি তবে আমাদের লক্ষ্য স্থির হইবে, লজ্জা দূর হইবে— ভারতবর্ষের মধ্যে যে একটি মৃত্যুহীন শক্তি আছে তাহার সন্ধান পাইব। আমাদিগকে ইহা মনে রাখিতেই হইবে যে, য়ুরোপের জ্ঞানবিজ্ঞানকে যে চিরকালই আমরা শুদ্ধমাত্র ছাত্রের মতো গ্রহণ করিব, তাহা নহে— ভারতবর্ষের সরস্বতী জ্ঞানবিজ্ঞানের সমস্ত দল ও দলাদলিকে একটি শতদল পদ্মের মধ্যে বিকশিত করিয়া তুলিবেন, তাহাদের খণ্ডতা দূর করিবেন। আমাদের ভারতের মনীষী ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বস্তুতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব ও জন্তুতত্ত্বের ক্ষেত্রকে এক সীমানার মধ্যে আনিবার পক্ষে সহায়তা করিয়াছেন— মনস্তত্ত্বকেও যে তিনি কোনো-একদিন ইহাদের এক কোঠায় আনিয়া দাঁড় করাইবেন না, তাহা বলিতে

পারি না। এই ঐক্যসাধনই ভারতবর্ষীয় প্রতিভার প্রধান কাজ। ভারতবর্ষ কাহাকেও ত্যাগ করিবার, কাহাকেও দূরে রাখিবার পক্ষে নহে— ভারতবর্ষ সকলকেই স্বীকার করিবার, গ্রহণ করিবার, বিরাট একের মধ্যে সকলকেই স্বস্বপ্রধান প্রতিষ্ঠা উপলব্ধি করিবার পন্থা এই বিবাদনিরত ব্যবধানসংকুল পৃথিবীর সম্মুখে একদিন নির্দেশ করিয়া দিবে।

সেই সুমহৎ দিন আসিবার পূর্বে— "একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্!" যে একমাত্র মা দেশের প্রত্যেককে কাছে টানিবার, অনৈক্য ঘুচাইবার, রক্ষা করিবার জন্য নিয়ত ব্যাপৃত রহিয়াছেন, যিনি আপন ভাণ্ডারের চিরসঞ্চিত জ্ঞানধর্ম নানা আকারে নানা উপলক্ষ্যে আমাদের প্রত্যেকেরই অন্তঃকরণের মধ্যে অশ্রান্তভাবে সঞ্চার করিয়া আমাদের চিত্তকে সুদীর্ঘ পরাধীনতার নিশীথরাত্রে বিনাশ হইতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, মদোদ্ধত ধনীর ভিক্ষুশালার প্রান্তে তাঁহার একটুখানি স্থান করিয়া দিবার জন্য প্রাণপণ চীৎকার না করিয়া দেশের মধ্যস্থলে সন্তানপরিবৃত যজ্ঞশালায় তাঁহাকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করো। আমরা কি এই জননীর জীর্ণ গৃহ সংস্কার করিতে পারিব না। পাছে সাহেবের বাড়ির বিল চুকাইয়া উঠিতে না পারি, পাছে আমাদের সাজসজ্জা আসবাব-আড়ম্বরে কমতি পড়ে, এইজন্যই, আমাদের যে-মাতা একদিন অন্নপূর্ণা ছিলেন পরের পাকশালার দ্বারে তাঁহারই অন্নের ব্যবস্থা করিতে হইবে? আমাদের দেশ তো একদিন ধনকে তুচ্ছ করিতে জানিত, একদিন দারিদ্র্যকেও শোভন ও মহিমান্বিত করিতে শিখিয়াছিল,— আজ আমরা কি টাকার কাছে সাষ্টাঙ্গে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া আমাদের সনাতন স্বধর্মকে অপমানিত করিব। আজ আবার আমরা সেই শুচিশুদ্ধ, সেই মিতসংযত, সেই স্বল্পোপকরণ জীবনযাত্রা গ্রহণ করিয়া আমাদের তপস্বিনী জননীর সেবায় নিযুক্ত হইতে পারিব না? আমাদের দেশে কলার পাতায় খাওয়া তো কোনোদিন লজ্জাকর ছিল না, একলা খাওয়াই লজ্জাকর; সেই লজ্জা কি আমরা আর ফিরিয়া পাইব না। আমরা কি আজ সমস্ত দেশকে পরিবেশন করিতে প্রস্তুত হইবার জন্য নিজের কোনো আরাম কোনো আড়ম্বর পরিত্যাগ করিতে পারিব না। একদিন যাহা আমাদের পক্ষে নিতান্তই সহজ ছিল তাহা কি আমাদের পক্ষে আজ একেবারেই অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। কখনোই নহে। নিরতিশয় দুঃসময়েও ভারতবর্ষের নিঃশব্দ প্রকাণ্ড প্রভাব ধীরভাবে নিগূঢ়ভাবে আপনাকে জয়ী করিয়া তুলিয়াছে। আমি নিশ্চয় জানি, আমাদের দুই-চারি দিনের এই ইস্কুলের মুখস্থ বিদ্যা সেই চিরন্তন প্রভাবকে লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। আমি নিশ্চয় জানি, ভারতবর্ষের সুগম্ভীর আহ্বান

প্রতি মুহূর্তে আমাদের বক্ষঃকুহরে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে; এবং আমরা নিজের অলক্ষ্যে শনৈঃশনৈ সেই ভারতবর্ষের দিকেই চলিয়াছি। আজ যেখানে পথটি আমাদের মঙ্গলদীপোজ্জ্বল গৃহের দিকে চলিয়া গেছে সেইখানে আমাদের গৃহযাত্রারম্ভের অভিমুখে দাঁড়াইয়া "একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্!" একবার স্বীকার করো, মাতার সেবা স্বহস্তে করিবার জন্য অদ্য আমরা প্রস্তুত হইলাম; একবার স্বীকার করো যে, দেশের উদ্দেশে প্রত্যহ আমরা পূজার নৈবেদ্য উৎসর্গ করিব; একবার প্রতিজ্ঞা করো, জন্মভূমির সমস্ত মঙ্গল আমরা পরের কাছে নিঃশেষে বিকাইয়া দিয়া নিজেরা অত্যন্ত নিশ্চিন্তচিত্তে পদাহত অকালকুষ্মাণ্ডের ন্যায় অধঃপাতের সোপান হইতে সোপানান্তরে গড়াইতে গড়াইতে চরম লাঞ্ছনার তলদেশে আসিয়া উত্তীর্ণ হইব না।

‘স্বদেশী সমাজ’ প্রবন্ধের পরিশিষ্ট

স্বদেশী সমাজ শীর্ষক যে-প্রবন্ধ আমি প্রথমে মিনার্ভা ও পরে কর্জন রঙ্গমঞ্চে পাঠ করি, তৎসম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধেয় সুহৃৎ শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ গোস্বামী মহাশয় কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। নিজের ব্যক্তিগত কৌতূহলনিবৃত্তির জন্য এ প্রশ্নগুলি তিনি আমার কাছে পাঠান নাই, হিন্দুসমাজনিষ্ঠ ব্যক্তিমাত্রেরই যে যে স্থানে লেশমাত্র সংশয় উপস্থিত হইতে পারে, সেই সেই স্থানে তিনি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

কিন্তু প্রশ্নোত্তরের মতো লিখিতে গেলে লেখা নিতান্তই আদালতের সওয়ালজবাবের মতো হইয়া দাঁড়ায়। সেরূপ খাপছাড়া লেখায় সকল কথা সুস্পষ্ট হয় না, এইজন্য সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ আকারে আমার কথাটা পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করি।

কর্ণ যখন তাঁহার সহজ কবচটি ত্যাগ করিয়াছিলেন তখনই তাঁহার মৃত্যু ঘনাইয়াছিল, অর্জুন যখন তাঁহার গাণ্ডীব তুলিতে পারেন নাই তখনই তিনি সামান্য দস্যুর হাতে পরাস্ত হইয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায়, শক্তি সকলের এক জায়গায় নাই— কোনো দেশ নিজের অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে নিজের বল রক্ষা করে, কোনো দেশ নিজের সর্বাঙ্গে শক্তিকবচ ধারণ করিয়া জয়ী হয়।

যুরোপের যেখানে বল আমাদের সেখানে বল নহে। যুরোপ আত্মরক্ষার জন্য যেখানে উদ্যম প্রয়োগ করে আমাদের আত্মরক্ষার জন্য সেখানে উদ্যমপ্রয়োগ বৃথা। যুরোপের শক্তির ভাণ্ডার স্টেট অর্থাৎ সরকার। সেই স্টেট দেশের সমস্ত হিতকর

কর্মের ভার গ্রহণ করিয়াছে— স্টেটই ভিক্ষাদান করে, স্টেটই বিদ্যাদান করে, ধর্মরক্ষার ভারও স্টেটের উপর। অতএব এই স্টেটের শাসনকে সর্বপ্রকারে সবল, কর্মিষ্ঠ ও সচেতন করিয়া রাখা, ইহাকে আভ্যন্তরিক বিকলতা ও বাহিরের আক্রমণ হইতে বাঁচানোই য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রাণরক্ষার উপায়।

আমাদের দেশে কল্যাণশক্তি সমাজের মধ্যে। তাহা ধর্মরূপে আমাদের সমাজের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছে। সেইজন্যই এতকাল ধর্মকে সমাজকে বাঁচানোই ভারতবর্ষ একমাত্র আত্মরক্ষার উপায় বলিয়া জানিয়া আসিয়াছে। রাজত্বের দিকে তাকায় নাই, সমাজের দিকেই দৃষ্টি রাখিয়াছে। এইজন্য সমাজের স্বাধীনতাই যথার্থভাবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। কারণ, মঙ্গল করিবার স্বাধীনতাই স্বাধীনতা, ধর্মরক্ষার স্বাধীনতাই স্বাধীনতা।

এতকাল নানা দুর্বিপাকেও এই স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু এখন ইহা আমরা অচেতনভাবে, মূঢ়ভাবে পরের হাতে প্রতিদিন তুলিয়া দিতেছি। ইংরেজ আমাদের রাজত্ব চাহিয়াছিল, রাজত্ব পাইয়াছে, সমাজটাকে নিতান্ত উপরি-পাওনার মতো লইতেছে—ফাউ বলিয়া ইহা আমরা তাহার হাতে বিনামূল্যে তুলিয়া দিতেছি।

তাহার একটা প্রমাণ দেখো। ইংরেজের আইন আমাদের সমাজরক্ষার ভার লইয়াছে। হয়তো যথার্থভাবে রক্ষা করিতেছে, কিন্তু তাই বুঝিয়া খুশি থাকিলে চলিবে না। পূর্বকালে সমাজবিদ্রোহী সমাজের কাছে দণ্ড পাইয়া অবশেষে সমাজের সঙ্গে রফা করিত। সেই রফা-অনুসারে আপসে নিষ্পত্তি হইয়া যাইত। তাহার ফল হইত এই, সামাজিক কোনো প্রথার ব্যত্যয় যাহারা করিত তাহারা স্বতন্ত্র সম্প্রদায়রূপে সমাজের বিশেষ একটা স্থানে আশ্রয় লইত। এ-কথা কেহই বলিবেন না, হিন্দুসমাজে আচারবিচারের কোনো পার্থক্য নাই। পার্থক্য যথেষ্ট আছে, কিন্তু সেই পার্থক্য সামাজিক ব্যবহারগুণে গণ্ডিবদ্ধ হইয়া, পরস্পরকে আঘাত করে না।

আজ আর তাহা হইবার জো নাই। কোনো অংশে কোনো দল পৃথক হইতে গেলেই হিন্দুসমাজ হইতে তাহাকে ছিন্ন হইতে হয়। পূর্বে এরূপ ছিন্ন হওয়া একটা বিভীষিকা বলিয়া গণ্য হইত। কারণ, তখন সমাজ এরূপ সবল ছিল যে, সমাজকে অগ্রাহ্য করিয়া টিকিয়া থাকা সহজ ছিল না। সুতরাং যে-দল কোনো পার্থক্য অবলম্বন করিত সে উদ্ধতভাবে বাহির হইয়া যাইত না। সমাজও নিজের শক্তি সম্বন্ধে নিঃসংশয় ছিল বলিয়াই অবশেষে ঔদার্য প্রকাশ করিয়া পৃথকপন্থাবলম্বীকে যথাযোগ্যভাবে নিজের অঙ্গীভূত করিয়া লইত।

এখন যে-দল একটু পৃথক হয় তাহাকে ত্যাগ করিতে হয়। কারণ, ইংরেজের আইন কোন্‌টা হিন্দু কোন্‌টা অহিন্দু তাহা স্থির করিবার ভার লইয়াছে— রক্ষা করিবার ভার ইংরেজের হাতে নাই, সমাজের হাতেও নাই। তাহার কারণ, পৃথক হওয়ার দরুন কাহারও কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নাই—ইংরেজরচিত স্বতন্ত্র আইনের আশ্রয়ে কাহারও কিছুতে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে না। অতএব, এখন হিন্দুসমাজ কেবলমাত্র ত্যাগ করিতেই পারে। শুদ্ধমাত্র ত্যাগ করিবার শক্তি বলরক্ষা-প্রাণরক্ষার উপায় নহে।

আক্কেল দাঁত যখন ঠেলিয়া উঠিতে থাকে তখন বেদনায় অস্থির করে। কিন্তু যখন সে উঠিয়া পড়ে তখন শরীর তাহাকে সুস্থভাবে রক্ষা করে। যদি দাঁত উঠিবার কষ্টের কথা স্মরণ করিয়া দাঁতগুলাকে বিসর্জন দেওয়াই শরীর সাব্যস্ত করে তবে বুঝিব, তাহার অবস্থা ভালো নহে—বুঝিব, তাহার শক্তিহীনতা ঘটিয়াছে।

সেইরূপ সমাজের মধ্যে কোনোপ্রকার নূতন অভ্যুদয়কে স্বকীয় করিয়া লইবার শক্তি একেবারেই না থাকা, তাহাকে বর্জন করিতে নিরুপায়ভাবে বাধ্য হওয়া সমাজের সজীবতার লক্ষণ নহে; এবং এই বর্জন করিবার জন্য ইংরেজের আইনের সহায়তা লওয়া সামাজিক আত্মহত্যার উপায়।

যেখানেই সমাজ আপনাকে খণ্ডিত করিয়া খণ্ডটিকে আপনার বাহিরে ফেলিতেছে সেখানে যে কেবল নিজেকে ছোটো করিতেছে তাহা নহে—ঘরের পাশেই চিরস্থায়ী বিরোধ সৃষ্টি করিতেছে। কালে কালে ক্রমে ক্রমে এই বিরোধী পক্ষ যতই বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে, হিন্দুসমাজ ততই সপ্তরথীর বেষ্টনের মধ্যে পড়িবে। কেবলই খোয়াইতে থাকিব, এই যদি আমাদের অবস্থা হয় তবে নিশ্চয় দুশ্চিন্তার কারণ ঘটিয়াছে। পূর্বে আমাদের এ-দশা ছিল না। আমরা খোওয়াই নাই, আমরা ব্যবস্থাবদ্ধ করিয়া সমস্ত রক্ষা করিয়াছি—ইহাই আমাদের বিশেষত্ব, ইহাই আমাদের বল।

শুধু এই নয়, কোনো কোনো সামাজিক প্রথাকে অনিষ্টকর জ্ঞান করিয়া আমরা ইংরেজের আইনকে ঘাঁটাইয়া তুলিয়াছি, তাহাও কাহারও অগোচর নাই। যেদিন কোনো পরিবারে সন্তানদিগকে চালনা করিবার জন্য পুলিসম্যান ডাকিতে হয়, সেদিন আর পরিবাররক্ষার চেষ্টা কেন। সেদিন বনবাসই শ্রেয়।

মুসলমান সমাজ আমাদের এক পাড়াতেই আছে এবং খ্রীস্টানসমাজ আমাদের সমাজের ভিতের উপর বন্যার মতো ধাক্কা দিতেছে। প্রাচীন শাস্ত্রকারদের সময়ে এ-সমস্যাটা ছিল না। যদি থাকিত তবে তাঁহারা হিন্দুসমাজের সহিত এই-সকল

পরসমাজের অধিকার নির্ণয় করিতেন— এমনভাবে করিতেন যাহাতে পরস্পরের মধ্যে নিয়ত বিরোধ ঘটিত না। এখন কথায় কথায় ভিন্ন ভিন্ন পক্ষে দ্বন্দ্ব বাধিয়া উঠিতেছে, এই দ্বন্দ্ব অশান্তি, অব্যবস্থা ও দুর্বলতার কারণ।

যেখানে স্পষ্ট দ্বন্দ্ব বাধিতেছে না সেখানে ভিতরে ভিতরে অলক্ষিতভাবে সমাজ বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িতেছে। এই ক্ষয়রোগও সাধারণ রোগ নহে। এইরূপে সমাজ পরের সঙ্গে আপনার সীমানির্ণয় সম্বন্ধে কোনো কর্তৃত্বপ্রকাশ করিতেছে না; নিজের ক্ষয়নিবারণের প্রতিও তাহার কর্তৃত্ব জাগ্রত নাই। যাহা আপনি হইতেছে তাহাই হইতেছে; যখন ব্যাপারটা অনেকদূর অগ্রসর হইয়া পরিস্ফুট হইতেছে তখন মাঝে মাঝে হাল ছাড়িয়া বিলাপ করিয়া উঠিতেছে। কিন্তু, আজ পর্যন্ত বিলাপে কেহ বন্যাকে ঠেকাইতে পারে নাই এবং রোগের চিকিৎসাও বিলাপ নহে।

বিদেশী শিক্ষা বিদেশী সভ্যতা আমাদের মনকে আমাদের বুদ্ধিকে যদি অভিভূত করিয়া না ফেলিত তবে আমাদের সামাজিক স্বাধীনতা এত সহজে লুপ্ত হইতে বসিত না।

গুরুতর রোগে যখন রোগীর মস্তিষ্ক বিকল হয় তখনই ডাক্তার ভয় পায়। তাহার কারণ, শরীরের মধ্যে রোগের আক্রমণ-প্রতিরোধের যে-ব্যবস্থা তাহা মস্তিষ্কই করিয়া থাকে— সে যখন অভিভূত হইয়া পড়ে তখন বৈদ্যের ঔষধ তাহার সর্বপ্রধান সহায় হইতে বঞ্চিত হয়।

প্রবল ও বিচিত্র শক্তিশালী য়ুরোপীয় সভ্যতা অতি সহজে আমাদের মনকে অভিভূত করিয়াছে। সেই মনই সমাজের মস্তিষ্ক; বিদেশী প্রভাবের হাতে সে যদি আত্মসমর্পণ করে তবে সমাজ আর আপনার স্বাধীনতা রক্ষা করিবে কী করিয়া।

এইরূপে বিদেশী শিক্ষার কাছে সমাজের শিক্ষিত লোক হৃদয়মনকে অভিভূত হইতে দিয়াছে বলিয়া কেহ বা তাহাকে গালি দেয়, কেহ বা প্রহসনে পরিহাস করে। কিন্তু শান্তভাবে কেহ বিচার করে না যে, কেন এমনটা ঘটিতেছে।

ডাক্তাররা বলেন, শরীর যখন সবল ও সক্রিয় থাকে, তখন রোগের আক্রমণ ঠেকাইতে পারে। নিদ্রিত অবস্থায় সর্দিকাসি-ম্যালেরিয়া চাপিয়া ধরিবার অবসর পায়।

বিলাতি সভ্যতার প্রভাবকে রোগের সঙ্গে তুলনা করিলাম বলিয়া মার্জনা প্রার্থনা করি। স্বস্থানে সকল জিনিসই ভালো, অস্থানে পতিত ভালো জিনিসও জঞ্জাল। চোখের কাজল গালে লেপিলে লজ্জার বিষয় হইয়া উঠে। আমার উপমার ইহাই কৈফিয়ত।

যাহা হউক, আমাদের চিত্ত যদি সকল বিষয়ে সতেজ সক্রিয় থাকিত তাহা হইলে বিলাত আমাদের সে-চিত্তকে বিহ্বল করিয়া দিতে পারিত না।

দুর্ভাগ্যক্রমে ইংরেজ যখন তাহার কলবল, তাহার বিজ্ঞান-দর্শন লইয়া আমাদের দ্বারে আসিয়া পড়িল তখন আমাদের চিত্ত নিশ্চেষ্ট ছিল। যে-তপস্যার প্রভাবে ভারতবর্ষ জগতের গুরুপদে আসীন হইয়াছিল সেই তপস্যা তখন ক্ষান্ত ছিল। আমরা তখন কেবল মাঝে মাঝে পুঁথি রৌদ্রে দিতেছিলাম এবং গুটাইয়া ঘরে তুলিতেছিলাম। আমরা কিছুই করিতেছিলাম না। আমাদের গৌরবের দিন বহুদূর-পশ্চাতে দিগন্তরেখায় ছায়ার মতো দেখা যাইতেছিল। সম্মুখের পুষ্করিণীর পাড়িও সেই পর্বতমালার চেয়ে বৃহৎরূপে সত্যরূপে প্রত্যক্ষ হয়।

যাহা হউক, আমাদের মন যখন নিশ্চেষ্ট নিষ্ক্রিয় সেই সময়ে একটা সচেষ্ট শক্তি, শুষ্ক জ্যৈষ্ঠের সম্মুখে আষাঢ়ের মেঘাগমের ন্যায়, তাহার বজ্রবিদ্যুৎ, বায়ুবেগে ও বারিবর্ষণ লইয়া অকস্মাৎ দিগ্‌দিগন্ত বেষ্টন করিয়া দেখা দিল। ইহাতে অভিভূত করিবে না কেন।

আমাদের বাঁচিবার উপায় আমাদের নিজের শক্তিকে সর্বতোভাবে জাগ্রত করা। আমরা যে আমাদের পূর্বপুরুষের সম্পত্তি বসিয়া বসিয়া ফুঁকিতেছি, ইহাই আমাদের গৌরব নহে; আমরা সেই ঐশ্বর্য বিস্তার করিতেছি, ইহাই যখন সমাজের সর্বত্র আমরা উপলব্ধি করিব তখনই নিজের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা সঞ্জাত হইয়া আমাদের মোহ ছুটিতে থাকিবে।

আমাদের এই নিষ্ক্রিয় নিশ্চেষ্ট অবস্থা কেন ঘটিয়াছে, আমার প্রবন্ধে তাহার কারণ দেখাইয়াছি। তাহার কারণ ভীরুতা। আমাদের যাহা-কিছু ছিল তাহারই মধ্যে কুঞ্চিত হইয়া থাকিবার চেষ্টাই বিদেশী সভ্যতার আঘাতে আমাদের অভিভূত হইবার কারণ।

কিন্তু, প্রথমে যাহা আমাদিগকে অভিভূত করিয়াছিল তাহাই আমাদিগকে জাগ্রত করিতেছে। প্রথম সুপ্তিভঙ্গে যে প্রখর আলোক চোখে ধাঁধা লাগাইয়া দেয় তাহাই ক্রমশ আমাদের দৃষ্টিশক্তির সহায়তা করে। এখন আমরা সজাগভাবে সজ্ঞানভাবে নিজের দেশের আদর্শকে উপলব্ধি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে নিজের দেশের গৌরবকে বৃহৎভাবে প্রত্যক্ষভাবে দেখিতেছি।

এখন এই আদর্শকে কী করিয়া বাঁচানো যাইবে, সেই ব্যাকুলতা নানাপন্থানুসন্ধানে আমাদিগকে প্রবৃত্ত করিতেছে। যেমন আছি ঠিক তেমনি বসিয়া থাকিলেই যদি সমস্ত রক্ষা পাইত, তবে প্রতিদিন পদে পদে আমাদের এমন দুর্গতি ঘটিত না।

আমি যে ভাষার ছটায় মুগ্ধ করিয়া তলে তলে হিন্দুসমাজকে একাকার করিয়া দিবার মতলব মনে মনে আঁটিয়াছি, 'বঙ্গবাসী'র কোনো কোনো লেখক এরূপ আশঙ্কা অনুভব করিয়াছেন। আমার বুদ্ধিশক্তির প্রতি তাঁহার যতদূর গভীর অনাস্থা, আশা করি, অন্য দশ জনের ততদূর না থাকিতে পারে। আমার এই ক্ষীণহস্তে কি ভৈরবের সেই পিনাক আছে। প্রবন্ধ লিখিয়া আমি ভারতবর্ষ একাকার করিব! যদি এমন মতলবই আমার থাকিবে তবে আমার কথার প্রতিবাদেরই বা চেষ্টা কেন। কোনো বালক যদি নৃত্য করে, তবে তাহার মনে মনে ভূমিকম্পসৃষ্টির মতলব আছে, শঙ্কা করিয়া কেহ কি গৃহস্থদিগকে সাবধান করিয়া দিবার চেষ্টা করে।

ব্যবস্থাবুদ্ধির দ্বারা ভারতবর্ষ বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করে, এ-কথার অর্থ ইহা হইতেই পারে না, ভারতবর্ষ স্টীমরোলার বুলাইয়া সমস্ত বৈচিত্র্যকে সমভুম সমতল করিয়া দেয়। বিলাত পরকে বিনাশ করাই, পরকে দূর করাই আত্মরক্ষার উপায় বলিয়া জানে; ভারতবর্ষ পরকে আপন করাই আত্মসার্থকতা বলিয়া জানে। এই বিচিত্রকে এক করা, পরকে আপন করা যে একাকার নহে, পরন্তু পরস্পরের অধিকার সুস্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া, এ-কথা কি আমাদের দেশেও চীৎকার করিয়া বলিতে হইবে। আজ যদি বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করিতে, পরকে আপন করিতে না পারি— আমরাও যদি পদশব্দটি শুনিলেই, অতিথি-অভ্যাগত দেখিলেই, অমনি হাঁ হাঁঃ শব্দে লাঠি হাতে করিয়া ছুটিয়া যাই, তবে বুঝিব, পাপের ফলে আমাদের সমাজের লক্ষ্মী আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতেছেন এবং এই লক্ষ্মীছাড়া অরক্ষিত ভিটাকে আজ নিয়ত কেবল লাঠিয়ালি করিয়াই বাঁচাইতে হইবে— ইহার রক্ষাদেবতা যিনি সহাস্যমুখে সকলকে ডাকিয়া আনিয়া সকলকে প্রসাদের ভাগ দিয়া অতি নিঃশব্দে অতি নিরুপদ্রবে ইহাকে বাঁচাইয়া আসিয়াছেন, তিনি কখন ফাঁকি দিয়া অদৃশ্য হইবেন, তাহারই অবসর খুঁজিতেছেন।

গোস্বামী মহাশয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমি যেখানে নূতন নূতন যাত্রা-কথকতা প্রভৃতি রচনার প্রস্তাব করিয়াছি, সে-স্থলে 'নূতন' কথাটার তাৎপর্য কী। পুরাতনই যথেষ্ট নহে কেন।

রামায়ণের কবি রামচন্দ্রের পিতৃভক্তি, সত্যপালন, সৌভ্রাত্র, দাম্পত্য প্রেম, ভক্তবাৎসল্য প্রভৃতি অনেক গুণগান করিয়া যুদ্ধকাণ্ড পর্যন্ত ছয় কাণ্ড মহাকাব্য শেষ করিলেন; কিন্তু তবু নূতন করিয়া উত্তরকাণ্ড রচনা করিতে হইল। তাঁহার ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক গুণই যথেষ্ট হইল না, সর্বসাধারণের প্রতি তাঁহার কর্তব্যনিষ্ঠা

অত্যন্ত কঠিনভাবে তাঁহার পূর্ববর্তী সমস্ত গুণের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহার চরিতগানকে মুকুটিত করিয়া তুলিল।

আমাদের যাত্রা-কথকতায় অনেক শিক্ষা আছে, সে-শিক্ষা আমরা ত্যাগ করিতে চাই না, কিন্তু তাহার উপরে নূতন করিয়া আরো-একটি কর্তব্য শিক্ষা দিতে হইবে। দেবতা, সাধু, পিতা, গুরু, ভাই, ভৃত্যের প্রতি আমাদের কী কর্তব্য, তাঁহাদের জন্য কতদূর ত্যাগ করা যায়, তাহা শিখিব ; সেই সঙ্গে সাধারণের প্রতি দেশের প্রতি আমাদের কী কর্তব্য, তাহাও নূতন করিয়া আমাদিগকে গান করিতে হইবে,— ইহাতে কি কোনো পক্ষের বিশেষ শঙ্কার কারণ কিছু আছে ?

একটা প্রশ্ন উঠিয়াছে, সমুদ্রযাত্রার আমি সমর্থন করি কি না ; যদি করি তবে হিন্দুধর্মানুগত আচারপালনের বিধি রাখিতে হইবে কি না।

এ-সম্বন্ধে কথা এই, পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া পৃথিবীর পরিচয় হইতে বিমুখ হওয়াকে আমি ধর্ম বলি না। কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে এ-সমস্ত কথাকে অত্যন্ত প্রাধান্য দেওয়া আমি অনাবশ্যক জ্ঞান করি। কারণ, আমি এ-কথা বলিতেছি না যে, আমার মতেই সমাজগঠন করিতে হইবে। আমি বলিতেছি, আত্মরক্ষার জন্য সমাজকে জাগ্রত হইতে হইবে, কর্তৃত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। সমাজ যে-কোনো উপায়ে সেই কর্তৃত্ব লাভ করিলেই আপনার সমস্ত সমস্যার মীমাংসা আপনি করিবে। তাহার সেই স্বকৃত মীমাংসা কখন কিরূপ হইবে, আমি তাহা গণনা করিয়া বলিতে পারি না। অতএব প্রসঙ্গক্রমে আমি দু-চারিটা কথা যাহা বলিয়াছি, অতিশয় সূক্ষ্মভাবে তাহার বিচার করিতে বসা মিথ্যা। আমি যদি সুপ্ত জহরিকে ডাকিয়া বলি "ভাই, তোমার হীরামুক্তার দোকান সামলাও", তখন কি সে এই কথা লইয়া আলোচনা করিবে যে, কঙ্কণ-রচনার গঠন সম্বন্ধে তাহার সঙ্গে আমার মতভেদ আছে অতএব আমার কথা কর্ণপাতের যোগ্য নহে। তোমার কঙ্কণ তুমি যেমন খুশি গড়িয়ো, তাহা লইয়া তোমাতে আমাতে হয়তো চিরদিন বাদপ্রতিবাদ চলিবে, কিন্তু আপাতত চোখ জল দিয়া ধুইয়া ফেলো, তোমার মণিমাণিক্যের পসরা সামলাও— দস্যুর সাড়া পাওয়া গেছে এবং তুমি যখন অসাড় অচেতন হইয়া দ্বার জুড়িয়া পড়িয়া আছ তখন তোমার প্রাচীন ভিত্তির 'পরে সিঁধেলের সিঁধকাঠি এক মুহূর্ত বিশ্রাম করিতেছে না।

সফলতার সদুপায়

প্রাইমারি শিক্ষা বাংলাদেশে যখন চার উপভাষায় চালাইবার কথা হইয়াছিল তখন এই প্রবন্ধ রচিত হয়। সম্প্রতি সে সংকল্প বন্ধ হওয়াতে প্রবন্ধের স্থানে স্থানে বাদ দেওয়া গেল।

ভারতবর্ষে একচ্ছত্র ইংরেজ-রাজত্বের প্রধান কল্যাণই এই যে, তাহা ভারতবর্ষের নানাজাতিকে এক করিয়া তুলিতেছে। ইংরেজ ইচ্ছা না করিলেও এই ঐক্যসাধন-প্রক্রিয়া আপনা-আপনি কাজ করিতে থাকিবে। নদী যদি মনেও করে যে, সে দেশকে বিভক্ত করিবে, তবু সে এক দেশের সহিত আর-এক দেশের যোগসাধন করিয়া দেয়, বাণিজ্য বহন করে, তীরে তীরে হাটবাজারের সৃষ্টি করে, যাতায়াতের পথ উন্মুক্ত না করিয়া থাকিতে পারে না। ঐক্যহীন দেশে এক বিদেশী রাজার শাসনও সেইরূপ যোগের বন্ধন। বিধাতার এই মঙ্গল-অভিপ্রায়ই ভারতবর্ষে ব্রিটিশশাসনকে মহিমা অর্পণ করিয়াছে।

জগতের ইতিহাসে সর্বত্রই দেখা গেছে, এক পক্ষকে বঞ্চিত করিয়া অন্য পক্ষের ভালো কখনোই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না। ধর্ম সামঞ্জস্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই সামঞ্জস্য নষ্ট হইলেই ধর্ম নষ্ট হয় এবং—

ধর্ম এব হতো হন্তি ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।

ভারতসাম্রাজ্যের দ্বারা ইংরেজ বলী হইতেছে, কিন্তু ভারতকে যদি ইংরেজ বলহীন করিতে চেষ্টা করে তবে এই এক পক্ষের সুবিধা কোনোমতেই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারিবে না, তাহা আপনার বিপর্যয় আপনি ঘটাইবে; নিরস্ত্র, নিঃসত্ত্ব, নিরন্ন ভারতের দুর্বলতাই ইংরেজ-সাম্রাজ্যকে বিনাশ করিবে।

কিন্তু, রাষ্ট্রনীতিকে বড়ো করিয়া দেখিবার শক্তি অতি অল্প লোকের আছে। বিশেষত, লোভ যখন বেশি হয় তখন দেখিবার শক্তি আরো কমিয়া যায়। ভারতবর্ষকে চিরকালই আমাদের আয়ত্ত করিয়া রাখিব, অত্যন্ত লুব্ধভাবে যদি কোনো রাষ্ট্রনীতিক এমন অস্বাভাবিক কথা ধ্যান করিতে থাকেন তবে ভারতবর্ষকে দীর্ঘকাল রাখিবার উপায়গুলি তিনি নিশ্চয়ই ভুলিতে থাকেন। চিরকাল রাখা সম্ভবই নয়, তাহা জগতের নিয়মবিরুদ্ধ— ফলকেও গাছের পরিত্যাগ করিতেই হয়— চিরদিন বাঁধিয়া-ছাঁদিয়া রাখিবার আয়োজন করিতে গেলে বস্তুত যতদিন রাখা সম্ভব হইত তাহাকেও হ্রস্ব করিতে হয়।

অধীন দেশকে দুর্বল করা, তাহাকে অনৈক্যের দ্বারা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা, দেশের

কোনো স্থানে শক্তিকে সঞ্চিত হইতে না দেওয়া, সমস্ত শক্তিকে নিজের শাসনাধীনে নির্জীব করিয়া রাখা— এ বিশেষভাবে কোন্ সময়কার রাষ্ট্রনীতি? যে-সময়ে ওঅর্ডস্‌ওঅর্থ, শেলি, কীট্‌স, টেনিসন, ব্রাউনিং অন্তর্হিত এবং কিপলিং হইয়াছেন কবি; যে-সময়ে কার্লাইল, রাস্কিন, ম্যাথ্যু আর্নল্ড্ আর নাই, একমাত্র মর্লি অরণ্যে রোদন করিবার ভার লইয়াছেন; যে-সময়ে গ্ল্যাড্‌স্টোনের বজ্রগম্ভীর বাণী নীরব এবং চেম্বার্লেনের মুখর চটুলতায় সমস্ত ইংলণ্ড উদ্‌ভ্রান্ত, যে-সময়ে সাহিত্যের কুঞ্জবনে আর সে ভুবনমোহন ফুল ফোটে না— একমাত্র পলিটিক্সের কাঁটাগাছ অসম্ভব তেজ করিয়া উঠিতেছে; যে-সময়ে পীড়িতের জন্য, দুর্বলের জন্য, দুর্ভাগ্যের জন্য দেশের করুণা উচ্ছ্বসিত হয় না, ক্ষুধিত ইম্পীরিয়ালিজ্‌ম স্বার্থজাল বিস্তার করাকেই মহত্ত্ব বলিয়া গণ্য করিতেছে; যে-সময়ে বীর্যের স্থান বাণিজ্য অধিকার করিয়াছে এবং ধর্মের স্থান অধিকার করিয়াছে স্বাদেশিকতা— ইহা সেই সময়কার রাষ্ট্রনীতি।

কিন্তু এই সময়কে আমরাও দুঃসময় বলিব কি না বলিব, তাহা সম্পূর্ণ আমাদের নিজেদের উপর নির্ভর করিতেছে। সত্যের পরিচয় দুঃখের দিনেই ভালো করিয়া ঘটে, এই সত্যের পরিচয় ব্যতীত কোনো জাতির কোনোকালে উদ্ধার নাই। যাহা নিজে করিতে হয়, তাহা দরখাস্ত দ্বারা হয় না, যাহার জন্য স্বার্থত্যাগ করা আবশ্যক তাহার জন্য বাক্যব্যয় করিলে কোনো ফল নাই। এই সব কথা ভালো করিয়া বুঝাইবার জন্য বিধাতা দুঃখ দিয়া থাকেন। যতদিন ইহা না বুঝিব ততদিন দুঃখ হইতে দুঃখে, অপমান হইতে অপমানে বারংবার অভিহত হইতেই হইবে।

প্রথমত এই কথা আমাদিগকে ভালো করিয়া বুঝিতে হইবে কর্তৃপক্ষ যদি কোনো আশঙ্কা মনে রাখিয়া আমাদের মধ্যে ঐক্যের পথগুলিকে যথাসম্ভব রোধ করিতে উদ্যত হইয়া থাকেন, সে-আশঙ্কা কিরূপ প্রতিবাদের দ্বারা আমরা দূর করিতে পারি। সভাস্থলে কি এমন বাক্যের ইন্দ্রজাল আমরা সৃষ্টি করিব যাহার দ্বারা তাঁহারা এক মুহূর্তে আশ্বস্ত হইবেন। আমরা কি এমন কথা বলিতে পারি যে, ইংরেজ অনন্তকাল আমাদিগকে শাসনাধীনে রাখিবেন, ইহাই আমাদের একমাত্র শ্রেয়। যদি বা বলি, তবে ইংরেজ কি অপোগণ্ড অর্বাচীন যে এমন কথায় মুহূর্তকালের জন্য শ্রদ্ধাস্থাপন করিতে পারিবে? আমাদিগকে এ-কথা বলিতেই হইবে এবং না বলিলেও ইহা সুস্পষ্ট যে, যে পর্যন্ত না আমাদের নানাজাতির মধ্যে ঐক্যসাধনের শক্তি যথার্থভাবে স্থায়িভাবে উদ্ভূত হয় সে-পর্যন্ত ইংরেজের রাজত্ব আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয়, কিন্তু পরদিনেই আর নহে।

এমন স্থলে ইংরেজ যদি মমতায় মুগ্ধ হইয়া, যদি ইংরেজি জাতীয় স্বার্থের দিকে

তাকাইয়া— সেই স্বার্থকে যত বড়ো নামই দাও না কেন, না হয় তাহাকে ইম্পীরিয়ালিজ্‌মই বলো— যদি স্বার্থের দিকে তাকাইয়া ইংরেজ বলে, আমাদের ভারত-রাজ্যকে আমরা পাকাপাকি চিরস্থায়ী করিব, আমরা সমস্ত ভারতবর্ষকে এক হইতে দিবার নীতি অবলম্বন করিব না, তবে নিরতিশয় উচ্চ-অঙ্গের ধর্মোপদেশ ছাড়া এ কথার কী জবাব আছে। এ-কথাটা সত্য যে, আমাদের দেশে সাহিত্য ক্রমশই প্রাণবান বলবান হইয়া উঠিতেছে; এই সাহিত্য ক্রমশই অল্পে অল্পে সমাজের উচ্চ হইতে নিম্ন স্তর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে; যে-সকল জ্ঞান, যে-সকল ভাব কেবল ইংরেজিশিক্ষিতদের মধ্যেই বদ্ধ ছিল তাহা আপামর সাধারণের মধ্যে বিস্তারিত হইতেছে, এই উপায়ে ধীরে ধীরে সমস্ত দেশের ভাবনা, বেদনা, লক্ষ্য এক হইয়া পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে; এক সময়ে যে-সকল কথা কেবল বিদেশী পাঠশালার মুখস্থ কথা মাত্র ছিল এখন তাহা দিনে দিনে স্বদেশের ভাষায় স্বদেশের সাহিত্যে স্বদেশের আপন কথা হইয়া দাঁড়াইতেছে। আমরা কি বলিতে পারি,— না, তাহা হইতেছে না, এবং বলিলেই কি কাহারও চোখে ধুলা দেওয়া হইবে। জলন্ত দীপ কি শিখা নাড়িয়া বলিবে— না, তাহার আলো নাই?

এমন অবস্থায় ইংরেজ যদি এই উত্তরোত্তর ব্যাপ্যমান সাহিত্যের ঐক্যস্রোতকে অন্তত চারটে বড়ো বড়ো বাঁধ দিয়া বাঁধিয়া নিশ্চল ও নিস্তেজ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমরা কী বলিতে পারি? আমরা এই বলিতে পারি যে, এমন করিলে যে ক্রমশ আমাদের ভাষার উন্নতি প্রতিহত এবং আমাদের সাহিত্য নির্জীব হইয়া পড়িবে। যখন বাংলাদেশকে দুই অংশে ভাগ করিবার প্রস্তাব প্রথম উত্থাপিত হইয়াছিল তখনো আমরা বলিয়াছিলাম, এমন করিলে যে আমাদের মধ্যে প্রভেদ উত্তরোত্তর পরিণত ও স্থায়ী হইয়া দাঁড়াইবে। কাঠুরিয়া যখন বনস্পতির ডাল কাটে তখন যদি বনস্পতি বলে, আহা কী করিতেছ, অমন করিলে যে আমার ডালগুলা যাইবে— তবে কাঠুরিয়ার জবাব এই যে, ডাল কাটিলে যে ডাল কাটা পড়ে তাহা কি আমি জানি না, আমি কি শিশু! কিন্তু তবুও তর্কের উপরেই ভরসা রাখিতে হইবে?

আমরা জানি পার্লামেণ্টেও তর্ক হয়, সেখানে এক পক্ষ আর-এক পক্ষের জবাব দেয়; সেখানে এক পক্ষ আর-এক পক্ষকে পরাস্ত করিতে পারিলে ফললাভ করিল বলিয়া খুশি হয়। আমরা কোনোমতেই ভুলিতে পারি না— এখানেও ফললাভের উপায় সেই একই।

কিন্তু উপায় এক হইতেই পারে না। সেখানে দুই পক্ষই যে বাম হাত ডান হাতের ন্যায় একই শরীরের অঙ্গ। তাহাদের উভয়ের শক্তির আধার যে একই।

আমরাও কি তেমনি একই? গবর্মেণ্টের শক্তির প্রতিষ্ঠা যেখানে আমাদেরও শক্তির প্রতিষ্ঠা কি সেইখানে? তাঁহারা যে-ডাল নাড়া দিলে যে-ফল পড়ে আমরাও কি সেই ডালটা নাড়িলেই সেই ফল পাইব? উত্তর দিবার সময় পুঁথি খুলিয়ো না; এ-সম্বন্ধে মিল কী বলিয়াছেন, স্পেনসর কী বলিয়াছেন, সীলি কী বলিয়াছেন, তাহা জানিয়া আমার সিকি পয়সার লাভ নাই। প্রত্যক্ষ শাস্ত্র সমস্ত দেশ ব্যাপ্ত করিয়া খোলা রহিয়াছে। খুব বেশিদূর তলাইবার দরকার নাই, নিজের মনের মধ্যেই একবার দৃষ্টিপাত করো না। যখন য়ুনিভার্সিটি-বিল লইয়া আমাদের মধ্যে একটা আন্দোলন উঠিয়াছিল, তখন আমরা কিরূপ সন্দেহ করিয়াছিলাম। আমরা সন্দেহ করিয়াছিলাম যে, গবর্মেণ্ট আমাদের বিদ্যার উন্নতিকে বাধা দিবার চেষ্টা করিতেছেন। কেন এরূপ করিতেছেন। কারণ, লেখাপড়া শিখিয়া আমরা শাসন সম্বন্ধে অসন্তোষ অনুভব করিতে এবং প্রকাশ করিতে শিখিয়াছি। মনেই করো, আমাদের এ সন্দেহ ভুল, কিন্তু তবু ইহা জন্মিয়াছিল, তাহাতে ভুল নাই।

যে-দেশে পার্লামেণ্ট আছে সে-দেশেও এডুকেশন-বিল লইয়া ঘোরতর বাদ-বিবাদ চলিয়াছিল— কিন্তু দুই প্রতিপক্ষের মধ্যে কি কোনো লোক স্বপ্নেও এমন সন্দেহ করিতে পারিত যে, যেহেতু শিক্ষালাভের একটা অনিবার্য ফল এই যে, ইহার দ্বারা লোকের আশা-আকাঙ্ক্ষা সংকীর্ণতা পরিহার করে, নিজের শক্তি সম্বন্ধে তাহার মন সচেতন হইয়া ওঠে এবং সেই শক্তি প্রয়োগ করিবার ক্ষেত্র বিস্তার করিতে সে ব্যগ্র হয়, অতএব এতবড়ো বালাইকে প্রশ্রয় না দেওয়াই ভালো। কখনোই নহে, উভয় পক্ষই এই কথা মনে করিয়াছিল যে, দেশের মঙ্গলসাধন সম্বন্ধে পরস্পর ভ্রমে পড়িয়াছে। ভ্রমসংশোধন করিয়া দিবা মাত্র তাহার ফল হাতে হাতে, অতএব সেখানে তর্ক করা এবং কার্য করা একই।

আমাদের দেশে সে-কথা খাটে না। কারণ, কর্তার ইচ্ছা কর্ম, এবং আমরা কর্তা নহি। তার্কিক বলিয়া থাকেন, "সে কী কথা। আমরা যে বহুকোটি টাকা সরকারকে দিয়া থাকি, এই টাকার উপরেই যে সরকারের নির্ভর; আমাদের কর্তৃত্ব থাকিবে না কেন। আমরা এই টাকার হিসাব তলব করিব।" গোরু যে নন্দনন্দনকে দুই বেলা দুধ দেয়, সেই দুধ খাইয়া নন্দনন্দন যে বেশ পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন, গোরু কেন শিং নাড়িয়া নন্দনন্দনের কাছ হইতে দুধের হিসাব তলব না করে! কেন যে না করে, তাহা গোরুর অন্তরাত্মাই জানে এবং তাহার অন্তর্যামীই জানেন।

সাদা কথা এই যে, অবস্থাভেদে উপায়ের বিভিন্নতা ঘটিয়া থাকে। মনে করো না কেন, ফরাসি রাষ্ট্রের নিকট হইতে ইংরেজ যদি কোনো সুবিধা আদায়ের মতলব করে,

তবে ফরাসি প্রেসিডেন্টকে তর্কে নিরুত্তর করিবার চেষ্টা করে না, এমন কি, তাহাকে ধর্মোপদেশও শোনায় না— তখন ফরাসি কর্তৃপক্ষের মন পাইবার জন্য তাহাকে নানাপ্রকার কৌশল অবলম্বন করিতে হয়— এইজন্যই কৌশলী রাজদূত নিয়তই ফ্রান্সে নিযুক্ত আছে। শুনা যায়, একদা জর্মনি যখন ইংলণ্ডের বন্ধু ছিল তখন ডিউক-উপাধিধারী ইংরেজ রাজদূত ভোজনসভায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া জর্মনরাজের হাতে তাঁহার হাত মুছিবার গামছা তুলিয়া দিয়াছেন। ইহাতে অনেক কাজ পাইয়াছিলেন। এমন একদিন ছিল যেদিন মোগল-সভায়, নবাবের দরবারে, ইংরেজকে বহু তোষামোদ, বহু অর্থব্যয়, বহু গুপ্ত কৌশল অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। সেদিন কত গায়ের জ্বালা যে তাঁহাদিগকে আশ্চর্য প্রসন্নতার সহিত গায়ে মিলাইতে হইয়াছিল, তাহার সীমাসংখ্যা নাই। পরের সঙ্গে সুযোগের ব্যবসায় করিতে গেলে ইহা অবশ্যম্ভাবী।

আর, আমাদের দেশে আমাদের মতো নিরুপায় জাতিকে যদি প্রবল পক্ষের নিকট হইতে কোনো সুযোগলাভের চেষ্টা করিতে হয়, তবে কি আন্দোলনের দ্বারাতেই তাহা সফল হইবে? যে-দুধের মধ্যে মাখন আছে সেই দুধে আন্দোলন করিলে মাখন উঠিয়া পড়ে; কিন্তু মাখনের দুধ রহিল গোয়াল-বাড়িতে, আর আমি আমার ঘরের জলে অহরহ আন্দোলন করিতে রহিলাম, ইহাতে কি মাখন জুটিবে। যাঁহারা পুঁথিপন্থী তাঁহারা বুক ফুলাইয়া বলিবেন,—আমরা তো কোনোরূপ সুযোগ চাই না, আমরা ন্যায্য অধিকার চাই। আচ্ছা, সেই কথাই ভালো। মনে করো, তোমার সম্পত্তি যদি তামাদি হইয়া থাকে তাহা হইলে ন্যায্য স্বত্বও যে দখলিকারের মন জোগাইয়া উদ্ধারের চেষ্টা করিতে হয়। গবর্মেণ্ট বলিতে তো একটা লোহার কল বোঝায় না। তাহার পশ্চাতে যে রক্তমাংসের মানুষ আছে— তাঁহারা যে ন্যূনাধিকপরিমাণে ষড়রিপুর বশীভূত। তাঁহারা রাগদ্বেষের হাত এড়াইয়া একেবারে জীবন্মুক্ত হইয়া এ-দেশে আসেন নাই। তাঁহারা অন্যায় করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহা হাতে হাতে ধরাইয়া দেওয়াই যে অন্যায়-সংশোধনের সুন্দর উপায়, এমন কথা কেহ বলিবে না। এমন কি যেখানে আইনের তর্ক ধরিয়াই কাজ হয়, সেই আদালতের উকিল শুদ্ধমাত্র তর্কের জোর ফলাইতে সাহস করে না; জজের মন বুঝিয়া অনেক সময় ভালো তর্কও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হয়, অনেক সময় বিচারকের কাছে মৌখিক পরাভব স্বীকারও করিতে হয়— তাহার কারণ, জজ তো আইনের পুঁথিমাত্র নহেন, তিনি সজীব মনুষ্য। যিনি আইন প্রয়োগ করিবেন, তাঁহার সম্বন্ধে যদি এত বাঁচাইয়া চলিতে হয়, যিনি আইন সৃষ্টি করিবেন তাঁহার মনুষ্যস্বভাবের প্রতি কি একেবারে দৃক্‌পাত করাও প্রয়োজন হইবে না।

কিন্তু আমাদের যে কী ব্যবস্থা, কী উদ্দেশ্য এবং কী উপায়, তাহা আমরা স্পষ্ট করিয়া ভাবিয়া দেখি না। যুদ্ধে যেমন জয়লাভটাই মুখ্য লক্ষ্য, পলিটিক্সে সেইরূপ উদ্দেশ্যসিদ্ধিটাই যে প্রধান লক্ষ্য, তাহা যদি বা আমরা মুখে বলি, তবু মনের মধ্যে সে-কথাটাকে আমল দিই না। মনে করি, আমাদের পোলিটিক্যাল কর্তব্যক্ষেত্র যেন স্কুল-বালকের ডিবেটিং ক্লাব— গবর্মেণ্ট যেন আমাদের সহপাঠি প্রতিযোগী ছাত্র, যেন জবাব দিতে পারিলেই আমাদের জিত হইল। শাস্ত্রমতে চিকিৎসা অতি সুন্দর হইয়াও যেরূপ রোগী মরে, আমাদের এখানেও বক্তৃতা অতি চমৎকার হইয়াও কার্য নষ্ট হয়, ইহার দৃষ্টান্ত প্রত্যহ দেখিতেছি।

কিন্তু আমি আজ আমার দেশের লোকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতেছি—আমার যা-কিছু বক্তব্য, সে তাঁহাদেরই প্রতি। তাঁহাদের কাছে মনের কথা বলিবার এই একটা উপলক্ষ্য ঘটিয়াছে বলিয়াই আজ এখানে আসিয়াছি। নহিলে, এই-সমস্ত বাদবিবাদের উন্মাদনা, এই সকল ক্ষণস্থায়ী উত্তেজনার ঘূর্ণিনৃত্যের মধ্যে পাক খাইয়া ফিরিতে আমার এক দিনের জন্যও উৎসাহ হয় না। জীবনের প্রদীপটিতে যদি আলোক জ্বালাইতে হয়, তবে সে কি এমন এলোমেলো হাওয়ার মুখে চলে। আমাদের দেশে এখন নিভৃতে চিন্তা ও নিঃশব্দে কাজ করিবার দিন— ক্ষণে ক্ষণে বারংবার নিজের শক্তির অপব্যয় এবং চিত্তের বিক্ষেপ ঘটাইবার এখন সময় নহে। যে অবিচলিত অবকাশ এবং অক্ষুব্ধ শান্তির মধ্যে বীজ ধীরে ধীরে অঙ্কুরে ও অঙ্কুর দিনে দিনে বৃক্ষে পরিণত হয়, তাহা সম্প্রতি আমাদের দেশে দুর্লভ হইয়া উঠিতেছে। ছোটো ছোটো আঘাত নানাদিক হইতে আসিয়া পড়ে— হাতে হাতে প্রতিশোধ বা উপস্থিত-প্রতিকারের জন্য দেশের মধ্যে ব্যস্ততা জন্মে, সেই চতুর্দিকে ব্যস্ততার চাঞ্চল্য হইতে নিজেকে রক্ষা করা কঠিন। রোগের সময় যখন হঠাৎ এখানে বেদনা ওখানে দাহ উপস্থিত হইতে থাকে, তখন তখনই-তখনই সেটা নিবারণের জন্য রোগী অস্থির না হইয়া থাকিতে পারে না। যদিও জানে অস্থিরতা বৃথা, জানে এই সমস্ত স্থানিক ও সাময়িক জ্বালাযন্ত্রণার মূলে যে ব্যাধি আছে তাহার ঔষধ চাই এবং তাহার উপশম হইতে সময়ের প্রয়োজন, তবু চঞ্চল হইয়া উঠে। আমরাও তেমনি প্রত্যেক তাড়নার জন্য স্বতন্ত্রভাবে অস্থির হইয়া মূলগত প্রতিকারের প্রতি অমনোযোগী হই। সেই অস্থিরতায় আজ আমাকে এখানে আকর্ষণ করে নাই— কর্তৃপক্ষের বর্তমান প্রস্তাবকে অযৌক্তিক প্রতিপন্ন করিয়া আমাদের যে ক্ষণিক বৃথা তৃপ্তি, তাহাই ভোগ করিবার জন্য আমি এখানে উপস্থিত হই নাই; আমি দুটো-একটা গোড়ার কথা স্বদেশী লোকের কাছে উত্থাপন করিবার সুযোগ পাইয়া

এই সভায় আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছি। যে জাতীয় কথাটা লইয়া আমাদের সম্প্রতি ক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছে এবং মাঝে মাঝে বারংবার ক্ষোভ উপস্থিত হয়, তাহাকে তাহার পশ্চাদ্‌বর্তী বৃহৎ আশ্রয়ভূমির সহিত সংযুক্ত করিয়া না দেখিলে আমাদের সামঞ্জস্য বোধ পীড়িত হইবে। প্রাথমিক শিক্ষাবিধিঘটিত আক্ষেপটাকে আমি সামান্য উপলক্ষ্যস্বরূপ করিয়া তাহার বিপুল আধার-ক্ষেত্রটাকে আমি প্রধানভাবে লক্ষ্যগোচর করিবার যদি চেষ্টা করি, তবে দয়া করিয়া আমার প্রতি সকলে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিবেন না।

আমি নিজের সম্বন্ধে একটা কথা কবুল করিতে চাই। কর্তৃপক্ষ আমাদের প্রতি কোন্‌দিন কিরূপ ব্যবহার করিলেন, তাহা লইয়া আমি নিজেকে অতিমাত্র ক্ষুব্ধ হইতে দিই না। আমি জানি, প্রত্যেক বার মেঘ ডাকিলেই বজ্র পড়িবার ভয়ে অস্থির হইয়া বেড়াইলে কোনো লাভ নাই। প্রথমত, বজ্র পড়িতেও পারে, না-ও পড়িতে পারে। দ্বিতীয়ত, যেখানে বজ্র পড়ার আয়োজন হইতেছে সেখানে আমার গতিবিধি নাই; আমার পরামর্শ, প্রতিবাদ বা প্রার্থনা সেখানে স্থান পায় না। তৃতীয়ত, বজ্রপাতের হাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার যদি কোনো উপায় থাকে তবে সে উপায় ক্ষীণকণ্ঠে বজ্রের পাল্টা জবাব দেওয়া নহে, সে-উপায় বিজ্ঞানসম্মত চেষ্টার দ্বারাই লভ্য। যেখান হইতে বজ্র পড়ে সেইখান হইতে সঙ্গে সঙ্গে বজ্রনিবারণের তাম্রদণ্ডটাও নামিয়া আসে না, সেটা শান্তভাবে বিচারপূর্বক নিজেকেই রচনা করিতে হয়।

বস্তুত, আজ যে পোলিটিকাল প্রসঙ্গ লইয়া এ-সভায় উপস্থিত হইয়াছি সেটা হয়তো সম্পূর্ণ ফাঁকা আওয়াজ, কিন্তু কাল আবার আর-একটা কিছু মারাত্মক ব্যাপার উঠিয়া পড়া আশ্চর্য নহে। ঘড়ি-ঘড়ি এমন কতবার ছুটাছুটি করিতে হইবে? আজ যাঁহার দ্বারে মাথা খুঁড়িয়া মরিলাম তিনি সাড়া দিলেন না— অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিলাম, ইহার মেয়াদ ফুরাইলে যিনি আসিবেন তাঁহার যদি দয়ামায়া থাকে। তিনি যদি বা দয়া করেন তবু আশ্বস্ত হইবার জো নাই, আর-এক ব্যক্তি আসিয়া দয়ালুর দান কানে ধরিয়া আদায় করিয়া তাহার হাল-নাগাদ সুদসুদ্ধ কাটিয়া লইতে পারেন। এতবড়ো অনিশ্চয়ের উপরে আমাদের সমস্ত আশাভরসা স্থাপন করা যায়?

প্রাকৃতিক নিয়মের উপরে ক্ষোভ চলে না। "সনাতন ধর্মশাস্ত্রমতে আমার পাখা পোড়ানো উচিত নয়" বলিয়া পতঙ্গ যদি আগুনে ঝাঁপ দিয়া পড়ে, তবু তাহার পাখা পুড়িবে। সে-স্থলে ধর্মের কথা আওড়াইয়া সময় নষ্ট না করিয়া আগুনকে দূর হইতে নমস্কার করাই তাহার কর্তব্য হইবে। ইংরেজ আমাদিগকে শাসন করিবে,

আমাদিগকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করিবে, যেখানে তাহার শাসনসন্ধি শিথিল হইবার লেশমাত্র আশঙ্কা করিবে, সেইখানেই তৎক্ষণাৎ বলপূর্বক দুটো পেরেক ঠুকিয়া দিবে, ইহা নিতান্তই স্বাভাবিক— পৃথিবীর সর্বত্রই এইরূপ হইয়া আসিতেছে— আমরা সূক্ষ্ম তর্ক করিতে এবং নিখুঁত ইংরেজি বলিতে পারি বলিয়াই যে ইহার অন্যথা হইবে, তা হইবে না। এরূপ স্থলে আর যাই হোক, রাগারাগি করা চলে না।

মানুষ প্রাকৃতিক নিয়মের উপরে উঠিতে পারে না যে তাহা নহে, কিন্তু সেটাকে প্রাত্যহিক হিসাবের মধ্যে আনিয়া ব্যবসা করা চলে না। হাতের কাছে একটা দৃষ্টান্ত মনে পড়িতেছে। সেদিন কাগজে পড়িয়াছিলাম, ডাক্তার চন্দ্র খ্রীস্টানমিশনে লাখখানেক টাকা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন— আইনঘটিত ত্রুটি থাকাতে তাঁহার মৃত্যুর পরে মিশন সেই টাকা পাওয়ার অধিকার হারাইয়াছিল। কিন্তু ডাক্তার চন্দ্রের হিন্দুভ্রাতা আইনের বিরূপতাসত্ত্বেও তাঁহার ভ্রাতার অভিপ্রায় স্মরণ করিয়া এই লাখ টাকা মিশনের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। তিনি ভ্রাতৃসত্য রক্ষা করিয়াছেন। যদি না করিতেন, যদি বলিতেন, আমি হিন্দু হইয়া খ্রীস্টান ধর্মের উন্নতির জন্য টাকা দিব কেন— আইনমতে যাহা আমার, তাহা আমি ছাড়িব না। এ-কথা বলিলে তাঁহাকে নিন্দা করিবার জো থাকিত না। কারণ সাধারণত আইন বাঁচাইয়া চলিলেই সমাজ নীরব থাকে। কিন্তু আইনের উপরেও যে ধর্ম আছে, সেখানে সমাজের কোনো দাবি খাটে না, সেখানে যিনি যান তিনি নিজের স্বাধীন মহত্ত্বের জোরে যান, মহতের গৌরবই তাই; তাঁহার ওজনে সাধারণকে পরিমাণ করা চলে না।

ইংরেজ যদি বলিত, জিত দেশের প্রতি বিদেশী বিজেতার যে-সকল সর্বসম্মত অধিকার আছে, তাহা আমরা পরিত্যাগ করিব, কারণ ইহারা বেশ ভালো বাগ্মী; যদি বলিত, বিজিত পরদেশী সম্বন্ধে অল্পসংখ্যক বিজেতা স্বাভাবিক আশঙ্কাবশত যে-সকল সতর্কতার কঠোর ব্যবস্থা করে, তাহা আমরা করিব না; যদি বলিত, আমাদের স্বদেশে স্বজাতির কাছে আমাদের গবর্মেণ্ট সকল বিষয়ে যেরূপ খোলসা জবাবদিহি করিতে বাধ্য, এখানেও সেরূপ সম্পূর্ণভাবে বাধ্যতা স্বীকার করিব; সেখানে সরকারের কোনো ভ্রম হইলে তাহাকে যেরূপ প্রকাশ্যে তাহা সংশোধন করিতে হয়, এখানেও সেইরূপ করিতে হইবে; এ-দেশ কোনো অংশেই আমাদের নহে, ইহা সম্পূর্ণই এ-দেশবাসীর, আমরা যেন কেবলমাত্র খবদারি করিতে আসিয়াছি এমনিতরো নিরাসক্তভাবে কাজ করিয়া যাইব— তবে আমাদের মতো লোককে ধুলায় লুণ্ঠিত হইয়া বলিতে হইত, তোমরা অত্যন্ত মহৎ, আমরা তোমাদের তুলনায় এত

অধম যে, এ-দেশে যতকাল তোমাদের পদধূলি পড়িবে ততকাল আমরা ধন্য হইয়া থাকিব। অতএব, তোমরা আমাদের হইয়া পাহারা দাও, আমরা নিদ্রা দিই; তোমরা আমাদের হইয়া মূলধন খাটাও এবং তাহার লাভটা আমাদের তহবিলে জমা হইতে থাক্; আমরা মুড়ি খাই তোমরা চাহিয়া দেখো, অথবা তোমরা চাহিয়া দেখো, আমরা মুড়ি খাইতে থাকি। কিন্তু ইংরেজ এত মহৎ নয় বলিয়া আমাদের পক্ষে অত্যন্ত বিচলিত হওয়া শোভা পায় না, বরঞ্চ কৃতজ্ঞ হওয়াই উচিত। দূরব্যাপী পাকা বন্দোবস্ত করিতে হইলে মানুষের হিসাবে বিচার করিলেই কাজে লাগে— সেই হিসাবে যা পাই তাই ভালো, তাহার উপরে যাহা জোটে সেটা নিতান্তই উপরি-পাওনা, তাহার জন্য আদালতে দাবি চলে না, এবং কেবলমাত্র ফাঁকি দিয়া সেরূপ উপরি-পাওনা যাহার নিয়তই জোটে, তাহাকে দুর্গতি হইতে কেহ রক্ষা করিতে পারে না।

একটা কথা মনে রাখিতেই হইবে, ইংরেজের চক্ষে আমরা কতই ছোটো। সুদূর য়ুরোপের নিত্যলীলাময় সুবৃহৎ পোলিটিকাল রঙ্গমঞ্চের প্রান্ত হইতে ইংরেজ আমাদিগকে শাসন করিতেছে— ফরাসি, জর্মান, রুশ, ইটালিয়ান, মার্কিন এবং তাহার নানা স্থানের নানা ঔপনিবেশিকের সঙ্গে তাহার রাষ্ট্রনৈতিক সম্বন্ধ বিচিত্র জটিল— তাহাদের সম্বন্ধে সর্বদাই তাহাকে অনেক বাঁচাইয়া চলিতে হয়; আমরা এই বিপুল পোলিটিকাল ক্ষেত্রের সীমান্তরে পড়িয়া আছি, আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা রাগদ্বেষের প্রতি তাহাকে তাকাইয়া থাকিতে হয় না, সুতরাং তাহার চিত্ত আমাদের সম্বন্ধে অনেকটা নির্লিপ্ত থাকে, এইজন্যই ভারতবর্ষের প্রসঙ্গ পার্লামেন্টের এমন তন্দ্রাকর্ষক,— ইংরেজ স্রোতের জলের মতো নিয়তই এ-দেশের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে, এখানে তাহার কিছুই সঞ্চিত হয় না, তাহার হৃদয় এখানে মূল বিস্তার করে না, ছুটির দিকে তাকাইয়া কর্ম করিয়া যায়, যেটুকু আমোদ-আহ্লাদ করে, সেও স্বজাতির সঙ্গে— এখানকার ইতিবৃত্তচর্চার ভার জর্মানদের উপরে, এখানকার ভাষার সহিত পরিচয় সাক্ষীর জবানবন্দিসূত্রে, এখানকার সাহিত্যের সহিত পরিচয় গেজেটে গবর্মেন্ট-অনুবাদকের তালিকাপাঠে— এমন অবস্থায় আমরা ইহাদের নিকট যে কত ছোটো, তাহা নিজের প্রতি মমত্ববশত আমরা ভুলিয়া যাই, সেইজন্যই আমাদের প্রতি ইংরেজের ব্যবহারে আমরা ক্ষণে ক্ষণে বিস্মিত হই, ক্ষুব্ধ হইয়া উঠি এবং আমাদের সেই ক্ষোভ-বিস্ময়কে অত্যুক্তিজ্ঞানে কর্তৃপক্ষগণ কখনো বা ক্রুদ্ধ হন, কখনো বা হাস্যসংবরণ করিতে পারেন না।

আমি ইহা ইংরেজের প্রতি অপবাদের স্বরূপ বলিতেছি না। আমি বলিতেছি,

ব্যাপারখানা এই, এবং ইহা স্বাভাবিক। এবং ইহাও স্বাভাবিক যে, যে-পদার্থ এত ক্ষুদ্র তাহার মর্মান্তিক বেদনাকেও, তাহার সাংঘাতিক ক্ষতিকেও স্বতন্ত্র করিয়া বিশেষ করিয়া দেখিবার শক্তি উপরওয়ালার যথেষ্ট পরিমাণে থাকিতে পারে না। যাহা আমাদের পক্ষে প্রচুর তাহাও তাহাদের কাছে তুচ্ছ বলিয়াই মনে হয়। আমার ভাষাটি লইয়া, আমার সাহিত্যটি লইয়া, আমার বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ভাগবিভাগ লইয়া, আমার একটুখানি মিউনিসিপালিটি লইয়া, আমার এই সামান্য য়ুনিভার্সিটি লইয়া আমরা ভয়ে ভাবনায় অস্থির হইয়া দেশময় চীৎকার করিয়া বেড়াইতেছি,— আশ্চর্য হইতেছি, এত কলরবেও মনের মতো ফল পাইতেছি না কেন। ভুলিয়া যাই, ইংরেজ আমাদের উপরে আছে, আমাদের মধ্যে নাই। তাহারা যেখানে আছে সেখানে যদি যাইতে পারিতাম, তাহা হইলে দেখিতে পাইতাম, আমরা কতই দূরে পড়িয়াছি, আমাদিগকে কতই ক্ষুদ্র দেখাইতেছে।

আমাদিগকে এত ছোটো দেখাইতেছে বলিয়াই সেদিন কর্জন সাহেব অমন অত্যন্ত সহজ কথার মতো বলিয়াছিলেন, তোমরা আপনাদিগকে ইম্পীরিয়ালতন্ত্রের মধ্যে বিসর্জন দিয়া গৌরববোধ করিতে পার না কেন। সর্বনাশ, আমাদের প্রতি এ কিরূপ ব্যবহার! এ যে একেবারে প্রণয়-সম্ভাষণের মতো শুনাইতেছে! এই অস্ট্রেলিয়া বল, ক্যানেডা বল, যাহাদিগকে ইংরেজ ইম্পীরিয়াল-আলিঙ্গনের মধ্যে বদ্ধ করিতে চায়, তাহাদের শয়নগৃহের বাতায়নতলে দাঁড়াইয়া অপর্যাপ্ত প্রেমের সংগীতে সে আকাশ মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে, ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলিয়া নিজের রুটি পর্যন্ত দুর্মূল্য করিতে রাজি হইয়াছে— তাহাদের সহিত আমাদের তুলনা! এতবড়ো অত্যুক্তিতে যদি কর্তার লজ্জা না হয়, আমরা যে লজ্জা বোধ করি। আমরা অস্ট্রেলিয়ায় তাড়িত, নাটালে লাঞ্ছিত, স্বদেশেও কর্তৃত্ব-অধিকার হইতে কতদিকেই বঞ্চিত, এমন স্থলে ইম্পীরিয়াল বাসরঘরে আমাদিগকে কোন্ কাজের জন্য নিমন্ত্রণ করা হইতেছে! কর্জন সাহেব আমাদের সুখদুঃখের সীমানা হইতে বহু ঊর্ধ্বে বসিয়া ভাবিতেছেন, ইহারা এত নিতান্তই ক্ষুদ্র, তবে ইহারা কেন ইম্পীরিয়ালের মধ্যে একেবারে বিলুপ্ত হইতে রাজি হয় না, নিজের এতটুকু স্বাতন্ত্র্য, এতটুকু ক্ষতিলাভ লইয়া এত ছটফট করে কেন। এ কেমনতরো— যেমন একটা যজ্ঞে যেখানে বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে সেখানে যদি একটা ছাগশিশুকে সাদরে আহ্বান করিবার জন্য মাল্যসিন্দুর-হস্তে লোক আসে, এবং এই সাদর ব্যবহারে ছাগের একান্ত সংকোচ দেখিয়া তাহাকে বলা হয়,— এ কী আশ্চর্য, এতবড়ো মহৎ যজ্ঞে যোগ দিতে তোমার আপত্তি! হায়, অন্যের যোগ দেওয়া এবং তাহার যোগ দেওয়াতে যে কত প্রভেদ, তাহা যে সে এক

মুহূর্তও ভুলিতে পারিতেছে না। যজ্ঞে আত্মবিসর্জন দেওয়ার অধিকার ছাড়া আর কোনো অধিকারই যে তাহার নাই। কিন্তু ছাগশিশুর এই বেদনা যজ্ঞকর্তার পক্ষে বোঝা কঠিন, ছাগ এতই অকিঞ্চিৎকর। ইম্পীরিয়ালতন্ত্র নিরীহ তিব্বতে লড়াই করিতে যাইবেন, আমাদের অধিকার তাহার খরচ জোগানো; সোমালিল্যাণ্ডে বিপ্লব নিবারণ করিবেন, আমাদের অধিকার প্রাণদান করা; উষ্ণপ্রধান উপনিবেশে ফসল উৎপাদন করিবেন, আমাদের অধিকার সস্তায় মজুর জোগান দেওয়া। বড়োয়-ছোটোয় মিলিয়া যজ্ঞ করিবার এই নিয়ম।

কিন্তু ইহা লইয়া উত্তেজিত হইবার কোনো প্রয়োজন নাই। সক্ষম এবং অক্ষমের হিসাব যখন এক খাতায় রাখা হয় তখন জমার অঙ্কের এবং খরচের অঙ্কের ভাগ এমনিভাবে হওয়াই স্বাভাবিক— এবং যাহা স্বাভাবিক তাহার উপর চোখ রাঙানো চলে না, চোখের জল ফেলাও বৃথা। স্বভাবকে স্বীকার করিয়াই কাজ করিতে হইবে। ভাবিয়া দেখো, আমরা যখন ইংরেজকে বলিতেছি "তুমি সাধারণ মনুষ্য-স্বভাবের চেয়ে উপরে ওঠো, তুমি স্বজাতির স্বার্থকে ভারতবর্ষের মঙ্গলের কাছে খর্ব করো", তখন ইংরেজ যদি জবাব দেয় "আচ্ছা, তোমার মুখে ধর্মোপদেশ আমরা পরে শুনিব, আপাতত তোমার প্রতি আমার বক্তব্য এই যে, সাধারণ মনুষ্য-স্বভাবের যে নিম্নতন কোঠায় আমি আছি, সেই কোঠায় তুমিও এসো, তাহার উপরে উঠিয়া কাজ নাই— স্বজাতির স্বার্থকে তুমি নিজের স্বার্থ করো— স্বজাতির উন্নতির জন্য তুমি প্রাণ দিতে না পার অন্তত আরাম বল, অর্থ বল, কিছু একটা দাও। তোমাদের দেশের জন্য আমরাই সমস্ত করিব, আর তোমরা নিজে কিছুই করিবে না!" এ-কথা বলিলে তাহার কী উত্তর আছে? বস্তুত আমরা কে কী দিতেছি, কে কী করিতেছি! আর কিছু না করিয়া যদি দেশের খবর লইতাম, তাহাও বুঝি— আলস্যপূর্বক তাহাও লই না। দেশের ইতিহাস ইংরেজ রচনা করে, আমরা তর্জমা করি; ভাষাতত্ত্ব ইংরেজ উদ্ধার করে, আমরা মুখস্থ করিয়া লই; ঘরের পাশে কী আছে জানিতে হইলেও হাণ্টার বই গতি নাই। তার পরে দেশের কৃষি সম্বন্ধে বল, বাণিজ্য সম্বন্ধে বল, ভূতত্ত্ব বল, নৃতত্ত্ব বল, নিজের চেষ্টার দ্বারা আমরা কিছুই সংগ্রহ করিতে চাই না। স্বদেশের প্রতি এমন একান্ত ঔৎসুক্যহীনতাসত্ত্বেও আমাদের দেশের প্রতি কর্তব্যপালন সম্বন্ধে বিদেশীকে আমরা উচ্চতম কর্তব্যনীতির উপদেশ দিতে কুণ্ঠিত হই না। সে-উপদেশ কোনোদিনই কোনো কাজে লাগিতে পারে না। কারণ যে-ব্যক্তি কাজ করিতেছে তাহার দায়িত্ব আছে, যে-ব্যক্তি কাজ করিতেছে না, কথা বলিতেছে, তাহার দায়িত্ব নাই— এই উভয় পক্ষের মধ্যে কখনোই যথার্থ আদানপ্রদান চলিতে পারে না। এক

পক্ষে টাকা আছে, অন্য পক্ষে শুদ্ধমাত্র চেকবইখানি আছে, এমন স্থলে সে ফাঁকা চেক ভাঙানো চলে না। ভিক্ষার স্বরূপে এক-আধবার দৈবাৎ চলে, কিন্তু দাবিস্বরূপে বরাবর চলে না— ইহাতে পেটের জ্বালায় মধ্যে মধ্যে রাগ হয় বটে, এক-একবার মনে হয়, আমাকে অপমান করিয়া ফিরাইয়া দিল— কিন্তু সে-অপমান, সে-ব্যর্থতা তারস্বরেই হউক, আর নিঃশব্দেই হউক, গলাধঃকরণপূর্বক সম্পূর্ণ পরিপাক করা ছাড়া আর গতি নাই। এরূপ প্রতিদিনই দেখা যাইতেছে। আমরা বিরাট সভাও করি, খবরের কাগজেও লিখি, আবার যাহা হজম করা বড়ো কঠিন তাহা নিঃশেষে পরিপাকও করিয়া থাকি। পূর্বের দিনে যাহা একেবারে অসহ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়া বেড়াই, পরের দিনে তাহার জন্য বৈদ্য ডাকিতে হয় না।

আশা করি, আমাকে সকলে বলিবেন, তুমি অত্যন্ত পুরাতন কথা বলিতেছ, নিজের কাজ নিজেকে করিতে হইবে, নিজের লজ্জা নিজেকে মোচন করিতে হইবে, নিজের সম্পদ নিজেকে অর্জন করিতে হইবে, নিজের সম্মান নিজেকে উদ্ধার করিতে হইবে, এ-কথার নূতনত্ব কোথায়। পুরাতন কথা বলিতেছি, এমন অপবাদ আমি মাথায় করিয়া লইব; আমি নূতন-উদ্ভাবনা-বর্জিত, এ-কলঙ্ক অঙ্গের ভূষণ করিব। কিন্তু যদি কেহ এমন কথা বলেন যে, এ আবার তুমি কী নূতন কথা তুলিয়া বসিলে তবেই আমার পক্ষে মুশকিল— কারণ, সহজ কথাকে যে কেমন করিয়া প্রমাণ করিতে হয়, তাহা হঠাৎ ভাবিয়া পাওয়া শক্ত। দুঃসময়ের প্রধান লক্ষণই এই, তখন সহজ কথাই কঠিন ও পুরাতন কথাই অদ্ভুত বলিয়া প্রতীত হয়। এমন কী শুনিলে লোকে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে, গালি দিতে থাকে। জনশূন্য পদ্মার চরে অন্ধকার রাত্রে পথ হারাইয়া জলকে স্থল, উত্তরকে দক্ষিণ বলিয়া যাহার ভ্রম হইয়াছে, সেই জানে, যাহা অত্যন্ত সহজ, অন্ধকারে তাহা কিরূপ বিপরীত কঠিন হইয়া উঠে; যেমনই আলো হয়, অমনি মুহূর্তেই নিজের ভ্রমের জন্য বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। আমাদের এখন অন্ধকার রাত্রি— এ-দেশে যদি কেহ অত্যন্ত প্রামাণিক কথাকেও বিপরীত জ্ঞান করিয়া কটূক্তি করেন, তবে তাহাও সকরুণ চিত্তে সহ্য করিতে হইবে, আমাদের কুগ্রহ ছাড়া কাহাকেও দোষ দিব না। আশা করিয়া থাকিব, একদিন ঠেকিয়া শিখিতেই হইবে, উত্তরকে দক্ষিণ জ্ঞান করিয়া চলিলে একদিন না ফিরিয়া উপায় নাই।

অথচ আমি নিশ্চয় জানি, সকলেরই যে এই দশা তাহা নহে। আমাদের এমন অনেক উৎসাহী যুবক আছেন, যাঁহারা দেশের জন্য কেবল বাক্যব্যয় নহে, ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত। কিন্তু কী করিবেন, কোথায় যাইবেন, কী দিবেন, কাহাকে দিবেন, কাহারও কোনো ঠিকানা পান না। বিচ্ছিন্নভাবে ত্যাগ করিলে কেবল নষ্টই করা হয়।

দেশকে চালনা করিবার একটা শক্তি যদি কোথাও প্রত্যক্ষ আকারে থাকিত, তবে যাঁহারা মননশীল তাঁহাদের মন, যাঁহারা চেষ্টাশীল তাঁহাদের চেষ্টা, যাঁহারা দানশীল তাঁহাদের দান একটা বিপুল লক্ষ্য পাইত— আমাদের বিদ্যাশিক্ষা, আমাদের সাহিত্যানুশীলন, আমাদের শিল্পচর্চা, আমাদের নানা মঙ্গলানুষ্ঠান স্বভাবতই তাহাকে আশ্রয় করিয়া সেই ঐক্যের চতুর্দিকে দেশ বলিয়া একটা ব্যাপারকে বিচিত্র করিয়া তুলিত।

আমার মনে সংশয়মাত্র নাই, আমরা বাহির হইতে যত বারংবার আঘাত পাইতেছি, সে কেবল সেই ঐক্যের আশ্রয়কে জাগ্রত করিয়া তুলিবার জন্য; প্রার্থনা করিয়া যতই হতাশ হইতেছি, সে কেবল আমাদিগকে সেই ঐক্যের আশ্রয়ের অভিমুখ করিবার জন্য; আমাদের দেশে পরমুখাপেক্ষী কর্মহীন সমালোচকের স্বভাবসিদ্ধ যে নিরুপায় নিরানন্দ প্রতিদিন পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে, সে কেবল এই ঐক্যের আশ্রয়কে, এই শক্তির কেন্দ্রকে সন্ধান করিবার জন্য—কোনো বিশেষ আইন রদ করিবার জন্য নয়, কোনো বিশেষ গাত্রদাহ নিবারণ করিবার জন্য নয়।

এই শক্তিকে দেশের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত করিলে তখন ইহার নিকটে আমাদের প্রার্থনা চলিবে, তখন আমরা যে-যুক্তি প্রয়োগ করিব তাহাকে কার্যের অঙ্গ বলিয়াই গণ্য করা সম্ভবপর হইবে। ইহার নিকটে আমাদিগকে কর দিতে হইবে, সময় দিতে হইবে, সামর্থ্য দিতে হইবে। আমাদের বুদ্ধি, আমাদের ত্যাগপরতা, আমাদের বীর্য, আমাদের প্রকৃতির মধ্যে যাহা-কিছু গম্ভীর, যাহা-কিছু মহৎ, তাহা সমস্ত উদ্‌বোধিত করিবার, আকৃষ্ট করিবার ব্যাপৃত করিবার এই একটি ক্ষেত্র হইবে; ইহাকে আমরা ঐশ্বর্য দিব এবং ইহার নিকট হইতে আমরা ঐশ্বর্য লাভ করিব।

এইখান হইতেই যদি আমরা দেশের বিদ্যাশিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা বাণিজ্যবিস্তারের চেষ্টা করি, তবে আজ একটা বিঘ্ন, কাল একটা ব্যাঘাতের জন্য যখন-তখন তাড়াতাড়ি দুই-চারিজন বক্তা সংগ্রহ করিয়া টৌনহল মীটিঙে দৌড়াদৌড়ি করিয়া মরিতে হয় না। এই যে থাকিয়া থাকিয়া চমকাইয়া ওঠা, পরে চীৎকার করা এবং তাহার পরে নিস্তব্ধ হইয়া যাওয়া, ইহা ক্রমশই হাস্যকর হইয়া উঠিতেছে— আমাদের নিজের কাছে এবং পরের কাছে এ-সম্বন্ধে গাম্ভীর্য রক্ষা করা আর তো সম্ভব হয় না। এই প্রহসন হইতে রক্ষা পাওয়ার একইমাত্র উপায় আছে, নিজের কাজের ভার নিজে গ্রহণ করা।

এ-কথা কেহ যেন না বোঝেন, তবে আমি বুঝি গবর্মেণ্টের সঙ্গে কোনো সংস্রবই রাখিতে চাই না। সে যে রাগারাগি, সে যে অভিমানের কথা হইল—সেরূপ অভিমান সমকক্ষতার স্থলেই মানায়, প্রণয়ের সংগীতেই শোভা পায়। আমি আরো উল্টা

কথাই বলিতেছি। আমি বলিতেছি, গবর্মেণ্টের সঙ্গে আমাদের ভদ্ররূপ সম্বন্ধ স্থাপনেরই সদুপায় করা উচিত। ভদ্রসম্বন্ধমাত্রেরই মাঝখানে একটা স্বাধীনতা আছে। যে-সম্বন্ধ আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো অপেক্ষাই রাখে না তাহা দাসত্বের সম্বন্ধ, তাহা ক্রমশ ক্ষয় হইতে এবং একদিন ছিন্ন হইতে বাধ্য। কিন্তু স্বাধীন আদান-প্রদানের সম্বন্ধ ক্রমশই ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে।

আমরা অনেক কল্পনা করি এবং বলিয়াও থাকি যে, আমরা যাহা-কিছু চাহিতেছি সরকার যদি তাহা সমস্ত পূরণ করিয়া দেন, তাহা হইলে আমাদের প্রীতি ও সন্তোষের অন্ত থাকে না। এ-কথা সম্পূর্ণ অমূলক। এক পক্ষে কেবলই চাওয়া, আর-এক পক্ষে কেবলই দেওয়া, ইহার অন্ত কোথায়। ঘৃত দিয়া আগুনকে কোনোদিন নিবানো যায় না, সে তো শাস্ত্রেই বলে— এরূপ দাতা-ভিক্ষুকের সম্বন্ধ ধরিয়া যতই পাওয়া যায়, বদান্যতার উপরে দাবি ততই বাড়িতে থাকে এবং অসন্তোষের পরিমাণ ততই আকাশে চড়িয়া উঠে। যেখানে পাওয়া আমার শক্তির উপরে নির্ভর করে না, দাতার মহত্ত্বের উপরে নির্ভর করে, সেখানে আমার পক্ষেও যেমন অমঙ্গল দাতার পক্ষেও তেমনি অসুবিধা।

কিন্তু, যেখানে বিনিময়ের সম্বন্ধ, দানপ্রতিদানের সম্বন্ধ, সেখানে উভয়েরই মঙ্গল— সেখানে দাবির পরিমাণ স্বভাবতই ন্যায্য হইয়া আসে এবং সকল কথাই আপসে মিটিবার সম্ভাবনা থাকে। দেশে এরূপ ভদ্র অবস্থা ঘটিবার একমাত্র উপায়, স্বাধীন শক্তিকে দেশের মঙ্গলসাধনের ভিত্তির উপরে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা। এক কর্তৃশক্তির সঙ্গে অন্য কর্তৃশক্তির সম্পর্কই শোভন এবং স্থায়ী, তাহা আনন্দ এবং সম্মানের আকর। ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ পাতাইতে গেলে নিজেকে জড়পদার্থ করিয়া তুলিলে চলে না, নিজেও এক স্থানে ঈশ্বর হইতে হয়।

তাই আমি বলিতেছিলাম, গবর্মেণ্টের কাছ হইতে আমাদের দেশ যতদূর পাইবার তাহার শেষ কড়া পর্যন্ত পাইতে পারে, যদি দেশকে আমাদের যতদূর পর্যন্ত দিবার তাহার শেষ কড়া পর্যন্ত শোধ করিয়া দিতে পারি। যে-পরিমাণেই দিব সেই পরিমাণেই পাইবার সম্বন্ধ দৃঢ়তর হইবে।

এমন কথা উঠিতে পারে যে, আমরা দেশের কাজ করিতে গেলে প্রবল পক্ষ যদি বাধা দেন। যেখানে দুই পক্ষ আছে এবং দুই পক্ষের সকল স্বার্থ সমান নহে, সেখানে কোনো বাধা পাইব না, ইহা হইতেই পারে না। কিন্তু, তাই বলিয়া সকল কর্মেই হাল ছাড়িয়া দিতে হইবে, এমন কোনো কথা নাই। যে-ব্যক্তি যথার্থই কাজ করিতে চায়, তাহাকে শেষ পর্যন্ত বাধা দেওয়া বড়ো শক্ত। এই মনে করো

স্বায়ত্তশাসন। আমরা মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতেছি যে, রিপন আমাদিগকে স্বায়ত্তশাসন দিয়াছিলেন, তাঁহার পরের কর্তারা তাহা কাড়িয়া লইতেছেন। কিন্তু ধিক এই কান্না! যাহা একজন দিতে পারে, তাহা আর-একজন কাড়িয়া লইতে পারে, ইহা কে না জানে! ইহাকে স্বায়ত্তশাসন নাম দিলেই কি ইহা স্বায়ত্তশাসন হইয়া উঠিবে।

অথচ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার আমাদের ঘরের কাছে পড়িয়া আছে— কেহ তাহা কাড়ে নাই এবং কোনোদিন কাড়িতে পারেও না। আমাদের গ্রামের, আমাদের পল্লীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পথঘাটের উন্নতি, সমস্তই আমরা নিজে করিতে পারি — যদি ইচ্ছা করি, যদি এক হই ; এ-জন্য গবর্মেণ্টের চাপরাস বুকে বাঁধিবার কোনো দরকার নাই। কিন্তু ইচ্ছা যে করে না, এক যে হই না। তবে চুলায় যাক স্বায়ত্তশাসন। তবে দড়ি ও কলসির চেয়ে বন্ধু আর কেহ নাই।

পরম্পরায় শুনিয়াছি, আমাদের দেশের কোনো রাজাকে একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী বন্ধুভাবে বলিয়াছিলেন যে, গবর্মেণ্টকে অনুরোধ করিয়া আপনাকে উচ্চতর উপাধি দিব— তাহাতে তেজস্বী রাজা উত্তর করিয়াছিলেন, "দোহাই আপনার, আপনি আমাকে রাজা বলুন, বাবু বলুন, যাহা ইচ্ছা বলিয়া ডাকুন, কিন্তু আমাকে এমন উপাধি দিবেন না, যাহা আজ ইচ্ছা করিলে দান করিতে পারেন, কাল ইচ্ছা করিলে হরণ করিতেও পারেন। আমার প্রজারা আমাকে মহারাজ-অধিরাজ বলিয়াই জানে, সে-উপাধি হইতে কেহই আমাকে বঞ্চিত করিতে পারে না।" তেমনি আমরাও যেন বলিতে পারি, দোহাই সরকার, আমাদিগকে এমন স্বায়ত্তশাসন দিয়া কাজ নাই, যাহা দিতেও যতক্ষণ কাড়িতেও ততক্ষণ— যে-স্বায়ত্তশাসন আমাদের আছে, দেশের মঙ্গলসাধন করিবার যে অধিকার বিধাতা আমাদের হস্তে দিয়াছেন, মোহমুক্ত চিত্তে, দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত তাহাই যেন আমরা অঙ্গীকার করিতে পারি— রিপনের জয় হউক এবং কর্জনও বাঁচিয়া থাকুন।

আমি পুনরায় বলিতেছি, দেশের বিদ্যাশিক্ষার ভার আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। সংশয়ী বলিবেন, শিক্ষার ভার যেন আমরা লইলাম, কিন্তু কর্ম দিবে কে? কর্মও আমাদিগকে দিতে হইবে। একটি বৃহৎ স্বদেশী কর্মক্ষেত্র আমাদের আয়ত্তগত না থাকিলে আমাদিগকে চিরদিনই দুর্বল থাকিতে হইবে, কোনো কৌশলে এই নির্জীব দুর্বলতা হইতে নিষ্কৃতি পাইব না। যে আমাদিগকে কর্ম দিবে সেই আমাদের প্রতি কর্তৃত্ব করিবে, ইহার অন্যথা হইতেই পারে না— যে কর্তৃত্ব লাভ করিবে সে আমাদিগকে চালনা করিবার কালে নিজের স্বার্থ বিস্মৃত হইবে না,

ইহাও স্বাভাবিক। অতএব সর্বপ্রযত্নে আমাদিগকে এমন একটি স্বদেশী কর্মক্ষেত্র গড়িয়া তুলিতে হইবে যেখানে স্বদেশী বিদ্যালয়ের শিক্ষিতগণ শিক্ষকতা, পূর্তকার্য, চিকিৎসা প্রভৃতি দেশের বিচিত্র মঙ্গলকর্মের ব্যবস্থায় নিযুক্ত থাকিবেন। আমরা আক্ষেপ করিয়া থাকি যে, আমরা কাজ শিখিবার ও কাজ দেখাইবার অবকাশ না পাইয়া মানুষ হইয়া উঠিতে পারি না। সে-অবকাশ পরের দ্বারা কখনোই সন্তোষজনকরূপে হইতে পারে না, তাহার প্রমাণ পাইতে আমাদের বাকি নাই।

আমি জানি, অনেকেই বলিবেন, কথাটা অত্যন্ত দুরূহ শোনাইতেছে। আমিও তাহা অস্বীকার করিতে পারিব না। ব্যাপারখানা সহজ নহে— সহজ যদি হইত, তবে অশ্রদ্ধেয় হইত। কেহ যদি দরখাস্ত-কাগজের নৌকা বানাইয়া সাত-সমুদ্র-পারে সাত রাজার ধন মানিকের ব্যবসা চালাইবার প্রস্তাব করে, তবে কারও-কারও কাছে তাহা শুনিতে লোভনীয় হয়, কিন্তু সেই কাগজের নৌকার বাণিজ্যে কাহাকেও মূলধন খরচ করিতে পরামর্শ দিই না। বাঁধ বাঁধা কঠিন, সে-স্থলে দল বাঁধিয়া নদীকে সরিয়া বসিতে অনুরোধ করা কন্স্টিট্যুশনাল অ্যাজিটেশন নামে গণ্য হইতে পারে। তাহা সহজ কাজ বটে, কিন্তু সহজ উপায় নহে। আমরা সস্তায় বড়ো কাজ সারিবার চাতুরী অবলম্বন করিয়া থাকি, কিন্তু সেই সস্তা উপায় বারংবার যখন ভাঙিয়া ছারখার হইয়া যায় তখন পরের নামে দোষারোপ করিয়া তৃপ্তিবোধ করি— তাহাতে তৃপ্তি হয়, কিন্তু কাজ হয় না।

নিজেদের বেলায় সমস্ত দায়কে হালকা করিয়া পরের বেলায় তাহাকে ভারী করিয়া তোলা কর্তব্যনীতির বিধান নহে। আমাদের প্রতি ইংরেজের আচরণ যখন বিচার করিব, তখন সমস্ত বাধাবিঘ্ন এবং মনুষ্য-প্রকৃতির স্বাভাবিক দুর্বলতা আলোচনা করিয়া আমাদের প্রত্যাশার অঙ্ককে যতদূর সম্ভব খাটো করিয়া আনিতে হইবে। কিন্তু, আমাদের নিজের কর্তব্য বিবেচনা করিবার সময় ঠিক তাহার উল্‌টাদিকে চলিতে হইবে। নিজের বেলায় ওজর বানাইব না, নিজেকে ক্ষমা করিতে পারিব না, কোনো উপস্থিত সুবিধার খাতিরে নিজের আদর্শকে খর্ব করার প্রতি আমরা আস্থা রাখিব না। সেইজন্য আমি আজ বলিতেছি, ইংরেজের উপর রাগারাগি করিয়া ক্ষণিক-উত্তেজনামূলক উদ্‌যোগে প্রবৃত্ত হওয়া সহজ, কিন্তু সেই সহজ পথ শ্রেয়ের পথ নহে। জবাব দিবার, জব্দ করিবার প্রবৃত্তি আমাদিগকে যথার্থ কর্তব্য হইতে সফলতা হইতে ভ্রষ্ট করে। লোকে যখন রাগ করিয়া মোকদ্দমা করিতে উদ্যত হয় তখন নিজের সর্বনাশ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। আমরা যদি সেইরূপ মনস্তাপের উপর কেবলই উষ্ণবাক্যের ফুঁ দিয়া নিজেকে রাগাইয়া তুলিবারই চেষ্টা করি, তাহা

হইলে ফললাভের লক্ষ্য দূরে দিয়া ক্রোধের পরিতৃপ্তিটাই বড়ো হইয়া উঠে। যথার্থভাবে গভীরভাবে দেশের স্থায়ী মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইলে এই ক্ষুদ্র প্রবৃত্তির হাত হইতে নিজেকে মুক্তি দিতে হইবে। নিজেকে ক্রুদ্ধ এবং উত্ত্যক্ত অবস্থায় রাখিলে সকল ব্যাপারের পরিমাণবোধ চলিয়া যায়— ছোটো কথাকে বড়ো করিয়া তুলি— প্রত্যেক তুচ্ছতাকে অবলম্বন করিয়া অসংগত অমিতাচারের দ্বারা নিজের গাম্ভীর্য নষ্ট করিতে থাকি। এইরূপ চাঞ্চল্য দ্বারা দুর্বলতার বৃদ্ধিই হয়— ইহাকে শক্তির চালনা বলা যায় না, ইহা অক্ষমতার আক্ষেপ।

এই-সকল ক্ষুদ্রতা হইতে নিজেকে উদ্ধার করিয়া দেশের প্রতি প্রীতির উপরেই দেশের মঙ্গলকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে— স্বভাবের দুর্বলতার উপর নহে, পরের প্রতি বিদ্বেষের উপর নহে এবং পরের প্রতি অন্ধ নির্ভরের উপরেও নহে। এই নির্ভর এবং এই বিদ্বেষ দেখিতে যেন পরস্পর বিপরীত বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বস্তুত ইহারা একই গাছের দুই ভিন্ন শাখা। ইহার দুটাই আমাদের লজ্জাকর অক্ষমতা ও জড়ত্ব হইতে উদ্ভূত। পরের প্রতি দাবি করাকেই আমাদের সম্বল করিয়াছি বলিয়াই প্রত্যেক দাবির ব্যর্থতায় বিদ্বেষে উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছি। এই উত্তেজিত হওয়ামাত্রকেই আমরা স্বদেশহিতৈষিতা বলিয়া গণ্য করি। যাহা আমাদের দুর্বলতা তাহাকে বড়ো নাম দিয়া কেবল যে আমরা সান্ত্বনালাভ করিতেছি, তাহা নহে—গর্ববোধ করিতেছি।

এ-কথা একবার ভাবিয়া দেখো, মাতাকে তাহার সন্তানের সেবা হইতে মুক্তি দিয়া সেই কার্যভার যদি অন্যে গ্রহণ করে, তবে মাতার পক্ষে তাহা অসহ্য হয়। ইহার কারণ, সন্তানের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহই তাহার সন্তানসেবার আশ্রয়স্থল। দেশহিতৈষিতারও যথার্থ লক্ষণ দেশের হিতকর্ম আগ্রহপূর্বক নিজের হাতে লইবার চেষ্টা। দেশের সেবা বিদেশীর হাতে চালাইবার চাতুরী, যথার্থ প্রীতির চিহ্ন নহে; তাহাকে যথার্থ বুদ্ধির লক্ষণ বলিয়াও স্বীকার করিতে পারি না, কারণ এরূপ চেষ্টা কোনোমতেই সফল হইবার নহে।

কিন্তু প্রকৃত স্বদেশহিতৈষিতা যে আমাদের দেশে সুলভ নহে, এ-কথা অন্তত আমাদের গোপন অন্তরাত্মার নিকট অগোচর নাই। যাহা নাই, তাহা আছে ভান করিয়া উপদেশ দেওয়া বা আয়োজন করায় ফল কী আছে। এ-সম্বন্ধে উত্তর এই যে, দেশহিতৈষিতা আমাদের যথেষ্ট দুর্বল হইলেও তাহা যে একেবারে নাই, তাহাও হইতে পারে না— কারণ, সেরূপ অবস্থা অত্যন্ত অস্বাভাবিক। আমাদের এই দুর্বল দেশহিতৈষিতাকে পুষ্ট করিয়া তুলিবার একমাত্র উপায় স্বচেষ্টায় দেশের কাজ করিবার

উপলক্ষ্য আমাদিগকে দেওয়া। সেবার দ্বারাতেই প্রেমের চর্চা হইতে থাকে। স্বদেশপ্রেমের পোষণ করিতে হইলে স্বদেশের সেবা করিবার একটা সুযোগ ঘটাইয়া তোলাই আমাদের পক্ষে সকলের চেয়ে প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। এমন একটি স্থান করিতে হইবে যেখানে দেশ জিনিসটা যে কী তাহা ভূরিপরিমাণে মুখের কথায় বুঝাইবার বৃথা চেষ্টা করিতে হইবে না, যেখানে সেবাসূত্রে দেশের ছোটো বড়ো, দেশের পণ্ডিত মূর্খ সকলের মিলন ঘটিবে।

দেশের বিচ্ছিন্ন শক্তিকে এক স্থানে সংহত করিবার জন্য, কর্তব্যবুদ্ধিকে এক স্থানে আকৃষ্ট করিবার জন্য আমি যে একটি স্বদেশীসংসদ গঠিত করিবার প্রস্তাব করিতেছি, তাহা যে এক দিনেই হইবে, কথাটা পড়িবামাত্রই অমনি যে দেশের চারি দিক হইতে সকলে সমাজের এক পতাকার তলে সমবেত হইবে, এমন আমি আশা করি না। স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধিকে খর্ব করা, উদ্ধত অভিমানকে দমন করা, নিষ্ঠার সহিত নিয়মের শাসনকে গ্রহণ করা, এ-সমস্ত কাজের লোকের গুণ— কাজ করিতে করিতে এই-সকল গুণ বাড়িয়া উঠে, চিরদিন পুঁথি পড়িতে ও তর্ক করিতে গেলে ঠিক তাহার উল্টা হয়— এই সকল গুণের পরিচয় যে আমরা প্রথম হইতেই দেখাইতে পারিব, তাহাও আমি আশা করি না। কিন্তু এক জায়গায় এক হইবার চেষ্টা যত ক্ষুদ্র আকারে হউক, আরম্ভ করিতে হইবে। আমাদের দেশের যুবকদের মধ্যে এমন-সকল খাঁটি লোক, শক্ত লোক যাঁহারা আছেন যাঁহারা দেশের কল্যাণকর্মকে দুঃসাধ্য জানিয়াই দ্বিগুণ উৎসাহ অনুভব করেন এবং সেই কর্মের আরম্ভকে অতি ক্ষুদ্র জানিয়াও হতোৎসাহ হন না, তাঁহাদিগকে একজন অধিনেতার চতুর্দিকে একত্র হইতে বলি। দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এইরূপ সম্মিলনী যদি স্থাপিত হয় এবং তাঁহারা যদি একটি মধ্যবর্তী সংসদকে ও সেই সংসদের অধিনায়ককে সম্পূর্ণভাবে কর্তৃত্বে বরণ করিতে পারেন, তবে একদিন সেই সংসদ সমস্ত দেশের ঐক্যক্ষেত্র ও সম্পদের ভাণ্ডার হইয়া উঠিতে পারে। সুবিস্তীর্ণ আরম্ভের অপেক্ষা করা, সুবিপুল আয়োজন ও সমারোহের প্রত্যাশা করা, কেবল কর্তব্যকে ফাঁকি দেওয়া। এখনই আরম্ভ করিতে হইবে। যত শীঘ্র পারি, আমরা যদি সমস্ত দেশকে কর্মজালে বেষ্টিত করিয়া আয়ত্ত করিতে না পারি, তবে আমাদের চেয়ে যাহাদের উদ্যম বেশি, সামর্থ্য অধিক, তাহারা কোথাও আমাদের জন্য স্থান রাখিবে না। এমন কি, অবিলম্বে আমাদের শেষ সম্বল কৃষিক্ষেত্রকেও অধিকার করিয়া লইবে, সেজন্য আমাদের চিন্তা করা দরকার। পৃথিবীতে কোনো জায়গা ফাঁকা পড়িয়া থাকে না; আমি যাহা ব্যবহার না করিব অন্যে তাহা ব্যবহারে লাগাইয়া দিবে; আমি যদি নিজের প্রভু না হইতে পারি অন্যে আমার প্রভু হইয়া বসিবে; আমি

যদি শক্তি অর্জন না করি অন্যে আমার প্রাপ্যগুলি অধিকার করিবে; আমি যদি পরীক্ষায় কেবলই ফাঁকি দিই তবে সফলতা অন্যের ভাগ্যেই জুটিবে— ইহা বিশ্বের অনিবার্য নিয়ম।

হে বঙ্গের নবীন যুবক, তোমার দুর্ভাগ্য এই যে, তুমি আপনার সম্মুখে কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত পাও নাই। কিন্তু, যদি ইহাকে অপরাজিতচিত্তে নিজের সৌভাগ্য বলিয়া গণ্য করিতে পার, যদি বলিতে পার, নিজের ক্ষেত্র আমি নিজেই প্রস্তুত করিয়া তুলিব, তবেই তুমি ধন্য হইবে। বিচ্ছিন্নতার মধ্যে শৃঙ্খলা আনয়ন করা, জড়ত্বের মধ্যে জীবনসঞ্চার করা, সংকীর্ণতার মধ্যে উদার মনুষ্যত্বকে আহ্বান করা—এই মহৎ সৃষ্টিকার্য তোমার সম্মুখে পড়িয়া আছে, এজন্য আনন্দিত হও। নিজের শক্তির প্রতি আস্থা স্থাপনা করো, নিজের দেশের প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা করো এবং ধর্মের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়ো না। আজ আমাদের কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের মানচিত্রের মাঝখানে একটা রেখা টানিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছেন, কাল তাঁহারা বাংলার প্রাথমিক শিক্ষা চারখানা করিবার সংকল্প করিতেছেন, নিশ্চয়ই ইহা দুঃখের বিষয়— কিন্তু শুধু কি নিরাশ্বাস দুঃখভোগেই এই দুঃখের পর্যবসান। ইহার পশ্চাতে কি কোনো কর্ম নাই, আমাদের কোনো শক্তি নাই। শুধুই অরণ্যে রোদন? ম্যাপে দাগ টানিয়া মাত্র বাংলাদেশকে দুই টুকরা করিতে গবর্মেণ্ট পারেন? আর, আমরা সমস্ত বাঙালি ইহাকে এক করিয়া রাখিতে পারি না? বাংলাভাষাকে গবর্মেণ্ট নিজের ইচ্ছামতো চারখানা করিয়া তুলিতে পারেন? আর আমরা সমস্ত বাঙালি তাহার ঐক্যসূত্রকে অবিচ্ছিন্ন রাখিতে পারি না? এই যে আশঙ্কা, ইহা কি নিজেদের প্রতি নিদারুণ দোষারোপ নহে। যদি কিছুর প্রতিকার করিতে হয়, তবে কি এই দোষের প্রতিকারেই আমাদের একান্ত চেষ্টাকে নিয়োগ করিতে হইবে না। সেই আমাদের সমুদয় চেষ্টার সম্মিলনক্ষেত্র, আমাদের সমুদয় উদ্যোগের প্রেরণাস্থল, আমাদের সমুদয় পূজা-উৎসর্গের সাধারণ ভাণ্ডার যে আমাদের নিতান্তই চাই। আমাদের কয়েক জনের চেষ্টাতেই সেই বৃহৎ ঐক্যমন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হইতে পারে, এই বিশ্বাস মনে দৃঢ় করিতে হইবে। যাহা দুরূহ তাহা অসাধ্য নহে, এই বিশ্বাসে কাজ করিয়া যাওয়াই পৌরুষ। এ-পর্যন্ত আমরা ফুটা কলসে জল ভরাকেই কাজ করা বলিয়া জানিয়াছি, সেই জন্যই বার বার আক্ষেপ করিয়াছি,— এ-দেশে কাজ করিয়া সিদ্ধিলাভ হয় না। বিজ্ঞানসভায় ইংরেজি ভাষায় পুরাতন বিষয়ের পুনরুক্তি করিয়াছি, অথচ আশ্চর্য হইয়া বলিয়াছি,— দেশের লোক আমার বিজ্ঞানসভার প্রতি এরূপ উদাসীন কেন। ইংরেজি ভাষায় গুটিকয়েক শিক্ষিত লোকে মিলিয়া রেজোল্যুশন পাস করিয়াছি, অথচ দুঃখ করিয়াছি— জনসাধারণের মধ্যে রাষ্ট্রীয় কর্তব্য-

বোধের উদ্রেক হইতেছে না কেন? পরের নিকট প্রার্থনা করাকেই কর্ম বলিয়া গৌরব করিয়াছি, তাহার পরে পরকে নিন্দা করিয়া বলিতেছি,— এত কাজ করি, তাহার পারিশ্রমিক পাই না কেন। একবার যথার্থ কর্মের সহিত যথার্থ শক্তিকে নিযুক্ত করা যাক, যথার্থ নিষ্ঠার সহিত যথার্থ উপায়কে অবলম্বন করা যাক, তাহার পরেও যদি সফলতা লাভ করিতে না পারি তবু মাথা তুলিয়া বলিতে পারিব—

যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ।

সংকটকে স্বীকার করিয়া, দুঃসাধ্যতা সম্বন্ধে অন্ধ না হইয়া, নিজেকে আসন্ন ফললাভের প্রত্যাশায় না ভুলাইয়া, এই দুর্ভাগ্য দেশের বিনা-পুরস্কারের কর্মে দুর্গম পথে যাত্রা আরম্ভ করিতে কে কে প্রস্তুত আছ, আমি সেই বীর যুবকদিগকে অদ্য আহ্বান করিতেছি— রাজদ্বারের অভিমুখে নয়, পুরাতন যুগের তপঃসঞ্চিত ভারতের স্বকীয় শক্তি যে-খনির মধ্যে নিহিত আছে সেই খনির সন্ধানে। কিন্তু, খনি আমাদের দেশের মর্মস্থানেই আছে— যে জনসাধারণকে অবজ্ঞা করি তাহাদেরই নির্বাক হৃদয়ের গোপন স্তরের মধ্যে আছে। প্রবলের মন পাইবার চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া সেই নিম্নতম গুহার গভীরতম ঐশ্বর্যলাভের সাধনায় কে প্রবৃত্ত হইবে।

একটি বিখ্যাত সংস্কৃত শ্লোক আছে, তাহার ঈষৎপরিবর্তিত অনুবাদ দ্বারা আমার এই প্রবন্ধের উপসংহার করি—

উদ্‌যোগী পুরুষসিংহ, তাঁরি 'পরে জানি
কমলা সদয়।
পরে করিবেক দান, এ অসলবাণী
কাপুরুষে কয়।
পরকে বিস্মরি করো পৌরুষ আশ্রয়
আপন শক্তিতে।
যত্ন করি সিদ্ধি যদি তবু নাহি হয়
দোষ নাহি ইথে।

ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ

অদ্য বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই সভা আহ্বান করিয়াছেন। তোমাদিগকে সর্বপ্রথমে সম্ভাষণ করিবার ভার আমার উপরে পড়িয়াছে।

ছাত্রদের সহিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কোন্‌খানে যোগ সে-কথা হয়তো তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার। যোগ আছে। সেই যোগ অনুভব করা ও ঘনিষ্ঠ করিয়া তোলাই অদ্যকার এই সভার একটি উদ্দেশ্য।

তোমরা সকলেই জান, আকাশে যে-ছায়াপথ দেখা যায় তাহার স্থানে স্থানে তেজ পুঞ্জীভূত হইয়া নক্ষত্র-আকার ধারণ করিতেছে এবং অপর অংশে জ্যোতির্বাষ্প অসংহতভাবে ব্যাপ্ত হইয়া আছে— কিন্তু সংহত-অসংহত সমস্তটা লইয়াই এই ছায়াপথ।

আমাদের বাংলাদেশেও যে জ্যোতির্ময় সারস্বত ছায়াপথ রচিত হইয়াছে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে তাহারই একটি কেন্দ্রবদ্ধ সংহত অংশ বলা যাইতে পারে, ছাত্রমণ্ডলী তাহার চতুর্দিকে জ্যোতির্বাষ্পের মতো বিকীর্ণ অবস্থায় আছে। এই ঘন অংশের সঙ্গে বিকীর্ণ অংশের যখন জাতিগত ঐক্য আছে, তখন সে-ঐক্য সচেতনভাবে অনুভব করা চাই, তখন এই দুই আত্মীয় অংশের মধ্যে আদানপ্রদানের যোগস্থাপন করা নিতান্ত আবশ্যক।

যে-ঐক্যের কথা আজ আমি বলিতেছি পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে তাহা মুখে আনিবার জো ছিল না। তখন ইংরেজি-শিক্ষামদে-উন্মত্ত ছাত্রগণ মাতৃভাষার দৈন্যকে পরিহাস করিতে কুণ্ঠিত হন নাই এবং উপবাসী দেশীয় সাহিত্যকে একমুষ্টি অন্ন না দিয়া বিদায় করিয়াছেন।

আমাদের বাল্যকালেও দেশের সাহিত্যসমাজ ও দেশের শিক্ষিতসমাজের মাঝখানকার ব্যবধানরেখা অনেকটা স্পষ্ট ছিল। তখনো ইংরেজি রচনা ও ইংরেজি বক্তৃতায় খ্যাতিলাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা ছাত্রদের মনে সকলের চেয়ে প্রবল ছিল। এমন কি, যাঁহারা বাংলা সাহিত্যের প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করিতেন তাঁহারা ইংরেজি মাচার উপরে চড়িয়া তবে সেটুকু প্রশ্রয় বিতরণ করিতে পারিতেন। সেইজন্য তখনকার দিনে মধুসূদনকে মধুসূদন, হেমচন্দ্রকে হেমচন্দ্র, বঙ্কিমকে বঙ্কিম জানিয়া আমাদের তৃপ্তি ছিল না, তখন কেহ বা বাংলার মিল্টন, কেহ বা বাংলার বায়রন,

কেহ বা বাংলার স্কট বলিয়া পরিচিত ছিলেন,— এমন কি, বাংলার অভিনেতাকে সম্মানিত করিতে হইলে তাঁহাকে বাংলার গ্যারিক বলিলে আমাদের আশ মিটিত, অথচ গ্যারিকের সহিত কাহারও সাদৃশ্যনির্ণয় আমাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না; কারণ গ্যারিক যখন নটলীলা সংবরণ করিয়াছিলেন তখন আমাদের দেশের নাট্যাভিনয় যাত্রার দলের মধ্যে জন্মান্তর যাপন করিতেছিল।

কিন্তু, প্রথম অবস্থার চেয়ে এই দ্বিতীয় অবস্থাটা আমাদের পক্ষে আশাজনক। কারণ, বাংলায় বায়রন-স্কটে সুদূর সাদৃশ্য যে মিলিতে পারে, এ-কথা ইংরেজিওয়ালার পক্ষে স্বীকার করা তখনকার দিনের একটা সুলক্ষণ বলিতে হইবে।

এখনকার তৃতীয় অবস্থায় ঐ ইংরেজি উপাধিগুলার কুয়াশা কাটিয়া গিয়া বাংলা সাহিত্য আর কাহারও সহিত তুলনার আশ্রয় না লইয়া নিজমূর্তিতে প্রকাশ পাইবার চেষ্টা করিতেছে। আমাদের সাহিত্যের প্রতি দেশের লোকের যথার্থ সম্মান ইহাতে ব্যক্ত হইতেছে।

ইহার কারণ, বাংলা সাহিত্য ক্রমশ আপনার মধ্যে একটা স্বাধীনতার তেজ অনুভব করিতেছে। ইহাতে প্রমাণ হয়, আমাদের মনটা ইংরেজি গুরুমহাশয়ের অপরিমিত শাসন হইতে অল্পে অল্পে মুক্ত হইয়া আসিতেছে। একদিন গেছে যখন আমাদের শিক্ষিত লোকেরা ইংরেজি পুঁথির প্রত্যেক কথাই বেদবাক্য বলিয়া জ্ঞান করিত। ইংরেজিগ্রস্ততা এতদূর পর্যন্ত সাংঘাতিক হইয়া উঠিয়াছিল যে, ইংরেজি বিধিবিধানের সহিত কোনোপ্রকারে মিলাইতে না পারিয়া জামাইষষ্ঠী ফিরাইয়া দিয়াছে এবং আমোদ করিয়া বান্ধবের গায়ে আবির-লেপনকে চরিত্রের একটা চিরস্থায়ী কলঙ্ক বলিয়া গণ্য করিয়াছে— এতবড়ো শিক্ষিত-মূর্খতার প্রমাণ আমরা পাইয়াছি।

এ-রোগের সমস্ত উপসর্গ যে একেবারে কাটিয়াছে, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু আরোগ্যের লক্ষণ দেখা দিয়াছে। আজকাল আমরা ইংরেজি ছাপাখানার দ্বারে ধন্না না দিয়া নিজে সন্ধান করিতে, নিজে যাচাই করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এমন কি পুঁথির প্রতিবাদ করিতেও সাহস হয়।

নিজের মধ্যে এই যে একটা স্বাতন্ত্র্যের অনুভূতি যে-অনুভূতি না থাকিলে শক্তির যথার্থ স্ফূর্তি হইতে পারে না, ইহা কোনো একটা দিকে আরম্ভ হইলে ক্রমে সকল দিকেই আপনাকে প্রকাশ করিতে থাকে। ধর্মে, কর্মে, সমাজে, সর্বত্র আমরা ইহার পরিচয় পাইতেছি। কিছুকাল পূর্বে আমাদের দেশের শাস্ত্র এবং শাসন সমস্তই আমরা খ্রীস্টান পাদরির চোখে দেখিতাম— পাদরির কষ্টিপাথরে কোন্‌টাতে কী রকম

দাগ পড়িতেছে, ইহাই আলোচনা করিয়া দেশের সমস্ত জিনিসকে বিচার করিতে হইত।

প্রথম-প্রথম সে-বিচারে দেশের কোনো জিনিসেরই মূল্য ছিল না। তার পরে মাঝে আর-একটু ভালো লক্ষণ দেখা দিল। তখন আমরা বিলিতি গুরুকে বলিতে লাগিলাম, তোমাদের দেশে যা-কিছু গৌরবের বিষয় আছে, আমাদের দেশেও তা সমস্তই ছিল; আমাদের দেশে রেলগাড়ি এবং বেলুন ছিল, শাস্ত্রে তাহার প্রমাণ আছে এবং ঋষিরা জানিতেন সূর্যালোকে গাছপালা অক্সিজেন নিশ্বাস পরিত্যাগ করে, সেইজন্যই প্রাতঃকালে পূজার পুষ্পচয়নের বিধান হইয়াছে। এ-কথা বলিবার সাহস ছিল না যে, রেলগাড়ি-বেলুন না থাকিলেও গৌরবের কারণ থাকিতে পারে এবং ফাঁকি দিয়া অক্সিজেন বাষ্প গ্রহণ করানোর চেয়ে নির্মল প্রত্যুষে সর্বকর্মারম্ভে সুন্দরভাবে দেবতার সেবায় লোকের মনকে নিযুক্ত করিবার মাহাত্ম্য অধিক।

এখনো এ-ভাবটা আমরা যে সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে পারিয়াছি, তা নয়। এ-কথা এখনো সম্পূর্ণ ভুলিতে পারি নাই যে, পাদরির কষ্টিপাথরে যাহা উজ্জ্বল দাগ দেয় তাহা মূল্যবান হইতে পারে, কিন্তু জগতে সোনাই তো একমাত্র মূল্যবান পদার্থ নয়;—পাথরে কিছুমাত্র দাগ টানে না, এমন মূল্যবান জিনিসও জগতে আছে। যাহা হউক, বন্ধন শিথিল হইতেছে। আজকাল অল্প অল্প করিয়া এ-কথা বলিতে আমরা সাহস করিতেছি যে, পাদরির বিচারে যাহা নিন্দনীয়, বিলাতের বিধানে যাহা গর্হিত, আমাদের দিক হইতে তাহার পক্ষে বলিবার কথা অনেক আছে।

আমরা যাহাকে পলিটিক্স বলি, তাহার মধ্যেও এই ভাবটা দেখিতে পাই। প্রথমে যাহা সানুনয় প্রসাদভিক্ষা ছিল দ্বিতীয় অবস্থাতে তাহার ঝুলি খসে নাই, কিন্তু তাহার বুলি অন্যরকম হইয়া গেছে— ভিক্ষুকতা যতদূর পর্যন্ত উদ্ধত স্পর্ধার আকার ধারণ করিতে পারে, তাহা করিয়াছে। আমাদের আধুনিক আন্দোলনগুলিকে আমরা বিলাতি রাষ্ট্রনৈতিক ক্রিয়াকলাপের অনুরূপ মনে করিয়া উৎসাহবোধ করিতেছি।

তৃতীয় অবস্থায় আমরা ইহার উপরের ধাপে উঠিবার চেষ্টা করিতেছি। এ-কথা বলিতে শুরু করিয়াছি যে, হাতজোড় করিয়াই ভিক্ষা করি আর চোখ রাঙাইয়াই ভিক্ষা করি, এত সহজ উপায়ে গৌরবলাভ করা যায় না— দেশের জন্য স্বাধীন শক্তিতে যতটুকু কাজ নিজে করিতে পারি, তাহাতে দুই দিকে লাভ— এক তো ফললাভ; দ্বিতীয়ত নিজে কাজ করাটাই একটা লাভ, সেটা ফললাভের চেয়ে বেশি বই কম নয়— সেই গৌরবের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই আমাদের দেশের গুরু বলিয়াছেন, ফলের

প্রতি আসক্তি না রাখিয়া কর্ম করিবে। ভিক্ষার অগৌরব এই যে, ফললাভ হইলেও নিজের শক্তি নিজে খাটাইবার যে সার্থকতা, তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়।

যাহা হউক, ইহা দেখা যাইতেছে যে, সকল দিক দিয়াই আমরা নিজের স্বাধীন শক্তির গৌরব অনুভব করিবার একটা উদ্যম অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতেছি—সাহিত্য হইতে আরম্ভ করিয়া পলিটিক্স্ পর্যন্ত কোথাও ইহার বিচ্ছেদ নাই।

ইহার একটা ফল এই দেখিতেছি, পূর্বে ইংরেজি শিক্ষা আমাদের দেশে প্রাচীন-নবীন, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, উচ্চ নীচ, ছাত্র ও সংসারীর মধ্যে যে একটা বিচ্ছেদের সৃষ্টি করিয়াছিল, এখন তাহার উল্‌টা কাজ আরম্ভ হইয়াছে, এখন আবার আমরা নিজেদের ঐক্যসূত্র সন্ধান করিয়া পরস্পর ঘনিষ্ঠ হইবার চেষ্টা করিতেছি। মধ্যকালের এই বিচ্ছিন্নতাই পরিণামের মিলনকে যথার্থভাবে সম্পূর্ণ করিবে, তাহার সন্দেহ নাই।

এই মিলনের আকর্ষণেই আজ বঙ্গভাষা বঙ্গসাহিত্য আমাদের ইংরেজি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকেও আপন করিয়াছে। একদিন যেখানে বিপক্ষের দুর্ভেদ্য দুর্গ ছিল সেখান হইতেও বঙ্গের বিজয়িনী বাণী স্বেচ্ছাসমাগত সেবকদের অর্ঘ্যলাভ করিতেছেন।

পূর্বে এমন দিন ছিল যখন ইংরেজি পাঠশালা হইতে আমাদের একেবারে ছুটি ছিল না। বাড়ি আসিতাম, সেখানেও পাঠশালা পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া আসিত। বন্ধুকেও সম্ভাষণ করিতাম ইংরেজিতে, পিতাকেও পত্র লিখিতাম ইংরেজিতে, প্রাণের কথা বলিতাম ইংরেজি কাব্যে, দেশের লোককে সভায় আহ্বান করিতাম ইংরেজি বক্তৃতায়। আজ যখন সেই পাঠশালা হইতে, একেবারে না হউক, ক্ষণে ক্ষণে ছুটি পাইয়া থাকি তখন সেই ছুটির সময়টাতে আনন্দ করিব কোথায়। মাতার অন্তঃপুরে নহে কি। দিনের পড়া তো শেষ হইল, তার পরে ক্রিকেট খেলাতেও না হয় রণজিৎ হইয়া উঠিলাম। তার পরে? তার পরে গৃহবাতায়ন হইতে মাতার স্বহস্তজ্বালিত সন্ধ্যাদীপটি কি চোখে পড়িবে না। যদি পড়ে, তবে কি অবজ্ঞা করিয়া বলিব, ওটা মাটির প্রদীপ। ওই মাটির প্রদীপের পশ্চাতে কি মাতার গৌরব নাই। যদি মাটির প্রদীপই হয় তো সে দোষ কার। মাতার কক্ষে সোনার প্রদীপ গড়িয়া দিতে কে বাধা দিয়াছে। যেমনই হউক না কেন, মাটিই হউক আর সোনাই হউক, যখন আনন্দের দিন আসিবে তখন ওইখানেই আমাদের উৎসব; আর যখন দুঃখের অন্ধকার ঘনাইয়া আসে তখন রাজপথে দাঁড়াইয়া চোখের জল ফেলা যায় না, তখন ওই গৃহ ছাড়া আর গতি নাই।

আজ এখানে আমরা সেই পাঠশালার ফেরত আসিয়াছি। আজ সাহিত্য-

পরিষৎ আমাদিগকে যেখানে আহ্বান করিয়াছেন তাহা কলেজ-ক্লাস হইতে দূরে, তাহা ক্রিকেট-ময়দানেরও সীমান্তরে, সেখানে আমাদের দরিদ্র জননীর সন্ধ্যাবেলাকার মাটির প্রদীপটি জ্বলিতেছে। সেখানে আয়োজন খুব বেশি নাই— কিন্তু, তোমরা এক সময়ে তাঁহার কাছে শ্রান্তদেহে ফিরিয়া আসিবে বলিয়া সমস্ত দিন যিনি পথ তাকাইয়া বসিয়া আছেন, আয়োজনে কি তাঁহার গৌরব প্রমাণ হইবে। তিনি এইমাত্র জানেন যে, তোমরাই তাঁহার একমাত্র গৌরব এবং আমরা জানি, তোমাদের একমাত্র গৌরব তাঁহার চরণের ধূলি, ভিক্ষালব্ধ রাজপ্রসাদ নহে।

পরীক্ষাশালা হইতে আজ তোমরা সদ্য আসিতেছ, সেইজন্য ঘরের কথা আজই তোমাদিগকে স্মরণ করাইবার যথার্থ অবকাশ উপস্থিত হইয়াছে—সেইজন্যই বঙ্গবাণীর হইয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ আজ তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন।

কলেজের বাহিরে যে-দেশ পড়িয়া আছে তাহার মহত্ত্ব একেবারে ভুলিলে চলিবে না। কলেজের শিক্ষার সঙ্গে দেশের একটা স্বাভাবিক যোগ স্থাপন করিতে হইবে।

অন্য দেশে সে-যোগ চেষ্টা করিয়া স্থাপন করিতে হয় না। সে-সকল দেশের কলেজ দেশেরই একটা অঙ্গ— সমস্ত দেশের আভ্যন্তরিক প্রকৃতি তাহাকে গঠিত করিয়া তোলাতে দেশের সহিত কোথাও তাহার কোনো বিচ্ছেদের রেখা নাই। আমাদের কলেজের সহিত দেশের ভেদচিহ্নহীন সুন্দর ঐক্য স্থাপিত হয় নাই। যেরূপ দেখা যাইতেছে, বিদ্যাশিক্ষা কালক্রমে কর্তৃপক্ষের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন হইয়া এই প্রভেদকে বাড়াইয়া তুলিবে।

এমন অবস্থায় আমাদের বিশেষ চিন্তার বিষয় এই হইয়াছে, কী করিলে বিদেশী-চালিত কলেজের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদিগকে একটা স্বাধীন শিক্ষায় নিযুক্ত করিয়া শিক্ষাকার্যকে যথার্থভাবে সম্পূর্ণ করা যাইতে পারে। তাহা না করিলে শিক্ষাকে কোনোমতে পুঁথির গণ্ডির বাহিরে আনা দুঃসাধ্য হইবে।

নানা আলোচনা নানা বাদপ্রতিবাদের ভিতর দিয়া পাঠ্যবিষয়গুলি যেখানে প্রত্যহ প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছে, যাঁহারা আবিষ্কার করিতেছেন, সৃষ্টি করিতেছেন, প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহারাই যেখানে শিক্ষা দিতেছেন, সেখানে শিক্ষা জড় শিক্ষা নহে। সেখানে কেবল যে বিষয়গুলিকেই পাওয়া যায়, তাহা নহে, সেই সঙ্গে দৃষ্টির শক্তি, মননের উদ্যম, সৃষ্টির উৎসাহ পাওয়া যায়। এমন অবস্থায় পুঁথিগত বিদ্যার অসহ জুলুম থাকে না, গ্রন্থ হইতে যেটুকু লাভ করা যায়, তাহারই মধ্যে একান্তভাবে বদ্ধ হইতে হয় না।

আমাদের দেশেও পুঁথিকে মনের রাজা না করিয়া মনকে পুঁথির উপর আধিপত্য

দিবার উপায় একটু বিশেষভাবে চিন্তা ও একটু বিশেষ উদ্যোগের সহিত সম্পন্ন করিতে হইবে। এই কাজের জন্য আমি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে অনুরোধ করিতেছি। আমার অনুনয়, বাঙালী ছাত্রদের জন্য তাঁহারা যথাসম্ভব একটি স্বাধীন শিক্ষার ক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া দিন—যে ক্ষেত্রে ছাত্রগণ কিঞ্চিৎপরিমাণেও নিজের শক্তিপ্রয়োগ ও বুদ্ধির কর্তৃত্ব অনুভব করিয়া চিত্তবৃত্তিকে স্ফূর্তিদান করিতে পারিবে।

বাংলাদেশের সাহিত্য, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, লোকবিবরণ প্রভৃতি যাহা-কিছু আমাদের জ্ঞাতব্য, সমস্তই বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের অনুসন্ধান ও আলোচনার বিষয়। দেশের এই-সমস্ত বৃত্তান্ত জানিবার ঔৎসুক্য আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক হওয়া উচিত ছিল—কিন্তু তাহা না হইবার কারণ, আমরা শিশুকাল হইতে ইংরেজি বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক, যাহা ইংরেজ ছেলেদের জন্য রচিত, তাহাই পড়িয়া আসিতেছি; ইহাতে নিজের দেশ আমাদের কাছে অস্পষ্ট এবং পরের দেশের জিনিস আমাদের কাছে অধিকতর পরিচিত হইয়া আসিয়াছে।

এজন্য কাহাকেও দোষ দেওয়া যায় না। আমাদের দেশের যথার্থ বিবরণ আজ পর্যন্ত প্রস্তুত হইয়া উঠে নাই, সেইজন্য যদিও আমরা স্বদেশে বাস করিতেছি তথাপি স্বদেশ আমাদের জ্ঞানের কাছে সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র হইয়া আছে।

এইরূপে স্বদেশকে মুখ্যভাবে সম্পূর্ণভাবে আমাদের জ্ঞানের আয়ত্ত না করিবার একটা দোষ এই যে, স্বদেশের সেবা করিবার জন্য আমরা কেহ যথার্থ ভাবে যোগ্য হইতে পারি না। আর-একটা কথা এই, জ্ঞানশিক্ষা নিকট হইতে দূরে, পরিচিত হইতে অপরিচিতের দিকে গেলেই তাহার ভিত্তি পাকা হইতে পারে। যে-বস্তু চতুর্দিকে বিস্তৃত নাই, যে-বস্তু সম্মুখে উপস্থিত নাই, আমাদের জ্ঞানের চর্চা যদি প্রধানত তাহাকে অবলম্বন করিয়াই হইতে থাকে, তবে সে-জ্ঞান দুর্বল হইবেই। যাহা পরিচিত তাহাকে সম্পূর্ণরূপে যথার্থভাবে আয়ত্ত করিতে শিখিলে, তবে যাহা অপ্রত্যক্ষ যাহা অপরিচিত, তাহাকে গ্রহণ করিবার শক্তি জন্মে।

আমাদের বিদেশী গুরুরা প্রায়ই আমাদিগকে খোঁটা দিয়া বলেন যে এতদিন যে তোমরা আমাদের পাঠশালে এত করিয়া পড়িলে, কিন্তু তোমাদের উদ্ভাবনাশক্তি জন্মিল না, কেবল কতকগুলো মুখস্থবিদ্যা সংগ্রহ করিলে মাত্র।

যদি তাঁহাদের এ-অপবাদ সত্য হয় তবে ইহার প্রধান কারণ এই, বস্তুর সহিত বহির সহিত আমরা মিলাইয়া শিখিবার অবকাশ পাই না। আমাদের অধিকাংশ শিক্ষা যে-সকল দৃষ্টান্ত আশ্রয় করে তাহা আমাদের দৃষ্টিগোচর নহে। আমরা ইতিহাস পড়ি—কিন্তু যে ইতিহাস আমাদের দেশের জনপ্রবাহকে অবলম্বন করিয়া

প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে, যাহার নানা লক্ষণ, নানা স্মৃতি আমাদের ঘরে বাহিরে নানা স্থানে প্রত্যক্ষ হইয়া আছে, তাহা আমরা আলোচনা করি না বলিয়া ইতিহাস যে কী জিনিস তাহার উজ্জ্বল ধারণা আমাদের হইতেই পারে না। আমরা ভাষাতত্ত্ব মুখস্থ করিয়া পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করি, কিন্তু আমাদের নিজের মাতৃভাষা কালে কালে প্রদেশে প্রদেশে কেমন করিয়া যে নানা রূপান্তরের মধ্যে নিজের ইতিহাস প্রত্যক্ষ নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে তাহা তেমন করিয়া দেখি না বলিয়াই ভাষারহস্য আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে না। এক ভারতবর্ষে সমাজ ও ধর্মের যেমন বহুতর অবস্থাবৈচিত্র্য আছে, এমন বোধ হয় আর কোনো দেশে নাই। অনুসন্ধানপূর্বক, অভিনিবেশপূর্বক সেই বৈচিত্র্য আলোচনা করিয়া দেখিলে সমাজ ও ধর্মের বিজ্ঞান আমাদের কাছে যেমন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে, এমন দূর দেশের ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় বই পড়িয়ামাত্র কখনো হইতেই পারে না।

ধারণা যখন অস্পষ্ট ও দুর্বল থাকে তখন উদ্ভাবনাশক্তির আশা করা যায় না। এমন কি, তখনকার সমস্ত উদ্ভাবনা অবাস্তবিক অদ্ভুত আকার ধারণ করে। এইজন্যই আমরা কেতাবে ইতিহাস শিখিয়াও ঐতিহাসিক বিচার তেমন করিয়া আয়ত্ত করিতে পারি নাই; কেতাবে বিজ্ঞান শিখিয়াও অভূতপূর্ব কাল্পনিকতাকে বিজ্ঞান বলিয়া চালাইয়া থাকি; ধর্ম, সমাজ, এমন কি, সাহিত্য-সমালোচনাতেও অপ্রমত্ত পরিমাণ-বোধ রক্ষা করিতে পারি না।

বাস্তবিকতাবিবর্জিত হইলে আমাদের মনই বল, হৃদয়ই বল, কল্পনাই বল, কৃশ এবং বিকৃত হইয়া যায়। আমাদের দেশহিতৈষা ইহার প্রমাণ। দেশের লোকের হিতের সঙ্গে এই হিতৈষার যোগ নাই। দেশের লোক রোগে মরিতেছে, দারিদ্র্যে জীর্ণ হইতেছে, অশিক্ষা ও কুশিক্ষায় নষ্ট হইতেছে, ইহার প্রতিকারের জন্য যাহারা কিছুমাত্র নিজের চেষ্টা প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হয় না তাহারা বিদেশী সাহিত্য-ইতিহাসের পুঁথি-গত পেট্রিয়টিজ্‌ম নানাপ্রকার অসংগত অনুকরণের দ্বারা লাভ করিয়াছি বলিয়া কল্পনা করে। এইজন্যই, এতকাল গেল, তথাপি এই পেট্রিয়টিজ্‌ম আমাদিগকে যথার্থ কোনো ত্যাগস্বীকারে প্রবৃত্ত করিতে পারিল না। যে দেশে পেট্রিয়টিজ্‌ম অবাস্তব নহে, পুঁথিগত অনুকরণমূলক নহে, সেখানকার লোক দেশের জন্য অনায়াসে প্রাণ দিতেছে; আমরা সামান্য অর্থ দিতে পারি না, সময় দিতে পারি না, আমাদের দেশ যে কিরূপ তাহা সন্ধানপূর্বক জানিবার জন্য উৎসাহ অনুভব করি না। যোশিদা তোরাজিরো জাপানের এক জন বিখ্যাত পেট্রিয়ট ছিলেন। তিনি তাঁহার প্রথমাবস্থায় চালচিঁড়া বাঁধিয়া পায়ে হাঁটিয়া ক্রমাগতই সমস্ত দেশ কেবল ভ্রমণ করিয়াই বেড়াইয়াছেন।

এইরূপে দেশকে তন্ন তন্ন করিয়া জানিয়া তাহার পরে ছাত্র পড়াইবার কাজে নিযুক্ত হন— শেষদশায় তাঁহাকে দেশের কাজে প্রাণ দিতে হইয়াছিল। এইরূপ পেট্রিয়টিজ্‌মের অর্থ বোঝা যায়। দেশের বাস্তবিক জ্ঞান এবং দেশের বাস্তবিক কাজের উপরে যখন দেশহিতৈষা প্রতিষ্ঠিত হয় তখনই তাহা মাটিতে বদ্ধমূল গাছের মতো ফল দিতে থাকে।

অতএব এ-কথা যদি সত্য হয় যে, প্রত্যক্ষবস্তুর সহিত সংস্রব ব্যতীত জ্ঞানই বল, ভাবই বল, চরিত্রই বল, নির্জীব ও নিষ্ফল হইতে থাকে, তবে আমাদের ছাত্রদের শিক্ষাকে সেই নিষ্ফলতা হইতে যথাসাধ্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করা অত্যাবশ্যক।

বাংলাদেশ আমাদের নিকটতম—ইহারই ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতিকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ আপনার আলোচ্য বিষয় করিয়াছেন। পরিষদের নিকট আমার নিবেদন এই যে, এই আলোচনাব্যাপারে তাঁহারা ছাত্রদিগকে আহ্বান করিয়া লউন। তাহা হইলে প্রত্যক্ষবস্তুর সম্পর্কে ছাত্রদের বীক্ষণশক্তি ও মননশক্তি সবল হইয়া উঠিবে এবং নিজের চারিদিককে, নিজের দেশকে ভালো করিয়া জানিবার অভ্যাস হইলে অন্য সমস্ত জানিবার যথার্থ ভিত্তিপত্তন হইতে পারিবে। তা ছাড়া, নিজের দেশকে ভালো করিয়া জানার চর্চা নিজের দেশকে যথার্থভাবে প্রীতির চর্চার অঙ্গ।

বাংলাদেশে এমন জিলা নাই যেখান হইতে কলিকাতায় ছাত্রসমাগম না হইয়াছে। দেশের সমস্ত বৃত্তান্তসংগ্রহে ইহাদের যদি সহায়তা পাওয়া যায়, তবে সাহিত্য-পরিষৎ সার্থকতা লাভ করিবেন। এ-সাহায্য কিরূপ এবং তাহার কতদূর প্রয়োজনীয়তা, তাহার দুই-একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

বাংলাভাষায় একখানি ব্যাকরণ-রচনা সাহিত্য-পরিষদের একটি প্রধান কাজ। কিন্তু কাজটি সহজ নহে। এই ব্যাকরণের উপকরণ সংগ্রহ একটি দুরূহ ব্যাপার। বাংলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশে যতগুলি উপভাষা প্রচলিত আছে তাহারই তুলনাগত ব্যাকরণই যথার্থ বাংলার বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ। আমাদের ছাত্রগণ সমবেতভাবে কাজ করিতে থাকিলে এই বিচিত্র উপভাষার উপকরণগুলি সংগ্রহ করা কঠিন হইবে না।

বাংলায় এমন প্রদেশ নাই যেখানে স্থানে স্থানে প্রাকৃত লোকদের মধ্যে নূতন নূতন ধর্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি না হইতেছে। শিক্ষিত লোকেরা এগুলির কোনো খবরই রাখেন না। তাঁহারা এ কথা মনেই করেন না, প্রকাণ্ড জনসম্প্রদায় অলক্ষ্য গতিতে নিঃশব্দচরণে চলিয়াছে; আমরা অবজ্ঞা করিয়া তাহাদের দিকে তাকাই না বলিয়া যে তাহারা স্থির হইয়া বসিয়া আছে, তাহা নহে— নূতন কালের নূতন শক্তি তাহাদের

মধ্যে পরিবর্তনের কাজ করিতেছেই; সে-পরিবর্তন কোন্ পথে চলিতেছে, কোন্ রূপ ধারণ করিতেছে, তাহা না জানিলে দেশকে জানা হয় না। শুধু যে দেশকে জানাই চরম লক্ষ্য, তাহা আমি বলি না— যেখানেই হোক না কেন, মানব-সাধারণের মধ্যে যা-কিছু ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলিতেছে, তাহা ভালো করিয়া জানারই একটা সার্থকতা আছে। পুঁথি ছাড়িয়া সজীব মানুষকে প্রত্যক্ষ পড়িবার চেষ্টা করাতেই একটা শিক্ষা আছে; তাহাতে শুধু জানা নয়, কিন্তু জানিবার শক্তির এমন একটা বিকাশ হয় যে কোনো ক্লাসের পড়ায় তাহা হইতেই পারে না। পরিষদের অধিনায়কতায় ছাত্রগণ যদি স্বস্ব প্রদেশের নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে যে-সমস্ত ধর্মসম্প্রদায় আছে তাহাদের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারেন, তবে মন দিয়া মানুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার যে একটা শিক্ষা তাহাও লাভ করিবেন এবং সেই সঙ্গেই দেশেরও কাজ করিতে পারিবেন।

আমরা নৃতত্ত্ব অর্থাৎ ethnologyর বই যে পড়ি না তাহা নহে, কিন্তু যখন দেখিতে পাই, সেই বই পড়ার দরুন আমাদের ঘরের পাশে যে হাড়ি-ডোম কৈবর্ত-বাগদি রহিয়াছে তাহাদের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইবার জন্য আমাদের লেশমাত্র ঔৎসুক্য জন্মে না, তখনই বুঝিতে পারি, পুঁথি সম্বন্ধে আমাদের কত বড়ো একটা কুসংস্কার জন্মিয়া গেছে— পুঁথিকে আমরা কত বড়ো মনে করি এবং পুঁথি যাহার প্রতিবিম্ব তাহাকে কতই তুচ্ছ বলিয়া জানি। কিন্তু, জ্ঞানের সেই আদিনিকেতনে একবার যদি জড়ত্ব ত্যাগ করিয়া প্রবেশ করি, তাহা হইলে আমাদের ঔৎসুক্যের সীমা থাকিবে না। আমাদের ছাত্রগণ যদি তাঁহাদের এই-সকল প্রতিবেশীদের সমস্ত খোঁজে একবার ভালো করিয়া নিযুক্ত হন, তবে কাজের মধ্যেই কাজের পুরস্কার পাইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সন্ধান ও সংগ্রহ করিবার বিষয় এমন কত আছে তাহার সীমা নাই। আমাদের ব্রতপার্বণগুলি বাংলার এক অংশে যেরূপ অন্য অংশে সেরূপ নহে। স্থানভেদে সামাজিক প্রথার অনেক বিভিন্নতা আছে। এ ছাড়া গ্রাম্য ছড়া, ছেলে ভুলাইবার ছড়া, প্রচলিত গান প্রভৃতির মধ্যে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় নিহিত আছে। বস্তুত, দেশবাসীর পক্ষে দেশের কোনো বৃত্তান্তই তুচ্ছ নহে, এই কথা মনে রাখিয়াই সাহিত্য-পরিষৎ নিজের কর্তব্যনিরূপণ করিয়াছেন।

আমাদের ছাত্রগণকে পরিষদের কর্মশালায় সহায়স্বরূপে আকর্ষণ করিবার জন্য আমার অনুরোধ পরিষৎ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই অদ্যকার এই সভায় আমি ছাত্রগণকে আমন্ত্রণ করিবার ভার লইয়াছি। সেই কাজে প্রবৃত্ত হইবার সময় আমাদের তরুণাবস্থার কথা আমার মনে পড়িতেছে।

আমাদের তরুণাবস্থা বলিলে যে অত্যন্ত সুদূরকালের কথা বোঝায়, এতবড়ো প্রাচীনত্বের দাবি আমি করিতে পারি না— কিন্তু, আমাদের তখনকার দিনের সঙ্গে এখনকার দিনের এমন একটা পরিবর্তন দেখিতে পাই যে, সেই অদূরবর্তী সময়কে যেন একটা যুগান্তর বলিয়া মনে হয়। এই পরিবর্তনটা বয়সের দোষে আমি দেখিতেছি অথবা এই পরিবর্তনটা সত্যই ঘটিয়াছে, তাহা ভাবিবার বিষয়। একটু বয়স বেশি হইলেই প্রাচীনতর লোকেরা তাঁহাদের সেকালের সঙ্গে তুলনা করিয়া একালকে খোঁটা দিতে বসেন— তাহার একটা কারণ, সেকাল তাঁহাদের আশা করিবার কাল ছিল এবং একালটা তাঁহাদের হিসাব বুঝিবার দিন। তাঁহারা ভুলিয়া যান, একালের যুবকেরাও আশা করিয়া জীবন আরম্ভ করিতেছে, এখনো তাহারা চশমা চোখে হিসাব মিটাইতে বসে নাই। অতএব, আমাদের সেদিনকার কালের সঙ্গে অদ্যকার কালের যে প্রভেদটা আমি দেখিতেছি তাহা যথার্থ কি না, তাহার বিচারক একা আমি নহি, তোমাদিগকেও তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

সত্যমিথ্যা নিশ্চয় জানি না, কিন্তু মনে হয়, এখনকার ছেলেদের চেয়ে তখন আমরা অনেক বেশি ছেলেমানুষ ছিলাম। সেটা ভালো কি মন্দ তাহার দুই পক্ষেই বলিবার কথা আছে— কিন্তু, ছেলেমানুষ থাকিবার একটা গুণ ছিল যে, আমাদের আশার অন্ত ছিল না, ভবিষ্যতের দিকে কী চোখে যে চাহিতাম, কিছুই অসাধ্য এবং অসম্ভব বলিয়া মনে হইত না। তখন আমরা এমন-সকল সভা করিয়াছিলাম, এমন-সকল দল বাঁধিয়াছিলাম, এমন-সকল সংকল্পে বদ্ধ হইয়াছিলাম যাহা এখনকার দিনে তোমরা শুনিলে নিশ্চয় হাস্যসংবরণ করিতে পারিবে না— এবং আমাদের সাহিত্যে কোনো কোনো স্থলে আমাদের সেদিনকার চিত্র হাস্যরসরঞ্জিত তুলিকায় চিত্রিত হইয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

কিন্তু, সব কথা যদি খুলিয়া বলি তবে তোমরা এই মনে করিয়া বিস্মিত হইবে যে, আমাদের সেকালে আমরা, বালকেরা, সকলেই যে একবয়সী ছিলাম তাহা নহে, আমাদের মধ্যে পক্বকেশের অভাব ছিল না এবং তাঁহাদের আশা ও উৎসাহ আমাদের চেয়ে যে কিছুমাত্র অল্প ছিল, তাহাও বলিতে পারি না। তখন আমরা নবীনে-প্রবীণে মিলিয়া ভয়-লজ্জা-নৈরাশ্য কেমন নিঃশেষে বিসর্জন দিয়াছিলাম, তাহা আজও ভুলিতে পারিব না।

সেদিনের চেয়ে নিঃসন্দেহই আজ আমরা অনেক বিষয়ে অগ্রসর হইয়াছি, কিন্তু আজ আকাশে আশার আলোক যেন ম্লান এবং পথিকের হস্তে আনন্দের পাথেয় যেন অপ্রচুর।

কেন এমনটা ঘটিল তাহার জবাবদিহি এখনকার কালের নহে, আমাদিগকেই তাহার কৈফিয়ত দিতে হইবে। যে-আশার সম্বল লইয়া যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলাম তাহা পথের মধ্যে কোন্‌খানে উড়াইয়া-পুড়াইয়া দিয়া আজ এমন রিক্ত হইয়া বসিয়া আছি।

অপরিমিত আশা-উৎসাহ আমাদের অল্পবয়সের প্রথম সম্বল; কর্মের পথে যাত্রা করিবার আরম্ভকালে বিধাতৃমাতা এইটে আমাদের অঞ্চলপ্রান্তে বাঁধিয়া আশীর্বাদ করিয়া প্রেরণ করেন। কিন্তু অর্থ যেমন খাদ্য নহে, তাহা ভাঙাইয়া তবে খাইতে হয়, তেমনি আশা-উৎসাহমাত্র আমাদিগকে সার্থক করে না, তাহাকে বিশেষ কাজে খাটাইয়া তবে ফললাভ করি। সে-কথা ভুলিয়া আমরা বরাবর ওই আশা-উৎসাহেই পেট ভরাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম।

শিশুরা শুইয়া শুইয়াই হাত-পা ছুঁড়িতে থাকে,— তাহাদের সেই শরীরসঞ্চালনের কোনো লক্ষ্য নাই। প্রথমাবস্থায় শক্তির এইরূপ অনির্দিষ্ট বিক্ষেপের একটা অর্থ আছে,— কিন্তু, সেই অকারণ হাত-পা-ছোঁড়া ক্রমে যদি তাহাকে সকারণ চেষ্টার জন্য প্রস্তুত করিয়া না তোলে তবে তাহা ব্যাধি বলিয়াই গণ্য হইবে।

আমাদেরও অল্পবয়সে উদ্যমগুলি প্রথমে কেবলমাত্র নিজের আনন্দেই বিক্ষিপ্তভাবে উদ্দামভাবে চারিদিকে সঞ্চালিত হইতেছিল— তখনকার পক্ষে তাহা অদ্ভুত ছিল না, তাহা বিদ্রূপের বিষয় ছিল না। কিন্তু ক্রমেই যখন দিন যাইতে লাগিল এবং আমরা কেবল পড়িয়া পড়িয়া অঙ্গসঞ্চালন করিতে লাগিলাম কিন্তু চলিতে লাগিলাম না, শরীরের আক্ষেপবিক্ষেপকেই অগ্রসর হইবার উপায় বলিয়া কল্পনা করিতে লাগিলাম, তখন আর আনন্দের কারণ রহিল না— এবং এক সময়ে যাহা আবশ্যক ছিল অন্য সময়ের পক্ষে তাহাই দুশ্চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিল।

আমাদের প্রথমবয়সে ভারতমাতা, ভারতলক্ষ্মী প্রভৃতি শব্দগুলি বৃহদায়তন লাভ করিয়া আমাদের কল্পনাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। কিন্তু মাতা যে কোথায় প্রত্যক্ষ আছেন তাহা কখনো স্পষ্ট করিয়া ভাবি নাই; লক্ষ্মী দূরে থাকুন, তাহার পেচকটাকে পর্যন্ত কখনো চক্ষে দেখি নাই। আমরা বায়রনের কাব্য পড়িয়াছিলাম, গারিবল্‌ডির জীবনী আলোচনা করিয়াছিলাম এবং পেট্রিয়টিজমের ভাবরসসম্ভোগের নেশায় একেবারে তলাইয়া গিয়াছিলাম।

মাতালের পক্ষে মদ্য যেরূপ খাদ্যের অপেক্ষা প্রিয় হয়, আমাদের পক্ষেও দেশহিতৈষার নেশা স্বয়ং দেশের চেয়েও বড়ো হইয়া উঠিয়াছিল। যে-দেশ প্রত্যক্ষ তাহার ভাষাকে বিস্মৃত হইয়া, তাহার ইতিহাসকে অপমান করিয়া, তাহার সুখদুঃখকে

নিজের জীবনযাত্রা হইতে বহুদূরে রাখিয়াও আমরা দেশহিতৈষী হইতেছিলাম। দেশের সহিত লেশমাত্র লিপ্ত না হইয়াও বিদেশীর রাজদরবারকেই দেশহিতৈষিতার একমাত্র কার্যক্ষেত্র বলিয়া গণ্য করিতেছিলাম— এমন অবস্থাতেও, এমন ফাঁকি দিয়াও, ফললাভ করিব, আনন্দলাভ করিব, উৎসাহকে বরাবর বজায় রাখিব, এমন আশা করিতে গেলে বিশ্ববিধাতার চক্ষে ধুলা দিবার আয়োজন করিতে হয়।

আইডিয়া যত বড়োই হউক, তাহাকে উপলব্ধি করিতে হইলে একটা নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ জায়গায় প্রথম হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। তাহা ক্ষুদ্র হউক, দীন হউক, তাহাকে লঙ্ঘন করিলে চলিবে না। দূরকে নিকট করিবার একমাত্র উপায় নিকট হইতে সেই দূরে যাওয়া। ভারতমাতা যে হিমালয়ের দুর্গম চূড়ার উপরে শিলাসনে বসিয়া কেবলই করুণ সুরে বীণা বাজাইতেছেন, এ-কথা ধ্যান করা নেশা করা মাত্র— কিন্তু ভারতমাতা যে আমাদের পল্লীতেই পঙ্কশেষ পানাপুকুরের ধারে ম্যালেরিয়াজীর্ণ প্লীহারোগীকে কোলে লইয়া তাহার পথ্যের জন্য আপন শূন্য ভাণ্ডারের দিকে হতাশদৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন, ইহা দেখাই যথার্থ দেখা। যে-ভারতমাতা ব্যাস-বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের তপোবনে শমীবৃক্ষমূলে আলবালে জলসেচন করিয়া বেড়াইতেছেন তাঁহাকে করজোড়ে প্রণাম করিলেই যথেষ্ট, কিন্তু আমাদের ঘরের পাশে যে জীর্ণচীরধারিণী ভারতমাতা ছেলেটাকে ইংরেজি বিদ্যালয়ে শিখাইয়া কেরানিগিরির বিড়ম্বনার মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবার জন্য অর্ধাশনে পরের পাকশালে রাঁধিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহাকে তো অমন কেবলমাত্র প্রণাম করিয়া সারা যায় না।

যাহাই হউক, কিছুই হইল না। বিজয়ীর মতো বাহির হইলাম, ভিখারির মতো পরের দ্বারে দাঁড়াইলাম, অবশেষে সংসারী হইয়া দাওয়ায় বসিয়া সেভিংস ব্যাঙ্কের খাতা খুলিলাম। কারণ, যে-ভারতমাতা, যে-ভারতলক্ষ্মী কেবল সাহিত্যের ইন্দ্রধনুবাষ্পে রচিত, যাহা পরানুসরণের মৃগতৃষ্ণিকার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, তাহার চেয়ে নিজের সংসারটুকু যে ঢের বেশি প্রত্যক্ষ, নিজের জঠরগহ্বরটা যে ঢের বেশি সুনির্দিষ্ট— এবং ভারতমাতার অশ্রুধারা ঝিঁঝিট-খাম্বাজ রাগিণীতে যতই মর্মভেদী হউক না, ডেপুটিগিরিতে মাসে মাসে যে স্বর্ণঝংকারমধুর বেতনটি মিলে তাহাতে সম্পূর্ণ সান্ত্বনা পাওয়া যায়, ইহা পরীক্ষিত। এমনি করিয়া যে-মানুষ একদিন উদার ভাবে বিস্ফারিত হইয়া দিন আরম্ভ করে সে যখন সেই ভাবপুঞ্জকে কোনো প্রত্যক্ষবস্তুতে প্রয়োগ করিতে না পারে, তখন সে আত্মম্ভরি স্বার্থপর হইয়া ব্যর্থভাবে দিন শেষ করে।— একদিন যে-ব্যক্তি নিজের ধনপ্রাণ সমস্তই হঠাৎ দিয়া ফেলিবার জন্য প্রস্তুত হয় সে যখন দান করিবার কোনো লক্ষ্যনির্ণয় করিতে পারে না, কেবল সংকল্প-কল্পনার বিলাসভোগেই

আপনাকে পরিতৃপ্ত করে, সে একদিন এমন কঠিনহৃদয় হইয়া উঠে যে, উপবাসী স্বদেশকে যদি সুদূরপথে দেখে, তবে টাকা ভাঙাইয়া সিকিটি বাহির করিবার ভয়ে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেয়। ইহার কারণ এই যে, শুদ্ধমাত্র ভাব যত বড়োই হউক, ক্ষুদ্রতম প্রত্যক্ষবস্তুর কাছে তাহাকে পরাস্ত হইতে হইবে।

এইজন্যই বলিতেছিলাম, যাহা আমরা পুঁথি হইতে পড়িয়া পাইয়াছি, যাহাকে আমরা ভাবসম্ভোগ বা অহংকারতৃপ্তির উপায়স্বরূপ করিয়া রসালসজড়ত্বের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছি ও ক্রমে অবসাদের মধ্যে অবতরণ করিতেছি, তাহাকে প্রত্যক্ষতার মূর্তি, বাস্তবিকতার গুরুত্ব দান করিলে তবে আমরা রক্ষা পাইব। শুধু বড়ো জিনিস কল্পনা করিলেও হইবে না, বড়ো দান ভিক্ষা করিলেও হইবে না এবং ছোটো মুখে বড়ো কথা বলিলেও হইবে না, দ্বারের পার্শ্বে নিতান্ত ছোটো কাজ শুরু করিতে হইবে। বিলাতের প্রাসাদে গিয়া রোদন করিলে হইবে না, স্বদেশের ক্ষেত্রে বসিয়া কণ্টক উৎপাটন করিতে হইবে। ইহাতে আমাদের শক্তির চর্চা হইবে— সেই শক্তির চর্চামাত্রেই স্বাধীনতা, এবং স্বাধীনতামাত্রেই আনন্দ।

আজ তোমাদের তারুণ্যের মধ্যে আমার অবারিত প্রবেশাধিকার নাই, তোমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা আদর্শ যে কী, তাহা স্পষ্টরূপে অনুভব করা আজ আমার পক্ষে অসম্ভব— কিন্তু, নিজেদের নবীন কৈশোরের স্মৃতিটুকুও তো ভস্মাবৃত অগ্নিকণার মতো পক্বকেশের নিচে এখনো প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। সেই স্মৃতির বলে ইহা নিশ্চয় জানিতেছি যে, মহৎ আকাঙ্ক্ষার রাগিণী মনে যে-তারে সহজে বাজিয়া উঠে তোমাদের অন্তরের সেই সূক্ষ্ম সেই তীক্ষ্ণ সেই প্রভাতসূর্যরশ্মি-নির্মিত তন্তুর ন্যায় উজ্জ্বল তন্ত্রীগুলিতে এখনো অব্যবহারের মরিচা পড়িয়া যায় নাই— উদার উদ্দেশ্যের প্রতি নির্বিচারে আত্মবিসর্জন করিবার দিকে মানুষের মনের যে একটা স্বাভাবিক ও সুগভীর প্রেরণা আছে, তোমাদের অন্তঃকরণে এখনো তাহা ক্ষুদ্র বাধার দ্বারা বারংবার প্রতিহত হইয়া নিস্তেজ হয় নাই; আমি জানি, স্বদেশ যখন অপমানিত হয় আহত অগ্নির ন্যায় তোমাদের হৃদয় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে—নিজের ব্যবসায়ের সংকীর্ণতা ও স্বার্থসাধনের চেষ্টা তোমাদের সমস্ত মনকে গ্রাস করে নাই; দেশের অভাব ও অগৌরব যে কেমন করিয়া দূর হইতে পারে, সেই চিন্তা নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে তোমাদের রজনীর বিনিদ্র প্রহর ও দিবসের নিভৃত অবকাশকে আক্রমণ করে— আমি জানি, ইতিহাসবিশ্রুত যে-সকল মহাপুরুষ দেশহিতের জন্য লোকহিতের জন্য আপনাকে উৎসর্গ করিয়া মৃত্যুকে পরাস্ত, স্বার্থকে লজ্জিত ও দুঃখক্লেশকে অমর মহিমায় সমুজ্জ্বল করিয়া গেছেন, তাঁহাদের দৃষ্টান্ত তোমাদিগকে যখন আহ্বান করে তখন তাহাকে আজও তোমরা বিজ্ঞ বিষয়ীর মতো

বিদ্রূপের সহিত প্রত্যাখ্যান করিতে চাও না— তোমাদের সেই অনাঘ্রাত পুষ্প অখণ্ড পুণ্যের ন্যায় নবীন হৃদয়ের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে আমি আজ তোমাদের দেশের সারস্বতবর্গের নামে আহ্বান করিতেছি— ভোগের পথে নহে, ভিক্ষার পথে নহে, কর্মের পথে। কর্মশালার প্রবেশদ্বার অতি ক্ষুদ্র, রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বারের ন্যায় ইহা অভ্রভেদী নহে কিন্তু গৌরবের বিষয় এই যে, এখানে নিজের শক্তি সম্বল করিয়া প্রবেশ করিতে হয়, ভিক্ষাপাত্র লইয়া নহে— গৌরবের বিষয় এই যে, এখানে প্রবেশের জন্য দ্বারীর অনুমতির অপমান স্বীকার করিতে হয় না, ঈশ্বরের আদেশ শিরোধার্য করিয়া আসিতে হয়; এখানে প্রবেশ করিতে গেলে মাথা নত করিতে হয় বটে, কিন্তু সে কেবল নিজের উচ্চ আদর্শের নিকট, দেশের নিকট, যিনি নত ব্যক্তিকে উন্নত করিয়া দেন, সেই মঙ্গলবিধাতার নিকট। তোমাদিগকে আহ্বান করিয়া এ-পর্যন্ত কেহ তো সম্পূর্ণ নিরাশ হন নাই; দেশ যখন বিলাতি বিষাণ বাজাইয়া ভিক্ষা করিতে বাহির হইয়াছিল তখন তোমরা পশ্চাৎপদ হও নাই— প্রাচীন শ্লোকে যে-স্থানটাকে শ্মশানের ঠিক পূর্বেই বসাইয়াছেন সেই রাজদ্বারে তোমরা যাত্রা করিয়া আপনাকে সার্থক জ্ঞান করিয়াছ— আর, আজ সাহিত্য-পরিষৎ তোমাদিগকে যে আহ্বান করিতেছেন তাহার ভাষা মাতৃভাষা ও তাহার কার্য মাতার অন্তঃপুরের কার্য বলিয়াই কি তাহা ব্যর্থ হইবে— সে আহ্বান দেশের "উৎসবে ব্যসনে চৈব", কিন্তু "রাজদ্বারে শ্মশানে চ" নয় বলিয়াই কি তোমাদের উৎসাহ হইবে না। সাহিত্য-পরিষদে আমরা দেশকে জানিবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছি— দেশের কাব্যে, গানে, ছড়ায়, প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষে, কীটদষ্ট পুঁথির জীর্ণ পত্রে, গ্রাম্য পার্বণে, ব্রতকথায়, পল্লীর কৃষিকুটিরে পরিষৎ যেখানে স্বদেশকে সন্ধান করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন সেখানে বিদেশী লোকে কোনোদিন বিস্ময়দৃষ্টিপাত করে না, সেখান হইতে সংবাদপত্রবাহন খ্যাতি সমুদ্রপারে জয়ঘোষণা করিতে যায় না, সেখানে তোমাদের কোনো প্রলোভন নাই— কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেহ মাতার নিঃশব্দ আশিসমাত্রকে যদি রাজমহিষীর ভোজ্যাবশেষের চেয়ে অধিক মনে করিতে পার তবে মাতার নিভৃত-অন্তঃপুরচারী এই-সকল মাতৃসেবকদের পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হও এবং দিনের পর দিন বিনা বেতনে বিনা পুরস্কারে খ্যাতিবিহীন কর্মে স্বদেশপ্রেমকে সার্থক করো। তাহা হইলে অন্তত এইটুকু বুঝিবে যে, যদি শক্তি থাকে তবে কর্মও আছে, যদি প্রীতি থাকে তবে সেবার উপলক্ষ্যের অভাব নাই, সে-জন্য গবর্মেণ্টের কোনো আইনপাশের অপেক্ষা করিতে হয় না এবং কোনো অধিকারভিক্ষার প্রত্যাশায় রুদ্ধ দ্বারের কাছে অনন্যকর্মা হইয়া দিনরাত্রি যাপন করা অত্যাবশ্যক নহে।

আমার আশঙ্কা হইতেছে, অদ্যকার বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে আমি ঠিক মাত্রারক্ষা করিতে পারি নাই। কথাটা তো শুদ্ধমাত্র এই যে, দেশী ভাষার ব্যাকরণ চর্চা করো, অভিধান সংকলন করো, পল্লী হইতে দেশের আভ্যন্তরিক বিবরণ সংগ্রহ করো। এই সামান্য প্রস্তাবের অবতারণার জন্য এমন করিয়া উচ্চভাবের দোহাই দিয়া দীর্ঘ ভূমিকা রচনা করা কিছু যেন অসংগত হইয়াছে। হইয়াছে স্বীকার করি—কিন্তু, কালের গতিকে এইরূপ অসংগত ব্যাপার আমাদের দেশে আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, ইহাই আমাদের দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। যদি কোনো মাতার এমন অবস্থা হয় যে, ছেলের প্রতি তাঁহার কর্তব্য কী, তাহাই নিরূপণ করিবার জন্য দেশবিদেশের বিজ্ঞান দর্শন ও ধর্মশাস্ত্র পড়িয়া তিনি কূলকিনারা পাইতেছেন না, তবে তাঁহাকে এই অত্যন্ত সহজ কথাটি যত্ন করিয়া বুঝাইতে হয়— আগে দেখো তোমার ছেলেটা কোথায় আছে, কী করিতেছে, সে পাতকুয়ায় পড়িল কি আলপিন গিলিয়া বসিল, তাহার ক্ষুধা পাইয়াছে কী শীত করিতেছে। এ-সব কথা সাধারণত বলিতেই হয় না, কিন্তু যদি দুর্দৈবক্রমে বিশেষ স্থলে বলা আবশ্যক হইয়া পড়ে, তবে বাহুল্য করিয়াই বলিতে হয়। বর্তমান কালে আমাদের দেশে যদি বলা যায় যে, দেশের জন্য বক্তৃতা করো, সভা করো, তর্ক করো, তবে তাহা সকলে অতি সহজেই বুঝিতে পারেন; কিন্তু যদি বলা হয়, দেশকে জানো ও তাহার পরে স্বহস্তে যথাসাধ্য দেশের সেবা করো, তবে দেখিয়াছি, অর্থ বুঝিতে লোকের বিশেষ কষ্ট হয়। এমন অবস্থায় দেশের প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে দুটো-একটা সামান্য কথা বলিতে যদি অসামান্য বাক্যব্যয় করিয়া থাকি, তবে মার্জনা করিতে হইবে। বস্তুত, সকালবেলায় যদি ঘন কুয়াশা হইয়া থাকে তবে অধীর হইয়া ফল নাই এবং হতাশ হইবারও প্রয়োজন দেখি না— সূর্য সে-কুয়াশা ভেদ করিবেনই এবং করিবামাত্র সমস্ত পরিষ্কার হইয়া যাইবে। আজ আমি অধীরভাবে অধিক আকাঙ্ক্ষা করিব না— অবিচলিত আশার সহিত আনন্দের সহিত এই কথাই বলিব, নিবিড় কুজ্ঝটিকার মাঝে মাঝে ওই যে বিচ্ছেদ দেখা যাইতেছে— সূর্যরশ্মির ছটা খরধার কৃপাণের মতো আমাদের দৃষ্টির আবরণ তিন-চারি জায়গায় ভেদ করিয়াছে— আর ভয় নাই, গৃহদ্বারের সম্মুখেই আমাদের যাত্রাপথ অনতিবিলম্বে পরিস্ফুটরূপে প্রকাশিত হইয়া পড়িবে— তখন দিগ্‌বিদিক সম্বন্ধে দশ জন মিলিয়া দশ প্রকারের মত লইয়া ঘরে বসিয়া বাদবিতণ্ডা করিতে হইবে না— তখন সকলে আপন-আপন শক্তি অনুসারে আপন-আপন পথ নির্বাচন করিয়া তর্কসভা হইতে, পুঁথির রুদ্ধ কক্ষ হইতে বাহির হইয়া পড়িব, তখন নিকটের কাজকে দূর মনে হইবে না এবং অত্যাবশ্যক কাজকে ক্ষুদ্র বলিয়া অবজ্ঞা জন্মিবে না। এই শুভক্ষণ আসিবে বলিয়া আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস আছে—

সেইজন্য, পরিষদের অদ্যকার আহ্বান যদি তোমাদের অন্তরে স্থান না পায়, বাংলা দেশের ঘরের কথা জানাকে যদি তোমরা বেশি একটা কিছু বলিয়া না মনে কর— তবু আমি ক্ষুব্ধ হইব না এবং আমার যে মাতৃভূমি এতদিন তাঁহার সন্তানগণের গৃহপ্রত্যাগমনের জন্য অনিমেষদৃষ্টিতে প্রতীক্ষা করিয়া আছেন, তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিব, জননী, সময় নিকটবর্তী হইয়াছে, ইস্কুলের ছুটি হইয়াছে, সভা ভাঙিয়াছে, এইবার তোমার কুটিরপ্রাঙ্গণের অভিমুখে তোমার ক্ষুধিত সন্তানদের পদধ্বনি ওই শোনা যাইতেছে— এখন বাজাও তোমার শঙ্খ, জ্বালো তোমার প্রদীপ, তোমার প্রসারিত শীতলপাটির উপরে আমাদের ছোটো বড়ো সকল ভাইয়ের মিলনকে তোমার অশ্রুগদ্গদ আশীর্বচনের দ্বারা সার্থক করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকো।

য়ুনিভার্সিটি বিল

এতকাল ধরিয়া য়ুনিভার্সিটি বিলের বিধিবিধান লইয়া তন্নতন্ন করিয়া অনেক আলোচনাই হইয়া গেছে, সেগুলির পুনরুক্তি বিরক্তিকর হইবে। মোটামুটি দুই-একটা কথা বলিতে চাই।

টাকা থাকিলে, ক্ষমতা থাকিলে, সমস্ত অবস্থা অনুকূল হইলে বন্দোবস্তর চূড়ান্ত করা যাইতে পারে, সে-কথা সকলেই জানে। কিন্তু অবস্থার প্রতি তাকাইয়া দুরাশাকে খর্ব করিতে হয়। লর্ড কর্জন ঠিক বলিয়াছেন, বিলাতি বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ খুব ভালো— কিন্তু ভারতবন্ধু লাটসাহেব তো বিলাতের সব ভালো আমাদিগকে দিবার কোনো বন্দোবস্ত করেন নাই, মাঝে হইতে কেবল্ একটা ভালোই মানাইবে কেন?

প্রত্যেকের সাধ্যমতো যে ভালো, সে-ই তাহার সর্বোত্তম ভালো, তাহার চেয়ে ভালো আর হইতে পারে না— অন্যের ভালোর প্রতি লোভ করা বৃথা।

বিলাতি য়ুনিভার্সিটিগুলাও একেবারেই আকাশ হইতে পড়িয়া অথবা কোনো জবরদস্ত শাসনকর্তার আইনের জোরে এক রাত্রে পূর্ণপরিণত হইয়া উঠে নাই। তাহার একটা ইতিহাস আছে। দেশের অবস্থা এবং ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা স্বভাবত বাড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার প্রতিবাদে বলা যাইতে পারে, আমাদের য়ুনিভার্সিটি গোড়াতেই বিদেশের নকল— স্বাভাবিক নিয়মের কথা ইহার সম্বন্ধে খাটিতে পারে না।

সে-কথা ঠিক। ভারতবর্ষের য়ুনিভার্সিটি দেশের প্রকৃতির সঙ্গে যে মিশিয়া গেছে, আমাদের সমাজের সঙ্গে সম্পূর্ণ একাঙ্গ হইয়া গেছে, তাহা বলিতে পারি না— এখনো ইহা আমাদের বাহিরে রহিয়াছে।

কিন্তু ইহাকে আমরা ক্রমশ আয়ত্ত করিয়া লইতেছি— আমাদের স্বদেশীদের পরিচালিত কলেজগুলিই তাহার প্রমাণ।

ইংরেজের কাছ হইতে আমরা কী পাইয়াছি, তাহা দেখিতে হইলে কেবল দেশে কী আছে তাহা দেখিলে চলিবে না, দেশের লোকের হাতে কী আছে, তাহাই দেখিতে হইবে।

রেলওয়ে টেলিগ্রাফ অনেক দেখিতেছি, কিন্তু তাহা আমাদের নহে; বাণিজ্য-ব্যবসায়ও কম নহে, কিন্তু তাহারও যৎসামান্য আমাদের! রাজ্যশাসনপ্রণালী জটিল ও বিস্তৃত, কিন্তু তাহার যথার্থ কর্তৃত্বভার আমাদের নাই বলিলেই হয়; তাহার মজুরের কার্যই আমরা করিতেছি, তাহাও উত্তরোত্তর সংকুচিত হইয়া আসিবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

যে-জিনিস যথার্থ আমাদের, তাহা কম ভালো হইলেও, তাহার ত্রুটি থাকিলেও, তাহা ভাণ্ডারকর-মহাশয়ের সম্পূর্ণ মনোনীত না হইলেও তাহাকেই আমরা লাভ বলিয়া গণ্য করিব।

যে-বিদ্যা পুঁথিগত, যাহার প্রয়োগ জানা নাই, তাহা যেমন পণ্ড, তেমনি যে-শিক্ষাদানপ্রণালী আমাদের আয়ত্তের অতীত তাহাও আমাদের পক্ষে প্রায় তেমনি নিষ্ফল। দেশের বিদ্যাশিক্ষাদান দেশের লোকের হাতে আসিতেছিল, বস্তুত ইহাই বিদ্যাশিক্ষার ফল। সেও যদি সম্পূর্ণ গবর্মেণ্টের হাতে গিয়া পড়ে, তবে খুব ভালো য়ুনিভার্সিটিও আমাদের পক্ষে দারিদ্র্যের লক্ষণ।

আমাদের দেশে বিদ্যাকে অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য করা কোনোমতেই সংগত নহে। আমাদের সমাজ শিক্ষাকে সুলভ করিয়া রাখিয়াছিল —দেশের উচ্চনীচ সকল স্তরেই শিক্ষা নানা সহজ প্রণালীতে প্রবাহিত হইতেছিল। সেই-সমস্ত স্বাভাবিক প্রণালী ইংরেজিশিক্ষার ফলেই ক্রমে ক্রমে বন্ধ হইয়া আসিতেছিল— এমন কি, দেশে রামায়ণ-মহাভারত-পাঠ, কথকতা-যাত্রাগান প্রতিদিন বিদায়োন্মুখ হইয়া আসিতেছে। এমন সময়ে ইংরেজিশিক্ষাকেও যদি দুর্লভ করিয়া তোলা হয়, তবে গাছে তুলিয়া দিয়া মই কাড়িয়া লওয়া হয়।

বিলাতি সভ্যতার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গই অনেক টাকার ধন। আমোদ হইতে লড়াই পর্যন্ত সমস্তই টাকার ব্যাপার। ইহাতে টাকা একটা প্রকাণ্ড শক্তি হইয়া উঠিয়াছে এবং টাকার পূজা আজ সমস্ত পূজাকে ছাড়াইয়া চলিয়াছে।

এই দুঃসাধ্যতা, দুর্লভতা, জটিলতা য়ুরোপীয় সভ্যতার সর্বপ্রধান দুর্বলতা। সাঁতার দিতে গিয়া অত্যন্ত বেশি হাত-পা ছোঁড়া অপটুতারই প্রমাণ দেয় ; কোনো সভ্যতার মধ্যে যখন সর্ব বিষয়েই প্রয়াসের একান্ত আতিশয্য দেখা যায়, তখন ইহা বুঝিতে হইবে তাহার যতটা শক্তি বাহিরে দেখা যাইতেছে, তাহার অনেকটারই প্রতিমুহূর্তে অপব্যয় হইতেছে। বিপুল মালমসলা-কাঠখড়ের হিসাব যদি ঠিকমতো রাখা যায়, তবে দেখা যাইবে, মজুরি পোষাইতেছে না। প্রকৃতির খাতায় সুদে-আসলে হিসাব বাড়িতেছে, মাঝে মাঝে তাগিদের পেয়াদাও যে আসিতেছে না তাহাও নহে— কিন্তু, সে লইয়া আমাদের চিন্তা করিবার দরকার নাই।

আমাদের ভাবনার বিষয় এই যে, দেশে বিচার দুর্মূল্য, অন্ন দুর্মূল্য, শিক্ষাও যদি দুর্মূল্য হয় তবে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে নিদারুণ বিচ্ছেদ আমাদের দেশেও অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া উঠিবে। বিলাতে দারিদ্র্য কেবল ধনের অভাব নহে, তাহা মনুষ্যত্বেরও অভাব —কারণ, সেখানে মনুষ্যত্বের সমস্ত উপকরণই চড়া দরে বিক্রয় হয়। আমাদের দেশে দরিদ্রের মধ্যে মনুষ্যত্ব ছিল, কারণ আমাদের সমাজে সুখ-স্বাস্থ্য-শিক্ষা-আমোদ মোটের উপরে সকলে ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছে। ধনীর চণ্ডীমণ্ডপে যে-পাঠশালা বসিয়াছে গরিবের ছেলেরা বিনা বেতনে তাহাতে শিক্ষা পাইয়াছে— রাজার সভায় যে-উৎসব হইয়াছে দরিদ্র প্রজা বিনা আহ্বানে তাহাতে প্রবেশলাভ করিয়াছে। ধনীর বাগানে দরিদ্র প্রত্যহ পূজার ফুল তুলিয়াছে, কেহ তাহাকে পুলিসে দেয় নাই ; সম্পন্ন ব্যক্তি দিঘি-ঝিল কাটাইয়া তাহার চারি দিকে পাহারা বসাইয়া রাখে নাই। ইহাতে দরিদ্রের আত্মসম্ভ্রম ছিল— ধনীর ঐশ্বর্যে তাহার স্বাভাবিক দাবি ছিল, এই জন্য, তাহার অবস্থা যেমনই হউক, সে পাশবতা প্রাপ্ত হয় নাই— যাঁহারা জাতিভেদ ও মনুষ্যত্বের উচ্চ অধিকার লইয়া মুখস্থ বুলি আওড়ান, তাঁহারা এ-সব কথা ভালো করিয়া চিন্তা করিয়া দেখেন না।

বিলাতি লাট আজকাল বলিতেছেন, যাহার টাকা নাই, ক্ষমতা নাই, তাহার বিদ্যাশিক্ষার প্রতি অত্যন্ত লোভ করিবার দরকার কী। আমাদের কানে এ-কথাটা অত্যন্ত বিদেশী, অত্যন্ত নিষ্ঠুর বলিয়া ঠেকে।

কিন্তু সমস্ত সহিতে হইবে। তাই বলিয়া বসিয়া বসিয়া আক্ষেপ করিলে চলিবে না।

আমরা নিজেরা যাহা করিতে পারি তাহারই জন্য আমাদিগকে কোমর বাঁধিতে হইবে। বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা আমাদের দেশে সমাজের ব্যবস্থা ছিল— রাজার উপরে বাহিরের সাহায্যের উপরে ইহার নির্ভর ছিল না— সমাজ ইহাকে রক্ষা করিয়াছে এবং সমাজকে ইহা রক্ষা করিয়াছে।

এখন বিদ্যাশিক্ষা রাজার কাজ পাইবার সহায়স্বরূপ হইয়াছে, তখন বিদ্যাশিক্ষা

সমাজের হিতসাধনের উপযোগী ছিল। এখন সমাজের সহিত বিদ্যার পরস্পর সহায়তার যোগ নাই। ইহাতে এতকাল পরে শিক্ষাসাধনব্যাপার ভারতবর্ষে রাজার প্রসাদ-অপেক্ষী হইয়াছে।

এ অবস্থায় রাজা যদি মনে করেন, তাঁহাদের রাজ-পলিসির অনুকূল করিয়াই শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে, রাজভক্তির ছাঁচে ঢালিয়া ইতিহাস রচিতে হইবে, বিজ্ঞানশিক্ষাটাকে পাকে-প্রকারে খর্ব করিতে হইবে, ভারতবর্ষীয় ছাত্রের সর্বপ্রকার আত্মগৌরবকে সংকুচিত করিতে হইবে, তবে তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না— কর্তার ইচ্ছা কর্ম— আমরা সে-কর্মের ফলভোগ করিব, কিন্তু সে কর্মের উপরে কর্তৃত্ব করিবার আশা করিব কিসের জোরে।

তা ছাঁড়া, বিদ্যা জিনিসটা কলকারখানার সামগ্রী নহে। তাহা মনের ভিতর হইতে না দিলে দিবার জো নাই। লাটসাহেব তাঁহার অক্‌সফোর্ড-কেমব্রিজের আদর্শ লইয়া কেবলই আস্ফালন করিয়াছেন, এ-কথা ভুলিয়াছেন যে, সেখানে ছাত্র ও অধ্যাপকের মধ্যে ব্যবধান নাই, সুতরাং সেখানে বিদ্যার আদানপ্রদান স্বাভাবিক। শিক্ষক সেখানে বিদ্যাদানের জন্য উন্মুখ এবং ছাত্রেরাও বিদ্যালাভের জন্য প্রস্তুত— পরস্পরের মাঝখানে অপরিচয়ের দূরত্ব নাই, অশ্রদ্ধার কণ্টক-প্রাচীর নাই, কাজেই সেখানে মনের জিনিস মনে গিয়া পৌঁছায়। পেড্‌লারের মতো লোক আমাদের দেশের অধ্যাপক, শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ,— তিনি আমাদিগকে কী দিতে পারেন, আমরাই বা তাঁহার কাছ হইতে কী লইতে পারি! হৃদয়ে হৃদয়ে যেখানে স্পর্শ নাই, যেখানে সুস্পষ্ট বিরোধ ও বিদ্বেষ আছে, সেখানে দৈববিড়ম্বনায় যদি দানপ্রতিদানের সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তবে সে-সম্বন্ধ হইতে শুধু নিষ্ফলতা নহে, কুফলতা প্রত্যাশা করা যায়।

সর্বাপেক্ষা এইজন্যই বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে, নিজেদের বিদ্যাদানের ব্যবস্থা-ভার নিজেরা গ্রহণ করা। তাহাতে আমাদের বিদ্যামন্দিরে কেম্‌ব্রিজ-অক্‌সফোর্ডের প্রকাণ্ড পাষাণ প্রতিরূপ প্রতিষ্ঠিত হইবে না জানি, তাহার সাজসরঞ্জাম দরিদ্রের উপযুক্ত হইবে, ধনীর চক্ষে তাহার অসম্পূর্ণতাও অনেক লক্ষিত হইবে,— কিন্তু জাগ্রত সরস্বতী শ্রদ্ধাশতদলে আসীন হইবেন, তিনি জননীর মতো করিয়া সন্তানদিগকে অমৃত পরিবেষণ করিবেন, ধনমদগর্বিতা বণিকগৃহিণীর মতো উচ্চ বাতায়নে দাঁড়াইয়া দূর হইতে ভিক্ষুকবিদায় করিবেন না।

পরের কাছ হইতে হৃদ্যতাবিহীন দান লইবার একটা মস্ত লাঞ্ছনা এই যে, গর্বিত দাতা খুব বড়ো করিয়া খরচের হিসাব রাখে, তাহার পরে দুই বেলা খোঁটা দেয়, "এত দিলাম তত দিলাম, কিন্তু ফলে কী হইল।" মা স্তন্যদান করেন, খাতায় তাহার

৩—৭৬

কোনো হিসাব রাখেন না, ছেলেও বেশ পুষ্ট হয়— স্নেহবিহীনা ধাত্রী বাজার হইতে খাবার কিনিয়া রোরুদ্যমান মুখের মধ্যে গুঁজিয়া দেয়, তাহার পরে অহরহ খিটখিট করিতে থাকে, "এত গিলাইতেছি, কিন্তু ছেলেটা দিন দিন কেবল কাঠি হইয়া যাইতেছে!"

আমাদের ইংরেজ কর্তৃপক্ষেরা সেই বুলি ধরিয়াছেন। পেড্‌লার সেদিন বলিয়াছেন, "আমরা বিজ্ঞানচর্চার এত বন্দোবস্ত করিয়া দিলাম, এত আনুকূল্য করিলাম, বৃত্তির টাকার এত অপব্যয় করিতেছি, কিন্তু ছাত্রেরা স্বাধীনবুদ্ধির কোনো পরিচয় দিতেছে না!"

অনুগ্রহজীবীদিগকে এই সব কথাই শুনিতে হয়— অথচ আমাদের বলিবার মুখ নাই, "বন্দোবস্ত সমস্ত তোমাদেরই হাতে, এবং সে-বন্দোবস্তে যদি যথেষ্ট ফললাভ না হয়, তাহার সমস্ত পাপ আমাদেরই!" এদিকে খাতায় টাকার অঙ্কটাও গ্রেট্‌প্রাইমার অক্ষরে দেখানো হইতেছে— যেন এত বিপুল টাকা এতবড়ো প্রকাণ্ড অযোগ্যদের জন্য জগতে আর কোনো দাতাকর্ণ ব্যয় করে না, অতএব ইহার moral এই,—"হে অক্ষম, হে অকর্মণ্য তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তোমরা রাজভক্ত হও, তোমরা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে চাঁদা দিতে কপোলযুগ পাণ্ডুবর্ণ করিয়ো না!"

ইহাতে বিদ্যালাভ কতটুকু হয় জানি না, কিন্তু আত্মসম্মান থাকে না। আত্মসম্মান ব্যতীত কোনো জাত কোনো সফলতা লাভ করিতে পারে না— পরের ঘরে জল-তোলা এবং কাঠ-কাটার কাজে লাগিতে পারে, কিন্তু দ্বিজধর্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের বৃত্তিরক্ষা করিতে পারে না।

একটা কথা আমাদিগকে সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদিগকে যে খোঁটা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা সম্পূর্ণ অমূলক। এবং যাঁহারা খোঁটা দেন, তাঁহারাও যে মনে মনে তাহা জানেন না, তাহাও আমরা স্বীকার করিব না। কারণ, আমরা দেখিয়াছি পাছে তাঁহাদের কথা অপ্রমাণ হইয়া যায়, এজন্য তাঁহারা ত্রস্ত আছেন।

এ-কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, বিলাতি সভ্যতা বস্তুত দুরূহ ও দুর্লভ নয়। স্বাধীন জাপান আজ পঞ্চাশ বৎসরে এই সভ্যতা আদায় করিয়া লইয়া গুরুমারা বিদ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। এ সভ্যতা অনেকটা ইস্কুলের জিনিস, পরীক্ষা করা, মুখস্থ করা, চর্চা করার উপরেই ইহার নির্ভর। জাপানের মতো সম্পূর্ণ সুযোগ ও আনুকূল্য পাইলে এই ইস্কুলপাঠ আমরা পেড্‌লার-সম্প্রদায় আসিবার বহুকাল পূর্বেই শেষ করিতে পারিতাম। প্রাচ্য সভ্যতা ধর্মগত, তাহার পথ নিশিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম— তাহা ইস্কুলের পড়া নহে, তাহা জীবনের সাধনা।

এ-কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, এতকাল অনেক বিদেশী অধ্যাপক আমাদের কলেজের পরীক্ষাশালায় যন্ত্রতন্ত্র লইয়া অনেক নাড়াচাড়া করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই স্বাধীন বুদ্ধি দেখাইয়া যশস্বী হইতে পারেন নাই। বাঙালীর মধ্যেই জগদীশ ও প্রফুল্লচন্দ্র সুযোগলাভ করিয়া সেই সুযোগের ফল দেখাইয়াছেন। পরের সহিত তর্কের জন্যই এগুলি স্মরণীয়, তাহা নহে, নিজেদের উৎসাহ ও আত্মসম্ভ্রমের জন্য। পরের কথায় নিজেদের প্রতি যেন অবিশ্বাস না জন্মে।

যাহাতে আমাদের যথার্থ আত্মসম্মানবোধের উদ্রেক হয় বিদেশীরা তাহা ইচ্ছাপূর্বক করিবে না, এবং সেজন্য আমরা যেন ক্ষোভ অনুভব না করি। যেখানে যাহা স্বভাবতই আশা করা যাইতে পারে না সেখানে তাহা আশা করিতে যাওয়া মূঢ়তা— এবং সেখানে ব্যর্থমনোরথ হইয়া পুনঃপুন সেইখানেই ধাবিত হইতে যাওয়া যে কী, ভাষায় তাহার কোনো শব্দ নাই। এ স্থলে আমাদের একমাত্র কর্তব্য, নিজেরা সচেষ্ট হওয়া; আমাদের দেশে ডাক্তার জগদীশ বসু প্রভৃতির মতো যে-সকল প্রতিভাসম্পন্ন মনস্বী প্রতিকূলতার মধ্যে থাকিয়াও মাথা তুলিয়াছেন, তাঁহাদিগকে মুক্তি দিয়া তাঁহাদের হস্তে দেশের ছেলেদের মানুষ করিয়া তুলিবার স্বাধীন অবকাশ দেওয়া; অবজ্ঞা-অশ্রদ্ধা-অনাদরের হাত হইতে বিদ্যাকে উদ্ধার করিয়া দেবী সরস্বতীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা; জ্ঞানশিক্ষাকে স্বদেশের জিনিস করিয়া দাঁড় করানো; আমাদের শক্তির সহিত, সাধনার সহিত, প্রকৃতির সহিত তাহাকে অন্তরঙ্গরূপে সংযুক্ত করিয়া তাহাকে স্বভাবের নিয়মে পালন করিয়া তোলা; বাহিরে আপাতত তাহার দীনবেশ, তাহার কৃশতা, দেখিয়া ধৈর্যভ্রষ্ট না হইয়া আশার সহিত আনন্দের সহিত হৃদয়ের সমস্ত প্রীতি দিয়া জীবনের সমস্ত শক্তি দিয়া তাহাকে সতেজ ও সফল করা।

উপস্থিত ক্ষেত্রে ইহাই আমাদের একমাত্র আলোচ্য, একমাত্র কর্তব্য। ইহাকে যদি দুরাশা বল, তবে কি পরের রুদ্ধদ্বারে জোড়হস্তে বসিয়া থাকাই আশা পূর্ণ হইবার একমাত্র সহজ প্রণালী। কবে কন্সার্ভেটিব গবর্মেণ্ট গিয়া লিবারেল গবর্মেণ্টের অভ্যুদয় হইবে, ইহারই অপেক্ষা করিয়া শুষ্ক চঞ্চু বিস্তারপূর্বক নিদাঘমধ্যাহ্নের আকাশে তাকাইয়া থাকাই কি হতবুদ্ধি হতভাগ্যের একমাত্র সদুপায়।

অবস্থা ও ব্যবস্থা

আজ বাংলাদেশে উত্তেজনার অভাব নাই, সুতরাং উত্তেজনার ভার কাহাকেও লইতে হইবে না। উপদেশেরও যে বিশেষ প্রয়োজন আছে তাহা আমি মনে করি না। বসন্তকালের ঝড়ে যখন রাশি রাশি আমের বোল ঝরিয়া পড়ে তখন সে বোলগুলি কেবলই মাটি হয়, তাহা হইতে গাছ বাহির হইবার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। তেমনি দেখা গেছে, সংসারে উপদেশের বোল অজস্র বৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু অনেক স্থলেই তাহা হইতে অঙ্কুর বাহির হয় না, সমস্ত মাটি হইতে থাকে।

তবু ইহা নিঃসন্দেহ যে, যখন বোল ঝরিতে আরম্ভ করে, তখন বুঝিতে হইবে ফল ফলিবার সময় সুদূরে নাই। আমাদের দেশেও কিছুদিন হইতে বলা হইতেছিল যে, নিজের দেশের অভাবমোচন দেশের লোকের নিজের চেষ্টার দ্বারাই সম্ভবপর, দেশের লোকই দেশের চরম অবলম্বন, বিদেশী কদাচ নহে, ইত্যাদি; নানা মুখ হইতে এই যে বোলগুলি ঝরিতে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা উপস্থিত মতো মাটি হইতেছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু ভূমিকে নিশ্চয়ই উর্বরা করিতেছিল এবং একটা সফলতার সময় যে আসিতেছে, তাহারও সূচনা করিয়াছিল।

অবশেষে আজ বিধাতা তীব্র উত্তাপে একটি উপদেশ স্বয়ং পাকাইয়া তুলিয়াছেন। দেশ গতকল্য যে-সকল কথা কর্ণপাত করিবার যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করে নাই, আজ তাহা অতি অনায়াসেই চিরন্তন সত্যের ন্যায় গ্রহণ করিতেছে। নিজেরা যে এক হইতে হইবে, পরের দ্বারস্থ হইবার জন্য নহে, নিজেদের কাজ করিবার জন্য, এ-কথা আজ আমরা একদিনেই অতি সহজেই যেন অনুভব করিতেছি, বিধাতার বাণীকে অগ্রাহ্য করিবার জো নাই।

অতএব, আমার মুখে আজ উত্তেজনা ও উপদেশ অনাবশ্যক হইয়াছে—ইতিহাসকে যিনি অমোঘ ইঙ্গিতের দ্বারা চালনা করেন, তাঁহার অগ্নিময় তর্জনী আজ দেশের সকলের চক্ষের সম্মুখে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে।

এখন এই সময়টাকে বৃথা নষ্ট হইতে দিতে পারি না। কপালক্রমে অনেক ধোঁয়ার পরে ভিজা কাঠ যদি ধরিয়া থাকে, তবে তাহা পুড়িয়া ছাই হওয়ার পূর্বে রান্না চড়াইতে হইবে; শুধু শুধু শূন্য চুলায় আগুনে খোঁচার উপর খোঁচা দিতে থাকিলে আমোদ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে ছাই হওয়ার কালটাও নিকটে অগ্রসর হয় এবং অন্নের আশা সুদূরবর্তী হইতে থাকে।

বঙ্গব্যবচ্ছেদের প্রস্তাবে যখন সমস্ত দেশের লোকের ভাবনাকে এক সঙ্গে জাগাইয়া তুলিয়াছে, তখন কেবলমাত্র সাময়িক উত্তেজনায় আত্মবিস্মৃত না হইয়া কতকগুলি গোড়াকার কথা স্পষ্টরূপে ভাবিয়া লইতে হইবে।

প্রথম কথা এই যে, আমরা স্বদেশের হিতসাধন সম্বন্ধে নিজের কাছে যে-সকল আশা করি না, পরের কাছ হইতে সেই সকল আশা করিতেছিলাম। এমন অবস্থায় নিরাশ হওয়াই স্বাভাবিক এবং তাহাই মঙ্গলকর। নিরাশ হইবার মতো আঘাত বারবার পাইয়াছি, কিন্তু চেতনা হয় নাই। এবারে ঈশ্বরের প্রসাদে আর-একটা আঘাত পাইয়াছি, চেতনা হইয়াছে কি না তাহার প্রমাণ পরে পাওয়া যাইবে।

“আমাদিগকে তোমরা সম্মান দাও, তোমরা শক্তি দাও, তোমরা নিজের সমান অধিকার দাও”— এই যে-সকল দাবি আমরা বিদেশী রাজার কাছে নিঃসংকোচে উপস্থিত করিয়াছি, ইহার মূলে একটা বিশ্বাস আমাদের মনে ছিল। আমরা কেতাব পড়িয়া নিশ্চয় স্থির করিয়াছিলাম যে, মানুষমাত্রেরই অধিকার সমান, এই সাম্যনীতি আমাদের রাজার জাতির।

কিন্তু সাম্যনীতি সেইখানেই খাটে, যেখানে সাম্য আছে। যেখানে আমারও শক্তি আছে, তোমার শক্তি সেখানে সাম্যনীতি অবলম্বন করে। য়ুরোপীয়ের প্রতি য়ুরোপীয়ের মনোহর সাম্যনীতি দেখিতে পাই; তাহা দেখিয়া আশান্বিত হইয়া উঠা অক্ষমের লুব্ধতামাত্র। অশক্তের প্রতি শক্ত যদি সাম্যনীতি অবলম্বন করে, তবে সেই প্রশ্রয় কি অশক্তের পক্ষে কোনোমতে শ্রেয়স্কর হইতে পারে। সে-প্রশ্রয় কি অশক্তের পক্ষে সম্মানকর। অতএব, সাম্যের দরবার করিবার পূর্বে সাম্যের চেষ্টা করাই মনুষ্যমাত্রের কর্তব্য। তাহার অন্যথা করা কাপুরুষতা।

ইহা আমরা স্পষ্টই দেখিয়াছি, যে-সকল জাতি ইংরেজের সঙ্গে বর্ণে ধর্মে প্রথায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তাহাদিগকে ইহারা নিজের পার্শ্বে স্বচ্ছন্দবিহারের স্থান দিয়াছেন, এমন ইহাদের ইতিহাসে কোথাও নাই। এমন কি, তাহারা ইহাদের সংঘর্ষে লোপ পাইয়াছে ও পাইতেছে, এমন প্রমাণ যথেষ্ট আছে। একবার চিন্তা করিয়া দেখো, ভারতবর্ষের রাজাদের যখন স্বাধীন ক্ষমতা ছিল তখন তাঁহারা বিদেশের অপরিচিত লোকমণ্ডলীকে স্বরাজ্যে বসবাসের কিরূপ স্বচ্ছন্দ অধিকার দিয়াছিলেন— তাহার প্রমাণ এই পার্শিজাতি। ইহারা গোহত্যা প্রভৃতি দুই-একটি বিষয়ে হিন্দুদের বিধিনিষেধ মানিয়া, নিজের ধর্ম সমাজ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, নিজের স্বাতন্ত্র কোনো অংশে বিসর্জন না দিয়া হিন্দুদের অতিথিরূপে প্রতিবেশিরূপে প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়া আসিয়াছে, রাজা বা জনসমাজের হস্তে পরাজিত বলিয়া উৎপীড়ন সহ্য করে নাই। ইহার সহিত ইংরেজ-

উপনিবেশগুলির ব্যবহার তুলনা করিয়া দেখিলে পূর্বদেশের এবং পশ্চিমদেশের সাম্যবাদের প্রভেদটা আলোচনা করিবার সুযোগ হইবে।

সম্প্রতি দক্ষিণ-আফ্রিকায় বিলাতি উপনিবেশীদের একটি সভা বসিয়াছিল, তাহার বিবরণ হয় তো অনেকে স্টেট্‌সম্যান-পত্রে পড়িয়া থাকিবেন। তাঁহারা একবাক্যে সকলে স্থির করিয়াছেন যে, এশিয়ার লোকদিগকে তাঁহারা কোনো প্রকারেই আশ্রয় দিবেন না। ব্যবসায় অথবা বাসের জন্য তাহাদিগকে ঘরভাড়া দেওয়া হইবে না, যদি কেহ দেয় তাহার প্রতি বিশেষরূপ অসন্তোষ প্রকাশ করিতে হইবে। বর্তমানে যে-সকল বাড়ি এশিয়ার লোকদিগকে ভাড়া দেওয়া হইয়াছে, মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলেই তাহা ছাড়াইয়া লওয়া হইবে। যে-সকস হৌস ঐশিয়দিগকে কোনো প্রকারে সাহায্য করে, খুচরা ব্যবসায়ী ও পাইকেরগণ যাহাতে তাহাদের সঙ্গে ব্যবসা বন্ধ করে, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। যাহাতে এই নিয়মগুলি পালিত হয় এবং যাহাতে সভ্যগণ ঐশিয় দোকানদার বা মহাজনদের কাছ হইতে কিছু না কেনে বা তাহাদিগকে কোনোপ্রকার সাহায্য না করে, সেজন্য একটী Vigilance Association বা চৌকিদার-দল বাঁধিতে হইবে। সভায় বক্তৃতাকালে একজন সভ্য প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, আমাদের শহরের মধ্যে ঐশিয় ব্যবসায়ীদিগকে যেমন করিয়া আড্ডা গাড়িতে দেওয়া হইয়াছে, এমন কি ইংলণ্ডের কোনো শহরে দেওয়া সম্ভব হইত। ইহার উত্তরে এক ব্যক্তি কহিল, না, সেখানে তাহাদিগকে ‘লিঞ্চ’ করা হইত। শ্রোতাদের মধ্যে একজন বলিয়াছিল, এখানেও কুলিদিগকে ‘লিঞ্চ’ করাই শ্রেয়।

এশিয়ার প্রতি য়ুরোপের মনোভাবের এই যে-সকল লক্ষণ দেখা যাইতেছে, ইহা লইয়া আমরা যেন অবোধের মতো উত্তেজিত হইতে না থাকি। এগুলি স্তব্ধভাবে বিচার করিবার দেখিবার বিষয়। যাহা স্বভাবতই ঘটিতেছে, যাহা বাস্তবিক সত্য, তাহা লইয়া রাগারাগি করিয়া কোনো ফল দেখি না। কিন্তু তাহার সঙ্গে যদি ঘর করিতে হয়, তবে প্রকৃত অবস্থাটা ভুল বুঝিলে কাজ চলিবে না। ইহা স্পষ্ট দেখা যায় যে, এশিয়াকে য়ুরোপ কেবলমাত্র পৃথক বলিয়া জ্ঞান করে না, তাহাকে হেয় বলিয়াই জানে।

এ-সম্বন্ধে য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের একটা প্রভেদ আছে। আমরা যাহাকে হেয় জ্ঞানও করি, নিজের গণ্ডির মধ্যে তাহার যে গৌরব আছে, সেটুকু আমরা অস্বীকার করি না। সে তাহার নিজের মণ্ডলীতে স্বাধীন; তাহার ধর্ম, তাহার আচার, তাহার বিধিব্যবস্থার মধ্যে তাহার স্বতন্ত্র সার্থকতা আছে; আমার মণ্ডলী আমার পক্ষে যেমন তাহার মণ্ডলী তাহার পক্ষে ঠিক সেইরূপ— এ-কথা আমরা কখনো ভুলি না। এইজন্য

যে-সকল জাতিকে আমরা অনার্য বলিয়া ঘৃণাও করি, নিজের শ্রেষ্ঠতার অভিমানে আমরা তাহাদিগকে বিলুপ্ত করিবার চেষ্টা করি না। এই কারণে, আমাদের সমাজের মাঝখানেই হাড়ি-ডোম-চণ্ডাল স্বস্থানে আপন প্রাধান্য রক্ষা করিয়াই চিরদিন বজায় আছে।

পশুদিগকে আমরা নিকৃষ্ট জীব বলিয়াই জানি, কিন্তু তবু বলিয়াছি, "আমরাও আছি, তাহারাও থাক"; বলিয়াছি, "প্রাণিহত্যা করিয়া আহার করাটা 'প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং, নিবৃত্তিস্তু মহাফলা'—সেটা একটা প্রবৃত্তি, কিন্তু নিবৃত্তিটাই ভালো।" য়ুরোপ বলে, "জন্তুকে খাইবার অধিকার ঈশ্বর আমাদিগকে দান করিয়াছেন।" য়ুরোপের শ্রেষ্ঠতার অভিমান ইতরকে যে কেবল ঘৃণা করে, তাহা নহে, তাহাকে নষ্ট করিবার বেলা ঈশ্বরকে নিজের দলভুক্ত করিতে কুণ্ঠিত হয় না।

য়ুরোপের শ্রেষ্ঠতা নিজেকে জাহির করা এবং বজায় রাখাকেই চরম কর্তব্য বলিয়া জানে। অন্যকে রক্ষা করা যদি তাহার সঙ্গে সম্পূর্ণ খাপ খাইয়া যায়, তবেই অন্যের পক্ষে বাঁচোয়া, যে-অংশে লেশমাত্র খাপ না খাইবে সে-অংশে দয়ামায়া বাছবিচার নাই। হাতের কাছে ইহার যে দুই-একটা প্রমাণ আছে তাহারই উল্লেখ করিতেছি।

বাঙালি যে একদিন এমন জাহাজ তৈরি করিতে পারিত যাহা দেখিয়া ইংরেজ ঈর্ষা অনুভব করিয়াছে, আজ বাঙালির ছেলে তাহা স্বপ্নেও জানে না। ইংরেজ যে কেমন করিয়া এই জাহাজ-নির্মাণের বিদ্যা বিশেষ চেষ্টায় বাংলাদেশ হইতে বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে তাহা শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয়ের 'দেশের কথা' নামক বইখানি পড়িলে সকলে জানিতে পারিবেন। একটা জাতিকে, যে-কোনো দিকেই হউক, একেবারে অক্ষম পঙ্গু করিয়া দিতে এই সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতাবাদী কোনো সংকোচ অনুভব করে নাই।

ইংরেজ আজ সমস্ত ভারতবর্ষকে বলপূর্বক নিরস্ত্র করিয়া দিয়াছে, অথচ ইহার নিদারুণতা তাহারা অন্তরের মধ্যে একবার অনুভব করে নাই। ভারতবর্ষ একটি ছোটো দেশ নহে, একটি মহাদেশবিশেষ। এই বৃহৎ দেশের সমস্ত অধিবাসীকে চিরদিনের জন্য পুরুষানুক্রমে অস্ত্রধারণে অনভ্যস্ত, আত্মরক্ষায় অসমর্থ করিয়া তোলা যে কতবড়ো অধর্ম, যাহারা এককালে মৃত্যুভয়হীন বীরজাতি ছিল, তাহাদিগকে সামান্য একটা হিংস্র পশুর নিকট শঙ্কিত নিরুপায় করিয়া রাখা যে কিরূপ বীভৎস অন্যায়, সে-চিন্তা ইহাদিগকে কিছুমাত্র পীড়া দেয় না। এখানে ধর্মের দোহাই একেবারেই নিষ্ফল—কারণ, জগতে অ্যাংলোস্যাক্সন জাতির মাহাত্ম্যকে বিস্তৃত ও সুরক্ষিত করাই ইহারা

চরম ধর্ম জানে, সেজন্য ভারতবাসীকে যদি অস্ত্রত্যাগ করিয়া এই পৃথিবীতলে চিরদিনের মতো নির্জীব নিঃসহায় পৌরুষবিহীন হইতে হয়, তবে সে-পক্ষে তাহাদের কোনো দয়া মায়া নাই।

অ্যাংলোস্যাক্সন যে শক্তিকে সকলের চেয়ে পূজা করে, ভারতবর্ষ হইতে সেই শক্তিকে প্রত্যহ সে অপহরণ করিয়া এ-দেশকে উত্তরোত্তর নিজের কাছে অধিকতর হেয় করিয়া তুলিতেছে, আমাদিগকে ভীরু বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছে— অথচ একবার চিন্তা করিয়া দেখে না, এই ভীরুতাকে জন্ম দিয়া তাহাদের দলবদ্ধ ভীরুতা পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছে।

অতএব অনেক দিন হইতে ইহা দেখা যাইতেছে যে, অ্যাংলোস্যাক্সন্ মহিমাকে সম্পূর্ণ নিরুপদ্রব করিবার পক্ষে দূরতম ব্যাঘাতটি যদি আমাদের দেশের পক্ষে মহত্তম দুর্মূল্য বস্তুও হয়, তবে তাহাকে দলিয়া সমভূম করিয়া দিতে ইহারা বিচারমাত্র করে না।

এই সত্যটি ক্রমে ক্রমে ভিতরে ভিতরে আমাদের কাছেও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই আজ গবর্মেণ্টের প্রত্যেক নড়াচড়ায় আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হইতেছে, তাঁহারা মুখের কথায় যতই আশ্বাস দিতেছেন আমাদের সন্দেহ ততই বাড়িয়া উঠিতেছে।

কিন্তু আমাদের পক্ষে অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, আমাদের সন্দেহেরও অন্ত নাই, আমাদের নির্ভরেরও সীমা নাই। বিশ্বাসও করিব না, প্রার্থনাও করিব। যদি জিজ্ঞাসা করা যায় এমন করিয়া সময় নষ্ট করিতেছ কেন, তবে উত্তর পাইবে, এক দলের দয়া না যদি হয় তো আর-এক দলের দয়া হইতে পারে। প্রাতঃকালে যদি অনুগ্রহ না পাওয়া যায় তো, যথেষ্ট অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিলে সন্ধ্যাকালে অনুগ্রহ পাওয়া যাইতে পারে। রাজা তো আমাদের একটি নয়, এইজন্য বারবার সহস্রবার তাড়া খাইলেও আমাদের আশা কোনোক্রমেই মরিতে চায় না— এমনি আমাদের মুশকিল হইয়াছে।

কথাটা ঠিক। আমাদের একজন রাজা নহে। পৃথিবীর ইতিহাসে ভারতবর্ষের ভাগ্যে একটা অপূর্ব ব্যাপার ঘটিয়াছে। একটি বিদেশী জাতি আমাদের উপরে রাজত্ব করিতেছে, একজন বিদেশী রাজা নহে। একটি দূরবর্তী সমগ্র জাতির কর্তৃত্ব-ভার আমাদিগকে বহন করিতে হইতেছে। ভিক্ষাবৃত্তির পক্ষে এই অবস্থাটাই কি এত অনুকূল। প্রবাদ আছে যে, ভাগের মা গঙ্গা পায় না, ভাগের কুপোষ্যই কি মাছের মুড়ো এবং দুধের সর পায়।

অবিশ্বাস করিবার একটা শক্তি মানুষের পক্ষে অবশ্যপ্রয়োজনীয়। ইহা কেবল একটা নৈতিভাবক গুণ নহে, ইহা কর্তৃভাবক। মনুষ্যত্বকে রক্ষা করিতে হইলে এই অবিশ্বাসের ক্ষমতাকে নিজের শক্তির দ্বারা খাড়া করিয়া রাখিতে হয়। যিনি বিজ্ঞান-চর্চায় প্রবৃত্ত, তাঁহাকে অনেক জনশ্রুতি, অনেক প্রমাণহীন প্রচলিত ধারণাকে অবিশ্বাসের জোরে খেদাইয়া রাখিতে হয়, নহিলে তাঁহার বিজ্ঞান পণ্ড হইয়া যায়। যিনি কর্ম করিতে চান, অবিশ্বাসের নিড়ানির দ্বারা তাঁহাকে কর্মক্ষেত্র নিষ্কণ্টক রাখিতে হয়। এই যে অবিশ্বাস, ইহা অন্যের উপরে অবজ্ঞা বা ঈর্ষাবশত নহে, নিজের বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি, নিজের কর্তব্যসাধনার প্রতি সম্মানবশত।

আমাদের দেশে ইংরেজ-রাজনীতিতে অবিশ্বাস যে কিরূপ প্রবল সতর্কতার সঙ্গে কাজ করিতেছে এবং সেই অবিশ্বাস যে কিরূপ নির্মমভাবে আপনার লক্ষ্যসাধন করিতেছে, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। উচ্চ ধর্মনীতির নহে, কিন্তু সাধারণ রাজনীতির দিক দিয়া দেখিলে এই কঠিন অটল অবিশ্বাসের জন্য ইংরেজকে দোষ দেওয়া যায় না। ঐক্যের যে কী শক্তি, কী মাহাত্ম্য, তাহা ইংরেজ আমাদের চেয়ে ভালো করিয়াই জানে। ইংরেজ জানে, ঐক্যের অনুভূতির মধ্যে কেবল একটা শক্তিমাত্র নহে, পরন্তু এমন একটা আনন্দ আছে যে সেই অনুভূতির আবেগে মানুষ সমস্ত দুঃখ ও ক্ষতি তুচ্ছ করিয়া অসাধ্যসাধনে প্রবৃত্ত হয়। ইংরেজ আমাদের চেয়ে ভালো করিয়াই জানে যে, ক্ষমতা-অনুভূতির স্ফূর্তি মানুষকে কিরূপ একটা প্রেরণা দান করে। উচ্চ অধিকার লাভ করিয়া রক্ষা করিতে পারিলে সেইখানেই তাহা আমাদিগকে থাকিতে দেয় না—উচ্চতর অধিকারলাভের জন্য আমাদের সমস্ত প্রকৃতি উন্মুখ হইয়া উঠে। আমাদের শক্তি নাই, আমরা পারি না, এই মোহই সকলের চেয়ে ভয়ংকর মোহ। যে ব্যক্তি ক্ষমতাপ্রয়োগের অধিকার পায় নাই, সে আপনার শক্তির স্বাদ জানে না; সে নিজেই নিজের পরম শত্রু। সে জানে যে আমি অক্ষম, এবং এইরূপ জানাই তাহার দারুণ দুর্বলতার কারণ। এরূপ অবস্থায় ইংরেজ যে আমাদের মধ্যে ঐক্যবন্ধনে পোলিটিকাল হিসাবে আনন্দবোধ করিবে না, আমাদের হাতে উচ্চ অধিকার দিয়া আমাদের ক্ষমতার অনুভূতিকে উত্তরোত্তর সবল করিয়া তুলিবার জন্য আগ্রহ অনুভব করিবে না, এ-কথা বুঝিতে অধিক মননশক্তির প্রয়োজন হয় না। আমাদের দেশে যে-সকল পোলিটিকাল প্রার্থনা-সভা স্থাপিত হইয়াছে তাহারা যদি ভিক্ষুকের রীতিতেই ভিক্ষা করিত তাহা হইলেও হয়তো মাঝে মাঝে দরখাস্ত মঞ্জুর হইত— কিন্তু তাহারা গর্জন করিয়া ভিক্ষা করে, তাহারা দেশবিদেশের লোক একত্র করিয়া ভিক্ষা করে, তাহারা ভিক্ষাবৃত্তিকে একটা শক্তি করিয়া তুলিতে চেষ্টা করে, সুতরাং এই শক্তিকে প্রশ্রয় দিতে

ইংরেজ রাজা সাহস করে না। ইহার প্রার্থনা পূরণ করিলেই ইহার শক্তির স্পর্ধাকে লালন করা হয়— এইজন্য ইংরেজ-রাজনীতি আড়ম্বরসহকারে ইহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া ইহার গর্বকে খর্ব করিয়া রাখিতে চান। এমন অবস্থায় এই সকল পোলিটিকাল সভা কৃতকার্যতার বল লাভ করিতে পারে না; একত্র হইবার যে শক্তি তাহা ক্ষণকালের জন্য পায় বটে, কিন্তু সেই শক্তিকে একটা যথার্থ সার্থকতার দিকে প্রয়োগ করিবার যে স্ফূর্তি, তাহা পায় না। সুতরাং নিষ্ফল চেষ্টায় প্রবৃত্ত শক্তি, ডিম্ব হইতে অকালে জাত অরুণের মতো পঙ্গু হইয়াই থাকে— সে কেবল রথেই জোড়া থাকিবার উমেদার হইয়া থাকে, তাহার নিজের উড়িবার কোনো উদ্যম থাকে না।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ভারতবর্ষের পলিটিক্সে অবিশ্বাসনীতি রাজার তরফে অত্যন্ত সুদৃঢ়, অথচ আমাদের তরফে তাহা একান্ত শিথিল। আমরা একই কালে অবিশ্বাস প্রকাশ করি, কিন্তু বিশ্বাসের বন্ধন ছেদন করি না। ইহাকেই বলে ওরিয়েন্টাল,— এইখানেই পাশ্চাত্যদের সঙ্গে আমাদের প্রভেদ। য়ুরোপ কায়মনোবাক্যে অবিশ্বাস করিতে জানে— আর, ষোলো-আনা অবিশ্বাসকে জাগাইয়া রাখিবার যে কঠিন শক্তি তাহা আমাদের নাই, আমরা ভুলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চাই, আমরা কোনোক্রমে বিশ্বাস করিতে পারিলে বাঁচি। যাহা অনাবশ্যক তাহাকেও রক্ষা করিবার, যাহা অশ্রদ্ধেয় তাহাকেও গ্রহণ করিবার, যাহা প্রতিকূল তাহাকেও অঙ্গীভূত করিবার জন্য আমরা চিরদিন প্রস্তুত হইয়া আছি।

য়ুরোপ যাহা কিছু পাইয়াছে তাহা বিরোধ করিয়াই পাইয়াছে, আমাদের যাহা-কিছু সম্পত্তি তাহা বিশ্বাসের ধন। এখন বিরোধপরায়ণ জাতির সহিত বিশ্বাসপরায়ণ জাতির বোঝাপড়া মুশকিল হইয়াছে। স্বভাববিদ্রোহী স্বভাববিশ্বাসীকে শ্রদ্ধাই করে না।

যাহাই হউক, চিরন্তন প্রকৃতিবশত আমাদের ব্যবহারে যাহাই প্রকাশ পাউক, ইংরেজ রাজা স্বভাবতই যে আমাদের ঐক্যের সহায় নহেন, আমাদের ক্ষমতালাভের অনুকূল নহেন, এ-কথা আমাদের মনকে অধিকার করিয়াছে। সেইজন্যই য়ুনিভার্সিটি-সংশোধন, বঙ্গব্যবচ্ছেদ প্রভৃতি গবর্মেণ্টের ব্যবস্থাগুলিকে আমাদের শক্তি খর্ব করিবার সংকল্প বলিয়া কল্পনা করিয়াছি।

এমনতরো সন্দিগ্ধ অবস্থার স্বাভাবিক গতি হওয়া উচিত— আমাদের স্বদেশহিতকর সমস্ত চেষ্টাকে নিজের দিকে ফিরাইয়া আনা। আমাদের অবিশ্বাসের মধ্যে এইটুকুই আমাদের লাভের বিষয়। পরের নিকট আমাদের সমস্ত প্রত্যাশাকে বদ্ধ করিয়া রাখিলে কেবল যে ফল পাওয়া যায় না, তাহা নহে, তাহাতে আমাদের ঈশ্বরপ্রদত্ত

আত্মশক্তির মাহাত্ম্য চিরদিনের জন্য নষ্ট হইয়া যায়। এইটেই আমাদিগকে বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে। ইংরেজ আমাদের প্রার্থনাপূরণ করিবে না, অতএব আমরা তাহাদের কাছে যাইব না, এ সুবুদ্ধিটা লজ্জাকর। বস্তুত এই কথাই আমাদের মনে রাখিতে হইবে— অধিকাংশ স্থলেই প্রার্থনাপূরণটাই আমাদের লোকসান। নিজের চেষ্টার দ্বারা যতটুকু ফল পাই তাহাতে ফলও পাওয়া যায়, শক্তিও পাওয়া যায়, সোনাও পাওয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে পরশপাথরও পাওয়া যায়। পরের দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই ভিক্ষাবৃত্তি হইতে যদি নিরস্ত হইতে হয়, পৌরুষবশত, মনুষ্যত্ববশত, নিজের প্রতি, নিজের অন্তর্যামী পুরুষের প্রতি সম্মানবশত যদি না হয়, তবে এই ভিক্ষা-বৈরাগ্যের প্রতি আমি কোনো ভরসা রাখি না।

বস্তুত, ইংরেজের উপর রাগ করিয়া নিজের দেশের উপর হঠাৎ অত্যন্ত মনোযোগ দিতে আরম্ভ করা কেমন— যেমন স্বামীর উপরে অভিমান করিয়া সবেগে বাপের বাড়ি যাওয়া। সে-বেগের হ্রাস হইতে বেশিক্ষণ লাগে না, আবার দ্বিগুণ আগ্রহে সেই শ্বশুর-বাড়িতেই ফিরিতে হয়। দেশের প্রতি আমাদের যে-সকল কর্তব্য আজ আমরা স্থির করিয়াছি, সে যদি দেশের প্রতি প্রীতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয় তবেই তাহার গৌরব এবং স্থায়িত্ব ; ইংরেজের প্রতি রাগের উপরে যদি তাহার নির্ভর হয় তবে তাহার উপরে ভরসা রাখা বড়ো কঠিন। ডাক্তার অসম্ভব ভিজিট বাড়াইয়াছে বলিয়া তাহার উপরে রাগ করিয়া যদি শরীর ভালো করিতে চেষ্টা করি, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু শরীরের প্রতি মমতা করিয়া যদি এ-কাজে প্রবৃত্ত হই, তবেই কাজটা যথার্থভাবে সম্পন্ন হইবার এবং উৎসাহ স্থায়িভাবে রক্ষিত হইবার সম্ভাবনা থাকে।

তবে কিনা, যেমন ঘড়ির কল কোনো একটা আকস্মিক বাধায় বদ্ধ হইয়া থাকিলে তাহাকে প্রথমে একটা নাড়া দেওয়া যায়, তাহার পরেই সে আর দ্বিতীয় ঝাঁকানির অপেক্ষা না করিয়া নিজের দমেই নিজে চলিতে থাকে— তেমনি স্বদেশের প্রতি কর্তব্য-পরতাও হয়তো আমাদের সমাজে একটা বড়ো রকমের ঝাঁকানির অপেক্ষায় ছিল— হয়তো স্বদেশের প্রতি স্বভাবসিদ্ধ প্রীতি এই ঝাঁকানির পর হইতে নিজের আভ্যন্তরিক শক্তিতেই আবার কিছুকাল সহজে চলিতে থাকিবে। অতএব এই ঝাঁকানিটা যাহাতে আমাদের মনের উপরে বেশ রীতিমতো লাগে, সে-পক্ষেও আমাদিগকে সচেষ্ট হইতে হইবে। যদি সাময়িক আন্দোলনের সাহায্যে আমাদের নিত্য জীবনীক্রিয়া সজাগ হইয়া উঠে, তবে এই সুযোগটা ছাড়িয়া দেওয়া কিছু নয়।

এখন তবে কথা এই যে, আমাদের দেশে বঙ্গব্যবচ্ছেদের আক্ষেপে আমরা যথাসম্ভব বিলাতি জিনিস কেনা বন্ধ করিয়া দেশী জিনিস কিনিবার জন্য যে সংকল্প

করিয়াছি, সেই সংকল্পটিকে শুদ্ধভাবে, গভীরভাবে স্থায়ী মঙ্গলের উপরে স্থাপিত করিতে হইবে। আমি আমাদের এই বর্তমান উদ্‌যোগটির সম্বন্ধে যদি আনন্দ অনুভব করি, তবে তাহার কারণ এ নয় যে, তাহাতে ইংরেজের ক্ষতি হইবে, তাহার কারণ সম্পূর্ণভাবে এও নহে যে, তাহাতে আমাদের দেশী ব্যবসায়ীদের লাভ হইবে— এ সমস্ত লাভক্ষতি নানা বাহিরের অবস্থার উপরে নির্ভর করে— সে সমস্ত সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখা আমার ক্ষমতায় নাই। আমি আমাদের অন্তরের লাভের দিকটা দেখিতেছি। আমি দেখিতেছি, আমরা যদি সর্বদা সচেষ্ট হইয়া দেশী জিনিস ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হই, যে-জিনিসটা দেশী নহে তাহার ব্যবহারে বাধ্য হইতে হইলে যদি কষ্ট অনুভব করিতে থাকি, দেশী জিনিস ব্যবহারের গতিকে যদি কতকটা পরিমাণে আরাম ও আড়ম্বর হইতে বঞ্চিত হইতে হয় যদি সেজন্য মাঝে মাঝে স্বদলের উপহাস ও নিন্দা সহ্য করিতে প্রস্তুত হই, তবে স্বদেশ আমাদের হৃদয়কে অধিকার করিতে পারিবে। এই উপলক্ষে আমাদের চিত্ত সর্বদা স্বদেশের অভিমুখ হইয়া থাকিবে। আমরা ত্যাগের দ্বারা দুঃখস্বীকারের দ্বারা আপন দেশকে যথার্থভাবে আপনার করিয়া লইব। আমাদের আরাম, বিলাস, আত্মসুখতৃপ্তি আমাদিগকে প্রত্যহ স্বদেশ হইতে দূরে লইয়া যাইতেছিল, প্রত্যহ আমাদিগকে পরবশ করিয়া লোকহিত-ব্রতের জন্য অক্ষম করিতেছিল— আজ আমরা সকলে মিলিয়া যদি নিজের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় দেশের দিকে তাকাইয়া ঐশ্বর্যের আড়ম্বর ও আরামের অভ্যাস কিছু পরিমাণও পরিত্যাগ করিতে পারি, তবে সেই ত্যাগের ঐক্য দ্বারা আমরা পরস্পর নিকটবর্তী হইয়া দেশকে বলিষ্ঠ করিতে পারিব। দেশী জিনিস ব্যবহার করার ইহাই যথার্থ সার্থকতা— ইহা দেশের পূজা, ইহা একটি মহান সংকল্পের নিকটে আত্মনিবেদন।

এইরূপে কোনো-একটা কর্মের দ্বারা, কাঠিন্যের দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা আত্মনিবেদনের জন্য আমাদের অন্তঃকরণ নিশ্চয়ই অপেক্ষা করিয়া আছে— আমরা কেবলমাত্র সভা ডাকিয়া, কথা কহিয়া, আবেদন করিয়া নিশ্চয়ই তৃপ্তিলাভ করি নাই। কখনো ভ্রমেও মনে করি নাই, ইহার দ্বারাই আমাদের জীবন সার্থক হইতেছে— ইহার দ্বারা আমরা নিজের একটা শক্তি উপলব্ধি করিতে পারি নাই; ইহা আমাদের চিত্তকে, আমাদের পূজার ব্যগ্রতাকে, আমাদের সুখদুঃখনিরপেক্ষ ফলাফলবিচার-বিহীন আত্মদানের ব্যাকুলতাকে দুর্নিবার বেগে বাহিরে আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারে নাই। কি আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তির প্রকৃতিতে, কি জাতির প্রকৃতিতে কোনো-একটি মহা-আহ্বানে আপনাকে নিঃশেষে বাহিরে নিবেদন করিবার জন্য

প্রতীক্ষা অন্তরের অন্তরে বাস করিতেছে— সেখানে আমাদের দৃষ্টি পড়ে বা না পড়ে, তাহার নির্বাণহীন প্রদীপ জ্বলিতেছেই। যখন কোনো বৃহৎ আকর্ষণে আমরা আপনাদের আরামের, আপনাদের স্বার্থের গহ্বর ছাড়িয়া আপনাকে যেন আপনার বাহিরে প্রবলভাবে সমর্পণ করিতে পারি, তখন আমাদের ভয় থাকে না, দ্বিধা থাকে না, তখনই আমরা আমাদের অন্তর্নিহিত অদ্ভুত শক্তিকে উপলব্ধি করিতে পারি— নিজেকে আর দীনহীন দুর্বল বলিয়া মনে হয় না। এইরূপে নিজের অন্তরের শক্তিকে এবং সেই শক্তির যোগে বৃহৎ বাহিরের শক্তিকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করাই আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের এবং জাতিগত সত্তার একমাত্র চরিতার্থতা।

নিশ্চয় জানি, এই বিপুল সার্থকতার জন্য আমরা সকলেই অপেক্ষা করিয়া আছি। ইহারই অভাবে আমাদের সমস্ত দেশকে বিষাদে আচ্ছন্ন ও অবসাদে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে। ইহারই অভাবে আমাদের মজ্জাগত দৌর্বল্য যায় না, আমাদের পরস্পরের মধ্যে অনৈক্য ঘোচে না, আমাদের আত্মাভিমানের চপলতা কিছুতেই দূর হয় না। ইহারই অভাবে আমরা দুঃখ বহন করিতে, বিলাস ত্যাগ করিতে, ক্ষতি স্বীকার করিতে অসম্মত। ইহারই অভাবে আমরা প্রাণটাকে ভয়মুগ্ধ শিশুর ধাত্রীর মতো একান্ত আগ্রহে আঁকড়িয়া ধরিয়া আছি, মৃত্যুকে নিঃশঙ্ক বীর্যের সহিত বরণ করিতে পারিতেছি না। যিনি আমাদের দেশের দেবতা, যিনি আমাদের পিতামহদের সহিত আমাদিগকে এক সূত্রে বাঁধিয়াছেন, যিনি আমাদের সন্তানের মধ্যে আমাদের সাধনাকে সিদ্ধিদান করিবার পথ মুক্ত করিতেছেন, যিনি আমাদের এই সূর্যালোকদীপ্ত নীলাকাশের নিম্নে যুগে যুগে সকলকে একত্র করিয়া এক বিশেষ বাণীর দ্বারা আমাদের সকলের চিত্তকে এক বিশেষ ভাবে উদ্‌বোধিত করিতেছেন, আমাদের চিরপরিচিত ছায়ালোকবিচিত্র অরণ্য-প্রান্তর-শস্যক্ষেত্র যাঁহার বিশেষ মূর্তিকে পুরুষানুক্রমে আমাদের চক্ষের সম্মুখে প্রকাশমান করিয়া রাখিয়াছে, আমাদের পুণ্যনদীসকল যাঁহার পাদোদকরূপে আমাদের গৃহের দ্বারে দ্বারে প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে, যিনি জাতিনির্বিশেষে হিন্দু-মুসলমান-খ্রীস্টানকে এক মহাযজ্ঞে আহ্বান করিয়া পাশে পাশে বসাইয়া সকলেরই অন্নের থালায় স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া আসিতেছেন, দেশের অন্তর্যামী সেই দেবতাকে, আমাদের সেই চিরন্তন অধিপতিকে এখনো আমরা সহজে প্রত্যক্ষ করিতে পারি নাই। যদি অকস্মাৎ কোনো বৃহৎ ঘটনায়, কোনো মহান্ আবেগের ঝড়ে পর্দা একবার একটু উড়িয়া যায় তবে এই দেবাধিষ্ঠিত দেশের মধ্যে হঠাৎ দেখিতে পাইব, আমরা কেহই স্বতন্ত্র নহি, বিচ্ছিন্ন নহি— দেখিতে পাইব, যিনি যুগযুগান্তর হইতে আমাদিগকে এই সমুদ্রবিধৌত হিমাদ্রি-অধিরাজিত উদার

দেশের মধ্যে এক ধনধান্য, এক সুখদুঃখ এক বিরাট প্রকৃতির মাঝখানে রাখিয়া নিরন্তর এক করিয়া তুলিতেছেন, সেই দেশের দেবতা দুর্জেয়, তাঁহাকে কোনোদিন কেহই অধীন করে নাই, তিনি ইংরেজি স্কুলের ছাত্র নহেন, তিনি ইংরেজ রাজার প্রজা নহেন, আমাদের বহুতর দুর্গতি তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে নাই, তিনি প্রবল, তিনি চিরজাগ্রত— ইহার এই সহজমুক্ত স্বরূপ দেখিতে পাইলে তখনই আনন্দের প্রাচুর্যবেগে আমরা অনায়াসেই পূজা করিব, ত্যাগ করিব, আত্মসমর্পণ করিব, কোনো উপদেশের অপেক্ষা থাকিবে না। তখন দুর্গম পথকে পরিহার করিব না, তখন পরের প্রসাদকেই জাতীয় উন্নতিলাভের চরম সম্বল মনে করাকে পরিহাস করিব এবং অপমানের মূল্যে আশু ফললাভের উঞ্ছবৃত্তিকে অন্তরের সহিত অবজ্ঞা করিতে পারিব।

আজ একটি আকস্মিক ঘটনায় সমস্ত বাঙালিকে একই বেদনায় আঘাত করাতে আমরা যেন ক্ষণকালের জন্যও আমাদের এই স্বদেশের অন্তর্যামী দেবতার আভাস পাইয়াছি। সেইজন্য, যাহারা কোনোদিন চিন্তা করিত না, তাহারা চিন্তা করিতেছে; যাহারা পরিহাস করিত তাহারা স্তব্ধ হইয়াছে; যাহারা কোনো মহান সংকল্পের দিকে তাকাইয়া কোনোরূপ ত্যাগস্বীকার করিতে জানিত না, তাহারাও যেন কিছু অসুবিধা ভোগ করিবার জন্য উদ্যম অনুভব করিতেছে এবং যাহারা প্রত্যেক কথাতেই পরের দ্বারে ছুটিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিত তাহারাও আজ কিঞ্চিৎ দ্বিধার সহিত নিজের শক্তি সন্ধান করিতেছে।

একবার এই আশ্চর্য ব্যাপারটা ভালো করিয়া মনের মধ্যে অনুভব করিয়া দেখুন। ইতিপূর্বে রাজার কোনো অপ্রিয় ব্যবহারে বা কোনো অনভিমত আইনে আঘাত পাইয়া আমরা অনেকবার অনেক কলকৌশল, অনেক কোলাহল, অনেক সভা-আহ্বান করিয়াছি; কিন্তু আমাদের অন্তঃকরণ বল পায় নাই, আমরা নিজের চেষ্টাকে নিজে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি নাই, এইজন্য সহস্র অত্যুক্তি দ্বারাও রাজার প্রত্যয় আকর্ষণ করিতে পারি নাই, দেশেরও ঔদাসীন্য দূর করিতে পারি নাই। আজ আসন্ন বঙ্গবিভাগের উদ্‌যোগ বাঙালির পক্ষে পরম শোকের কারণ হইলেও এই শোক আমাদিগকে নিরুপায় অবসাদে অভিভূত করে নাই। বস্তুত, বেদনার মধ্যে আমরা একটা আনন্দই অনুভব করিতেছি। আনন্দের কারণ, এই বেদনার মধ্যে আমরা নিজেকে অনুভব করিতেছি— পরকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি না। আনন্দের কারণ, আমরা আভাস পাইয়াছি আমাদের নিজের একটা শক্তি আছে, সেই শক্তির প্রভাবে আজ আমরা ত্যাগ করিবার, দুঃখভোগ করিবার পরম অধিকার লাভ করিয়াছি। আজ আমাদের বালকেরাও বলিতেছে, "পরিত্যাগ করো, বিদেশের বেশভূষা, বিদেশের

বিলাস পরিহার করো”— সে-কথা শুনিয়া বৃদ্ধেরাও তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিতেছে না, বিজ্ঞেরাও তাহাদিগকে পরিহাস করিতেছে না; এই কথা নিঃসংকোচে বলিবার এবং এই কথা নিস্তব্ধ হইয়া শুনিবার বল আমার কোথা হইতে পাইলাম। সুখেই হউক আর দুঃখেই হইক, সম্পদেই হউক আর বিপদেই হউক, হৃদয়ে হৃদয়ে যথার্থ ভাবে মিলন হইলেই যাঁহার আবির্ভাব আর মুহূর্তকাল গোপন থাকে না, তিনি আমাদিগকে বিপদের দিনে এই বল দিয়াছেন, দুঃখের দিনে এই আনন্দ দিয়াছেন। আজ দুর্যোগের রাত্রে যে বিদ্যুতের আলোক চকিত হইতেছে সেই আলোকে যদি আমরা রাজপ্রাসাদের সচিবদেরই মুখমণ্ডল দেখিতে থাকিতাম, তবে আমাদের অন্তরের এই উদার উদ্যমটুকু কখনোই থাকিত না। এই আলোকে আমাদের দেবালয়ের দেবতাকে, আমাদের ঐক্যাধিষ্ঠাত্রী অভয়াকে দেখিতেছি— সেইজন্যই আজ আমাদের উৎসাহ এমন সজীব হইয়া উঠিল। সম্পদের দিনে নহে, কিন্তু সংকটের দিনেই বাংলাদেশ আপন হৃদয়ের মধ্যে এই প্রাণ লাভ করিল। ইহাতেই বুঝিতে হইবে, ঈশ্বরের শক্তি যে কেবল সম্ভবের পথ দিয়াই কাজ করে, তাহা নহে; ইহাতেই বুঝিতে হইবে, দুর্বলেরও বল আছে দরিদ্রেরও সম্পদ আছে এবং দুর্ভাগ্যকেই সৌভাগ্য করিয়া তুলিতে পারেন যিনি, সেই জাগ্রত পুরুষ কেবল আমাদের জাগরণের প্রতীক্ষায় নিস্তব্ধ আছেন। তাঁহার অনুশাসন এ নয় যে, “গবর্মেণ্ট তোমাদের মানচিত্রের মাঝখানে যে একটা কৃত্রিম রেখা টানিয়া দিতেছেন, তোমরা তাঁহাদিগকে বলিয়া কহিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া, বিলাতি জিনিস কেনা রহিত করিয়া, বিলাতে টেলিগ্রাম ও দূত পাঠাইয়া তাঁহাদের অনুগ্রহে সেই রেখা মুছিয়া লও।” তাঁহার অনুশাসন এই যে “বাংলার মাঝখানে যে-রাজাই যতগুলি রেখাই টানিয়া দিন, তোমাদিগকে এক থাকিতে হইবে— আবেদন-নিবেদনের জোরে নয়, নিজের শক্তিতে এক থাকিতে হইবে, নিজের প্রেমে এক থাকিতে হইবে। রাজার দ্বারা বঙ্গবিভাগ ঘটিতেও পারে, না-ও ঘটিতে পারে— তাহাতে অতিমাত্র বিষণ্ণ বা উল্লসিত হইয়ো না— তোমরা যে আজ একই আকাঙ্ক্ষা অনুভব করিতেছ, ইহাতেই আনন্দিত হও এবং সেই আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তির জন্য সকলের মনে যে একই উদ্যম জন্মিয়াছে, ইহার দ্বারাই সার্থকতা লাভ করো!”

অতএব, এখন কিছুদিনের জন্য কেবল মাত্র একটা হৃদয়ের আন্দোলন ভোগ করিয়া এই শুভ সুযোগকে নষ্ট করিয়া ফেলিলে চলিবে না। আপনাকে সংবরণ করিয়া, সংযত করিয়া এই আবেগকে নিত্য করিতে হইবে। আমাদের যে ঐক্যকে একটা আঘাতের সাহায্যে দেশের আদ্যন্তমধ্যে আমরা একসঙ্গে সকলে অনুভব করিয়াছি,— আমরা

হিন্দু-মুসলমান, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, স্ত্রীলোক ও পুরুষ সকলেই বাঙালি বলিয়া যে এক বাংলার বেদনা অনুভব করিতে পারিয়াছি, আঘাতের কারণ দূর হইলেই বা বিস্মৃত হইলেই সেই ঐক্যের চেতনা যদি দূর হইয়া যায় তবে আমাদের মতো দুর্ভাগা আর কেহ নাই। এখন হইতে আমাদের ঐক্যকে নানা উপলক্ষ্যে নানা আকারে স্বীকার ও সম্মান করিতে হইবে। এখন হইতে আমরা হিন্দু ও মুসলমান, শহরবাসী ও পল্লীবাসী, পূর্ব ও পশ্চিম, পরস্পরের দৃঢ়বদ্ধ করতলের বন্ধন প্রতিক্ষণে অনুভব করিতে থাকিব। বিচ্ছেদে প্রেমকে ঘনিষ্ঠ করে, বিচ্ছেদের ব্যবধানের মধ্য দিয়া যে প্রবল মিলন সংঘটিত হইতে থাকে তাহা সচেষ্ট, জাগ্রত, বৈদ্যুত শক্তিতে পরিপূর্ণ। ঈশ্বরের ইচ্ছায় যদি আমাদের বঙ্গভূমি রাজকীয় ব্যবস্থায় বিচ্ছিন্নই হয়, তবে সেই বিচ্ছেদবেদনার উত্তেজনায় আমাদিগকে সামাজিক সদ্ভাবে আরো দৃঢ়রূপে মিলিত হইতে হইবে, আমাদিগকে নিজের চেষ্টায় ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে, সেই চেষ্টার উদ্রেকই আমাদের পরম লাভ।

কিন্তু, অনির্দিষ্টভাবে, সাধারণভাবে এ-কথা বলিলে চলিবে না। মিলন কেমন করিয়া ঘটিতে পারে। একত্রে মিলিয়া কাজ করিলেই মিলন ঘটে, তাহা ছাড়া যথার্থ মিলনের আর-কোনো উপায় নাই।

দেশের কার্য বলিতে আর ভুল বুঝিলে চলিবে না— এখন সেদিন নাই,— আমি যাহা বলিতেছি তাহার অর্থ এই, সাধ্যমতো নিজেদের অভাব মোচন করা, নিজেদের কর্তব্য নিজে সাধন করা

এই অভিপ্রায়টি মনে রাখিয়া দেশের কর্মশক্তিকে একটি বিশেষ কর্তৃসভার মধ্যে বদ্ধ করিতে হইবে। অন্তত একজন হিন্দু ও একজন মুসলমানকে আমরা এই সভার অধিনায়ক করিব— তাঁহাদের নিকটে নিজেকে সম্পূর্ণ অধীন, সম্পূর্ণ নত করিয়া রাখিব, তাঁহাদিগকে কর দান করিব, তাঁহাদের আদেশ পালন করিব, নির্বিচারে তাঁহাদের শাসন মানিয়া চলিব— তাঁহাদিগকে সম্মান করিয়া আমাদের দেশকে সম্মানিত করিব।

আমি জানি, আমার এই প্রস্তাবকে আমাদের বিবেচক ব্যক্তিগণ অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দিবেন। যাহা নিতান্তই সহজ, যাহাতে দুঃখ নাই, ত্যাগ নাই, অথচ আড়ম্বর আছে, উদ্দীপনা আছে, তাহা ছাড়া আর-কিছুকেই আমাদের স্বাদেশিকগণ সাধ্য বলিয়া গণ্যই করেন না। কিন্তু সম্প্রতি নাকি বাংলায় একটা দেশব্যাপী ক্ষোভ জন্মিয়াছে, সেই জন্যই আমি বিরক্তি ও বিদ্রূপ উদ্রেকের আশঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া আমার প্রস্তাবটি সকলের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি এবং আশ্বস্ত করিবার জন্য একটা ঐতিহাসিক নজিরও এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। আমি যে-বিবরণটি পাঠ করিতে

উদ্ধৃত হইয়াছি তাহা রুশীয় গবর্মেণ্টের অধীনস্থ বাহ্লীক প্রদেশীয়। ইহা কিছুকাল পূর্বে স্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই বাহ্লীক প্রদেশে জর্জীয় আর্মানিগণ যে-চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহা যে কেন আমাদের পক্ষে দৃষ্টান্তস্বরূপ হইবে না, তাহা জানি না। সেখানে 'সকার্‌ট্‌ভেলিষ্টি' নামধারী একটি জর্জীয় 'ন্যাশনালিস্ট' সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে— ইহারা 'কার্স্' প্রদেশে প্রত্যেক গ্রাম্য জিলায় স্বদেশীয় বিচারকদের দ্বারা গোপন বিচারশালা স্থাপন করিয়া রাজকীয় বিচারালয়কে নিষ্প্রভ করিয়া দিয়াছেন।—

> The peasants aver that these secret courts work with much greater expedition, accuracy and fairness than the Crown Courts, and that the Judges have the invaluable characteristic of incorruptibility. The Drozhakisti, or Armenian Nationalist party, had previously established a similar system of justice in the rural districts of the province of Erwan and more than that, they had practically supplanted the whole of the government system of rural administration and were employing agricultural experts, teachers and physicians of their own choosing. It has long been a matter of notoriety that ever since the suppression of Armenian schools by the Russian minister of Education, Delyanoff, who by the way, was himself an Armenian, the Armenian population of the Caucasus has maintained clandestine national schools of its own.

আমি কেবল এই বৃত্তান্তটি উদাহরণস্বরূপে উদ্ধৃত করিয়াছি— অর্থাৎ, ইহার মধ্যে এইটুকুই দ্রষ্টব্য যে, স্বদেশের কর্মভার দেশের লোকের নিজেদের গ্রহণ করিবার চেষ্টা একটা পাগলামি নহে— বস্তুত, দেশের হিতেচ্ছু ব্যক্তিদের এইরূপ চেষ্টাই একমাত্র স্বাভাবিক।

আমাদের দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোকে যে গবর্মেণ্টের চাকরিতে মাথা বিকাইয়া রাখিয়াছেন, ইহার শোচনীয়তা কি আমরা চিন্তা করিব না,— কেবল চাকরির পথ আরো প্রশস্ত করিয়া দিবার জন্য প্রার্থনা করিব? চাকরির খাতিরে আমাদের দুর্বলতা কতদূর বাড়িতেছে তাহা কি আমরা জানি না। আমরা মনিবকে খুশি

করিবার জন্য গুপ্তচরের কাজ করিতেছি, মাতৃভূমির বিরুদ্ধে হাত তুলিতেছি এবং যে-মনিব আমাদের প্রতি অশ্রদ্ধা করে তাহার পৌরুষক্ষয়কর অপমানজনক আদেশও প্রফুল্লমুখে পালন করিতেছি— এই চাকরি আরো বিস্তার করিতে হইবে? দেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের বন্ধনকে আরো দৃঢ় করিতে হইবে? আমরা যদি স্বদেশের কর্মভার নিজে গ্রহণ করিতাম তবে গবর্মেণ্টের আপিস রাক্ষসের মতো আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকদিগকে কি এমন নিঃশেষে গ্রাস করিত। আবেদনের দ্বারা সরকারের চাকরি নহে, পৌরুষের দ্বারা স্বদেশের কর্মক্ষেত্র বিস্তার করিতে হইবে। যাহাতে আমাদের ডাক্তার, আমাদের শিক্ষক, আমাদের এঞ্জিনিয়ারগণ দেশের অধীন থাকিয়া দেশের কাজেই আপনার যোগ্যতার স্ফূর্তিসাধন করিতে পারেন, আমাদিগকে তাহার ব্যবস্থা করিতেই হইবে। নতুবা আমাদের যে কী শক্তি আছে, তাহার পরিচয়ই আমরা পাইব না। তা ছাড়া, এ-কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, সেবার অভ্যাসের দ্বারাই প্রীতির উপচয় হয়; যদি আমরা শিক্ষিতগণ এমন কোথাও কাজ করিতাম যেখানে 'দেশের কাজ করিতেছি' এই ধারণা সর্বদা স্পষ্টরূপে জাগ্রত থাকিত, তবে 'দেশকে ভালোবাসো' এ-কথা নীতিশাস্ত্রের সাহায্যে উপদেশ দিতে হইত না। তবে একদিকে যোগ্যতার অভিমান করা, অন্যদিকে প্রত্যেক অভাবের জন্য পরের সাহায্যের প্রার্থী হওয়া— এমনতরো অদ্ভুত অশ্রদ্ধাকর আচরণে আমাদিগকে প্রবৃত্ত হইতে হইত না, দেশের শিক্ষা স্বাধীন হইত এবং শিক্ষিত-সমাজের শক্তি বন্ধনমুক্ত হইত।

জর্জীয়গণ, আর্মানিগণ প্রবল জাতি নহে— ইহারা যে-সকল কাজ প্রতিকূল অবস্থাতেও নিজে করিতেছে, আমরা কি সেই-সকল কাজেরই জন্য দরবার করিতে দৌড়াই না। কৃষিতত্ত্বপারদর্শীদের লইয়া আমরাও কি আমাদের দেশের কৃষির উন্নতিতে প্রবৃত্ত হইতে পারিতাম না। আমাদের ডাক্তার লইয়া আমাদের দেশের স্বাস্থ্যবিধানচেষ্টা কি আমাদের পক্ষে অসম্ভব। আমাদের পল্লীর শিক্ষাভার কি আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। যাহাতে মামলা-মকদ্দমায় লোকের চরিত্র ও সম্বল নষ্ট না হইয়া সহজ বিচারপ্রণালীতে সালিস-নিষ্পত্তি দেশে চলে, তাহার ব্যবস্থা করা কি আমাদের সাধ্যাতীত। সমস্তই সম্ভব হয়, যদি আমাদের এই-সকল স্বদেশী চেষ্টাকে যথার্থভাবে প্রয়োগ করিবার জন্য একটা দল বাঁধিতে পারি। এই দল, এই কর্তৃসভা আমাদিগকে স্থাপন করিতেই হইবে— নতুবা বলিব, আজ আমরা যে একটা উত্তেজনা প্রকাশ করিতেছি, তাহা মাদকতা মাত্র, তাহার অবসানে অবসাদের পঙ্কশয্যায় লুণ্ঠন করিতে হইবে।

একটা কথা আমাদিগকে ভালো করিয়া বুঝিতে হইবে যে, পরের প্রদত্ত অধিকার আমাদের জাতীয় সম্পদরূপে গণ্য হইতে পারে না— বরঞ্চ তাহার বিপরীত। দৃষ্টান্তস্বরূপে একবার পঞ্চায়েতবিধির কথা ভাবিয়া দেখুন। একসময় পঞ্চায়েত আমাদের দেশের জিনিস ছিল, এখন পঞ্চায়েত গবর্মেণ্টের আপিসে-গড়া জিনিস হইতে চলিল। যদি ফল বিচার করা যায় তবে এই দুই পঞ্চায়েতের প্রকৃতি একেবারে পরস্পরের বিপরীত বলিয়াই প্রতীত হইবে। যে-পঞ্চায়েতের ক্ষমতা গ্রামের লোকের স্বতঃপ্রদত্ত নহে, যাহা গবর্মেণ্টের দত্ত, তাহা বাহিরের জিনিস হওয়াতেই গ্রামের বক্ষে একটা অশান্তির মতো চাপিয়া বসিবে— তাহা ঈর্ষার সৃষ্টি করিবে— এই পঞ্চায়েতপদ লাভ করিবার জন্য অযোগ্য লোকে এমন-সকল চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবে যাহাতে বিরোধ জন্মিতে থাকিবে— পঞ্চায়েত ম্যাজিস্ট্রেটবর্গকেই স্বপক্ষ এবং গ্রামকে অপর পক্ষ বলিয়া জানিবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বাহবা পাইবার জন্য গোপনে অথবা প্রকাশ্যে গ্রামের বিশ্বাসভঙ্গ করিবে— ইহারা গ্রামের লোক হইয়া গ্রামের চরের কাজ করিতে বাধ্য হইবে এবং যে পঞ্চায়েত এ-দেশে গ্রামের বলস্বরূপ ছিল সেই পঞ্চায়েতই গ্রামের দুর্বলতার কারণ হইবে। ভারতবর্ষের যে সকল গ্রামে এখনো গ্রাম্য পঞ্চায়েতের প্রভাব বর্তমান আছে, যে-পঞ্চায়েত কালক্রমে শিক্ষার বিস্তার ও অবস্থার পরিবর্তন-অনুসারে স্বভাবতই স্বাদেশিক পঞ্চায়েতে পরিণত হইতে পারিত, যে গ্রাম্যপঞ্চায়েতগণ একদিন স্বদেশের সাধারণ কার্যে পরস্পরের মধ্যে যোগ বাঁধিয়া দাঁড়াইবে এমন আশা করা যাইত— সেই সকল গ্রামের পঞ্চায়েতগণের মধ্যে একবার যদি গবর্মেণ্টের বেনো জল প্রবেশ করে, তবে পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েতত্ব চিরদিনের মতো ঘুচিল। দেশের জিনিস হইয়া তাহারা যে-কাজ করিত, গবর্মেণ্টের জিনিস হইয়া সম্পূর্ণ উল্টারকম কাজ করিবে।

ইহা হইতে আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, দেশের হাত হইতে আমরা যে-ক্ষমতা পাই তাহার প্রকৃতি একরকম, আর পরের হাত হইতে যাহা পাই তাহার প্রকৃতি সম্পূর্ণ অন্যরকম হইবেই। কারণ, মূল্য না দিয়া কোনো জিনিস আমরা পাইতেই পারি না। সুতরাং দেশের কাছ হইতে আমরা যাহা পাইব সেজন্য দেশের কাছেই আপনাকে বিকাইতে হইবে— পরের কাছ হইতে যাহা পাইব সেজন্য পরের কাছে না বিকাইয়া উপায় নাই। এইরূপ বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ যদি পরের কাছে মাগিয়া লইতে হয় তবে শিক্ষাকে পরের গোলামি করিতেই হইবে— যাহা স্বাভাবিক, তাহার জন্য আমরা বৃথা চীৎকার করিয়া মরি কেন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ আর-একটা কথা বলি। মহাজনেরা চাষিদের অধিক সুদে কর্জ দিয়া

তাহাদের সর্বনাশ করিতেছে, আমরা প্রার্থনা ছাড়া অন্য উপায় জানি না— অতএব গবর্মেণ্টকেই অথবা বিদেশী মহাজনদিগকে যদি আমরা বলি যে, "তোমরা অল্প সুদে আমাদের গ্রামে গ্রামে কৃষি-ব্যাঙ্ক স্থাপন করো," তবে নিজে খদ্দের ডাকিয়া আনিয়া আমাদের দেশের চাষিদিগকে নিঃশেষে পরের হাতে বিকাইয়া দেওয়া হয় না? যাহারা যথার্থই দেশের বল, দেশের সম্পদ, তাহাদের প্রত্যেকটিকে কি পরের হাতে এমনি করিয়া বাঁধা রাখিতে হইবে। আমরা যে-পরিমাণেই দেশের কাজ পরকে দিয়া করাইব সেই পরিমাণেই আমরা নিজের শক্তিকেই বিকাইতে থাকিব, দেশকে স্বেচ্ছাকৃত অধীনতাপাশে উত্তরোত্তর অধিকতর বাঁধিতে থাকিব, এ-কথা বুঝাই কি এতই কঠিন। পরের প্রদত্ত ক্ষমতা আমাদের উপস্থিত সুবিধার কারণ যেমনই হউক তাহা আমাদের পক্ষে ছদ্মবেশী অভিসম্পাত, এ-কথা স্বীকার করিতে আমাদের যত বিলম্ব হইবে, আমাদের মোহজাল ততই দুশ্ছেদ্য হইয়া উঠিতে থাকিবে।

অতএব, আর দ্বিধা না করিয়া আমাদের গ্রামের স্বকীয় শাসনকার্য আমাদিগকে নিজের হাতে লইতেই হইবে। সরকারি পঞ্চায়েতের মুষ্টি আমাদের পল্লীর কণ্ঠে দৃঢ় হইবার পূর্বেই আমাদের নিজের পল্লী-পঞ্চায়েতকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। চাষিকে আমরাই রক্ষা করিব, তাহার সন্তানদিগকে আমরাই শিক্ষা দিব, কৃষির উন্নতি আমরাই সাধন করিব, গ্রামের স্বাস্থ্য আমরাই বিধান করিব এবং সর্বনেশে মামলার হাত হইতে আমাদের জমিদার ও প্রজাদিগকে আমরাই বাঁচাইব। এ-সম্বন্ধে রাজার সাহায্য লইবার কল্পনাও যেন আমাদের মাথায় না আসে— কারণ, এ-স্থলে সাহায্য লইবার অর্থই দুর্বলের স্বাধীন অধিকারের মধ্যে প্রবলকে ডাকিয়া আনিয়া বসানো।

একবার বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, বিদেশী শাসনকালে বাংলাদেশে যদি এমন কোনো জিনিসের সৃষ্টি হইয়া থাকে যাহা লইয়া বাঙালি যথার্থ গৌরব করিতে পারে, তাহা বাংলা সাহিত্য। তাহার একটা প্রধান কারণ, বাংলা সাহিত্য সরকারের নেমক খায় নাই। পূর্বে প্রত্যেক বাংলা বই সরকার তিনখানি করিয়া কিনিতেন, শুনিতে পাই এখন মূল্য দেওয়া বন্ধ করিয়াছেন। ভালোই করিয়াছেন। গবর্মেণ্টের উপাধি-পুরস্কার-প্রসাদের প্রলোভন বাংলা সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই বলিয়াই, এই সাহিত্য বাঙালির স্বাধীন আনন্দ-উৎস হইতে উৎসারিত বলিয়াই, আমরা এই সাহিত্যের মধ্য হইতে এমন বল পাইতেছি। হয়তো গণনায় বাংলাভাষায় উচ্চশ্রেণীর গ্রন্থ-সংখ্যা অধিক না হইতে পারে, হয়তো বিষয়-বৈচিত্র্যে এ-সাহিত্য অন্যান্য সম্পৎশালী সাহিত্যের সহিত তুলনীয় নহে, কিন্তু তবু ইহাকে আমরা বর্তমান অসম্পূর্ণতা অতিক্রম করিয়া বড়ো করিয়া দেখিতে পাই— কারণ,

ইহা আমাদের নিজের শক্তি হইতে, নিজের অন্তরের মধ্য হইতে উদ্ভূত হইতেছে। এ ক্ষীণ হউক, দীন হউক, এ রাজার প্রশ্রয়ের প্রত্যাশী নহে,— আমাদেরই প্রাণ ইহাকে প্রাণ জোগাইতেছে। অপর পক্ষে, আমাদের স্কুল-বইগুলির প্রতি ন্যূনাধিক পরিমাণে অনেক দিন হইতেই সরকারের গুরুহস্তের ভার পড়িয়াছে, এই রাজপ্রসাদের প্রভাবে এই-বইগুলির কিরূপ শ্রী বাহির হইতেছে তাহা কাহারও অগোচর নাই।

এই-যে স্বাধীন বাংলা সাহিত্য যাহার মধ্যে বাঙালি নিজের প্রকৃত শক্তি যথার্থভাবে অনুভব করিয়াছে, এই সাহিত্যই নাড়ীজালের মতো বাংলার পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণকে এক বন্ধনে বাঁধিয়াছে; তাহার মধ্যে এক চেতনা, এক প্রাণ সঞ্চার করিয়া রাখিতেছে; যদি আমাদের দেশে স্বদেশীসভাস্থাপন হয় তবে বাংলা সাহিত্যের অভাবমোচন, বাংলা সাহিত্যের পুষ্টিসাধন সভ্যগণের একটি বিশেষ কার্য হইবে। বাংলা ভাষা অবলম্বন করিয়া ইতিহাস, বিজ্ঞান, অর্থনীতি প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে দেশে জ্ঞান বিস্তারের চেষ্টা তাঁহাদিগকে করিতে হইবে। ইহা নিশ্চয় জানিতে হইবে যে, বাংলা সাহিত্য যত উন্নত সতেজ, যতই সম্পূর্ণ হইবে, ততই এই সাহিত্যই বাঙালি জাতিকে এক করিয়া ধারণ করিবার অনশ্বর আধার হইবে। বৈষ্ণবের গান, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত আজ পর্যন্ত এই কাজ করিয়া আসিয়াছে।

আমি জানি, সমস্ত বাংলাদেশ এক মুহূর্তে একত্র হইয়া আপনার নায়ক নির্বাচনপূর্বক আপনার কাজে প্রবৃত্ত হইবে, এমন আশা করা যায় না। এখন আর বাদ-বিবাদ তর্কবিতর্ক না করিয়া আমরা যে-কয়জনেই উৎসাহ অনুভব করি, প্রয়োজন স্বীকার করি, সেই পাঁচ-দশজনেই মিলিয়া আমরা আপনাদের অধিনায়ক নির্বাচন করিব, তাঁহার নিয়োগক্রমে জীবনযাত্রা নিয়মিত করিব, কর্তব্য পালন করিব, এবং সাধ্যমতে আপনার পরিবার প্রতিবেশী ও পল্লীকে লইয়া সুখ-স্বাস্থ্য-শিক্ষাবিধান সম্বন্ধে একটি স্বকীয় শাসনজাল বিস্তার করিব। এই প্রত্যেক দলের নিজের পাঠশালা, পুস্তকালয়, ব্যায়ামাগার, ব্যবহার্য দ্রব্যাদির বিক্রয়ভাণ্ডার (কো-অপারেটিভ স্টোর) ঔষধালয়, সঞ্চয়-ব্যাঙ্ক, সালিস নিষ্পত্তির সভা ও নির্দোষ আমোদের মিলনগৃহ থাকিবে।

এমনি করিয়া যদি আপাতত খণ্ড খণ্ড ভাবে দেশের নানা স্থানে এইরূপ এক-একটি কর্তৃসভা স্থাপিত হইতে থাকে, তবে ক্রমে একদিন এই-সমস্ত খণ্ডসভাগুলিকে যোগ-সূত্রে এক করিয়া তুলিয়া একটি বিশ্ববঙ্গপ্রতিনিধিসভা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে।

আমরা এই সময়ে এই উপলক্ষ্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে বাংলার ঐক্যসাধনযজ্ঞে

বিশেষভাবে আহ্বান করিতেছি। তাঁহারা পরের দিকে না তাকাইয়া, নিজেকে পরের কাছে প্রচার না করিয়া, নিজের সাধ্যমতো স্বদেশের পরিচয়লাভ ও তাহার জ্ঞানভাণ্ডার-পূরণ করিতেছেন। এই পরিষৎকে জেলায় জেলায় আপনার শাখাসভা স্থাপন করিতে হইবে, এবং পর্যায়ক্রমে এক-একটি জেলায় গিয়া পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন সম্পন্ন করিতে হইবে। আমাদের চিন্তার ঐক্য, ভাবের ঐক্য, ভাষার ঐক্য, সাহিত্যের ঐক্য সম্বন্ধে সমস্ত দেশকে সচেতন করিবার, এই ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে আপন স্বাধীন কর্তব্য পালন করিবার ভার সাহিত্য-পরিষৎ গ্রহণ করিয়াছেন। এখন সময় উপস্থিত হইয়াছে— এখন সমস্ত দেশকে নিজের অনুকূল্যে আহ্বান করিবার জন্য তাঁহাদিগকে সচেষ্ট হইতে হইবে।

যখন দেখা যাইতেছে, বাহির হইতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা নিয়ত সতর্ক রহিয়াছে, তখন তাহার প্রতিকারের জন্য নানারূপে কেবলই দল বাঁধিবার দিকে আমাদের সমস্ত চেষ্টাকে নিযুক্ত করিতে হইবে।

যে-গুণে মানুষকে একত্র করে তাহার মধ্যে একটা প্রধান গুণ বাধ্যতা। কেবলই অন্যকে খাটো করিবার চেষ্টা, তাহার ত্রুটি ধরা, নিজেকে কাহারও চেয়ে ন্যূন মনে না করা, নিজের একটা মত অনাদৃত হইলেই অথবা নিজের একটুখানি সুবিধার ব্যাঘাত হইলেই দল ছাড়িয়া আসিয়া তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবার প্রয়াস — এইগুলিই সেই শয়তানের প্রদত্ত বিষ যাহা মানুষকে বিশ্লিষ্ট করিয়া দেয়, যজ্ঞ নষ্ট করে। ঐক্যরক্ষার জন্য আমাদিগকে অযোগ্যের কর্তৃত্বও স্বীকার করিতে হইবে— ইহাতে মহান্ সংকল্পের নিকট নত হওয়া হয়, অযোগ্যতার নিকট নহে। বাঙালিকে ক্ষুদ্র আত্মাভিমান দমন করিয়া নানারূপে বাধ্যতার চর্চা করিতে হইবে, নিজে প্রধান হইবার চেষ্টা মন হইতে সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া অন্যকে প্রধান করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। সর্বদাই অন্যকে সন্দেহ করিয়া, অবিশ্বাস করিয়া, উপহাস করিয়া, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় না দিয়া বরঞ্চ নম্রভাবে বিনা বাক্যব্যয়ে ঠকিবার জন্যও প্রস্তুত হইতে হইবে। সম্প্রতি এই কঠিন সাধনা আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে— আপনাকে খর্ব করিয়া আপনাদিগকে বড়ো করিবার এই সাধনা, গর্বকে বিসর্জন দিয়া গৌরবকে আশ্রয় করিবার এই সাধনা— ইহা যখন আমাদের সিদ্ধ হইবে তখন আমরা সর্বপ্রকার কর্তৃত্বের যথার্থরূপে যোগ্য হইব। ইহাও নিশ্চিত, যথার্থ যোগ্যতাকে পৃথিবীতে কোনো শক্তিই প্রতিরোধ করিতে পারে না। আমরা যখন কর্তৃত্বের ক্ষমতা লাভ করিব তখন আমরা দাসত্ব করিব না— তা আমাদের প্রভু যত বড়োই প্রবল হউন। জল যখন জমিয়া কঠিন হয় তখন সে লোহার পাইপকেও ফাটাইয়া ফেলে।

আজ আমরা জলের মতো তরল আছি, যন্ত্রীর ইচ্ছামতো যন্ত্রের তাড়নায় লোহার কলের মধ্যে শত শত শাখাপ্রশাখায় ধাবিত হইতেছি— জমাট বাঁধিবার শক্তি জন্মিলেই লোহার বাঁধনকে হার মানিতেই হইবে।

আমাদের নিজের দিকে যদি সম্পূর্ণ ফিরিয়া দাঁড়াইতে পারি, তবে নৈরাশ্যের লেশমাত্র কারণ দেখি না। বাহিরের কিছুতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবে, এ-কথা আমরা কোনোমতেই স্বীকার করিব না। কৃত্রিম বিচ্ছেদ যখন মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইবে তখনই আমরা সচেতনভাবে অনুভব করিব যে, বাংলার পূর্ব-পশ্চিমকে চিরকাল একই জাহ্নবী তাঁহার বহু বাহুপাশে বাঁধিয়াছেন, একই ব্রহ্মপুত্র তাঁহার প্রসারিত আলিঙ্গনে গ্রহণ করিয়াছেন, এই পূর্ব-পশ্চিম হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ-বাম অংশের ন্যায়, একই পুরাতন রক্তস্রোতে সমস্ত বঙ্গদেশের শিরা-উপশিরায় প্রাণবিধান করিয়া আসিয়াছে; এই পূর্ব-পশ্চিম, জননীর বাম-দক্ষিণ স্তনের ন্যায়, চিরদিন বাঙালির সন্তানকে পালন করিয়াছে। আমাদের কিছুতেই পৃথক করিতে পারে, এ-ভয় যদি আমাদের জন্মে, তবে সে-ভয়ের কারণ নিশ্চয়ই আমাদেরই মধ্যে আছে এবং তাহার প্রতিকার আমাদের নিজের চেষ্টা ছাড়া আর-কোনো কৃত্রিম উপায়ের দ্বারা হইতে পারে না। কর্তৃপক্ষ আমাদের একটা কিছু করিলেন বা না করিলেন বলিয়াই যদি আমাদের সকল দিকে সর্বনাশ হইয়া গেল বলিয়া আশঙ্কা করি, তবে কোনো কৌশললব্ধ সুযোগে কোনো প্রার্থনালব্ধ অনুগ্রহে আমাদিগকে অধিক দিন রক্ষা করিতে পারিবে না। ঈশ্বর আমাদের নিজের হাতে যাহা দিয়াছেন তাহার দিকে যদি তাকাইয়া দেখি, তবে দেখিব, তাহা যথেষ্ট এবং তাহাই যথার্থ। মাটির নিচে যদি বা তিনি আমাদের জন্য গুপ্তধন না দিয়া থাকেন, তবু আমাদের মাটির মধ্যে সেই শক্তিটুকু দিয়াছেন যাহাতে বিধিমতো কর্ষণ করিলে ফললাভ হইতে কখনোই বঞ্চিত হইব না। বাহির হইতে সুবিধা এবং সম্মান যখন হাত বাড়াইলেই পাওয়া যাইবে না, তখনই ঘরের মধ্যে যে চিরসহিষ্ণু চিরন্তন প্রেম লক্ষ্মীছাড়াদের গৃহপ্রত্যাবর্তনের জন্য গোধূলির অন্ধকারে পথ তাকাইয়া আছে, তাহার মূল্য বুঝিব। তখন মাতৃভাষায় ভ্রাতৃগণের সহিত সুখদুঃখ-লাভক্ষতি আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতে পারিব— এবং সেই শুভদিন যখন আসিবে তখনই ব্রিটিশ শাসনকে বলিব ধন্য— তখনই অনুভব করিব, বিদেশীর এই রাজত্ব বিধাতারই মঙ্গলবিধান। আমরা যাচিত ও অযাচিত যে-কোনো অনুগ্রহ পাইয়াছি তাহা যেন ক্রমে আমাদের অঞ্জলি হইতে স্খলিত হইয়া পড়ে এবং তাহা যেন স্বচেষ্টায় নিজে অর্জন করিয়া লইবার অবকাশ পাই। আমরা প্রশ্রয় চাহি না— প্রতিকূলতার দ্বারাই আমাদের শক্তির উদ্‌বোধন হইবে। আমাদের

নিদ্রার সহায়তা কেহ করিয়ো না— আরাম আমাদের জন্য নহে, পরবশতার অহিফেনের মাত্রা প্রতিদিন আর বাড়িতে দিয়ো না— বিধাতার রুদ্রমূর্তিই আজ আমাদের পরিত্রাণ! জগতে জড়কে সচেতন করিয়া তুলিবার এইমাত্র উপায় আছে— আঘাত, অপমান ও অভাব; সমাদর নহে, সহায়তা নহে, সুভিক্ষা নহে।

ব্রত ধারণ

কোনো 'স্ত্রীসমাজে' জনৈক মহিলা-কর্তৃক পঠিত

আজ এই স্ত্রীসমাজে আমি যে উপদেশ দিতে উঠিয়াছি বা আমার কোনো নূতন কথা বলিবার আছে, এমন অভিমান আমার নাই।

আমার কথা নূতন নহে বলিয়াই, কাহাকেও উপদেশ দিতে হইবে না বলিয়াই, আমি আজ সমস্ত সংকোচ পরিহার করিয়া আপনাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছি।

যে-কথাটি আজ দেশের অন্তরে অন্তরে সর্বত্র জাগ্রত হইয়াছে, তাহাকেই নারীসমাজের নিকট সুস্পষ্টরূপে গোচর করিয়া তুলিবার জন্যই আমাদের অদ্যকার এই উদ্‌যোগ।

আমাদের দেশে সম্প্রতি একটি বিশেষ সময় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আমরা সকলেই অনুভব করিতেছি। অল্পদিনের মধ্যে আমাদের দেশ আঘাতের পর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে। হঠাৎ বুঝিতে পারিয়াছি যে, আমাদের যাত্রাপথের দিক্‌পরিবর্তন করিতে হইবে।

যে-সময়ে এইরূপ দেশব্যাপী আঘাতের তাড়না উপস্থিত হইয়াছে, যে-সময়ে আমাদের সকলেরই হৃদয় কিছু না কিছু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, সেই সময়কে যদি আমরা উপেক্ষা করি তবে বিধাতার প্রেরণাকে অবজ্ঞা করা হইবে।

ইহাকে দুর্যোগ বলিব কি। এই-যে দিগ্‌দিগন্তে ঘন মেঘ করিয়া শ্রাবণের অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল, এই-যে বিদ্যুতের আলোক এবং বজ্রের গর্জন আমাদের হৃৎপিণ্ডকে চকিত করিয়া তুলিতেছে, এই-যে জলধারাবর্ষণে পৃথিবী ভাসিয়া গেল— এই দুর্যোগকেই যাহারা সুযোগ করিয়া তুলিয়াছে তাহারাই পৃথিবীর অন্ন জোগাইবে। এখনই স্কন্ধে হল লইয়া কৃষককে কোমর বাঁধিতে হইবে। এই সময়টুকু যদি অতিক্রম করিতে দেওয়া হয় তবে সমস্ত বৎসর দুর্ভিক্ষ এবং হাহাকার।

আমাদের দেশেও সম্প্রতি ঈশ্বর দুর্যোগের বেশে যে-সুযোগকে প্রেরণ করিয়াছেন তাহাকে নষ্ট হইতে দিব না বলিয়াই আজ আমাদের সামান্য শক্তিকেও যথাসম্ভব সচেষ্ট

করিয়া তুলিয়াছি। যে এক বেদনার উত্তেজনায় আমাদের সকলের চেতনাকে উৎসুক করিয়া তুলিয়াছে, আজ সেই বিধাতার প্রেরিত বেদনাদূতকে প্রশ্ন করিয়া আদেশ জানিতে হইবে, কর্তব্য স্থির করিতে হইবে।

নিজেকে ভুলাইয়া রাখিবার দিন আর আমাদের নাই। বড়ো দুঃখে আজ আমাদিগকে বুঝিতে হইয়াছে যে, আমাদের নিজের সহায় আমরা নিজেরা ছাড়া আর কেহ নাই। এই সহজ কথা যাহারা সহজেই না বুঝে, অপমান তাহাদিগকে বুঝায়, নৈরাশ্য তাহাদিগকে বুঝায়। তাই আজ দায়ে পড়িয়া আমাদিগকে বুঝিতে হইয়াছে যে, 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ'। আজ আসন্নবিচ্ছেদশঙ্কিত বঙ্গভূমিতে দাঁড়াইয়া বাঙালি এ-কথা সুস্পষ্ট বুঝিয়াছে যে, যেখানে স্বার্থের অনৈক্য, যেখানে শ্রদ্ধার অভাব, যেখানে রিক্ত ভিক্ষার ঝুলি ছাড়া আর কোনোই বল বা সম্বল নাই, সেখানে ফললাভের আশা কেবল যে বিড়ম্বনা তাহা নহে, তাহা লাঞ্ছনার একশেষ।

এই আঘাত আবার একদিন হয়তো সহ্য হইয়া যাইবে— অপমানে যাহা শিখিয়াছি তাহা হয়তো আবার ভুলিয়া গিয়া আবার গুরুতর অপমানের জন্য প্রস্তুত হইব। যে দুর্বল, নিশ্চেষ্ট, তাহার ইহাই দুর্ভাগ্য— দুঃখ তাহাকে দুঃখই দেয়, শিক্ষা দেয় না। আজ সেই শঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া সময় থাকিতে এই দুঃসময়ের দান গ্রহণ করিবার জন্য আমরা একত্র হইয়াছি।

কোথায় আমরা আপনারা আছি, কোথায় আমাদের শক্তি এবং কোন্ দিকে আমাদের অসম্মান ও প্রতিকূলতা, আজ দৈবকৃপায় যদি তাহা আমাদের ধারণা হইয়া থাকে, তবে কেবল তাহাকে ক্ষীণ ধারণার মধ্যে রাখিয়া দিলে চলিবে না। কারণ, শুদ্ধমাত্র ইহাকে মনের মধ্যে রাখিলে ক্রমে ইহা কেবল কথার কথা এবং অবশেষে একদিন ইহা বিস্মৃত ও তিরোহিত হইয়া যাইবে। ইহাকে চিরদিনের মতো আমাদিগকে মনে গাঁথিতে এবং কাজে খাটাইতে হইবে। ইহাকে ভুলিলে আমাদের কোনোমতেই চলিবে না— তাহা হইলে আমরা মরিব।

কাজে খাটাইতে হইবে। কিন্তু আমরা স্ত্রীলোক— পুরুষের মতো আমাদের কার্যক্ষেত্র বাহিরে বিস্তৃত নহে। জানি না, আজিকার দুর্দিনে আমাদের পুরুষেরা কী কাজ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। জানি না, এখনো তাঁহারা যথার্থ মনের সঙ্গে বলিতে পারিয়াছেন কি না যে,—

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু, হায়,
তাই ভাবি মনে!

৩—৭৯

যে নির্জীব, যে সহজ পথ খুঁজিয়া আপনাকে ভুলাইয়া রাখিতেই চায়, তাহাকে ভুলাইবার জন্য আশাকে অধিক বেশি ছলনা বিস্তার করিতে হয় না। সে হয়তো এখনো মনে করিতেছে, যদি এখানকার রাজদ্বার হইতে ভিক্ষুককে তাড়া খাইতে হয়, তবে ভিক্ষার ঝুলি ঘাড়ে করিয়া সমুদ্রপারে যাইতে হইবে। সমুদ্রের এ-পারেই কি আর ও-পারেই কি, অনন্যশরণ কাঙাল সেই একই চরণ আশ্রয় করিয়াছে।

কিন্তু এ-দশা আমাদের পুরুষদের মধ্যে সকলের নহে— তাঁহাদের বহুদিনের বিশ্বাস-ক্ষেত্রে ভূমিকম্প উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহাদের ভক্তি টলিয়াছে, তাঁহাদের আশা খিলানে-খিলানে ফাটিয়া ফাঁক হইয়া গেছে— এখন তাঁহারা ভাবিতেছেন, ইহার চেয়ে নিজের দীনহীন কুটির আশ্রয় করাও নিরাপদ। এখন তাই সমস্ত দেশের মধ্যে নিজের শক্তিকে অবলম্বন করিবার জন্য একটা মর্মভেদী আহ্বান উঠিয়াছে।

এই আহ্বানে যে পুরুষেরা কী ভাবে সাড়া দিবেন তাহা জানি না— কিন্তু আমাদের অন্তঃপুরেও কি এই আহ্বান প্রবেশ করে নাই। আমরা কি আমাদের মাতৃভূমির কন্যা নহি। দেশের অপমান কি আমাদের অপমান নহে। দেশের দুঃখ কি আমাদের গৃহপ্রাচীরের পাষাণ ভেদ করিতে পারিবে না।

ভগিনীগণ, আপনারা হয়তো কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিবেন, আমরা স্ত্রীলোক, আমরা কী করিতে পারি— দুঃখের দিনে নীরবে অশ্রুবর্ষণ করাই আমাদের সম্বল।

এ-কথা আমি স্বীকার করিতে পারিব না। আমরা যে কী না করিতেছি, তাই দেখুন। আমরা পরনের শাড়ি কিনিতেছি বিলাত হইতে, আমাদের অনেকের ভূষণ জোগাইতেছে হ্যামিল্টন, আমাদের গৃহসজ্জা বিলাতি দোকানের, আমরা শয়নে স্বপনে বিলাতের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আছি। আমরা এতদিন আমাদের জননীর অন্ন কাড়িয়া তাঁহার ভূষণ ছিনাইয়া বিলাত-দেবতার পায়ে রাশি রাশি অর্ঘ্য জোগাইতেছি।

আমরা লড়াই করিতে যাইব না, আমরা ভিক্ষা করিতেও ফিরিব না, কিন্তু আমরা কি এ-কথা বলিতে পারিব না যে, "না, আর নয়— আমাদের এই অপমানিত উপবাস-ক্লিষ্ট মাতৃভূমির অন্নের গ্রাস বিদেশের পাতে তুলিয়া দিয়া তাহার পরিবর্তে আমাদের বেশভূষার শখ মিটাইব না? আমরা ভালো হউক, মন্দ হউক, দেশের কাপড় পরিব, দেশের জিনিস ব্যবহার করিব।"

ভগিনীগণ, সৌন্দর্যচর্চার দোহাই দিবেন না! সৌন্দর্যবোধ অতি উত্তম পদার্থ, কিন্তু তাহার চেয়েও উচ্চ জিনিস আছে। আমি এ-কথা স্বীকার করিব না, যে, দেশী জিনিসে আমাদের সৌন্দর্যবোধ ক্লিষ্ট হইবে; কিন্তু যদি শিক্ষা ও অভ্যাসক্রমে আমাদের সেই রূপই ধারণা হয়, তবে এই কথা বলিব, সৌন্দর্যবোধকেই সকলের চেয়ে বড়ো

করিবার দিন আজ নহে— সন্তান যখন দীর্ঘকাল রোগশয্যায় শায়িত তখন জননী বেনারসি শাড়িখানা বেচিয়া তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে কুণ্ঠিত হন না— তখন কোথায় থাকে সৌন্দর্যবোধের দাবি?

জানি, আমাকে অনেকে বলিবেন, কথাটা বলিতে যত সহজ করিতে তত সহজ নহে। আমাদের অভ্যাস, আমাদের সংস্কার, আমাদের আরামস্পৃহা, আমাদের সৌন্দর্যবোধ— ইহাদিগকে ঠেলিয়া নড়ানো বড়ো কম কথা নহে।

নিশ্চয়ই তাহা নহে। ইহা সহজ নহে, ইহার চেয়ে একদিনের মতো চাঁদার খাতায় সহি দেওয়া সহজ। কিন্তু বড়ো কাজ সহজে হয় না। যখন সময় আসে তখন ধর্মের শঙ্খ বাজিয়া উঠে, তখন যাহা কঠিন তাহাকেই বরণ করিয়া লইতে হয়। বস্তুত, তাহাতেই আনন্দ,—সহজ নহে বলিয়াই আনন্দ, দুঃসাধ্য বলিয়াই সুখ।

আমরা ইতিহাসে পড়িয়াছি, যুদ্ধের সময় রাজপুত মহিলারা অঙ্গের ভূষণ, মাথার কেশ দান করিয়াছে; তখন সুবিধা বা সৌন্দর্যচর্চার কথা ভাবে নাই—ইহা হইতে আমরা এই শিখিয়াছি যে, জগতে স্ত্রীলোক যদি বা যুদ্ধ না করিয়া থাকে, ত্যাগ করিয়াছে; সময় উপস্থিত হইলে ভূষণ হইতে প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। কর্মের বীর্য অপেক্ষা ত্যাগের বীর্য কোনো অংশেই ন্যূন নহে। ইহা যখন ভাবি তখন মনে এই গৌরব জন্মে যে, এই বিচিত্রশক্তিচালিত সংসারে স্ত্রীলোককে লজ্জিত হইতে হয় নাই; স্ত্রীলোক কেবল সৌন্দর্য দ্বারা মনোহরণ করে নাই, ত্যাগের দ্বারা শক্তি দেখাইয়াছে।

আজ আমাদের বঙ্গদেশ রাজশক্তির নির্দয় আঘাতে বিক্ষত হইয়াছে, আজ বঙ্গরমণীদের ত্যাগের দিন। আজ আমরা ব্রতগ্রহণ করিব। আজ আমরা কোনো ক্লেশকে ডরিব না, উপহাসকে অগ্রাহ্য করিব, আজ আমরা পীড়িত জননীর রোগশয্যায় বিলাতের সাজ পরিয়া শৌখিনতা করিতে যাইব না।

দেশের জিনিসকে রক্ষা করা, এও তো রমণীর একটা বিশেষ কাজ। আমরা ভালোবাসিতে জানি! ভালোবাসা চাকচিক্যে ভুলিয়া নূতনের কুহকে চারিদিকে ধাবমান হয় না। আমাদের যাহা আপন, সে সুশ্রী হউক আর কুশ্রী হউক, নারীর কাছে অনাদর পায় না— সংসার তাই রক্ষা পাইতেছে।

একবার ভাবিয়া দেখুন, আজ যে বঙ্গসাহিত্য বলিষ্ঠভাবে অসংকোচে মাথা তুলিতে পারিয়াছে, একদিন শিক্ষিত পুরুষসমাজে ইহার অবজ্ঞার সীমা ছিল না। তখন পুরুষেরা বাংলা বই কিনিয়া লজ্জার সহিত কৈফিয়ত দিতেন যে, আমরা পড়িব না, বাড়ির ভিতরে মেয়েরা পড়িবে। আচ্ছা আচ্ছা, তাঁহাদের সে-লজ্জার ভার আমরাই বহন

করিয়াছি, কিন্তু ত্যাগ করি নাই। আজ তো সে-লজ্জার দিন ঘুচিয়াছে! যে বাড়ির ভিতরে মেয়েদের কোলে বাংলাদেশের শিশুসন্তানেরা— তাহারা কালোই হউক আর ধলোই হউক— পরম আদরে মানুষ হইয়া উঠিতেছে, বঙ্গসাহিত্যও সেই বাড়ির ভিতরে মেয়েদের কোলেই তাহার উপেক্ষিত শিশু-অবস্থা যাপন করিয়াছে, অন্নবস্ত্রের দুঃখ পায় নাই।

একবার ভাবিয়া দেখুন, যেখানে বাঙালি পুরুষ বিলাতি কাপড় পরিয়া সর্বত্র নিঃসংকোচে আপনাকে প্রচার করিতেছেন সেখানে তাঁহার স্ত্রীকন্যাগণ বিদেশী বেশ ধারণ করিতে পারেন নাই। স্ত্রীলোক যে উৎকট বিজাতীয় বেশে আপনাকে সজ্জিত করিয়া বাহির হইবে, ইহা আমাদের স্ত্রীপ্রকৃতির সঙ্গে এতই একান্ত অসংগত যে, বিলাতের মোহে আপাদমস্তক বিকাইয়াছেন যে-পুরুষ তিনিও আপন স্ত্রীকন্যাকে এই ঘোরতর লজ্জা হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

এই রক্ষণপালনের শক্তি স্ত্রীলোকের অন্তরতম শক্তি বলিয়াই দেশের দেশীয়ত্ব স্ত্রীলোকের মাতৃক্রোড়েই রক্ষা পায়। নূতনত্বের বন্যায় দেশের অনেক জিনিস, যাহা পুরুষ-সমাজ হইতে ভাসিয়া গেছে, তাহা আজও অন্তঃপুরের নিভৃত কক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আছে। এই বন্যার উপদ্রব একদিন যখন দূর হইবে তখন নিশ্চয়ই তাহাদের খোঁজ পড়িবে এবং দেশ রক্ষণপটু স্নেহশীল নারীদের নিকট কৃতজ্ঞ হইবে।

অতএব, আজ আমরা যদি আর-সমস্ত বিচার ত্যাগ করিয়া দেশের শিল্প, দেশের সামগ্রীকে অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত রক্ষা করি, তবে তাহাতে নারীর কর্তব্যপালন করা হইবে।

আমার মনে এ-আশঙ্কা আছে যে, আমাদের মধ্যেও অনেকে অবজ্ঞাপূর্ণ উপহাসের সহিত বলিবেন, "তোমরা কয়জনে দেশী জিনিস ব্যবহার করিবে প্রতিজ্ঞা করিলেই অমনি নাকি ম্যাঞ্চেস্টর ফতুর হইয়া যাইবে এবং লিভারপুর বাসায় গিয়া মরিয়া থাকিবে!"

সে-কথা জানি। ম্যাঞ্চেস্টরের কল চিরদিন ফুঁসিতে থাক্, রাবণের চিতার ন্যায় লিভারপুলের এঞ্জিনের আগুন না নিভুক! আমাদের অনেকে আজকাল যে বিলাতির পরিবর্তে দেশী জিনিস ব্যবহার করিতে ব্যগ্র হইয়াছেন, তাহার কারণ এ নয় যে, তাঁহারা বিলাতকে দেউলে করিয়া দিতে চান। বস্তুত, আমাদের এই-যে চেষ্টা ইহা কেবল আমাদের মনের ভাবকে বাহিরে মূর্তিমান করিয়া রাখিবার চেষ্টা। আমরা সহজে না হউক, অন্তত বারংবার আঘাতে ও অপমানে পরের বিরুদ্ধে নিজেকে যে বিশেষভাবে আপন বলিয়া জানিতে উৎসুক হইয়া উঠিয়াছি, সেই ঔৎসুক্যকে যে কায়ে-মনে-বাক্যে প্রকাশ করিতে হইবে— নতুবা দুই দিনেই তাহা যে বিস্মৃত ও ব্যর্থ হইয়া

যাইবে। আমাদের মন্ত্রও চাই, চিহ্নও চাই। আমরা অন্তরে স্বদেশকে বরণ করিব এবং বাহিরে স্বদেশের চিহ্ন ধারণ করিব।

বিদেশীয় রাজশক্তির সহিত আমাদের স্বাভাবিক পার্থক্য ও বিরোধ ক্রমশই সুস্পষ্টরূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। আজ আর ইহাকে ঢাকিয়া রাখিবে কে। রাজাও পারিলেন না, আমরাও পারিলাম না। এই বিরোধ যে ঈশ্বরের প্রেরিত। এই বিরোধ ব্যতীত আমরা প্রবলরূপে, যথার্থরূপে আপনাকে লাভ করিতে পারিতাম না। আমরা যতদিন প্রসাদভিক্ষার আশে একান্তভাবে এই-সকল বিদেশীর মুখ চাহিয়া থাকিতাম ততদিন আমরা উত্তরোত্তর আপনাকে নিঃশেষভাবে হারাইতেই থাকিতাম। আজ বিরোধের আঘাতে বেদনা পাইতেছি, অসুবিধা ভোগ করিতেছি, সকলই সত্য, কিন্তু নিজেকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করিবার পথে দাঁড়াইয়াছি। যতদিন পর্যন্ত এই লাভ সম্পূর্ণ না হইবে ততদিন পর্যন্ত এই বিরোধ ঘুচিবে না; যতদিন পর্যন্ত আমরা নিজশক্তিকে আবিষ্কার না করিব, ততদিন পর্যন্ত পরশক্তির সহিত আমাদের সংঘর্ষ চলিতে থাকিবেই।

যে আপনার শক্তিকে খুঁজিয়া পায় নাই, যাহাকে নিরুপায়ভাবে পরের পশ্চাতে ফিরিতে হয়, ঈশ্বর করুন, সে যেন আরাম ভোগ না করে— সে যেন অহংকার অনুভব না করে! অপমান ও ক্লেশ তাহাকে সর্বদা যেন এই কথা স্মরণ করাইতে থাকে যে, "তোমার নিজের শক্তি নাই, তোমাকে ধিক্!" আমরা যে অপমানিত হইতেছি, ইহাতে বুঝিতে হইবে, ঈশ্বর এখনো আমাদিগকে ত্যাগ করেন নাই। কিন্তু আমরা আর বিলম্ব যেন না করি। আমরা নিজেকে ঈশ্বরের এই অভিপ্রায়ের অনুকূল যেন করিতে পারি। আমরা যেন পরের অনুকরণে আরাম এবং পরের বাজারে কেনা জিনিসে গৌরববোধ না করি। বিলাতি আসবাব পরিত্যাগ করিয়া আমাদের যদি কিছু কষ্ট হয়, তবে সে কষ্টই আমাদের মন্ত্রকে ভুলিতে দিবে না। সেই মন্ত্রটি এই—

> সর্বং পরবশং দুঃখং সর্বমাত্মবশং সুখম্।
>
> যাহা-কিছু পরবশ, তাহাই দুঃখ; যাহা-কিছু আত্মবশ, তাহাই সুখ।

আমাদের দেশের নারীগণ আত্মীয়স্বজনের আরোগ্যকামনা করিয়া দীর্ঘকালের জন্য কৃচ্ছ্রব্রত গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। নারীদের সেই তপঃসাধন বাঙালির সংসারে যে নিষ্ফল হইয়াছে, তাহা আমি মনে করি না। আজ আমরা দেশের নারীগণ দেশের জন্য যদি সেইরূপ ব্রত গ্রহণ করি, যদি বিদেশের বিলাস দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত পরিত্যাগ করি, তবে আমাদের এই তপস্যায় দেশের মঙ্গল হইবে— তবে এই স্বস্ত্যয়নে আমরা পুণ্যলাভ করিব এবং আমাদের পুরুষগণ শক্তি লাভ করিবেন।

কাটিয়া ফেলিয়া আপেল-গাছ রোপণ করিলে তবেই আমরা আশানুরূপ ফললাভ করিব। এই কথা নিশ্চয় জানিতে হইবে, আপেল-গাছে যে বেশি ফল ফলিতেছে তাহার কারণ তাহার গোড়ায়, তাহার মাটিতে সার আছে— আমাদের আমবাগানের জমির সার বহুকাল হইল নিঃশেষিত হইয়া গেছে। আপেল পাই না, ইহাই আমাদের মূল দুর্ভাগ্য নহে; মাটিতে সার নাই, ইহাই আক্ষেপের বিষয়। সেই সার যদি যথেষ্ট পরিমাণে থাকিত তবে আপেল ফলিত না, কিন্তু আম প্রচুর পরিমাণে ফলিত এবং তখন সেই আম্রের সফলতায় আপেলের অভাব লইয়া বিলাপ করিবার কথা আমাদের মনেই হইত না। তখন দেশের আম বেচিয়া অনায়াসে বিদেশের আপেল হাটে কিনিতে পারিতাম, ভিক্ষার ঝুলি সম্বল করিয়া একরাত্রে পরের প্রসাদে বড়োলোক হইবার দুরাশা মনের মধ্যে বহন করিতে হইত না।

আসল কথা, দেশের মাটিতে সার ফেলিতে হইবে। সেই সার আর কিছুই নহে— 'কিল বিদুর্বীরতাং সারমেকং', বীরতাকেই একমাত্র সার বলিয়া জানিবে। ঋষিরা বলিয়াছেন, 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'— এই যে আত্মা, ইনি বলহীনের দ্বারা লভ্য নহেন। বিশ্বাত্মা-পরমাত্মার কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক— যে-ব্যক্তি দুর্বল সে নিজের আত্মাকে পায় না, নিজের আত্মাকে যে-ব্যক্তি সম্পূর্ণ উপলব্ধি না করিয়াছে সে অপর কিছুকেই লাভ করিতে পারে না। য়ুরোপ নিজের আত্মাকে যে-পথ দিয়া লাভ করিতেছে সে-পথ আমাদের সম্মুখে নাই; কিন্তু যে-মূল্য দিয়া লাভ করিতেছে তাহা আমাদের পক্ষেও অত্যাবশ্যক— তাহা বল, তাহা বীর্য। য়ুরোপ যে-কর্মের দ্বারা যে-অবস্থার মধ্যে আত্মাকে উপলব্ধি করিতেছে আমরা সে-কর্মের দ্বারা সে-অবস্থার মধ্যে আত্মাকে উপলব্ধি করিব না— আমাদের সম্মুখে অন্য পথ, আমাদের চতুর্দিকে অন্যরূপ পরিবেষ, আমাদের অতীতের ইতিহাস অন্যরূপ, আমাদের শক্তির মূলসঞ্চয় অন্যত্র— কিন্তু আমাদের সেই বীর্য আবশ্যক যাহা থাকিলে পথকে ব্যবহার করিতে পারিব, পরিবেষকে অনুকূল করিতে পারিব, অতীতের ইতিহাসকে বর্তমানে সফল করিতে পারিব এবং শক্তির গূঢ় সঞ্চয়কে আবিষ্কৃত-উদ্‌ঘাটিত করিয়া তাহার অধিকারী হইতে পারিব। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'— আত্মা তো আছেই, কিন্তু বল নাই বলিয়া তাহাকে লাভ করিতে পারি না। ত্যাগ করিতে শক্তি নাই, দুঃখ পাইতে সাহস নাই, লক্ষ্য অনুসরণ করিতে নিষ্ঠা নাই; কৃশ সংকল্পের দৌর্বল্য, ক্ষীণ শক্তির আত্মবঞ্চনা, সুখবিলাসের ভীরুতা, লোকলজ্জা, লোকভয় আমাদিগকে মুহূর্তে মুহূর্তে যথার্থভাবে আত্মপরিচয় আত্মলাভ আত্মপ্রতিষ্ঠা হইতে দূরে রাখিতেছে। সেইজন্যই ভিক্ষুকের মতো আমরা অপরের মাহাত্ম্যের প্রতি ঈর্ষা

করিতেছি এবং মনে করিতেছি, বাহ্য অবস্থা যদি দৈবক্রমে অন্যের মতো হয় তবেই আমাদের সকল অভাব, সকল লজ্জা দূর হইতে পারে।

বিদেশের ইতিহাস যদি আমরা ভালো করিয়া পড়িয়া দেখি তবে দেখিতে পাইব, মহত্ত্ব কত বিচিত্র প্রকারের— গ্রীসের মহত্ত্ব এবং রোমের মহত্ত্ব একজাতীয় নহে— গ্রীস বিদ্যা ও বিজ্ঞানে বড়ো, রোম কর্মে ও বিধিতে বড়ো। রোম তাহার বিজয়-পতাকা লইয়া যখন গ্রীসের সংস্রবে আসিল তখন বাহুবলে ও কর্মবিধিতে জয়ী হইয়াও বিদ্যাবুদ্ধিতে গ্রীসের কাছে হার মানিল, গ্রীসের কলাবিদ্যা ও সাহিত্য-বিজ্ঞানের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু তবু সে রোমই রহিল, গ্রীস হইল না— সে আত্মপ্রকৃতিতেই সফল হইল, অনুকৃতিতে নহে— সে লোকসংস্থানকার্যে জগতের আদর্শ হইল, সাহিত্য-বিজ্ঞান-কলাবিদ্যায় হইল না।

ইহা হইতে বুঝিতে হইবে, উৎকর্ষের একমাত্র আকার ও একমাত্র উপায় জগতে নাই। আজ য়ুরোপীয় প্রতাপের যে-আদর্শ আমাদের চক্ষের সমক্ষে অভ্রভেদী হইয়া উঠিয়াছে, উন্নতি তাহা ছাড়াও সম্পূর্ণ অন্য আকারে হইতে পারে— আমাদের ভারতীয় উৎকর্ষের যে-আদর্শ আমরা দেখিয়াছি তাহার মধ্যে প্রাণসঞ্চার বলসঞ্চার করিলে জগতের মধ্যে আমাদিগকে লজ্জিত থাকিতে হইবে না। একদিন ভারতবর্ষ জ্ঞানের দ্বারা ধর্মের দ্বারা চীন-জাপান, ব্রহ্মদেশ-শ্যামদেশ, তিব্বত-মঙ্গোলিয়া, এশিয়া মহাদেশের অধিকাংশই জয় করিয়াছিল; আজ য়ুরোপ অস্ত্রের দ্বারা বাণিজ্যের দ্বারা পৃথিবী জয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে— আমরা ইস্কুলে পড়িয়া এই আধুনিক য়ুরোপের প্রণালীকেই যেন একমাত্র গৌরবের কারণ বলিয়া মনে না করি।

কিন্তু ইংরেজের বাহুবল নহে— ইংরেজের ইস্কুল ঘরে-বাইরে, দেহে-মনে, আচারে বিচারে সর্বত্র আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। আমাদিগকে যে-সকল বিজাতীয় সংস্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন করিতেছে তাহাতে অন্তত কিছুকালের জন্যও আমাদের আত্মপরিচয়ের পথ লোপ করিতেছে। সে-আত্মপরিচয় ব্যতীত আমাদের কখনোই আত্মোন্নতি হইতে পারে না।

ভারতবর্ষের দেশীয় রাজ্যগুলির যথার্থ উপযোগিতা কী, তাহা এইবার বলিবার সময় উপস্থিত হইল।

দেশবিদেশের লোক বলিতেছে, ভারতবর্ষের দেশীয় রাজ্যগুলি পিছাইয়া পড়িতেছে। জগতের উন্নতির যাত্রাপথে পিছাইয়া পড়া ভালো নহে, এ-কথা সকলেই স্বীকার করিবে, কিন্তু অগ্রসর হইবার সকল উপায়ই সমান মঙ্গলকর নহে। নিজের শক্তির দ্বারাই অগ্রসর হওয়াই যথার্থ অগ্রসর হওয়া— তাহাতে যদি মন্দগতিতে

যাওয়া যায় তবে সেও ভালো। অপর ব্যক্তির কোলে-পিঠে চড়িয়া অগ্রসর হওয়ার কোনো মাহাত্ম্য নাই— কারণ, চলিবার শক্তিলাভই যথার্থ লাভ, অগ্রসর হওয়ামাত্রই লাভ নহে। ব্রিটিশ-রাজ্যে আমরা যেটুকু অগ্রসর হইতে পারিয়াছি তাহাতে আমাদের কৃতকার্যতা কতটুকু! সেখানকার শাসনরক্ষণ-বিধিব্যবস্থা যত ভালোই হউক না কেন, তাহা তো বস্তুত আমাদের নহে। মানুষ ভুলত্রুটি-ক্ষতিক্লেশের মধ্য দিয়াই পূর্ণতার পথে অগ্রসর হয়। কিন্তু আমাদিগকে ভুল করিতে দিবার ধৈর্য যে ব্রিটিশ-রাজের নাই। সুতরাং তাঁহারা আমাদিগকে ভিক্ষা দিতে পারেন, শিক্ষা দিতে পারেন না। তাঁহাদের নিজের যাহা আছে তাহার সুবিধা আমাদিগকে দিতে পারেন, কিন্তু তাহার স্বত্ব দিতে পারেন না। মনে করা যাক, কলিকাতা ম্যুনিসিপ্যালিটির পূর্ববর্তী কমিশনারগণ পৌরকার্যে স্বাধীনতা পাইয়া যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই, সেই অপরাধে অধীর হইয়া কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের স্বাধীনতা হরণ করিলেন। হইতে পারে এখন কলিকাতার পৌরকার্য পূর্বের চেয়ে ভালোই চলিতেছে, কিন্তু এরূপ ভালো চলাই যে সর্বাপেক্ষা ভালো, তাহা বলিতে পারি না। আমাদের নিজের শক্তিতে ইহা অপেক্ষা খারাপ চলাও আমাদের পক্ষে ইহার চেয়ে ভালো। আমরা গরিব এবং নানা বিষয়ে অক্ষম; আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্য ধনী জ্ঞানী বিলাতের বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত তুলনীয় নহে বলিয়া শিক্ষাবিভাগে দেশীয় লোকের কর্তৃত্ব খর্ব করিয়া রাজা যদি নিজের জোরে কেমব্রিজ-অক্‌সফোর্ডের নকল প্রতিমা গড়িয়া তোলেন, তবে তাহাতে আমাদের কতটুকুই বা শ্রেয় আছে— আমরা গরিবের যোগ্য বিদ্যালয় যদি নিজে গড়িয়া তুলিতে পারি তবে সেই আমাদের সম্পদ। যে-ভালো আমার আয়ত্ত ভালো নহে সে-ভালোকে আমার মনে করাই মানুষের পক্ষে বিষম বিপদ। অল্পদিন হইল একজন বাঙালি ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট দেশীয় রাজ্যশাসনের প্রতি নিতান্ত অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেছিলেন— তখন স্পষ্টই দেখিতে পাইলাম, তিনি মনে করিতেছেন, ব্রিটিশ-রাজ্যের সুব্যবস্থা সমস্তই যেন তাঁহাদেরই সুব্যবস্থা; তিনি যে ভারবাহীমাত্র, তিনি যে যন্ত্রী নহেন, যন্ত্রের একটা সামান্য অঙ্গমাত্র, এ-কথা যদি তাঁহার মনে থাকিত তবে দেশীয় রাজ্যব্যবস্থার প্রতি এমন স্পর্ধার সহিত অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে পারিতেন না। ব্রিটিশ-রাজ্যে আমরা যাহা পাইতেছি তাহা যে আমাদের নহে, এই সত্যটি ঠিকমতো বুঝিয়া উঠা আমাদের পক্ষে কঠিন হইয়াছে, এই কারণেই আমরা রাজার নিকট হইতে ক্রমাগতই নূতন নূতন অধিকার প্রার্থনা করিতেছি এবং ভুলিয়া যাইতেছি— অধিকার পাওয়া এবং অধিকারী হওয়া একই কথা নহে।

দেশীয় রাজ্যের ভুলত্রুটি-মন্দগতির মধ্যেও আমাদের সান্ত্বনার বিষয় এই যে, তাহাতে যেটুকু লাভ আছে তাহা বস্তুতই আমাদের নিজের লাভ। তাহা পরের স্কন্ধে চড়িবার লাভ নহে, তাহা নিজের পায়ে চলিবার লাভ। এই কারণেই আমাদের বাংলাদেশের এই ক্ষুদ্র ত্রিপুররাজ্যের প্রতি উৎসুক দৃষ্টি না মেলিয়া আমি থাকিতে পারি না। এই কারণেই এখানকার রাজ্যব্যবস্থার মধ্যে যে-সকল অভাব ও বিঘ্ন দেখিতে পাই তাহাকে আমাদের সমস্ত বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য বলিয়া জ্ঞান করি। এই কারণেই এখানকার রাজ্যশাসনের মধ্যে যদি কোনো অসম্পূর্ণতা বা শৃঙ্খলতার অভাব দেখি তবে তাহা লইয়া স্পর্ধাপূর্বক আলোচনা করিতে আমার উৎসাহ হয় না— আমার মাথা হেঁট হইয়া যায়। এই কারণে, যদি জানিতে পাই, তুচ্ছ স্বার্থপরতা আপনার সামান্য লাভের জন্য, উপস্থিত ক্ষুদ্র সুবিধার জন্য, রাজশ্রীর মন্দিরভিত্তিকে শিথিল করিয়া দিতে কুণ্ঠিত হইতেছে না, তবে সেই অপরাধকে আমি ক্ষুদ্র রাজ্যের একটি ক্ষুদ্র ঘটনা বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। এই দেশীয় রাজ্যের লজ্জাকেই যদি যথার্থরূপে আমাদের লজ্জা এবং ইহার গৌরবকেই যদি যথার্থরূপে আমাদের গৌরব বলিয়া না বুঝি, তবে দেশের সম্বন্ধে আমরা ভুল বুঝিয়াছি।

পূর্বেই বলিয়াছি, ভারতীয় প্রকৃতিকেই বীর্যের দ্বারা সবল করিয়া তুলিলে তবেই আমরা যথার্থ উৎকর্ষলাভের আশা করিতে পারিব। ব্রিটিশ-রাজ ইচ্ছা করিলেও এ-সম্বন্ধে আমাদিগকে সাহায্য করিতে পারেন না। তাঁহারা নিজের মহিমাকেই এক-মাত্র মহিমা বলিয়া জানেন— এই কারণে, ভালোমনেও তাঁহারা আমাদিগকে যে-শিক্ষা দিতেছেন তাহাতে আমরা স্বদেশকে অবজ্ঞা করিতে শিখিতেছি। আমাদের মধ্যে যাঁহারা পেট্রিয়ট বলিয়া বিখ্যাত তাঁহাদের অনেকেই এই অবজ্ঞাকারীদের মধ্যে অগ্রগণ্য। এইরূপে যাঁহারা ভারতকে অন্তরের সহিত অবজ্ঞা করেন তাঁহারাই ভারতকে বিলাত করিবার জন্য উৎসুক— সৌভাগ্যক্রমে তাঁহাদের এই অসম্ভব আশা কখনোই সফল হইতে পারিবে না।

আমাদের দেশীয় রাজ্যগুলি পিছাইয়া পড়িয়া থাকুক আর যাহাই হউক, এইখানেই স্বদেশের যথার্থ স্বরূপকে আমরা দেখিতে চাই। বিকৃতি-অনুকৃতির মহামারী এখানে প্রবেশলাভ করিতে না পারুক, এই আমাদের একান্ত আশা। ব্রিটিশ-রাজ আমাদের উন্নতি চান, কিন্তু সে-উন্নতি ব্রিটিশ মতে হওয়া চাই। সে-অবস্থায় জলপদ্মের উন্নতি-প্রণালী স্থলপদ্মে আরোপ করা হয়। কিন্তু দেশীয় রাজ্যে স্বভাবের অব্যাহত নিয়মে দেশ উন্নতিলাভের উপায় নির্ধারণ করিবে, ইহাই আমাদের কামনা।

ইহার কারণ এ নয় যে, ভারতের সভ্যতাই সকল সভ্যতার শ্রেষ্ঠ। য়ুরোপের

সভ্যতা মানবজাতিকে যে-সম্পত্তি দিতেছে তাহা যে মহামূল্য, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা ধৃষ্টতা।

অতএব, য়ুরোপীয় সভ্যতাকে নিকৃষ্ট বলিয়া বর্জন করিতে হইবে, এ-কথা আমার বক্তব্য নহে— তাহা আমাদের পক্ষে অস্বাভাবিক বলিয়াই, অসাধ্য বলিয়াই স্বদেশী আদর্শের প্রতি আমাদের মন দিতে হইবে— উভয় আদর্শের তুলনা করিয়া বিবাদ করিতে আমার প্রবৃত্তি নাই, তবে এ-কথা বলিতেই হইবে, যে, উভয় আদর্শই মানবের পক্ষে অত্যাবশ্যক।

সেদিন এখানকার কোনো ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন যে, গবর্মেণ্ট আর্ট স্কুলের গ্যালারি হইতে বিলাতি ছবি বিক্রয় করিয়া ফেলা কি ভালো হইয়াছে।

আমি তাহাতে উত্তর করিয়াছিলাম যে, ভালোই হইয়াছে। তাহার কারণ এ নয় যে, বিলাতি চিত্রকলা উৎকৃষ্ট সামগ্রী নহে। কিন্তু সেই চিত্রকলাকে এত সস্তায় আয়ত্ত করা চলে না। আমাদের দেশে সেই চিত্রকলার যথার্থ আদর্শ পাইব কোথায়। দুটো লক্ষ্নৌ-ঠুংরি ও 'হিলিমিলি পনিয়া' শুনিয়া যদি কোনো বিলাতবাসী ইংরেজ ভারতীয়-সংগীতবিদ্যা আয়ত্ত করিতে ইচ্ছা করে, তবে বন্ধুর কর্তব্য তাহাকে নিরস্ত করা। বিলাতি বাজারের কতকগুলি সুলভ আবর্জনা এবং সেই সঙ্গে দুটি একটি ভালো ছবি চোখের সামনে রাখিয়া আমরা চিত্রবিদ্যার যথার্থ আদর্শ কেমন করিয়া পাইব। এই উপায়ে আমরা যেটুকু শিখি তাহা যে কত নিকৃষ্ট, তাহাও ঠিকমতো বুঝিবার উপায় আমাদের দেশে নাই। যেখানে একটা জিনিসের আগাগোড়া নাই, কেবল কতকগুলা খাপছাড়া দৃষ্টান্ত আছে মাত্র, সেখানে সে-জিনিসের পরিচয়লাভের চেষ্টা করা বিড়ম্বনা। এই অসম্পূর্ণ শিক্ষায় আমাদের দৃষ্টি নষ্ট করিয়া দেয়— পরের দেশের ভালোটা তো শিখিতেই পারি না, নিজের দেশের ভালোটা দেখিবার শক্তি চলিয়া যায়।

আর্ট স্কুলে ভর্তি হইয়াছি, কিন্তু আমাদের দেশে শিল্পকলার আদর্শ যে কী তাহা আমরা জানিই না। যদি শিক্ষার দ্বারা ইহার পরিচয় পাইতাম তবে যথার্থ একটা শক্তিলাভ করিবার সুবিধা হইত। কারণ, এ-আদর্শ দেশের মধ্যেই আছে— একবার যদি আমাদের দৃষ্টি খুলিয়া যায় তবে ইহাকে আমাদের সমস্ত দেশের মধ্যে, থালায়, ঘটিতে, বাটিতে, ঝুড়িতে, চুপড়িতে, মন্দিরে, মঠে, বসনে, ভূষণে, পটে, গৃহভিত্তিতে নানা-অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-পরিপূর্ণ একটি সমগ্র মূর্তিরূপে দেখিতে পাইতাম; ইহার প্রতি আমাদের সচেষ্ট চিত্তকে প্রয়োগ করিতে পারিতাম; পৈতৃক সম্পত্তি লাভ করিয়া তাহাকে ব্যবসায়ে খাটাইতে পারিতাম।

এই কারণে, আমাদের শিক্ষার অবস্থায় বিলাতী চিত্রের মোহ জোর করিয়া ভাঙিয়া দেওয়া ভালো। নহিলে নিজের দেশে কী আছে তাহা দেখিতে মন যায় না— কেবলই অবজ্ঞায় অন্ধ হইয়া যে-ধন ঘরের সিন্দুকে আছে তাহাকে হারাইতে হয়।

আমরা দেখিয়াছি, জাপানের একজন সুবিখ্যাত চিত্ররসজ্ঞ পণ্ডিত এ-দেশের কীটদষ্ট কয়েকটি পটের ছবি দেখিয়া বিস্ময়ে পুলকিত হইয়াছেন— তিনি একখানি পট এখান হইতে লইয়া গেছেন, সেখানি কিনিবার জন্য জাপানের অনেক গুণজ্ঞ তাঁহাকে অনেক মূল্য দিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু তিনি বিক্রয় করেন নাই।

আমরা ইহাও দেখিয়াছি, য়ুরোপের বহুতর রসজ্ঞ ব্যক্তি আমাদের অখ্যাত দোকানবাজার ঘাঁটিয়া মলিন ছিন্ন কাগজের চিত্রপট বহুমূল্য সম্পদের ন্যায় সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতেছেন। সে-সকল চিত্র দেখিলে আমাদের আর্ট স্কুলের ছাত্রগণ নাসাকুঞ্চন করিয়া থাকেন। ইহার কারণ কী। ইহার কারণ এই; কলাবিদ্যা যথার্থভাবে যিনি শিখিয়াছেন তিনি বিদেশের অপরিচিত রীতির চিত্রের সৌন্দর্যও ঠিকভাবে দেখিতে পান— তাঁহার একটি শিল্পদৃষ্টি জন্মে। আর, যাহারা কেবল নকল করিয়া শেখে তাহারা নকলের বাহিরে কিছুই দেখিতে পায় না।

আমরা যদি নিজের দেশের শিল্পকলাকে সমগ্রভাবে যথার্থভাবে দেখিতে শিখিতাম, তবে আমাদের সেই শিল্পদৃষ্টি শিল্পজ্ঞান জন্মিত যাহার সাহায্যে শিল্পসৌন্দর্যের দিব্য-নিকেতনের সমস্ত দ্বার আমাদের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইয়া যাইত। কিন্তু বিদেশী শিল্পের নিতান্ত অসম্পূর্ণ শিক্ষায়, আমরা যাহা পাই নাই তাহাকে পাইয়াছি বলিয়া মনে করি, যাহা পরের তহবিলেই রহিয়া গেছে তাহাকে নিজের সম্পদ জ্ঞান করিয়া অহংকৃত হইয়া উঠি।

'পিয়ের লোটি' ছদ্মনামধারী বিখ্যাত ফরাসি ভ্রমণকারী ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিতে আসিয়া আমাদের দেশের রাজনিকেতনগুলিতে বিলাতি আসবাবের ছড়াছড়ি দেখিয়া হতাশ হইয়া গেছেন। তিনি বুঝিয়াছেন যে, বিলাতি আসবাবখানার নিতান্ত ইতরশ্রেণীর সামগ্রীগুলি ঘরে সাজাইয়া আমাদের দেশের বড়ো বড়ো রাজারা নিতান্তই অশিক্ষা ও অজ্ঞতা বশতই গৌরব করিয়া থাকেন। বস্তুত বিলাতি সামগ্রীকে যথার্থভাবে চিনিতে শেখা বিলাতেই সম্ভবে। সেখানে শিল্পকলা সজীব, সেখানে শিল্পীরা প্রত্যহ নব নব রীতি সৃজন করিতেছেন, সেখানে বিচিত্র শিল্পপদ্ধতির কালপরম্পরাগত ইতিহাস আছে, তাহার প্রত্যেকটির সহিত বিশেষ দেশকালপাত্রের সংগতি সেখানকার গুণী লোকেরা জানেন— আমরা তাহার কিছুই না জানিয়া কেবল টাকার থলি লইয়া মূর্খ দোকানদারের সাহায্যে অন্ধভাবে কতকগুলা খাপছাড়া

জিনিসপত্র লইয়া ঘরের মধ্যে পুঞ্জীভূত করিয়া তুলি— তাহাদের সম্বন্ধে বিচার করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে।

এই আসবাবের দোকান যদি লর্ড কর্জন বলপূর্বক বন্ধ করিয়া দিতে পারিতেন তবে দায়ে পড়িয়া আমরা স্বদেশী সামগ্রীর মর্যাদা রক্ষা করিতে বাধ্য হইতাম— তাহা হইলে টাকার সাহায্যে জিনিস-ক্রয়ের চর্চা বন্ধ হইয়া রুচির চর্চা হইত। তাহা হইলে ধনীগৃহে প্রবেশ করিয়া দোকানের পরিচয় পাইতাম না, গৃহস্থের নিজের শিল্পজ্ঞানের পরিচয় পাইতাম। ইহা আমাদের পক্ষে যথার্থ শিক্ষা, যথার্থ লাভের বিষয় হইত। এরূপ হইলে আমাদের অন্তরে-বাহিরে, আমাদের স্থাপত্যে-ভাস্কর্যে, আমাদের গৃহভিত্তিতে, আমাদের পণ্যবীথিকায় আমরা স্বদেশকে উপলব্ধি করিতাম।

দুর্ভাগ্যক্রমে সকল দেশেরই ইতরসম্প্রদায় অশিক্ষিত। সাধারণ ইংরেজের শিল্পজ্ঞান নাই— সুতরাং তাহারা স্বদেশী সংস্কারের দ্বারা অন্ধ। তাহারা আমাদের কাছে তাহাদেরই অনুকরণ প্রত্যাশা করে। আমাদের বসিবার ঘরে তাহাদের দোকানের সামগ্রী দেখিলে তবেই আরাম বোধ করে— তবেই মনে করে, আমরা তাহাদেরই ফরমায়েশে-তৈরি সভ্যপদার্থ হইয়া উঠিয়াছি। তাহাদেরই অশিক্ষিত রুচি-অনুসারে আমাদের দেশের প্রাচীন শিল্পসৌন্দর্য স্থূলভ ও ইতর অনুকরণকে পথ ছাড়িয়া দিতেছে। এ-দেশের শিল্পীরা বিদেশী টাকার লোভে বিদেশী রীতির অদ্ভুত নকল করিতে প্রবৃত্ত হইয়া চোখের মাথা খাইতে বসিয়াছে।

যেমন শিল্পে তেমনি সকল বিষয়েই। আমরা বিদেশী প্রণালীকেই একমাত্র প্রণালী বলিয়া বুঝিতেছি। কেবল বাহিরের সামগ্রীতে নহে, আমাদের মনে, এমন কি, হৃদয়ে নকলের বিষবীজ প্রবেশ করিতেছে। দেশের পক্ষে এমন বিপদ আর হইতেই পারে না।

এই মহাবিপদ হইতে উদ্ধারের জন্য একমাত্র দেশীয় রাজ্যের প্রতি আমরা তাকাইয়া আছি। এ-কথা আমরা বলি না যে, বিদেশী সামগ্রী আমরা গ্রহণ করিব না। গ্রহণ করিতেই হইবে, কিন্তু দেশীয় আধারে গ্রহণ করিব। পরের অস্ত্র কিনিতে নিজের হাতখানা কাটিয়া ফেলিব না। একলব্যের মতো ধনুর্বিদ্যার গুরুদক্ষিণাস্বরূপ নিজের দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দান করিব না। এ-কথা মনে রাখিতেই হইবে, নিজের প্রকৃতিকে লঙ্ঘন করিলে দুর্বল হইতে হয়। ব্যাঘ্রের আহার্য পদার্থ বলকারক সন্দেহ নাই, কিন্তু হস্তী তাহার প্রতি লোভ করিলে নিশ্চিত মরিবে। আমরা লোভবশত প্রকৃতির প্রতি ব্যভিচার যেন না করি। আমাদের ধর্মে-কর্মে ভাবে-ভঙ্গীতে প্রত্যহই তাহা করিতেছি, এইজন্য আমাদের সমস্যা

উত্তরোত্তর জটিল হইয়া উঠিতেছে—আমরা কেবলই অকৃতকার্য এবং ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িতেছি। বস্তুত জটিলতা আমাদের দেশের ধর্ম নহে। উপকরণের বিরলতা জীবনযাত্রার সরলতা আমাদের দেশের নিজস্ব— এইখানেই আমাদের বল, আমাদের প্রাণ, আমাদের প্রতিভা। আমাদের চণ্ডীমণ্ডপ হইতে বিলাতি কারখানাঘরের প্রভূত জঞ্জাল যদি ঝাঁট দিয়া না ফেলি, তবে দুই দিক হইতেই মরিব—অর্থাৎ বিলাতি কারখানাও এখানে চলিবে না, চণ্ডীমণ্ডপও বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিবে।

আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে এই কারখানাঘরের ধূমধূলিপূর্ণ বায়ু দেশীয় রাজ্যব্যবস্থার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে— সহজকে অকারণে জটিল করিয়া তুলিয়াছে, বাসস্থানকে নির্বাসন করিয়া দাঁড় করাইয়াছে। যাঁহারা ইংরেজের হাতে মানুষ হইয়াছেন তাঁহারা মনেই কবিতে পারেন না যে, ইংরেজের সামগ্রীকে যদি লইতেই হয় তবে তাহাকে আপন করিতে না পারিলে তাহাতে অনিষ্টই ঘটে—এবং আপন করিবার একমাত্র উপায় তাহাকে নিজের প্রকৃতির অনুকূলে পরিণত করিয়া তোলা, তাহাকে যথাযথ না রাখা। খাদ্য যদি খাদ্যরূপেই বরাবর থাকিয়া যায় তবে তাহাতে পুষ্টি দূরে থাক্, ব্যাধি ঘটে। খাদ্য যখন খাদ্যরূপ পরিহার করিয়া আমাদের রসরক্তরূপে মিলিয়া যায় এবং যাহা মিলিবার নহে পরিত্যক্ত হয় তখনই তাহা আমাদের প্রাণবিধান করে। বিলাতি সামগ্রী যখন আমাদের ভারতপ্রকৃতির দ্বারা জীর্ণ হইয়া তাহার আত্মরূপ ত্যাগ করিয়া আয়াদের কলেবরের সহিত একাত্ম হইয়া যায় তখনই তাহা আমাদের লাভের বিষয় হইতে পারে— যতক্ষণ তাহার উৎকট বিদেশীয়ত্ব অবিকৃত থাকে ততক্ষণ তাহা লাভ নহে। বিলাতি সরস্বতীর পোষ্যপুত্রগণ এ-কথা কোনোমতেই বুঝিতে পারেন না। পুষ্টিসাধনের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি নাই, বোঝাই করাকেই তাঁহারা পরমার্থ জ্ঞান করেন। এইজন্যই আমাদের দেশীয় রাজ্যগুলিও বিদেশী কার্যবিধির অসংগত অনাবশ্যক বিপুল জঞ্জালজালে নিজের শক্তিকে অকারণে ক্লিষ্ট করিয়া তুলিতেছে। বিদেশী বোঝাকে যদি অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারিতাম, যদি তাহাকে বোঝার মতো না দেখিতে হইত, রাজ্য যদি একটা আপিসমাত্র হইয়া উঠিবার চেষ্টায় প্রতিমুহূর্তে ঘর্মাক্তকলেবর হইয়া না উঠিত, যাহা সজীব হৃৎপিণ্ডের নাড়ির সহিত সম্বন্ধযুক্ত ছিল তাহাকে যদি কলের পাইপের সহিত-সংযুক্ত করা না হইত, তাহা হইলে আপত্তি করিবার কিছু ছিল না। আমাদের দেশের রাজ্য কেরানিচালিত বিপুল কারখানা নহে, নির্ভুল নিবিকার এঞ্জিন নহে— তাহার বিচিত্র সম্বন্ধসূত্রগুলি লৌহদণ্ড নহে, তাহা হৃদয়তন্তু— রাজলক্ষ্মী প্রতিমুহূর্তে তাহার কর্মের শুষ্কতার মধ্যে রসসঞ্চার করেন, কঠিনকে কোমল করেন, তুচ্ছকে সৌন্দর্যে মণ্ডিত

করিয়া দেন, দেনাপাওনার ব্যাপারকে কল্যাণের কান্তিতে উজ্জ্বল করিয়া তোলেন এবং ভুলত্রুটিকে ক্ষমার অশ্রুজলে মার্জনা করিয়া থাকেন। আমাদের মন্দভাগ্য আমাদের দেশীয় রাজ্যগুলিকে বিদেশী আপিসের ছাঁচের মধ্যে ঢালিয়া তাহাদিগকে কলরূপে বানাইয়া না তোলে, এই-সকল স্থানেই আমরা স্বদেশলক্ষ্মীর স্তন্যসিক্ত স্নিগ্ধ বক্ষঃস্থলের সজীব কোমল মাতৃস্পর্শ লাভ করিয়া যাইতে পারি— এই আমাদের কামনা। মা যেন এখানেও কেবল কতকগুলা ছাপমারা লেফাফার মধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া না থাকেন—দেশের ভাষা, দেশের সাহিত্য, দেশের শিল্প, দেশের রুচি, দেশের কান্তি এখানে যেন মাতৃকক্ষে আশ্রয়লাভ করে এবং দেশের শক্তি মেঘমুক্ত পূর্ণচন্দ্রের মতো আপনাকে অতি সহজে অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিতে পারে।

গ্রন্থ-পরিচয়

[রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে, মুদ্রিত গ্রন্থগুলির প্রথম সংস্করণ, বর্তমানে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রচলিত সংস্করণ, ও রচনাবলী-সংস্করণ, এই তিনটির পার্থক্য সংক্ষেপে ও সাধারণভাবে নির্দেশ করা গেল। পূর্ণতর তথ্যসংগ্রহ সর্বশেষ খণ্ডে একটি পঞ্জীতে সংকলিত হইবে।]

সোনার তরী

সোনার তরী ১৩০০ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

এই গ্রন্থের প্রথম কবিতা ‘সোনার তরী’র অর্থ-ব্যাখ্যা লইয়া একসময় অনেক বিসংবাদ হইয়াছে। কবি স্বয়ং নানা প্রসঙ্গে এই কবিতাটির যে-ব্যাখ্যা করিয়াছেন নিম্নে তাহা সংকলিত হইল।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে লিখিত একটি পত্রে (১৩৩৯) রবীন্দ্রনাথ ‘সোনার তরী’ কবিতার আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিতেছেন :

> এক জাতের কবিতা আছে যা লেখা হয় বাইরের দরজা বন্ধ করে। সেগুলো হয়তো অতীতের স্মৃতি বা অনাগতের প্রত্যাশা, বাসনার অতৃপ্তি বা আকাঙ্ক্ষার আবেগ, কিংবা রূপরচনার আগ্রহের উপর প্রতিষ্ঠিত। আবার এক জাতের কবিতা আছে যা মুক্তদ্বার অন্তরের সামগ্রী, বাইরের সমস্ত কিছুকে আপনার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে। যেমন সোনার তরী কবিতাটি। ছিলাম তখন পদ্মার বোটে। জলভারনত কালো মেঘ আকাশে, ওপারে ছায়াঘন তরুশ্রেণীর মধ্যে গ্রামগুলি, বর্ষার পরিপূর্ণ পদ্মা খরবেগে বয়ে চলেছে, মাঝে মাঝে পাক খেয়ে ছুটেছে ফেনা। নদী অকালে কূল ছাপিয়ে চরের ধান দিনে দিনে ডুবিয়ে দিচ্ছে। কাঁচা ধানে বোঝাই চাষীদের ডিঙিনৌকা হুহু করে স্রোতের উপর দিয়ে ভেসে চলেছে। ওই অঞ্চলে এই চরের ধানকে বলে জলি ধান। আর কিছু দিন হলেই পাকত।... ভরা পদ্মার উপরকার ওই বাদল-দিনের ছবি সোনার তরী কবিতার অন্তরে প্রচ্ছন্ন এবং তার ছন্দে প্রকাশিত।

সোনার তরী কবিতার কল্পনা-কাল শ্রাবণ ও রচনা-কাল ফাল্গুন, এ-সম্বন্ধে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

> তুমি পঞ্জিকা মিলিয়ে যদি কবিতার তাৎপর্য নির্ণয় করতে চাও তো বিপন্ন হবে। বুধবারের পর বৃহস্পতিবার আসে অত্যন্ত সাধারণ নিয়মে। সেটাকে অবজ্ঞা কোরো। আমাদের জীবনে সুতরাং সাহিত্যেও হয়তো কোনো-একটা বিশেষ বুধ বা বৃহস্পতিবার সপ্তাহ ডিঙিয়ে চব্বিশ ঘণ্টাকে উপেক্ষা করেই আসন রক্ষা করে। যেদিন বর্ষার অপরাহ্নে খরস্রোত পদ্মার উপর দিয়ে কাঁচা ধানে ডিঙিনৌকা বোঝাই করে মগ্নপ্রায় চর থেকে চাষীরা এপারে চলে আসছে সে দিনটা সন তারিখ মাস পার হয়ে আজো আমার মনে আছে। সেই দিনেই সোনার তরী কাব্যের সঞ্চার হয়েছিল মনে, তার প্রকাশ হয়েছিল কবে তা আমার মনেও নেই। এইরকম অবস্থায় ইতিহাসের ভুল হবারই কথা। কারণ, আমার মনে সোনার তরীর যে ইতিহাসটা সত্য হয়ে আছে সেটা হচ্ছে সেই শ্রাবণ-দিনের ইতিহাস, সেটা কোন্ তারিখে লিখিত হয়েছিল সেইটেই আকস্মিক— সেদিনটা বিশেষ দিন নয়, সে দিনটা আমার স্মৃতিপটে কোনো চিহ্ন দিয়েই যায়নি। অতএব আমার ইতিহাসে আর তোমাদের ইতিহাসে এইখানে বাদপ্রতিবাদ হবেই, দুর্ভাগ্যক্রমে তোমাদের হাতে দলিল আছে, আমার হাতে নেই। আদালতে তোমাদেরই জিৎ রইল। আমার দলিলের তারিখ কবিতার অভ্যন্তরেই আছে,— "শ্রাবণ-গগন ঘিরে ঘন-মেঘ ঘুরে ফিরে।" তুমি বলবে ওটা কাল্পনিক, আমি বলব তোমাদের তারিখটা রিয়ালিস্টিক।

'শান্তিনিকেতন' সপ্তম খণ্ডে মুদ্রিত 'তরী বোঝাই' শীর্ষক উপদেশ-ভাষণে (৪ চৈত্র, ১৩১৫) রবীন্দ্রনাথ সোনার তরী কবিতার মর্মব্যাখ্যা করিয়াছেন :

> সোনার তরী বলে একটা কবিতা লিখেছিলুম, এই উপলক্ষ্যে তার একটা মানে বলা যেতে পারে।
>
> মানুষ সমস্ত জীবন ধরে ফসল চাষ করছে। তার জীবনের খেতটুকু দ্বীপের মতো— চারিদিকেই অব্যক্তের দ্বারা সে বেষ্টিত— ওই একটুখানি তার কাছে ব্যক্ত হয়ে আছে— সেইজন্য গীতা বলেছেন—
>
> অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্ত মধ্যানি ভারত
> অব্যক্ত নিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা।

> যখন কাল ঘনিয়ে আসছে, যখন চারিদিকের জল বেড়ে উঠছে, যখন আবার অব্যক্তের মধ্যে তার ওই চরটুকু তলিয়ে যাবার সময় হল— তখন তার সমস্ত জীবনের কর্মের যা কিছু নিত্য ফল তা ওই সংসারের তরণীতে বোঝাই করে দিতে পারে। সংসার সমস্তই নেবে, একটি কণাও ফেলে দেবে না— কিন্তু যখন মানুষ বলে, ওই সঙ্গে আমাকেও নাও, আমাকেও রাখো, তখন সংসার বলে, তোমার জন্যে জায়গা কোথায়।— তোমাকে নিয়ে আমার হবে কী। তোমার জীবনের ফসল যা কিছু রাখবার তা সমস্তই রাখব কিন্তু তুমি তো রাখবার যোগ্য নও!
>
> প্রত্যেক মানুষ জীবনের কর্মের দ্বারা সংসারকে কিছু না কিছু দান করছে, সংসার তার সমস্তই গ্রহণ করছে, রক্ষা করছে, কিছুই নষ্ট হতে দিচ্ছে না— কিন্তু মানুষ যখন সেই সঙ্গে অহংকেই চিরন্তন করে রাখতে চাচ্ছে তখন তার চেষ্টা বৃথা হচ্ছে। এই-যে জীবনটি ভোগ করা গেল অহংটিকেই তার খাজনাস্বরূপ মৃত্যুর হাতে দিয়ে হিসাব চুকিয়ে যেতে হবে— ওটি কোনোমতেই জমাবার জিনিস নয়।

রবীন্দ্রনাথ ছিন্নপত্রের একটি চিঠিতে (সাহাজাদপুরের পথ, জুলাই, ১৮৯৪) ‘শৈশব সন্ধ্যা’ কবিতাটির ভাবব্যাখ্যা করিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :

> সন্ধ্যাবেলায় পাবনা শহরের একটি খেয়াঘাটের কাছে বোট বাঁধা গেল। ওপার থেকে জনকতক লোক বাঁয়াতবলার সঙ্গে গান গাচ্ছে, একটা মিশ্রিত কলরব কানে এসে প্রবেশ করছে; রাস্তা দিয়ে স্ত্রী পুরুষ যারা চলছে তাদের ব্যস্ত ভাব; গাছপালার ভিতর দিয়ে দীপালোকিত কোঠাবাড়ি দেখা যাচ্ছে; খেয়াঘাটে নানাশ্রেণী লোকের ভিড়। আকাশে নিবিড় একটা একরঙা মেঘ, সন্ধ্যাও অন্ধকার হয়ে এসেছে; ওপারে সারবাঁধা মহাজনী নৌকায় আলো জ্বলে উঠল, পূজাঘর থেকে সন্ধ্যারতির কাঁসরঘণ্টা বাজতে লাগল,— বাতি নিবিয়ে দিয়ে বোটের জানলায় বসে আমার মনে ভারি একটা অপূর্ব আবেগ উপস্থিত হল। অন্ধকারের আবরণের মধ্য দিয়ে এই লোকালয়ের একটি যেন সজীব হৃৎস্পন্দন আমার বক্ষের উপর এসে আঘাত করতে লাগল। এই মেঘলা আকাশের নিচে, নিবিড় সন্ধ্যার মধ্যে, কত লোক, কত ইচ্ছা, কত কাজ, কত গৃহ, গৃহের মধ্যে জীবনের কত রহস্য,— মানুষে মানুষে কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি কত শতসহস্র প্রকারের ঘাতপ্রতিঘাত। বৃহৎ জনতার সমস্ত ভালোমন্দ

> সমস্ত সুখদুঃখ এক হয়ে তরুলতাবেষ্টিত ক্ষুদ্র বর্ষানদীর দুই তীর থেকে একটি সকরুণ সুন্দর সুগম্ভীর রাগিণীর মতো আমার হৃদয়ে এসে প্রবেশ করতে লাগল।
>
> আমার 'শৈশব সন্ধ্যা' কবিতায় বোধ হয় কতকটা এই ভাব প্রকাশ করতে চেয়েছিলুম। কথাটা সংক্ষেপে এই যে, মানুষ ক্ষুদ্র এবং ক্ষণস্থায়ী, অথচ ভালোমন্দ এবং সুখদুঃখপরিপূর্ণ জীবনের প্রবাহ সেই পুরাতন সুগভীর কলস্বরে চিরদিন চলছে ও চলবে— নগরের প্রান্তে সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই চিরন্তন কলধ্বনি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। মানুষের দৈনিক জীবনের ক্ষণিকতা ও স্বাতন্ত্র্য এই অবিচ্ছিন্ন সুরের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে, সবসুদ্ধ খুব একটা বিস্তৃত আদিঅন্তশূন্য প্রশ্নোত্তরহীন মহাসমুদ্রের একতান শব্দের মতো অন্তরের নিস্তব্ধতার মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করছে। এক-এক সময়ে কোথাকার কোন্ ছিদ্র দিয়ে জগতের বড়ো বড়ো প্রবাহ হৃদয়ের মধ্যে পথ পায়— তার যে একটা ধ্বনি শোনা যায় সেটাকে কথায় তর্জমা করা অসাধ্য।

রবীন্দ্রনাথ ছিন্নপত্রের একটি চিঠিতে (সাহাজাদপুর, ৩০ আষাঢ়, ১৮৯৩) 'অনাদৃত' (বা 'জালফেলা') কবিতাটির যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :

> মনে করো একজন ব্যক্তি তার জীবনের প্রভাতকালে সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখছিল ; সে সমুদ্রটা তার আপনার মন কিংবা ওই বাহিরের বিশ্ব কিংবা উভয়ের সীমানামধ্যবর্তী একটি ভাবের পারাবার। সে-কথা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। যাই হোক সেই অপূর্ব সৌন্দর্যময় অগাধ সমুদ্রের দিকে চেয়ে চেয়ে লোকটার মনে হল এই রহস্যপাথারের মধ্যে জাল ফেলে দেখা যাক না কী পাওয়া যায়। এই বলে তো সে ঘুরিয়ে জাল ফেললে। নানারকমের অপরূপ জিনিস উঠতে লাগল— কোনোটা বা হাসির মতো শুভ্র, কোনোটা বা অশ্রুর মতো উজ্জ্বল, কোনোটা বা লজ্জার মতো রাঙা। মনের উৎসাহে সে সমস্ত দিন ধরে ওই কাজই কেবল করলে— গভীর তলদেশে যে-সকল সুন্দর রহস্য ছিল সেইগুলিকে তীরে এনে রাশীকৃত করে তুললে। এমনি করে জীবনের সমস্ত দিনটি যাপন করলে। সন্ধ্যার সময় মনে করলে, এবারকার মতো যথেষ্ট হয়েছে, এখন এইগুলি নিয়ে তাকে দিয়ে আসা যাকগে। কাকে যে সে-কথাটা স্পষ্ট করে বলা হয়নি— হয়তো তার প্রেয়সীকে, হয়তো তার স্বদেশকে। কিন্তু যাকে দেবে সে

> তো এ সমস্ত অপূর্ব জিনিস কখনো দেখেনি। সে ভাবলে, এগুলো কী, এর আবশ্যকতাই বা কী, এতে কী অভাব দূর হবে, দোকানদারের কাছে যাচিয়ে দেখলে এর কতই বা মূল্য হতে পারবে! এক কথায়, এ বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি, তত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতি কিছুই নয়; এ কেবল কতকগুলো রঙিন ভাবমাত্র, তারও যে কোন্‌টার কী নাম কী বিবরণ, তারও ভালো পরিচয় পাওয়া যায় না। ফলত, সমস্ত দিনের জালফেলা অগাধ সমুদ্রের এই রত্নগুলি যাকে দেওয়া গেল সে বললে, এ আবার কী। জেলেরও মনে তখন অনুতাপ হল, সত্যি বটে, এ তো বিশেষ কিছু নয়, আমি কেবল জাল ফেলেছি আর তুলেছি; আমি তো হাটেও যাইনি পয়সাকড়িও খরচ করিনি, এর জন্যে তো আমাকে কাউকে এক পয়সা খাজনা কিংবা মাশুল দিতে হয়নি। সে তখন কিঞ্চিৎ বিষণ্নমুখে লজ্জিত ভাবে সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে ঘরের দ্বারে বসে একে একে রাস্তায় ফেলে দিলে। তার পরদিন সকালবেলায় পথিকরা এসে সেই বহুমূল্য জিনিসগুলি দেশে বিদেশে আপন আপন ঘরে নিয়ে গেল। বোধ হচ্ছে, এই কবিতাটি যিনি লিখেছেন তিনি মনে করছেন, তাঁর গৃহকার্যনিরতা অন্তঃপুরবাসিনী জন্মভূমি, তাঁর সমসাময়িক পাঠকমণ্ডলী, তাঁর কবিতাগুলির ঠিক ভাবগ্রহ করতে পারবে না,— তার যে কতখানি মূল্য সে তাদের জ্ঞানগোচর নয়,— অতএব এখনকার মতো এ-সমস্ত পথেই ফেলে দেওয়া যাচ্ছে, তোমরাও অবহেলা করো আমিও অবহেলা করি, কিন্তু এ-রাত্রি যখন পোহাবে তখন 'পস্টারিটি' এসে এগুলি কুড়িয়ে নিয়ে দেশে বিদেশে চলে যাবে। কিন্তু তাতে ওই জেলে লোকটার মনের আক্ষেপ কি মিটবে। যাই হোক, 'পস্টারিটি' যে অভিসারিণী রমণীর মতো দীর্ঘরাত্রি ধরে ধীরে ধীরে কবির দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং হয়তো নিশিশেষে এসে উপস্থিত হতেও পারে, এ সুখকল্পনাটুকু কবিকে ভোগ করতে দিতে কারো বোধ হয় আপত্তি না হতেও পারে।

'দেউল' কবিতাটির সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ছিন্নপত্রে-সংকলিত উল্লিখিত চিঠিতেই বলিয়াছেন:

> সেই মন্দিরের কবিতাটির ঠিক অর্থটা কী ভালো মনে পড়ছে না। বোধ হয় সেটা সত্যিকার মন্দির সম্বন্ধে। অর্থাৎ যখন কোণে বসে বসে কতকগুলো কৃত্রিম কল্পনার দ্বারা আপনার দেবতাকে আচ্ছন্ন করে

> নিজের মনটাকেও একটা স্বাভাবিক সুতীব্র অবস্থায় নিয়ে যাওয়া গেছে এমন সময় যদি হঠাৎ একটা সংশয়বজ্র পড়ে, সেই-সমস্ত সুদীর্ঘকালের কৃত্রিম প্রাচীর ভেঙে যায়, তখন হঠাৎ প্রকৃতির শোভা, সূর্যের আলোক এবং বিশ্বজনের কল্লোলগান এসে তন্ত্রমন্ত্র ধূপধুনার স্থান অধিকার করে এবং তখন দেখতে পাই— সেই যথার্থ আরাধনা এবং তাতেই দেবতার তুষ্টি।

'দুই পাখি' কবিতা-প্রসঙ্গে জীবনস্মৃতির নিম্নোদ্ধৃত অংশ প্রণিধান যোগ্য :

> বাড়ির বাহিরে আমাদের যাওয়া বারণ ছিল; এমন কি বাড়ির ভিতরেও আমরা সর্বত্র যেমন-খুশি যাওয়া-আসা করিতে পারিতাম না। সেইজন্য বিশ্বপ্রকৃতিকে আড়াল-আবডাল হইতে দেখিতাম। বাহির বলিয়া একটি অনন্তপ্রসারিত পদার্থ ছিল যাহা আমার অতীত, অথচ যাহার রূপ শব্দ গন্ধ দ্বার-জানালার নানা ফাঁক-ফুকর দিয়া এদিক ওদিক হইতে আমাকে চকিতে ছুঁইয়া যাইত। সে যেন গরাদের ব্যবধান দিয়া নানা ইশারায় আমার সঙ্গে খেলা করিবার নানা চেষ্টা করিত। সে ছিল মুক্ত, আমি ছিলাম বদ্ধ, মিলনের উপায় ছিল না, সেইজন্য প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল। আজ সেই খড়ির গণ্ডি মুছিয়া গেছে, কিন্তু গণ্ডি তবু ঘোচে নাই। দূর এখনো দূরে, বাহির এখনো বাহিরেই। বড়ো হইয়া যে-কবিতাটা লিখিয়াছিলাম তাহাই মনে পড়ে—
>
> খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে
> বনের পাখি ছিল বনে।...

'ঝুলন' কবিতাটি সম্পর্কে, 'সাহিত্যের পথে' (১৩৪৩) গ্রন্থে সংকলিত 'সাহিত্যতত্ত্ব' প্রবন্ধে কবি মন্তব্য করিয়াছেন :

> বদ্ধ জল যেমন বোবা, গুমট হাওয়া যেমন আত্মপরিচয়হীন, তেমনি প্রাত্যহিক আধমরা অভ্যাসের একটানা আবৃত্তি ঘা দেয় না চেতনায়, তাতে সত্তাবোধ নিস্তেজ হয়ে থাকে। তাই দুঃখে বিপদে বিদ্রোহে বিপ্লবে অপ্রকাশের আবেশ কাটিয়ে মানুষ আপনাকে প্রবল আবেগে উপলব্ধি করতে চায়।
>
> একদিন এই কথাটি আমার কোনো একটি কবিতায় লিখেছিলেম। বলেছিলেম, আমার অন্তরতম আমি আলস্যে আবেশে বিলাসের প্রশ্রয়ে ঘুমিয়ে পড়ে, নির্দয় আঘাতে তার অসাড়তা ঘুচিয়ে তাকে জাগিয়ে তুলে

> তবেই সেই আমার আপনাকে নিবিড় করে পাই— সেই পাওয়াতেই আনন্দ।

‘হিং টিং ছট’ কবিতাটি চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে আক্রমণ করিয়া লিখিত, তৎকালে অনেকে এইরূপ ধারণা প্রকাশ করিয়াছিলেন; এইরূপ অনুমানের কারণ, সামাজিক মত লইয়া চন্দ্রনাথ বসুর সহিত ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের একাধিকবার তর্কবিতর্ক চলিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ সাধনা পত্রে এই অনুমানের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন,— “কোনো সরল অথবা অসরল বুদ্ধিতে যে এরূপ অমূলক সন্দেহ উদিত হইতে পারে, তাহা আমার কল্পনার অগোচর ছিল।”

সোনার তরীর ‘বিম্ববতী’ কবিতাটি পরে শিশুতে ও ‘গানভঙ্গ’ কবিতাটি কথা ও কাহিনী কাব্যের কাহিনী অংশে সংকলিত হইয়াছিল। রচনাবলীতে ‘বিম্ববতী’ শিশু হইতে বর্জিত হইবে, সোনার তরীতে তাহা পূর্ববৎ মুদ্রিত থাকিল; ‘গানভঙ্গ’ রচনাবলীতে সোনার তরী হইতে বর্জিত হইল, কথা ও কাহিনীতে মুদ্রিত হইবে।

চিত্রাঙ্গদা

চিত্রাঙ্গদা ১২৯৯ সালের ২৮ ভাদ্র তারিখে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

এই কাহিনীটিকে পরবর্তীকালে কবি নৃত্যনাট্যের রূপ দিয়াছেন, তাহা ‘নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা’ নামে ১৩৪৩ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

চিত্রাঙ্গদার প্রথম সংস্করণ শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক ‘চিত্রাঙ্কিত’ হইয়াছিল, উৎসর্গে তাহারই উল্লেখ আছে।

দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩০১) ও ১৩০৩ সালের কাব্যগ্রন্থাবলী-সংকলনে চিত্রাঙ্গদার স্থানে স্থানে পাঠ-পরিবর্তন হইয়াছিল; বর্তমান স্বতন্ত্র সংস্করণ এই তিনটির কোনো-একটির সম্পূর্ণ অনুরূপ নহে। উল্লিখিত সংস্করণগুলির পাঠ তুলনা করিয়া তাহা হইতে কবির নির্দেশানুযায়ী পাঠ রচনাবলীতে গ্রহণ করা হইয়াছে।

গোড়ায় গলদ

গোড়ায় গলদ ১২৯৯ সালের ৩১ ভাদ্র তারিখে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে ইহা ‘গদ্যগ্রন্থাবলী’র প্রহসন খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়, বর্তমানেও সেইরূপভাবে প্রচলিত আছে। পরে গ্রন্থখানি পুনর্লিখিত হইয়া ‘শেষ রক্ষা’ (১৩৩৫) নামে প্রকাশিত হয়, তাহাও রচনাবলীতে যথাক্রমে প্রকাশিত হইবে।

Digitization by eGangotri and Sarayū Trust. Funding by MoE-IKS

চোখের বালি

চোখের বালি ১৩০৯ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

প্রথম সংস্করণের শেষ অংশ ("তখন ঘোমটা-মাথায় আশা…ভগবান তোমাদের চিরসুখী করুন।"—পৃঃ ৪৯৯-৫১০, রচনাবলী) বর্তমানে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রচলিত সংস্করণে বর্জিত হইয়াছিল, রচনাবলী-সংস্করণে তাহা যোগ করিয়া দেওয়া হইল।

আত্মশক্তি

আত্মশক্তি ১৩১২ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। পরে ইহা আর স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রচলিত ছিল না, ইহার অনেকগুলি 'গদ্যগ্রন্থাবলী'র অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছিল; 'স্বদেশী সমাজ,' 'স্বদেশী সমাজ প্রবন্ধের পরিশিষ্ট' ও 'সফলতার সদুপায়' সমূহ গ্রন্থে, 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' শিক্ষা গ্রন্থে, 'দেশীয় রাজ্য' স্বদেশ গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়, ভারতবর্ষীয় সমাজের এক অংশ স্বদেশী সমাজ প্রবন্ধের পরিশিষ্টের সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। বিভিন্ন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করিবার সময় প্রবন্ধগুলিকে বিশেষভাবে সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছিল। সেই পরিবর্জিত অংশগুলি রচনাবলীতে পুনরায় যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

আত্মশক্তির প্রবন্ধগুলি ১৩০৮-১২ সালে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়, যথা, নেশন কী (১৩০৮), ভারতবর্ষীয় সমাজ ('হিন্দুত্ব' নামে; ১৩০৮), স্বদেশী সমাজ (১৩১১), স্বদেশী সমাজ প্রবন্ধের পরিশিষ্ট (১৩১১), সফলতার সদুপায় (১৩১১), ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ (১৩১২), য়ুনিভার্সিটি বিল (১৩১১), অবস্থা ও ব্যবস্থা (১৩১২), ব্রতধারণ (১৩১২), দেশীয় রাজ্য (১৩১২)।

স্বদেশী সমাজ ৭ শ্রাবণ (১৩১১) তারিখে মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে চৈতন্য লাইব্রেরির বিশেষ অধিবেশনে প্রথম পঠিত হয়, পরে পরিবর্ধিত আকারে ১৬ শ্রাবণ তারিখে কর্জন রঙ্গমঞ্চে পুনঃপঠিত হয়। ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ ১৭ চৈত্র (১৩১১) তারিখে ক্লাসিক রঙ্গমঞ্চে পঠিত হয়। অবস্থা ও ব্যবস্থা ৯ ভাদ্র (১৩১২) টাউন হলে পঠিত হয়। দেশীয় রাজ্য ১৭ আষাঢ় (১৩১২) "রাজধানী আগরতলায় 'ত্রিপুরা সাহিত্য-সম্মিলনী'র প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে" পঠিত হয়।

সফলতার সদুপায় প্রবন্ধের উপলক্ষ্য, বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত উক্ত প্রবন্ধের কোনো কোনো অংশ উদ্ধৃত করিলে অধিকতর পরিস্ফুট হইবে।—

> শহরে এবং ভদ্রপল্লীতে প্রাথমিক শিক্ষার যেরূপ ব্যবস্থা আছে, কৃষিপল্লীগুলিতে ঠিক সেরূপ ব্যবস্থা অনুপযুক্ত বলিয়া স্থির হইয়াছে।

এই সকল স্থানের প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষাপ্রণালী পরিবর্তন করিয়া পাঠ্যবিষয় সরল করিবার প্রস্তাব বিচার করিবার জন্য গবর্মেণ্ট একটি কমিটি বসাইয়াছিলেন। পাঁচ জন এই কমিটির সদস্য…

দশম প্যারাগ্রাফে কমিটি বলিতেছেন— বাংলা নিম্ন প্রাইমারি স্কুলে প্রচলিত পাঠ্যপুস্তকগুলির অধিকাংশ ন্যূনাধিক সংস্কৃতায়িত (Sanscritized) ভাষায় লেখা হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে এমন-সকল পরিভাষা থাকে যাহা পল্লিবাসীরা বোঝে না। অতএব, এই-সকল স্কুলের উপযুক্ত আদর্শপাঠ্যগ্রন্থ তৈরি করিবার জন্য কয়েকটি বিচক্ষণ কর্মচারী লইয়া একটি বিশেষ সমিতি স্থাপিত হউক। বইগুলি প্রথমে ইংরাজিতে লেখা হইবে, তাহার পরে সরকার মঞ্জুর করিলে কমিশনার সাহেব ও স্কুল-ইন্‌স্পেক্টরদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্‌টার বইগুলিকে স্থানীয় প্রচলিত ভাষায় (local vernaculars) তর্জমা করিবার জন্য লোক নির্বাচন করিবেন।…মনে করিয়াছিলাম, বাংলার "local vernacular" বাংলা, বেহারের বেহারী, উড়িষ্যার উড়িয়া।…

একাদশ প্যারাগ্রাফে কমিটি বলিতেছেন:— ইংরেজি আদর্শপাঠ্যপুস্তকগুলি যথেষ্টপরিমাণ স্থানীয় প্রচলিত ভাষায় তর্জমা হওয়াটাকে কমিটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার বলিয়া মনে করেন। যথা তাঁহাদের বিবেচনায় বেহারে অন্তত তিন উপভাষায় তর্জমা হওয়া চাই, ত্রিহুতি, ভোজপুরি এবং মৈথিলি; এবং বাংলাদেশে অন্ততপক্ষে উত্তর, পূর্ব, মধ্য এবং পশ্চিম ভাষায় তর্জমা হওয়া উচিত হইবে।…

চারিজন ইংরেজ ও তাঁহাদের অনুগত একজন বাঙালি [কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত] বাংলাদেশের শিক্ষাপ্রণালীর ভিত্তিপত্তনে ভাষাবিচ্ছেদ ঘটানোটাকে "matter of great importance" গুরুতর প্রয়োজনীয় ব্যাপার বলিয়া মনে করেন।…

কমিটি বলিতেছেন, ইহাতে চাষীদের উপকার হইবে; কিন্তু… একতলায় এমন উপকার করিতে বসা ঠিক নয়, যাহাতে কিছুদিন পরেই দোতলায় ফাটল ধরিতে আরম্ভ হয়। সেটা দোতলার পক্ষে মন্দ এবং একতলার পক্ষেও ভালো নয়। সরকারবাহাদুর যদি ভারতবর্ষের দেশে-দেশে ভাষাবিচ্ছেদ শুরু করিয়া দেন, তবে কৃষিপল্লীতে তাহার সূত্রপাত

হইয়া দিনে দিনে নিচে হইতে উপর পর্যন্ত তাহার ফাটল বিস্তৃত হইতে আরম্ভ করিবে।…

ভারতবর্ষে ভাষার বৈচিত্র্য আমাদিগকে যেমন খণ্ডবিখণ্ড করিয়াছে, এমনতরো গিরিমরুর ব্যবধানও করিতে পারে নাই। ইহার উপরেও যেখানে ভাষার যথার্থ বিচ্ছেদ নাই, সেখানেও যদি বিচ্ছেদ সযত্নে তৈরি করিয়া তোলা হয়…তবে— তবে কী আর বলিতে পারি, অন্তত দুই হাত তুলিয়া ব্রিটিশ সরকারকে আশীর্বাদ করিব না।

বোঝা যাইতেছে, কর্তৃপক্ষের তরফ হইতে আমাদের দেশটাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়াটা একটা matter of great importance হইয়া উঠিয়াছে।

কর্তৃপক্ষ বলিতেছেন, আমরা নিতান্তই চাষীদের উপকার করিতে চাই। হয়তো চান, কিন্তু কমিটিও যে বিশুদ্ধভাবে সেই উদ্দেশ্যসাধনের প্রতিই লক্ষ্য রাখিয়াছেন, সে-কথাটা বিশ্বাস করা সহজ হইত যদি দেখিতাম কর্তৃপক্ষের স্বদেশেও তাঁহাদের স্বজাতীয় চাষীদের এই প্রণালীতে উপকার করা হইয়া থাকে।

ইংরেজের দেশেও চাষা যথেষ্ট আছে এবং সেখানে যে-ভাষায় পাঠ্যগ্রন্থ লেখা হয় তাহা সকল চাষার মধ্যে প্রচলিত নহে।…ল্যাঙ্কাশিয়রের উপভাষায় ল্যাঙ্কাশিয়রের চাষীদের বিশেষ উপকারের জন্য পাঠ্যপুস্তক-প্রণয়ন হইতেছে না। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, ইংলণ্ডে চাষীদের শিক্ষা সুগম করা যদিও নিশ্চয়ই matter of great importance, তথাপি ইংলণ্ডের সর্বত্র ইংরেজিভাষার ঐক্য রক্ষা করা matter of greater importance। কিন্তু সে-দেশে চাষীদের উপকার ও ভাষার অখণ্ডতা রক্ষা উভয়ই এক স্বার্থের অন্তর্গত, এ সম্বন্ধে কোনো পক্ষভেদ নাই— সুতরাং সেখানে ভাষাকে চার টুকরা করিয়া চাষীদের কিঞ্চিৎ ক্লেশলাঘব করার কল্পনামাত্রও কোনো পাঁচজন বুদ্ধিমানের একত্র সম্মিলিত মাথার মধ্যে উদয় হইতেই পারে না।…জনসাধারণের শিক্ষার উপসর্গ লইয়াই হউক বা যে উপলক্ষ্যেই হউক, দেশের উপভাষার অনৈক্যকে প্রণালীবদ্ধ উপায়ে ক্রমশ পাকা করিয়া তুলিলে তাহাতে যে দেশের সাধারণ মঙ্গলের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়, তাহা নিশ্চয়ই আমাদের পাশ্চাত্ত্য কর্তৃপক্ষেরা, এমন কি, তাঁহাদের বিশ্বস্ত বাঙালীসদস্য, আমাদের চেয়ে বরঞ্চ ভালোই বোঝেন।

বাংলা 'সাহিত্যভাষা বড়ো বেশি সংস্কৃতান্বিত', এই কারণ দেখাইয়া কর্তৃপক্ষ উহাকে 'কৃষিপল্লীর পাঠশালা হইতে নির্বাসিত' করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

> আমাদের দেশে প্রাচীনভাষার সহিত আধুনিক প্রাকৃত ভাষাগুলির …আকস্মিক সম্বন্ধ নহে, বরাবর সংস্কৃত ভাষার সহিত ইহার নাড়ীর যোগ রহিয়া গেছে। অন্য কারণ ছাড়িয়া দিলেও ইহা দেখিতে হইবে, আমাদের দেশের ধর্মসাহিত্যের একমাত্র প্রস্রবণ সংস্কৃত। পুরাণপাঠ, কীর্তন, পৌরাণিক যাত্রা, কথকতা, তরজা, কবির লড়াই প্রভৃতি যাহা-কিছু আমাদের সাধারণ লোকের উপদেশ ও আমোদের উপকরণ, সমস্তই স্বভাবতই সংস্কৃতকথাকে দেশের সর্বত্র সঞ্চারিত করিয়া দিতেছে। দেশের পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত দেশের সাধারণের এই জ্ঞানসম্বন্ধের ভাবসম্বন্ধের পথ চিরদিন অবারিত আছে। বর্তমানকালেও দেশের বিদ্বানেরা যে-ভাষার মধ্যে তাঁহাদের জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া রাখিতেছেন, যে-ভাষায় দেশের সমস্ত ভদ্রসম্প্রদায় তাঁহাদের বীক্ষণাশক্তি, মননাশক্তি, পরীক্ষণাশক্তির সমস্ত ফলকে বিস্তীর্ণ দেশ ও বিস্তীর্ণ কালের জন্য স্থায়িত্ব দিতে চেষ্টা করিতেছেন, সেই ভাষার সহিত নিম্নসাধারণের চিত্তের যোগ কৃত্রিম বাধার দ্বারা বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া সরকারের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে, এ-কথা বলিলে অবশ্য আমাদিগকে বিশ্বাস করিতেই হইবে— কিন্তু চাষাদের মঙ্গলের পক্ষেও ইহা প্রয়োজনীয়, এ-কথা স্বয়ং কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত মহাশয় বলিলেও বিশ্বাস করিব না।……

কর্তৃপক্ষের এই চারিটি উপভাষা চালাইবার সংকল্প বন্ধ হওয়াতে, বঙ্গদর্শনে মুদ্রিত সফলতার সদুপায় প্রবন্ধের উপরিলিখিত ও তৎসময়োপযোগী অন্যান্য অংশ আত্মশক্তিতে প্রবন্ধটি সংকলনের সময় বাদ দেওয়া হয়।

লর্ড কর্জনের আমলে য়ুনিভার্সিটি "সংস্কার" করিবার জন্য যে য়ুনিভার্সিটি বিল উপস্থাপিত হয়, যাহার উদ্দেশ্য ছিল উচ্চশিক্ষার প্রসার সংকুচিত ও ব্যয়সাধ্য করা, দেশের প্রতিবাদসত্ত্বেও তাহা পাশ হইবার পর 'য়ুনিভার্সিটি বিল' প্রবন্ধটি বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। সেই প্রবন্ধের উপক্রমণিকায় রবীন্দ্রনাথ বলিলেন :

> য়ুনিভার্সিটি বিল পাশ হইয়া গেছে, আমরাও নিস্তব্ধ হইয়াছি। যতক্ষণ পাশ হয় নাই, ততক্ষণ আমরা এমন ভাব ধারণ করিয়াছিলাম

> যেন আমাদের মহা অনর্থপাত ঘটিয়াছে। যদি বস্তুতই আমাদের সেইরূপ বিশ্বাসই হয়, তবে বিল পাস হইয়া গেল বলিয়াই অমনি সুনিদ্রার আয়োজন করিতে হইবে, ইহার হেতু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।
>
> দেশের সত্যই যদি কোনো দারুণ অনিষ্ট ঘটিবার কারণ থাকে, তবে গবর্মেণ্ট আমাদের দোহাই মানিলেন না বলিয়াই আমরা নিজেরাও যথাসাধ্য প্রতিকার-চেষ্টা করিব না, ইহার অর্থ কী। আন্দোলনসভায় আমরা যে-পরিমাণে সুর চড়াইয়া কাঁদিয়াছিলাম, রং ফলাইয়া ভাবী সর্বনাশের ছবি আঁকিয়াছিলাম, আমাদের বর্তমান নিশ্চেষ্টতা কি আমাদের সেই পরিমাণ লজ্জার বিষয় নহে। বেদনা যদি অকপট হয়, শঙ্কা যদি ভান না হয়, তবে আজ আমরা চুপচাপ করিয়া বসিয়া নিজের দুই গালে চূণকালি লেপিতেছি।

রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাব করিলেন, 'নিজেদের বিদ্যাদানের ভার নিজেরা গ্রহণ' করিতে হইবে:

> বসিয়া-বসিয়া আক্ষেপ করিলে চলিবে না। আমরা নিজেরা যাহা করিতে পারি তাহারই জন্য আমাদিগকে কোমর বাঁধিতে হইবে।… বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে— নিজেদের বিদ্যাদানের ব্যবস্থাভার নিজেরা গ্রহণ করা। তাহাতে আমাদের বিদ্যামন্দিরে কেম্ব্রিজ-অক্স্ফোর্ডের প্রকাণ্ড পাষাণ প্রতিরূপ প্রতিষ্ঠিত হইবে না জানি, তাহার সাজসরঞ্জাম দরিদ্রের উপযুক্ত হইবে…কিন্তু জাগ্রত সরস্বতী শ্রদ্ধাশতদলে আসীন হইবেন, তিনি জননীর মতো করিয়া সন্তানদিগকে অমৃত পরিবেষণ করিবেন, ধনমদগর্বিতা বণিক্‌গৃহিণীর মতো উচ্চ বাতায়নে দাঁড়াইয়া দূর হইতে ভিক্ষুকবিদায় করিবেন না।

ভূমিকা

রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত বিভিন্ন গ্রন্থের সূচনাগুলি কবি রচনাবলীর জন্য সম্প্রতি লিখিয়া দিয়াছেন।

LIBRARY
No.……………
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

বর্ণানুক্রমিক সূচী

অক্ষমা ১৪৪
অচল স্মৃতি ১৪৬
অনাদৃত ৭৭
অবস্থা ও ব্যবস্থা ৬০০
অমন দীন-নয়নে তুমি চেয়ো না ১০৩
আকাশের চাঁদ ৪৫
আজ কোনো কাজ নয়; সব ফেলে দিয়ে ৬৫
আজি যে-রজনী যায় ফিরাইব তায় ৯৯
আত্মসমর্পণ ১২৫
আমার হৃদয় প্রাণ ১০৬
আমার হৃদয়ভূমি-মাঝখানে ১৪৬
আমারে ফিরায়ে লহ, অয়ি বসুন্ধরে ১৩১
আমি পরানের সাথে খেলিব আজিকে ৯৩
আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে ১৫০
একদা পুলকে প্রভাত-আলোকে ১৪৭
ওরে মৃত্যু, জানি তুই আমার বক্ষের মাঝে ৫৯
কণ্টকের কথা ১৪৭
খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে ৪৩
খেলা ১৪২
খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ-পাথর ৩৭
গগন ঢাকা ঘন মেঘে ৮০
গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা ৭
গতি ১৪৩
ঘুমের দেশে ভাঙিল ঘুম ১৯
চক্ষু কর্ণ বুদ্ধি মন সব রুদ্ধ করি ১৪৩
ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ ৫৭৯
জানি আমি সুখেদুঃখে হাসি ও ক্রন্দনে ১৪৩

ঝুলন	...	...	৯৩
তখন তরুণ রবি প্রভাতকালে	...	...	৭৭
তুমি মোরে পার না বুঝিতে ?	...	...	৯
তোমরা ও আমরা	...	...	২৫
তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাও	...	...	২৪
তোমার আনন্দগানে আমি দিব সুর	...	...	১৪৫
দরিদ্রা	...	...	১৪৪
দরিদ্রা বলিয়া তোরে বেশি ভালোবাসি	...	...	১৪৪
দুই পাখি	...	...	৪৩
দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি ; বেলা দ্বিপ্রহর	...	...	৪৯
দুর্বোধ	...	...	৯১
দোল	...	...	৮২
দেশীয় রাজ্য	...	...	৬২৬
ধীরে ধীরে বিস্তারিছে ঘেরি চারি ধার	...	...	১২
নদীপথে	...	...	৮০
নদী ভরা কূলে কূলে, খেতে ভরা ধান	...	...	১০১
নিদ্রিতা	...	...	১৬
নিরুদ্দেশ যাত্রা	...	...	১৫০
নেশন কী	...	...	৫১৫
পরশ-পাথর	...	...	৩৭
পুরস্কার	...	...	১০৯
প্রতীক্ষা	...	...	৫৯
প্রত্যাখ্যান	...	...	১০৩
বন্দী হয়ে আছ তুমি সুমধুর স্নেহে	..	...	২৬
বন্ধন	...	...	১৪২
বন্ধন ? বন্ধন বটে সকলি বন্ধন	...	...	১৪২
বর্ষাযাপন	...	...	২৭
বসুন্ধরা	...	...	১৩১
বিপুল গভীর মধুর মন্দ্রে	...	...	৮৬
বিম্ববতী	...	...	৯

বিশ্বনৃত্য ৮৬
বৈষ্ণব-কবিতা ৪৩
ব্যর্থ যৌবন ... ... ৯[illegible]
ব্রতধারণ ৬২০
ভরা ভাদরে ১০১
ভারতবর্ষীয় সমাজ ৫২০
মানসসুন্দরী ৬৫
মায়াবাদ ১৪১
মুক্তি ১৪৩
যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ ৯৭
যার অদৃষ্টে যেমনি জুটুক ২৮০
য়ুনিভার্সিটি বিল ... ... [illegible]৪
যেখানে এসেছি আমি, আমি সেথাকার ১৪৪
যেতে নাহি দিব ... ... ৪[illegible]
রচিয়াছিনু দেউল একখানি ... ... ৮[illegible]
রাজধানী কলিকাতা ; তেতালার ছাতে ... ... [illegible]
রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে ১৪
রাজার ছেলে ফিরেছি দেশে দেশে ১৬
রাজার ছেলে যেত পাঠশালায় ১৪
লজ্জা ১০৬
শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান ? ৪০
শৈশবসন্ধ্যা ১২
সফলতার সদুপায় ৫৫৯
সমুদ্রের প্রতি ৫৫
সযত্নে সাজিল রানী, বাঁধিল কবরী ৯
সুপ্তোত্থিতা ১৯
সেদিন বরষা ঝর ঝর ঝরে ... ... ১[illegible]
সোনার তরী ৭
সোনার বাঁধন ২৬
স্বদেশী সমাজ ৫২৬

'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধের পরিশিষ্ট ৫৫২
স্বপ্ন দেখেছেন রাত্রে হবুচন্দ্র ভূপ ৪১
হাত্তো[illegible] দাও আকাশের চাঁদ ৫
হা রে নিরানন্দ দেশ, পরি জীর্ণ জরা ১৪
হিং টিং ছট্ ৩১
হৃদয়যমুনা ৯৭
হে আদিজননী সিন্ধু, বসুন্ধরা সন্তান তোমার ৫৫
হোক খেলা, এ খেলায় যোগ দিতে হবে ১৪২

LIBRARY
No.............
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

LIBRARY
No.…………
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.